শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র দেবশর্ম্মা

তীর্থের পথে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ভারতবর্ষ

বৈশাখ, ১৩৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা।

বিধাতার বিশ্বসৃষ্টির প্রয়োজন কি ?

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের প্রথম কথা ও তাহার উত্তর পূর্ব্ব প্রবন্ধে (পৌষ সংখ্যায়) সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছি। এইবার তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কথার যথামতি আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকায় তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"। এখন স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে এই প্রয়োজন দ্বিবিধ। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া যে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহার যখন কিছুরই অভাব নাই, কোন দুঃখ নাই, তখন তিনি কোনও স্বার্থের জন্য জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা কিছুতেই বলা যাইবে না। তিনি পরার্থেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহাও বলা যায় না। কারণ, তিনি জীবের প্রতি করুণাবশতঃ জগতের সৃষ্টি করিলে সুখময়ী সৃষ্টিই করিতেন। জগতে দুঃখের সৃষ্টি করিতেন না। যিনি পরম কারুণিক, তিনি কাহারও দুঃখজনক কোন কার্য্য কেন করিবেন? তিনি দুঃখময় সংসারে বদ্ধ করিয়া কাহাকেও দুঃখ দিতে পারেন না। অতএব সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের কোনই প্রয়োজন সম্ভব না হওয়ায় সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নাই—ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই চিন্তাশীল ভারতীয় দার্শনিক আচার্য্যগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমালোচনা হইয়া আসিতেছে। তাই বেদান্তদর্শনেও আমরা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান দেখিতে পাই। "ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্বসমর্থক ভারতীয় সমস্ত দার্শনিকই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আমরা উক্ত বিষয়ে দুইটি মত দেখিতে পাই।

(১) প্রথম মত এই যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তিনি প্রয়োজন ব্যতীতই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রয়োজন ব্যতীতও তাঁহার পক্ষে জগৎসৃষ্টি অসম্ভব নহে।

২। দ্বিতীয় মত এই যে, ঈশ্বর পরার্থেই অর্থাৎ জীবের মঙ্গলের জন্যই করুণাবশতঃ জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবের প্রতি অনুগ্রহই তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের প্রয়োজন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের মতে বেদান্ত-দর্শনে পূর্ব্বোক্ত প্রথম মতই সমর্থিত হইয়াছে এবং অন্যান্য বৈদান্তিক আচার্য্যগণও ঐ প্রথম মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহাদিগের মতে বেদান্তদর্শনের "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" (২।১।৩২।) এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষই প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রে "প্রবৃত্তীনাম্" এই পদের অধ্যাহার করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না; যেহেতু প্রবৃত্তিমাত্রেরই "প্রয়োজনবত্ত্ব" আছে, অর্থাৎ প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও কোনরূপ প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি-প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজনই সম্ভব না হওয়ায় তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্তি অসম্ভব। সুতরাং তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। বেদান্তদর্শনে পূর্ব্বোক্ত সূত্রের পরেই "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান হইয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যদিও এই বিশ্বসৃষ্টি আমাদিগের পক্ষে অতি গুরুতর ব্যাপার বা অসাধ্য ব্যাপারের ন্যায়ই মনে হয়, তথাপি পরমেশ্বরের শক্তি অপরিমিত, এজন্য এই বিশ্বসৃষ্টি তাঁহার কেবল লীলামাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অনায়াসে স্বেচ্ছামাত্রেই জগতের সৃষ্টি করেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই। কারণ, কষ্টসাধ্য কার্য্যই প্রয়োজন ব্যতীত কেহ করে না। কিন্তু যাহার যে কার্য্যে কিছুমাত্র কষ্ট বা পরিশ্রম নাই, এমন অনেক কার্য্য অনেক সময়ে অনেকে প্রয়োজন ব্যতীতও করিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত কথা সমর্থন করিতে "ভামতী" টীকায় শ্রীবাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, যদি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের কোন কার্য্যই নিষ্প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কোন প্রয়োজন সম্ভব না হওয়ায় তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন—ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোন প্রয়োজন-জ্ঞান ব্যতীতও অনেক সময়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের যাদৃচ্ছিক অনেক ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। অন্যথা ধর্ম্ম-সূত্রকার ঋষিদিগের "ন কুর্য্যাৎ বৃথা চেষ্টাং" এই নিষেধ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। কারণ, নিষ্প্রয়োজন কোন চেষ্টা বা কার্য্য একেবারে অলীক বা অসম্ভব হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত কথা সমর্থন করিতে সেখানে বেদান্তচূড়ামণি মহামনীষী অপ্পয় দীক্ষিত "বেদান্ত কল্পতরু" গ্রন্থের "কল্পতরুপরিমল" টীকায় বলিয়াছেন যে, কাহারও সুখ হইলে ঐ সুখের অনুভবপ্রযুক্ত কোন প্রয়োজন ব্যতীতও তাহার হাস্য ও গানাদি ক্রিয়া দেখা যায়। সেখানে তাহার ঐ হাস্যাদি ক্রিয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজনের সম্ভাবনা করা যায় না। দুঃখের উদ্রেক হইলে যেমন কোন প্রয়োজন ব্যতীতও অনেকে রোদন করে, তদ্রূপ, সুখের উদ্রেক হইলেও কোন প্রয়োজন ব্যতীতও অনেকে হাস্যাদি করে,—ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এই জন্যই তখন লোকে ঐ হাস্য বা রোদনের কারণই জিজ্ঞাসা করে, প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করে না। অর্থাৎ কারণ ও প্রয়োজন সর্ব্বত্র এক পদার্থ নহে। ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির কারণ আছে, কিন্তু প্রয়োজন নাই। তিনি প্রয়োজন ব্যতীতই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রয়োজন ব্যতীতও অনেক ক্রিয়া হইয়া থাকে ও হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে পরমবৈষ্ণব মধ্বাচার্য্যও ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন মত্ত ব্যক্তি সুখের উদ্রেকবশতঃই কোন প্রয়োজন ব্যতীতও নৃত্যগীতাদি লীলা করে, তদ্রূপ, পরমেশ্বরও কোন প্রয়োজন ব্যতীতও জগতের সৃষ্টি করেন। মধ্বাচার্য্য ইহা সমর্থন করিতে সেখানে "নারায়ণ সংহিতা"র বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"কিন্তু যথা লোকে মত্তস্য সুখোদ্রেকাদেব নৃত্যগানাদি লীলা, ন তু প্রয়োজনাপেক্ষয়া, এবমেবেশ্বরস্য। নারায়ণ সংহিতায়াম্—

"সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু।
কুরুতে, কেবলানন্দান্ যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্॥
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ।
মুক্তা অপ্যাপ্নুঃ কামাঃ স্যুঃ কিমুতা স্যাখিলাত্মনঃ॥" ইতি।
দৈবতৈর্ব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি শ্রুতিঃ"।
মাধ্বভাষ্য।

"ভগবৎসন্দর্ভে" গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামীও মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত কথারই উল্লেখপূর্ব্বক সমর্থন

করিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজও শ্রীভাষ্যে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য যে শ্রীভগবানের লীলা, চেতন অচেতন পুনঃ পুনঃ সর্ব্ববিধ বস্তুই যে তাঁহার সেই লীলার উপকরণ, ইহা বলিয়া ঋষিবচনের দ্বারা উহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বাণি চিদচিদ্বস্তূনি সূক্ষ্মদশাপন্নানি স্থূলদশাপন্নানি চ পরস্য ব্রহ্মণো লীলোপকরণানি। সৃষ্ট্যাদয়শ্চ লীলেতি ভগবদ্দ্বৈপায়ন পরাশরাদিভিরুক্তম্।

"অব্যক্তাদ্বিবিশেষান্তং পরিণামর্দ্ধিসংযুতম্।
ক্রীড়া হরেরিদং সর্ব্বং ক্ষয়মিত্যুপধার্য্যতাম্॥"

"ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময়"। (বিষ্ণু-পুরাণ ১।২।১৮)। "বালঃ ক্রীড়নকৈরিব" (বায়ু পুরাণ উত্তর ৩৬।১৬) ইত্যাদিভিঃ। বক্ষ্যতি চ "লোকবত্তু লীলা কৈবল্য" মিতি। বেদান্তদর্শন ১ম অঃ ৪র্থ পাঃ ২৭শ সূত্রের শ্রীভাষ্য।

পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যের প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু গৌড়পাদ স্বামী "মাণ্ডূক্য কারিকা"য় লিখিয়াছেন—

"ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা:"।

অর্থাৎ এক সম্প্রদায় বলেন যে, ঈশ্বর ভোগের জন্য সৃষ্টি করেন, অপর সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ক্রীড়ার জন্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু জগৎসৃষ্টি ঈশ্বরের স্বভাব। কারণ, তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোন স্পৃহা থাকিতে পারে না। "বেদান্ত কল্পতরু"র "পরিমল" টীকায় অপ্পয় দীক্ষিত "ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনকে মাণ্ডূক্য উপনিষৎ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য এবং প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামীও "দেবস্যৈষ (ব) স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা।" এই বচনকে শ্রুতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত মাণ্ডূক্য উপনিষদের মধ্যে আমরা উক্ত শ্লোক দেখিতে পাই না। প্রচলিত "মাণ্ডূক্য কারিকা"র মধ্যেই উক্ত শ্লোক দেখিতে পাই। উহা গৌড়পাদ স্বামীর বিরচিত গ্রন্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। অপ্পয় দীক্ষিতও কেন যে উক্ত শ্লোককে মাণ্ডূক্য উপনিষৎ বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আছে। অপ্পয় দীক্ষিত উক্ত শ্লোককে শ্রুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াই উহার সহিত "লোকবত্তু লীলা কৈবল্যং" এই বেদান্তসূত্রের বিরোধের আশঙ্কাও করিয়াছেন। কারণ, পরমেশ্বর ক্রীড়ার জন্য জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, এই মত উক্ত শ্লোকে অপরের মত বলিয়াই কথিত হইয়াছে। উহা সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত-সূত্রে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকেই সিদ্ধান্তরূপেই তাঁহার লীলা বলা হইয়াছে। "ক্রীড়া" ও "লীলা" একই পদার্থ হইলে উক্ত শ্রুতির সহিত উক্ত বেদান্তসূত্রের বিরোধ হয়। অপ্পয় দীক্ষিত উক্ত বিরোধপরিহারের জন্য বলিয়াছেন যে, "ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে" এই শ্রুতি-বাক্যোক্ত "ক্রীড়া" ও বেদান্তসূত্রোক্ত "লীলা" সর্ব্বথা একই পদার্থ নহে। যে ক্রীড়াবিশেষের প্রয়োজন তৎকালীন আনন্দলাভ, তাহাই ঐ শ্রুতিবাক্যে "ক্রীড়া" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। আর যে ক্রীড়াবিশেষের কোনই প্রয়োজন নাই, তাহাই বেদান্ত সূত্রে "লীলা" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সপ্রয়োজন ও নিষ্প্রয়োজন এই বিবিধ লীলাই জগতে দেখা যায়। প্রয়োজন ব্যতীত যে কোন লীলাই হয় না, হইতেই পারে না, ইহা স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহাও বলিয়াছেন যে, যদিও জগতে সর্ব্ববিধ লীলাতেই কোন না কোন প্রয়োজন সম্ভাবনা করা যায়, অর্থাৎ মত্ত ব্যক্তির হস্তাদি ক্রিয়াতেও যদি তাঁহার তৎকালীন আনন্দবিশেষই প্রয়োজন বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও পরমেশ্বরের লীলার কিছুমাত্র প্রয়োজন সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতিতে তিনি "আপ্তকাম" বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কিছুরই অভাব না থাকায় তিনি কোন বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শেষে তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তানুসারে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত পরিহার প্রকাশ করিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর হইতে জগতের সৃষ্টিবোধক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য আছে, তাহা পরমার্থবিষয়ক নহে। কারণ, ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্য অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ-ব্যবহার-বিষয়ক এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই সিদ্ধান্তপ্রতিপাদনেই উহার তাৎপর্য্য, ইহা বিস্মৃত হইবে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ঐ কথার তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর হইতে জগতের সত্য সত্য সৃষ্টি হয় নাই। অবিদ্যাবশতঃ যেমন রজ্জুতে সর্পের মিথ্যা সৃষ্টি হইয়া থাকে, তদ্রূপ, ব্রহ্মে এই জগতের মিথ্যা সৃষ্টি

হইয়াছে। উহার ব্যাবহারিক সত্তা আছে বটে, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় এই জগৎ ভ্রমকল্পিত বা মিথ্যা, উহা বস্তুতঃ সত্য নহে। সুতরাং ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না। কারণ, যে অনাদি অবিদ্যা এই মিথ্যা সৃষ্টির মূল, উহা স্বভাবতঃই কার্য্যোন্মুখী, উহা নিজকার্য্যে কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করে না। অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুতে যে সর্পের মিথ্যা সৃষ্টি হয়, এবং রজ্জুজ্ঞ তখন ঐ সর্পদ্রষ্টা ব্যক্তির ভয় ও কম্পাদি জন্মে, তাহা যে কাহারই কোনই প্রয়োজনকে অপেক্ষা করে না—ইহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। "ভামতী" টীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত কথা দৃষ্টান্তাদির দ্বারা বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

অবশ্য স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল প্রভৃতির ন্যায় জগৎসৃষ্টিও অলীক হইলে তাহাতে কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না থাকায় এ মতে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের এবং পরমেশ্বরের বৈষম্যাদি দোষের সর্ব্বোত্তম খণ্ডন হয়, ইহা সত্য, কিন্তু বেদান্ত-সূত্রকার ভগবান্ বাদরায়ণের "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" ইত্যাদি অনেক সূত্রের দ্বারা সৃষ্টির সত্যতাই বুঝা যায় কি না, ইহা অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে। "ভামতী" টীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ইহা চিন্তা করিয়া সেখানে লিখিয়াছেন যে, সৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করিয়াই অর্থাৎ লোকসিদ্ধ মতানুসারেই বাদরায়ণ পূর্ব্বোক্ত সমাধান প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের মতে সৃষ্টি সত্য নহে। সুতরাং তাঁহার নিজমতে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের অবকাশই নাই। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেও সকলে ঐ কথায় সন্তুষ্ট হইবেন কি না, ইহা অবশ্য বিচার্য্য। পরন্তু অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায় যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত মায়াবাদ স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের মতে সৃষ্টি সত্য, সুতরাং, সৃষ্টির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন অবশ্যই হইবে এবং উহার উত্তরও বলিতে হইবে। তাই সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় আস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন ও উহার উত্তরের জন্য নানারূপ বিচার হইয়াছে।

ঈশ্বর কিসের জন্য সৃষ্টি করেন? তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোন দুঃখ নাই, সুতরাং তাঁহার হেয় ও উপাদেয় কিছু না থাকায় সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না,—এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া বৌদ্ধযুগের প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিক" গ্রন্থে প্রথমে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর ক্রীড়ার জন্য জগতের সৃষ্টি করেন, ইহা এক সম্প্রদায় বলেন এবং ঈশ্বর বিভূতিখ্যাপনের জন্য জগতের সৃষ্টি করেন, ইহা অপর সম্প্রদায় বলেন। কিন্তু ঐ উভয় মতই যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, যাঁহারা ক্রীড়া ব্যতীত আনন্দলাভ করেন না, তাঁহারাই ক্রীড়ার জন্য আনন্দভোগ করিতে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের দুঃখ জন্মে, তাঁহারাই সুখভোগের জন্য ক্রীড়া করেন। কিন্তু পরমেশ্বরের কোন দুঃখ না থাকায় তিনি সুখভোগের জন্য ক্রীড়া করিতে পারেন না। তিনি তাঁহার বিভূতিখ্যাপনের জন্যই জগৎসৃষ্টি করেন, ইহাও বলা যায় না। কারণ, বিভূতিখ্যাপন না করিলেও তাঁহার কোন অপকর্ষ বা ন্যূনতা হয় না। সুতরাং তিনি বিভূতিখ্যাপনের জন্য কেন প্রবৃত্ত হইবেন? তিনি আপ্তকাম, তাঁহার পক্ষে বিভূতিখ্যাপনও প্রয়োজন হইতে পারে না। তবে পরমেশ্বর সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন কেন? এতদুত্তরে উদ্যোতকর তাঁহার নিজ মত বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের ঐ প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাব। যেমন ধারণাদি ক্রিয়া ভূমি প্রভৃতির স্বভাব বলিয়াই ভূমি প্রভৃতি ধারণা ক্রিয়া করে, তদ্রূপ, পরমেশ্বরও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ঐ প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাব,—স্বভাবের উপরে কোন অনুযোগ করা যায় না। ফলকথা, প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্যোতকরের মতেও পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কোন প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, সৃষ্টিপ্রবৃত্তি পরমেশ্বরের স্বভাব হইলে কখনই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং চিরকালই সৃষ্টি হইবে। ক্রমিক সৃষ্টিরও উপপত্তি হয় না। কারণ, প্রবৃত্তি-স্বভাবসম্পন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সতত একরূপই আছেন। সুতরাং সততই একরূপ সৃষ্টি হইবে। একরূপ কারণ হইতে কার্য্যভেদ হইতে পারে না। এতদুত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির ন্যায় প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন জড় পদার্থ নহেন। তিনি প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন হইলেও চেতন পদার্থ, সুতরাং তিনি তাঁহার কার্য্যে অন্যান্য কারণকে অপেক্ষা করায় সতত প্রবৃত্ত হন না। সৃষ্টিকার্য্যে সমস্ত জীবের অদৃষ্টসমষ্টি ও উহার ফলভোগকাল প্রভৃতি অনেক কারণই অপেক্ষিত,

সুতরাং ঐ সমস্ত কারণ যুগপৎ সম্ভব না হওয়ায় যুগপৎ সকল কার্য্য জন্মিতে পারে না।

উদ্যোতকরের পরবর্ত্তী মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও "ন্যায়-মঞ্জরী" গ্রন্থে প্রথম কল্পে বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের স্বভাবই এই যে, তিনি কোন সময়ে বিশ্বের সৃষ্টি করেন, কোন সময়ে বিশ্বের সংহার করেন। কালবিশেষে উদয় ও কালবিশেষে অস্তগমন যেমন সূর্য্যদেবের স্বভাব, এবং উহা জীবগণের কর্ম্মাপেক্ষ, তদ্রূপ কালবিশেষে বিশ্বের সৃষ্টি ও কালবিশেষে বিশ্বের সংহার করাও পরমেশ্বরের স্বভাব, এবং তাঁহার ঐ স্বভাবও জীবগণের কর্ম্মাপেক্ষ। সুতরাং তাঁহার ঐ স্বভাব কেন—এইরূপ প্রশ্নও নিরুত্তর নহে। মূল কথা, পূর্ব্বোক্ত মতে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির কোন প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন ব্যতীতও সৃষ্টি হইতে পারে। ক্রিয়া মাত্রই সপ্রয়োজন নহে। প্রয়োজন ও কারণ সর্ব্বত্র একই পদার্থ নহে। বিচার্য্য বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রথম মতই প্রাচীন মত বলিয়া বুঝা যায়।

ভারতের দার্শনিক-চূড়ামণি শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার "ভামতী" টীকায়—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রথম মত সমর্থন করিলেও "ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য-টীকা" গ্রন্থে দ্বিতীয় মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে "ন্যায়বার্ত্তিক"কার উদ্যোতকরের মতের কোন সমালোচনা করেন নাই। ইহার গূঢ় কারণ এই যে, তিনি সেখানে ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের মতে জগতে নিষ্প্রয়োজন কোন কার্য্য বা ক্রিয়া নাই। তিনি ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে "বিতণ্ডার"ও প্রয়োজন আছে বলিয়া উহা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে পরমেশ্বরের জগৎসৃষ্টিরও প্রয়োজন আছে। জীবগণের প্রতি অনুগ্রহই সেই প্রয়োজন। পরমেশ্বর জীবের প্রতি করুণাবশতঃই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার মত বুঝা যায়। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও বাৎস্যায়নের কথার দ্বারা তাঁহার ঐ মতই সমর্থন করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্যকার সুপ্রাচীন প্রশস্তপাদও "সৃষ্টিসংহারবিধি"র বর্ণন করিতে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় মতই প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে, সংসারে নানা স্থানে পুনঃ পুনঃ নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়া নানাবিধ দুঃখ প্রাপ্ত সর্ব্বজীবের রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য সকল ভুবনপতি মহেশ্বরের সংহারেচ্ছা জন্মে এবং পরে পুনর্ব্বার সর্ব্ব জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলনির্ব্বাহের জন্য মহেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মে। প্রশস্তপাদ ভাষ্যের "ন্যায়কন্দলী" টীকায় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর বাঙ্গালী দার্শনিক-শিরোমণি শ্রীধর ভট্ট প্রশস্তপাদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকিলেও তিনি পরার্থেই সৃষ্টি করেন। কারণ, তিনি জীবগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগনির্ব্বাহের জন্যই পুনঃ সৃষ্টি করেন। তিনি করুণাবশতঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও কেবল সুখময়ী সৃষ্টি করিতে পারেন না। কারণ, তিনি জীবগণের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টানুসারেই সৃষ্টি করেন। তিনি জীবগণের অধর্ম্মরূপ দুরদৃষ্টবশতঃ দুঃখ প্রদান করিলেও তাঁহার করুণাময়ত্বেরও হানি হয় না। পরন্তু তাহাতে তাঁহার জীবগণের প্রতি করুণাই বুঝা যায়। কারণ, দুঃখভোগ ব্যতীত জীবের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না। সংসারের দুঃখময়ত্ব বোধ সুদৃঢ় হইলেই অধিকারিবিশেষের বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। সুতরাং পরমেশ্বরের দুঃখময় বিশ্ব-সৃষ্টি অধিকারিবিশেষের বৈরাগ্যের উৎপাদন করিয়া মোক্ষলাভের সহায় হওয়ায় উহা তাঁহার জীবের প্রতি করুণারই পরিচায়ক বলা যায়। কথা—শ্রীধর ভট্টও নিজে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় মতই সমর্থন করিয়াছেন; সুতরাং বৈশেষিক সম্প্রদায়ের যে উহাই মত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও "ন্যায়-মঞ্জরী" গ্রন্থে শেষে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় মতই গ্রহণ করিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ অনাদিকাল হইতেই সমস্ত জীব অনাদি কর্ম্মফল—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বশতঃ পুনঃ পুনঃ বিচিত্র শরীর পরিগ্রহ করিয়া বিচিত্র সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। অনাদি পরমেশ্বরও অনাদিকাল হইতেই জীবগণের অনাদি কর্ম্মফল ভোগ-নির্ব্বাহের জন্য বিচিত্র সৃষ্টি করিতেছেন। পরমেশ্বর অনাদি এবং সমস্ত জীবও তাহাদিগের সংসার ও কর্ম্মফল—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—সবই অনাদি। জীবের ধর্ম্মের ফল সুখ এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ। পরমেশ্বর করুণাময় হইলেও জীবগণের অধর্ম্মের ফল দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত পূর্ব্বোক্ত উভয় মতেই স্বীকৃত হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রবাহ বা জীবের সংসার অনাদি এই সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিলে দার্শনিক কোন

সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩৪শ ও ৩৬শ সূত্রেও ঐ সিদ্ধান্ত কথিত ও সমর্থিত হইয়াছে। জীবগণ অনাদিকাল হইতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়া—ধর্ম্মজন্য সুখভোগের ন্যায় অধর্ম্মজন্য নানাবিধ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতেছে। সুদীর্ঘকাল হইতে সংসারে নানাবিধ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে কোন জন্মে পূর্ব্বকৃত শুভকর্ম্মজন্য বিশিষ্টশরীর লাভ করিলে তখন সেই জীবের সংসারের দুঃখময়ত্ব সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার বৈরাগ্যের কারণ হয়। সংসার দুঃখময় এই সংস্কার সুদৃঢ় না হইলে কাহারও বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না। সুদীর্ঘকাল হইতে নানাবিধ দুঃসহ দুঃখভোগ ব্যতীতও ঐ সংস্কার সুদৃঢ় হয় না। সুতরাং অনাদিকাল হইতে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর বিশ্বসৃষ্টির দ্বারা জীবের নানাবিধ দুঃখভোগ সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ উৎকট বৈরাগ্য উৎপাদন করতঃ সময়ে জীবকে কৃপা করেন—ইহা বলা যায়। তাহা হইলে করুণাময় পরমেশ্বর, সময়ে জীবগণের বৈরাগ্য সম্পাদন করিয়া মোক্ষলাভে অধিকার জন্মাইবার জন্য জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, ইহাও অবশ্য বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে পরমেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির প্রয়োজন আছে। জীবগণের প্রতি অনুগ্রহই সেই প্রয়োজন, এই দ্বিতীয় মতই সিদ্ধ হয়। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ ও শ্রীধর ভট্টেরও যে উহাই মত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যোগদর্শনের সমাধিপাদের ২৫শ সূত্রের ব্যাসভাষ্যেও ঐ মতেরই আভাস পাওয়া যায়। সেখানে ভাষ্যকার ব্যাসদেব লিখিয়াছেন—

"তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্।
জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্প-প্রলয়-মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ
পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি"।

অবশ্য উক্ত সন্দর্ভে পরমেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির প্রয়োজন কথিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ভাষ্যকার ব্যাসদেবের মতে পরমেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টিতেও যে ভূতানুগ্রহই প্রয়োজন, ইহাও তাঁহার উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে।

বেদান্তসূত্রেরও ঐক্য মতানুসারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—ইহাও আমার মনে হয়। যদিও ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ব্যাখ্যায় বিপরীত মতাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির মনঃকল্পিত সেই অভিনব ব্যাখ্যা কোনরূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না, ইহা আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, তথাপি স্বাধীনচিন্তাপ্রিয় সুধী পাঠকগণের বিচারের জন্য আমি এখানে সেই ব্যাখ্যাও প্রকাশ করা কোন দোষ মনে করি না। তাই সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিতেছি—

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে যথাক্রমে নিম্নলিখিত ৩টি সূত্র আছে—

"ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ"। ৩২।
"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। ৩৩।
বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি"।৩৪।

প্রথম সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যার জন্যই ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "প্রবৃত্তীনাং" এই পদের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তীনাং"। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের ন্যায় প্রথম সূত্রেও "ঈশ্বরস্য" এই পদেরই অধ্যাহার করিলে "ঈশ্বরস্য প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" এইরূপ বাক্যই সূত্রকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাহা হইলে প্রথম সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ইহাই বুঝা যায় যে, যেহেতু ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টিকার্য্যে "প্রয়োজনবত্ত্ব" অর্থাৎ প্রশস্ত প্রয়োজন আছে, অতএব, তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে কোনরূপ প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, ইহা বলা যায় না। স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে পরার্থই প্রশস্ত প্রয়োজন। তাই ঐ সূত্রে "প্রয়োজনবত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সেই প্রশস্ত প্রয়োজনই প্রকটিত হইয়াছে। "প্রয়োজন" শব্দের পরে প্রাশস্ত্য অর্থে "মতুপ্" প্রত্যয় করিলে "প্রয়োজনবত্ত্ব" শব্দের দ্বারা প্রশস্ত প্রয়োজন বুঝা যায়। ভূতানুগ্রহই সেই প্রশস্ত প্রয়োজন। ঐ প্রশস্ত প্রয়োজন বুঝাইবার জন্যই "প্রয়োজনবত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগ করিলে ঐ প্রয়োগও সার্থক হইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত প্রথম সূত্রটিও সিদ্ধান্তসূত্র হইলে বেদান্তসূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র না বলিয়াই সিদ্ধান্ত সূত্র বলিয়াছেন, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহা ত সম্ভব ও উচিত নহে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ন্যায়দর্শনের ন্যায় বেদান্তদর্শনেও কোন কোন স্থলে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র না বলিয়াও সিদ্ধান্তসূত্র বলা হইয়াছে। সেই

সিদ্ধান্তসূত্রের দ্বারাই সেখানে সূত্রকারের বুদ্ধির পূর্ব্বপক্ষের জ্ঞান জন্মে। যথা "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) ইত্যাদি।

প্রথম সূত্রোক্ত সিদ্ধান্তে আপত্তি হইতে পারে যে, পরমেশ্বর পরার্থেই বিশ্বসৃষ্টি করিলে তাঁহার উহাতে কিছু স্বার্থও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, কিছু মাত্র স্বার্থ ব্যতীত পরার্থেও কাহারও কোন প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু পরমেশ্বরের নিজের যে কোন স্বার্থ আছে, ইহা ত স্বীকার করা যাইবে না। এই জন্যই মহর্ষি বাদরায়ণ আবার দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। অর্থাৎ লোকে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ ব্যতীতও পরার্থে প্রবৃত্তি দেখা যায়। পরন্তু পরমেশ্বরের সম্বন্ধে এই বিশ্বসৃষ্টি কেবল লীলামাত্র, অর্থাৎ তিনি অনায়াসে কিছুমাত্র পরিশ্রম ব্যতীত এই সৃষ্টি করেন। যে কার্য্যে কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় না, তাহা স্বার্থ ব্যতীতও পরার্থে অনেকে করিয়া থাকেন। সুতরাং পরমেশ্বরের ত কিছু মাত্র স্বার্থ না থাকিলেও পরার্থে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতে পারে।

ইহাতেও আপত্তি হয় যে, পরমেশ্বর পরার্থেই বিশ্বসৃষ্টি করিলে বিষমসৃষ্টিজন্য তাঁহার "বৈষম্য" বা পক্ষপাত দোষ স্বীকার করিতে হয় এবং পরার্থেই বিশ্বসংহার করিলে তাঁহার "নৈর্ঘৃণ্য" বা নির্দ্দয়তা দোষ স্বীকার করিতে হয়। এজন্য আবার তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—

"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।"

অর্থাৎ সৃষ্টিসংহারকার্য্যে পরমেশ্বরের পক্ষপাত ও নির্দ্দয়তা দোষ নাই। কারণ, উহাতে তিনি সর্ব্বজীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল যে ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহারই সাপেক্ষ হয়েন। জীবের কর্ম্মফলানুসারেই তিনি বিষম সৃষ্টি ও সংহার করেন। ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ও "ভামতী" টীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র দৃষ্টান্তাদির দ্বারা উক্ত যুক্তি বিশদ করিয়া সমর্থন করিয়াছেন। বিশেষজিজ্ঞাসু তাহা দেখিবেন।

ফল কথা পূর্ব্বোক্ত "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" এই প্রথম সূত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের ন্যায় "ঈশ্বরস্য" এই পদেরই অধ্যাহার সূত্রকারের অভিপ্রেত। ইহাই যদি সম্ভব ও সুসঙ্গত হয় তাহা হইলে ঐ সূত্রের দ্বারা পরমেশ্বর যে, পরার্থেই বিশ্বসৃষ্টি করেন, জীবের প্রতি অনুগ্রহই যে তাঁহার বিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজন—এই মতই সমর্থিত হয়।

তবে উক্ত মতে আপত্তি হয় যে, পরমেশ্বর জীবের প্রতি করুণাবশতঃ বিশ্বসৃষ্টি করিলে তাঁহার দুঃখিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ, করুণাবশতঃ কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তিনি পরের দুঃখে দুঃখানুভব করিয়াই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন—ইহাই সর্ব্বজনসিদ্ধ। কিন্তু পরমেশ্বরের দুঃখিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পরমেশ্বর করুণাময় হইলেও তাঁহার দুঃখের কারণ দুরদৃষ্ট না থাকায় তাঁহার দুঃখ জন্মিতে পারে না। তিনি কারুণিক মানবাদির স্বাভাবিক দুঃখে দুঃখী হইয়া পরার্থে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। কারুণিক হইলেই যে সকলেই পরের দুঃখে দুঃখী হইয়াই কার্য্য করেন, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। সেই অদ্বিতীয় পরম পুরুষের সম্বন্ধে তাহা সম্ভবও নহে। পরন্তু ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হইলে পরমেশ্বরের করুণাময়ত্বও কোন মতেই সম্ভব হয় না। কারণ, তাঁহার দুঃখজনক দুরদৃষ্ট না থাকায় তাঁহার যে পরের দুঃখে বাস্তব দুঃখানুভবের সম্ভাবনা নাই, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু তিনি যে করুণাময় ইহা উক্ত উভয় মতেরই স্বীকৃত সত্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৭।৫ শ্লোকে শ্রীভগবানের অবতারের যে প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী "ভাগবৎসন্দর্ভে" শ্রীভগবানের করুণা গুণের বিশেষরূপ সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু পরমেশ্বর অবতীর্ণ হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত কর্ম্ম করেন, সে সমস্তও ত তাঁহার লীলা; কিন্তু সে সমস্ত কর্ম্ম ত পূর্ব্বোক্ত উভয় মতেই নিষ্প্রয়োজন নহে। শ্রীভগবানের লীলা বলিয়া ঐ সমস্ত কর্ম্মের নিষ্প্রয়োজনত্ব ত কেহই সমর্থন করেন না। পরন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যম্" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবানের ঐ সমস্ত কর্ম্মের প্রয়োজনই সমর্থিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরের কোন কর্ম্মেই তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু জীবের মঙ্গলই তাঁহার কর্ম্মের প্রয়োজন। শ্রীজীবগোস্বামীও "ভাগবৎসন্দর্ভে" শেষে মাধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত "পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ" এই বচনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের প্রয়োজনান্তরবুদ্ধি নাই। অর্থাৎ জীবের মঙ্গল ভিন্ন নিজের কোনরূপ প্রয়োজনবোধ তাঁহার নাই। কারণ, তিনি পূর্ণানন্দ। তাঁহার কোন দুঃখই নাই, কিছুরই অভাব নাই। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা" এই বচনের দ্বারাও

ঐ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়। অর্থাৎ তাঁহার নিজের কোন অভাব না থাকায় নিজের কোন বিষয়ে স্পৃহা নাই—ইহাই তাৎপর্য্য। এই জন্যই উক্ত বচনে "আপ্তকাম" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বরের পরার্থেও কোন স্পৃহা নাই, ইহা উক্ত বচনের তাৎপর্য্য নহে। কারণ, পরমেশ্বরের নিত্য সিদ্ধ করুণাই ত তাঁহার পরার্থে স্পৃহা, তাহা ত অস্বীকার করা যাইবে না। পরদুঃখনিবারণের স্পৃহাকেই করুণা বলে। করুণাময় শ্রীভগবানের সেই করুণার যে অবধি নাই। সুতরাং পরমেশ্বরের অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টিক্রিয়ারও অবশ্য প্রয়োজন আছে—ইহা বলা যায়। অর্থাৎ তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ না থাকায় তিনি পরার্থেই অর্থাৎ জীবের উদ্ধারের জন্যই বিশ্বসৃষ্টি করেন, এই সিদ্ধান্তও শাস্ত্র ও যুক্তি-সম্মত হইতে পারে। পরমেশ্বর জীবের প্রতি করুণাবশতঃই বিশ্বসৃষ্টি করিলে তিনি কেবল সুখময়ী সৃষ্টিই করিতেন, তিনি জগতে দুঃখের সৃষ্টি করিতেন না—এই আপত্তিও করা যায় না। কারণ, পরমেশ্বর সমস্ত জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ ও সর্ব্ব কর্ম্মের ফল-দাতা; সুতরাং তিনি সর্ব্বজীবের অনাদিকালসঞ্চিত অধর্ম্ম-সমূহের ফল দুঃখসমূহও প্রদান করিবেন। নচেৎ তাঁহার ঈশ্বরত্ব বা প্রভুত্ব সম্ভব হইতে পারে না। রাজা যদি দণ্ডনীয় প্রজাগণের কখনই কিছুমাত্র দণ্ড বিধান না করিয়া কেবল তাহাদিগকে চিরদিন সুখই প্রদান করেন, তাহা হইলে যেমন তাঁহাকে প্রভু বলা যায় না, তাঁহার রাজ্যরক্ষাও হয় না, তদ্রূপ, জগৎপতি পরমেশ্বরও জীবগণের অধর্ম্মের ফল দুঃখপ্রদান না করিলে তাঁহাকে প্রভু বলা যায় না। সুতরাং তাঁহাকে ঈশ্বরই বলা যায় না।

পরন্তু জগতে দুঃখের অস্তিত্বই না থাকিলে জীবগণের সুখের অনুভূতি কিরূপে হইতে পারে—ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক। জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই দুঃখের এত অন্বেষণ, এত আকাঙ্ক্ষা, এত সমাদর, ইহা প্রকৃত কথা নয় কি? পরন্তু দুঃখভোগ ব্যতীত সুখভোগও অসম্ভব। বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর জগতে দুঃখের সৃষ্টি না করিয়া কিরূপে কেবল সুখের সৃষ্টি করিবেন, ইহাও ত চিন্তা করিয়া বুঝা আবশ্যক। জীবের নিজকৃত কর্ম্মানুসারেই তাঁহার সুখভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মের বৈচিত্র্যবশতঃ সুখেরও বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। সকল জীবই চিরদিন সর্ব্বপ্রকার সমান সুখভোগ করিতে পারে না। সকল সময়ে সকল জীবেরই সর্ব্বপ্রকার সুখের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, হইতেই পারে না। সুতরাং জীবের কেবল সুখভোগেই বা শান্তি কোথায়? অনিত্য সুখে বৈরাগ্য ব্যতীত কাহারই শান্তির আশা নাই—ইহা তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং সর্ব্বশক্তিদাতা শ্রীভগবান্ জীবের ঐ সুখে বৈরাগ্যসম্পাদনের জন্য দুঃখেরও সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহাও বুঝিতে হইবে। দুঃসহ দুঃখভোগ ব্যতীত কে কবে ব্যাকুল হইয়া শ্রীভগবান্‌কে ডাকিয়াছে, কে কবে তাঁহার কৃপালাভের অধিকারী হইয়াছে? দুঃখই জীবের চিরশান্তির মূল সাধন। দুঃখের অসহ্য তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়াই মানব শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। তখনই তাহার গর্ব্ব-পর্ব্বতের সমুচ্চ চূড়া বিচূর্ণ হইয়া খসিয়া পড়ে। তখনই করুণাময় শ্রীভগবান্ করুণার সুশীতল কোমল অঞ্চল দিয়া তাহার নয়নবারি মুছাইয়া তাহাকে চিরশান্তি প্রদান করেন। তাই বলিয়াছি—দুঃখই জীবের চিরশান্তির মূল সাধন। তাই প্রকৃত ভক্তগণ কখনই দুঃখকে ভয় করেন না। পরন্তু দুঃখের প্রার্থনাই করিয়া থাকেন। প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে "বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ" বলিয়া পুনর্ব্বার সেই সমস্ত বিপদেরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি পুনর্ব্বার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের জন্যই পূর্ব্ববৎ সেই সমস্ত বিপদেরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি দুঃখকে কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। ভক্তচূড়ামণি মহাকবি রাম-প্রসাদও গাইয়াছিলেন—

> ওমা আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
> সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
> আমি করি দুঃখের বড়াই॥

ভক্ত অধিকারিগণ ইহা অবশ্যই বুঝিবেন। ভক্তিহীন অনধিকারী আমি ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদের ঐ দুঃখের কথা কিরূপে বুঝিব, তাই বুঝাইতে পারিলাম না।

মনের পরশ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

২৮

পল্লব মসিয়ে • জঁা রিশারের (Monsieur Jean Richard) বাড়ীতে উঠে এল। মসিয়ে রিশার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। ইংরাজীতে তাঁর বেশ দখল ছিল, তবে তাঁর উচ্চারণে ফরাসী কোঁকটি প্রবলভাবে পাওয়া যেত। খাটো মানুষটি, রসিক, বহুভাষী ও প্রফুল্ল প্রকৃতি—যেমন সচরাচর ফরাসীরা হ'য়ে থাকে। তবে পল্লব ফরাসীদের সঙ্গে আগে কখনও মেশেনি ব'লে তার চোখে মসিয়ে রিশারের হাসিখুসি ভাবটা যেন একটু বাড়াবাড়ি ঠেকত। তবে সে এই বলে নিজেকে বোঝাত যে ফরাসী জাতি মরতে বসলেও না হেসে থাকতে পারে না। এই রকম ধরণের একটা কথা সে একজন বড় সাহিত্যিকের লেখায় প'ড়েছিল।...

মসিয়ে রিশারের সঙ্গে অল্প স্বল্প আলাপ হ'তে না হ'তেই পল্লব দেখ্‌ল যে তিনি ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ। সে একদিন কেম্ব্রিজে একজন হাঙ্গেরিয়ান ছাত্রের কাছে শুনেছিল যে জগতে ফরাসী জাতি যে সব-চেয়ে সভ্য জাতি তার প্রমাণ এই যে তাদের জনসাধারণও যেভাবে নিজেদের সাহিত্যের খবর রাখে সে ভাবে অন্যদেশের জনসাধারণ রাখে না। পল্লব অন্ততঃ মসিয়ে রিশারের মতন একজন সাধারণ অধ্যাপকের ক্ষেত্রে এ কথার সমর্থনই পেয়ে খুসি হ'য়ে উঠ্‌ল। কারণ সে মসিয়ে রিশারের কাছে ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যই সংগ্রহ করত।

বাড়ীর গৃহিণী মাদাম রিশারকেও পল্লবের বেশ লাগ্‌ল। তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না, ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে মসিয়ে রিশারের মতন অন্তর্দৃষ্টিও তাঁর ছিল না;—তবু 'কাল্‌চার' যেন তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ একত্রিশ, কিন্তু তাঁকে দেখ্‌লে পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি কিছুতেই মনে হ'ত না—এমনিই সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাবে তিনি বেশভূষা করতেন। পল্লব নানাস্থলে নানপ্রসঙ্গে শুনেছিল যে শুধু ফ্যাশনে নয় সকল সুরুচির সঙ্গে সৌন্দর্য্য-বিধায়ক বেশভূষার সমন্বয়েও ফরাসী রমণী অদ্বিতীয়। এখানে এসে সে প্রথম তার এ শোনা-কথাটির চাক্ষুষ সমর্থন পেল। তার মনে হ'ত যে মিসেস নর্টন, মিসেস টমাস, মিস স্মিথ প্রভৃতি সকলে সুষ্ঠু বেশভূষার আঁটসাঁট সম্বন্ধে মাদাম রিশারের কাছে এখনও অনেকদিন শিক্ষানবিশি করতে পারেন। সময়ে সময়ে মাদাম রিশারের

• ফরাসী ভাষায় 'মসিয়ে' বলা হয় পুরুষকে 'মাদাম' বলা হয় মহিলাকে।

সামান্য একটি বনেট পরার ধরণ, বা বসনসম্বরের মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব্ব সরল সুষমা ফুট করে তোলার আর্টটি দেখে পল্লব মুগ্ধ না হ'য়েই পারত না। বা দৃশ্যতঃ নিতান্ত সাধারণ তার মধ্যে দিয়েও যে নারী নিজের লাবণ্য সংহত ক'রে প্রকাশ করতে পারে এ সত্যটি সম্বন্ধে যেন মানান রিশার তার অন্যমনস্ক চিত্তের চোখও ফুটিয়ে দিয়েছিলেন।

কেবল মাদাম রিশারের ব্লেণ্ডভূষার একটা প্রখরতা তার প্রথম দুচারদিন একটু খারাপ লেগেছিল। সেটা হচ্ছে তাঁর নানাছলে নিজ দেহলাবণ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা, যেটা য়ুরোপীয় মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। যথা,—টিলাঢালা জাকেট ব্লাউসের মধ্যদিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আভাষ ও ইঙ্গিত একটু বেশি-রকম ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা; সান্ধ্যসজ্জাতে শরীরের নানা অংশ অনাবৃত রাখার ফ্যাশন, চলা-ফেরার নানা ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে অঙ্গসৌষ্ঠবের ও গতিছন্দের লাবণ্য বিকীরণ করবার প্রতি সতর্কতা প্রভৃতি। তার বিলেতে এসে অবধি মনে হ'ত যে য়ুরোপীয় মেয়েরা ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় বড় লজ্জাহীনা ও প্রগল্‌ভা; আর বেণ্ডভূষার ধরণ পার্থক্যেই যেন এই বৈষম্যটা তার কাছে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ত।

কিন্তু দুতিন সপ্তাহের মধ্যে—যখন পল্লবের মাদাম রিশারকে সত্যিই ভাল লেগে গেল তখন—এ সবের দৃষ্টি-কটুতা তার চোখে আর তেমন ভাবে ঠেকত না। তখন তার মনে হ'ত যে মিস শ্রিথের ক্ষেত্রেও হয়ত ঠেকত না যদি তাঁকে তার মাদাম রিশারের মতন ভাল লেগে যেত। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রথম মনে হ'তে লাগল যে কারুর ধরণ-ধারণ আমাদের ভাল-লাগা-না-লাগাটা যে কি আশ্চর্য্য রকমের পরিবর্ত্তনশীল তা সে আগে কখনও এমন ভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পায় নি। কারণ মাদাম রিশারের সঙ্গে পরিচয়ের দশপনর দিনের মধ্যেই সে বেশ স্পষ্ট অনুভব করল যে বেণ্ডভূষার আত্যন্তিক ভদ্রতা সম্বন্ধে তার কঠোর ধারণার অনেকখানিই বদলে গেছে।...তার মনে হল যে অনেক জিনিষই অপরিচিত বা উদাসীনের মধ্যে বিসদৃশ ঠেকে যা দুদিনে প্রিয়জনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মনে হতে পারে।

এটা আরও তাড়াতাড়ি হ'ল মাদাম রিশারের কমনীয় ব্যবহারে। তিনি প্রথম সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই যেন তার সঙ্গে এমন স্বাভাবিক ও সহজ ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন যে পল্লবের মনেই হ'ত না যে তাঁর সঙ্গে তার আলাপ দুদিনের মাত্র। মিসেস নর্টন তাঁর একান্ত সাদর ও নিখুঁত আতিথ্যের পরেও এত অল্প সময়ের মধ্যে তাকে আপনার ক'রে নিতে পারেন নি। পল্লব ভাবত যোগহয় মাদাম রিশারের ফরাসী প্রকৃতিই এজন্য বিশেষ রূপে দায়ী।... ইংরাজ রমণী হ'লে হয়ত মাদাম রিশার কোনমতেই এত সহজে ও অল্প সময়ে তার মতন বিদেশীকে বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় গ্রহণ করতে পারতেন না।

মাদাম রিশারের সব ব্যবহারেই একটা অনাড়ম্বর দান-শীলতার ছন্দ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠত—যে দান নেবার ভিতর দিয়েই রমণীচরিত্র সব-চেয়ে বেশি সার্থক হয়ে উঠে থাকে। পল্লবের বাটের বোতাম সেলাই করা, তার জন্য নানারকম 'টাই' বুনে দেওয়া, তার বই-টই স্বহস্তে গুছিয়ে রাখা থেকে আরম্ভ ক'রে আহারের টেবিলে খুঁটিনাটি পরিবেষণ পর্য্যন্ত সব কর্ম্মই মাদাম রিশার এমন একটা সহজ অথচ সাগ্রহ সদয়তার সঙ্গে সম্পন্ন ক'রে দিতেন যে পল্লবের মনটা কুণ্ঠিত হবারও যেন সুযোগ পেত না। সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়টি তাঁর প্রতি এক মনোজ্ঞ কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে ভরে উঠ্‌ত। তবে সে নিজেকে সব-চেয়ে ধন্য মনে করত—মাদাম রিশারের তার সঙ্গে ফরাসী কথাবার্ত্তা কওয়ার অক্লান্ত ধৈর্য্যের জন্যে। কারণ তার তদানীন্তন ফরাসী বুৎপত্তি মোটেই চমকপ্রদ ছিল না বলে প্রথম প্রথম মাদাম রিশার তাকে অনেক সময়ে একই কথা দুতিনবার না বললে সে বুঝতে পারত না। এজন্য তাকে মনে মনে খুবই লজ্জিত বোধ করতে হত যদি না মাদাম রিশারের ক্লান্তিহীন ধীরে-ধীরে কথাবলার প্রযত্নের মধ্যে এমন একটা সাগ্রহ সাহায্যতৎপরতার ভাব ফুটে উঠত, যা মুহূর্ত্তে অস্বস্তির পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞ আরামই বহন ক'রে এনে দেয়।

মাদাম রিশারের তৃপ্তিকর সাহচর্য্যের জন্যেও তাঁর এ সাহায্য পল্লবের ফরাসী ভাষা শিক্ষার আশাতীত রকমের সহায়তা ক'রেছিল। কারণ সে অনেকটা তাঁর সঙ্গে আরও সহজ ভাবে কথা কইবার লোভে প'ড়েই ফরাসীভাষাটা আয়ত্ত করবার জন্য বেশি সচেষ্ট হয়ে পড়ল। সে ফরাসী ভাষার নানান্ নতুন নতুন কথা ও ইডিয়ম মনে রাখ্‌তে

সোৎসাহে লেগে গেল ও ফরাসী নাটকাদির কথাবার্ত্তার ধরণধারণ লক্ষ্য করতে আরম্ভ করল।

ফলে ছ'তিন সপ্তাহের মধ্যেই সে বেশ খানিকটা উন্নতি করল ও সে দেখল যে, চল্‌তি ধরণের কথাবার্ত্তা কইবার সঙ্কোচ তার প্রায় উবে গেছে বল্‌লেই হয়। মাদাম রিশার তার আগ্রহ দেখেই হোক্ বা তার প্রতি মমতা বশতঃই হোক্ সে ভুল ভাষা বল্‌লে অতি সযত্নে তার ভুলগুলি সংশোধন ক'রে তাকে ব'লে ব'লে দিতেন।

কেবল তাঁর ছয় বৎসরের মেয়ে ইভেত এ-সব ভাষার ভুল-চুকে প্রথম প্রথম ভারি হাস্‌ত। মাদাম রিশার তাকে তাড়া দিলে সে মুখে রুমাল দিয়ে হাসি চাপ্‌তে চাপ্‌তে বেরিয়ে যেত। পল্লব যে এতে প্রথম প্রথম লজ্জিত বোধ না করত তা নয়—কারণ প্রথম যৌবনের অহমিকার সময় মানুষ অপ্রস্তুত হ'লে আঘাত পায়ই পায়, বিশেষতঃ সুন্দরী রমণীর সাম্‌নে—কিন্তু তার শত গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও ইভেতের হাসি সে রোধ করতে পারত না। যাই হোক্ দশবার দিনের মধ্যেই ইভেতের সঙ্গেও তার বেশ ভাব হ'য়ে গেল, যার ফলে তার ভুল ভাষা শুনে সে আর আগেকার মতন হাস্‌ত না। শিশু কিসে না সহজে অভ্যস্ত হ'য়ে যেতে পারে?... মহা খুসি হ'য়ে পল্লবও ইভেতের সঙ্গে বেশি সৎসাহসের সহিত তার ভাঙা ফরাসী চালাতে লাগ্‌ল বেটা প্রথমে তার অসাধ্য মনে হ'ত—ইভেতের হাসিকে সে এতই ভয় করত। শুধু তাই নয়—ইভেতের সাহচর্য্য শেষটা তার ভাষা শিক্ষারও একটা মস্ত সহায়ক হ'য়ে দাঁড়াল। সেটা বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে বালিকার মুখের ফরাসী ভাষা তার কাছে এত মিষ্ট লাগ্‌ত যে সে অনেক সময় ফরাসী বই পড়া ছেড়ে তার সঙ্গে ভাঙা ফরাসীতে গল্প করতে আস্‌ত। স্নেহশীলা ইভেতও দুদিনে তার এ মেশ্‌বার আগ্রহে সাড়া দিয়ে বল্‌ল, কেন না বালিকা দেখ্‌ল যে পল্লবের মতন ধৈর্য্যশীল শ্রোতা বেশী আর যার ভাগ্যেই সম্ভব হোক্ না কেন, তার ভাগ্যে যে বড় মিল্‌বে না সেটা সুনিশ্চিত। এবং কোন্ নারী—তা সে বর্ষীয়সীই হোক বা বালিকাই হোক্—রসনা সঞ্চালনের অবাধ সুযোগে আনন্দে ভরপুর হ'য়ে না ওঠে? ইভেতও তার বাগ্মিতা জাহির করার এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে তার সঞ্চয়রত বক্তব্যের ঝুড়ি পল্লবের কাছে উজাড় ক'রে দিতে উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তার অনর্গল কলকণ্ঠের গল্পের অনেক কথাই অবশ্য পল্লব ধরতে পারত না। কিন্তু তাতে বাক্যালাপের বিশেষ কোনও অঙ্গহানি হ'ত না। কারণ তার মস্ত সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল এই যে বালিকা তাকে প্রশ্ন বড় একটা করত না বা করলেও নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আবার বক্‌তে সুরু করে দিত; কাজেই একদিকে যেমন পল্লবের গল্পালাপের সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল অপরদিকে তেম্‌নি ইভেতও আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে আপন মনেই নিজের হৃদয়ের নানান্ রঙীন স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষার ডালি উজাড় ক'রে অক্লান্ত ভাবে দিনের-পর-দিন একতরফা কথাবার্ত্তা চালিয়ে যেত। যদিও এ কথা-বার্ত্তার ফলে পল্লবের সম্বন্ধে ইভেতের জ্ঞান একতিলও বাড়্‌ত না, কিন্তু সেজন্য ইভেতের কোনও মাথাব্যথাই ছিল না। কারণ একমাত্র শিশু সম্প্রদায়ের কাছেই বোধ হয় ভাবার ব্যবধান বন্ধুত্বের অন্তরায় হ'তে পারে না।

মাস খানেকের মধ্যেই পল্লব কথাবার্ত্তা অনেকটা স্বচ্ছন্দ ভাবেই বল্‌তে শিখ্‌ল। বলা বাহুল্য যে এরজন্য সে মনের মধ্যে বিলক্ষণ গৌরবমিশ্রিত তৃপ্তির আস্বাদ অনুভব ক'রেছিল। তবে এ সূত্রে তার সব-চেয়ে লাভ হ'য়েছিল কোনটি—ফরাসী ভাষায় কথা বলার শিক্ষা, না তার ধৈর্য্যশীলা গৃহকর্ত্রীর কোমল হৃদয়টিকে পরশ পাওয়া, তা সে অনেক সময়ে ঠাহর ক'রে উঠ্‌তে পারত না। মাদাম রিশার যখন মাঝে মাঝে পল্লবকে ফরাসীসুলভ কম্‌প্লিমেণ্ট দিতেন যে তার মতন এত অল্প সময়ে ফরাসী ভাষা শিখা করতে তিনি কাউকে দেখেন নি, তার মতন ভদ্র বিদেশীও বড় দেখা যায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি—তখন তার মনটি গর্ব্বের গৌরবের চেয়ে এক অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতার রসেই বেশি আপ্লুত হ'য়ে উঠ্‌ত। সে মাদাম রিশারকে বলত যে তার ফরাসী ভাষার যা-কিছু উন্নতি হ'য়েছে সেটা তাঁরই করুণায়। কিন্তু মাদাম রিশার এ প্রশস্তিতে কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌তেন যে তা মোটেই নয়, তিনি কতটুকুই বা করতে পেরেছেন, গৃহকর্ম্মের চাপে পল্লবের দিকে দৃষ্টিই দিতে পারেন নি, অপরের চেষ্টার ফলে কেউ কখনও কিছু শিখ্‌তে পারে না, সব শিক্ষাই মানুষকে নিজেরই অর্জ্জন করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক্ এমনি ক'রেই পল্লব ক্রমশঃ ফরাসী ভাষায় বেশ সহজে কথাবার্ত্তা বল্‌তে শিখ্‌ল। এমন কি মাস দেড়েক বাদে সে একদিন হঠাৎ দেখা করল যে আমাদের

টেবিলে বসিয়ে ও মাদামের কথাবার্ত্তার অধিকাংশ কথাই সে বেশ ধরতে পারছে। এতে সে ভারি তৃপ্তি অনুভব করল। কারণ এই দশ পনর দিন আগেও, তাঁরা যখন নিজেদের মধ্যে দ্রুত কথা বলতেন তখন তাঁদের কথাবার্ত্তার তাৎপর্য্যের অধিকাংশই সে বুঝতে পারত না, যদিও মাদাম বিশার তাকে ধীরে ধীরে কিছু বললে পারত। তার তখন প্রথম মনে হ'ল যে কোনও একটা নতুন ভাষা শেখবার সময়ে কতটা অলক্ষিতে আস্তে আস্তে বিদেশী উচ্চারণের ধরণধারণে অভ্যস্ত হ'য়ে আসতে থাকে, যদিও এ সত্যটা উপলব্ধি করতে সময় লাগে। তাছাড়া সে এই সূত্রে আর একটা কথা বেশি ক'রে উপলব্ধি করল। সেটা এই যে ফরাসী ভাষাটা একটু আয়ত্ত করতে না করতেই তার মনে হ'ল যেন তার কাছে মসিয়ে ও মাদাম বিশারের প্রকৃতির অনেকগুলি সূক্ষ্ম দিক্ বোঝা তাঁরি সহজ হ'য়ে এসেছে। এ আবিষ্কারে সে ভারি একটা আত্ম-প্রসাদ বোধ করল যার স্পর্শে তার মনে হ'ল যে এত কষ্ট করে ফরাসী ভাষা শেখা তার সার্থক।...তার মনে হ'ল যে মিষ্টার টমাস প্রায়ই একটা কথা বলতেন যে একটা ক'রে নতুন বিদেশী ভাষা শেখার মানে হচ্ছে—একটা ক'রে নতুন আত্মা অর্জ্জন করা। "To learn a new language is to acquire a new soul," কথাটা সে তাঁর মুখে এতবার শুনেছিল যে কথাটা তার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল। তবু তার মনে পড়ল যে তখন এ কথাটা তার কাছে কি রকম যেন একটু অতিরঞ্জিত গোছের মনে হ'ত। কিন্তু তার গৌরব-পুলকিত মনটা আজ সর্ব্বপ্রথম এ কথার পূর্ণভাবে সাড়া দিল।... সেদিন রাতে সে আনন্দে ভরপুর হ'য়ে মিষ্টার টমাসকে এক চিঠি লিখল :—

"প্রিয় মিষ্টার টমাস

আপনি যে-একটি কথা বলতেন যে নতুন ভাষা শেখার ফলে, মানুষ নব আত্মা লাভ করে সে কথাটা আজ হঠাৎ আমি বড় প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি ক'রেছি।...এ ফরাসী পরিবারটি সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে অনেক কথাই লিখেছি। কিন্তু আজ একটা কথা আপনাকে বিশেষ ক'রে লিখতে চাই। সেটা এই যে আমার সন্দেহটি বার বার মনে হ'য়েছে যে এদের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে আজ আমি ফরাসী জাতির গুটিকতক বৈশিষ্ট্য যেন অতি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, যেগুলি হাজার তাদের সাহিত্য বা বর্ণনা পড়লেও এমন ভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম না। কারণ আমার মনে হয় যে এদের যে সব চরিত্র-লক্ষণ আজ আমার কাছে একান্ত ভাবে বোধগম্য হ'য়ে উঠেছে সেগুলি আমার কাছে চিরকাল অনেকটা কথার কথাই থেকে যেত যদি এদের ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা এদের মনোজগৎটির অন্ততঃ খানিকটাও উঁকি দিয়ে দেখতে না পেতাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা কথা বার বারই মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব পুলকের খোরাক যোগাচ্ছে। সে কথাটি এই যে কোনও জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হ'লে শুধু বই পড়লে হয় না, তাদের সঙ্গে উপর-উপর মিশলেও হয় না; তাদের ভাষা শিখে অন্ততঃ কিছুদিন তাদের সঙ্গে একত্র থাকা দরকার, যাতে স্নেহ-প্রীতির আলোকে তাদের অন্তর-জগতের খানিকটা পরশও আমরা পেতে পারি। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই আপনাকে।—এই পরিবারটির সঙ্গে বর্ত্তমান স্নেহ-প্রীতির সম্বন্ধের গোড়া-পত্তন হ'তে না হ'তে আমার ফরাসী নারী সম্বন্ধে অনেকগুলি ভুল ধারণার যে-ভাবে নিরাকরণ হ'য়েছে, শুধু উদার যুক্তির আলোকে সেটা ঠিক সেভাবে সম্ভবপর হ'ত ব'লে মনে হয় না। আজকাল আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় আপনার আত্মীয়া মিসেস নর্টনের একটি সুন্দর কথা।—তিনি একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমার সেই বন্ধুটিকে (মিষ্টার ধরের কথা ব'লেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই) বড় সুন্দর বলেছিলেন যে কোনও জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হ'লে আগে সে জাতির অনকয়েকের সঙ্গে যথার্থ প্রীতি-স্নেহের সম্বন্ধ স্থাপন করা দরকার। এটা যে একটা কত বড় গভীর কথা সেটা এ পরিবারটির সঙ্গে আত্মীয়তা ক'রে অবধি আমি যেন আরও উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি ক'রেছি বোধ হয়। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছে হয়।"

দুদিন পরে পল্লু মিষ্টার টমাসের উত্তর পেল :—

"প্রিয় বাকৃচি, তোমার চিঠিতে তোমার নতুন অভিজ্ঞতার কথা প'ড়ে ভারি খুসী হ'লাম। আমাদের জীবনের প্রতি অভিজ্ঞতাই আমাদের চরিত্রকে স্পষ্টতর ভাবে সমৃদ্ধ ক'রে রেখে যেতে পারত যদি আমরা বাল্যকাল হ'তে অভিজ্ঞতাগুলিকে নিয়ে একটু অলসভাবে নাড়াচাড়া

করবার সুযোগ পেতাম। কিন্তু, হায় আমাদের য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্বগ্রাসী কর্মযজ্ঞের ধোঁয়ায় এ আরাম নিঃশ্বাস নেবার কোনও উপায়ই প্রায় থাকে না। পারিপার্শ্বিকের ছোঁয়াচের প্রভাব বড় বেশি ব'লে আমরা আজ মনে প্রাণে একটা বিরাট্ ভুলকে আঁকড়ে ধ'রে ব'সে আছি যে অর্থহীন কর্মিষ্ঠতাই হচ্ছে সময়ের একমাত্র সদ্ব্যবহার। তাই আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি যেন তোমরা আমাদের দেশের কর্মব্যস্ততার ঘূর্ণীতে প'ড়ে তোমাদের মনের সহজ অন্তর্মুখিতাটি খুইয়ে না বস। মনের এ পরম সম্পদটি আজ আমরা অনেক পরিমাণে হারিয়ে ব'সে আছি ব'লেই আমার মনে হয় যে তোমাদের সভ্যতার এ ভাবপ্রবণতার বেশি ক'রে দাম দেওয়া উচিত।..

"এ সূত্রে একটা কথা আজ আবার না ব'লে থাকতে পারছি না, যদিও হয়ত তোমার মনে থাকতে পারে যে এ কথাটি প্রসঙ্গতঃ দু একবার তোমায় ব'লেছিলাম।... কথাটা এই যে বহির্মুখ কর্মযজ্ঞকে বেশি বড় ক'রে দেখার কুফল অনেক সময়ে আপাতঃ-স্পষ্ট না হ'লেও পরিণামে জাতীয় জীবনের মূল ধারণাগুলির উপর যথেষ্ট না ক'লেই পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দেখ না আমাদের খেলা ধূলার ক্ষেত্রে। একটু স্থিরচিত্তে ভাবতে গেলে কি হাসি পায় না যে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের কয়েকটি ছাত্রের টেম্‌সে ধাঁড় টানা দেখতে আমরা কি দেশজোড়া ছেলেমানুষিই না করি! যদি জিজ্ঞাসা কর যে এতে আমাদের মঙ্গল হ'য়েছে কি না যার ফলে আমরা আজ জগতের চোখে sportsএ সেরা ব'লে গণ্য হ'য়েছি, তাহ'লে আর একটা দৃষ্টান্ত দিতে হয়। একদল লোককে আজ আমরা কি ক্ষেপিয়েই তুলেছি বল দেখি যাদের জীবনব্যাপী সাধনা হ'চ্ছে ঘুঁষি মেরে মানুষের বিধাতৃ-দত্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিলোপ সাধন করা? (এতেও কি জাতীয় মঙ্গল হয়েছে?...) অথচ আমরা ভূত যুগের গ্লাডিয়েটরের নিষ্ঠুর হত্যা দেখার উৎসাহ বা বাঁড়ের লড়াইয়ে উন্মত্ত হয়ে পড়াকে সে-যুগের অসভ্যতার চরম নিদর্শন ব'লে আত্মপ্রসাদে শিউরে উঠি!...অথচ আমরা যে তাদের চেয়ে এক চুলও বেশি সভ্য হই নি তা কি এই sportsএর হাস্যকর পূজা দেখলে মনে হয় না? মনে হয় না কি সেই কথাটা যে বিধাতা যাকে বিনষ্ট করতে চান আগে তাকে পাগল ক'রে দিয়ে থাকেন?...শুধু দেহের বা মাংসপেশীর একাগ্র অর্জনায়ও আমরা আজ সন্তুষ্ট নই। অন্য জাতিরা আমাদের কাছ থেকেই প্রথম এ শিক্ষা লাভ করেছে এই চিন্তায় আমাদের কি অহঙ্কার আজ! যেন মানুষ যে মূলতঃ মনোজগতের জীব—মাংসপেশীর জগতের নয়—এইটে ভুলতে পারাই হচ্ছে সভ্যতার চরম পরিণতি!... তাই কাউকে মন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখলেই আমরা তাকে অলস, নিষ্কর্মা, দিবাস্বপ্নবিলাসী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করে নিজেদের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্বের ধ্যানে গুম্‌হয়ে চাড়া দেই!...

"কথাটা একটু অবান্তর হ'য়ে পড়ল। তবে খেলা-ধূলাকে তার প্রাপ্য গৌরবের চেয়ে বেশি দাম দিলে শ্রেষ্ঠতর বস্তুর মূল্য ঠিকমত দেওয়ার বাধা হয় ব'লেই আমি হঠাৎ এ সম্বন্ধে আজ একটু বেশি উষ্মা প্রকাশ ক'রে ফেললাম।...যাক্ এ কথা।

"তোমার পত্রে তুমি ভাষাশেখার সঙ্গে একটা জাতির নানা সূক্ষ্ম ও কমনীয় দিক্ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার বিষয়ে যা যা লিখেছ সবই খুব সত্য। এ সম্বন্ধে এক এক সময়ে আমার এমনও মনে হ'য়েছে যে বিদেশীর সঙ্গে আবাল্য না মিশলে তাদের স্বরূপটি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ কখনও হ'তেই পারে না। সাধারণতঃ আমরা এ জ্ঞান-লাভ নিয়ে বড় মাথা ঘামাই না,—বিদেশীর সম্বন্ধে অবলীলাক্রমে সহজ সিদ্ধান্ত ক'রে নিজেদের বিজ্ঞতা জাহির করতেই ভালবাসি। বোধ হয় সেইজন্যেই জগতে মানুষ মানুষকে এত ভুল বোঝে। কিন্তু যদি the proper study of mankind is man কথাটি সত্য হয়—তুমি জানো যে আমি নিজে এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি—তাহ'লে প্রতি জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করাটা মানুষের একটা মহৎ কর্তব্য ব'লে মনে না ক'রেই গত্যন্তর নেই। তাই তোমাকে তোমার ভাষা শেখার সূত্রে এ নবলব্ধ বন্ধুত্ববন্ধন স্থাপনের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।...

"আমি প্রতি শনিবারে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরবার সময়ে Kew gardenএ সাড়ে তিনটের সময়ে বেড়াতে যাই। কাল শনিবার; তুমি যদি সেখানে আস ত সুখী হব ও আরও সুখী হব যদি আমার সঙ্গে সাউথেণ্ডে আসতে পার ও রবিবার দিনটাও আমাদের সাহচর্য্যে কাটাতে সম্মত হও।"

(২৯)

পরদিন আহারের পর মসিয়ে রিশার কলেজে চ'লে গেলে পল্লব মাদাম রিশারকে মিষ্টার টমাস সম্বন্ধে সব কথা খুলে বল্‌ল ও তার ও মিষ্টার টমাসের চিঠির মর্ম্মার্থও জানাল। মাদাম রিশার খুসি হওয়া সত্ত্বেও লজ্জা পেয়ে ঈষৎ রসিকতা ক'রে বল্‌লেন: "আপনি ভারি ছেলেমানুষ মসিয়ে থাকচি। আমাকে এ ভাবে আপনার বন্ধুবর্গের কাছে বাড়িয়ে লাভ কি বলুন ত?"

পল্লব বল্‌ল: "এ আপনার মিথ্যা নম্রতা মাদাম রিশার যখন আপনি জানেন যে—"

এবার কিন্তু মাদাম রিশার তার তরল কম্‌প্লিমেণ্টে খুসি না হ'য়ে হঠাৎ একটু শুষ্ক স্বরেই বল্‌লেন: "না না মসিয়ে থাকচি, এ মিথ্যা নম্রতা নয়। আমার সম্বন্ধে সব কথা যদি জান্‌তেন তাহ'লে বুঝতেন। কিন্তু···কিন্তু··· আপনাকে কেমন ক'রে বোঝাব সে কথা!"

পল্লব একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল: "তার মানে?"

মাদাম রিশার একটু চুপ ক'রেই হঠাৎ আবার পূর্ব্ববৎ প্রফুল্লস্বরে বল্‌বার চেষ্টা করলেন: "যেতে দিন। আপনি কি তাহ'লে আজ সাউথেণ্ডে যাচ্ছেন?"

পল্লব বল্‌ল: "হাঁ মাদাম রিশার।"

মাদাম জিজ্ঞাসা করলেন: "সে কতদূর?"

পল্লব বল্‌ল: "সে কি? সাউথেণ্ড যে লণ্ডন থেকে ২০ মাইল মাত্র। তা-ও জানেন না?"

মাদাম রিশার অন্যমনস্কভাবে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বল্‌লেন: "বাইরের খবর জানার আমার দরকার কি মসিয়ে থাকচি? বাইরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধই বা কি বলুন ত? আপনি কি আমাকে কখনও বাগ্‌ধারে ছাড়া আর কোথাও বেতে দেখেছেন? ভেবে দেখুন ত?"

পল্লব এ অপ্রত্যাশিত সুরে চমকিত হ'য়ে বল্‌ল: "এ কি বল্‌ছেন আপনি মাদাম রিশার, আপনার কি আজ কোনও কারণে মন খারাপ আছে? ক্লাসে আপনার আত্মীয় স্বজন সব ভাল ত?"

মাদাম রিশার চকিতে আত্মসংবরণ ক'রে বল্‌লেন: "সব ভাল ধন্যবাদ। আমার আজ শরীরটা ঠিক্ নেই। কিছু মনে করবেন না। আপনাকে কি বলতে কি ব'লেছি। কবে আস্‌বেন?"

পল্লব বল্‌ল: "পরশু—সোমবার।"

মাদাম রিশার বল্‌লেন: "দু দুটো দিন আপনার দেখা পাওয়া যাবে না? উঁহুতের ভারি মন খারাপ হবে মসিয়ে থাকচি।"

পল্লব আর্দ্র স্বরে বল্‌ল: "আমি ত সোমবারে সকালেই আস্‌ব মাদাম রিশার!···যদি বলেন ত কালই আস্‌তে পারি। তবে মিষ্টার টমাস অনুরোধ জানিয়েছেন তাই ভাবছিলাম রবিবারটা তাঁদের ওখানে থেকে এলেই ভাল হ'ত—"

মাদাম রিশার তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লেন: "সে কি কথা মসিয়ে? যাবেন বৈ কি। আমি এমনই বল্‌ছিলাম। আর মন খারাপ করার কথা ভাব্‌ছেন? আর মাসখানেক বাদে যখন এখান থেকে হয়ত চিরদিনের মতন চ'লে যাবেন তখন?"

পল্লব আরও আর্দ্র হ'য়ে বল্‌ল: "আপনার এ স্নেহ কথাগুলির জন্যে কি ব'লে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো মাদাম রিশার—"

মাদাম রিশার হঠাৎ কণ্ঠস্বর গাঢ় ক'রে বল্‌লেন: "ধন্যবাদ না জানালেই সুখী হব। কপট ধন্যবাদ আমাদের এত শুন্‌তে হয় যে আপনাদের মুখে সেটা না শুন্‌তে হ'লেই বেশি ভাল লাগে—বিশেষ ক'রে আপনার মুখে।"

পল্লব একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল: "বিশেষ ক'রে আমার মুখে বলার মানে?"

মাদাম রিশার এ প্রশ্নের উত্তরে একটু চুপ ক'রে রইলেন; পরে একটু অন্যমনস্ক ভাবে বল্‌লেন: "কারণ শুন্‌তে চান? তবে শুনুন। প্রথম যেদিন আপনাকে দেখি সেইদিনই, কেন জানি না, আমার বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠেছিল। কেন জানি না আমার মনে প'ড়েছিল আমার সেই ছোট ভাইটির কথা যে এই যুদ্ধে মারা গেছে।···বোধ হয়···বোধ হয় তারও অনেকটা এম্‌নিই কালো চুল ছিল ব'লে।···থাক্, এ আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের কথা আজ হঠাৎ আবার কেন মনে হ'ল কে জানে?" ব'লে একটু চুপ ক'রে ধীরে ধীরে শুধু বল্‌লেন: "কেমন? এখন শুন্‌লেন ত?···তাই আজ থেকে আপনার কাছে অত বেশি লৌকিকতার আড়ষ্টতার পরিবর্ত্তে একটু সহজ প্রীতি পেলেই বেশি সুখী হব, বুঝলেন?"

পল্লব এবার গম্ভীরভাবে স্পষ্ট হ'য়ে কি বল্‌তে গিয়ে লজ্জা পেয়ে আত্মসংবরণ ক'রে বল্‌ল : "আপনার একটি ভাই কি যুদ্ধে মারা গিয়েছে ? এ কথা ত কই আমাকে কখনও বলেন নি ?"

মাদাম রিশারের কণ্ঠস্বরের হঠাৎ বার্নিক-আগের সেই উদাস সুরটির রেশ দেখা দিল। তিনি বল্‌লেন : "আপনাকে আমার কোন্ কথাটি ব'লেছি মসিয়ে বাক্‌চি ?"

পল্লব ঠিক্ এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে সকাল থেকে লক্ষ্য ক'রেছিল বটে যে মাদাম রিশারের মনটা ঠিক্ সুস্থ নেই, কিন্তু তবু হঠাৎ যে তিনি সহজ কথাবার্তার মধ্যেও এমন একটা উদাস সুর টেনে আন্‌বেন তা সে কখনও ভাবে নি।···সে কি বল্‌বে ভেবে পেল না।

মাদাম রিশার তাকে চুপ ক'রে যেতে দেখে বল্‌লেন : "আমাকে ক্ষমা করবেন মসিয়ে বাক্‌চি। আমার মনটা আজ কোনও বিশেষ কারণে বড়ই খারাপ আছে। অথচ কারণটা আপনাকে ব'লে চিত্তভার লাঘব করতেও সাহস পাচ্ছি না।···যদি সময় পাই আর একদিন বল্‌ব।···যাক্, আপনার বোধ হয় Kew gardenএ যাবার সময় হ'ল।··· পরশু সকালেই আস্‌বেন ত ?"

পল্লব অন্যমনস্ক ভাবে বল্‌ল : "হাঁ।"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "আপনার সেই ছোট্ট হ্যাণ্ড-ব্যাগটাতে আপনার জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে দিই তাহ'লে ? —যখন দুদিন বাইরে থাক্‌বেন।"

পল্লব বল্‌ল : "না না ধন্যবাদ, সে আমিই নিয়ে নিচ্ছি, আপনি কেন কষ্ট করবেন ?"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "আবার ? এই জন্যেই ত ধন্যবাদ কথাটির উপর আমি চটা মসিয়ে বাক্‌চি। কৃতজ্ঞতা জানাবার এমন সহজ সুগম অথচ অসার পন্থা বোধ হয় দুটি নেই। একটা সামান্য রুমাল তুলে দেওয়ার উত্তরেও যে ধন্যবাদ, মন থেকে কোনও স্নেহ বা সেবার উত্তরেও সেই ধন্যবাদ। অর্থাৎ একবার দিতে পারলেই সব বাধ্যবাধকতা মিটে যায়। কেমন ঠিক্ না ?"

পল্লব লজ্জিত হ'য়ে বল্‌ল : "কি বল্‌তে বলেন তাহ'লে !"

মাদাম রিশার তিরস্কারের স্বরে বল্‌লেন : "কিছু না। আপনার কাছেই ত শুনেছি মসিয়ে বাক্‌চি যে ছোটভাই আপনাদের দেশে বড় বোনের স্নেহসেবা নেবার সময়ে ধন্যবাদ জানায় না।"

পল্লব বল্‌ল : "কিন্তু এ কিছু আমাদের দেশ নয়।"

মাদাম রিশার পরিহাসচ্ছলে বল্‌লেন : "আর আমিও কিছু আপনার বড় বোন নই, এই ত আপনার মনোগত ভাব—না ?"

পল্লব অপ্রতিভ হ'য়ে বল্‌ল : "না—না—সেকথা কি আমি ব'লেছি যে—"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "সব কথাই কি বল্‌বার দরকার হয় মসিয়ে বাক্‌চি ?"

পল্লব এবার সাহস সঞ্চয় ক'রে বল্‌ল : "তবে আর আমার অপরাধ নেই। আমাদের দেশে দিদিও ছোট ভাইকে মিষ্টার বা মসিয়ে বলে না, নাম ধ'রে ডাকে।"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "আচ্ছা তাই হবে। তবে আপনিও আমাকে আজ থেকে বড় বোন মনে করবেন।"

পল্লব বল্‌ল : "তাহ'লে আপনিও আমাকে মন খারাপ হ'লে সব কথা খুলে বল্‌বেন ?" এ কথায় মাদাম রিশার হঠাৎ কণ্ঠস্বরে আবার সেই গাঢ় সুর এনে বল্‌লেন : "বল্‌ব, যদি আপনি ভরসা দেন।"

পল্লব আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল : "সে কি !" এমন সময়ে দোরে ক্রিং ক্রিং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল।

(৩০)

মাদাম রিশার দুয়ার খুলে দিতে গেলেন। পল্লব ঘরের মধ্যে একটা উত্তেজনা ভাব নিয়ে বসে রইল। তার মনটা কেবলই নাড়াচাড়া করতে লাগ্‌ল মাদাম রিশারের শেষ কথা কয়টি নিয়ে—"যদি আপনি ভরসা দেন।"···তিনি কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন !···কি হ'তে পারে !···হঠাৎ তার মনে একটা মধুর করুণ ভাব এল। সে এক মুহূর্ত্তে যেন বুঝতে পারলে কেন মাদাম রিশার প্রথম থেকেই তার প্রতি এতটা সত্যকার স্নেহাকর্ষণ বোধ ক'রে এসেছেন, ও সে-ও তার সাড়া না দিয়েই পারে নি। যদি সে তাঁর মৃত ভাইটির স্থান আজ সত্যি সত্যি অধিকার করতে পারত তাহ'লে আজ তাতে সে কি তৃপ্তিই না বোধ করত !···কিন্তু তখনই আবার তার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগ্‌ল সেই প্রশ্নটি—মাদাম রিশারের বেদনার ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহস্যভাবের অর্থ কি ?···তাঁর মনে যে কোথায় একটা নিহিত গভীর

বেদনা আছে তা ইতিপূর্ব্বে কখনও কখনও তার মনে হ'লেও এভাবে তার কখনও লক্ষ্য করবার ত অবকাশ হয় নি।...এ কি শুধু এঁর ভাইয়ের বিয়োগ-ব্যথা? না শুধু তা ত নয়। তিনি যে এইমাত্র অন্য আরও ব্যথার আভাষ দিলেন!...হায়, সে কি তাঁর বেদনার ভার অন্ততঃ দুটো আন্তরিক সহানুভূতির বাণীতেও লঘু করতে পারে না? ...সে বিদেশে সহানুভূতি পাবার জন্যও সময়ে সময়ে যেরকম উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকত সহানুভূতি প্রকাশ করবার প্রয়োজনও তার-চেয়ে কম অনুভব করত না।

মাদাম রিশার একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এলেন। পল্লব খুলে দেখল মিষ্টার টমাস তার করে'ছেন সে যেন তার পরদিন সাউথেণ্ডে যায়, কারণ মিষ্টার টমাসকে বিশেষ কাজে সেদিন লণ্ডনে একটি নবাগত রুষ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে ও সম্ভবতঃ রাত্রিটা তার সাহচর্য্যেই কাটাতে হবে।

মাদাম রিশারকে সে এ কথা বলল। শোনবামাত্র তাঁর নীলাভ চোখদুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি বললেন: "তাহ'লে আজ আপনার যাওয়া হ'ল না ত?"

পল্লব দৃঢ়স্বরে বলল: "না।"

মাদাম রিশার স্মিত হেসে বললেন: "তাহ'লে পুরস্কার স্বরূপ আপনাকে এক পেয়ালা কফি দেই এখনই, কি বলেন মসিয়ে বাক্‌চি?"

পল্লব অনুযোগের স্বরে বলল: "আবার মসিয়ে বাক্‌চি? মিষ্টার টমাস যখন আমাকে শুধু বাক্‌চি ব'লে ডাকতে পারেন তখন আপনিই বা কেন এখন থেকে আমাকে শুধু ঐ নামে ডাকতে না পারবেন?"

মাদাম রিশার খুসি হ'য়ে বললেন: "আচ্ছা আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে। আপনিও তাহ'লে আমাকে নাম ধ'রে ডাকবেন এখন থেকে, কেমন?"

পল্লব বলল: "না।"

মাদাম রিশার জিজ্ঞাসা করলেন "কেন?"

পল্লব বলল: "কারণ প্রথমতঃ আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় ও দ্বিতীয়তঃ আপনি আমার চেয়ে সম্পর্কেও বড় হয়ে গেলেন যখন আপনি আমার বড় বোন।"

মাদাম রিশার বললেন "কিন্তু বড় বোনকে ত আমাদের দেশে নাম ধ'রে ডাকে।"

পল্লব বলল: "কিন্তু আমাদের দেশে ত ডাকে না।"

মাদাম রিশার বললেন: "কিন্তু আমি ত আপনাদের দেশের লোক নই যে আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকবেন না।"

পল্লব উত্তর দিল: "বা রে যুক্তি। আর আমিই বুঝি আপনাদের দেশের লোক যে নাম ধরে ডাকব?"

মাদাম রিশার ফরাসীসুলভ shrug-এর সঙ্গে হেসে বললেন: "এবার আমার হার।" বলে আরও একটু হেসে বললেন: "কিন্তু তাহলে কি সাব্যস্ত হল?"

পল্লব বলল: "সেটা আপনিই স্থির করুন!"

মাদাম রিশার বললেন: "আচ্ছা আজ থেকে আপনি আমাকে sœurette (বোন) ব'লে ডাকবেন। কেমন? সরেত্‌ নামটি আপনার পছন্দ ত?"

পল্লব ঘাড় নেড়ে ধীর ভাবে বলল: "হাঁ মিষ্টি বটে কিন্তু দিদির মত মিষ্টি নয়।"

মাদাম রিশার বললেন: "আচ্ছা তাহ'লে না হয় দিদিই বলবেন।"

পল্লব বলল: "না-না তা কখনও হয়? এসব দেশে দিদি কেমন বিসদৃশ শোনাবে। আচ্ছা, আমি আপনাকে Sœurette ব'লেই ডাকব যদি আপনি আমাকে বলেন, কেন খানিক আগে আপনি এমন রহস্যভরা কথাবার্ত্তা বলছিলেন।"

মাদাম রিশার সুর বদলে বললেন: "সে কথা আজ থাক্‌, আর একদিন বলব—যদি কখনও বুঝি যে আপনি কথাটা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারবেন।"

পল্লব বলল: "তার মানে?"

মাদাম রিশার মুখ ফিরিয়ে বললেন: "শুনেছি আপনাদের দেশে নারীর ক্ষেত্রে পান থেকে চুণটি খসলেও আপনারা তার মুখদর্শন করেন না। তাই আমার ভয় হয় পাছে..."

এমন সময়ে ইজেত দমকা হাওয়ার মতন স্কুল থেকে বই হাতে ক'রে এসে হাজির হ'ল। "মা, মা, আজ কি হয়েছে জানো? আমাদের ইস্কুলের মিস্‌ ম্যাকেনা ব'লেছেন যে কাল ভোরে আমাদের একটা যুদ্ধ-জাহাজ দেখতে নিয়ে যাবেন। তিনি ব'লেছেন যে তাঁদের যুদ্ধ-জাহাজ না কি আমাদের দেশের জাহাজের চেয়েও বড়। সত্যি

না কি মা? আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। তোমার হয়?—"

মাদাম রিশার হেসে ফেল্‌লেন।

পল্লবও হেসে বল্‌ল: "কাল মেঁথ্‌লেই ত বুঝতে পারবে ইভেত। তবে আজ এ নিয়ে এত মাথাব্যথার দাত কি?"

ইভেত একটুও অপ্রতিভ না হ'য়ে বল্‌ল: "তা বটে।... কিন্তু···আচ্ছা মসিয়ে বাকচি, আপনি সাবমেরিণ দেখেছেন? আমি একবার দেখেছিলাম—বুলোনে। না মা?—যদি না দেখে থাকেন তবে দেখ্‌বেন। সে ভারি মজার দেখ্‌তে। কি রকম জানেন? অনেকটা সীল মাছের মতন, না মা? কিন্তু তার মধ্যে মানুষ থাকে কেমন করে যে···তাদের হাঁফ লাগে না?···"

(৩১)

সেদিন সন্ধ্যায় পল্লব একাই Hampstead Heathএ বেড়াতে গেল। দুধারে দলে দলে প্রণয়িযুগল বাহু-আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লেছে; কোথাও বা কয়েকটি গোলাপ ফুলের মতন শিশুর মেলা বসেছে—তারা উদ্দাম ভাবে ছুট্‌ছে, পড়ছে, হাস্‌ছে; কোথাও বা কোন নিকুঞ্জে কোনও দম্পতী নিবিড় প্রণয়ালাপে মগ্ন; কোথাও বা বৃদ্ধ বৃদ্ধা-বীর মন্থর গতিতে সান্ধ্য বায়ু সেবন করতে বেরিয়েছে।···কিন্তু পল্লবের এ-সব কিছুই চোখে পড়ছিল না। মাঝে মাঝে সে দেখ্‌ছিল কেবল—অস্তোন্মুখ রবিকর-জালের খণ্ডমেঘের সঙ্গে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন-বিলাসী রঙ্ নিয়ে লুকোচুরি খেলা। কিন্তু সে-ও ক্ষণেকের তরে। পরক্ষণেই তার মনে হচ্ছিল মাদাম রিশারের কথাগুলি: "যদি ভরসা দেন···আর একদিন বল্‌ব···তবে আমার ভয় হয় পাছে...।" কি এমন কথা তিনি বল্‌তে যাচ্ছিলেন!··· তার সঙ্গে তাঁর কি-ই বা এমন বাধাবাধকতা যাতে তিনি তার কিছু মনে-করা না-করার এতটা দাম দেওয়া দরকার মনে করতে পারেন? আর যদিই বা তিনি কিছু অন্যায় ক'রে থাকেন—যদিও তাঁর লাবণ্যময়ী কমনীয় মূর্ত্তি মনে ক'রে সে সম্ভাবনা পল্লব মনে স্থান দিতেও সঙ্কোচ বোধ না ক'রেই পারছিল না—তাহ'লেও তার কাছে তাঁর জবাবদিহি করার ত কিছুই থাকতেই পারে না!···তবে?···

হঠাৎ তার মনে হ'ল ছুএকটা কথা।···

তার শয়নকক্ষের একধারে ছিল ইভেতের শোবার ঘর ও অপর পাশে রিশার দম্পতীর শয়নকক্ষ। মাঝের দেয়ালটা পাতলা কাঠের ছিল বলে সময়ে সময়ে ছুচারটে চাপা কথা তার কাণে আস্‌ত। সে কখনই প্রায় সে-সব কথা কাণ পেতে শোন্‌বার চেষ্টা পেত না। তবে তা সত্ত্বেও সে সম্প্রতি লক্ষ্য না ক'রেই পারে নি যে রিশার দম্পতীর নেপথ্যে চাপা কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা অশ্রুতপূর্ব্ব উত্তেজনা-কম্পন মাঝে মাঝে প্রকট হ'য়ে উঠ্‌ত। সময়ে সময়ে ছুএকটা কথা সে চাপা সুরের ছন্দকে অতিক্রম ক'রে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌ত। তার মধ্যে মাদাম রিশারের যেন ছুএকটা তিরস্কার-সূচক কথাও তার কাণে প্রবেশ করত। এ রকম কথার স্মৃতি অনেক সময়ে বহুদিন ধ'রে মানুষের মগ্ন-চৈতন্যের তলায় প'ড়ে থাকে—হঠাৎ একদিন বুদ্‌বুদের মতনই উপরে উঠে আস্‌বার জন্যে। এই রকমই ছুএকটা কথা আজ তার হঠাৎ স্মরণ হ'ল, বিশেষ ক'রে মাদাম রিশারের একটা অনুযোগ যে "Les hommes sont hypocrites" (পুরুষেরা সব কপট)। উত্তরে মসিয়ে রিশার যেন ব্যস্ত হ'য়ে তাঁকে শান্তস্বরে কথা বল্‌তে অনুরোধ করতেন, যার ফলে দাম্পত্য কলহ আবার খানিকক্ষণ পূর্ব্ববৎ চাপা সুরে চল্‌ত। পল্লব চেষ্টা করলে হয়ত আরও ছুচারটে কথা শুন্‌তে পারত। কিন্তু তুচ্ছ দাম্পত্যকলহ ভেবে সে এ-সবে বড় একটা কাণ দিত না,—শুনেই অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়ত।

আজ কিন্তু প্রথম তার মনে হঠাৎ একটা গাঢ় সংশয় ছায়াপাত করল। তার মনে হ'ল মাদাম রিশার কি একটা সত্য কথা তাকে বল্‌তে চান, কেবল মসিয়ে রিশারের প্ররোচনায় পারছেন না। খুব সম্ভবতঃ তাঁর সত্যপ্রিয় অন্তর এই লুকোচুরি-রূপ কপট ব্যবহারের জন্যই গত কয়েকদিন কষ্ট পাচ্ছে।···তার মনে পড়্‌ল গত সপ্তাহে সে ছুতিন দিন প্রভাতে মাদাম রিশারের চোখ ছুটি ক্রন্দনস্ফীত অবস্থায় দেখেছিল।···কিন্তু তাকে এমন কি কথা বলা তিনি কর্ত্তব্য মনে করতে পারেন?···কি এমন গভীর রহস্যময় বক্তব্য তাঁর থাকতে পারে!···

সেদিন সন্ধ্যায় সে মনটাকে প্রফুল্ল করবার জন্যে একটা Musical Comedy দেখ্‌তে গেল। কিন্তু ভাল লাগ্‌ল না। কমেডিটির অসহ্য ভাঁড়ামি, অসার প্রেমের জাকামি ও নৃত্যচ্ছলে অভিনেত্রীদের কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী সে বরদাস্ত

করতে পারল না—বিশেষতঃ সেদিন সন্ধ্যায়। তাই সে হঠাৎ দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝখানেই উঠে চ'লে এল।

বাড়ী এসে সে সটান নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম তার আজ সহজে আসতে চাইল না। সে নানা কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময়ে হঠাৎ পাশের ঘরে রিশার দম্পতীর আবার সেই চাপা সুরে বাদানুবাদ তার কাণে প্রবেশ করল।... সে মুহূর্ত্তে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল।

মানুষ উত্তেজিত হ'লে সর্ব্বদা সুরের সমান ওজন রেখে কথা কইতে পারে না। পল্লবের কাণে হঠাৎ মাদাম রিশারের' দুএকটি কথা প্রবেশ করল: "এ মিথ্যায় ত আমি রাজি হই নি।" উত্তরে মসিয়ে রিশার কি একটা কথা বলতেই মাদাম রিশার বললেন: "আমার আবার সমাজ। সে কি আমি একদিনে ছাড়ি নি!...তুমি হিপক্রিট, কপট...মিথ্যা ক'রে সমাজে থাকা..." এবার মসিয়ে রিশারের বিকৃত কণ্ঠ শ্রবণগোচর হ'ল: "আঃ আস্তে আস্তে। স্ত্রীলোক কি না...বুদ্ধির ত ধার ধারো না...কেবল উচ্ছ্বাস নিয়ে ঘর কর।"

উত্তরে মাদাম রিশারের কণ্ঠস্বর আরও একটু শোনা গেল: "বেশ আমি যা তাই। আমার স্বভাব ত তুমি জানতে...তবে এখন কেন এ বৃথা অনুযোগ!"...

মসিয়ে রিশার ব্যস্ত হ'য়ে বললেন: "আহা আস্তে... আস্তে...পাশের ঘরে..."

তার পর পল্লব আর কিছু শুনতে পেল না। কিন্তু তবু সে আরও উৎকর্ণ হ'য়ে রইল, যদিও সে মনে মনে বেশ বুঝছিল যে স্বামীস্ত্রীর গোপন কথাবার্ত্তা কাণ পেতে শোনা তার অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু আজ সারা সন্ধ্যাটা সে যে এই প্রশ্ন নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে!...কাজেই কৌতূহলই তার কাছে সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে উঠল।...

হঠাৎ আবার মাদাম রিশারের গলার স্বর শোনা গেল: "কালই আমি মসিয়ে বাকুচিকে বলব।" মসিয়ে রিশার তিরস্কারের সুরে কি বললেন শোনা গেল না। কিন্তু মাদাম রিশারের উত্তরটা শোনা গেল: "আর আমি পারছি না এ মুখোষ প'রে থাকতে।"...

মসিয়ে রিশার বললেন: "আহা আস্তে আস্তে।..."

এবার উত্তরে শুধু মাদাম রিশারের চাপাকান্না শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মসিয়ে রিশারের সান্ত্বনাসূচক কথা শোনা গেল, কিন্তু মাদাম রিশারের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার রোল থামানো গেল না।

পল্লব আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না। তার হৃৎস্পন্দন উদ্দাম হ'য়ে উঠেছিল। সে বিছানা থেকে উঠে রিশার দম্পতীর ঘরের দেয়ালের কাছে কাণ খাড়া ক'রে দাঁড়াল। শুনতে পেল: মসিয়ে রিশার বলছেন "চুপ্ কর...ছি...লক্ষ্মীটি...মসিয়ে বাকুচি তোমার কান্না হয় ত শুনতে পাবেন...তাহ'লে তিনি কি মনে করবেন বল ত?..." তার পরে আর কোনও শব্দ শোনা গেল না—কেবল থেকে থেকে মাদাম রিশারের চাপাকান্না ও ঘরের ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া।...পল্লব আরও পাঁচ সাত মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কিছু শুনতে না পেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে তার মনে কেবলই এই প্রশ্নটি জাগতে লাগল যে স্বামীস্ত্রীর দাম্পত্য কলহের মধ্যে তার নাম আসে কোথা থেকে? তার মনে হ'ল রিশার পরিবারের মধ্যে কি একটা গোপন রহস্যগ্রন্থি তাঁদের বিবাহিত জীবনের অনড় অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ মাদাম রিশারের আন্তরিক স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, স্বামী-কন্যার প্রতি অনুরাগ, দাসদাসীর প্রতি আচরণ—এক-কথায় তাঁর সব চালচলনেই একটা ভদ্র মার্জ্জিত সৌজন্যের কথা ভেবে তার মনে করতেই প্রবৃত্তি হ'ল না যে তাঁর জীবনে কোনও কিছু ঘৃণ্য থাকতে পারে।...

তার মনে হ'ল দশ পনর দিন আগে তার একবার দাঁতে বেদনা হ'য়ে দু-তিন দিন বিছানায় প'ড়ে থাকতে হ'য়েছিল। সে সময়ে মাদাম রিশার স্বহস্তে তার খাবার এনে তাকে খাইয়ে দিয়ে যেতেন, ওষুধ গরমজল প্রভৃতি সরবরাহ করতেন, নিজে ডাক্তার ডেকে আনতেন। এমন কি সে যখন মুখ ধুত তখন তিনি নিজে পাত্র হাতে ক'রে তার মুখের সামনে ধরতেন। এতে সে সঙ্কুচিত হ'লে তিনি তিরস্কারের সুরে বলতেন: "এ-সব মেয়েদেরই কাজ মসিয়ে বাকুচি। মেয়েরা কিছু আলমারিতে সাজিয়ে রাখার পুতুল মাত্র নয়।" তাঁর সে আন্তরিক স্নেহকোমল ব্যবহার, ঘরের কাজ ফেলে তার মাথা টিপে দেওয়া, তাকে বই-পড়ে শোনানো প্রভৃতি নানান্ ছোট-

খাট সেবার দানের স্মৃতি আজ তার চোখের সাম্নে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। ছি ছি···এহেন মাদাম রিশারের জীবনে কি কখন কোনও দুষণীয় রহস্য থাক্‌তে পারে! তাছাড়া তাঁর মধ্যে নানা-বিষয়ে খুঁটিনাটিতে সে সতত এমন একটা শুচ্ছতা ও সত্যনিষ্ঠতার পরিচয় পেত যাতে ক'রে তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বেড়েই চ'লেছিল।···

কিন্তু তবু···আজ তার নাম ওঠে কেন? কি ব্যাপার এ? তার মস্তিষ্ক উষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল। নীচের ঘরের বড় ঘড়িতে সে ঢং ঢং ক'রে বারটা একটা ও দুটো বাজতে শুন্‌ল। মাঝে মাঝে থেকে থেকে মাথার কাছের জানালায় বৃষ্টিপাতের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছিল···দু একবার সামনের বাড়ী হ'তে একটা রোরুদ্যমান শিশুকণ্ঠ শোনা গেল।···একবার কি দুবার কাছের একটা বাড়ী থেকে একটা হাসি ও নৃত্যসুরের ক্ষীণ রেশ তার কাণে ভেসে এল।...তার পর সে যে কখন ঘুমিয়ে পড়্‌ল.....

(৩২)

পরদিন সকালে পল্লবের যখন ঘুম ভাঙল তখন নটা বেজে গেছে ও গত রাত্রের হঠাৎ-মেঘাবৃত আকাশ নির্ম্মল হ'য়ে গিয়ে রৌদ্রালোকে সমস্ত ঘরটা প্লাবিত হ'য়ে গেছে। পল্লব সচরাচর আটটার আগেই উঠ্‌ত ও স'আটটার মধ্যেই নীচে গিয়ে প্রাতরাশে যোগ দিত। তার উঠ্‌তে কখনও-কদাচিৎ বিলম্ব হ'লে মাদাম রিশার তার জন্য অপেক্ষা করতেন। এজন্য পল্লব বড় কুণ্ঠা বোধ কর্‌ত। তাই পারতপক্ষে সে তার অনেক বন্ধুদের মতন কখনও কুড়েমি ক'রে বিছানায় দেরি কর্‌ত না। সুতরাং আজ তার উঠ্‌তে বিলম্ব হ'য়ে যাওয়ায় দরুণ সে কুণ্ঠিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে নীচে গেল। তখন মসিয়ে রিশার ছেলে পড়াতে বেরিয়ে গেছেন। রবিবারে সকালে 'ঈস্টিডে' গিয়ে তিনি দুতিনটি ছেলেকে আলাদা পড়াতেন। তাই তাঁকে চা খেয়েই বেরিয়ে যেতে হ'ত যাতে যথাসময়ে মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগ দিতে পারেন।

পল্লব আহারের টেবিলে গিয়ে দেখল ইভেত সবে মাত্র তার খাওয়া শেষ ক'রেছে। তাকে দেখে সে তার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে সুপ্রভাত জ্ঞাপন ক'রেই তাড়াতাড়ি দাদার দুএকটি ছেলের সঙ্গে খেল্‌তে বেরিয়ে গেল। আজ তার গল্পালাপের সময় ছিল না যেহেতু রবিবার সকালে সে তাদের সঙ্ঘ দল বেঁধে চার্চ্চে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ফিরে খেলার ধুম! "A bien tot" (এখনি আস্‌ছি) ব'লে ইভেত ছুটে বেরিয়ে গেলে পল্লব সেদিনকার সচিত্র Daily Mirrorএর দুএকটা পাতা উল্‌টোতেই বড় বড় অক্ষরে এক বড়ঘরের ডাইভোর্স ও পাত্রপাত্রীর ছবি তার দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল।··· তার মনে কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর অনুভূতি জেগে উঠ্‌ল। এই লোকটির বক্তৃতা সে সে মাত্র সাতদিন আগে Steinway Hallএ শুনেছিল!···তিনি অভিযুক্ত!···

"সুপ্রভাত মসিয়ে বাক্‌চি, আশা করি শরীর ভালই আছে—দেরি হ'ল যে?" বল্‌তে বল্‌তে মাদাম রিশার পরিজ, ডিম ও রুটি নিয়ে সে ঘরে প্রবেশ করলেন।

"হাঁ···ধন্যবাদ···সুপ্রভাত···শরীর ভালই আছে... তবে···" বল্‌তে বল্‌তে পল্লব থেমে গেল। বাক পথে মাদাম রিশারের চোখ দুটির উপর তার দৃষ্টি পড়্‌ল। চোখ দুটির শুধু যে পাতা স্ফীত হ'য়ে উঠেছিল তাই নয়, তাঁর নীলাভ চক্ষুতারকার চারপাশ স্পষ্ট লাল হ'য়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্রের সব কথা দম্‌কা হাওয়ার মতন হুড়োহুড়ি ক'রে তার মনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার বাক্যরোধ কর্‌ল।

মাদাম রিশার তার বাধ-বাধ ভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে ঈষৎ রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু তখনই যথাসম্ভব সহজ সুরে বল্‌লেন: "যাক্ তবু ভাল। আমার ত মনে হচ্ছিল যে গত কয়দিন সন্ধ্যায় আপনি থিয়েটার বায়স্কোপ টেনিস ম্যাচ প্রভৃতি নিয়ে যে অনিয়ম ক'রেছেন তাতে আবার ঠাণ্ডা লেগে দাঁতে বাথা না হ'য়ে থাকে।"

পল্লব ভদ্রতা করে সস্মিতভাবে বল্‌ল: "না না··· থিয়েটার দেখ্‌লে বুঝি দাঁতের গোড়া ফুলে ওঠে? সে আমি শোতে প'ড়ে আপনার তৈরি সেই ফরাসী আইস ক্রীম খেয়েছিলাম ব'লে।—যাক্ সে কথা।···সর্ব-আগে আপনার কাছে আমার মাফ চাওয়া দরকার আপনাকে অপেক্ষা করতে বাধ্য ক'রেছি ব'লে।"

মাদাম রিশার দুটো পেয়ালায় চিনি ঢেলে বল্‌লেন: "কের ঐ-সব লৌকিকতা! কাল কি-সব সর্ত্ত হ'য়েছে?"

পল্লব বল্‌ল: "ধন্যবাদ দেব না এই সর্ত্তই হয়েছে— কিন্তু ত্রুটি হ'লে তা' স্বীকার কর্‌ব না এ সর্ত্ত ত হয় নি

মাদাম রিশার। তবে এও আমি বল্‌ব যে আজ আপনাকে অপেক্ষা করতে হওয়ার দরুণ দায়ী আমি নই। আমি ত আপনাকে কতবার ব'লেছি, আমার জন্য অপেক্ষা না করতে। তা আপনি ত বল্‌লে শুন্‌বেন না; আমার হঠাৎ উঠ্‌তে বেলা হ'লে নিজেও না খেয়ে আমার জন্যে ককি নিয়ে ব'সে থাক্‌বেন। কিন্তু এ রকমটা যে আপনি কেন করেন তা জানি না, যখন এ দেশে কেউ কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। আপনি যে দেখ্‌ছি এ বিষয়ে আমাদের মেয়েদের নকল করতে আরম্ভ কর্‌লেন।"

মাদাম রিশার ককি ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে বল্‌লেন: "কর্‌লেই বা ক্ষতি কি। আমার ত মনে হয় আপনাদের দেশের এ প্রথাটা খুব ভাল। বিশেষতঃ যখন আমি এখন আপনার সঙ্গে বড় বোনের সম্বন্ধ পাতিয়ে আপনাদেরই একজন হ'য়ে গেছি।"

পল্লব সস্মিতমুখে বল্‌ল: "ধন্যবাদ মাদাম রিশার আজ সকালে আপনার এ সুন্দর কথার জন্যে।"

মাদাম রিশার এক খণ্ড রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বল্‌লেন: "কেন ধন্যবাদ দেওয়া ও মাদাম রিশার ব'লে ডাকা?"

পল্লব হেসে বল্‌ল: "অনেক দিনের অভ্যেস কি একদিনে যায়? এই দেখুন না—আপনিও কি এইমাত্র আমার নাম ধ'রে না ডেকে আমাকে মসিয়ে বাক্‌চি বলে ডাকেন নি?"

মাদাম রিশার রুটির রেকাবীটা এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন: "আচ্ছা···বোঝবোধ। এখন থেকে কিন্তু···"

পল্লব বল্‌ল: "আচ্ছা তাই সই। কিন্তু এখন এ নতুন ডাকটায় অভ্যস্ত হ'তে দুএকদিন সময় লাগ্‌বে ব'লে রাখ্‌ছি।"

মাদাম রিশার বল্‌লেন: "আচ্ছা···কিন্তু ভুল হ'লেই আমার টোক্‌বার অধিকার রইল।···আর এক পেয়ালা ককি দেই?"

পল্লব বল্‌ল: "আচ্ছা দিন। আজ মাথাটা সামান্য ধ'রে আছে, হয় ত একটু বেশি ককি খেলে উপকার হবে।"

মাদাম রিশার চোখ তুলে বল্‌লেন: "মাথা ধ'রেছে নাকি?·····কেন বলুন?"

পল্লব এ 'কেন'র উত্তরে কি বল্‌বে ভেবে না পেয়ে বল্‌ল: "কাল রাত্রে একটা কমেডি দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। বোধ হয়···সেখানকার দূষিত গরমের জন্যই রাত্রে ঘুম হয় নি···ও তাই হবে ত···"

মাদাম রিশার হঠাৎ সুর বদ্‌লে তাঁর নীল চক্ষু দুটি অচঞ্চল দৃষ্টিতে পল্লবের মুখের ওপর স্থাপন ক'রে বাধা দিয়ে বল্‌লেন: "সেজন্য নয় মসিয়ে বাক্‌চি।···রাত্রে আপনার ঘুম না হওয়ার কারণ থিয়েটারের দূষিত গরম নয়।···তার কারণ···আমি।"

পল্লবের রক্ত দ্রুত চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল: "সে কি মাদাম রিশার?"

মাদাম রিশার সমান অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন: "হাঁ মসিয়ে বাক্‌চি, এবং আপনিও নিশ্চয়ই এ কথার মানে বুঝতে পারছেন। কাল বিকেলে আমার রহস্যময় কথাবার্ত্তা ও রাত্রে কান্নার স্বরই আপনার মনকে চঞ্চল ক'রে রেখে আপনাকে ঘুমোতে দেয় নি। কেমন বলুন ত আমি ঠিক্ বলি নি? মনে রাখ্‌বেন বড় বোনের কাছে মিথ্যা বল্‌তে নেই। ভদ্রতার খাতিরেও নয়।"

পল্লব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে বল্‌ল: "ন···তা ঠিক্ নয় ···কেবল···"

মাদাম রিশার বাধা দিয়ে স্থির স্বরে বল্‌লেন: "বৃথা ঢাক্‌ছেন কেন মসিয়ে বাক্‌চি?···শুনুন, আমি আজ ইচ্ছে ক'রেই এ প্রসঙ্গ তুলেছি। কেন না আমি আজ সকালে উঠেই ঠিক্ ক'রে ফেলেছিলাম যে আপনাকে সব কথা খুলে বল্‌ব। যদিও আপনাকে বল্‌তে মসিয়ে রিশার বারবার নিষেধ ক'রে দিয়েছেন তবু আমি আপনাকে না ব'লে থাক্‌তে পারছি না। কারণ—কেন জানি না—আপনাকে দেখে আমার ক্রমাগতই সেই ভাইটির কথা মনে হয় ও ভাইয়ের কাছে মানুষ মুখোস প'রে থাক্‌তে পারে না।"

পল্লব উৎকণ্ঠিত চিত্তে চুপ ক'রে রইল।

মাদাম রিশার একটু থেমে বল্‌তে লাগ্‌লেন: "তবু আপনাকে বল্‌তে আমার সত্যি এত সঙ্কোচ ও আশঙ্কা হচ্ছে যে কি বল্‌ব?···কেন জানেন? কারণ পাছে আপনাকে সব কথা খুলে বল্‌লে আপনি আমার সংস্পর্শ ত্যাগ করেন।"

পল্লব দুঃখিত স্বরে বল্‌ল: "ছি-ছি···এমন কথা বল্‌তে আছে মাদাম রিশার—বিশেষতঃ আমাকে ভাই ব'লে ডাকার পরে!"

দেখ' না এই গোলাপবালার মুখের পানে চেয়ে,
অধর টিপে হাস্‌ছে যেন গন্ধে বাতাস ছেয়ে!

—রোবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম। —শ্রীমণীন্দ্র দেব

মাদাম রিশার ম্লান হেসে বল্‌লেন : "সাধে বলি মসিয়ে রাকৃচি ? এ কথা আমি ফ্রান্সে ইতিপূর্ব্বে মসিয়ে রিশারের চার পাঁচজন বন্ধুকে ব'লেছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই আমাদের সংস্রব ত্যাগ ক'রেছিলেন।"

পল্লব বল্‌ল : "মাদাম রিশার, কি কথা আপনি যে বল্‌তে যাচ্ছেন জানি না, এবং আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি এমন কোনও কাজ ক'রে থাকতে পারেন যার জন্যে কেউ আপনার সঙ্গ বর্জ্জনীয় মনে করতে পারে।···কিন্তু সে কথা যাক্। আপনার সব-কথা বল্‌বার আগে আমি আপনাকে একটা কথা ব'লে রাখ্‌তে চাই ও সেটা এই যে আপনি যা-ই ক'রে থাকুন না কেন আমার কাছে তা স্বীকার করার কোনও বাধাবাধকতাই আপনার থাকতে পারে না। কাজেই আপনার কোনও স্বীকারোক্তি জান্‌বার বিন্দুমাত্র অধিকারও আমার নেই।"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "আছে, মসিয়ে রাকৃচি। আমার ভাই হবার আগে আমার সত্যি পরিচয় জান্‌তে দাবী করার অধিকার আপনার আছে।"

পল্লব আর্দ্রস্বরে বল্‌ল : "সে কি মাদাম রিশার ? আপনার সত্য পরিচয় আবার কি ? আপনি আগে কি ছিলেন না ছিলেন, আপনার নামধাম বংশবিবরণ···এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কি অধিকার যে আমার থাকতে পারে তা ত আমি ভেবেই পাচ্ছি না। আপনি আমার দিদি ও মসিয়ে রিশারের স্ত্রী এই পরিচয়ই আমার কাছে যথেষ্ট।"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "আর যদি···যদি···যদি··· আমি মসিয়ে রিশারের স্ত্রী না হই তাহ'লে ?"

পল্লব থম্‌কে গিয়ে বল্‌ল : "সেকি মাদাম রিশার ? তার মানে ?"

মাদাম রিশার মাটির দিকে চোখ নামিয়ে শান্ত স্বরে বল্‌লেন : "তার মানে আইনের চোখে যিনি আমার স্বামী তিনি এখন পারিসের একজন বিশিষ্ট ধনী অভিজাত। কাজেই সমাজের চোখে আমি মসিয়ে রিশারের রক্ষিতা মাত্র।"

পল্লবের হৃৎস্পন্দন বোধ হয় ঘরের ঘড়িটার টিক্‌টিকের চেয়েও উচ্চরব হ'য়ে উঠেছিল। তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। সে কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে ব'সে রইল। হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত গুরুতর আঘাত পেলে মানুষ অনেক সময়ে প্রথমটায় বল্‌তেই পারে না তার কোথায় লেগেছে।

মাদাম রিশার তাকে নীরব দেখে বল্‌লেন : "আপনি যে এ কথায় ব্যথা পাবেন তা আমি জান্‌তাম। এবং সেই জন্যই আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। অথচ আমি স্বরূপ পরিচয় না দিয়েও এ মুখোস-পরা রূপে আর আপনার কাছে বাহির হ'তে পারছিলাম না।···কারণ কারণ···মানুষ বেশিদিন অভিনয় করতে পারে না মসিয়ে রাকৃচি···হাঁপিয়ে ওঠে···বিশেষতঃ প্রিয়জনের কাছে। স্নেহাস্পদ আমাদের না বুঝলে যে আমাদের প্রীতি স্নেহ বন্ধুত্ব কিছুই সার্থক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না মসিয়ে রাকৃচি।···নইলে প্রিয়জন ও উদাসীনের মধ্যে তফাৎ থাকত কোথায় ?"

পল্লব কি একটা কথা বল্‌তে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

মাদাম রিশার আর্দ্রকণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌লেন : "তবু হয় ত আমি আপনার কাছে এ কথা বল্‌তে এতটা শঙ্কা করতাম না যদি না প'ড়ে ও শুনে থাকতাম যে আপনাদের দেশের মেয়েরা সতীত্বের জন্য বিখ্যাত। তাই আমার ভয় হ'ত—কেন না সামাজিক লোকমতের প্রভাব আমাদের উপর অত্যন্ত বেশি—পাছে আমি আপনার চোখে হেয় পতিতা নারী মাত্র ব'লে গণ্য হই। এখনও সে ভয় যে নেই তা নয়···"

বল্‌তে বল্‌তে দুই বিন্দু অশ্রু তাঁর দুই চোখে টল্‌টল্ ক'রে উঠ্‌ল। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করলেন।

পল্লব এবার ব্যথিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল : "ছি—ছি—এ আপনি কি অন্যায় কথা ব'লে অনর্থক নিজেকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করছেন মাদাম রিশার ? আপনার স্নেহ, দয়া, শিক্ষা প্রভৃতি নানা গুণ কি আমি গত দুমাস ধ'রে স্বচক্ষে দেখি নি যে আপনি নিজেকে এ ভাবে···" সে আর কথা খুঁজে পেল না।

মাদাম রিশার গাঢ়স্বরে বল্‌লেন : "আমি আপনাকে এ দুমাসে যতটুকু জেনেছি—ও আমার মনে হয় নিতান্ত ভুল জানি নি—তাতে আমার মনে হয়েছে মসিয়ে রাকৃচি যে আমাদের মধ্যেকার এ আন্তরিক স্নেহ সম্বন্ধটি আপনি একদিনে ছিন্ন ক'রে দিতে পারবেন না।···তবু কি জানেন মসিয়ে রাকৃচি ? নীতি সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক

ধারণার শক্তি যে কত প্রবল তা আমার জীবনে আমি এতবার ঠেকে শিখেছি যে আর ভরসা হয় না…"

বলতে বলতে অশ্রু-আভাসে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এল।

পল্লব বলল: "অনর্থক আপনি এতটা বিচলিত হচ্ছেন মাদাম রিশার—"

মাদাম রিশার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ক'রে অপেক্ষাকৃত সহজ সুরে বললেন: "এ-সব কথা বলতে আমার যে বাধা বোধ না হ'তেই পারে না এ কথা সম্ভবতঃ আপনি কল্পনা করতে পারবেন। তাই আশা করি আমার আজ এতটা বিচলিত হবার জন্ত আমাকে ক্ষমা করবেন।…হয় ত বলবেন যে আমরা—করাসীজাতি—একটু বেশি উচ্ছ্বাসপ্রবণ। এ কথা অনেকেই ব'লে থাকে। জানি না কথাটা সত্যি কি না। কিন্তু এ কথা সত্যি হোক্ বা না হোক্ আশা করি আপনি এ ভুলটা আজ ক'রে বসবেন না যে আমার আজকের আবেগটা একটা নিতান্ত সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র। আমি প্রথম কয়েকদিনের পর থেকেই সব কথা আপনাকে খুলে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মসিয়ে রিশারের যুক্তিতর্ক ও নিজের আশঙ্কা আমাকে এতদিন নিরস্ত ক'রে রেখেছিল। তবে এ হয়ে পড়েছিল আমার এক উভয় সঙ্কট। না বললেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না, আবার বললেও আপনার ঘৃণা কুড়িয়ে আসতে হচ্ছিল। তাই আজ আমি যদি আপনাকে ইচ্ছে করেই এ ব্যথা দিয়ে থাকি তবে এই ভেবে আমাকে মার্জনা করবেন যে সে ব্যথা আপনাকে দেবার আগে আমাকে অন্ততঃ তার চতুর্গুণ ব্যথা পেতে হ'য়েছে।"

এবার পল্লব একটু আবেগের মাথায়ই ব'লে উঠল: "আমি আপনাকে মার্জনা করব কিসের জন্তে মাদাম রিশার? কোন্ স্পর্দ্ধায়ই বা আমি আপনার জীবনের ইতিহাস না জেনে নিজেকে আপনার বিচারাসনে বসাতে যাব? আমাকে কি এতই ক্ষুদ্র পেলেন?"

মাদাম রিশার বললেন: "এর সঙ্গে ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্তর সম্পর্ক নেই মসিয়ে বাকচি। আমরা যখন ফ্রান্সে Lyonএ থাকতাম তখন মসিয়ে রিশারের যে দুচারজন বন্ধুকে আমার ভাল লাগত তাদের আমি আমার স্বীয় পরিচয় দিয়েছিলাম। তারা কেউই নির্দ্দোষ ছিল না। অথচ তাদের মধ্যে অধিকাংশই আমার আচরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত রূঢ় রায়ই দিয়েছিল। তার প্রমাণ এই যে তার পর থেকে তারা সকলেই একে একে আমাদের বর্জ্জন করেছিল।"

পল্লব ব্যথা-নির্ব্বিক্ত কণ্ঠে বলল: "সকলেই?"

মাদাম রিশার বললেন: "সকলেই না হোক্ অধিকাংশ ত' বটেই। মসিয়ে রিশার তাই আমাকে ক্রমাগতই ব'লে থাকেন যে খুঁচিয়ে ব্যথা পাবার দরকার কি? কিন্তু আমার মনে হয় যে এ রকম চলতি সামাজিক মতামত সুবিধাজনক হ'তে পারে বটে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে কোনও বড় তৃপ্তিরসের আস্বাদ মিলতে পারে না। আমার যে ছোট ভাইটি যুদ্ধে মারা গেছে—যার মতন জ্ঞানী ও গভীর হৃদয় আমি জীবনে কম দেখেছি—" বলতে বলতে দু ফোঁটা অশ্রু টপ্ টপ্ ক'রে টেবিলের উপর পড়ল। তিনি লজ্জিত হ'য়ে তৎক্ষণাৎ আবেগের একটু রশ্মি সংযত ক'রে বলতে লাগলেন: "তার কাছে আমি অনেক শিখেছি মসিয়ে বাকচি। সে শুধু আমার ভাই ছিল না, একাধারে খেলার সাথী, বন্ধু ও অনেক বিষয়ে গুরু ছিল। সে ঠিক্ সাংসারিক ছেলে ছিল না, এমন কি অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্য রকম অনভিজ্ঞ ছিল। তবু তার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব সত্য দর্শনের ক্ষমতা ছিল। সাহিত্য, কাব্য ও চিন্তাজগতে তার রসবোধও ছিল যেমন সূক্ষ্ম, অনুসন্ধিৎসাও ছিল তেমনি গভীর। যাক্ কি বলছিলাম?—"

পল্লব বলল: "সামাজিক মতামত সম্বন্ধে।"

মাদাম রিশার বললেন: "হাঁ হাঁ। সে আমাকে মাঝে মাঝেই বলত যে নির্ব্বিচারে সামাজিক মতামত শিরোধার্য্য ক'রে নিলে হয়ত জীবনযাত্রার মোটের উপর সুখ-শান্তিই বেশি লাভ হ'য়ে থাকে; কিন্তু কোনও বড় উপলব্ধি পেতে গেলেই তার জন্তে অনেক লোভনীয় সুখ-শান্তি ছাড়তে হয়। তা ছাড়া যে বড় জিনিষ চায় ছোট জিনিষের লোভ তাকে বাঁধতেও পারে না। তাই আমি ভাবতাম যে যে বন্ধু আমার সত্য পরিচয় জানলে আমাকে ত্যাগ করবে তার বন্ধুত্বের দামই বা কতটুকু? অনেকটা এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়েই আমি Lyonএ আমার সে-সব বন্ধুদের বন্ধুত্বের গভীরতা পরখ করতে গিয়েছিলাম। কারণ কোনও বড় বন্ধুত্ব যে মিথ্যার আওতায় বিকশিত হ'তে পারে না এ আমি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি। তাই মসিয়ে রিশারকে যখন আমি ভালবাসি ও তাঁর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতন থাকাটা

অন্যায় মনে করি না তখন সমাজের চোখ-রাঙানির ভয়ে বিদেশে বিভূঁয়ে গিয়ে নিজেদের বিবাহিত ব'লে প্রচার করব কোন্ লজ্জায় ?"

পল্লব এ রকম তেজোগর্ভ কথা ইতিপূর্ব্বে কোনও নারীর মুখে শোনে নি, এমন কি মিসেস নর্টনের মুখেও নয়। তবু বহুদিনের সংস্কার বশে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে বাহির হ'ল দুটি কথা : "কিন্তু বিবাহ—"

মাদাম রিশার ঈষৎ উদ্দীপ্ত ভাবে বল্‌লেন : "আমি বুঝতে পারছি মসিয়ে বাক্‌চি কোথায় আপনার মনে খট্‌কা লাগ্‌ছে। বহুদিনের সংস্কার বশে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে বিবাহ না ক'রেও স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সত্য হ'য়ে ওঠার কোনও বাধাই থাকতে পারে না। কারণ আমাদের স্বতঃই মনে হয় যে যদি সে রকম কোনও বাধা না থাকত তাহ'লে বিবাহরূপ অনুষ্ঠানটির সৃষ্টি হ'ল কেন ? আমি অসাধারণ বুদ্ধিমতীও নই, উচ্চশিক্ষিতাও নই। কাজেই এ বিষয়ে সমাজহিতৈষী ও কূটতার্কিকদের নানান জটিল নীতি ও জটিল যুক্তিবাদের হয়ত ঠিক্ উত্তর দিতে পারব না। হয়ত তর্ক ক'রে আপনিই আমাকে হারিয়ে দিতে পারেন যে এ দুর্নীতি, মানুষের সব প্রবল বিশ্বাসই সমর্থনীয় নয় ইত্যাদি। কিন্তু তবু আমি বলব যে না, এ অন্যায় নয়। তবু আমি বলব যে সেই সম্বন্ধই সত্য সম্বন্ধ যেখানে ভালবাসা আছে।—মইলে হাজারই মন্ত্র উচ্চারণ কর, চার্চ্চে বিধাতাকে সাক্ষী মানো, আর রেজিষ্টারী কর—পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ কখনই নিছক দৈহিক সম্বন্ধের উপরে উঠ্‌তে পারে না।"

পল্লব বল্‌ল : "যদি কিছু মনে না করেন ত দু একটা কথা বলি।"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "বল্‌বেন বৈ কি। বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই চাই যে এ বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করেন। কেবল আবেগের মাথায় আমি কখনও কখনও আপনার কথায় বাধা দিলে অপরাধ নেবেন না মসিয়ে বাক্‌চি, এই আমার অনুরোধ।"

পল্লব কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌ল : "সে কি কথা মাদাম রিশার ? আমাকে আপনার এই অকপট স্বীকারোক্তির মূল্য দিতে কি এতই অক্ষম মনে করেন যে আমি এ হেন সময়ে আপনার দু একটা আদবকায়দার ভুলচুকে দোষ ধরব ?"

মাদাম রিশার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন : "এতক্ষণে আমি প্রথম একটু ভরসা পেলাম।...বাক্ আপনি কি বল্‌তে চাচ্ছিলেন বলুন।"

পল্লব বল্‌ল : "আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম শুধু এই কথাটি মাত্র যে আপনার কথাটা মেনে নিয়েও কি এ কথা বলা চলে না যে সমাজের শৃঙ্খলার জন্যে একটা সাধারণ নীতির বল না হ'লে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না ? অর্থাৎ কিনা, সমাজের মতন একটা অতিকায় জীবের সংরক্ষণের জন্যে কি অনেক সময়ে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ শান্তি বলাঞ্জলি দেওয়ার দরকার হয় না ?"

মাদাম রিশার চিন্তিত সুরে বল্‌লেন : "প্রশ্নটা জটিল মানি। কিন্তু আমার মনে হয় যে য়ুরোপ এ যাবৎ সমাজের সঙ্গে মানুষের বিরোধের ক্ষেত্রে বরাবর মানুষকেই বিসর্জ্জন দিয়ে মোটের ওপর অন্যায় ক'রেছে। আমার ভাইয়ের কাছে শুন্‌তাম আজকাল বড় বড় চিন্তাশীল লোক এ অবিচার ও একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আরম্ভ ক'রেছেন—শুধু লেখায় নয়, জীবনে ; যেমন বার্টরাণ্ড রাসেল, মরেল, টলষ্টয়, রোলাঁ প্রভৃতি। এঁরা state বা সমাজকেই সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করার বিরোধী। আমি এঁদের সব যুক্তিবাদের খবর রাখি না, বা রাখ্‌লেও হয়ত গুছিয়ে বল্‌তে পারব না। তবু আমার অন্তরাত্মা আমাকে অনুক্ষণ একটা কথা বলে যে এঁরা একটা মস্ত সত্যের দর্শন পেয়েছেন। সে সত্যটি এই যে মানুষ আজ অবধি বাষ্টির মহিমার যথেষ্ট মূল্য দিতে না পারার দরুণ সমাজ আজ বড় বেশি আত্মাচার ও অসারতায় ভ'রে উঠেছে। তার ফলে Lord Northcliffe ও Clemenceauই আজ কর্ম্মজগতে সর্ব্বেসর্ব্বা ও রাসেল ও রোলাঁ সাধারণের চোখে অবজ্ঞাত। কারণ ভেবে দেখুন, এটা সম্ভব হ'তে পেরেছে কি শুধু এই জন্যে নয় যে যারা বিবেক খুইয়ে সমাজের ও লোকমতের তোষামোদ করবে তারাই জগতে যশ-মান-অর্থের অধিকারী হবে ?...যাক্ কি কথায় কি প্রসঙ্গ এনে ফেল্‌লাম।...বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার মোটে জিজ্ঞাস্য ছিল শুধু এইটুকু মাত্র যে কূটতর্ক ছেড়ে দিলে কি বলা যায় না যে একটা দম্পতীর মধ্যে যথার্থ ও সত্যিকার ভালবাসা থাকলে তাতে সমাজের অমঙ্গল হ'তেই পারে না ? আমার সমগ্র চৈতন্য ও অভিজ্ঞতা যখন

আমাকে বল্‌ছে যে এ-সংসারে যা কিছু অল্প স্বল্প কাম্য আছে তার মূল উৎস প্রেম ভালবাসা, তখন কেমন ক'রে দুচারজন নীতিবাগীশের কথায় মেনে নেব বলুন যে ভালবাসাতে কোনও ক্ষেত্রে সত্য অহিত হ'তে পারে?"

শেষ কথাটি পল্লবের কাণে একে অশ্রুতপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুল্‌ল।...তবু তার যে বহুদিনের সংস্কার! সে বল্‌ল: "মাপ করবেন মাদাম রিশার!—দুএকজনের ক্ষেত্রে এতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়ত না হ'তেও পারে, কিন্তু যদি অনেকেই এইরকম দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে তাহ'লে কি সমাজে মহা বিশৃঙ্খল অবস্থা আস্‌বে না?"

মাদাম রিশার একটু করুণ হেসে বল্‌লেন; "তার অনেক দেরি আছে মসিয়ে বাকৃচি। আমি অহঙ্কার করবার জন্যে বল্‌ছি না—কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে সে রকম ভালবাসার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে বার বলে মানুষ তার জন্য সমাজের ঘৃণাও হাসিমুখে বহন করতে রাজি হয়।"

পল্লবের সমগ্র চিত্ত এ কথায় ভ'রে উঠ্‌ল।...শ্রদ্ধার পূর্ণতায় সে কথা কইতে পার্‌ল না।

মাদাম রিশার তাকে চিন্তাকুল দেখে একটু ঝুঁকে মৃদুস্বরে বল্‌লেন; "মসিয়ে বাকৃচি, যদি আমি আমার অসামাজিক ও দুর্নীতিপূর্ণ কথায় আপনার মনে আঘাত দিয়ে থাকি ত এই ভেবে আমাকে মাফ করবেন যে আমি কর্ত্তব্যবোধেই আপনাকে সব-কথা খুলে বলতে বাধ্য হ'য়েছি। তাছাড়া এ কথাও আপনি অবিশ্বাস করবেন না যে আমার এ বিশ্বাসের দরুন আমাকে অনেক বেদনা সইতে হ'য়েছে। এর জন্য শুধু যে আমাকে আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করতে হয়েছে তাই নয়, আমার জন্মভূমি ফরাসীদেশ ছেড়ে এখানে এসে একরকম নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনকেই বরণ ক'রে নিতে হ'য়েছে। কাজেই এ বিশ্বাস অনুসরণে চল্‌বার জন্যে আমাকে একরকম সমাজকেই পরিত্যাগ করতে হ'য়েছে। এবং এখন বুঝেছি যে এ দুঃখ যে কত দুর্ব্বহ তা সমাজকে গালাগালি দেবার সময় আমরা ঠিক্ উপলব্ধি করি না।"

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে এল। পল্লব স্পষ্ট হ'য়ে বল্‌ল: "কেন বার বার মিথ্যামিথ্যা আমার কাছে মিনতি জানিয়ে আমাকে অপরাধী করছেন মাদাম রিশার! আমি চুপ ক'রে ছিলাম এজন্য নয় যে আপনার কথায় আমি ব্যথা পেয়েছিলাম—"

মাদাম রিশারের কাণে এ কথা গেল না। তিনি আপন মনেই বলতে লাগ্‌লেন: "যে সমাজের প্রতি শাসনের মধ্য দিয়ে আমাদের শরীর মন অনুভূতি গ'ড়ে ওঠে সে সমাজ যতই দোষ করুক না কেন ও যতই নিষ্ঠুর হোক্ না কেন তা আমাদের হৃদয়ের অন্ততঃ বার আনা স্থান অধিকার ক'রে থাকে। এইজন্যেই সব রকম ভালবাসা ও কামনাবাসনা সার্থক হ'য়ে ওঠ্‌বার জন্যে সমাজের আনুকূল্য ও অনুমোদন এত দরকার।...কিন্তু তবু এ-সমাজকে ছাড়তেও আমার তত কষ্ট হয়নি মসিয়ে বাকৃচি, যত হয় এই চিন্তায় যে আমার এ ঝাঁপ-দেওয়ার জন্যে আমার পূর্ব্ব স্বামীর মেয়ে ইভেতের কাছেও হয়ত একদিন অপরাধীর মতন জবাবদিহি করতে হবে।...আমার ভয় হয়—আপনি না হয় আজ সহানুভূতি প্রকাশ করলেন—কিন্তু ইভেত কি করতে পারবে, যখন আমার এই আচরণের জন্যে তাকে পরে কমবেশি ভুগতে হবেই হবে? যখন লোকে তার মার নাম ক'রে আঙুল দেখাবে ও ঘৃণা প্রকাশ করবে তখন সে কি তা সইতে পারবে?...আমার সব বেদনার চেয়ে এই আশঙ্কাই আমাকে বেশি বেঁধে... আমি যে এ কথা ভেবে কত বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছি, কত আশা ভয়ের মালা গেঁথেছি...কত..."

এবার তাঁর নিরুদ্ধ অশ্রু আর বাধা মান্‌ল না। তিনি মুখটি নিজের টেবিলের উপর ন্যস্ত বাহুর মধ্যে রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

পল্লব ধীরে ধীরে উঠে তাঁর চেয়ারের কাছে গিয়ে তাঁর একখানি হাতের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌ল: "আগে থেকে কল্পনায় এ কষ্ট পেয়ে কি হবে মাদাম রিশার?...হয়ত...হয়ত...আপনি যা আশঙ্কা করছেন তা না হ'তেও পারে।...হয়ত ইভেত বড় হ'লে আপনার আচরণের জন্যে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই বোধ করতে পারে। কেন আপনি ধ'রে নিচ্ছেন যে সে আপনার আন্তরিকতা, ঋজুতা ও সত্য প্রেমের জন্য ত্যাগের দাম দিতে কখনই পারবে না, যখন সেটা পারা-না-পারার অনেকটাই নির্ভর করে বাল্যের শিক্ষার ওপর। তাই আমার আশা হয় যে আপনি আপনার

সাহস, গভীরতা ও আন্তরিকতার আদর্শে ইভেতকে অনেকটা মনের মতন ক'রেই গ'ড়ে তুলতে পারবেন। অন্ততঃ আগে থাকতে পারবেন না মনে ক'রে মন খারাপ ক'রে ফল কি বলুন ?"

মাদাম রিশার অনেকটা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে চোখ মুছে বল্লেন : "আপনার সান্ত্বনার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানবেন মসিয়ে বাকৃচি। কিন্তু কি জানেন ?···আমার নিঃসঙ্গত্বের পরিমাণটা আপনি ঠিক্ বুঝতে পারছেন না ব'লেই নিছক যুক্তির ওজনে বিচার করতে যাচ্ছেন আমার আশঙ্কার ভিত্তি কতখানি। কিন্তু আমার সামাজিক জীবনের নিঃসঙ্গতার কথাটা একটু ভেবে দেখলে হয়ত বুঝতে পারবেন কেন আমি আপনার বা ইভেতের সহানুভূতির এতটা কাঙাল হ'য়ে প'ড়েছি। যার অনেক উদ্বৃত্ত থাকে সে হেলায়ও অনেক সম্পৎ হারাতে পারে। কিন্তু আমি যে সমাজে-পরিত্যক্তা মসিয়ে বাকৃচি! বোধ হয় আমার কাছে আপনার সাহচর্য্য এত মূল্যবান্ হ'য়ে ওঠার সেটা একটা প্রধান কারণ। তাহ'লে বলুন দেখি, আপনার ক্ষেত্রেই যদি আমার আশঙ্কা আমাকে এতখানি বিচলিত করে তবে ইভেতের সম্বন্ধে এ আশঙ্কা আমার বুভুক্ষু হৃদয়কে কতখানি ব্যাকুল ক'রে তুলতে পারে ? আমার অবস্থা যে ঠিক্ সহজ অবস্থা নয় মসিয়ে বাকৃচি! তাই শুধু সহজ যুক্তি দিয়ে কি আমার দুর্ব্বলতার পরিমাপ করতে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত হবে ?"

অসীম কারুণ্যে পল্লবের মন ভ'রে গেল। তার মনে হ'ল সমাজের মধ্যে পাঁচজনের মেলামেশা, সাহচর্য্য ও আদান-প্রদানের আলোতে বুঝি ধারণা করাই যায় না যে নিঃসঙ্গতার অন্ধকার কি সূচিভেদ্য !···সঙ্গে সঙ্গে তার মনটি মাদাম রিশারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ভ'রে গেল। সে বল্ল : "মাদাম রিশার, যে ভালবাসার জন্যে আপনি এত সংযেছেন সে ভালবাসার জন্যে আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। ও শুধু তাই নয় এ সূত্রে আপনার এ সত্যপ্রিয় শুভ্র মনটির প্রত্যক্ষ পরশ পাওয়া যে আমার কাছে একটা কত বড় লাভ সেটাও আপনাকে যথাযথভাবে বলতে পারছি না। এতটা সরল সহজ আত্মপ্রকাশ—"

মাদাম রিশার এবার একটু কুণ্ঠিত স্বরে বাধা দিয়ে বল্লেন : "আপনি আমাকে বড় বেশি বাড়াচ্ছেন মসিয়ে বাকৃচি। আমি এসব কথা বলতে চেয়েছিলাম মূলতঃ নিজেরই স্বার্থের জন্যে। ব্যথাকে নিরন্তর পুষে রেখে মানুষ বাঁচতে পারে না।···তবে আপনাকে আজ এত কথা বলব ভাবি নি ও দরকারও মনে করি নি—"

পল্লব বাধা দিয়ে বল্ল : "আমাকে আপনার গোপন ব্যথার কথা খুলে বলার জন্য কেন বৃথা সঙ্কুচিত হচ্ছেন মাদাম রিশার ? আমাকে আজ যা বল্লেন তার জন্যে আপনাকে কখনও অনুতাপ করতে হবে না। আপনার ত্যাগ, আন্তরিকতা, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি অমেয় গুণাবলীর মহিমা কি আমি কিছুই বুঝি না মনে করেন ? না, আমি এতই তরলচিত্ত যে আজ আপনাকে আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য জানিয়ে কাল আপনার দুর্ব্বলতার জন্য আপনাকে মনে মনে অবজ্ঞা করব ?"

মাদাম রিশারের পাণ্ডুর মুখখানি এ কথায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্ল। তিনি বল্লেন : "আপনার সহানুভূতির জন্যে যে আমি আপনার কাছে কতদূর কৃতজ্ঞ "

পল্লব বিচলিত স্বরে বল্ল : "কৃতজ্ঞ হবার কথা—আমার, আপনার নয় মাদাম রিশার। কারণ আপনার আজকের কথাগুলি আমার জীবনের একটা মস্ত অভিজ্ঞতা।- কয়েকমাস আগে আমার এক বিশেষ বন্ধু এইরকম ধরণেরই আন্তরিক স্বীকারোক্তি ক'রে আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হ'য়েছিলেন। কারণ মানুষের আসল মনটির পরশ পাওয়া কি জীবনে সর্ব্বদাই একটা মস্ত লাভ নয় ? তিনি তাঁর একটা ছোট গল্পে বড় সুন্দর ব'লেছেন যে আমাদের সব চেয়ে বড় শিক্ষক—রাশি-রাশি পুঁথিপড়া বিদ্যে নয়, জীবনের অভিজ্ঞতার জলন্ত জ্ঞান।"

ব'লেই সে থেমে গেল। তার মনে হল যেন তার শেষ কথাগুলি একটু লেক্চারের মতন শোনাল। মাদাম রিশার বল্লেন : "থামবেন না মসিয়ে বাকৃচি, আপনি যা বলতে চান নিঃসঙ্কোচে ব'লে যেতে পারেন। মনে করবেন না আমি আপনার বন্ধুভাবে কথাগুলি অন্যভাবে নিতে পারি।"

পল্লব বল্ল : "বলবার আমার আর বিশেষ কিছু নেই মাদাম রিশার। তবে শোনবার ও জানবার ঢের আছে। তাই আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন তখন বলি···আপনার

সম্বন্ধে দুএকটি কথা জান্‌বার আমার ইচ্ছে হচ্ছে। তবে··· সে কৌতূহলটা···"

মাদাম রিশার বল্‌লেন: "আমি বুঝেছি আপনি কি জান্‌তে চাচ্ছেন। আমার পূর্ব্বজীবন ও আমার প্রথম স্বামীর কাহিনী জানার আপনার কৌতূহল হয়েছে, না?"

পল্লব আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল: "কেমন ক'রে অনুমান কর্‌লেন?"

মাদাম রিশার একটু হেসে বল্‌লেন: "নারীর সহজ অনুভূতি (intuition) ব'লে একটা বিশেষ ক্ষমতার কথা কখনও শোনেন নি কি? তবে এটা অবান্তর কথা।.. আপনার জিজ্ঞাস্য প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক্! আমার কাছে এত কথা শুনে বাকীটুকু জান্‌বার কৌতূহল হওয়া আপনার পক্ষে স্বাভাবিক ব'লেই বাকি। তাই এজন্য অত সঙ্কোচ বোধ করবার কোনও কারণ নেই। কারণ আমি যখন আমার জীবনের গোড়ার্দ্ধ আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে ব'লেছি, তখন প্রথমার্দ্ধ বল্‌বারই বা কি বাধা থাকতে পারে? তাছাড়া সেটা বোধ হয় উচিতও হবে। কারণ নইলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হবে না।···তবে শুনুন···"

ব'লে তিনি স্বেদসিক্ত কপোল রুমাল দিয়ে মুছে পল্লবের দিকে তাকালেন।···পল্লব তাঁর দৃষ্টির সাম্‌নে কেমন যেন একটা কুণ্ঠা বোধ ক'রে চোখ নীচু কর্‌ল। মাদাম রিশার দু তিনবার কি একটা কথা বল্‌তে গিয়েই যেন থেমে গেলেন। লজ্জায় তাঁর মুখখানি রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌ল।

পল্লব কুণ্ঠিতস্বরে বল্‌ল: "যদি আপনার অতীত জীবন-কাহিনী বল্‌তে বাধা থাকে তবে কাজ নেই মাদাম রিশার—আমি সে কাহিনী জান্‌তে চাইবার জন্য ক্ষমা চাইছি—"

মাদাম রিশার দৃঢ়স্বরে বল্‌লেন: "না না বাধা কিছু নেই, সে কি কথা? আপনাকে যে কাহিনী ব'লেছি তার চেয়ে এ কাহিনী বলা ঢের সোজা। তবু সামাজিক প্রথার প্রভাব মানুষের মন থেকে সহজে যেতে চায় না। পৃথিবীতে কোনও সভ্য সমাজেই বোধ হয় নারী সহজে তার নিজের দাম্পত্য জীবন নিয়ে তার কোনও পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে না। কাজেই এ বহুদিন-পুষ্ট সংস্কার ও-সব বিষয়ে মন খুলে কথা বল্‌তে বাধা না দিয়েই পারে না। তবে আজ যখন আমি আপনাকে সব কথা খুলে বল্‌তে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছি তখন গোড়া থেকেই আরম্ভ করব।"

(ক্রমশঃ)

ভারতের স্থাপত্য-শিল্প

শ্রীভূপতি চৌধুরী এম-এ

শিল্প জিনিষটা দেশের না জাতির, ঠিক কোন্‌টার সঙ্গে যে সে বিশেষভাবে জড়িত তা বলা একটু শক্ত হলেও এটুকু বেশ অসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে দেশ, জাতি ও ধর্ম্ম এই তিনটীরই সঙ্গে তার বেশ একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। এ কথার প্রমাণ দেশ-বিদেশের শিল্পকলার ইতিহাস, বিশেষ করে ভারতবর্ষের শিল্পের ইতিহাস খুলেই পাওয়া যাবে, যদিও এ জন্যে আমাদের Fergusson, Banister Fletcher, Havell প্রভৃতি বিদেশীদের কাছে হাত পাততে হবে। এঁদের এক দল 'ভারত-শিল্প'কে যতটা অনাদর ও অপর দল যতটা সমাদর করেছেন, তার জন্যে কিন্তু এক দলের উপর রুষ্ট ও অপর দলের উপর তুষ্ট হওয়া আমাদের সাজে না; কারণ, এঁরা সমালোচক বা দরদী যে ভাবেই ভারতীয় শিল্পকে দেখুন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। দু'দলই যে সমান অনুসন্ধিৎসা নিয়ে এজন্যে পরিশ্রম করেছেন, তা' এঁদের সংগৃহীত তথ্য ও টীকা পড়লেই বোঝা যায়; এবং এজন্যে উভয় দলই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু, যাক্ এ কথা। ওঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্প বলতে যে জিনিষ পাই, তার ইতিহাস অতীতের হিন্দুযুগ থেকে মুঘল যুগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তার পর আর-

তার কোনও ইতিহাস নেই এবং সত্য বলতে কি মুঘল যুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের ইতি হয়েছে; সুতরাং ইতিহাস আসবে কোথা থেকে? তার পর আরম্ভ হয়েছে ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব; এবং সেই সময় থেকে দেশে যে সমস্ত স্থাপত্য-নিদর্শন স্থাপিত হয়েছে, তার সঙ্গে আর যারই সম্বন্ধ থাক, ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে কিসের সঙ্গে যে তার সম্পর্ক আছে সে কথা বলার আগে, ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের কথাই ধরা যাক।

ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের আরম্ভ কবে থেকে এ সম্বন্ধে

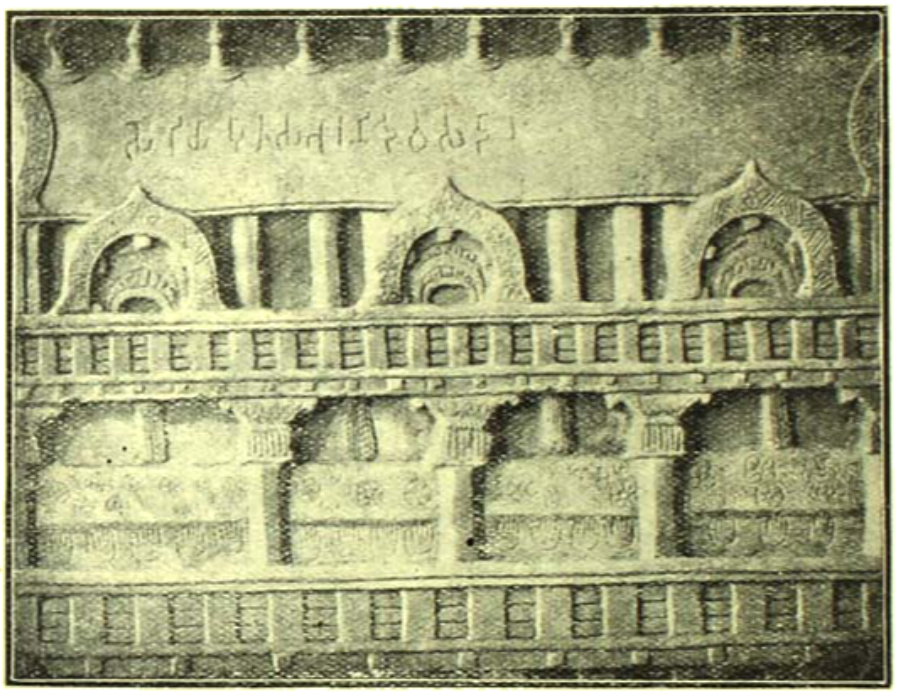

চতালা বাড়ীর নমুনা—(বারহুতের ভাস্কর্য্য থেকে)

ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং থাকবেও; কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিয়ে, যখন থেকে আমরা ভারত-স্থাপত্যের একটা ক্রমিক উন্নতির ইতিহাস পাই, সেই খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর কথা ধরা যেতে পারে। এই সময়ে ভারত-স্থাপত্যের যে কি পরিমাণ ছিল, তা সেই যুগের ভগ্নাবশেষ দেবমন্দিরাদি থেকে কিছু কিছু বোঝা যায়। এই সঙ্গে হিন্দু-শিল্প-শাস্ত্রের সূত্র অনুসরণ করলে সেকালের নগর বা গ্রাম-নির্ম্মাণ ও গৃহ নির্ম্মাণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হতে পারে। এইখানে একটা কথা উঠতে পারে যে, শিল্প-শাস্ত্র কত দিনের? এই সম্পর্কে মহামতি E. B. Havell যে কথাগুলি বলেছেন, তা উল্লেখযোগ্য—The Silpa-Sastras were possibly compiled about the fifth or sixth century A. D., but the traditions they embody are of far greater antiquity. এবং এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই শিল্পশাস্ত্রোক্ত বর্ণনা ও খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর সাঁচি বারহুতের খোদিত গৃহাদির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সম্পর্কে যদি শিল্পশাস্ত্রের সাহায্য পাওয়া যায়, তবে তা' বিশেষ দোষের হবে না বলে মনে হয়। শিল্পশাস্ত্রে আমরা প্রথম পাই স্থপতি, তার সহকারী সূত্রগ্রাহী প্রভৃতির জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ। তার পর ভূমি-পরীক্ষা-পদ্ধতির নির্দ্দেশ এবং ক্রমশঃ নগর, গ্রাম, গৃহ প্রভৃতির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে উপদেশ। পথের প্রশস্ততা, বাটীর উচ্চতা, বিস্তারতন প্রভৃতি গৃহের স্থান-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নানা তথ্য শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং সেই সকল তথ্য শুধু তখনকার দিনেই যে প্রযোজ্য ছিল তা নয়, এখনকার কালেও তার কিছু কিছু প্রয়োগ করা চলে।

এইবার সেকালের স্থাপত্যের কথা। সেকালে সাধারণ বাড়ীগুলি যে কি রকম ছিল, তার উদাহরণ আমরা পাই বারহুত, সাঁচি ও অমরাবতীর ভাস্কর্য্য থেকে; এবং তার মধ্যে সামান্য পর্ণকুটীর থেকে দু' তিন তলা বাটীর নমুনার পর্য্যন্ত অভাব নেই। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে—ভারতীয় স্থাপত্য বলতে আমরা যদি খালি কতকগুলি দেবমন্দির, চৈত্য বা বিহার বুঝে থাকি, তাহলে সেটা একটা মস্ত ভুল হবে। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, সাধারণ বাড়ীর নমুনা এই সকল পাষাণ ভাস্কর্য্য ছাড়া আর অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। ধ্বংসাবশেষে যে সকল স্থাপত্য-নিদর্শন আমরা দেখতে পাই, তা হচ্ছে প্রধানতঃ দেবমন্দিরাদির।

দেবমন্দির কথাটাকে এখানে আমি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। দেবমন্দির বলতে আমি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন যাবতীয় ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মমন্দির বুঝি; এবং এমন কি বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য এবং স্তূপাদিও আমি এই পর্য্যায়ভুক্ত করি। এইখানে একটা কথা বলা দরকার। জগতের সব জাতেরই স্থাপত্য দেবমন্দিরাদির সঙ্গে জড়িত। তার কারণ, সেকালে ধর্ম্ম ও দেবতাদেরই ছিল সর্ব্ব প্রথম ও শ্রেষ্ঠ স্থান। মানুষ তার যা কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিষ তাই সে দেবতার নামে উৎসর্গ করত এবং এ ব্যাপার বিশেষ করে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হত। ফলে তার শিল্পকলা যা-কিছু পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে, তা সবের উপর দেবতার নামে উৎসৃষ্ট হয়ে এসেছে এবং এইজন্যে স্থাপত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা আমরা পাই এই সকল দেবমন্দিরাদিতেই।

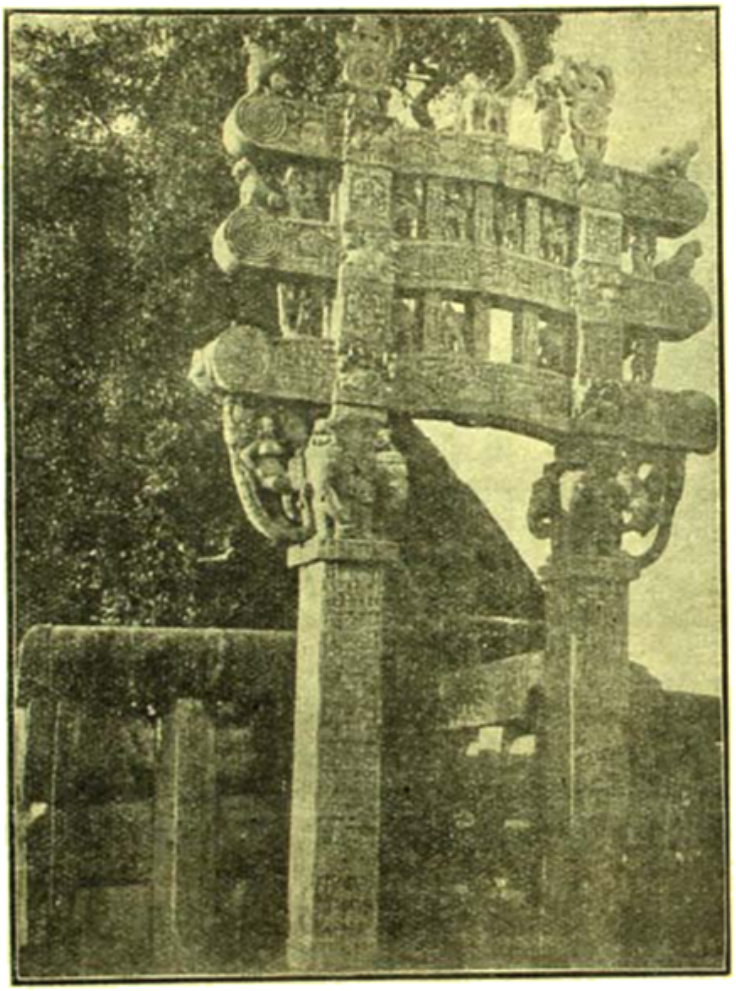

সাঁচিস্তূপের তোরণদ্বার

পুরাতন স্থাপত্য-নিদর্শনের মধ্যে প্রথমে বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শনের কথা ধরা যাক। বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যের কথায় আমি বৌদ্ধ স্থাপত্য-ধারার কথার উল্লেখ করছি না; কারণ, বৌদ্ধযুগের ও আদিম ভারতের স্থাপত্যের মূল ধারা অব্যাহত চলে এসেছে, পরিবর্ত্তন যা কিছু ঘটেছে তাতে মূল নীতি কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি। কাজেই বৌদ্ধ স্থাপত্য বা জৈন স্থাপত্য বলতে আমি বুঝি বৌদ্ধ বা জৈন নির্ম্মিত স্থাপত্য-নিদর্শন মাত্র, এবং এই পন্থা-বিভাগ ঐতিহাসিক যুগের স্থাপত্য-ধারার নয়। সুতরাং বৌদ্ধ স্থাপত্য-নিদর্শনে বৈদিক ভারতের রীতি-নীতির প্রভাব ধারাক্রমে চলে এসেছে। উদাহরণ-স্বরূপ সাঁচি স্তূপের কথা ধরা যাক। বৌদ্ধ যুগের এটা একটা খুব বড় স্থাপত্য-নিদর্শন। এই সাঁচি স্তূপের ভিত্তি-নক্সা (Plan) বৈদিক যুগের গ্রামের ক্ষুদ্রাকৃতি নক্সা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বৈদিক যুগে গ্রামের চতুর্দ্দিকে যেমন পথ থাকত, এই স্তূপের চারিদিকেও ঠিক তেমনই প্রদক্ষিণ-পথ আছে। এমন কি গ্রামের স্বস্তিক-চিহ্ন-অনুকৃত প্রবেশ-পথের আদর্শে এই সকল স্তূপের প্রবেশ-পথও রচিত। এই সাঁচি-স্তূপের তোরণ একটা উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-নিদর্শন। বৌদ্ধ-যুগের স্তূপ-স্থাপত্যের আরও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আমরা পাই—সারনাথ, বুদ্ধ-গয়া এবং অমরাবতীতে। কিন্তু এই স্তূপ-নির্ম্মাণেই বৌদ্ধ-স্থাপত্যের শেষ নয়। বৌদ্ধ-স্থাপত্যের পরিণতি বিহার ও চৈত্য নির্ম্মাণে। এ সম্বন্ধে বেশী উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; কারণ অজন্তা, ইলোরা, এলিফান্টা বা কালে গুহার স্থাপত্য-নিদর্শন বিশ্ববিখ্যাত। এই সকল স্থাপত্য-নিদর্শন হতে আমরা আরও কতকগুলি তথ্য পাই যে, কেমন ভাবে যুগে যুগে মূল ধারা অব্যাহত ভাবে সামান্য স্থানান্তর গ্রহণ করেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র শিব মন্দিরের চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ ও ষোড়শকোণাকৃতি গুহাদির অনুকরণে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জন্য উৎসৃষ্ট মন্দিরাদিতেও এই পর্য্যায়ক্রমে চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ ও ষোড়শ-

কোণাকৃতি স্তম্ভাদি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই নিয়ম সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হলেও এর ব্যতিক্রমও যে না পাওয়া যায় তা নয়। জৈন যুগের স্থাপত্য-নিদর্শনের মধ্যেও আমরা মধ্যে মধ্যে এই রীতি অনুসৃত হতে দেখতে পাই। বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রয়ীর উদ্দেশে মন্দিরাদি নির্মাণ করত, জৈনেরাও তেমনি প্রধানতঃ মন্দির নির্মাণ করত মেমিনাথ, পরেশনাথ, ঋষভনাথ প্রভৃতি ২৪ জন তীর্থঙ্করের উদ্দেশে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মূলতঃ অনেক সাদৃশ্য থাকায়, বুদ্ধ ও এই সকল তীর্থঙ্করদিগের পাওয়া ভার। সূক্ষ্ম কারুকার্যের ঐশ্বর্যে এই মন্দির দুটী অতুলনীয়। নক্সার পরিকল্পনায় খুব বিভিন্নতা না থাকলেও এত বিভিন্ন আকৃতির স্তম্ভাদি এর পূর্বে কোথাও দেখা যায় নি। এই সকল স্তম্ভাদির পাদপীঠ ও শিরঃশোভা নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অপূর্ব শিল্পকার্যে মণ্ডিত। জৈন-যুগের স্থাপত্যের আর এক বিশেষত্ব—ইহার বক্র-রেখাবলিখায় ও চক্রতোরণ বাতায়নে। বৌদ্ধ-স্থাপত্যের বাতায়ন বা আলোক-পথ, অধিকাংশই অশ্বত্থ-পত্রাকৃতি। এই পার্থক্য ঘটার একটা কারণ আছে। বৌদ্ধ স্থাপত্য অধিকাংশই

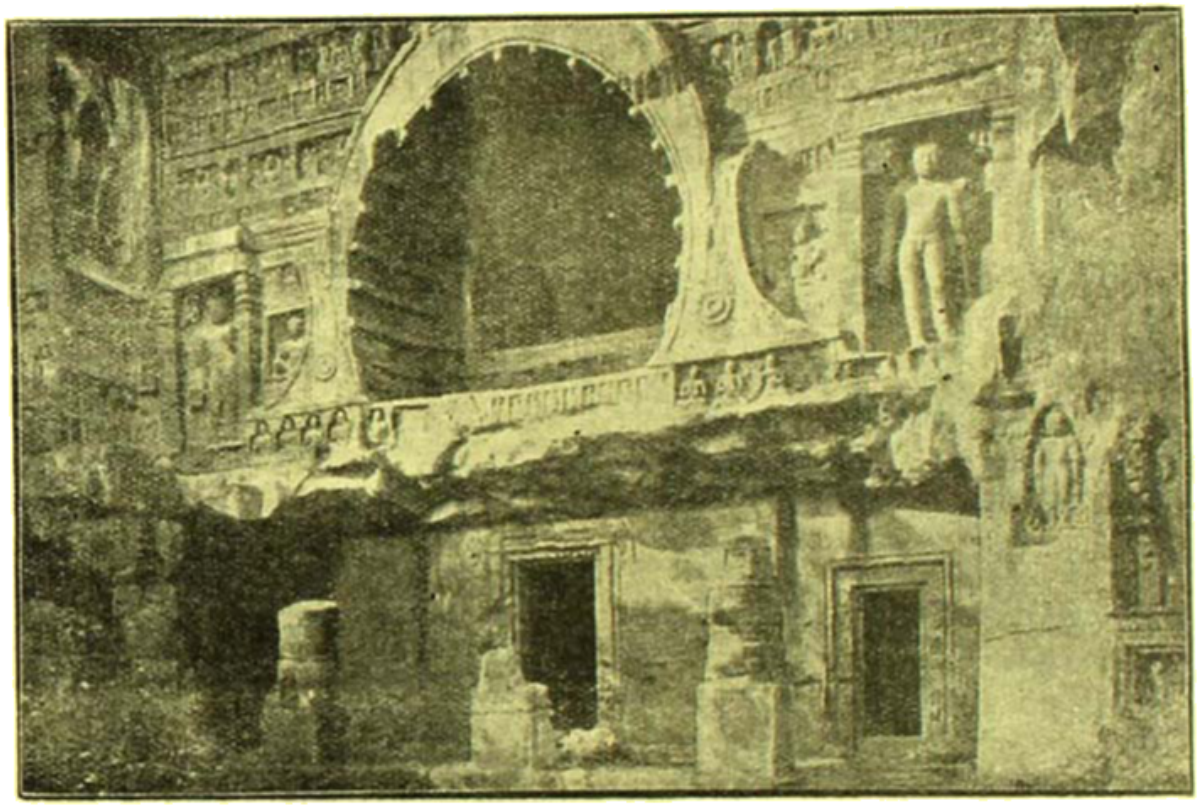

অলন্দার প্রবেশদ্বার

মূর্তির বসিবার ভঙ্গী প্রায় একই প্রকার। তবে প্রভেদও কিছু কিছু আছে। মূর্তির পশ্চাতে যক্ষযক্ষিনীদের মূর্তি ও তাদের অবস্থান দ্বারা এই প্রভেদ বোঝা যায়। এ প্রভেদ অবশ্য ভাস্কর্যের। স্থাপত্যেরও অবশ্য কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

জৈন স্থাপত্যের মুখ্য নিদর্শন আমরা পাই, আবু পাহাড়, পরেশনাথ, গান্ধি ও খাজুরাহোতে। এদের মধ্যে আবার গান্ধি ও আবু পাহাড়ের মন্দিরের কারুকার্যের তুলনা খুঁজে পর্বত-গুহায় হওয়ায়, অধিক আলোকের প্রয়োজন এবং এই জন্যই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এই সকল অশ্বত্থ-পত্রাকৃতি বাতায়ন। কিন্তু জৈন স্থাপত্য অধিকাংশই পর্বতচূড়ায় হওয়ায় আলো-ছায়ার দ্বন্দ্বমাত্রার জন্যই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির বাতায়ন ব্যবহার করা হয়েছে। এইবার বৌদ্ধ যুগের শিখরের কথা। বৌদ্ধ স্থাপত্য অধিকাংশই পর্বত-গুহায় হওয়ায় শিখরের বালাই নেই বল্লেও চলে। তবে বুদ্ধ-গয়ায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরের শিখর, জৈন

মন্দিরের শিখরেরই অনুরূপ। তবে বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ থাকায়, মনে হয়, এই মন্দির বৌদ্ধযুগে যে ভাবে গঠিত হয়েছিল, তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে এটী এই ভাবে জৈন স্থাপত্যের অনুসরণে নির্ম্মিত হয়েছিল।

এই প্রকার বক্ররেখাকৃতিযুক্ত শিখর উত্তর ভারতের অনেক হিন্দু-মন্দিরেই দেখতে পাওয়া যায়। কোণারকের সূর্য্য-মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, পুরীর জগন্নাথ-মন্দির বক্ররেখাকৃতিযুক্ত শিখর-শোভিত। এ ছাড়া আর এক প্রকার শিখরও হিন্দু স্থাপত্য-যুগের মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি খাঁজ-সোপানযুক্ত পিরামিড আকৃতির। এ ধরণের শিখরযুক্ত মন্দির দক্ষিণ ভারতের বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বযুক্ত মন্দিরগুলির জন্য হিন্দু স্থাপত্যের একটী বিভাগ আছে—সেটী হচ্ছে দ্রাবিড়ীয়। এই দ্রাবিড়ীয় বিভাগ থেকে আর একটী শাখার উদ্ভব হয়েছে; তার নাম চালুক্য-স্থাপত্য। এই চালুক্য-স্থাপত্যের উৎপত্তি দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য হতে হলেও, তার নিজের কয়েকটী বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই শ্রেণী-বিভাগ। চালুক্য-স্থাপত্যের সর্ব্বপ্রথম যে বৈশিষ্ট্যটী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটী হচ্ছে—এই পদ্ধতিতে নির্ম্মিত মন্দিরগুলি তিন-চার ফিট্ উচ্চ পাদপীঠের উপর নির্ম্মিত। তার পর চালুক্য-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত মন্দিরের শিখরের কথা। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ও দ্রাবিড়ীয় পদ্ধতির যুগপৎ প্রভাব এই চালুক্য-পদ্ধতিতে গঠিত মন্দিরের শিখরে দেখতে পাওয়া যায়। বক্ররেখাকৃতি ও খাঁজ-

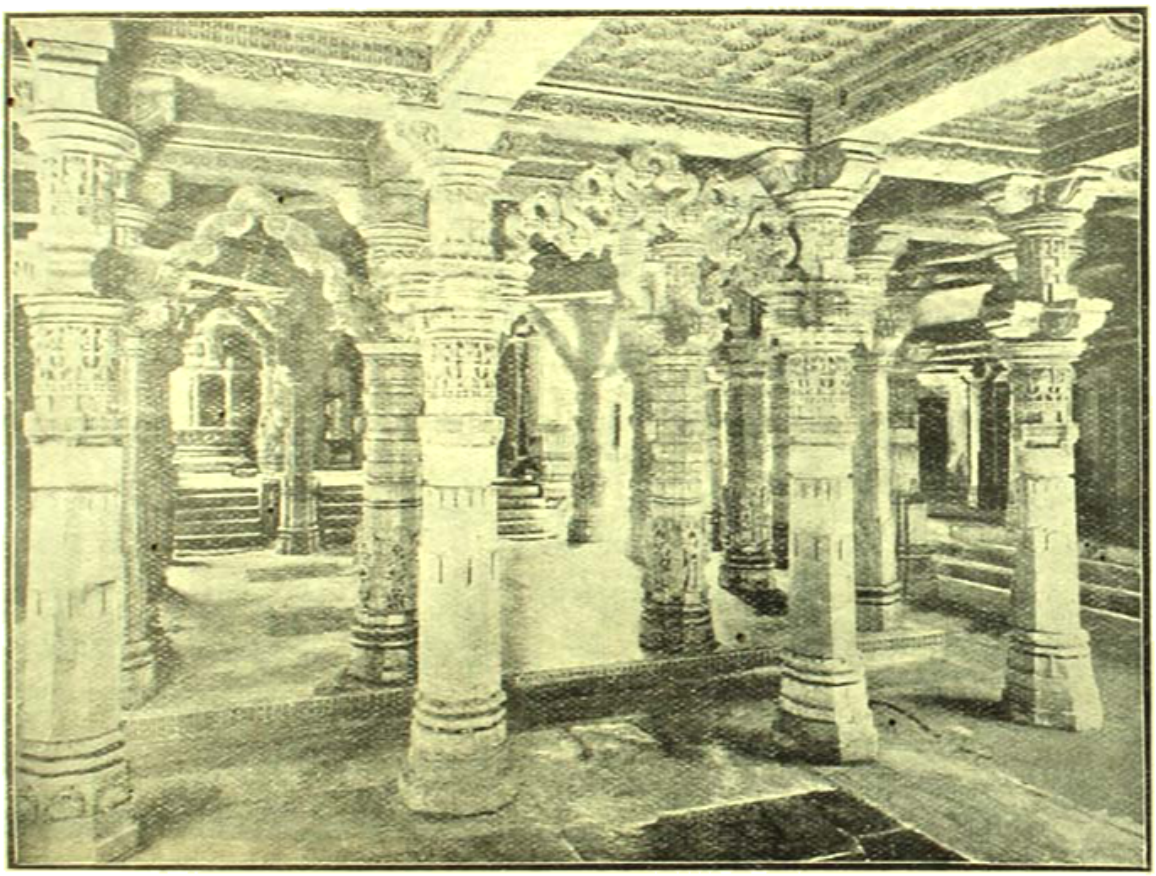

আবুপাহাড়ে তেজপাল মন্দিরের অভ্যন্তর

সোপানযুক্ত পিরামিডাকৃতি শিখরের সংমিশ্রণে এই চালুক্য শিখরের উদ্ভব। চালুক্য স্তম্ভাদির মধ্যেও এই হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ও দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের সংমিশ্রিত প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট। এই চালুক্য ও দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য দক্ষিণ ভারতের সম্পত্তি; কিন্তু এ কথা বুঝলে ভুল হবে যে, এ পদ্ধতি মাত্র দক্ষিণ ভারতের মধ্যে আবদ্ধ,—কারণ, উত্তর ভারতেও এই পদ্ধতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তবে দ্রাবিড়ীয় পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের কথা

বলতে হলে—দক্ষিণ ভারতের মহাবলীপুরম্, তাঞ্জোর, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি স্থানের নাম কর্ত্তে হবে। চালুক্য পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা পাই—মহীশূর রাজ্যে চালবিদ্ধ এবং বেলুর মন্দিরে। এই সকল পদ্ধতি যে উত্তর-ভারতেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, তার বিশেষ রকম প্রমাণ আমরা পাই বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি স্থানের মন্দিরাদিতে। স্থানে স্থানে অবশ্য খুঁটীনাটীর যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও একটী পদ্ধতি-বিশেষের ছাপ এদের মধ্যে বেশ পূর্ণমাত্রাতেই পরিস্ফুট।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থাপত্যের কথা শুধু মন্দির নিয়েই চলেছে। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, স্থাপত্যের নিদর্শন শুধু মন্দিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৌদ্ধ-যুগে অবশ্য গুহার স্থাপত্য ছাড়া বড় বেশী কিছু পাওয়া যায় না; কিন্তু তার পর থেকে স্থাপত্য-নিপুণতা সাধারণ কার্য্যেও স্থান পেয়েছে এবং তার সীমা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ গুহার স্থাপত্য ও মন্দিরাদি এবং সাধারণ কার্য্যের স্থাপত্য দুই-ই সমান ভাবে অগ্রসর হয়েছে। দিল্লী, চিতোর প্রভৃতি স্থানের কীর্ত্তিস্তম্ভ, বেনারসের স্নানের ঘাট, রাজপুতানার রাজপ্রাসাদ, প্রমোদাগার প্রভৃতি এর প্রমাণ।

এই সমস্ত তথ্য থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বৌদ্ধ, জৈন, ও হিন্দু স্থাপত্যের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে ভারত-স্থাপত্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। এমন সময় ভারতে মুসলমান অধিকারের সূত্রপাত হল।

ভারতে মুসলমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-স্থাপত্যের এক মহা যুগান্তর আরম্ভ হল। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ স্থাপত্যের ভিত্তির উপর ভারত স্থাপত্যের এক সুরম্য হর্ম্ম্য গড়ে উঠল। বৈদেশিক সারাসেনিক পদ্ধতি ভারতে নব রূপ গ্রহণ করল। দিল্লীর কুতুবমিনার, আজমীর মস্‌জিদ, সাসারামে শের শাহের সমাধি-মন্দির এই সব স্থাপত্য-নিদর্শনের মধ্যে বেশ একটা সংমিশ্রণের ক্রমবিকাশ দেখা যায়। তোরণ, গুম্বজ, খিলান, দরজা সবেতেই একটা নূতনত্ব; অথচ তাহাতে ভারতীয়ত্বটুকু পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট। সারাসেনিক মাত্রা-বিভাগটুকুকে ভারতীয় স্থাপত্যের ছাঁচে ফেলে এই নব পদ্ধতি গঠিত হয়ে উঠল।

পাঠান যুগে এই যে নব পদ্ধতির অভ্যুদয়, মুঘল যুগে তার পরিণতি। এবং এই পরিণতি যে কত সূক্ষ্ম, কত

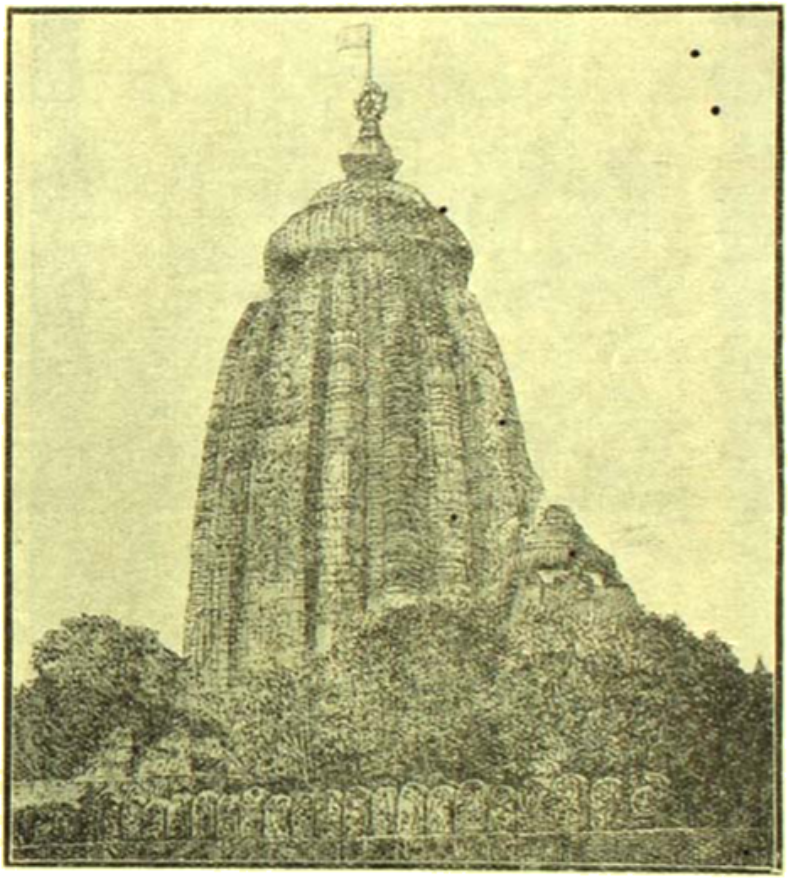

পুরীর জগন্নাথ মন্দির—হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-স্থাপত্যের নিদর্শন

উচ্চতম জ্ঞানের পরিচায়ক, তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই বল্লেই হয়। মাত্র তাজমহলের কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট। মুঘল যুগের এই যে এত বড় একটী স্থাপত্য-নিদর্শন—ইহা জগতের অন্যতম আশ্চর্য্য। এটীর সঙ্গে ভারতের স্থাপত্যের যে কতখানি সম্পর্ক, তা বলতে হলে প্রথমে বলতে হয় তাজ ও তাজ-উদ্যানের ভিত্তি নক্সার কথা। এই নক্সাটী বৈদিক ভারতের গ্রাম বা নগর ভিত্তির নক্সার অনুরূপ। তার পর গম্বুজের সমান পদ্ম।

সেটাও অবশ্যই স্বাভাবিক নয়। এটার ছেলেবেলা ও বৌদ্ধ-যুগের সৌধ-কাঠামোর ছেলেবেলার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্য থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারত-স্থাপত্য কেমন ধারে ধারে তবে নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রেখে অন্য ধারের নানা অংশ গ্রহণ করে নিজের

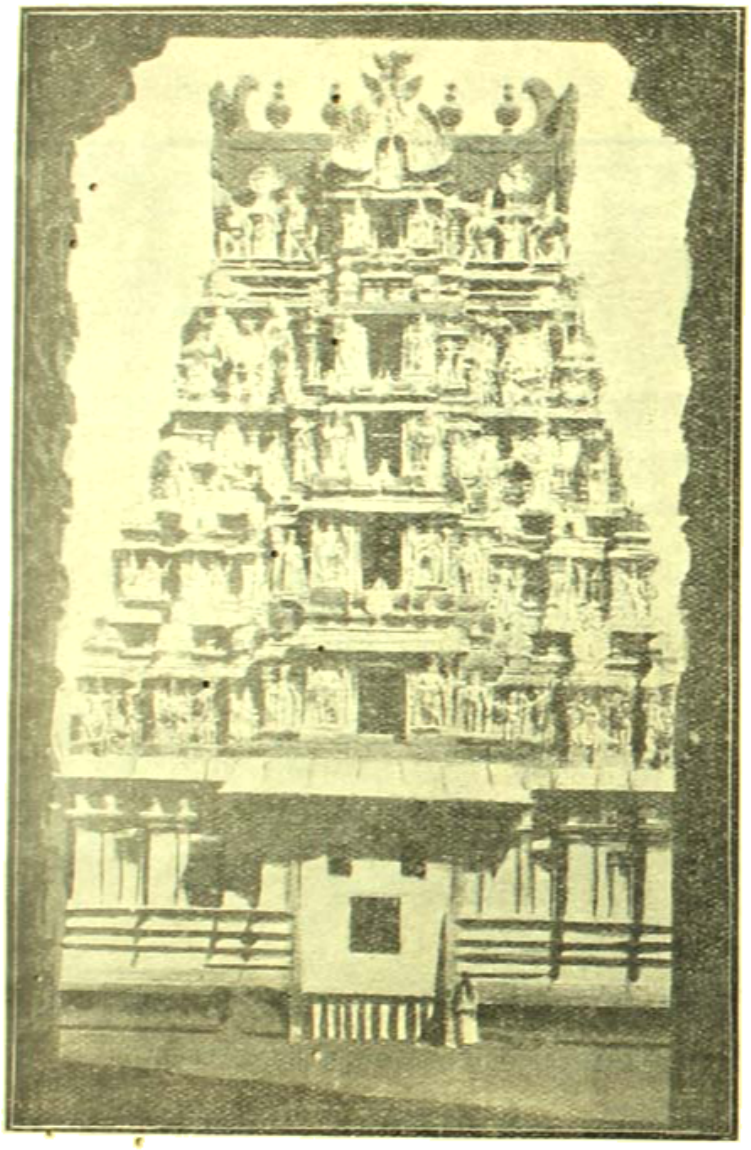

মাদুরার, দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য অনুসারে নির্ম্মিত মন্দির

পরিপুষ্টি সাধন করেছে। এই নব পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি সৌন্দর্য্যে ও কারুকার্য্যে বিশ্ববিখ্যাত।

ভারত-স্থাপত্যের এই পদ্ধতি শুধু যে দিল্লী আগ্রাতেই আবদ্ধ ছিল তা নয়, এ পদ্ধতি উত্তর ভারতের এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে গৌড় মালদহে তার কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ চিহ্নাদি পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের মহীশূর হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম্মমন্দির, রাজপ্রাসাদ, প্রমোদাগার, উদ্যান, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি সকল প্রকার স্থাপত্য কার্য্যেই এই পদ্ধতি অনুসৃত হতে লাগল। তার পর মুঘল যুগ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-স্থাপত্যের অবনতি ঘটতে আরম্ভ হয়। শুধু অবনতি নয়—তার মৃত্যু হল বলাই বোধ করি সঙ্গত হবে। ইংরাজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-স্থাপত্য-শিল্পের স্রোত একেবারে রুদ্ধ ও শুষ্ক হয়ে গেল। বিদেশীয় ও বিজাতীয় স্থাপত্য ভারতের এই সব অপূর্ব্ব স্থাপত্য-নিদর্শনের পাশে এসে তাল ঠুকে বসল; ফলে হল এই,—ভারত স্থাপত্য-শিল্পের সঙ্গে এই নবাগত শিল্পের মিলন হল না। মুসলমান শাসনকালে ইরাণ-সৈনিক পদ্ধতি যেমন ভারতে এসে রূপান্তর ঘটিয়ে ভারত-শিল্পের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল, ইংরাজ রাজত্বকালে বিদেশীয় গ্রীক, রোমান, গথিক স্থাপত্য-পদ্ধতি ঠিক তেমন ভাবে কোনো রকমেই মিলে মিশে যেতে পারে নি। ভারতীয় পাগড়ী ধুতি চাদরের মধ্যে ইয়োরোপীয় হ্যাট কোট প্যাণ্ট বড়ই বেমানান ভাবে উঁচু হয়ে বসে আছে। তাদের অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয়—এর কারণ কি? আসলে ত এই সকল গ্রীসীয় বা রোমীয় পদ্ধতি এমন বিসদৃশ নয়। বরং ছন্দমাত্রা ও সৌন্দর্য্য হিসাবে আসল জিনিষ জগতের এক অপরূপ সামগ্রী। তাহলে অনুকরণের মধ্যে এমন কি ত্রুটী আছে, যাতে সেই জিনিষই অশোভন মনে হয়?

গ্রীসে ও রোমে যে ছন্দমাত্রার প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হ'ত, এখনকার যুগে সেই ছন্দমাত্রা স্বীকার করে চলা নানা কারণে সম্ভব নয়। ফলে ছন্দমাত্রার গুণে সেকালের প্রাসাদাদিতে যে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি হয়েছিল এ

যুগে সেই ছন্দমাত্রার অভাবে সে গুণের অভাব ঘটেছে। এবং এই অবনতি ঘটেছে বিশেষ করে আমাদের দেশে।

যুগধর্ম্ম একটা মস্ত বড় জিনিষ। অতীত যদি বর্ত্তমানে এসে স্থান পেতে চায়, তবে তার সেই পুরাতন বেশে আর চলবে না; তাকে বর্ত্তমানের উপযোগী বেশই গ্রহণ কর্ত্তে হবে। তাই সেই গ্রীসিয় ও রোমিয় যুগে যে ভাবে জিনিষগুলি সুপ্রযুক্ত হত, এখন আর সেই জিনিষগুলি স্থানাভাব ও জীবন যাপনের বিভিন্ন ধারার জন্য ঠিক সেই ভাবে প্রযুক্ত না হওয়ায়, স্থাপত্য-শিল্পের অখণ্ড সৌন্দর্য্য অনেকটা হ্রাস পেয়ে যায়। সেইজন্য সেই গ্রীসিয় ও রোমিয় যুগের জিনিষগুলিকে, তাদের আত্মার বদল না ঘটিয়ে, মাত্র সামান্য বেশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে বর্ত্তমানের উপযোগী করে নেবার জন্য ইয়োরোপে বিশেষ রকম চেষ্টা হয়; এবং তারই ফলে স্থাপত্য-শিল্পের অবনতি সেখানে বড় ঘটে না। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা ভিন্ন রকম। এখানে Architect বলে বিশেষ কিছু ছিল না। বিশেষ করে কিছু ছিল না এই জন্যে বলছি যে, যা দু চার জন আছেন, তাঁদের সংখ্যা খুব সামান্য—নগণ্য মাত্র। এবং তাঁরাও অধিকাংশেই বিদেশী বা বিদেশী প্রায় শিক্ষিত। তাঁরা ভারতে আছেন, কিন্তু ভারত-স্থাপত্যের কথা বড় বেশী জানেন না। তা ছাড়া, আমাদের দেশে সরকারী ব্যবস্থা অনুসারে স্থাপত্য-বিদ্যা যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তার মধ্যে আর যাই থাক, ভারত-স্থাপত্য-শিল্পের স্থান নেই। আমাদের দেশের ছাত্রেরা স্থাপত্য-বিদ্যায় শিক্ষিত হচ্ছেন; কিন্তু তাঁরা নিজের দেশের স্থাপত্যের কথা কিছুই জানেন না। এ ব্যবস্থা একটু অদ্ভুত হলেও সম্ভব হয়েছে শুধু আমাদের দেশ বলে।

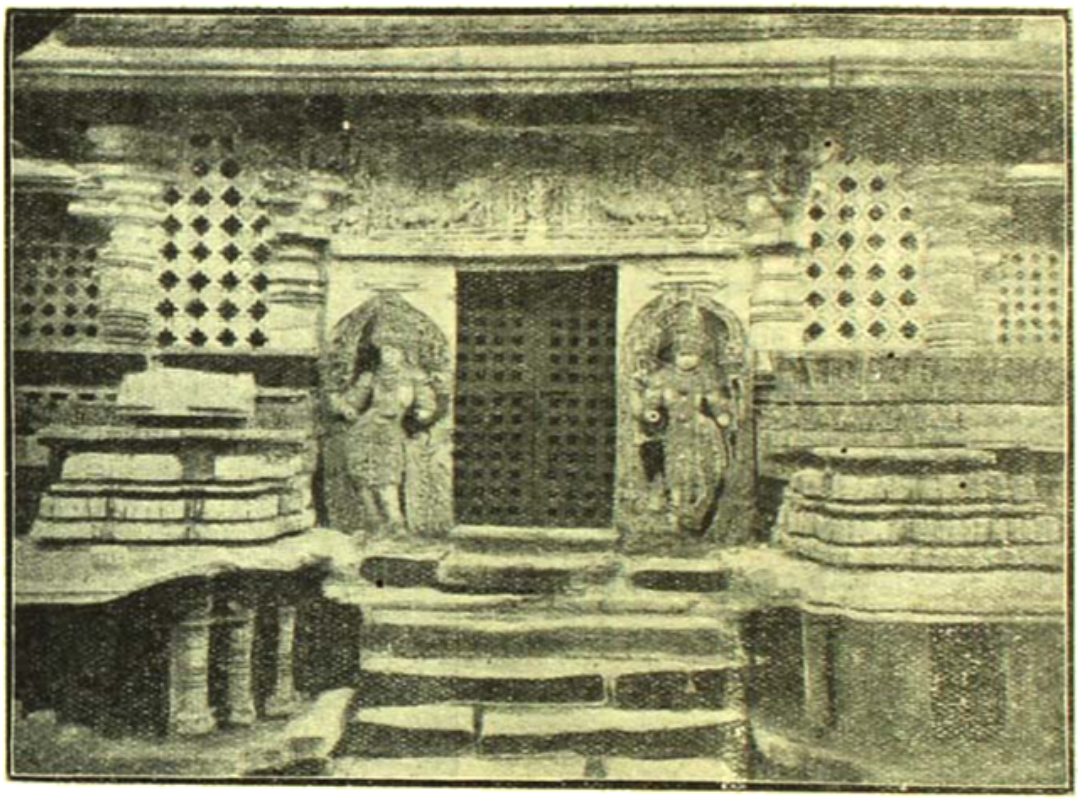

হালবিদের মন্দিরের প্রবেশদ্বার। চালুক্য স্থাপত্য নিদর্শন

তার পর একটা কথা। স্থাপত্য-শিল্প জিনিষটার এখন আদৌ প্রয়োজন আছে কি? যখন সময় ছিল প্রচুর তখন এ প্রশ্ন উঠতেই পারত না; কিন্তু বর্ত্তমানের এই মোটর, ট্রেণ ইলেক্‌ট্রিকের যুগে চাই তড়িঘড়ি কাজ,—অলঙ্কারের কোনো প্রয়োজন নেই। এখন চাই অলঙ্কারবিহীন বিশ ত্রিশ তোলা বাড়ী। আমেরিকার সাদাসিধা বিশ ত্রিশ তোলা বাড়ীগুলি এর সাক্ষ্য দেবে। তবে এ কথা সত্য যে বণিক সভ্যতার চাপে মানুষ সমস্তকে যতই কর্ত্তব্যগত করার

চেষ্টা করুক না, সে তার সৌন্দর্য্যস্পৃহা কোনো দিন হারাবে না। এই আশায় এ কথা বলা যেতে পারে যে, স্থাপত্য-শিল্প জিনিষটাও একেবারে লোপ পাবে না।

এখন কথা হচ্ছে—আমাদের দেশে ভারতীয় স্থাপত্য-পদ্ধতিতে বাড়ী হয় না কেন? তার প্রধান কারণ হচ্ছে জ্ঞানের অভাব। তার উপর আমাদের চোখের সামনে বাড়ী করা হয়েছে বিজাতীয় স্থাপত্য-পদ্ধতির আদর্শ; ও কাণে শুনছি খালি তারই স্তুতিবাদ। ফলে তার অনুকরণ কর্ত্তে গিয়ে আমরা শিব গড়তে বানর গড়ে বসছি। তার পর প্রতীচ্যের সংস্পর্শে এসে আমরা, সময়-সাপেক্ষ ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের অনুসরণ না করে, অপেক্ষাকৃত অল্প-সময়-সাপেক্ষ অথচ অলঙ্কার-পূর্ণ বাড়ী নির্ম্মাণ করাচ্ছি। এবং এছাড়া আর একটা কারণ আছে। Doric, Ionic, Composite, Corinthian প্রভৃতি ছাঁদের স্তম্ভশীর্ষাদির নমুনা পাওয়া অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। অনেকটা এইসব কারণে ভারতীয় স্থাপত্য-পদ্ধতিতে বাড়ী তৈরি করানো হয় না। তবে এও ঠিক যে বর্ত্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভারত-স্থাপত্য-পদ্ধতিতে বাড়ী তৈরী করানো যেতে পারে; এবং তা সামান্য পরিশ্রম-সাধ্য হলেও খুব শ্রেষ্ঠ শ্রমসাধ্য নয়। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাহুল্যযুক্ত অলঙ্কার-পূর্ণ ও সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য-মণ্ডিত ভারতীয় স্থাপত্য-নিদর্শনগুলির আত্মার পরিবর্ত্তন না ঘটিয়ে তাকে কিঞ্চিৎ মাত্রায় বাহুল্য-মুক্ত করে দিলে ব্যাপার অনেকটা সোজা হয়ে পড়ে।

এইবার আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা। সে যুগে পাথর ছিল সস্তা; কাজেই ভারত-শিল্পের কাজও তখন হত পাথর দিয়ে। কিন্তু এ যুগে পাথর তত সুলভ নয়, এবং শ্রমিকও বিশেষ সুপ্রাপ্য নয়। এ সমস্যা সমাধান খুব শক্ত নয়। পাথরের পরিবর্ত্তে Re-inforced Concrete দিয়ে এ কাজ চলতে পারে। এই সম্পর্কে, এ কার্য্যে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁর মতের যথেষ্ট মূল্য আছে, মনে কর্ত্তে হবে। বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির বাড়ীগুলি যে পূর্ত্তবিদের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হয়েছিল, তিনি যে এ কার্য্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। ১৯২৫ সালে যুক্তপ্রদেশের পূর্ত্তবিদগণের সম্মিলনের সভাপতি রূপে, হিন্দু ইউনিভারসিটি বাড়ীগুলির তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত অওলাপ্রসাদ তাঁর অভিভাষণে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

I may point out in this connection, the great stability of re-inforced concrete and

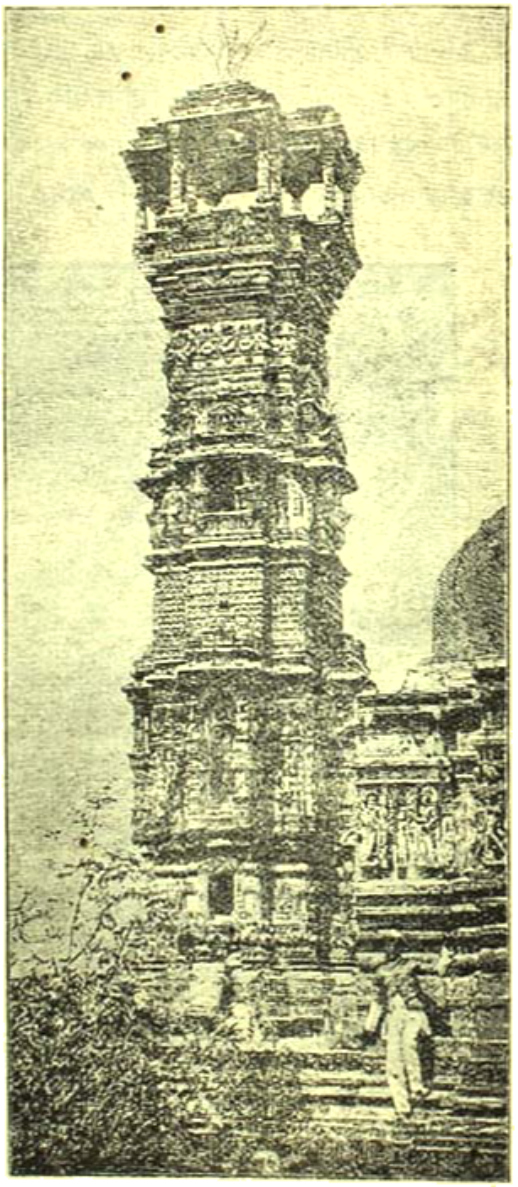

চিতোরে জৈন স্তম্ভ। [খুব সম্ভবতঃ এটী জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। এটী উচ্চতায় মাত্র ৬৪ ফিট্।]

brick work for Indian architecture...The cutting shaping and polishing of stone which are required in this style of architecture, are now so costly, that it can only be resorted

to by princes, priests and patrecians; while the softer varieties of stone which can be worked more cheaply, rapidly deteriorate by the action of the acids in air. This actually happened···and I therefore decided to adopt reinforced brick and conercte work for practically all decorative and architectural work such as railings, screens, domes, minarets, sikharas, lintels, brackets, beams, cornices and roofs.

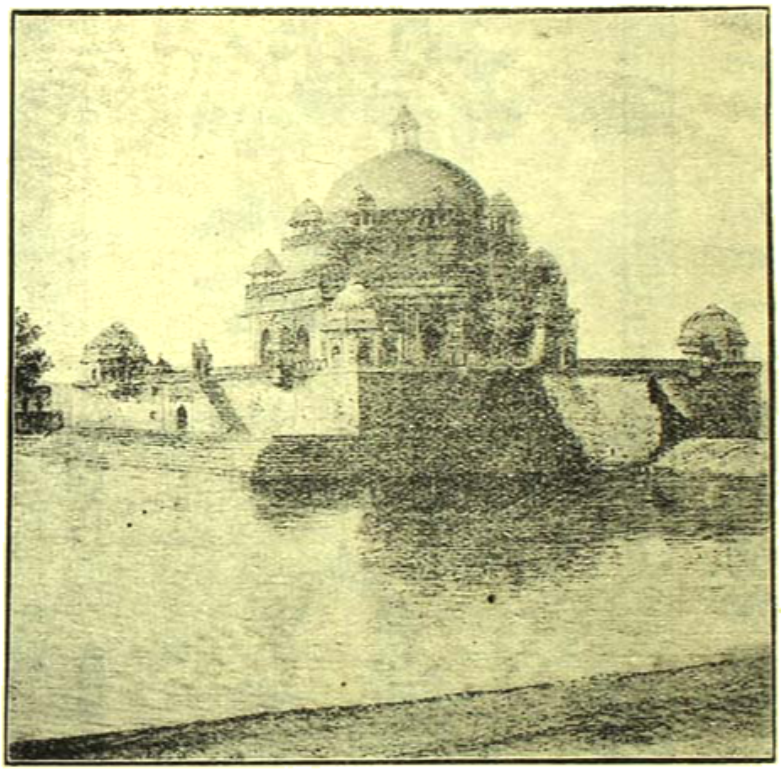

সেরসাহের সমাধি-মন্দির—সাসারাম

এই সম্পর্কে আর একজন পূর্ত্তবিদের নামও উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও ভারতীয় স্থাপত্য পদ্ধতি-অনুসারে অনেক বাড়ী নির্ম্মিত হয়েছে। এই সম্পর্কে তিনি Modern Review ও 'ভারতবর্ষে' অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মত এই যে আজকালকার পদ্ধতিহীন স্থাপত্য-শিল্পের সাহায্যে ছন্দ-মাত্রাহীন অলঙ্কারপূর্ণ বাড়ীগুলি নির্ম্মাণ করতে যত টাকা লাগে, ভারতীয় স্থাপত্য-পদ্ধতি অনুসারে বাড়ী নির্ম্মাণ করতে তা অপেক্ষা অধিক ব্যয় ত হবেই না,—অধিকন্তু বাড়ীগুলিও দেখতে যথেষ্ট সুদৃশ্য হবে। এই সম্পর্কে অধুনা স্বদেশ-প্রত্যাগত জনৈক ইংরাজ স্থপতি, তাঁর পনের বৎসর কালব্যাপী ভারতবর্ষ-বাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে যে কথা লিখেছেন, তাও এই মতবাদেরই পোষকতা করে। তিনি লিখছেন—By far the best craftsmanship and the only architecture showing real development in any of the vernacular styles, I found in works away from official centres and the influence of Government control. I made enquiries as to the cost of such work and found it less than we should have paid for the same thing. তার পর বর্ত্তমানে ভারত-স্থাপত্য-পদ্ধতিতে বাড়ী নির্ম্মাণ করা সম্ভব কি না, এই সম্পর্কেও তাঁর মতটী উল্লেখ-যোগ্য—I see no inconsistency between Indian architecture and the buildings which are in demand there at the present time.

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের অনুসরণ করে ভারতীয় স্থাপত্য পদ্ধতিতে বাড়ী নির্ম্মাণ করালে সেগুলি যে কত সুশোভন হয়, তার প্রমাণ কলিকাতার বসু-বিজ্ঞান-মন্দির, শ্রীধর্ম্মরাজিকা বৌদ্ধ-বিহার, শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের বাস ভবন, তাঁর থিয়েটার, প্রভৃতি। কলিকাতায় এই ভাবে ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্ম্মিত বাটীর সংখ্যা অবশ্য খুব কম। তার আরও দু একটী কারণ আছে।

স্থাপত্য-শিল্প জিনিষটী ধনীদের জন্য। কিন্তু কলকাতায় ধনবান যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই হয় ইয়োরোপীয় নয় ত মাড়োয়ারী। এ স্থানে ইয়োরোপীয়দের কথা ছেড়ে দিতে হবে; কারণ, তাঁরা তাঁদের দেশের স্থাপত্য-পদ্ধতি ছেড়ে যে ভারতীয় স্থাপত্য-পদ্ধতি অনুকরণ কর্ব্বেন, এ আশা বৃথা। তারপর মাড়োয়ারী মহলের কথা। এ কথা শুনতে অবশ্য

খুব খারাপ হলেও অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই যে, তাঁদের অর্থ থাকলেও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান কম। তার পর আমাদের রুচির কথা। রুচি যে আমাদের যথেষ্ট বিকৃত হয়ে গেছে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। ফলে আমরা আমাদের দেশের অনেক কিছুই জানি না; শুধু জানি না নয়, জানি না বলে গৌরব বোধ করা ও স্বদেশী জিনিষের প্রতি অনাদর করে তৃপ্তি বোধ করাও আমাদের যেন স্বভাবগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ আমার বানানো কথা নয়—কিছু দিন পূর্ব্বে এদেশীয় পূর্ত্তবিদ্‌গণের সম্মিলন সভাতেই অনেকের মুখে এই ধরণের কথাই শুনেছিলুম। তাঁদের মত কৃতবিদ্যের মুখে যে কথা শুনেছিলুম, তার মোট কথা এই যে ভারত-স্থাপত্য শুধু যে অতি-বাহুল্য-দোষাক্রান্ত তা নয়,—তার উপর ছন্দমাত্রাহীন। কোন স্থাপত্য নির্দ্দোষ নয়; সুতরাং ভারত-স্থাপত্যও নয়; কিন্তু ভারত স্থাপত্য ছন্দ-মাত্রাহীন এ কথা বলা শুধু তাদেরই সাজে, যারা জীবনে ভারত-স্থাপত্যের কোন নিদর্শন পর্য্যন্ত দেখে নি। ভারত-স্থাপত্যের ছন্দ মাত্রা সম্বন্ধে Royal Institute of British Arechitectsএর Journalএ Architecture and Architects in India নামক প্রবন্ধে H.V. Lanchester F.R.I.B.A. যে কথা কয়টি বলেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—To our taste, most Indian buildings are over-enriched; but I would point out that those enrichments all have a meaning...and that they are not barbaric but proportioned and distributed on a strictly architectural basis. I think you will agree that no style shows a higher standard of skill than the Hindu architecture ..in the distribution of masses,the proportions of solids and voids and the surface treatment with a view to contrasting the plain and enriched.

ভারত-স্থাপত্যের মধ্যে এ যুগের অনুপযোগী অংশ বাদ দিয়ে, তাকে সংশোধন করে, তাকে কালের উপযোগী করে তোলাই হবে এ যুগের স্থপতির কাজ। ইয়োরোপে যেমন এক সময়ে revivalএর যুগে কাজ হয়েছিল, আমাদের দেশেও ঠিক তাই করতে হবে। এ কাজে অবশ্য স্থপতি ও জনসাধারণ উভয়েরই সাহায্যের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অর্থ হয়ত সাধারণের নেই; কিন্তু সাধারণের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান-গুলি তৈরী হয়, যাতে আর যারই হোক অর্থের অভাব হয়

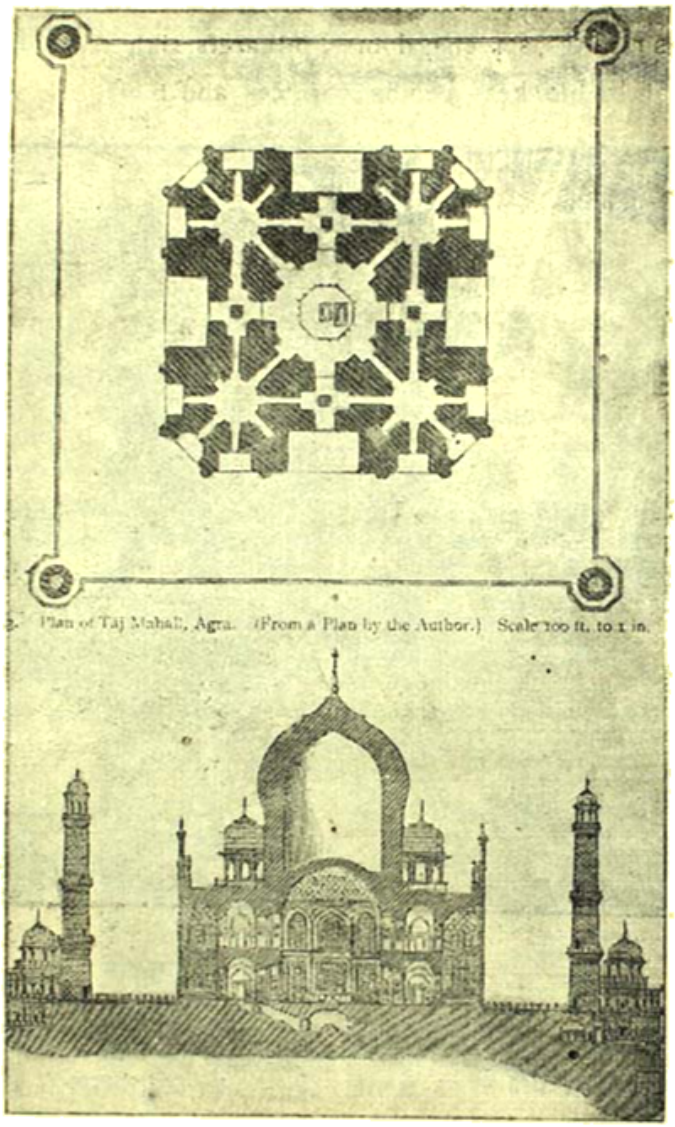

Plan of Taj Mahal, Agra. (From a Plan by the Author.) Scale 100 ft. to 1 in.

তাজমহলের ভিত্তি-নক্সা ও ছেদাংশ

না—যেমন হাসপাতাল, উজান, থিয়েটার, বায়োস্কোপ—সেই সব বাড়ী ত অনায়াসে ভারতীয় পদ্ধতিতে হতে পারে। এ সমস্ত কাজে যে ভাবে অর্থ ব্যয় হয়, তাতে ভারতীয় স্থাপত্য-পদ্ধতি অনুসারে খুব সুন্দর ব্যবস্থা হতে পারে। প্রয়োজন খালি তা হচ্ছে সাধারণের মত ও সহানুভূতি।

আমাদের জাতীয় জাগরণের যুগ এসেছে শুনতে পাই। জাতীয় জাগরণ সত্য হয়েছে কিনা বল্‌তে পারি না। তবে জাতীয় জাগরণ হ'য়েছে স্বীকার কর্ত্তে তখনই বাধ্য হব, যখন দেখা যাবে সাধারণের রুচি পরিবর্ত্তন ঘটেছে, দেশে লুপ্ত শিল্প-কলার পূর্ব্ব গৌরব আবার অক্ষুণ্ণ গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশে কিছুদিন থেকে লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা চলেছে এবং স্থাপত্যের দিক থেকেও এ চেষ্টা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরম্ভ করেছেন। তাঁর এ চেষ্টা যে সফল হবে এ আশা কি করা যায় না?

চিরন্তন সাম্য

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী বি-এ

না ছিল দিবস, না ছিল রজনী,
না ছিল আলোক, অন্ধকার।
না ছিল সলিল, না ছিল ভূতল,
কোন বাধা-বাধা-বন্ধ তার।
ছিল না আকাশ, ছিল না বাতাস,
সূর্য্য, তারকা, চন্দ্রমা।
ছিল না শবদ কঠোর মধুর,
গরজন, মধু-মূর্চ্ছনা।
প্রলয়ঙ্কর সে মহানিদ্রা
ছাড়িয়া বিশ্বপতি,—
মেলিল নয়ন নব জাগরণে,
বয়ানে বিমল জ্যোতিঃ।
বক্ষেতে ভরা করুণা অপার,—
নয়নে উছলি উঠে;
শান্তি-নিঝর-সলিলের ধার
দিগ্‌দিগন্তে ছুটে।
দক্ষিণ করে বরাভয় ভরা—
চেতনা আশীর্ব্বাদ';—
পূর্ণ পূরিল সমীরণ হয়ে
জীবনের নব স্বাদ।
মহা প্রলয়ের সে মহা অন্তে
হয়েছিল যারা সম—
নব সৃজনের নবীন উষায়
নাশিয়া সে মহা তমঃ;—
তারাই হাসিয়া ভাসিয়া উঠিল
বিশ্বের বুকে বুকে;
নব নব রূপে, ছন্দে, গন্ধে,
মুক্তির মহা সুখে।
প্রভেদ না রাখা, এক হয়ে থাকা,
এ নহে বিধির কল্পনা।
এ নহে সাম্য; মহাবরণের
অভিনব এক জল্পনা।

তাই ত গরজে কেশরি সিন্ধু;
জ্বালাময় ধূ ধূ মরুভূমি।
কুলিশ-কঠোর বিশাল ভূধরে
অলি ঘেরা ফুলে প্রণয় চুমি।
হেথায় রয়েছে দরবেশ্ সাধু
জগতের হিত-সাধন-রত।
হেথা বেদুইন, তাতারের হাতে
নিয়ত নিঃস্ব হতেছে কত।
কোথাও রয়েছে গগন-চুম্বি
মস্‌জিদ্ ষষ্ঠ্ সৌধ-শির।
কোথাও ভগ্ন কুটীর-আবারে
রহে নর নারী পরিয়া চীর।
সচ্ছালোকে কোথাও নগরী
ধনে জনে জ্ঞানে ভরপুর।
কোথাও গহন কানন মাঝারে
নাহিক প্রভেদ নর-পশুর।
কোথা সতী নারী কল্যাণী মাতা,
বক্ষেতে ভরা স্নেহের ক্ষীর।
কোথা সেই নারী পিশাচীর সম,
লাঞ্ছিতা গোটা পৃথিবীর।
হেথায় মানুষ ধরণীর পতি,—
স্বরগের চাহে অধিকার।
বিশ্বের পতি প্রেমের ভিখারী
ফিরে দ্বারে দ্বারে রাখিকার!
হেথায় স্বরগ, হেথায় নরক,
বিধাতার লীলা অন্তহীন;
রবে চিরদিন হেন পাশাপাশি,
না হবে আঁধারে কেহই লীন।
সকলি নিখিল লীলার অঙ্গ,
নাহি অহমিকা, ভেদ ও বাদ!
এ জগতে এক পিতা সবাকার;
শাশ্বত এই সাম্যবাদ!!

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(১৩)

যদিও নিত্যরঞ্জন প্রথমে এই দেশ-সেবকের উপর অত্যন্ত চটিয়াছিল এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে তাহাকে ভণ্ড ও অপদার্থ বলিয়া গালি দিতে ত্রুটি করে নাই, তবু যখন সে দেখিল যে, তাঁর বক্তৃতার পর সমস্ত যুবক-সমাজে একটা প্রচণ্ড উৎসাহের ঢেউ বহিয়া গেল, তখন সে তার বিরাগ ভক্ত করিয়া নিজে অগ্রবর্ত্তী হইয়া মহাপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। সে তার সেবাসঙ্ঘকে পরিপূর্ণরূপে মহাপুরুষের নির্দ্দেশ অনুসারে পরিচালন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

নিত্যরঞ্জন লোক মন্দ ছিল না। তার মধ্যে দেশ-সেবার একটা প্রকৃত উৎসাহ ছিল, এবং খুব বড় একটা ত্যাগের দ্বারা বীর-পদবীতে আরূঢ় হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল। কিন্তু তার এই ত্যাগের আকাঙ্ক্ষার ভিতর আত্মগৌরব-বোধটা এত প্রবল ভাবে ছিল যে, তাহা তার চেষ্টা ও প্রবৃত্তিকে অনেকটা বিকৃত করিয়া দিত। কাজ করিয়া সে কাজের জন্য ষোলআনা বাহাদুরী পাইতে ইচ্ছা করিত, এবং সেই প্রশংসা সংগ্রহ করিবার জন্য সে অনেকটা চেষ্টা করিত। সেবার ভিতর তার এই যে আত্মপ্রীতি ছিল, তাহা ক্রমে তাহার দলের ভিতর সংক্রামিত হইল। তার যে সেবাসঙ্ঘ—ইহা দেশের সবার কাছে সম্মান লাভ করুক এবং দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবানুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াক, এ বিষয়ে তার আকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিল না। এ আকাঙ্ক্ষা যে মহাপুরুষ-কল্পিত সেবাসঙ্ঘের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসঙ্গত নয়, তাহা এক-একবার তাঁর মনে যে না হইত তাহা নহে, কিন্তু সে এই যুক্তি দিয়া তার মনকে বুঝাইত যে, দল ছাড়া কোনও কাজ হয় না। আর দলকে প্রকৃত হিসাবে কার্য্যক্ষম ও শক্তিমান করিতে হইলে, তাহার পুষ্টিসাধন আবশ্যক এবং দেশের লোকের চক্ষে সেটাকে বড় করিয়া দাঁড় করান দরকার।

কাজেই নিত্যরঞ্জনের সেবার চেষ্টা আসল সেবার বস্তুকে অনেকটা ছাড়িয়া একাগ্রভাবে তার এই সঙ্ঘকে আঁকড়াইয়া ধরিল। ইহার পুষ্টি ও সমৃদ্ধি, ইহার প্রতিপত্তি ও সম্মান তার দিবারাত্রির চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। এজন্য সে দিনরাত বক্তৃতা করিত, প্রবন্ধ লিখিত, কাগজ-ওয়ালাদের দিয়া লেখাইত, আর যেখানে যে কোনও নাম করিবার মত কাজ দেখিতে পাইত, সেখানে সে তার সঙ্ঘ লইয়া ছুটিয়া যাইত। তার শয়ন, স্বপ্ন ও জাগরণের প্রধান চিন্তার বিষয় দাঁড়াইয়া গেল এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান সংস্থাপন। দুর্ভিক্ষ, মড়ক, বন্যা, যোগস্নান প্রভৃতি ব্যাপার সে একাগ্রভাবে কামনা করিত। এমন কোনও একটা কিছু হইলেই সে সর্ব্বাগ্রে কাগজে চাঁদার জন্য বিজ্ঞাপন বাহির করিত; ঘটনাস্থানে যাইয়া স্বেচ্ছা-সেবক সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগিয়া যাইত, দানবের মত শক্তি লইয়া কাজ করিত; আর যতটা কাজ করিত তার দশগুণ কাগজে লিখিত। এমনি করিয়া যখন যেখানে লোকের নজরে পড়িবার মত কোনও কাজ দেখা দিত, সেখানে সেবাসঙ্ঘ খবরের কাগজের খুব একটা বড় অংশ গ্রাস করিয়া বসিত।

এই যে বক্তৃতা লইয়া যুবক-মণ্ডলীর মধ্যে মস্ত বড় সাড়া পড়িয়া গেল, দলচর নিত্যরঞ্জন ইহার ভিতর নিজের দলের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠার একটা প্রকাণ্ড সুযোগ দেখিতে পাইল। সে অবিলম্বে এই মহাপুরুষের নামে যুবক-মণ্ডলীকে সেবাসঙ্ঘে যোগদান করিয়া সেবায় সর্ব্বস্ব-ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিল। পার্কে

পার্কে মীটিং করিয়া সে যুবকদের দলে টানিতে লাগিল। হোষ্টেলে হোষ্টেলে, মেসে মেসে ঘুরিয়া সে লোক সংগ্রহ করিতে লাগিল। কয়েক দিন এই লোক সংগ্রহ লইয়া তাহারা খুব মাতিয়া গেল।

সৌরীনের মনের ভিতর সেদিনকার বক্তৃতা ভয়ানক প্রাঘাত করিয়াছিল। এ বক্তা যাহা বলিলেন, সৌরীনের কাছে তার কোনও কথাই নূতন নয়। সে নিজে অনেক দিন এ সব কথা ভাবিয়াছে। একদিন সেও এই সব উচ্চ আদর্শের দ্বারা এমনি নিঃস্বার্থ ভাবে জীবন নিয়মিত করিবে মনে করিয়াছিল। এই তো সেদিন সে কল্পনা করিয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দের মত সে সর্বত্যাগী হইয়া লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করিবে, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া সে দরিদ্রকে চিনিবে জানিবে, তার আপনার লোক হইয়া তাহাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিবে। এই এক বৎসরের মধ্যে তার সে সমস্ত আদর্শ তার মনে আর দেখা দেয় নাই- তার সমস্ত জীবন ওলোট-পালট হইয়া গিয়াছে। এখন সে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিবে, এবং অন্য যে কোনও লোকের মত স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সুখে জীবন কাটাইবে, কেবল ইহাই ভাবিতেছে। রেখা আসিয়া তার জীবনে এ প্রকাণ্ড বিপর্য্যয় সাধন করিয়া ফেলিয়াছে।

তার এই নূতন জীবনধারার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বক্তা মহাশয় অর্জ্জুনের মত যেন প্রচণ্ড বিক্রমে সহস্র হস্ত বিস্তার করিয়া তার স্রোতোবেগ ঘুরাইয়া উজান ঠেলিয়া তার অর্দ্ধ-বিস্মৃত অতীতের দিকে পরিচালিত করিয়া দিলেন। তার মনে সেই সব পুরাতন কল্পনা ও হারান আদর্শ আবার তোলপাড় করিয়া উঠিল—সেই সব নষ্ট স্বপ্ন আবার হৃদয়ের ভিতর আন্দোলন করিতে লাগিল। একটা অপূর্ব্ব মোহে আবিষ্ট হইয়া সৌরীন সে মনোহর স্বপ্নের ভিতর আত্মবিস্মৃত হইয়া ডুবিয়া গেল।

শেষে সে বহুকষ্টে যেন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। সে স্মরণ করিল যে, তার আর এ আদর্শের অনুশীলন করিবার স্বাধীনতা নাই। সে রেখার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, রেখার জীবনের ভার সে লইয়াছে, রেখাও একান্ত বিশ্বাসে তার হাতে তার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এখন তার মুখে এ সব কথা শোভা পায় না। জীবনকে সে এই কার্য্যের দ্বারা এমন একটা খাদের ভিতর টানিয়া দিয়াছে, যেখান হইতে তাহাকে ইচ্ছা করিলেই ফিরান যায় না। ফিরাইবার ইচ্ছা করাটাও তার কাছে পাপ। সুতরাং একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে তার পুরাতন বিস্মৃত স্বপ্ন বিদায় দিয়া আবার সে পরের দিন রেখার কাছে ছুটিল।

এস্‌প্লানেডে ট্রাম হইতে নামিয়া রেখা বলিল, "তোমার কবে কাজে লাগতে হ'বে?"

সৌরীন বলিল, "এখনো নিয়োগপত্র আসে নি,—সে কথা বোধ হয় তাতে লেখা থাকবে। কিন্তু আজ আমার বন্ধুর চিঠি পেলাম—তাতে সে লিখেছে যে হয় তো সামনের মাসের পয়লা থেকে দিল্লীতে গিয়ে কাজে লাগতে হ'বে।"

"ওমা, তবে তো আর তিন সপ্তাহ মাত্র বাকী আছে। তুমি তো তার আয়োজন উদ্যোগ কিছুই করছো না। তোমার কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত তৈয়ারী ক'রলে না। চল যাই, হারমনের বাড়ী গিয়ে তোমার কয়েকটা সুটের অর্ডার দিয়ে আসি।"

সৌরীন একটু উদাস ভাবে বলিল, "থাক এখন, মাইনেটা একবার পাই তার পর করা যাবে।"

রেখা একটু অভিমান করিয়া বলিল, "কেন, তোমার কি টাকার অভাব আছে না কি? এতদিন তবে আমি স্কুলে খেটে মরলাম কিসের জন্য?"

সৌরীন বলিল, "থাক না, কটা দিনের জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"আমার যে তর সইছে না। আমি যে তোমাকে ভাল কাপড় চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে বাবুটি করে' দেখতে চাই।"

"কেন? এমনি আমার চেহারা দেখতে বুঝি ভাল লাগে না?"

সৌরীনের হাতের উপর একটু চাপ দিয়া রেখা বলিল, "Naughty boy! তুমি জান না ভাল লাগে কি না? যা'ক, সে কথা থাক, এখন চল। আমি আজ তোমার পোষাক অর্ডার না দিয়ে ফিরবো না।"

"কিন্তু রেখা, আমার তো ইংরাজী কাপড় পরবার ইচ্ছে নেই।"

"তবে কি? তুমি চাপকান পরতে চাও—চাপকান আমার মোটে ভাল লাগে না।"

"না হয় গলাবন্ধ কোটই পরা যাবে।"

"তবে তাই অর্ডার দেবে চল।"

"আজ থাক রেখা, আজকের সন্ধ্যার এই অবসর এমন ভাবে নষ্ট করার চেয়ে চল গঙ্গার ধারে যাই।"

রেখার মনে বড় সখ ছিল সে নিজে সঙ্গে যাইয়া সৌরীনের জামা কাপড়ের অর্ডার দিবে। ইহার ভিতর একটা অধিকার-বোধের তৃপ্তি ছিল। যে তৃপ্তির জন্য নূতন গৃহিণী আনন্দ করিয়া স্বামীর গৃহস্থালী গুছাইতে বসেন, সেই তৃপ্তি, সেই আনন্দ সম্ভোগের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন আর এক মুহূর্ত্তও তার সৌরীনকে পর করিয়া রাখিয়া আশ মিটিতেছিল না। সে সৌরীনকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া, তাহার ভার লইবার জন্য, তার কাজ কর্ম্ম বুঝিয়া লইবার জন্য, তার গৃহস্থালীর কর্ত্রী হইবার জন্য অস্থির হইয়াছিল। সৌরীনের পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিয়া তার চাকরীর জীবন আরম্ভ করিবার সমুদায় উদ্যোগ আয়োজন করিয়া দিয়া সে তার এই নূতন পদবী গ্রহণের প্রথম ধাপে পা দিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সৌরীনের এ বিষয়ে অসম্মতিতে সে মনের ভিতর একটু ধাক্কা খাইল।

তার পর ময়দানের ভিতর দিয়া তারা গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রেখার মনে কেবলি একটা প্রশ্ন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, "এখন কবে তাদের বিবাহ হইবে?" কিন্তু এ কথা আজ উপযাচিকা হইয়া উপস্থিত করিতে তার ভয়ানক লজ্জা বোধ হইল। এক দিন সে নিজেই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। তখন সৌরীনের কিছু ছিল না; রেখা নিজের উপার্জ্জনে সংসার চালাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাই তার ইহাতে কোনও লজ্জা ছিল না। কিন্তু আজ সৌরীন মস্ত বড় চাকরী পাইয়াছে, আজ তার পক্ষে উপযাচিকা হইয়া বিবাহের কথা উপস্থিত করার ভিতর একটা লোভের কথা উঠিতে পারে এই ভাবনায় সে মহা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাই যদিও কাল সন্ধ্যা হইতে এই প্রশ্নই তার মনের সব ভাবনা চিন্তার উপর দিয়া চাপাইয়া উঠিতেছিল, তবু সে এ কথা কিছুতেই তুলিতে পারিতেছিল না। সে প্রতিক্ষণেই আশা করিতেছিল সৌরীন নিজে কথাটা তুলিবে, আর সৌরীন কথা তুলিল না দেখিয়া সে কেবলই বেদনা বোধ করিতেছিল।

শেষে সে বলিল, "পয়লা এপ্রিল তোমায় যেতে হ'বে—আমার কলেজ বন্ধ হবার ঠিক কুড়ি দিন আগে। তোমার যদি এখানে join ক'রতে হ'ত তবেই বেশ হ'ত।"

"কেন? সরকারী খরচায় বিলাত বেড়ান হ'বে তা মন্দ কি?"

রেখা তার ক্লিষ্ট দৃষ্টি সৌরীনের মুখের উপর রাখিল। তার ভিতর অপরিসীম বাধা ও নৈরাশ্য ছিল। তার দিকে চাহিয়া সৌরীন সে দৃষ্টির অর্থ হঠাৎ বুঝিয়া ফেলিল। সে তখন বলিল, "এখনও তুমি vacationএর কথা ভাবছো রেখা? এখনও কি চাকরী করবে মনে করছো?"

রেখা উল্লসিত হইয়া উঠিল, তার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল। সে কথা কহিল না, তার হাতের ভিতর সৌরীনের হাতখানা আরও নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিল।

সৌরীন বলিল, "তুমি এই সদর থেকে তোমার প্রিন্সিপ্যালকে বলে রেখো।"

রেখা বলিল, "ওসব প্রিন্সিপ্যালকে বল্লে চলবে না, রীতিমত নোটিস দিতে হ'বে। কবে আমাদের যেতে হ'বে সেটা ঠিক জানতে পারলে—"

"তার জন্যে কি যায় আসে? তুমি এখনি নোটিস দাও না। যাবার আগে বিয়ের জন্যেও তো কয়েকটা দিন লাগবে। হাঁ, বিয়ের জন্য এখন কি ক'রতে হ'বে রেখা, আমি তো কিছু জানি নে।"

রেখার মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সে বলিল, "আমাদের যতীনদা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার, তুমি একবার তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, তা হলেই সব জানতে পারবে। একটা নোটিস দিতে হয় তিন সপ্তাহ আগে—"

"তিন সপ্তাহ আগে? তবে তো আর দেরী করা চলে না। চলো, আজই তোমার যতীনদা'র কাছে যাই।"

গঙ্গার ধারে যাওয়া আর সেদিন হইল না। তাহারা একখানা গাড়ী ডাকিয়া যতীন বাবু ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের বাড়ী গেল।

রেখা খুসী হইয়া, কিন্তু তার মনের ভিতর সঙ্গে সঙ্গে

সে একটা চাপ অনুভব করিল। আজ সৌরীনের কথার ভিতর সে যেন একটা আড়ষ্টতা, একটু চাপা ভাব লক্ষ্য করিল। যাহা রেখা চাহিয়াছিল তাহা সে পাইয়াছে, কিন্তু রেখার যেন মনে হইল যে সৌরীন তার চোখের ভিতর এ আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়াই সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়াছে। সৌরীনের প্রেমের ভিতর আগে যে স্বচ্ছন্দতা ও একটা ছাপাইয়া-পড়া আনন্দের ভাব ছিল, আজকার কথায় বা কার্য্যে রেখা তাহার সন্ধান পাইল না। সে স্পষ্টই অনুভব করিল যে, সৌরীনের মনের ভিতর অন্য একটা কি যেন আসিয়া তার চিত্তকে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছে—এখন তার সমস্ত সত্তা রেখানয় নয়। কি সে? কোন্ বাধা আজ আসিয়া রেখা ও সৌরীনের মাঝখানে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

(১৪)

সেদিন হোষ্টেলে আসিয়া সৌরীন শুনিতে পাইল নিত্যরঞ্জন আসিয়াছিল। নিত্যরঞ্জন ও নবজীবন পড়া ছাড়িয়াই হোষ্টেল ছাড়িয়া দিয়াছিল। আজকে আসিয়াছিল সেবাসঙ্ঘের লোক জোগাড় করিতে। সে অনেকক্ষণ নানাছন্দে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছে এবং সাত আটটি ছেলে তার প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছে।

শুনিয়া সৌরীন বিরক্ত হইল। লোকের কাছে নিত্যরঞ্জনের প্রতিষ্ঠা যে আরও অনেকগুণ বাড়িয়া যাইতে চলিল, সে যে মস্তবড় ত্যাগী স্বদেশসেবক বলিয়া জনসাধারণের কাছে ক্রমে শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিতে থাকিবে, এ কথা ভাবিতেই তার একটা তীব্র বেদনা বোধ হইল। এত বড় মেকী, জাল এই লোকটা। পরের আলো ধার করিয়া এ জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া নির্লজ্জ ভাবে লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা কুড়াইতেছে। পরের কৃতিত্ব আত্মসাৎ করিয়া এ লোককে ঠকাইয়া বেড়াইতেছে। নিজের কাণাকড়ি সম্বল নাই, তবু সে মস্ত ধনী সাজিয়া বেড়াইতেছে।

যদি কারও এই সেবাধর্ম্মে অধিকার থাকে তবে তাহা সৌরীনের আছে,—সেই মাত্র এই মহাপুরুষের নির্দ্দিষ্ট ব্রত গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু—হায়, সে যে হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়াছে; তার তো স্বাধীনতা নাই। সে নিজের সত্তার অব্যক্ত ইঙ্গিত অবহেলা করিয়া দাসত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। সে কিছুই করিতে পারে না। আর এই জাল—এই মেকী—নিত্যরঞ্জন তার প্রাপ্য যশ দুই হাতে লুটিয়া লইতেছে। তার যত রাগ হইল নিত্যরঞ্জনের উপর, তত হইল জনসাধারণের উপর, আর সে তত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল নিজের উপর। তার মনে হইল, সে পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণীর মত নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় ও পরাধীন করিয়া ফেলিয়াছে। তার নিজের ভুলে সে তার জীবনটাকে পরিপূর্ণরূপে অসার্থক করিয়া ফেলিয়াছে।

পরের দিন সে নিয়োগপত্র পাইল। এত বড় একটা চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া সে প্রাণের ভিতর খুব তীব্র উল্লাস অনুভব করিল না। তার মনে হইল, সে যেন এই চাকরী লইয়া তার ভিতরকার সত্য জীবনকে বঞ্চিত করিতে চলিয়াছে। ভাবিয়া দেখিল, এই আরম্ভের শেষ কোথায়? ইহার ফলে সে চাকরীতে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে, ক্রমে তার বেতন বাড়িয়া চলিবে, কালে হয় তো সে Accountant General বা Comptroller General হইবে। টাকায় পয়সায় ছেলে পিলেতে ঘর ভরিয়া খুব সুখ সম্ভোগ করিয়া সে শেষে ঠিক একটি সম্পন্ন গৃহস্থজীবনের বাঁধা-সড়ক আওড়াইয়া সাধারণ মৃত্যুতে জীবনের সমাপ্তি লাভ করিবে। ইহার ভিতর তার স্বপ্নদৃষ্ট গৌরবের বা সেবার জীবনের বিন্দুমাত্র অবসর সে খুঁজিয়া পাইল না। একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে চিঠিখানা তুলিয়া রাখিল।

রেখার সঙ্গে সে পূর্ব্বেকার মত নিয়মিত ভাবে দেখাশুনা করে। কিন্তু ঠিক আগের মত আনন্দ সে আর পায় না। একটা নিষ্ফলতার ভার তার সমস্ত অন্তর চাপিয়া সর্ব্বক্ষণ বসিয়া থাকিত—এখন আর সে রেখার সঙ্গে তেমন মন খুলিয়া কথাও বলিতে পারে না। কথা বলিতে বলিতে সে হঠাৎ থামিয়া যায়। কি যেন বলিতে গিয়া হঠাৎ সে নীরব হইয়া পড়ে। তার প্রাণখোলা কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে এখন প্রত্যেকটি কথা ওজন করিয়া বলিতে লাগিল।

ইহার পাঁচ-ছয় দিন পরে সে রেখাকে লইয়া এক দিন চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে গেল। বাঘের ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া তাহারা একটি বিশালকায় বেঙ্গল টাইগারের পরিক্রম দেখিতেছিল। বাঘ তার খাঁচার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীটির ভিতর একই পথে বার বার ঘুরিতেছে, আর মাঝে মাঝে ঘূর্ণিত নয়নে বাহিরের লোকগুলির দিকে চাহিয়া

দেখিতেছে। সৌরীন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই বাঘটার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে সে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি কষ্ট বেচারার!"

রেখা একটু ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিল, কিছু না বুঝিয়া বলিল, "হাঁ তা বটে!"

"দেখ, ওর কত বড় শক্তি, কিন্তু ওকে জীবন কাটাতে হবে ওই খাঁচার ওই অপরিসর বেষ্টনের ভিতর এমনি পায়চারী করে। যে শক্তিতে সে সুন্দরবনের সমস্ত জীব-জন্তুর মনে ভয়সঞ্চার করে বেড়ায়, সেই শক্তির সবটুকু ক্ষয় করতে হবে ওর ওই খাঁচার ভিতর পায়চারী ক'রে, আর হতাশভাবে এই বাইরের বিস্তারের দিকে চেয়ে। ঠিক আমারই মত।"

আবেগের মুখে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সৌরীনের মনে হইল কথাটা বলা ভাল হইল না। কথাটা রেখার বুকের ভিতর ছুরীর মত গিয়া বিঁধিল। সে বিষাদক্লিষ্ট নয়ন জিজ্ঞাসু ভাবে সৌরীনের মুখের দিকে ফিরাইল। সৌরীন সে ব্যথাভরা দৃষ্টি সহিতে পারিল না। অন্য দিকে চাহিল।

রেখার মনের ভিতর তখন ভীষণ তোলপাড় লাগিয়া গেল। কয়েক দিন হইতে সে সৌরীনের ভিতর যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল, তাহাতে সে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক যে দিন বিবাহের নোটিস দেওয়া হইল, তার পর হইতেই সৌরীনের কথাবার্ত্তার ভিতর একটা বিষাদের প্রচ্ছন্ন সুর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কথার খরচে সৌরীন ভীষণ সংযমী হইয়াছিল। তার এই ওজন-করা কথাবার্ত্তায় রেখার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। তার কেবলি মনে হইতেছিল যে, যে সৌরীনকে সে ভালবাসিয়াছে, সে যেন শামুকের মত তার খোলার ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তার আর সন্ধান পাইবার উপায় নাই।

সৌরীনের ব্যবহারের গূঢ় অর্থ রেখা কতকটা আন্দাজ করিয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে নাই। রেখা আতঙ্কের সহিত অনুভব করিয়াছিল যে, সৌরীন রেখাকে বিবাহ করা স্থির করিয়া কতকটা অনুতপ্ত হইয়াছে। এখন সে কেবল কর্ত্তব্যের দায়েই বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তার এ কার্য্যের মধ্যে প্রেমিকের প্রবল আগ্রহ নাই। ইহাতে রেখার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তার মন ভয়ানক ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। অনেকবার সে মনে করিয়াছে যে, সে সম্পূর্ণ সরল ভাবে কথাটা পাড়িয়া সৌরীনের সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে বোঝাপড়া করিয়া লইবে। কিন্তু সৌরীনের ব্যবহারের ফলে তাদের ভিতর এমন একটা সঙ্কোচের অন্তরাল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, এই বোঝাপড়া সে কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিল না।

আজকার কথায় তার এতদিনকার দিনরাতের সমস্ত চিন্তা প্রবল ও তীব্র ভাবে তার মনের ভিতর ভীষণ তোলপাড় উপস্থিত করিল। তার ভয়ানক লজ্জা ও ঘৃণাবোধ হইল। সে অনেকক্ষণ কোনও কথা কহিল না।

কিছুক্ষণ পরে যখন তাহারা একটা নিভৃত স্থানে একটা বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল, তখন রেখা তার সমস্ত সঙ্গিহীনতা সম্বল করিয়া ধীরভাবে বলিল, "তুমি যে বল্লে, বাঘটা ঠিক তোমার মত, তার মানে কি?"

সৌরীনের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। অসত্য বলিতে তার ঘৃণা বোধ হইল; কিন্তু সত্য বলিতেও সে সঙ্কুচিত হইল। একটু ভাবিয়া সে বলিল, "মানেটা এই। আমি মনে মনে অনুভব করি—আমার ভিতর একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। আমি খুব বড় কাজ ক'রতে পারি। কিন্তু এখন আমি চারদিক দিয়ে এমন সীমাবদ্ধ যে, আমার কিছুই করবার জো' নেই। আমার সেই বিপুল শক্তি কেবল বড়লাটের হিসাবের দপ্তরে কেরাণীগিরী করেই ক্ষয় করাতে হ'বে।"

রেখা বুকের ভিতর একটা বোঝা সমস্ত শক্তি দিয়া চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "কি ক'রতে চাও তুমি?"

হাসিয়া সৌরীন বলিল, "কি যে ক'রতে চাই তা' ঠিক বলতে পারি না রেখা; কিন্তু মনে হয় যে যদি আমি নিজেকে এমনি করে' বেঁধে না ফেলতাম, তবে হয় তো একটা ভয়ানক বড় কাজ ক'রতে পারতাম।"

রেখার কথা ভার হইয়া আসিল; সে বলিল, "কেন বাঁধছো নিজেকে?"

গভীর তৃষিত দৃষ্টিতে রেখার দিকে চাহিয়া সৌরীন বলিল, "কেন বাঁধছি তা' জানি না রেখা, কিন্তু বাঁধা পড়েছি। ভগবানের আমার উপর এই আদেশ। তাঁর রাজ্যে এমন অপচয় তাঁর দিকেই হ'চ্ছে। কত অজস্র শক্তি কত ছোট ছোট কাজ সম্পন্ন ক'রতে গিয়ে অপচয় হ'চ্ছে। তাঁর ইচ্ছা যে আমার এই তীব্র এঞ্জিনের মত শক্তি কেবল ঘর ঝাঁটা'তেই ব্যবহার হবে। তাই হ'ক।"

রেখা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "না—আমি তা' হ'তে দেব না।"

সৌরীনও উঠিয়া পড়িল। বিস্মিত হইয়া রেখার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "কি বলছো রেখা? তুমি—"

"আমি তোমাকে এমন করে আপনাকে বাঁধতে দেবো না। কি দরকার তোমার চাকরী করবার। তুমি দয়া করে শুধু তোমার ভার আমাকে দেও। আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না, কোনও দাবী-দাওয়া করবো না। তুমি স্বচ্ছন্দে যা তোমার ইচ্ছা কর, তুমি যত বড়, ঠিক সেই পরিমাণ কাজ তুমি ক'রো। আমি শুধু এই অধিকার চাই যে তোমার ভার আমি বইবো।"

আনন্দে সৌরীনের মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তার আনন্দ হইল, গর্ব্ব হইল, সে বলিল, "এ তোমারই যোগ্য কথা রেখা, কিন্তু আমি তো এমন করে তোমায় আপনাকে বঞ্চিত ক'রতে দিতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি বলে' আমি তোমার সুখের জন্য আমার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারি, তোমাকে কষ্ট দিতে তো পারি না। তুমি রোজগার ক'রে আমায় খাওয়াবে, পরাবে, আর আমি চারিদিক দিয়ে আমার জীবনকে ছারখার করে' বেড়াব—তোমার উপর এ অত্যাচার আমি ক'রতে পারবো না। যখন আমি তোমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাকে খাওয়াবার পরাবার এবং সাধ্যমতে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। সে দায়িত্ব থেকে তুমি মুক্তি দিলেই কি আমি নিতে পারি?"

রেখা হঠাৎ বলিয়া বসিল, "তাই যদি তোমার জীবনের প্রতিজ্ঞা হয়, তবে নাই ক'রলে বিয়ে। স্ত্রীর অধিকার নাই দিলে আমায়!"

চমকিত হইয়া সৌরীন বলিল, "কি বলছো রেখা?"

সে রেখার মুখের দিকে চাহিল। তখন দিনের আলো শেষ হইয়া আসিয়াছে, ক্ষীণ আলোকে সৌরীন দেখিতে পাইল না যে, রেখার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারিল না যে, রেখা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এ সহজ কথার তলায় রেখার মনে যে কি প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া যাইতেছিল, তাহা সে একটুও বুঝিতে পারিল না। রেখাও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সৌরীনের কথার কোনও উত্তর দিয়া উঠিতে পারিল না। কি যেন একটা তার বুকের ভিতর এমন ভাবে ঠেলা মারিয়া উঠিতেছিল, যাহাতে তার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, সে কথা বলিতে গেলেই কাঁদিয়া ফেলিবে। তাই সে ঠোঁট-মুখ চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সৌরীন আবার বলিল, "কি বলছ তুমি রেখা? তোমায় বিয়ে ক'রবো না, সে কি কথা!"

রেখা এতক্ষণে কথা বলিল, "আমাকে বিয়ে করে তুমি জীবনে বন্ধন ও নিষ্ফলতাকে বরণ ক'রে নেবে, সে আমি হ'তে দেব না। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী না হ'তে পারি তো শুধু বন্ধন হ'ব না।"

সৌরীন কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমার মনে বড় ব্যথা দিয়েছি রেখা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি আমার দুঃখের কথাই ভাবছিলাম, তোমার কথা ভাবি নি। আমি বড় স্বার্থপর।"

রেখার অশ্রু ইহার পর আর বাগ মানিল না। চক্ষু মুছিয়া সে বলিল, "আমি রাগ ক'রে তোমাকে কিছু বলছি না প্রিয়তম, এ কয়দিন ধরে' ভেবে চিন্তে আমি যা' স্থির ক'রেছি, তাই আমি বলছি। আমার জন্য তুমি যে তোমার জীবনের আদর্শ থেকে চ্যুত হ'বে, সে আমি চাই না। আমি এত বড় স্বার্থপর নই। আমি দেখতে চাই তোমাকে স্বাধীন,—স্বচ্ছন্দ ভাবে তোমাকে তোমার আদর্শের অনুশীলন করতে দিতে চাই। যাতে তা' হয় তাই যদি তুমি না কর, তবে আমি কোনও দিনই মনে শান্তি পাব না। যদি বিয়ে ক'রলেই তোমার বাধা হয়, তবে বিয়ে নাই করলে—যাও তুমি তোমার পথে, আমি আমার বুকভরা ভালবাসা নিয়ে তোমার দিকে চেয়ে থাকবো। যদি কোনও দিন মনে হয় যে তোমার শান্তি বা সুখের জন্য আমাকে তোমার দরকার, তবে আমাকে স্মরণ ক'রে এসো—এই মাত্র আমি চাই।"

সৌরীন ভয় পাইয়া গেল। রেখার এত বড় একটা প্রচণ্ড ত্যাগস্বীকারে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে বলিল, "থাক—থাক, ও সব কথা থাক। ও সব কথা এখন ভাবতে বা বলতে নেই। আজকের সন্ধ্যাটা এমন ক'রে নষ্ট করিলাম আমি। ছি!"

রেখা সৌরীনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না—কথাটা চাপা দিও না। তাই হোক, আমার যা' হয় হ'ক,

আমি আজ তোমাকে মুক্তি দেবো। আমি তোমাকে বিয়ে ক'রতে দেবো না।"

অপরাধীর মত লজ্জিত ভাবে সৌরীন বলিল, "ছি, রেখা, এমনি করে আমায় তুমি শাস্তি দেবে!"

"ভগবান জানেন, আমি তোমাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি না—তোমার মঙ্গল আমার এখনও সাধনা—তাই আমি বিয়ে হ'তে দেব না। এ আমার স্থির সংকল্প।"

সৌরীন অনেকক্ষণ রেখার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রেখা তার দৃষ্টি নত করিল, তার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শেষে সৌরীন বলিল, "তোমাকে দুঃখ দিয়ে যদি আমি স্বাধীনতা গ্রহণ করি, তবে আমার স্বাধীনতাও যে অভিশপ্ত হ'য়ে যাবে রেখা!"

"আমার কোনও দুঃখ নাই। তোমার জীবন যদি আমাকে ছেড়ে সার্থক হয়, তবে সেই আমার সুখ।" বলিয়া রেখা কেবলি মুখ-চোখ মুছিতে লাগিল।

তার পর তারা ধীরে ধীরে উঠিয়া নীরবে বাড়ীর দিকে ফিরিল। এস্‌প্লানেড্‌ পর্য্যন্ত তারা বিশেষ কোনও কথাই কহিল না। সেখানে ট্রাম হইতে নামিয়া রেখা সৌরীনকে কার্জ্জন গার্ডেনে লইয়া গেল। সেখানে একটা নিভৃত কুঞ্জের আড়ালে গিয়া সে সৌরীনের পায়ের ধূলা লইল, পায়ের উপর পড়িয়া চুম্বন করিয়া বলিল, "তবে আজ বিদায় প্রিয়তম, আর দেখা হ'বে না।" বলিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল।

সৌরীন কিছুক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। যখন বুঝিল, তখন চট্ করিয়া রেখার হাত ধরিয়া ফিরাইল। বলিল, "রেখা, তুমি কি সত্যিই আমাকে ছেড়ে দিতে চাও?"

খুব কষ্টে রেখা কথা কহিল, বলিল, "দিয়েছি তো।"

"কিন্তু তুমি ছেড়ে দিলেই তো ছাড়া পাওয়া যায় না, ধর্ম্ম যে আমাকে তোমার সঙ্গে বেঁধে রাখছে রেখা। তোমাকে এমনি করে' যদি কাঁদিয়ে আমি যাই, তবে আমার মনত্বে ভেঙ্গে যাবে রেখা!—"

"যাও তুমি, যদি কখনও বোঝ আমাকে তোমার দরকার আছে, তবে ফিরে এসো, আমি তোমার প্রতীক্ষা করবো।"

"সে হয় না রেখা।" তার পর অনেকক্ষণ দুইজন নীরবে রহিল। অনেকক্ষণ পরে সৌরীন বলিল, "তোমাকে ছেড়ে, সব ছেড়ে যেতে পারি রেখা, যদি তুমি—যদি তুমি আর কাউকে বিয়ে কর। তোমাকে এমন ব্যথাতুর ভিখারিণী ক'রে রেখে আমি যেতে পারি না।"

সপাং করিয়া কে যেন রেখার মুখের উপর চাবুক মারিল। এক মুহূর্ত্ত সে নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল; তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। সে কেবল ভাবিল, কি নিষ্ঠুর সৌরীন!

যখন সে আঘাতের প্রথম ঝোঁকটা সামলাইতে পারিল তখন সে বলিল, "আচ্ছা সে বিবেচনা করা যাবে। যদি তাতে তোমার তৃপ্তি হয়, তবে আমার আপত্তি কি?" বলিয়া নিতান্ত সহজ ভাবে সে অগ্রসর হইল।

তার কথায় সৌরীনের সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। এত সহজে যে রেখা তার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গেল, তাহাতে তার অন্তরে আঘাত লাগিল। কিন্তু তার কিছু বলিবার তো মুখ নাই। সেও রেখার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল।

রেখা বলিল, "আমার সঙ্গে আর নাই এলে।" এ কথায় সৌরীন কতকটা প্রহৃত কুক্কুরের মত নত মস্তকে অন্য পথে গেল। রেখা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ট্রামে উঠিল। চলিতে চলিতে সে কোনও মতে গিয়া হোষ্টেলে আপনার ঘরে পৌঁছিল। ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া সে ধপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তার পর সে কাঁদিতে লাগিল। তার সমস্ত অন্তর গলিয়া অজস্র অশ্রুধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে আকুল হইয়া কেবলি কাঁদিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪৮)

স্বভাব-সরল, সদা-প্রফুল্ল জয়হরির বিষণ্ণ ভাব আমি আদৌ সহিতে পারিতাম না,—আমাকে বড় বাজিত। স্বস্তি থাকিত না—মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিতাম। তাহার মনটাকে অন্যদিকে মোড় ফিরাইবার জন্য বলিলাম—

"জয়হরি,—আমার একটা কাজ করবে,—আমি আজ আর বেরুতে পারছি না।"

সে সচকিত হইয়া বলিল—"বলুন না, আমি ত' কাজই খুঁজছি। মামা চ'লেন—"

আমি আর ও-প্রসঙ্গ বাড়িতে না দিয়া বলিলাম—"সে তো জানা কথা জয়হরি,—আমরা কেহই তো এখানে থাকতে আসিনি। আমরাও তো যাব'। কাচ্চা-বাচ্চাওলা গৃহস্থলোক বাড়ী ছেড়ে কতদিন থাকতে পারে।"

"তা বটে,—সেটা ঠিকও নয়। তবে এক সঙ্গে,—থাক্,—কষ্ট হয়ই। হ্যাঁ—কি করতে হবে বলুন,—এই তো সবে পউষ ন'টা।"

বলিলাম—"আমাকে একখানি—তোমার পচন্দ মতো, খুব ভালো—দিশী কালাপেড়ে ধুতি এনে দিতে হবে। মোটা দশহাতি। তোমার মনের মতো হওয়া চাই কিন্তু।"

জয়হরি উৎফুল্ল উৎসাহে বলিল—"ওঃ—বুঝেছি, মাতুলের জন্যে। আপনি দেখে নেবেন—কি রকম কাপড় আনি! আমি নিজে কুঁচিয়ে দেব'।"

"তা দিও। তোমার মনের মতো হলেই—আমার পচন্দ হবে। এই বলিয়া দশ টাকার একখানি নোট্ তাহার হাতে দিলাম। সে আগ্রহের সহিত লইয়া—আনন্দে বাহির হইয়া গেল।

জয়হরির ধাতে বাবুর গন্ধ না থাকিলেও আমি বরাবরই দুইটী বস্তুতে তাহার সখ ও যত্ন লক্ষ্য করিতাম। তাহার দিশি কালাপেড়ে কাপড়খানি নিমন্ত্রণাদি রক্ষাক্ষেত্রে বাহির হইত। ব্যবহারান্তে, ময়লা না হইলেও,—বেশী পয়সা দিয়া সেখানি কাচাইয়া ও স্বয়ং কোঁচাইয়া, ভবিষ্যৎ ভোজের জন্য প্রস্তুত রাখিত। আর তাহার নামাঙ্কিত সীল-আংটী। সেটি সে অর্ডার্ দিয়া কলিকাতা হইতে তৈয়ার করাইয়া আনায়। তাহার ধারণা—অন্যত্র তেমন হাই-পালিস্ সম্ভবই নয়। আংটীটি বরাবরই velvet-lined case এ (মখমল্ বসানো বাক্সে) নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিত। এখানে আসা অবধি তাহার আলোক দর্শন ঘটিয়াছে,—সে আঙুলে উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহার উপর ঘড়ি-পালিসও চলিতেছে।

• • • •

জয়হরি চলিয়া যাইবার পর কত কি কথা—এলো-মেলো অগ্রথিত ভাবে মনটাকে ভাগাভাগি আরম্ভ করিয়া দিল। কোনটাই ধরা দেয় না;—"এলুম্" বলিয়া আসে,—"দাঁড়াও" বলিলেই সরিয়া যায়!

ফল কথা,—এখানে আর বসিয়া থাকা কেন,—কোন্ কাজে? আবার যেখানে যাইব—যাওয়া ছাড়া সেখানেই বা কোন্ কাজটা আমার প্রতীক্ষায় আছে! কোন্ ক্ষতিটা বা কাহার ক্ষতিটা নিবারণ হইবে!

বৈরাগ্য নয়,—এ এক অদ্ভুত অবস্থা। কোথাও একটা বড় রকমের টান্ নাই,—কোনোটাতেই জোর পড়ে না! জগতে—পাওয়ার দাবী ফুরাইলে, শুধু থাকার দাবীটা বোধ হয় বিড়ম্বনা।

যাক্,—উঠিয়া পড়িলাম। একটু নড়াচড়া না করিলে—এ জড়তাও নড়িবে না। শরীর বা মন কোনটাই ঘুরে যাইবার মত' ছিল না। ইস্কুলটি নিকটেই—কম্পাউণ্ডও বড়। এক কোণে বৃদ্ধ-বটবৃক্ষ একটি—প্রস্তরাসন ও ছায়া দুই-ই পাতিয়া রাখিয়াছে। এক পাক্ ঘুরিতেই—সেইখানেই

যেন ডাক্ পড়িল,—আমি আসন লইলাম। একদিন এই বটকুঞ্জের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া—মাতুলকে দেবতার ভয় দেখানো হইয়াছিল। অন্ধকার রাত হইলে আমাকেও আজ দূর হইতেই নমস্কার করিতে হইত।

সম্মুখেই রাজপথ,—রাজ-রঙ্গ-রঞ্জিত যাত্রীর কোলাহল; —নিকটেই বালকদের বাণী-ভবন—কল্লোল-কুঞ্জ। তবুও স্থানটি বেশ নিভৃত আর নির্জ্জন,—বড় আরাম বোধ করিলাম। ভাবিলাম—সর্ব্ব-বন্ধন-মুক্ত দ্রষ্টার মত' বসিয়া থাকি। কিন্তু তো কি! গত রাত্রের স্বপ্ন-বিভীষিকা,—জাগরণ,—ক্ষয়হরি-হরণ, এই ত্রাহস্পর্শে বাতিক বৃদ্ধি তো ঘটিয়াই ছিল,—সহসা মনে পড়িল—ফিরিবার দিন নিকট হইয়া আসিল, কই—স্থানটা সম্বন্ধে মনে যে সমস্যাটা উঠেছিল —এর কতটাই বা বৈদ্যনাথ আর, কতখানিই বা দেওঘর, —তাহা তো মিটে নাই—অপূর্ণই রহিয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব? এতো কলা-পাতে কুমড়ো-বড়ী দিয়া ঝোল অম্বল সম্বন্ধে হাত পাকানো নয়। এ সম্বন্ধে যে আমার চিন্তা ছিল না তাহা নয়; যে হেতু—নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গে লোকেও বাঁচে, এবং বাঁচিতে হইলে—মাথাটা বাদ দিয়া বাঁচা চলে না। চিন্তা আসিত;—স্থানাভাব দেখিয়া সরিয়া যাইত, কারণ শীর্ষটা বড়-বড়তে আর শুভার্থীতে ভরাট। মাথাটা যেন অমূল্য "pass" (পাস্) পাওয়া wall flowerদের (দিমুল স্কুলের) পাস্ তালুক! তাহাদের এড়াইয়া চলা অসম্ভব।

বিদ্যালয়ের বাউণ্ডি্র (গণ্ডীর) মধ্যে থাকায়,—স্থান-মাহাত্ম্যেই হউক বা যে কারণেই হউক,—ছাত্রাবস্থার একটা স্মৃতি সহসা উদয় হইল। সে-বৎসর এণ্ট্রেন্স্ দিব,—পরীক্ষা আসন্ন,—গণিতের একটা জটিল অঙ্ক—নানা পন্থা অবলম্বনে, কসিয়াও ঠিক্ উত্তর পাইতেছি না। দূর কর'—বলিয়া হতাশ হইয়া হলের (hallএর) পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখি—কোর্থ্-ইয়ারের ((4 yearএর) একটি দাড়ি-গোঁফধারী-চেয়ার-জোড়া স্থূলকায় ছাত্র, টেবিলের উপর Political Economy এবং তদুপরি মাথা রাখিয়া নাসিকা-ধ্বনি করিতেছেন। তাঁহাকে সকলেই চিনিত, কারণ তিনি নাকি Knowledge (জ্ঞান) অর্জ্জনের জন্য প্রত্যেক ক্লাসে তিন বৎসর করিয়া কাটাইয়া আসিতেছেন, এবং কোর্থ্-ইয়ারেও এইটা তাঁর তৃতীয় বৎসর! বহু আয়াসে এই নিয়মটি রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। প্রফেসার পীরি সাহেব তাঁহাকে wide (wise) man (দিগ্‌গজ) বলিতেন। এ-হেন পাকা লোক পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে "হলে" ঢুকিলাম। কোন প্রফেসার ভাবিয়া তিনি সচকিত ভাবে মাথা তুলিলেন। তিনি যেমন মাংসল, তাঁহার মেজাজটিও তেমনি মোলায়েম ছিল। তাঁহাকে আমার অবস্থা জানাইয়া —অঙ্কটি একবার কসিয়া দেখাইয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলাম। তিনি অঙ্কটি দেখিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন— "এটা পারো নি! খুব সোজা যে হে,—তখন এক মিনিটও লাগতো না,—দেখি" বলিয়া—আমার খাতা আর পেন্‌সিলটি লইয়া—লাগিয়া গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার খাতায়—পাঁচখানি পৃষ্ঠা মাত্র ব্যবহার্য্য হিসাবে বাকি ছিল। তাহা খতম করিয়া, "সমাপ্ত" লিখিবার স্থানে স্থির হইয়া বলিলেন— "কাগজ কই? আচ্ছা থাক্। কেনই বা এত' গোলমালে যাওয়া,—এক্স (X) লাগালে এতক্ষণ কবে হয়ে যেতো। তুমি এক কাজ কর,—একটা এক্স্ (X) লাগিও,—ব্যস্, আর কিছু করতে হবে না, আপ্‌সে বেরিয়ে আসবে। কথাটা—বুঝেছ কি না!—সর্ব্বদা মনে রেখো—difficulty (মুস্কিল) দেখলেই—এক্স্ (X) লাগাবে,—বুঝলে?" বলিতে বলিতে বেশ সপ্রতিভ ভাবে সটান্ চলিয়া গেলেন! থাক্—

এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার সেই উপদেশটি হঠাৎ যেন দেহ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিল। মনটা বল্ পাইল।

লোকে অঙ্কশাস্ত্রে জাত মানিতে নারাজ; জাতের সাড়া কিন্তু সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এক্সের শক্তির কথা যাঁহাতক মনে পড়া, সঙ্গে সঙ্গেই—এই ইস্কুলের সহিত একদিন যাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সেই—প্রজ্ঞেয় রামনারায়ণ বসু মহাশয়ের —"সেকাল আর একাল," পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সম্মুখে আসিয়া হাজির! তখন বন্ধুর মিঞা লিখিতে হইলে —"ম" না দিয়া এক্স্ লিখিয়া তাহাতে উকার যোগ করা হইত—যথা—বX্‌র! কি সোজা।

মনে পড়িল—ক্রিশ্চানেরা—উপাসনায় বা সঙ্কটে—হাত দুটি বুকে এক্সের আকারে স্থাপন করেন। ওইটি তাঁহাদের বিশু স্মরণ ও বিপদবারণ মুদ্রা।—বরম ও চরম ক্ষেত্রে ওই এক্স্‌ই নিরুপায়ের উপায়,—মুস্কিলাসান।

বুকে পিঠে X (Geniva cross) লাগানো মানুষ আর গাড়ি (Ambulance corps) যুদ্ধক্ষেত্রের গোলা-গুলির মুখ হইতে অক্ষত বাহির হইয়া আসে।

সভ্যদেশে নিরক্ষর বিষয়ীরা এক্স্ লাগাইয়া (চ্যারা সই করিয়া) লক্ষ লক্ষ টাকা বাহির করিতে পারে।

ইত্যাদি সব প্রমাণ থাকায় বুঝিলাম এক্সের মত অমন ইংরাজি "মধুসূদন" আর দ্বিতীয় নাই। Victoria crossএর প্রভাব সকলেই জানেন। আর X'mas তো ঠাকুরদের কথা—১২ দিন ছুটি!

তাই—পাঠ্যজীবনের সেই পাক্কা wide manএর (বিদ্যা-দিগ্‌গজের) কথাই শিরোধার্য্য করিয়া স্থির করিলাম, —সময় মত' একটা এক্স্ (X) লাগাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইব।

একটা পূর্ব্ব ('প্রাচীন' বলাই উচিত) অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ হইয়া মনটা একটু দমিবার মত হুর ধরিতেছিল। সত্বর সেটাকে honorable exceptionএর (সম্মানিত ব্যতিক্রমের) ঘরে সমাধি দিয়া ফেলিলাম। উনি X Ray অবতারে—"বাহির করার" চরম দেখাইয়াছেন সত্য, কেবল একটি অবস্থায়—ছেলেদের প্রাণটা "বাহির" করেন,—যখন "ইউনিভার্সিটি হলে" (University Hallএ) পাস্-ফেলের প্রলয় তালিকায় স্বরূপে (চ্যারা হইয়া) দেখা দেন। তবে—ওটা ওঁর সম্মানিত ব্যতিক্রম। যাক্, দুশ্চিন্তা গেল,—নিশ্চিন্ত হইয়া বাসায় ফিরিলাম।

(৪৯)

বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখি,—কর্ত্তা বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া বাণেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছেন। আমি তাঁহার সামনে দিয়া বৈঠকে গিয়া ঢুকিলাম।

বাণেশ্বর বলিতেছে—"মাটির মানুষ ছিলেন"—

কর্ত্তা,—"এই না বলিল—রসগোল্লা খেয়ে গেলেন। তুই বেটা আমাকে জানোয়ার পেয়েছিস্,—যা বলবি তাই বিশ্বাস করতে হবে! মাটির মানুষে রসগোল্লা খায় রে হারামজাদা?"

বাণেশ্বর,—"না হুজুর—সত্যিই বড় ভাল লোক"—

কর্ত্তা,—"কিসে ভাল লোক?"

বাণেশ্বর,—"আজ্ঞে—কথাবার্ত্তা কেমন মিষ্টি।"

কর্ত্তা,—"বটে! আর আমাদের পকেটটা কেবল মিষ্টি! যে যার খায়—তার কথা কি কারুর ভাল লাগে রে বেইমান।"

সত্বর বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্নান আহ্নিক সারা হয়ে গেছে নাকি?"

"এই যে! কখন এলেন? ঘরেই ছিলেন বুঝি?"

"আপনার সামনে'দেই তো এলুম"।

"কই আমি তো দেখতে পাইনি! এ বেটার জন্যে কি কিছু দেখবার শোনবার জো আছে। বেরো বেটা—আবার কে আসবে দেখতে পাব না।—শুনেছেন তো—বেটা বলে—মামা বাবুর কথা ভারি শ্রুতিমধুর।"

বাণেশ্বর কাতরভাবে বলিল—"না হুজুর,—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি ও কথা বলিনি। তিনি ব্রাহ্মণ—দেবতা, আমি এমন কথা বলতে পারি"—

কর্ত্তা,—"বলিস নি?"

বাণেশ্বর,—"কি বলছেন বাবু?—গরীব বলে আমার কি পরকালের ভয় নেই—আমি অমন কথা বলতে যাবো কেনো।"

কর্ত্তা,—"তোর পরকাল গেলেই বা ভাবনাটা কি,—আমারটা তো নিয়ে বসে আছিস।"

এত বেলায় এ অঙ্ক আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়, নিজেদের গর্ভাঙ্কও আছে। বলিলাম—"ওটা তো মন্দ কথা নয় বাণেশ্বর,—শ্রুতিমধুর মানে—শুনতে মিষ্টি।"

কর্ত্তা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"ও বুঝি তাও জানে না! ওরে বেটা, আজকালের দিনে এই বিদ্যে নিয়ে বিদেশে চাকরী করতে বেরিয়েছ! মহিলাদের পাল্লায় পড়লে মরবি যে। যা মুখ্যু ইস্কুলে যা—ইস্কুলে যা। বেটা ইহকাল না দেখে—পরকাল দেখছো।"

অবস্থা সুবিধার নয় দেখিয়া, স্নানের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া বাণেশ্বরকে সরাইয়া দিলাম।

এইবার কর্ত্তার চমক ভাঙিল,—আমাকে যেন এই দেখিলেন।

বলিলেন "হাঁ,—শুনছি নাকি যাবার চক্রান্ত চলছে? ওটার কথা ছেড়ে দিন,—পরিবারের মাথার অসুখ বলে' দেড়মাসে এক ক্যানেস্তারা ঘি শুষেছে. পরিবার দেড় পো পেয়ে থাকেন তো ঢের। রায়ড়ী কিনে রাস্তায় সাবাড় ক'রে বাড়ী ঢোকে। ও কেবল নিজের পেট আর পোষাক বোঝে। পরিবারের মাথা ঘুরেছে কি অমনি,—ওই ঘুরিয়েছে। ওর যাওয়াই ভাল। তা বলে আপনাদের

ও খেয়াল আসছে কেন! এই এখনই তো এখানে ভাল সময়। না—না, ও সব মতলব করবেন না।"

বলিলাম—"জয়হরিকে এখানে রাখতে আর সাহস পাচ্ছি না,—বড় হালকা বুদ্ধি, কোন্ দিন কি—"

তিনি সহাস্তে বলিলেন—"ওঃ—বুদ্ধির কথা বলছেন? সকলে আমাকে ভারি বুদ্ধিমান বলতো। ভারি বুদ্ধি নিয়ে জারির কাজটা কি করা হয়েছে! বুদ্ধিমানে—বিবাহ করে? সেটি আমি করেছি। বুদ্ধিমানে—ভেজাল্ ঘাড়ায়? সেটি আমি বাড়িয়েছি,—এক ছিলুম—এগারো হয়েছি! বহু হওয়াটা ভগবানেরি পোষায়। দিবি—মুখীকে ফাঁকি দিয়ে বেড়াতে পারেন। তাঁকে আদালতে হাজির করবার মতো "ওয়ারেণ্ট" আজো সৃষ্টি হয়নি। বুদ্ধিমানে—গীতা পড়ে,—যাতে বলে—সেরেফ্ খেটে যাও,—পয়লার পিত্তেস্ রেখো না? আমি তা পড়ি।"

"কেন পড়েন?"

"পড়ি কি সাধে,—মাহাম্মো যে মেরে রেখেছে মশাই। নিত্য পড়লে আর গীতা দান করলে—ধানও যে করিনি তা নয়, যদিও তাঁর বাঁধাতে বারো আনা লাগবে—নাকি—ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী প্রভৃতি হন। তা এই সতেরো বচর তো পড়ছি,—বোধ হয়—স্বামীকে সেটা শুনতে নেই। যাক্,—বুদ্ধির কথা আর বলবেন না,—বড় ঠকেছি। এখনো একটু কমে তো বাঁচি!"

বলিলাম—"অন্ততঃ—ছেলে মেয়েদের।"

"আঃ—সেইটে আশীর্ব্বাদ করুন। এর ওপর কি আর কথা আছে। আপনি দেখছি অন্তর্যামী। আপনারা থাকায় বেশ আছি, বাড়ীতে সব—আরো বেশ আছেন, যাবার কথা আর নয়। ভাল কথা—জয়হরি বাবুকে যে দেখতে পাচ্ছি না বড়!"

"এই নিকটেই গেছেন।"

তিনি চঞ্চল হইয়া বলিলেন—"বলেন কি। সবার চেয়ে নিকট যে ইষ্টেশন। যদি খালি গাড়ী দেখে উঠে বসতে সখ্ হয়,—তার পর—ছাড়লেই তো লাফ"—

হাসিতে গিয়া প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল,—কথাটা আদৌ অসম্ভব নয়।

তিনি চঞ্চল ভাবে—"এই বাণীকুঞ্জ—ওরে বাণীকুঞ্জ" হাঁকিতে হাঁকিতে অন্দরের দিকে ছুটিলেন। আমিও শিরস্ত্রাণ-রক্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত র‍্যাপারখানা লইতে বৈঠকের মধ্যে ঢুকিলাম।—সত্যইত, বাজার তো দূর নহে,—সে গিয়াছে নয়টার পূর্ব্বে—এখন এগারোটা অতীত। কর্ত্তার আওয়াজ পাইলাম—"এই যে জয়হরিবাবু—এখানে এ-কি হচ্ছে!"

"এই সাবুটো মা'কে দিয়ে তয়ের করিয়ে নিচ্ছি।"

"বেলা হয়েছে—খিদে পাবারই কথা। ওর সঙ্গে পান্তুয়া খা মধ্যে! মাধুরি আর তো"—

আর শোনা গেল না। একটা আরাম নিশ্বাস পড়িল। কিন্তু শয্যাগত রোগী হইবার পূর্ব্বে জয়হরি সাবু খাইবে,—এরূপ একটা অসম্ভব কথা—মানুষের মাথা খারাপ না হইলে সেখানে ঘেঁসিতেই পারেনা। দুর্ম্মতিকে—এ সুমতি দিল কে? বিশেষ বাড়াবাড়ি সুরু হয় নাই ত'? কাপড় কিনিতে গিয়াছিল,—কাপড়ই বা কই। ঘরটা ভাল করিয়া দেখিলাম। কই—কাপড় কোথায়!

বাণেশ্বর স্নানের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"জয়হরিবাবু সাবু খাচ্ছেন কেন হ্যা,—কেমন আছেন?"

"তিনি তো ভালই আছেন বাবু,—তিনি সাবু খাবেন কেন? ও আর-কার জন্যে তয়ের করিয়ে নে-গেলেন।"

"সে আবার কি! তাঁর নিজের নাওয়া-খাওয়া নেই?"

বাণেশ্বর বলিল—"বলে গেলেন—তাঁর একটু দেরি হবে,—আপনারা খেয়ে নেবেন। তিনি মা'দের সঙ্গে খাবেন।"

কথাটায় আশ্চর্য্য বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। জয়হরির মধ্যে এমন কিছু আছে—যাহার সহজ শক্তি দু'এক দিনের পরিচয়েই স্ত্রীলোকদের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া সঙ্কোচশূন্য করিয়া লয়। তাঁহারা তাহার চিরদিনের পরমাত্মীয়া হইয়া যান,—এবং তাহাকে পাইলে একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্নেহ ও আনন্দ অনুভব করেন,—কেহ তাহার মা, কেহ মাসীমা, কেহ দিদি,—কেহ ভগ্নী হইতে বাধ্য। আবার একদণ্ডের মধ্যে বালকবালিকাদের কাছে সে সমবয়স্ক খেলার সাথী বনিয়া যায়! অথচ অতি অল্প বাঙালীই তাহার মত দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ লাভ করে। এত বড় লাভ সত্ত্বেও—পরিচিত স্ত্রীলোকদের ও বালকদের নিকট সে শিশু ভিন্ন আর কিছুই নহে,—ছেলেধরায় তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে!

তাই মেয়েদের সঙ্গে যাবে শুনিয়া আমি আদৌ আশ্চর্য্য হই নাই। কিন্তু—এ আবার কি! বাবু কাহার জন্য,—সে গেল কোথায়,—আমার সঙ্গে দেখা করিল না কেন? আবার কি কিছু ঘটাইল নাকি!

ভাল জল-হাওয়া তো সকলেই চান্, গ্রহেরাও ত' সকলের বাহিরে নহেন,—তাঁহাদেরও এখানে গতিবিধি—ভুবন নিকেতন আছেই। কর্ত্তা বলিলেন—"এখানে এই সময়টাই ভাল সময়,—এখন যাবার নাম করবেন না। মানে কি?—সকলে বেশ ভাগাভাগি করে' ভোগ করা নাকি। না;—সে হতেই পারে না।

• • • •

আহারটা আজ যেন কর্ত্তব্য সমাধা করিবার অস্বস্তি লইয়া আরম্ভ হইল। কর্ত্তার মুখে যেন অস্বাচ্ছন্দ্য মাখানো। তিনি চটিবার একটা অবলম্বনের অনুসন্ধানে ছিলেন। বাণেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"এই বেটা বাঁদরপানি—জয়হরি বাবুকে চট্ করে ডেকে আন্।—দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

"আজ্ঞে তিনি কোথায় গেছেন তা তো জানিনে বাবু।"

"জানতে কেউ মানা করেছিল রে হারামজাদা।"

এই সময় খিড়কি দিয়া জয়হরি ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাণেশ্বর নিষ্কৃতি পাইল,—আমিও কম নয়।

কর্ত্তা বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—"আমাদের এঁরা বলেন ব'সতে,—দেখ দেখি—কি বিচ্ছিরি কাজটা হ'ল! যাও—জয়হরি বাবুকেও দাও"—

জয়হরি বিনম্র স্বরে বলিল—"আপনারা খেয়ে নিন,—তাতে কি হয়েছে। আজ যে আমি মার সঙ্গে যাব।"

"ওঃ—আপনারো অম্বল চাগিয়েছে বুঝি, তবে সেই ভাল,—সেই ভাল, ওই হেঁসেল ঘরে বসাই ভাল,—ওটি অম্বলের ভৈষজ্যরত্নাকর। হাতের কাছে সব রকম পাবেন।"

জয়হরির কথার সুরটা যেন বৈরাগ্য-মিশ্রিত বিনয়ের মত বাজিল। সে আমার দিকে না তাকাইয়া সরিয়া যাইতেছিল। তাহার ভাব দেখিয়া সন্দেহ হওয়ায় বলিলাম—"আহারান্তে আমার কাছে এসো,—কথা আছে।"

সে নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ব্যাপার কি।

(৫০)

সিগারেটের ধুঁয়ার সঙ্গে মনটাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া কূল না পাইয়া শূন্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বেড়াইতেছিল। জয়হরি কখন নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে লক্ষ্যই করি নাই। ফিরিয়া দেখি সে বিষণ্ণ মুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া! চুল আঁচড়ায় নাই, গায়ে মাথা-গলানো একটা ময়লা গেঞ্জী। গাঁদা ফুলের মালা আর সিঁদুরের টিপ্ থাকিলে—পাড়াগেঁয়ে যাত্রী বলিয়া ভ্রম হইত।

বলিলাম—"ব্যাপারটা কি,—শরীর কি খুব খারাপ?—সকালে এত উৎসাহ করে নোট নিয়ে কাপড় কিনতে গেলে,—এনেছ?"

সে মুখখানা আরো নীচু করিয়া মাথা নাড়িল মাত্র। বুঝিলাম—আনা হয় নাই।

"নোটখানা হারিয়েছ?"—কারণ সেটা তাহার পক্ষে খুব সোজা কাজ।

আবার পূর্ব্ববৎ মাথা নাড়িল! হঠাৎ একটা সন্দেহ মনে জাগায়, চাহিয়া দেখি—তাহার সাধের আংটীও আঙুলে নাই! কি সর্ব্বনাশ! নিশ্চয়ই কোনো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়িয়াছিল দেখিতেছি। গায়ের কাপড়ই বা কোথায়? গায়ে নাই,—এ ঘরেও ত' দেখিতেছি না!

বলিলাম "জয়হরি—কি হয়েছে ঠিক্ করে বলো,—আমাকে আর ভাবিও না। আংটী দেখছি না,—গায়ের র‍্যাপারটাই বা কোথায়,—নোটখানাও নেই!"

মুখ না তুলিয়াই সে ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি গেলেও আপনার থাকতো না,—সে আপনি দেখলে থাকতে পারতেন না। গায়ের কাপড় আমার দরকারই হয় না—মাঘ মাস তো গেছেই। আংটীর সখও আমার মিটে গেছে।—যাই, মাকে বলে আসিগে—কাপড় পাঠিয়ে দেব'।"

বলিলাম—"খবরদার, এমন কাজ কোরো না, সে কাপড় মামার জন্যে নয়। কিন্তু যা সুন্দর হিসেব দিলে, তাতে তো কিছুই খোলসা হল না।"

সে একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল—"হিসেব কি করে হবে মশাই। কাপড় কিনতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু কোথায় বটতলায় সেই অসহায় বাঙালীটি বসে আছেন, তাঁর খবরটা নিতে ইচ্ছে হল,—আর সেই বদমাইস বেটাকে"—

সভয়ে বলিলাম—"মারামারি করনি তো ?"

"না,—তা আর হল কই।—এখনো ইচ্ছে আছে ;—চোর বেটা ! দেখি—ভিড় জমে রয়েছে। পাষণ্ড বেটা সব কেড়ে নিয়েছে। ব্যায়রামী মানুষ—এই শীতে একখানি কম্বল জড়িয়ে হেঁট হয়ে বসে আছেন,—সেখানাও চায় ! বেটার গলা যেন কাটের তক্তোরি,—একটু রস নেই। যেমন আওয়াজ—তেমনি ভাষা ! বেটা কথা কইছে যেন গাওয়ারের চামড়ায় লাঠি পিঠছে। বাঙ্গালী যেন চিরকাল মাছের ঝোল ভাত আর লাউচিংড়ি খায়,—সরল থাকবে মশাই। বাবুটি দেখি ধীরে ধীরে কম্বলখানি গা থেকে খুলে মাটিতে ফেলে দিলেন। তাঁর গায়ে রইলো—টুইলের একটি ছেঁড়া সার্ট, আর তাঁর পাঁজরা ক'খানি। পাপিষ্ঠ বেটা —কম্বলখানা তুলে নিতে যেই হাত বাড়ালে,—আমার সব রক্তটা চন্ করে মাথায় পৌঁছে গেল,—মুখ থেকে বেরুলো—"খবরদার !" আমি সেই অবস্থায় নিজের গায়ের কাপড়খানা তাড়াতাড়ি তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে,—বটের একটা ঝুরি একটানে ছিঁড়ে নিয়ে বললুম -"পাষণ্ড, তোর একজন অসহায় ব্যায়রামী বেক্তির কম্বল—এই শীতকা দিনে গায়েমে থেকে উতরে লেকে বাড়ী যাবে,—আও—লেও ! হামারা শরীরমে জান্ থাকতে—তোমারা সাদ্দি নেই হোগা,—আও ;—কেত্না শক্তি হায় একবার দেখি !"

এই বলিতে বলিতে জয়হরি—স্থান-কাল ভুলিয়া—ফুলিয়া উঠিল,—মাল্‌কোঁচা মারিয়া ফেলিল। আজ সে চুল আঁচড়ায় নাই—তাহার অধিকাংশই উৎক্ষিপ্ত ছিল। সবটার সমাবেশে —দুঃশাসনের রক্তপানের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থায় দাঁড়াইয়া গেল। আমি ভীত হইলাম, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম— "জয়হরি করছ' কি,—এঁরা এখনি ছুটে আসবেন। থাক্— মারোটারোনি তো ?"

'অনাবশ্যক উত্তেজনাটা কতক সম্বরণ করিয়া সে বলিল— "মারামারি ?—ইচ্ছাটা কেবল হয়। দুর্ব্বলের ওপর অন্যায় অত্যাচার দেখলে চুপ্ করে সভ্যতার পরিচয় দেবার মত উচ্চ শিক্ষা হয়নি বলেই হয়। অসহায় দুর্ব্বল ভাইকে কি মা-বোনকে পশুর হাতে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অত্যাচারিত হ'তে দেখলে, দিব্যি দিতে দিতে সোজা বাড়ী এসে, চা খেতে খেতে গ্রামোফোন ঘুরিয়ে—"মানুষ আমরা নহি তো মেষ" শোনবার মত' সুবুদ্ধি আসেনা মশাই ! বরং ইচ্ছা হয়—ঐ মিথ্যাভাবী চাকায় ভেঙে আকার দি !"

অবাক হইয়া শুনিতেছি আর ভাবিতেছি—এ আবার কি ! এ আবার কবে এমন বক্তা হ'ল ! যাহার যাহা প্রিয়, কোন' এক শুভ বা অশুভ লগ্নে তাহার সাড়া মানুষকে বোধ হয় শক্তি যোগায়। সে বস্তুটি হৃদয়ের কোনো গভীর গুহায় গোপন থাকে এবং সহসা একদিন বাহির হইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দেয় !

বলিলাম—"তার পর ?"

"তার পর আর কি ! তিনি কিছুই করতে দিলেন না। জোড় হাত করে বললেন—"ভাই—আমার জন্যে নিজেকে বিপন্ন কোরো না। আমার যদি কোনো আশা ভরসা থাকতো—তোমার এ সব সার্থক হ'ত। আমার শেষ হয়ে এসেছে,—গায়ের কাপড় আর আমাকে রক্ষা করতে পারবে না,—উনি নিয়ে যান। আমি ঋণী।"

"সে সব অনেক ভাল ভাল কথা,—সে আমার আসে না,—মনেও নেই। মানুষের এত কষ্ট,—উঃ !"

দেখি—জয়হরি অন্য দিকে ফিরিয়া চোখের জল সামলাইতেছে। পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সে সব শুনে কি হবে।" অর্থাৎ সে আর বলিতে পারিতেছিল না।

বলিলাম—"চিন্তা কি জয়হরি—যিনি এত বড় বিশ্ব সামলাচ্ছেন, সেই ভগবান তাঁরও উপায় করে দেবেন।"

সে একটু স্থির হইয়া বলিল—"আপনারা ওই-যে সাধু ভাষায় প্রভু প্রভু, ভগবান ভগবান বলেন,—উনিও বলছিলেন,—আপনাদের ও সত্য ঠাকুরটি কিন্তু নেই ! কোথাও চেহারা দেখেছেন কি ? পা না থাকলে লোক কোথায় হাত্‌খু আনাবে ! ঐ ভুল করেই উনি এত' কষ্ট পেয়েছেন দেখছি। আমাদের মা-কালীকে ডাকলে কখ্‌খনো এমন হত' না। কী জাগ্রত মশাই,—তারক তেলির ছেলে কলেরায় গিয়েই ছিল,—মা-কালীর এক কোঁটা চরণামৃত গলায় যেতেই বেঁচে উঠলো। চক্ষে দেখেছি। তবে,—তার না বাঁচাই ভাল ছিল,—বেটা এখন চোর হয়েছে।"

এতক্ষণে জয়হরিকে ফিরিয়া পাইলাম। মনে মনে হাসিয়া, বলিলাম—"শেষটা কি হল' ?"

"শেষ আর কি,—শীত নেই যে ব্যাপার চাই, বে-পৈত্তে নয় যে—আংটীর দরকার। কেবল অকেজো আসবাব ব'লে

বেড়ানো আর খবরদারী করা। সে দিন নাকটা ছড়ে' রক্তারক্তি! অর্দ্ধেক রাতে সন্দেহ হল' আংটী বুঝি নেই,—তাড়াতাড়ি আলোটা নাকে ঘোসে দেখতে গিয়ে ওই কাণ্ড! যাক্—ভালই হয়েছে,—আমার তো মশাই বেশ বাড়াবাড়িতপা বোধ হচ্ছে।"

"তা যেন' হচ্ছে, কিন্তু শেষটা হ'ল কি? সে সব গেল' কোথায়?"

"আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না,—ও ব্যাপার থাকত না মশাই,—ছিঁড়ে যেতই;—আর আংটী আমি হারাতুমই। ছাতা, ছড়ি, ছুরি—সবই ত' হাতের জিনিস,—কই, একটাও রইলো কি?"

"কি পাপ! বলই না কি করেছ, আমি ত' কিছু বলছি না।"

"আপনি তো লাভটা দেখছেনই না। আপনি থাকলে কিন্তু অনেক পোড়তো,—সে দুশমন্ বেটা পেয়ে বোসতো! বেটা আমার কাছেই "ঠারা" টাকা চায়! আপনি হ'লে দিয়ে বসতেন। বেটা আমার কাছে ঠারা টাকা নেবে—আমায় এমনি মুখ্খু পেয়েছে! আমি সেই ছ গণ্ডা টাকার আংটী দিয়ে সেরে দিয়েছি। বললুম—"তোমারা কেত্তা টাকা চাই?" বেটা থতমত খেয়ে বলে ফেললে—"বাবুকে ঠারা রোজ ঘরমে রেখেসে—সাব্ খিলিয়েসে,—ঠারা টাকা চাই।" বললুম—"ঠারা ফারা বুঝি না—এই আংটী লেও—এর বেশী দিতে পারেগাও নেই,—মাথা খুড়ে ক্ষত বিক্ষত করলেও মিলেগা নেই,—এবং পত্রপাঠ বাবুকা সব জিনিস পত্তোর গুড়্গুড়্ করকে নিয়েসকে দেও।" বেটা ভয়ে ভয়ে আর কথাটি কইতে পারলে না। তিন খানা কম্বোল, একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ্, একটা টিনের মগ্, আধ-খানা সানুলাইট্ সাবান, একখানা ছেঁড়া কাপড়, আর এক খানা বোধ হয় Word Book (ওয়ার্ড বুক) বার করে দিলে।"

"বাবুটি বললেন—"ভাই—তুমি কার জন্যে এ সব কোরছ,—হাতের আংটী দিও না—আমার বেদনা বাড়িও না। আমার শক্তি নাই যে বাধা দি,—অস্ত্র নাই যে কাঁদি, স্থানও নেই, প্রাণও থাকছে না,—রাস্তার ধারেই ও-গুলো পড়ে থাকবে। উনি নিয়ে যান,—আংটী নষ্ট কোরো না ভাই। ঐ ব্যাগে দু' তিন খানা কাগজ আছে—তা যদি যেন—থাকুসে। আর কি হবে! তুমি কিছু মনে কোরোনা ভাই,—আংটী ফিরিয়ে নাও। তুমি আমাকে যা দিয়েছ—তাই আমার যাত্রা-পথের যথেষ্ট পাথেয়,—জগতে অসহায়দের দেখবার মানুষ আছে—তাদেরও মিলবে। এ দুর্লভ দান তোমারি।"

"এই বলে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে—ওপর দিকে চেয়ে, বুকে হাত ঘস্‌তে ঘস্‌তে—"জল দাও- প্রভু জল দাও, এত করুণার মাঝে, এ মরু রেখো না! অন্ধকেও এ কৃপা করেছ—এক বিন্দু দাও,—আমি তোমাকেই নিবেদন কোরবো," বলতে বলতে তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। চেয়ে দেখি—লোকজন সরে গেছে। সেই সকালবেলায় যে দুটি ছোকরা ধর্ম্মশালার খোঁজ নিচ্ছিল—তাদের একজন আমার পাশে!

"আমি জলের জন্য ব্যস্ত হতে সে ছোকরা বললে—"জল চাই না, একখানা গাড়ী দেখুন। উনি কোথায় যাবেন!" যাক্

"তাঁকে এখন ধর্ম্মশালায় এনে রেখেছি। সে ছোকরা দুটিও আছে। কিন্তু তিন চার দিনের বেশী তো থাকতে দেবে না। একটু সেবা-যত্ন পেলে বোধ হয় বাঁচতে পারেন। নিশ্চয় স্ত্রীপুত্র আছে,—উঃ—ভাবা যায় না মশাই! বেশ বাংলা জানেন—আমি সে সব বুঝতে পারি না। বোধ হয় মাইনার ইস্কুলের পণ্ডিত ছিলেন, উন্নতির আশায় ইংরিজিও শিখছিলেন,—Word Bookও কিনেছিলেন,—আহা! একবার যেন Benedictionও বললেন,—ও সেই Copy Bookএ (কাপি বুকে) থাকে কি না। আহা—রোগে এগুতে দেয় নি,—পৈতে রয়েছে দেখলুম। এ বাসায় তো স্থান নেই,—আর এ অবস্থায় ওঁকে একলা ফেলেও তো যাওয়া যায় না। আপনি কি বলেন?"

আমি যতই শুনিতেছিলাম ততই চিন্তার চাপ্ বাড়িতে-ছিল। শেষটা কি এইখানেই থাকিতে হইবে—না একেই খোয়াইতে হইবে! দেখিতেছি—ব্রাহ্মণী আমার গলায় একটি প্রবল গ্রহ বাঁধিয়া দিয়াছেন! বলিলাম—"তোমার বলাটাই আগে শেষ হোক্।"

জয়হরির মুখখানা চিন্তাপূর্ণ হইয়া উঠিল,—সে বলিল—"আপনি কি একা পুলিয়ায় যেতে পারবেন! না: তা হলে মা কি মনে করবেন! চলুন কাল্ আপনাকে পৌঁছে

দিয়ে আসিগে। আপনি তো ফেরবার তরে ব্যস্ত হয়েছেন ?"

বলে কি! আমি যেন আমার জন্য ব্যস্ত হয়েছি! এর মতলবটা কি! বলিলাম—"তার পর ?"

সে কাতর ভাবে বলিল—"ভদ্রলোক এই বিদেশে বড়ই অসহায়। তা না তো মারাই যাবেন। দেখে শুনে—আপনি আর গোটা কতক টাকা যদি দেন,—সে দশ টাকা—এক জোড়া কাপড়, ছুটো, জামা, আধসের বেদানা আর গাড়ী ভাড়াতেই হয়ে গেছে। আমি মাইনে পেলেই"—

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম—"দেখ জয়হরি—দুনিয়ার রোগ শোক দুঃখ কষ্টের কমতি নেই,—তুমি কয়জন লোকের কতটুকু অভাব দূর করতে পার। সাধ্যমত যা করেছ—ভালই করেছ, আর বাড়াবাড়িতে যেও না। বাকিটা অপরকে করতে দাও। কেউ না কেউ দেখবে. ভগবান দেখবেন।"

"আবার ওই ভগবান বলছেন. মা কালী বলুন না। তা তিনি তো আমাদের গাঁয়েই আছেন,—তাই তো সেখানে—। সেখানে চাষের ঘা হয় আছে, পুকুরে মাছ আছে, গরুর দুধ আছে,—মা আছেন, আর সে —, তার আর কাজ কি আছে! রান্না, বাসন মাজা, জল তোলা আর গরুর সেবা—এই। সেও দেখতে পারবে। যদি বাড়ী যেতে পারেন আর চান তো পৌঁছে দিয়ে আসি। বিদেশে ভদ্রলোককে এ অবস্থায় ছেড়ে,——আপনি মাপ করবেন"—

তাহার কণ্ঠ ভার হইয়া আসিল, চক্ষু দেখি—অশ্রুসিক্ত! সস্নেহে বলিলাম—"জয়হরি তাঁর কোন' পরিচয় নিয়েছ! পরিচয়টা তো পাওয়া দরকার। অপরিচিত"——

"অপরিচিত কি মশাই! তিনি কতটা অসহায়,—সাহায্য তাঁর কতটা দরকার,—সে পরিচয় তো তাঁর শরীর, তাঁর চোখ মুখ, তাঁর অবস্থা—দিয়েই দিচ্ছে। তাঁর মুখের কথা শুনে আর কি লাভ মশাই। আমাদের যেটুকু দরকার ত তো পেয়েছি।"

শেষ সে কাতর ভাবে বলিল—"আপনি একবার দেখবেন না ?"

লজ্জায় অন্তরটা ছি ছি করিয়া উঠিল। সংসারে আজন্ম হিসাবের পথে চলার অভ্যাস—সম্মুখের সহজ পথটা মুছিয়া দেয়! কথায় কাহার কতটুকু পরিচয় আমরা পাই! কিন্তু পূর্ব্বে জয়হরির কতটুকু জানিতাম! লোকের পরিচয় তো কেবল কথায় আবদ্ধ নয়,—বরং কথাই তাহা গোপন রাখে।

এই চরম পরাজয়ে বড়ই মানসিক গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলাম।

"চলো জয়হরি," বলিয়া,—উঠিলাম। (ক্রমশঃ)

ভুল

শ্রীবাণী দেবী

বেলা ৮ টায় সবে-মাত্র চায়ের পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়ে চোখ্ দুটো ঈষৎ বন্ধ করে মুখের আরামটা একটা টানা-গোছের 'আ—:' তে ব্যক্ত করবার প্রয়াস পাচ্ছিলুম, এমন সময়ে বেয়ারা হাঁকলে, হুজুর—আখ্‌বার!

তড়াক্ করে উঠে বসলুম। চায়ের সময়ে 'হুজুর আখ্‌বার!' 'মেঘের সঙ্গে ইন্দ্রধনু' বা 'মুড়ির সঙ্গে কড়াইশুটি'র চেয়ে কিছু কম লোভনীয় নয়। এক্ হাতে চায়ের পেয়ালাটা আঙুলের আলিঙ্গনবদ্ধ রেখে অন্য হাতটা বাড়িয়ে কাগজ্‌টা এগিয়ে নেওয়া গেল। খুলতেই চোখে পড়ল বিজ্ঞাপনের 'পারসোনাল্' কলমটা; কিন্তু হা হতোস্মি! একটি মোটে বিজ্ঞাপন, আর তাও "I present my thanks to the sacred Heart of St. Andrews....."

লোফায় এলিয়ে পড়লুম মনের দুঃখে। ও কলমটায় কয়দিন হতে যে রোমান্স্‌টা গজিয়ে উঠ্‌ছিল, তা আমার কৌতূহলের খুঁটি ধরে কম নাড়া দেয়নি। এক্ প্রেমিক ওর মধ্যে দু'লাইনের এক্ চিঠি লিখ্‌তেন তাঁর প্রেমিকাকে; সুকৌশলে সাজানো রহস্যের সুরে ভেজা ছোট ক'টি কথা। প্রেমিকারও উত্তর আসত ঠিক্ তেমনি ক'রে। নীরস দৈনিক পত্রটা আমার কাছে হয়ে উঠেছিল কোনান্ ডয়েলের

চিত্রাঙ্কন ও ছাপা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্তী

ভারতবর্ষ হাফটোন এণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

নক্ষত্রের মত চমকপ্রদ। আমার কল্পনার চোখে নেমে আসত এক তরুণ—চুল তার উস্কোখুস্কো, নাকে রিম্‌লেস্ পাঁস্‌নে, আর হাতে কবিতার খাতা। আর এক তরুণী—রঙটা তার শ্যামলা অর্থাৎ বেশী কটাও নয় আবার কালোও নয়, ঠোঁট্‌দুটোয় বেশ্ মিষ্টি গোছের একটু লালচে ছাপ, চুলগুলো কখনো বেণীদোদুল্ আবার কখনো কাণের উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে নামিয়ে দেওয়া। আর তাঁর চোখ্‌দুটি হচ্ছে সব্‌চেয়ে সুন্দর—ঠিক্ পদ্মপলাশের মত নয়, কিন্তু কেমন যেন ঘুমিয়ে-পড়া ভাবে ভরা, ভুলে-যাওয়া স্বপ্নের স্মৃতিমাখানো যেন। হয়তো এক একদিন তরুণী লিখ্‌তেন, পরদিন 'ছু' কি 'মেমোরিয়ালে' তাঁদের বেড়াতে যাবার কথা আছে। আমি বেশ্ অনুভব করতুম, কি নিবিড় উৎকণ্ঠার সঙ্গে তরুণ সেই সময়টির অপেক্ষা করে থাকতেন। তার পর —শুধু ক্ষণেকের দেখা। তরুণীর চোখের বিদ্যুৎ মুহূর্ত্তেকের জন্য তাঁর মনে আলো জেলে দিয়ে যেত—মুখ একটুও চাহনি, শুধু চোখ্ আর গালের একপাশটা দেখ্‌তে পাওয়া—তারপর সঙ্গিনীদের সঙ্গে বন্দিনীর মত তরুণী অদৃশ্য হয়ে যেতেন। তরুণের নিস্পন্দভাবটা কেটে যেত যখন, তখন তিনি ছুটে চল্‌তেন রাস্তার ধারে তরুণীর ফেরবার পথে,···ওই মোটরটা এসে গেল, ঐ তরুণীর অনাবৃত হাতটা বাইরে এলিয়ে পড়েছে, সাড়ির লাল্ টক্‌টকে পাড়্‌টা বেলা-শেষের রোদে ঝল্‌সে উঠ্‌ল।····এম্‌নি কত কি ভাব্ হুড়্‌মুড়্ করে আমার চোখের সাম্‌নে দিয়ে ভেসে যেত।

দুই দিন পর পর একের উত্তর কাগজে ছাপা হত। হয়তো প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের কাছে চিঠি লেখবার কোনো উপায় ছিল না, তাই তাঁরা এই পথের অনুবর্ত্তী হয়েছিলেন। আজ উত্তর-আসার দিন ছিল তরুণের কাছ্ থেকে।····· কিন্তু এ কি? ও কলম্‌টায় ঐ অতিশয় বিশ্রী বিজ্ঞাপনটা ছাড়া আর যে কিছুই নেই। তরুণী এ দেখে বড়ই আঘাত পাবেন, কাগজ পেয়েই দুরুদুরু বুকে কাঁপা-কাঁপা হাতে যখন তিনি খুলে দেখ্‌বেন তখন তাঁর সুন্দর চোখ্‌দুটি জলে ছল্‌ছল্ করে উঠ্‌বে—আর তার চেয়েও বেশী কষ্ট, কেউ ওঁর কান্না দেখ্‌তে পেলে কিনা এই ভয়ে পিছনে চেয়েই চকিতে চোখের জল মুছে ফেল্‌তে হবে; মুখে হাসি এঁটে সকলের পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে হবে, আর জিগ্‌গেস্ করতে হবে, 'আপনার ক'চামচ চিনি?' তখন হাত কি তাঁর কেঁপে উঠ্‌বে না, গলার স্বর ভেঙে পড়্‌বে না, নিশ্বাস নাম্‌বে না দ্রুত?

·····মনটা সত্যিই একটু খারাপ্ হয়ে গেল। চোখ্‌দুটো যন্ত্রের মত লাইনের পর লাইন্ পড়ে চল্‌ল; যেতে যেতে একটা জায়গায় দৃষ্টি আট্‌কে গেল। মস্ত একটা আগ্রহ মনের মধ্যে কল্‌লে উঠ্‌ল। তার বাংলা করলে কথাগুলো এইরকম দাঁড়ায়,—

"গত ১৪ই জানুয়ারি আমি—সিনেমা হাউসে 'দি থিফ্ অব্ বাগ্‌দাদ্' দেখ্‌তে গেছলুম। ওপরের বক্সে বসে রেলিংএ হাত রেখে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা জায়গায় এমন মশগুল্ হয়ে পড়েছিলুম যে হাতের রুমালটা ফস্‌কে রেলিং টপকে নীচে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই ফিল্ম্ শেষ হল ও আমার রুমালটা ফিরে-পাওয়া হয়ে উঠল না। কোন দর্শক যদি সেটা পেয়ে থাকেন, অনুগ্রহ করে আমার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বাধিত করবেন। রুমাল্‌টা এক্ প্রিয় বন্ধুর উপহার—সেজন্যে আমার কাছে যথেষ্ট মূল্যবান্।

শ্রীবিজলী মিত্র,—ল্যান্স্‌ডাউন্ রোড্।

বিজ্ঞাপনটা পড়লুম—একবার নয়, দুবার নয়, তিন্‌বার। একটা নতুন রোমান্সের ছবি মনে ঝল্‌মল্ করে গেল। চট্ করে উঠে পড়ে সুট্ কেশটা খুলে একটি বাক্স বার করলুম—আর তাথেকে ছোট্ট একটি রুমাল।

কিছুক্ষণ একটা স্তব্ধ বিস্ময়ে কেটে গেল। তারপর রুমালটা মুখের ওপর চেপে ধরলুম—একটা ঝিম্‌ঝিমে ভাব বুক্‌টাকে যেন অসাড় করে দিলে। মনে হল যেন কার হৃদয়ের স্পন্দন শুন্‌তে পাচ্ছি,—টিপ্‌টিপ্—রিম্‌ঝিম্!···মৃদু··· বহুদূর-হতে-আসা···ভালবাসা-জাগানো স্পন্দন। হাস্‌নোহেনার গন্ধে মনে বেশ একটা তৃপ্তি এল। অনেক দিন আগে মাখানো সেন্ট, তাই খুব হাল্কা। তীব্র জিনিসের মাদকতার চেয়ে হাল্কা লাওয়ার মত ফুরফুরে আল্‌গোছে ছুঁয়ে-যাওয়া-গোছের ভাব্ আমার অনেক বেশী ভাল লাগে। পাশের বাড়ী থেকে ভেসে-আসা সেতারের মৃদু ওজনটি কেন যে আমার এত প্রিয়—যদিও যে বোড়শী সেতার বাজায় তার মধ্যে বাইরের রূপের এতটুকুও বাহুল্য নেই—তা আজ বেশ বুঝ্‌লুম।

তার পর ভাবলুম—কি বেকুব আমি! অনেক আগেই

আমার বোঝা উচিত ছিল যে এ রুমালটি এক তরুণীর। এর আকার এবং প্রকার দুই-ই জানিয়ে দেয় যে এর মধ্যে মেয়েলি ভাব যথেষ্ট রয়েছে; কিন্তু শুধু তাই নয়; এর স্পর্শ এত কোমল (জাপানি সিল্কের কোমলত্বে আমার চোখ সেদিন থেকে বিশেষ-ভাবে খুলে গেছে)—এর বর্ণ এমন সুন্দর—আকাশের কিংকে নীলের মত—আর এর মৃদু গন্ধ যা মেয়েদের চুলের-মধ্যে-জড়িয়ে-থাকা মিষ্টি গন্ধটুকু মনে পড়িয়ে দেয়—এ সমস্তই—সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করছে এক নারীর দিকে।

কল্পনায় দেখলুম সে নারীর রূপ। সজ্ঞানে তার চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো। "সঞ্চারিণী পল্লবিনী" লতার মত সে—দ্রুতচরণে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার হঠাৎ কি ভেবে বিষম আগ্রহে তার দিদির কচি মেয়েটিকে কোলে চেপে ধরে তার পাপড়ির মত তুলতুলে গালে ছোট একটি চুমু খেলে। তার পর শিথিল আঁচলটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে বাড়ীর বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে রাস্তার জনতার দিকে চেয়ে রইল। এক যুবক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দুবার তার দিকে ফিরে চাইলে; তরুণীর মুখ অজানিতে কি-রকম যেন রাঙিয়ে উঠ্‌ল। একজন ১৬।১৭ বছরের ছেলে সাইকেল চেড়ে যেতে দূর থেকে তাকে দেখে হ্যাণ্ড ছেড়ে সাইকেল চালিয়ে নিজের বাহাদুরিটা দেখিয়ে দিয়ে গেল। তরুণীর ঠোঁট দুটি উচ্ছল, মিষ্টি হাসিতে কচি বাঁশপাতার মত খিরিখিরি কেঁপে উঠ্‌ল। চোখে তার অলসতা, আঁচলে আকুলতা। মুখ তার জ্যোৎস্নার মত শুভ্র, শুধু গালদুটিতে অল্প একটু গোলাপের ছোপ্। অকারণে সে গান গেয়ে ওঠে আর না-জানা-কারণে ছোট ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই হেসে ফেলে।

আর একবার রুমালটা মুখে চেপে ধরলুম।

মনে পড়ে গেল ১৫ দিন আগের কথা—যেদিন রুমালটা প্রথম পাই। ভগলাস্ কেয়ারব্যাঙ্কএর অপরূপ কলানিপুণতায় মন তখন মুগ্ধ। মেঘের মধ্য দিয়ে এক ঘোড়া উড়ে আসছে—তার ওপর চোরের বেশে কেয়ার-ব্যাঙ্কস্! রাতটা হয়ে যাবার পর মনের ঔৎসুক্যের তাপ কিছু কমে আসতেই হাতে বেশ একটা কোমল স্পর্শ অনুভব করলুম—আর কিসের এক ফুরফুরে গন্ধ। মাথা নামাতেই দেখি এক রুমাল। বুঝলুম ওপরের বন্ধের কারুর প'ড়ে গেছে। সেটার সদ্গতির কোনো উপায় না দেখে পকেটস্থ করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করলুম। সামান্য একটা জিনিস—তার জন্যে মস্তিষ্ককে অনর্থক আর আলোড়িত করা সম্পূর্ণ অসার—এবিষয়ে আমার এক কণাও সন্দেহ ছিল না।

হঠাৎ সামনের টিপয়টার দিকে চোখ্ পড়্‌ল। যাঃ, চা-টা যে খাওয়াই হয়নি—একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এরকম ভুল বোধ হয় জীবনে এই আমার প্রথম। 'বয়'কে ডেকে আর এক্ কাপ চা আন্‌তে বলে ব্যাপারটা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে চিন্তায়—সাগর নয়, সুশীতল ঝরণায় ডুব্ দিলুম।

স্থির করলুম, এই রুমালের সাহায্যে তার সঙ্গে পরিচিত হব। হংসদূতী দময়ন্তীর কাছে যেমন এক বার্তা নিয়ে গেছ্‌ল, আমার রুমালদূতী বিংশ শতাব্দীর দময়ন্তী শ্রীবিমলী মিত্রের কাছে তেম্‌নি এক বার্তা বহন করবে।

কিন্তু কখন যাবো? কাল? না—না, অত-দেরী নয়—আজ ও-বেলাই।

আচ্ছা, আমাদের প্রথম পরিচয়টা কি রকম হবে? কণ্ঠে তার মধু ঝরবে, না দৃষ্টিতে মদিরা? গালে তার গোলাপের লাল ফুটে উঠ্‌বে? কেয়ার মত কপোলটি তার ঝিল্‌মিল্ করবে নাকি সিঁদুর-রঙে? রুমালটি যখন দিতে যাবো, তখন সে হয়তো একবার চকিতে আমার দিকে চেয়ে মুখটি বাঁকিয়ে অলখিতে শুধু একটু হাস্‌বে। আমি বল্‌ব "আপনার জিনিস আমি ফেরত্ এনেছি কিন্তু—কিন্তু—মাফ্ করবেন, কুড়োনো জিনিস যে পায় তার কি একটুও দাবী থাকে না তার ওপর? পুরস্কারের প্রত্যাশা করে নাকি সে?" তরুণীর সারা মুখ এবার রক্তজবার মত টক্‌টকে লাল হয়ে উঠ্‌বে। কিছুক্ষণ মুখ নীচু ক'রে বসে থাকার পর সে হঠাৎ দুচোখে কি-একটা রহস্য ভ'রে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌বে, তার পর তার গলার সুর কেঁপে উঠ্‌বে—ঝাউবনে বাতাসের দোলানির মত। ততক্ষণ আমি তার ঝাঁকড়া কোঁকড়া কালো মেঘের মত চুলগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তার মনস্তত্ত্ব নিরূপণ করবার চেষ্টা করব। সে আমার দিকে চাইতেই আমার চোখের চাওয়া কোমলতায় দুইয়ে আস্‌বে। সে বল্‌বে, দাবীর যার অন্ত নেই, তার কি চাইতে আছে কিছু? পুরস্কারের পাওনা

যার শেষ সীমায় পৌঁচেছে, সব্ দেনার বাঁধন চৌচির ক'রে, সে কি তার প্রাপ্য ছিনিয়ে নিতে জানে না? এ কথা শুনে ধীরে আমি উঠে পড়ব,—দু'পা এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্কোচটা মল্লিকার মত ধবধবে, মনোরম হাতটা আমার হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে সুরটা যথাসম্ভব ঘোলায়েম ক'রে দীপ্তনয়নে তার দিকে চেয়ে বল্ব, বড় সুখী করলে।

তার পর? আমার কল্পনার চরখা ঘুরেই চলেছে—হঠাৎ কি-রকম্ একটা টান্ লাগায় সুতোটা ছিঁড়ে গেল। দেখি, চা হাজির!.....

.....সেদিন খাবার সময়ে মিনা বল্লে, আজ্ তোমাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন দাদা?

বল্লুম,—উঃ দা ব্যস্ত এক্ মর্টগেজ্ কেস্ নিয়ে—সেটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেল্বার সময় নেই আমার।

বার লাইব্রেরিতে গিয়ে আজ আর কড়িকাঠের সংখ্যা-নিরূপণে মন দেওয়ার কোনো আবশ্যকতা দেখলুম না—সময় কোনারক-যাত্রী গরুর গাড়ীর মত ধীরমন্থর গতিতে বয়ে চল্ল—ততক্ষণ না আর শ্রীবিজলী মিত্র তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসি আর গালের টোলে লজ্জার রাঙা নিয়ে আবার আমার মনের চোখে উদিত হলেন।

বিজলী, বিজলী, বিজলী—কি মিষ্টি নাম! মনে পড়ে যায় এক ঝড়ের রাত্—সাপের মত ফণা-তোলা কালো মেঘ, বাতাসের ঘন ঘন অট্টহাসি, আর তার মাঝে বিজ্লীর চম্কানি। সেই আকাশের বিজ্লী যেন দেহের মধ্যে বন্দী হয়ে এক্ মানবীর সৃষ্টি করেছে। তাই সে নারী অমন চলচঞ্চল, তার চোখের চাহনি অমন অকস্মাৎ চম্কে দিয়ে যায়।

কল্পনা মেয়েটি, কেন জানি না, ছেলেবেলা থেকেই আমায় ভালবেসে ফেলেছে। আমার বয়েস্ যখন ছিল ১০, তখন দাদা একদিন আমার জাগ্রৎ-স্বপ্নের ঝোঁকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে আমার কাণ দুটির ওপর অকারণে অত্যাচার ক'রে আমায় ভূবৃত্তান্তের পাতায় মনোনিবেশ্ করবার উপদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু সেইদিনই লুকিয়ে লুকিয়ে শুন্লুম তিনি বাবাকে বল্ছেন, "ওর আর যাই হোক্, নেচারটা বেশ্ ফ্যান্সিফুল্—চাইকি কালে একটা রবি ঠাকুর হয়ে উঠ্তে পারে।"

হয়তো হতুম—কিন্তু আমার কল্পনা ঠিক্ বিজলী মিত্রেরই মত; ছন্দের বন্ধে ধরা দিতে নিতান্ত নারাজ। তাই আমার কবি হবার সদিচ্ছা কুঁড়িই রয়ে গেল—ফুট্ল না কোনোদিন।.....আঃ, কি মুস্কিল, এক্ মক্কেল যে! আর আমাকেই এন্গেজ্ করতে চায়। অন্যদিন অনেক আরাধনাতেও পাই না, আর আজ না চাইতেই হাজির। মক্কেলদের আক্কেল যে কেন এত কম্ এ বিষয়ে ফ্রয়ড্ ও অন্য মনস্তত্ত্ববিদ্দের অভিমত নেওয়া দরকার করলুম।

বেলা যখন ৪টা, তখন আমার বুক্ দুরদুর্ ক'রে কাঁপ্ছে। কেন? আমার আড্ভেঞ্চার অনেকটা এগিয়ে এসেছিল, আমি তখন বিজলী মিত্রের বাড়ীর ড্রয়িং রুমে ব'সে; বেয়ারাকে দিয়ে কার্ড্টা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

মনে মনে বল্লুম, অয়ি যুদ্ধে, আজ আমাদের প্রথম দেখার বহা স্মরণীয় দিন; আমার ভালবাসার তাজা ফুলগুলি চয়ন করে তোমার জন্যে বহন করে এনেছি। নেবে নাকি? সফল হবে না তোমার এতদিনের পথ চেয়ে থাকা? মনে হল যেন কত দিন হতে আমি বিজলীকে জানি আর বিজলী আমাকে জানে। রুমালটা বার ক'রে নিয়ে তার কোমল ও ঈষৎ শীতল স্পর্শটা একবার অনুভব করলুম।

দুয়োরের ভারী সবুজ পর্দাটা দুলে উঠ্ল। পরক্ষণেই একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে নমস্কার ক'রে দাঁড়ালেন।

তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থাপিত দেখে উত্তর দিলুম, বিজলী মিত্র এখানে থাকেন কি? সেদিন Statesmanএ তাঁর একটা রুমাল-হারানোর বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম—

হাঁ, হাঁ, সে রুমাল কি আপনিই পেয়েছেন? কই দেখি, দেখি—

আস্তে আস্তে রুমালটা বার ক'রে তাঁর চোখের সাম্নে ধরলুম।

চট্ করে সেটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে তিনি বলে উঠ্লেন, আঃ—রুমালটা শেষকালে পাওয়া গেল দেখ্ছি—ওটা ডায়োসিস্যানের এক্ বান্ধবীর দেওয়া উপহার—আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো জানি না—

আমি বল্লুম, মাফ্ করবেন, এ—রুমালটা তো বিজলী মিত্রের—

হ্যাঁ, আমিই বিজলী মিত্র—বিজলীকুমার মিত্র—

ঘরের মধ্যে যেন একটা বাজ্ পড়ল। বিস্মিত, স্তব্ধ, চকিত ইত্যাদি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি। আকাশে কড়্‌কড়্‌.. বাতাসে সাঁইসাঁই···পাশের ঘরে একটা চায়ের পেয়ালা ঝন্‌ঝন্ শব্দে পড়ে চুরমার·····আর আমার কানের পাশ্ দিয়ে যেন একঝাঁক ভোম্‌রা বোঁ-ও-ও ক'রে উড়ে চলে গেল।

* * *

সেদিন থেকে বার লাইব্রেরির নীরস ল'য়ের বইগুলোও আমার কাছে রসাল হয়ে উঠেছে; সখী কল্পনা চিরদিনের জন্য আমায় ত্যাগ করে গেছেন এবং তাঁর জন্যে একটি-বারও হা হতোস্মি করা বা চোখের জল ফেলা আবশ্যক মনে করিনি। নারীজাতির ওপর আমার যে অসীম শ্রদ্ধা ছিল, তা নিতান্তই সসীম হয়ে উঠেছে; এবং বিজলী নামে জিভে মোটেই জড়তা আসে না। Statesman নেওয়া ছেড়ে 'ফরওয়ার্ড্' নিতে সুরু করেছি—যাতে 'পারসোনাল্' কলমটা অজানিত কখনো চোখে না পড়ে। যখন কল্পনার অভাবে বড় একলা একলা বোধ হয়, মনটা উড়ু উড়ু করে, তখন শুধু একটি কথা খানিকটা সান্ত্বনা যোগায়; সে হচ্ছে "·····ডায়োসিসানের এক্ বান্ধবীর দেওয়া উপচার···"

পরম তীর্থ

শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বিন্দুর মা'র আর কেহ নাই, দুখিনী বিধবা মেয়ে,
বিয়ে দুই জমি, কোন মতে কাটে আধ পেটে দু'টো খেয়ে;
অবসর-কালে পৈতা কাটিয়া, পেটে সহি ক্লেশ কত,
সারা জীবনের সঞ্চিত পুঁজি টাকা দেড় দুই শত।

২

ফাল্গুন মাসে ব্রজবাসী এক পাণ্ডা আসিল গাঁয়,
ভক্তি-প্রণত গ্রামবাসী সবে জুটিল তাহার ঠাঁই;
তীর্থে এবার কে কে যাবে দেখ, উঠিল যখন কথা,
সকলের আগু বিন্দু-জননী আসিয়া জুটিল তথা।

৩

শুভদিন দেখি মুড়ি-চাল বাঁধি জন কুড়ি এক সাথে
গাড়ী ধরিবারে বাহির হইল শ্রীহরি স্মরিয়া প্রাতে;
গ্রাম-সীমানায় এসে দেখে তারা দীন কালেমের কুঁড়ে,
দগ্ধ ছাইয়ের স্তূপ একরাশি—বেবাক্ গিয়াছে পুড়ে।

৪

ছেঁড়া কাঁথা আহা তা'ও গেছে পুড়ে, কাঁসার দু'খানি থাল,
ঘড়া দুটী যাহা ছিল সব হল পোড়া পিতলের তাল;
ছেলেগুলো কাঁদে ক্ষুধার তাড়নে, কালেম্ ভাবিছে বসে.
হায় ভগবান, শাস্তি এ মিলে কোন্ জনমের দোষে?

৫

মুখে নাই কথা, বুকভরা ব্যথা কালেমের আঁখি ফুটি;
পরমানন্দ তীর্থ-গামীর চরণে পড়িল লুটি·····!
ডাকিতে সাহস হয় না পিছনে, এগুতে সাহস তা'র,
বুকে নাই বল, শুধু আঁখিজল, বুকভরা হাহাকার।

৬

থমকি দাঁড়ায়ে বিন্দুর মাতা জানি না কি নিজ মনে
নিমেষের মাঝে ভাবিয়া লইল অতঃপর সেই ক্ষণে,—
অঞ্চল হ'তে খুলিয়া বাঁধন যাহা ছিল কিছু তার,
কালেমের হাতে সব দিল দান দেখিল না আরবার।

৭

পাণ্ডা কহিল, "ফেলেছিস্ মাগী, তীর্থের নামে কড়ি,
যবনেরে দান, মরিবি এখুনি রক্ত যে বমি করি!"
নীরবে সহিয়া বিন্দুর মাতা সেথোদের উপহাস,
কহিল হাসিয়া "ফিরিলাম আমি, তোরা যেতে হয় যাস্।

৮

গৃহ-হীনে যদি গৃহ পায় বাবা, নারায়ণ সেথা বাঁধা,
সুদূর তীর্থে কাজ নাই গিয়ে, মিটিয়াছে সব ধাঁধা;
কে যেন বলিল, কালেমের কুঁড়ে পুরী প্রয়াগের সম,
তীর্থের সেরা তীর্থ সে হবে পরম তীর্থ মম।"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

সংস্কৃত-ভাষায় অনুষ্টুপ্-ছন্দঃ

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উভটসাগর বি-এ

ছন্দঃ প্রধানতঃ দুই প্রকার,—বৈদিক ও লৌকিক। লৌকিক-ছন্দঃ পিঙ্গলের মতে তিন প্রকার,—বর্ণ-ছন্দঃ, মাত্রা-ছন্দঃ ও বর্ণ-ছন্দঃ। বৃত্তরত্নাকরকর্ত্তা কেদার-ভট্ট ও ছন্দোমঞ্জরী-কর্ত্তা গঙ্গাদাসের মতে লৌকিক-ছন্দঃ দুই প্রকার,—বৃত্ত ও জাতি। বর্ণ-ছন্দের নাম 'বৃত্ত' এবং মাত্রা-ছন্দের নাম 'জাতি'।

এখন দেখা যাউক, অনুষ্টুপ্-ছন্দঃ কি? অনুষ্টুপ্ বর্ণ-ছন্দঃ; ইহা অষ্টাক্ষরা বৃত্তি। অনুষ্টুপ্ দুই প্রকার। ইহা কখনও সমবৃত্ত, কখনও বা অর্দ্ধসম-বৃত্ত ও বিষম-বৃত্ত হইয়া থাকে। যখন ইহা সমবৃত্ত হয়, তখন চিত্রপদা, মাণবক, বিদ্যুন্মালা, সমানিকা, প্রবাণিকা, গরুত্মতি প্রভৃতি ছন্দঃ ইহার অন্তর্গত। যখন ইহা অর্দ্ধসম-বৃত্ত বা বিষম-বৃত্ত হয়, তখন যাবতীয় 'বক্ত্র-ছন্দঃ' ইহার অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। শেষোক্ত প্রকার অনুষ্টুপ্‌কে কেহ কেহ বক্ত্র, কেহ কেহ বা অনুষ্টুপ্-বক্ত্রও বলিয়া থাকেন।

সমবৃত্ত অনুষ্টুপ্ অতি সরল, কারণ ইহার প্রত্যেক চরণে একরূপ বর্ণই থাকে। অর্দ্ধসম ও বিষম-বৃত্ত অনুষ্টুপ্ অপেক্ষাকৃত দুরূহ। শেষোক্ত প্রকার অনুষ্টুপ্-ছন্দই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

অনুষ্টুপ্ 'সাধারণ নাম' মাত্র। ইহা বারশ প্রকার; যথা,—(১) বক্ত্র, (২) পথ্যা-বক্ত্র, (৩) বিপরীত-পথ্যাবক্ত্র, (৪) চপলা-বক্ত্র, (৫) বিপুলা-বক্ত্র ও ভ-বিপুলা-বক্ত্র, (৬) ত-বিপুলা-বক্ত্র, (৭) র-বিপুলা-বক্ত্র, (৮) ন-বিপুলা-বক্ত্র, (৯) ত-বিপুলা-বক্ত্র, (১০) ম-বিপুলা-বক্ত্র, (১১) য-বিপুলা-বক্ত্র, (১২) সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্র। প্রত্যেক ছন্দের প্রকৃতি দেখাইবার পূর্ব্বে ১০টি গণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদর্শন করা উচিত :—

"ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ মকারো
আদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুঃ টঃ।
যো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ।"
"ভস্ত্রেরেকো গুরুরন্ত্য নকারো লঘুরেকঃ।"

ইহার অর্থঃ—ম=ত্রিগুরু, ন=ত্রিলঘু, ভ=আদিগুরু; র=আদিলঘু, জ=গুরুমধ্য; ত=লঘুমধ্য; দ=অন্তগুরু; ত=অন্তলঘু; গ=একটি গুরু; ল=একটি লঘু।

"ন প্রথমাৎ সৌ" (পিঙ্গল ৪।১০)। "দ্বিতীয়চতুর্থয়োর্ন ভ" (পিঙ্গল ৪।১১)। পূর্ব্বে যে দ্বাদশ প্রকার অনুষ্টুপ্-ছন্দের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন পাদেরই প্রথম বর্ণের পরে স-গণ কিংবা ন-গণ থাকিতে না; এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের প্রথম বর্ণের পরে র-গণও থাকিবে না। ইহাই উক্ত দ্বাদশ প্রকার অনুষ্টুপ্-ছন্দে বিধেয়-বাক্য। কিন্তু মহাকবি-গণেরও প্রয়োগে এই বিধেয়-বাক্য প্রতিপালিত হয় নাই। যথা :—

(ক) "প্রভাময়াকৃতায়াস্তে দীপধনিপদান্তরাৎ।
প্রবিভক্তাকৃতায়াসৌ কাকুৎস্থায়তিভিস্তিতঃ॥" (ভট্টি ৩।২)

(খ) "পবনচূতলুখাস্তা উদ্ভবন্ধরাধরাঃ।
ফলং পুষ্পং ফলং পুষ্পং কর্ণ যাস্থ কর্ণ যাস্থসি॥" (ইন্দুদূ)

(গ) "ওষধয়ঃ সুধয়েবাস্মান্ সাদয়ন্তাংশ্চ সর্ব্বতঃ।
বৃক্ষুষে দেবসাৎকৃত্বা পুণ্যমুখাক হোমবম্॥" (ভট্টি ৪।৯)

(ঘ) "সিংহাদেকঃ বলাদেকঃ দ্বৌ ওনস্ত্রীণি দর্শতাৎ।
বাসসাং পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারিকুকুটাদপি॥" (লঘু-চাণক্য ৬৪)

এখানে (ক) শ্লোকের তৃতীয়-পাদে "বিতত্য" এই স-গণঃ, (খ) শ্লোকের প্রথম-পাদে "অলঘু" এবং দ্বিতীয় পাদে "তমস" এই দুইটি স-গণ, (গ) শ্লোকের প্রথম-পাদে "বসুধ" এই ন-গণ; এবং (ঘ) শ্লোকের চতুর্থ-পাদে "বায়িকু" এই র-গণ থাকায় পিঙ্গলের মতে ছন্দোদোষ হইয়াছে।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে র-গণ রাখা নিষিদ্ধ, ইহা পিঙ্গলের মত। কিন্তু বৃত্তরত্নাকর-কর্ত্তা কেদার-ভট্ট এ কথার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। বৃত্তরত্নাকরের টীকাকার নারায়ণ-ভট্ট বলেন যে, কাহারও কাহারও মতে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে র-গণ রাখা অনুচিত। ইহার অজ্ঞতায় টীকাকার রামচন্দ্র কবি-ভারতি, র-গণ রাখা উচিত কি অনুচিত, তৎসম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই।

এখন দ্বাদশ প্রকার অনুষ্টুপ্-ছন্দের প্রত্যেকটির প্রকৃতি কিরূপ, তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে :—

(১) বক্ত্র।

"ন চতুর্থাৎ" (পিঙ্গল ৪।১৩)

"পাদস্য চতুর্থাদ্ অক্ষরাদ্ ঊর্দ্ধং ন-কারঃ প্রযোক্তব্যঃ" (হলায়ুধঃ)

যে অনুষ্টুপ্-কবিতার প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে ন-গণ থাকে, তাহাকে "বক্ত্র" বলে। যথা,

"তৃতীয়েঽপি সৌভাগ্যং আহুঃ প্রকৃতয়ে শ্রীতিঃ।
বাসুদেবো হরত্যেব যৌবনানিত্যোক্তিবালঃ॥" (হলায়ুধঃ)

বৃত্তরত্নাকর-কর্ত্তা কেদার-ভট্টও পিঙ্গলের মতানুসরণ করিয়া বক্ত্রের এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন :—

"অন্যেষোঽনুষ্টুভি খ্যাতম্।"

কিন্তু ছন্দোমঞ্জরী-কর্ত্তা গঙ্গাদাস, পিঙ্গলের নিয়ম অতিক্রম করিয়া বক্ত্রের এই লক্ষণ করিয়া দিয়াছেন :—

"বক্ত্রং দ্বয়োর্যদৌ তাতাস্যেষোঽনুষ্টুভি খ্যাতম্।" (গঙ্গাদাসঃ)

অন্বয়ার্থ,—"অনুষ্টুভি অন্যেষু-বৃত্তৌ দ্বয়োঃ চরণয়োঃ যদৌ প্রাপ্য (যত্বর্থে পঞ্চমী) তৌ তাতাস্যম্। চরণয়োঃ প্রথমং চরমঃ গুরবঃ ইত্যর্থঃ। অন্যেষু চতুর্থ-বর্ণাৎ পরং যঃ ন-গণস্তেন তথা বক্ত্রং নাম খ্যাতম্।"—(শিবরামণিঃ)

গঙ্গাদাসের মতে বক্ত্রের দুই পাদে প্রথম চারিটি বর্ণ গুরু থাকিবে; এবং প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে ন-গণ থাকিবে।

উদাহরণম্ :—

"বক্ত্রান্তোঽং সদা স্নেহং চন্দ্রমৌলেঽপাদং দুহন্।
বরদীনাং দুরাপাঽপ্যেতোদুরং জহারোচ্চৈঃ।" (গঙ্গাদাসঃ)

(২) পথ্যা-বক্ত্রম্।

"পথ্যা দ্বয়োর্হ্রৌ" (পিঙ্গল ৭।১৮)

"যত্র বক্ত্রে দ্বয়োঃ পাদয়ো চতুর্থাদ্ অক্ষরাদ্ ভবং হ-কারঃ প্রযুজ্যতে, তদ্ বক্ত্রং পথ্যা নাম। যথা অশ্বধারঃ।" (হলায়ুধঃ)

যে বক্ত্রে দুই-পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে হ-গণ থাকে, তাহাকে পথ্যাবক্ত্র বলে। এই পথ্যাবক্ত্র-ছন্দের অন্য-পাদে যে ন-গণ থাকিবে, তাহা স্মরণ করিয়া রাখা চাই। কারণ বক্ত্র-ছন্দেই ন-গণের থাকিবার কথা বলা হইয়াছে। উদাহরণ,—

"বাসর্ষাবিব সম্পৃক্তৌ বাসর্ষপ্রতিপত্তরে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥" (কালিদাসঃ)

মন্তব্য। বাহান্ন প্রকার অনুষ্টুপ্-ছন্দের মধ্যে পথ্যাবক্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুবন্ধুর। এই পথ্যাবক্ত্র-ছন্দঃ লইয়াই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লোকই এই ছন্দে রচিত।

অনেকে মনে করেন যে, নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোকে অনুষ্টুপ্ ছন্দেরই লক্ষণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। ইহারা পথ্যাবক্ত্র-ছন্দেরই লক্ষণ বলিয়া দিতেছে। যথা,—

(ক) "পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
ষষ্ঠং গুরু পাদানাং শ্লোকে শ্লোকনিয়মো যতঃ।"

(খ) "শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘু পঞ্চমম্।
দ্বিচতুষ্পাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ।"

(ক) শ্লোকের অর্থ এই—সকল পাদেরই পঞ্চম বর্ণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ লঘু; এবং সমস্ত পাদেরই ষষ্ঠ বর্ণ গুরু। অবশিষ্ট ভাগে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই।

(খ) শ্লোকের অর্থ এই—সকল পাদেরই ষষ্ঠ বর্ণ গুরু ও পঞ্চম বর্ণ লঘু; এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ লঘু এবং প্রথম ও তৃতীয় পাদের সপ্তম বর্ণ গুরু হইয়া থাকে।

মন্তব্য। এখনে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, উক্ত দুইটী শ্লোকেরই তাৎপর্য্য একরূপ। বিশেষতঃ পথ্যাবক্ত্র-ছন্দের যে লক্ষণ, উক্ত দুইটী শ্লোকের প্রত্যেকটীরই সেই লক্ষণ। অতএব যে সকল কবিতা উক্ত দুইটী লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত, তাহাদিগকে "অনুষ্টুপ্" না বলিয়া 'পথ্যাবক্ত্র' বলাই উচিত। তাহার 'অনুষ্টুপ্' সাধারণ নাম, এবং 'পথ্যাবক্ত্র' বিশেষ নাম। বিশেষ নাম থাকিতে সাধারণ নাম গ্রহণ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। ইহাই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, কালিদাস "প্রস্তুতোবে" পদ্যের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই যে, কোন পাদেরই প্রথম বর্ণের পরে ন-গণ কিংবা ন-গণ থাকিবে না, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের প্রথম বর্ণের পরে র-গণ থাকিবে না। বোধ হয়, শ্লোকটিকে মোটামুটি বুঝাইবার জন্যই তিনি সংক্ষেপে কাজ সারিয়াছেন।

এইখানে একটি বিশেষ কথা বলা আবশ্যক। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়ের ধারণা আছে যে, যে সকল কবিতা "পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র" ও "শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং" এই দুইটি শ্লোকের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, তাহারা 'অনুষ্টুপ্' এবং তদ্ভিন্ন শ্লোক সকল "পথ্যাবক্ত্র"। কিন্তু এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা।

(৩) বিপরীত-পথ্যাবক্ত্রম্।

"বিপরীতেকীয়ম্" (পিঙ্গল ৭।১৯)

লক্ষণলক্ষ্যাম্ (পথ্যাবক্ত্র-লক্ষণাদিভির্যথাঃ) বিপরীত-লক্ষণা একীয়-মতে পথ্যা ভবতি। অর্থাৎ অন্য-পাদে চতুর্থাদ্ অক্ষরাদ্ পরস্তো হ-কারঃ কর্ত্তব্যঃ, দুই-পাদে য-কার এবং অবতিষ্ঠতে। পথ্যাবক্ত্রের প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে য-গণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে হ-গণ থাকে। কিন্তু বিপরীত-পথ্যাবক্ত্র এই নিয়মের ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ ইহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে হ-গণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে য-গণ থাকে। উদাহরণ যথা,—

বাসর্ষপ্রতিপত্তয়ে বাসর্ষাবিব সম্পৃক্তৌ।
পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ জগতঃ পিতরৌ বন্দে।

(৪) চপলা-বক্ত্রম্।

"চপলাদ্যুগলো ন্" (পিঙ্গল ৭।১৩)

"অন্য-পাদয়ো যদা চতুর্থাদূর্দ্ধং ন-কারো ভবতি, দুই-পাদে য এব অবতিষ্ঠতে, তদা চপলা নাম সা অনুষ্টুব্-বক্ত্রম্।" (হলায়ুধঃ)

যখন অন্য-পাদে চতুর্থ-বর্ণের পরে ন-গণ এবং দুই-পাদে চতুর্থ-বর্ণের পরে য-গণ থাকে, তখন "চপলা-বক্ত্র" হইয়া থাকে। যথা,

"শ্রীরমণা প্রবসনা বক্ত্রমির্মাংসবালাগ্রা।
কন্তকা বাকাচপলা ভবতে মূর্ত্তিস্তোতায়াম্।"

(৫) বিপুলা-বক্ত্রম্ সৈতব-জ-বিপুলা-বক্ত্রঞ্চ।

(ক) "বিপুলা যুজঃ সপ্তমঃ" (পিঙ্গল ৪।১৭) ; (খ) "সর্ব্বতঃ সৈতবস্ত" (পিঙ্গল ৪।১৮)

(ক) "য চতুর্থাদিস্থানেন সর্ব্বত্র য-কারে প্রাপ্তে যদা যুক্-পাদে সপ্তমো বর্ণো লঘুর্ভবতি, তদা বিপুলা নাম।"—(হলায়ুধঃ)। সপ্তমো বর্ণো লঘুর্ভবতি ইতি যুক্-পাদে চতুর্থাদিযু য-কার-স্থানে জ-কারো জ্ঞাতীতার্থঃ।

বৃত্ত-রত্নাকরে "য চতুর্থাৎ" এই যে সূত্র করা হইয়াছে, তদনুসারে প্রত্যেক পাদেরই চতুর্থ বর্ণের পরে য-গণ হইবার বিধান আছে ; কিন্তু যখন বৃত্তিকার বলিয়াছেন, "যুক্-পাদে সপ্তমো বর্ণো লঘুর্ভবতি", তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, বিপুলা-ছন্দে যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে সপ্তম বর্ণ লঘু হইবে, অর্থাৎ য-কার-স্থানে জ-কার হইবে।

(খ) সৈতবস্ত আচার্য্যের মতেও যুক্-পাদে অযুক্-পাদে চ সপ্তমো লকার এব কর্ত্তব্যঃ।

সৈতবাচার্য্যের মতে কি যুক্-পাদে কি অযুক্-পাদে সর্ব্বত্রই সপ্তম বর্ণ লঘু হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ (৷ ৷ ৷) হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা,—

(১) "সৈতবেন পথাদর্শিবং ভীর্ণো যশরথাত্মজঃ।
রক্ষঃক্ষয়করীং পুনঃ প্রতিজ্ঞাং যেন বাহনা।" (হলায়ুধঃ)

(২) "যদেতদ্ হৃদয়ং তব তবস্ত হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তবস্ত হৃদয়ং তব।" (ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণে)

(৩) "অস্মিন্ হৃদয়গ্রহীৎ সবিতা হৃদয়গ্রহীৎ।
মথাযা হৃদয়গ্রহীৎ বিশ্বতমসি কর্ত্তণা।" (মহ-ব্রাহ্মণে)

(৬) ভ-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"ভৌ ভৌ চ" (পিঙ্গল ৪।১৯)

"ভৌ ভৌ চ বিপুলাবেকা বক্ত্রজাতিঃ সমীরিতা।" (অগ্নিপুরাণম্)

(ক) "অযুক্-পাদে যদা চতুর্থাৎ অক্ষরাৎ পরতো য-কারং বাধিত্বা ভকার-রেফ-যকার-ভকারা বিকল্পেন ভবন্তি, তদাপি বিপুলা নাম। ভকারাৎ যকার-সকারাভ্যামপি বিপুলোপপত্তিঃ। সর্ব্বাসাং বিপুলানাং চতুর্থো বর্ণঃ প্রায়েণ গুরুর্ভবতীত্যাশয়ঃ।" (হলায়ুধঃ)

(খ) "বিপুলায়াং যুক্-পাদে চতুর্থাদিষু য-কারং বাধিত্বা জ-কারো ভবতি, অযুক্-পাদে তু চতুর্থাদিষু য-কারং বাধিত্বা ভকার-রেফ-যকার-ভকারা বিকল্পেন ভবন্তি ; সৈতবস্ত মতেন যুক্-পাদে অযুক্-পাদে চ চতুর্থাদিষু য-কারং বাধিত্বা জ-কারো ভবতি। পথ্যায়াস্তু যুক্-পাদে চতুর্থাদিষু জ-কারো ভবতি, অযুক্-পাদে য-কার এব অবস্থিতঃ, ইত্যেবং পথ্যাবিপুলয়োর্ভেদো বোধ্যঃ" (স্মৃতিতীর্থঃ)

(ক) বিপুলা-ছন্দের অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে য-কার-স্থানে কখন কখনও ভ-কার, রেফ, ম-কার বা ত-কার হইয়া থাকে। "ভৌ ভৌ চ" এই পিঙ্গল-কৃত সূত্রে "চ" এই পদ-দ্বারা ম-কার ও ন-কার পাওয়া যাইতেছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি কোন অনুষ্টুপ্-কবিতার যুক্-পাদে জ-গণ থাকে, এবং অযুক্-পাদে ভ-গণ, র-গণ, ন-গণ, ত-গণ, ম-গণ অথবা স-গণ থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম যথাক্রমে ভ-বিপুলা-বক্ত্র, র-বিপুলা-বক্ত্র, ন-বিপুলা-বক্ত্র, ত-বিপুলা-বক্ত্র, ম-বিপুলা-বক্ত্র, অথবা স-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। এই ষট্-প্রকার বিপুলার প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণ প্রায় গুরু হইয়া থাকে।

(খ) এখন দেখা যাউক, পথ্যাবক্ত্র ও বিপুলা-বক্ত্র প্রভেদ কি ? পথ্যাবক্ত্রের যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ এবং অযুক্-পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে য-গণ থাকে ; কিন্তু বিপুলা-বক্ত্রের যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ এবং অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ভ-গণ, র-গণ, ন-গণ, ত-গণ, ম-গণ অথবা স-গণ থাকে। সৈতবাচার্য্যের মতে বিপুলা-বক্ত্রের প্রত্যেক পাদেরই চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকিবে। পথ্যা-বক্ত্র ও বিপুলা-বক্ত্রের উদাহরণ। যথা,—

"ঘটে ঘটে বৈশ্রবণস্তারে চক্রে শিবঃ।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে রামঃ সর্ব্বত্র মধুসূদনঃ।" (হলায়ুধঃ)

"যথা বহ্নিজ্বালিরসানুরী প্রাচ্যেতরস্তথা।
জনকানাং হৃদয়াক্ষ বংশয়োরুভয়োরপি।" (ভবভূতিঃ)

"মুকুন্দঃ লক্ষিতাশেষঃ প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধঃ ব্যাকরণঃ পরোপকৃতয়ে যয়া।" (বোপদেবঃ)

বৃত্তরত্নাকর-কর্ত্তা কেদার-ভট্ট ভ-বিপুলা-বক্ত্রের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন :—

"ভৌ ভাদ্বিতৌ ভাবিপুলা" (কেদার-ভট্ট ২।৪৮)

"অন্তিমঃ সমুদ্যাৎ চতুর্থী; অক্ষরেভ্যঃ পরেণ ভেন জ-গণেন ভাবিপুলা ভ-কারাৎ পরা বিপুলা ভ-বিপুলা নাম স্যাৎ।"—কবি-ভারতিঃ। ইহা যথা :—

"বিষাণী কপালকরঃ সদা রোষায় ভাজতি।
পশুপাঃ পক্ষপাতঃ পরাক্রমবান্ পতে :।" (রামচন্দ্র কবি-ভারতি :)

বৌদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র কবি-ভারতি "বৃত্তরত্নাকরের" অন্যতর টীকাকার। তিনি বৃত্তরত্নাকরের উপর্যুক্ত লক্ষণটির ব্যাখ্যা উল্লিখিত-প্রকারেই করিয়া এই কবিতাটি উদাহরণ স্বরূপ দিয়াছেন। কবি-ভারতির মতে প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে ভ-গণ থাকিলে তবে ভ-বিপুলা-বক্ত্র হয়। কিন্তু পিঙ্গল বলেন যে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকিলে, এবং প্রথম ও তৃতীয় পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে ভ-গণ থাকিলে তবে ভ-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পিঙ্গল ও কবি-ভারতির মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

(৭) র-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"ইষবস্তা রশ্চতুর্থাৎ" (বৃত্তরত্নাকরঃ ২।৪৯)

"চতুর্থাৎ বর্ণাৎ পরেণ ভ-গণেন যথা ভ-বিপুলা অযুৎ, ইষবঃ অনেন প্রকারেণ চতুর্থাৎ পরো যঃ র-গণস্তেন, তথা সত্যা র-বিপুলা নাম স্যাৎ।" —কবি-ভারতিঃ।

যদি প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে র-গণ থাকে, তাহা হইলে

কবি-ভারতির মতে ন-বিপুলা-বক্ত্র হয়। কিন্তু যদি যুক্-পাদে জ-গণ থাকে, এবং অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ন-গণ থাকে, তাহা হইলে পিঙ্গলের মতে ন-বিপুলা বক্ত্র হইয়া থাকে।

কবিভারতি-মতে ন-বিপুলাঃ—

"নাপি বক্ত্রং যত্র যেনেতি চ যাচকে তম্।
সর্ব্বজ্ঞোঽসি ক্ব ন তস্মাৎ পরাক্রমবারণেন।" (কবি-ভারতি)

পিঙ্গল-মতে ন বিপুলাঃ—

"শ্রীহালকবিঃ কালিদাসঃ রুদ্রে বাগ্‌দেবতাং গুরুম্।
জ্ঞিজ্ঞানে বিষমাভাতি দর্পণে প্রতিবিম্বিবৎ।" (হলায়ুধঃ)

দ্রষ্টব্য। পিঙ্গলের মতে অন্যান্য বিপুলা-বক্ত্রও ঠিক এইরূপ ভাবেই চলিবে।

(৮) ন-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"নোঽযুক্তেঽন্তেবিপুলা।" (বৃত্তরত্নাকরঃ ২।৩৯)

"অযুক্তঃ চতুর্থো বর্ণোঽন্তঃ পাদঃ যস্যাং ন-গণস্তেৎ, তদা ন-বিপুলা নাম ভবতি।"—কবি-ভারতিঃ।

যদি প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে ন-গণ থাকে, তাহা হইলে কবি ভারতির মতে ন-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যদি যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকে, এবং অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ন-গণ থাকে, তাহা হইলে পিঙ্গলের মতে ন-বিপুলা বক্ত্র হয়। তদ্ যথা,

কবি-ভারতি-মতে ন-বিপুলাঃ—

"উপকারায় বিদুষামসাধুরমপবৃত্তে।
তীব্রাং পরাক্রমভুজো বরবারো নিরস্যতঃ। (কবি-ভারতিঃ)

পিঙ্গল-মতে ন বিপুলাঃ—

"পুরোঽংশীড়ে ঽঽশিক্ত পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
লোকে লোকে চ হরয়ঃ প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে।" (ভবভূতিঃ)

(৯) ভ-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"ভোঽন্তেঽযুক্ পূর্ব্বাভা ভবেৎ।" (বৃত্তরত্নাকরঃ ২।৪০)

"অন্তে চতুর্থো বর্ণোঽন্তঃ পাদঃ যত্র ভ-গণস্তেৎ, তদা তৎপূর্ব্বাভা ভবেৎ। যঃ ভ-কারঃ পূর্ব্বো বক্ত্রাঃ সা তৎপূর্ব্বা ভ-বিপুলা নাম স্যাৎ।"
—কবি ভারতিঃ।

যদি প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণের পরে ভ-গণ থাকে, তাহা হইলে কবি ভারতির মতে ভ-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যদি যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকে, এবং অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ভ-গণ থাকে, তাহা হইলে পিঙ্গলের মতে ভ-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। তদ্ যথা,

কবিভারতি মতে ভ-বিপুলাঃ—

"পরাক্রমধামো প্রভো প্রবিভর্ষি তে সর্ব্বদা।
তীর্ণসত্ত্বেষু প্রাণিষু ক্ষেমধারণে সংফলম্।" (কবি-ভারতিঃ)

পিঙ্গল-মতে ভ-বিপুলাঃ—

"অন্তে কবিঃ শ্রীভারবিঃ লোকস্তবমসঙ্খ্যম্।
বিধাবীপা ইবাভাতি বক্ত্রাগ্রে কবয়োঽপরে।" (হলায়ুধঃ)

(১০) ম-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"অযুক্-পাদ-ত্বয়ে চতুর্থাদূর্দ্ধঃ ম-কারশ্চ যুক্-পাদে তথা জ-কারশ্চ চ সম্ভাৎ ম-বিপুলা।"

অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে ম-গণ এবং যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকিলে ম-বিপুলা বক্ত্র হইয়া থাকে।

বক্তব্য। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, পিঙ্গলের মতে ম-বিপুলা-বক্ত্র হইয়া থাকে। কিন্তু বৃত্তরত্নাকর ও তাঁহার টীকাকার কবি-ভারতি ম-বিপুলার উল্লেখ করেন নাই।

পিঙ্গলের মতে ম-বিপুলা :—

"ইহ গুরুত্যঃ পূর্ব্বেজ্যা অযোবাকং প্রশাস্মহে।
বিশ্বের দেবতাঃ বাচমমৃতায়ন্নমঃ কলাম্।" (ভবভূতি)
"অটাটামাবোঽরণ্যানীঃ সর্ব্বাঃ সহলক্ষ্মঃ।
ধনায় যুদ্ধুদুপোৎক্ষিপ্য অত্রে জীবেন রক্ষসা।" (ভট্টিঃ)

(১১) স-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"অযুক্-পাদ-ত্বয়ে চতুর্থাদূর্দ্ধঃ স-কারশ্চ যুক্-পাদে তথা জ-কারশ্চ চ সম্ভাৎ স-বিপুলা।"

বক্তব্য। পিঙ্গলের মতে ম-বিপুলার ন্যায় স-বিপুলাও হইতে পারে। কিন্তু বৃত্তরত্নাকর ও তাহার টীকাকার কবি-ভারতি স-বিপুলার কথা উল্লেখ করেন নাই।

পিঙ্গলের মতে স-বিপুলা :—

"জিতে তু লক্ষ্মে লক্ষ্মীঃ মৃতে তাপি বরা ।
অবিষ্কৃতঃসিনি তারে কা চিন্তা মরণে রণে।" (হলায়ুধঃ)
তচ্চ যাদসসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং তদ্ দ্বিজেদর্পণেৎ।
তারতে পরমসাত্ত্বো ধ্রুবগুপ্ত প্রমাদিতিঃ।" (অগ্নিপুরাণম্)

"বাদিন্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এবং "কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা" এই দুইটি শ্লোকাংশে ছন্দোরক্ষার্থ ব্যাকরণ-দোষ রহিয়াছে। 'বসতে' ও 'কুপ্যতে' না করিয়া 'বসতি' ও 'কুপ্যতি' করিলেও ব্যাকরণ ঠিক থাকে, এবং পিঙ্গল, হলায়ুধ ও অগ্নি-পুরাণের মতে ছন্দও ঠিক থাকিয়া যায়।

(১২) সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্রম্।

"ইত্যাদয়ো বিপুলা বিকল্পাঃ সঙ্কীর্ণাশ্চ অযুতকোটিশঃ কাব্যেষু দৃশ্যন্তে" (হলায়ুধঃ)

বিপুলা-বক্ত্র নানাবিধ। সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্রও বহুবিধ। অনেকানেক কাব্যে ইহাদের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি যুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে জ-গণ থাকে, এবং অযুক্-পাদে চতুর্থ বর্ণের পরে বিভিন্ন গণ থাকে, তবে সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্র হয়।

সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্রের উদাহরণ :—

"কচিৎকালে প্রসন্নতা কচিদাপত্তা বিরতা।
শুনেৰ নারদকুলং যথা তিরং বিষাং কুলম্।" (হলায়ুধঃ)

প্রথম-পাদে চতুর্থাক্ষরঃ ন-কারশ্চ সপ্তাৎ, তৃতীয়-পাদে চতুর্থাক্ষরঃ ভ-কারশ্চ সপ্তাক্ষ পদয়ন্তটতবিপুলাছাং সঙ্কীর্ণ-বিপুলাঃ ইতি বোধ্যম্।

উক্ত কবিতার দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে চ-গণ থাকায় এবং প্রথম ও তৃতীয় পাদে যথাক্রমে ন ও ভ এই দুই বিভিন্ন গণ থাকায় ইহা সঙ্কীর্ণ-বিপুলা-বক্ত্র হইল।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ

(১)

গীতা ও চণ্ডী দুইখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম-গ্রন্থ। গীতা বৈষ্ণবের, চণ্ডী শাক্তের। গীতা দর্শন, চণ্ডী পুরাণ। গীতা নিবৃত্তি-মূলক, চণ্ডী প্রবৃত্তি মূলক। গীতায় ভগবানের তত্ত্বকথা, চণ্ডীতে ভগবতীর লীলা-মাহাত্ম্য। গীতার বিষয় পরম শান্তি, চণ্ডীর বিষয় প্রচণ্ড সংগ্রাম। গীতার দেবতা পরম পুরুষ, চণ্ডীর দেবতা পরমা প্রকৃতি। গীতায় ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, চণ্ডীতে মায়ার তত্ত্বানুসন্ধান। দুইখানি গ্রন্থের বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্য এত অধিক যে, এ দুইএর মধ্যে তুলনার কোনো কথাই যেন নাই। এই প্রবন্ধে আমি চণ্ডীগ্রন্থখানি সম্বন্ধে দুই চারিটী সাধারণ কথা বলিতে চাই। তুলনা দ্বারা দুইখানি গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সমস্ত বিপরীত ভাবের মধ্যেও দুই গ্রন্থে যে অনেকটা ভাবের ও তত্ত্বের ঐক্য রহিয়াছে, প্রথমে তাহারই সামান্যতঃ উল্লেখ করিব।

গীতার আরম্ভেই দেখিতেছি—অর্জুন উপস্থিত কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ। কারণ তিনি কৃপাপরবশ—'কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ।' কর্ত্তব্য যুদ্ধ; কিন্তু যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনের সংহার অনিবার্য্য। তাই জাগিল অর্জুন কাতর।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে।

অর্জুনের মাথা ঘুরিয়া গেল, 'ভ্রমতীব চ মে মনঃ।' অর্জুন কি করিয়া জ্ঞাতি, বান্ধব, গুরুজন বধ করিবেন? অথচ যুদ্ধ উপস্থিত। ভয়ঙ্কর সমস্যা। এই যে ভাব, ইহা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবজনিত। অর্জুন মোহে আবিষ্ট। তিনি মহামায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন। তাঁহার জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধমক দিলেন।

'কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।'

এ সঙ্কট সময়ে তোমার এ কি মোহ, অর্জুন? ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন—ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ। তবু অর্জুনের চৈতন্য হইল না, মোহাবরণ অপসৃত হইল না। অর্জুন 'ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং ব্ভূব হ।' তিনি যুদ্ধ করিব না বলিয়া মৌনী রহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের ও সখার ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য সপ্তদশ অধ্যায় ব্যাপী যোগোপদেশ আরম্ভ করিলেন।

ইহাই গীতার আরম্ভ। চণ্ডীর আরম্ভও বস্তুতঃ ঠিক এই প্রকার।

সুরথ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী। তাঁহার আপনার বলিতে কেহই নাই—কিছুই নাই। তিনি—'একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনং।' সেখানে তিনি মেধস্ মুনির আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার সর্ব্বদা প্রাণ কাঁদে তাহারি জন্য যারা তিনি হারাইয়া আসিয়াছেন। যারা ছত, যারা নষ্ট, যারা শত্রু-করতল-গত, সুরথের চিত্ত সেখানেই সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। এ অনুচিত আসক্তি রাজা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছেন না। হাতীটা কি খাইতেছে তাহা জানিয়া তোমার কি লাভ, রাজা? সে হাতী ত এখন তোমার না? কিন্তু তবু রাজা ভাবেন—

মে জ্ঞানে ন প্রধানো যে শূরহস্তী মদান্বিতঃ।
মম বৈরিবলং যাতঃ কান্ তোষায়ন্তলপক্ষতে। ১।১৯

যে রাজকোষ পরের অধিকৃত—সেই রাজকোষের অর্থ হয় ত অপব্যয়ে নষ্ট হইতেছে, তাহা ভাবিয়া সুরথ বিচলিত। কিন্তু সে অর্থ ত এখন পরের। তাহা যায় যাক্, অপব্যয় হোক, সুরথের তাতে কি আসে যায়? কিন্তু সুরথের মন তা বোঝে কই? সুরথ ভাবেন—

অসমাধ্যবহারৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ং।
সঞ্চিতঃ ক্ষীয়তি ক্ষিপ্রং ক্ষয়ঃ কৌবো গরিয়সি। ১।১৬

এত অজ্ঞানের কাছে আসিয়া অন্ত অজ্ঞান ঘুচিল। এক দিন এক বৈশ্যের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ। রাজা দেখিলেন, লোকটীর মুখ বিষাদ-ম্লান; লোকটী দে-কাতুর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, লোকটীর নাম সমাধি—ধনি-বংশজাত বৈশ্য। লোকটীর অনেক অর্থ ছিল। পত্নী-পুত্রেরা সমস্ত অর্থ কাড়িয়া রাখিয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বৈশ্য এই স্নেহমমতাশূন্য অর্থলোলুপ স্বার্থপর নৃশংস আত্মীয়গণের এই অমানুষিক ব্যবহার সত্ত্বেও তাহাদিগের প্রতি মমতাপরায়ণ। তাহাদেরই মঙ্গল সংবাদ পাইবার জন্য সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। যাহারা তাহাকে গৃহ হইতে নির্দ্দয় ভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, তাহারা কেমন আছে, তাহা না জানিয়া তাহার রাত্রিতে নিদ্রা নাই, দিনে আহার নাই। স্ত্রী স্বামী বলিয়া গ্রাহ্য করিল না, পুত্রেরা পিতা বলিয়া গণ্য করিল না,—ধন-সম্পত্তি হস্তগত করিয়া ঘর করিয়া খেদাইয়া দিল যাহারা তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য বৈশ্যের প্রাণ সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করিতেছে—

তেষাংকৃতে মে নিশ্বাসো দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে। ১।৩৬

রাজা দেখিলেন, তাঁহার মত মমতা-বিভ্রান্ত লোক সংসারে আরো আছে। কিন্তু কেন এমন হয়? এ মোহ কেন আসে? এ ভ্রান্তি কিসের জন্য? মন বুঝিয়াও বোঝে না কেন? জ্ঞানের মধ্যেও অজ্ঞানের বাস—ইহার তাৎপর্য্য কি? এই রহস্যের মীমাংসার জন্য রাজা বৈশ্যকে সঙ্গে লইয়া মহর্ষি মেধসের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং চিত্তের সমস্ত সন্দেহের কথা নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

তৎ কেনেহমহাভাগ যয়োহো জ্ঞানিনোঽপি
মহাং চ তরতোহো বিবেকাকস্য মূঢ়তা। ১।৫৫

ঋষি কহিলেন—মহামায়ার প্রভাবে এই সমস্ত ভ্রম মানুষের চিত্ত-ক্ষেত্রে উদিত হয়। জ্ঞানীরও মন মহামায়ার শক্তিতেই মোহের বশীভূত হইয়া অন্যের অনাস্থিত কারণ হয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মহামায়া কে এবং কি বস্তু? কিরূপে ইঁহার উৎপত্তি, ইনি কি করেন, ইঁহার স্বভাব কি—ইঁহার স্বরূপ কি?

যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাংবর। ১।৬১

এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাহা যাহা বলিলেন, তাহাই চণ্ডীগ্রন্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুইখানি গ্রন্থের আরম্ভ বাস্তবিক পক্ষে একই প্রকার।

(২)

এই স্থানে দুইটী কথা বলা আবশ্যক।

একটী কথা এই যে—বেদান্তের নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিলে—আমরা দুইটী তত্ত্ব পাই। এক সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা পরম-কারণ ভগবান্ আর ত্রিগুণময়ী মায়া বা সৃজন-শক্তি বা আদ্যা প্রকৃতি। গীতার প্রতিপাদ্য প্রথম তত্ত্ব, চণ্ডীর প্রতিপাদ্য দ্বিতীয় তত্ত্ব।

কিন্তু এই চণ্ডীর প্রকৃতি আর সাংখ্যের প্রকৃতি এক নহে। সাংখ্যের প্রকৃতি অচেতন জড়বস্তু। তিনি থাকুই হউন আর অব্যক্তই থাকুন, তিনি ব্যক্তিবিহীনা—অজ, অব্যয়, মূক বিশ্ববিধিপ্রজ্ঞানশূন্য। ধ্যানীজনের কৃপায় মায়ের দুর্দশার অন্ত নাই!! কিন্তু প্রকৃত যিনি আদ্যাজননী তিনি চিন্ময়ী; তাঁহারি কন্যা, তাঁহারি লীলা-বাহারা চণ্ডীতে বিবৃত।

সাংখ্যানুসারে প্রকৃতি বা প্রধান

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।
(সাংখ্যকারিকা। ১১।)

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী অর্থাৎ প্রকাশ প্রবৃত্তি ও স্থিতি বা সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণ স্বভাবান্বিতা। (ত্রিগুণম্) এই ত্রিগুণ হইতে বিবিক্ত বা পৃথগবস্থান তিনি থাকেন না। এবং কোনো একটী স্বতন্ত্র গুণ মাত্রেও তিনি অবস্থিতি করেন না। (অবিবিক্তং) তিনি সমস্ত পুরুষের (বেদান্তানুসারে সমস্ত জীবাত্মার) সাধারণ ভোগের বস্তু। (সামান্যম্) তিনি অচেতন অর্থাৎ জড়-স্বভাব। (অচেতনম্) তিনি মহদহঙ্কারাদি তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রসব করেন। (প্রসবধর্মি) অচেতন হইয়াও এই সুশৃঙ্খল সুন্দর জগৎ প্রসব করেন কি করিয়া?

অজস্যোপরাগাদ্ যথাগ্নিরুষ্ণস্য দাহকো ভবতি।
(সাংখ্যপ্রবচনসূত্র। ২।৮)

তিনি অচেতনস্বভাবা বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার উদ্দেশ্য-পূর্বক কার্য্য করিবার শক্তি না থাকিলেও, লৌহ যেমন অগ্নি-সংযোগে দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি প্রকৃতিও চৈতন্যময় পুরুষের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া উদ্দেশ্য-পূর্বক কার্য্য করিবার শক্তি প্রাপ্ত হন।

সাংখ্যকার প্রকৃতি সম্বন্ধে এই প্রকার মত স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ত্রিগুণময় প্রকৃতি বিষয়ে বহু সাদৃশ্য সত্ত্বেও চণ্ডীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-প্রকৃতি ও স্বতন্ত্র ভাবান্বিতা।

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী'
যোগনিদ্রা দেবি! বিষ্ণোরাধিসা মহামায়া।
দুর্গাসি দুর্গভয়া সাগর নৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারি হৃদয়ৈককৃতাধিবাস।
গৌরীত্বয়ৈব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা। ৪।১১

ইনি চৈতন্যময়ী ভগবতী—অশেষ বিদ্যা-কল্যাণ-গুণ-সম্পন্না ভক্তবৎসলা, বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বপালিনী, পরমাগত ধীমান্ত পরিত্রাণ-পরায়ণা, দুর্বৃত্তবৃন্দ দমনকারিণী, সর্বান্তর্যামিনী জননী! পরাপরাণাম্ পরম।

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্যস্থিতা জগৎ।

ইনিই প্রকৃত প্রকৃতি—দেবীসূক্ত ইহার প্রমাণ। সাংখ্যের প্রকৃতি Abstraction—যথা বেদান্তের ব্রহ্ম—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

আর একটী কথা এই যে—ঋষি সুরথের জিজ্ঞাসায় দেবী-মাহাত্ম্য আরম্ভ করিবার পূর্বে যে উত্তরটী দিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। কথাগুলির মধ্যে অতি সুন্দর একটী ভঙ্গী আছে—যেন একটু কাঠামিশ্রা রকমের ভাব। একটু প্রচ্ছন্ন শ্লেষেরই আভাস যেন পাওয়া যায়।

সুরথ বলিলেন আমরা ত জ্ঞানী, তবু আমাদের এই মোহ কেন? ইহা ত বিবেকান্ধের মূঢ়তা!

'তৎ কেনেহমহাভাগ যয়োহো জ্ঞানিনোঽপি?'

নিজের প্রতি ও মেধসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সুরথ বলিলেন, 'জ্ঞানিনোঃ'। সুরথের জ্ঞানী বলিয়া অহঙ্কারটুকু বেশ রহিয়াছে। ঋষি তাহা লক্ষ্য করিলেন। হয়তো মনে মনে বলিলেন—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ,
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। কঠোপনিষৎ। ২।৫

সুরথের ঐ মিথ্যা অভিমানকে আঘাত করিবার জন্যই যেন ঋষি বলিলেন

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয় গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্।
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ।
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলং।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাং
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ। ১।৪৯ ৫০

অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে "রাজন্, তুমি যে জ্ঞানের গর্ব করিতেছ তাহা পশু-পক্ষীরও আছে। উহাতে তোমার গৌরবের

কিছু নাই। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভব মানুষেও করে, পশুরাও করে। ইন্দ্রিয় থাকিলে এই জ্ঞান আপনি আপনি হয়—চেষ্টার আবশ্যক হয় না। তবে কখনো কখনো এবং কোথাও কোথাও একটু তারতম্য লক্ষিত হয় এই যাত্র। কোনো কোনো প্রাণী আলোকে ভালো দেখে না; যথা পেচক, যাহার এক নাম 'দিবান্ধ'। কেহ কেহ রাত্রিতে অন্ধকারে দেখিতেই পায় না; যথা মনুষ্য এবং অধিকাংশ পক্ষী। কেহ কেহ দিবা-রাত্রি সমান দেখিতে পায়; যথা বিড়াল। কেহ কেহ দিনেও দেখে না রাত্রিও দেখে না; যেমন মহীলতা অর্থাৎ কেঁচো এবং অন্য মানুষ।

মানুষের জ্ঞানও যা, পশু-পক্ষীর জ্ঞানও তাই। আবার, পশু-পক্ষীর জ্ঞানও যা, মানুষের জ্ঞানও তাই, এ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। এ জ্ঞানে মানুষে ও পশুতে কোনো ভেদ নাই। এই দৃশ্যমান জগৎ যে তত্ত্বের বহিরঙ্গ প্রকাশ, সেই তত্ত্বের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই যে প্রবহমান চিরচঞ্চল জগৎ-প্রপঞ্চ, ইহার অন্তরালে এক অনাদি অনন্ত অপরিবর্তনীয় চির-স্থির সত্তা আছে, যাহার জন্ম নাই, অপচয় নাই, বিনাশ নাই—তাহা কি জানিয়াছ, রাজন্? তবে আর নিজেকে জ্ঞানী মনে করিতেছ কিসে?

কবির উত্তরের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়, আর ঐ যে "দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিন্ নক্তান্ধাস্তথাপরে"—শ্লোকটী, উহার সরল ও স্পষ্ট অর্থের পশ্চাতে বোধ হয় যেন একটু সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা আছে এবং তাহাও ক্লেশ-বিরহিত নয়।

গীতায় আছে—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।

গীতার এই গভীর অর্থযুক্ত শ্লোকটী মনে রাখিয়া চণ্ডীর ঐ রহস্য-পূর্ণ কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করিলে বোধ করি ভাল হয়।

কিন্তু আবার বক্তব্য হইতে আমি দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। গীতার আরম্ভ ও চণ্ডীর আরম্ভ প্রকৃত পক্ষে একই ভাব হইতে। অর্জুনের মোহ অপনোদনের জন্য ভগবান্ পরমাত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন; আর সুরথের মোহ অপনোদনের জন্য মেধস-ঋষি মহামায়ার তত্ত্ব প্রকট করিয়া দেখাইলেন।

(৩)

গীতায় প্রসঙ্গক্রমে ভগবান্ অবতার-তত্ত্ব-কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তিনি কহিলেন—আমি চিরকালই প্রকট হইয়া থাকি—যদিও আমি অব্যক্ত, অব্যয় ও অজরহিত। কি জন্য প্রকাশিত হই? অধর্মের নিরাকরণের জন্য, ধর্মের সংস্থাপনের জন্য, ভক্তের ও সাধুর পরিত্রাণের জন্য, এবং পাপাত্মাদিগের বিনাশের জন্য। কেমন করিয়া প্রকাশিত হই? নিজমায়া-শক্তি দ্বারা নিজ-প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। গীতা। ৪।৭-৮
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। ৪।৬

প্রায় এই একই কথা প্রায় এই একই ভাষায় চণ্ডীতেও উক্ত হইয়াছে।

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং। চণ্ডী। ১১।৫৫
এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনং। চণ্ডী। ১১।৫৬

এখানে কেবল ধর্ম-সংস্থাপনের কথাটী নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী অবতার-তত্ত্বের অতি সুন্দর সূক্ষ্মরূপ বিচার করিয়াছেন। অবতার বহু প্রকার। (১) পুরুষাবতার—মৎস্য কূর্মাদি এবং হিরণ্য-গর্ভান্তর্যামী প্রভৃতি পুরুষাবতার।

(২) গুণাবতার—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।

(৩) শক্ত্যাবেশ-অবতার—পৃথু-ব্যাস প্রভৃতি

(৪) লীলাবতার। (৫) মন্বন্তরাবতার। (৬) যুগাবতার। ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ভগবানের 'প্রকাশ' ও 'বিলাস'—নামক আবির্ভাব আছে। প্রকাশে একই বিগ্রহ অভিন্নরূপে বহু হন। যেমন রাসের সময় একই সময়ে প্রত্যেক গোপী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন—"তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ"। বিলাস হয় যখন—"একই বিগ্রহ ভিন্ন আকারে হয় আন।"—চৈতন্যচরিতামৃত। যেমন পরব্যোমে চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ইহাকে "অনেকাত্ম"ও বলে।

সেই বহু ভিন্নভাবে কিন্তু ভিন্নাকার ভাবাবেশ মূর্ত্তিভেদ তত্ত্বেকাত্মক নয়। চৈতন্যচরিতামৃত।

ভগবানের অবতার অসংখ্য—শুধু দশটী পাঁচটী নয়।

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।"

চণ্ডী শুধু অবতার-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—সাক্ষাৎ স্বরূপে বহু-অবতার কেমন করিয়া প্রকটিত হন, তাহা দেখাইয়াছেন। চণ্ডীতে যে সব অবতার আছেন—তাঁহারা অবতারের কোন্ শ্রেণী-ভুক্ত পড়িবেন? বোধ হয় অনেকেরই ও 'বিলাস'।

'বিষ্ণোঃ প্রভবতাং'। দেবীর প্রথম অবতার মধুকৈটভ বধের জন্য। প্রলয় জলধি-জলে মহাবিষ্ণু শেষ-শয্যায় যোগনিদ্রায় নিদ্রিত। তাঁহার নাভি কমল-বনে প্রজাপতি বিরাজিত। মধুকৈটভ বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে দুইজন অসুরের উৎপত্তি হইল। তাহারা সম্মুখে ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। ব্রহ্মা মহা বিপদাপন্ন উপায় কি? বিষ্ণু নিদ্রিত—কে রক্ষা করে? যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে পরিত্যাগ না করিলে ত বিষ্ণু জাগিতে পারেন না। ব্রহ্মা যোগনিদ্রা-স্তব করিলেন। যোগনিদ্রা দ্রষ্টা হইয়া বিষ্ণুর নয়ন হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার গোচরীভূতা হইলেন। এখানে দেবী কোনো বিশেষরূপ ধারণ করিলেন কি না তাহার উল্লেখ নাই। শুধু আছে—ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিলেন—ব্রহ্মলো দর্শনে তস্যৌ। ইহার পর মহিষাসুর

অঙ্গের জন্য দেবী জ্যোতিষ্মতী স্নেহোজ্জ্বলা পর্ণকুটী সমুদ্ভাসিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনরায় প্রকাশিত হইলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—দেবগণ-প্রভুত্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহিষাসুরের অত্যাচার এবং দেবগণের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন। তখন ক্রোধান্বিত শ্রীকৃষ্ণের বদন মণ্ডল হইতে একটী সুমহৎ তেজ নির্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের, ব্রহ্মার, চন্দ্রের ও অন্যান্য সমস্ত দেবতার শরীর হইতেও অনন্ত তেজ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহির্গত হইয়া একত্র মিলিত হইল এবং একটী প্রকাণ্ড দিঙ্মণ্ডলব্যাপী জ্বালাময় পর্ব্বতাকার জ্যোতিষ্পুঞ্জরূপে দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই বিশ্বিত দেব-দেহ-জাত স্নেহোজ্জ্বলা সহসা এক অপরূপা নারী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহস্র বাহু বিস্তারপূর্ব্বক লোক-সমূহের ভীতিধ্বংস করিল। তাঁহার পদভরে ধরণী আনমিতা হইল; তাঁহার কিরীট আকাশ স্পর্শ করিল। দেবীর কোন্ কোন্ অঙ্গ কোন্ কোন্ দেবতার তেজ হইতে উদ্ভূত হইল তাহার বিস্তৃত বর্ণনা চণ্ডীতে আছে। শিবের তেজ হইতে মুখ-মণ্ডল, বিষ্ণুর তেজ হইতে বাহু, যমের তেজ হইতে কেশ, চন্দ্রের তেজ হইতে স্তন-যুগল, ইন্দ্রের তেজ হইতে কটি-দেশ, বরুণের তেজ হইতে উরু, পৃথিবীর তেজ হইতে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজ হইতে পদ-দ্বয়—ইত্যাদি। দেবগণ অস্ত্রশস্ত্র বসন-ভূষণে দেবীকে সজ্জিত করিলেন। এইরূপে সজ্জিতা হইয়া তিনি ভয়ঙ্কর বিনাদ এবং মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন তাঁহার বপুর্জ্বালানিঘনে আকাশ পাতাল বিক্ষোভিত হইল। ইনিই চণ্ডী-গ্রন্থের দেবতা নিখিল-সৃষ্টি-সংহার-কারিণী চণ্ডী।

পঞ্চম অধ্যায়ে আছে—শুম্ভ-নিশুম্ভাদি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও বিতাড়িত দেবগণ হিমালয়ে যাইয়া বিষ্ণু-মায়ার স্তব করিতেছেন। এই প্রকার স্তুতি-পরায়ণ দেবগণের অভিমুখে পার্ব্বতী-রূপিণী মহামায়া জাহ্নবী-সলিলে স্নানার্থে গমন করিলেন। এখানে দেবীর কোনো রূপের বর্ণনা নাই—এবং ইনি এখানে কেন কোথা হইতে আসিলেন সে সম্বন্ধেও কোনো কথা নাই। তিনি দেবতাদিগের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা এখানে কাহার স্তব করিতেছেন। দেবতাদিগের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দেবীর শরীর-কোষ হইতে অম্বা এক দেবী আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—শুম্ভদৈত্য কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হইয়া এই দেবগণ আমারি স্তব করিতেছেন। পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে এই দেবী নিঃসৃতা হইলেন বলিয়া ইঁহার নাম হইল কৌষিকী। কৌষিকীর আবির্ভাবের পর পার্ব্বতী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকা-নামে হিমাচলনিবাসিনী হইয়া রহিলেন। এই ঘটনার পর হইতে এই কৌষিকীই চণ্ডী-গ্রন্থের অধিষ্ঠাত্রী এবং ইনিই চণ্ডী। ইনি অতি অপূর্ব্ব মনোহর-রূপ-মাধুর্য্যময়ী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিমালয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক দিন চণ্ড ও মুণ্ড নামক শুম্ভ-নিশুম্ভের দুইজন অনুচর দেবীর রূপরাশি দর্শন করিয়া যাইয়া শুম্ভকে কহিল—মহারাজ, হিমালয়ে এক অনুপম সৌন্দর্য্যময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী নারী-রত্ন দেখিয়া আসিলাম। তাহার রূপের আলোকে দশ দিক্ আলোকিত। মহারাজ, আপনি তাহাকে গ্রহণ করুন। শুম্ভ তাহাকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইল। এইখানে মহামায়া এক মায়া-জাল বিস্তার করিলেন। দূত শুম্ভের শুণ-মহিমা বলবীর্য্য ও ঘনৈশ্বর্য্যের কথা খুব ঘটা করিয়া দেবীকে জানাইল। এবং কহিল—হে চারুহাসিনি! অতএব তুমি শুম্ভকে ভজনা কর—খুব সুখী হইতে পারিবে। ভগবতী ভবভয়হরা দূতের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন,—কিন্তু বাহিরে খুব গম্ভীর। দূতকে কহিলেন যে দূত! তুমি যাহা যাহা কহিলে সমস্তই সত্য। এবং যে প্রস্তাব করিলে তাহাও অতি উত্তম। কিন্তু আমি অল্পবুদ্ধিতা বশতঃ এক প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি,—আমাকে যে যুদ্ধে পরাজিত করিবে সেই আমার স্বামী হইবে। সে প্রতিজ্ঞা ত আর ভাঙ্গিতে পারি না? অতএব তুমি যাও। তোমার প্রভুকে পাঠাইয়া দাও। সে আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার পাণি গ্রহণ করুক। বুঝিতেই পারিতেছ, আমাকে পরাস্ত করা অতি সহজ! এইভাবে যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। সেনাপতি ধূম্রলোচন সসৈন্যে ধাবমান হইলেন। আসিলেন চণ্ড-মুণ্ড। তাহাদের সৈন্যেরা দেবীকে ঘিরিতে গেল। দেবী ভয়ানক ক্রোধ করিলেন। অমনি তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল-ললাট-পট হইতে করাল-বদনা বিভীষণা কালী আবির্ভূতা হইলেন। ইঁহার রূপের বর্ণনা, কার্য্যের বর্ণনা—

অতিবিস্তার-বদনা জিহ্বা-ললন-ভীষণা
নিমগ্নারক্ত-নয়না নাদাপূরিত দিঙ্মুখা।

ইনি চণ্ড-মুণ্ডের চতুরঙ্গ-সৈন্য সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তার পর রক্ত-বীজের যুদ্ধ। রক্ত-বীজের রক্ত ভূমিতে পড়িলে প্রত্যেক বিন্দু রক্ত হইতে অবিকল রক্ত বীজের মত দৈত্যের উদ্ভব হয়। এ প্রকার দৈত্যকে বিনাশ করা ত অসম্ভব। কিন্তু তবু তাহা বিনাশ করা হইল। রক্তবীজের যুদ্ধারম্ভের ঠিক পূর্ব্বে সপ্ত-মাতৃকার আবির্ভাব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক, বরাহ, নৃসিংহ, ইন্দ্র ও কার্ত্তিক—এই সাতজন দেবতার শক্তি, প্রত্যেক দেবতার অবিকৃত রূপ, বসন, ভূষণ ও বাহন গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক দেব-দেহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং ভগবতীর পক্ষে অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ইঁহারা সকলেই পরোক্ষ-ভাবে মহামায়ারই শক্তি-বিভূতি। কারণ দেবতারা সকলেই সগুণ ব্রহ্মের অংশ। এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব মানেই তাহার মায়াধিষ্ঠানত্ব। সুতরাং দেবতারা সকলেই মহামায়ার অংশবিভূতি।

এই যে দেব-শক্তি-বাহিনী আসিলেন—ইঁহাদের প্রেরণা দিয়া আসিলেন ঈশান। তিনি চণ্ডিকাকে কহিলেন—দেবি! আমার প্রীতির জন্য তুমি অসুর কুল বিনাশ কর। তখন দেবীর শরীর হইতে অতি ভীষণা—অতি উগ্রা—শক্তি-শিবা-নিনাদিনী চণ্ডিকা-শক্তি বহির্গতা হইয়া ক্রুদ্ধ-ভীষণ ঈশানকে দূত করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। এই জন্য ইঁহার নাম হইল শিবদূতী। চণ্ডীতে দেবীর এই শেষ প্রকাশ। এইভাবে ক্রমান্বয়ে মহামায়ার বিভূতি-নিবহ প্রকটিত হইল। ইহার মধ্যে কেন Evolutionএর প্রণালী রহিয়াছে! পঞ্চম অধ্যায়ে শুম্ভ দেবীকে কহিলেন—দুর্গে! তুমি অন্যের শক্তি আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ। তোমার অভিমান অবলম্বন! দেবী

কহিলেন—বৈত্যরাজ! তুমি ভুল বুঝিতেছ; এ জগতে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় নাই। এই দেখ, আমার বিভূতিসমূহ আমার দেহেই লীন হইল। অম্বিকা কালী, বৈষ্ণবী, মহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রাণী, শিবদূতী সকলেই দেবীর দেহে মিলাইয়া গেল। দেবী একাই রহিলেন।

চণ্ডীর এই অবতার-তত্ত্ব। ইহা ছাড়া একাদশ অধ্যায়ের শেষে স্বয়ং ভগবতী আরো অনেকগুলি ভবিষ্যদবতারের কথা বলিয়াছেন।

(৭)

মহাকালী সৃষ্টি সংহার করেন। মহাকাল শিবও সংহারকর্ত্তা। আমরা গীতায় অর্জ্জুন দেখিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ব-রূপে নিজেই সৃষ্টি সংহার করিতেছেন। ইহা কি সব বিরুদ্ধ কথা? এই তিন উক্তির কি দুইটি মিথ্যা আর একটি সত্য। না, কোনটিই মিথ্যা নয়। কারণ তিনটী উক্তির একটী তাৎপর্য্য। একই সংহার-শক্তিকে একবার কালী, একবার শিব, একবার কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। দর্শন ও ধারণার বিষ্ণু ও ভূমির প্রভেদ হইতে এই প্রভেদ হইয়া থাকে। তত্ত্বে কোনো প্রভেদ নাই। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সংহার মানে ধ্বংস নয়। সংহারের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ একত্র সংগ্রহ বা সংস্থাপন। কাজেই এখানে সংহার মানে বহুর একে পর্য্যবসান—কার্য্যের কারণে লয়। চণ্ডীতে ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন—

বিশ্বস্যাস্যা সৃষ্টি-রক্ষা-ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতি-রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে। ১।৭৬

ময়ংকল্পে চ সর্ব্বদা। ১। ৭৪

তুমি চির-কালই কল্পান্তে (জগৎ-সংহার) গ্রাস করিয়া থাক।

দেবগণের স্তবে আছে—

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। ১১। ১১

এই সব কথা সামান্যতঃ দেবীর সংহার কর্ত্রীত্ব-জ্ঞাপক। কিন্তু চণ্ডীতে জগদম্বা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল সংহারই করিতেছেন। মহিষাসুরের অক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সেনা এবং সহস্র সহস্র সেনাপতি বিনাশ করিয়া মহিষাসুরকে বধ করিলেন।

ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভ এবং ইহাদের সঙ্গে অসংখ্য কোটি সৈন্য, হস্তী, অশ্ব, রথ, সমস্ত বিনষ্ট করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ধ্বংস করিলেন—শোণিত প্লাবনে ধরাতল প্লাবিত হইল! সে ধ্বংসের পদ্ধতি অদ্ভুত ও অদ্ভুত। সে সংহারের দৃশ্য অতি বিভীষণ—অতি লোমহর্ষক!

কেষাঞ্চিদ্ বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ
বিচ্ছিন্ন-জঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্যাং মহাসুরাঃ
এক বাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ,
বিচ্ছেদপি তথৈ শিরাংসি পতিতানি পুনস্তথা।
কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা গৃহীত পরমায়ুধাঃ। চণ্ডী। ৯। ৭০-৭৪
পাতিতৈর্যত্র তত্রাজৌ গজবাজি বিনশ্বরৈঃ। ৯। ৬৮

চণ্ড-মুণ্ড-বধের সময় মহাকালী আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার সংহারের বিধান অতি ভয়ংকর! তিনি অস্ত্র-শস্ত্র একই ব্যবহার করেন। তিনি সমস্তই গ্রাস করেন। এক একটী হস্তী এক গ্রাসে চূর্ণিত মানুষ-শুদ্ধ মুখে ফেলিয়া দিয়া প্রলয়ংকরী করেন। এক একখানা রথ সারথি-শুদ্ধ মুখে পুরিয়া ভীষণভাবে চর্ব্বণ করেন।

পার্ষ্ণি-গ্রাহাঙ্কুশ-গ্রাহিযোধ ঘণ্টাসমন্বিতান্
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্।
তথৈব যোধমুখ্যস্থং রথং সারথিনা সহ
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চকর্ত্তাতিভৈরবম্। চণ্ডী। ৮। ৬১-৬২

গীতায় যে সংহার-লীলা অর্জ্জুন দেখিলেন, তাহা অবশ্য ইহা হইতেও বিশাল ব্যাপার। কারণ সেখানে সমগ্র বিশ্বের সংহার-দৃশ্য।

নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চকর্ত্তাতিভৈরবম্

পড়িলেই মনে হয় গীতার সেই—

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।

এবং লেলিহসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ। ১১।৩০

গীতার সংহার-কর্ত্রী আর চণ্ডীর সংহার কর্ত্রী একই এবং একই শক্তি। গীতায় পূর্ণভাবে প্রকাশিত, চণ্ডীতে খণ্ডভাবে প্রকটিত। সন্ত্রাসিত স্তম্ভিত অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ। ১১।৩২

চণ্ডীতে ভগবতী এই প্রকার সর্ব্ব-লোক-বিনাশিনী নন—তিনি শুধু অসুর-মর্দ্দিনী। তিনি 'ত্বয়ৈতদ্ দুষ্টমেতদ্ মহাসুরাদ্যং বিনাশং নায়ন কৃতবতী।

সর্ব্ব-দেব-দেহ হইতে চণ্ডিকার আবির্ভাবের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেইখানে বর্ণিত হইয়াছে—

অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতং
দদৃশুতে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগম্বরং। ২।১৮
স চাষ্টদশ তত্রো দেবীঃ ব্যাপ্তলোকত্রয়ং দ্বিষঃ
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাং। ২।১৯

ইত্যাদি—চণ্ডীর সমুজ্জ্বল চিত্র-ভাষার সহিত গীতার অনুরূপ শব্দাবলি তুলনীয়।

লম্পসি ত্বং গ্রসমান সমন্তাৎ
সমগ্রান্ লোকান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ। ১১।৩০
ভাসা পূরিত্বৈর্জগদ সমগ্রং ত্বং
ব্যাপ্তরবৈরুগ্রকরৈর্বিসদ্ভঃ। ১১।৩০
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ। ১১।৩০

চণ্ডীতে ও গীতায় এই স্থানগুলিতে—একই ভাষায় একই জ্যোতির্ময় বিশ্ব-ব্যাপী রূপ অঙ্কিত করা হইয়াছে।

(৫)

গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। ৭।৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। ৭।৭

যদ্যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবং। ১০।৪১

চণ্ডীতে ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন—

ত্বয়ৈতদ্ ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতেঽখিলং।

ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমত্স্যন্তে চ সর্ব্বদা। ১।৭৭

—কেবল বলিতেছেন

বিদ্যা তথৈব হেতবস্তব জন্মরূপাঃ

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। ৪।৩

'তত্তদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বমূর্জ্জিতং' আর 'তত্তদ্বিভূতিমৎ জগন্মাত্ররূপা' একই ভাষা আর একই কথা। মাত্র শক্তি অর্থে বিভূর শক্তি এবং পরাশক্তির শক্তি—দুইই হয় এবং দুই অর্থেই একই তাৎপর্য্য।

দেবতারা বলিতেছেন

সর্ব্বস্যাদ্যন্তরহিতং তবসংস্থমভূত

সর্ব্বাত্মিকা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা। চণ্ডী। ৪।৭

গীতায় ভগবান্ও বলিতেছেন

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। ১০।৪২

'তত্তদ্বিভূতিমৎ কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' একই কথা। এইখানে একটু বুঝিবার বিষয় আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'এই বিশ্ব-জগৎ ব্যাপিয়া আমিই রহিয়াছি। আমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমা হইতেই সমস্তের উদ্ভব, আমাতেই স্থিতি, আমার আমাতেই সমস্ত লীন হইয়া যায়। চণ্ডীর সমস্তের ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ একই কথা বলিতেছেন 'তুমিই এই জগৎ ধারণ কর; তুমিই এই জগৎ সৃজন কর। তুমিই এই জগৎ পালন কর, আবার তুমিই এই জগৎ গ্রাস কর।' গীতায় অর্জ্জুন দেখিলেন কাল-রূপী শ্রীহরিই জগৎ গ্রাস করিতেছেন।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ

লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ। ১১।৩০

একই কার্য্য দুইজনে দাবী করিতেছেন। কিন্তু দুইজন কোথায়? অগ্নি আর অগ্নির দাহিকা-শক্তি ত দুই নয়। তেমনি বিভু আর বিভু-শক্তিও দুই স্বতন্ত্র সত্তা নয়। লীলায় দুই হইতে পারেন—বহু হইতে পারেন, কিন্তু তত্ত্বে এক। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। ৭।১৪

এই যে ত্রিগুণাত্মিকা দুরতিক্রমণীয়া মায়া—ইহা আমারি (শক্তি)।

চণ্ডীতে দেবতারা বলিতেছেন

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। ১১।৫

আর এই স্তবেই ভগবান্ দেবীকে নারায়ণী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। নারায়ণী শব্দের অর্থ কি? নারায়ণস্যেমিতি—নারায়ণের শক্তি। নারায়ণ কে?

নারায়ণঃ ন বৈ সর্ব্ব-দেহিনা

মাত্মাস্তবীশাখিললোকসাক্ষী।

নারায়ণোঽঙ্গ নরভূজলায়নাৎ

তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।

(শ্রীমদ্ভাগবত। ১০।১৪।১৪)

'নার' শব্দে সর্ব্বজীবের সমূহ অথবা মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তাহার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় যিনি তিনিই নারায়ণ। সেই নারায়ণই সর্ব্বদেহধারীর আত্মা, সকলের অধীশ্বর এবং সর্ব্বলোক-সাক্ষী। (হে অধীশ! তুমি কি এমন নহ? এইভাবে অন্বয় হইবে) আবার 'নার' শব্দে জল অর্থাৎ কারণ-বারি, তাহাই অয়ন বা বিশ্রাম-স্থান যাহার তিনিই নারায়ণ। তিনি পরমাত্মা সর্ব্বকারণের কারণ শ্রীভগবান্। তাঁহার এক শক্তি নারায়ণী! তিনিই মহামায়া, তিনিই আদ্যা প্রকৃতি, তিনিই চণ্ডী। এই প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। এই উপাদান-কারণ-রূপেই ইনি সাংখ্যের চক্ষে জড়-রূপা। ইহাঁরই বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), অহংকার, মন, পঞ্চ-তন্মাত্র প্রকৃতি পরম্পরাক্রমে প্রসব করেন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাপ্রকৃতিরষ্টধা। গীতা। ৭।৪

এই উক্তির সঙ্গে সমন্বয় করিয়া বুঝিতে হইবে

ত্বং বৈষ্ণবী-শক্তিরনন্তবীর্য্যা

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। চণ্ডী। ১১।৫

চণ্ডীর উক্তিতে যাহা পাওয়া যায়—গীতার উক্তিতে তাহাই প্রকাশিত। সাংখ্যেরা বলেন পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিয়া প্রকৃতি সৃজন করেন। শুধু সান্নিধ্য, সংযোগ বলিতে তাঁদের বিশেষ আপত্তি। কারণ পুরুষকে নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, অনাসক্ত, ঋষির, জ্ঞাতিযোগাদি করিতেই হইবে। প্রকৃতির গায়ে তিনি কিছুতেই গা লাগাইবেন না। তাহাতে তাঁহার অপোজ হইবে। কিন্তু চণ্ডীতে দেখি প্রকৃতিকে বুকে লইয়া পুরুষ ঘুমাইতেছেন।

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।

আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ।

এই যোগনিদ্রাই প্রকৃতি। দেবী যখন বিশ্ব ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া ব্রহ্মার নয়ন-সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন, তখন দেখি তিনি শ্রীহরির দেহ, আসন, শয্যা ও বক্ষ হইতে নির্গতা হইয়া আসিলেন।

নেত্রাক্তনাসিকবাহুজঘনেত্যুপযোগঃ।
নির্গম্য ধর্মনে এষো ব্রহ্মণোঽধারূপধনঃ।

অর্থাৎ প্রকৃতি কেবল পুরুষের কাছে থাকেন না—পুরুষের সর্বাঙ্গ অধিকার করিয়াই থাকেন।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া গীতায় ভগবানও বলিয়াছেন,

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত। ১৪।৩

প্রাকৃত সৃষ্টিতে যেমন দেখা যায়—প্রথমতঃ জরায়ু হইতে রজোনির্গমরূপ বিক্ষোভ, পরে পুরুষের সংসর্গ, তবে সৃষ্টি—তাহারই তেমনি প্রকৃতিতে এক প্রকার বিক্ষোভ বা রজঃ-উদ্রেক জাতীয় কিছু ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সেই সময় পরমপুরুষ, মহদ্ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ যোনিতে বীর্য—অর্থাৎ সৃষ্টি-বীজ আধান করেন। অমনি সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

(৩)

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" গীতার এই কথাটিই যেন বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার জন্যই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

এই জন্যই গীতায় এই শক্তিকে 'দুরত্যয়া' অর্থাৎ দুর্লঙ্ঘনীয়া বলা হইয়াছে।

উপরিউক্ত চণ্ডীর শ্লোকটীর ঠিক অনুরূপ ভাব ও ভাষাও গীতাতে আছে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

কৈর্ময়া প্রযুক্তঃ কেন পাপং চরতি পূরুষঃ
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ। ৩।৩৬

ভগবান্ বলিলেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

এই কাম ও ক্রোধ গুণময়ী মায়ার সন্তান—রজোগুণ সমুদ্ভব। মহামায়াই গুণত্রয়-বিভাবিনী।

চণ্ডীর 'বলাদাকৃষ্য প্রযচ্ছতি'—গীতার 'বলাদিব নিয়োজিতঃ'।

গীতা বলেন—সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্। ১৪।৫

চণ্ডীও বলেন—প্রকৃতিস্ত্বং সর্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী। ১।৭৮

আর, সংসার-বন্ধ-হেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী। ১।৫৮

এখানেও ভাব ও ভাষা অবিকল এক!

সংসার বন্ধহেতুশ্চ—দেহে দেহিনংনিবধ্নন্তি।

সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা জীবের সংসার নামক বন্ধন সংঘটিত হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকাশ—স্বভাব ও সুখপ্রিয় সত্ত্ব-গুণ প্রায়ই সুপ্ত অবস্থায় থাকে। আর প্রবৃত্তি-জনক ও দুঃখ-প্রিয় রজ এবং জড়ত্বভাব (inertia) ও মোহপ্রিয় এবং সত্ত্ব ও রজের আবরক তম অধিকাংশ মানুষেই প্রবল থাকে। জীব-জন্তুতে সত্ত্বের প্রকাশ নাই, রজ ও তমই সব। উদ্ভিদাদিতে কেবলই তমের কার্য। শুধু তম বা শুধু রজ অথবা শুধু সত্ত্ব স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না—অর্থাৎ ইহারা পরস্পর inseparable। গুণ-সকলের বৃত্তি এই যে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া প্রকাশ পায়।

অন্যোন্যাভিভবাশ্রয় জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ। সাংখ্যকারিকা।১২

ইহারা অন্যোন্যাভিভব-বৃত্তি অর্থাৎ একে অন্যকে অভিভূত করিয়া কার্য করে; অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তি, অর্থাৎ—একে অন্যের অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হয়; যেমন বৃহৎ কিছু না থাকিলে ক্ষুদ্র থাকিত না। উপর না থাকিলে নীচ কথাটাই হইত না—তেমনি রজ বা তম না থাকিলে সত্ত্ব থাকিত না। অন্যোন্যজননবৃত্তি—অর্থাৎ পরস্পরকে পরিণামিত করা গুণ-সকলের ক্রিয়া—ইহা ঐ 'অভিভবের' উল্টা দিক্। উদ্ভাস, মিথুনবৃত্তি—অর্থাৎ পরস্পরে অধিবাস্যাবিরূপে ক্রিয়া করা। এক সত্ত্বের কার্যে অন্য দুই গুণও গৌণভাবে থাকে।

মহামায়া এই ত্রিগুণময়ী। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু মূর্ত-অমূর্ত, স্থূল—সূক্ষ্ম বস্তু আছে সমস্তই এই তিন গুণের কার্য। তাই দেবীকে বলা হইয়াছে—

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

আর, দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা।

গীতা বলেন—বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্। ১৩।২০

আর, কার্য-কারণ কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। ১৩।২১

আবার চণ্ডীতে আছে—

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম-প্রদায়িনী। ১১।৯

(৪)

গীতার বিভূতিযোগ-নামক দশমাধ্যায়টীর সঙ্গে এবং ৭ম, ৯ম ও ১৪শ অধ্যায়ের ততকগুলি শ্লোকের সঙ্গে চণ্ডীর ৪র্থ অধ্যায়ে দেবতাদিগের স্তবের বিষয়টী বিশেষভাবে তুলনা করিয়া পড়িলে দুয়ের মধ্যে ভগবান্ ও ভগবতীর তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় অনেক ঐক্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে।

গীতার নবম অধ্যায়ে ভগবান্

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা মৎস্থানি সর্ব ভূতানি"

বলিয়াই আবার তখনি বলিলেন—

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্
ভূত ভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।

ইহার পূর্বে ৭ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি। ৭।১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্। ৭।১৩

সমস্ত দার্শনিক তর্ক, যুক্তি ও বিচারের যাহা চূড়ান্ত রহস্য তাহা এবং তাহার সীমা-সা—এই শ্লোক কয়টীর মধ্যে নিহিত আছে, কিন্তু সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক এবং লেখকেরও বিদ্যার অতীত। তবে সহজ কথাটা হইতেছে এই যে—সমস্ত বস্তুই ভগবানে অবস্থিত এবং

সমস্ত বস্তুতে ভগবান্ আছেন। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন

প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমাবশ্বচাণ্ডাল গোখরম্
প্রবিষ্ট ইতি তত্রাপি তত্ত্বেন ভগবান্ ইতি।

অর্থ, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ সকলকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। কারণ প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান্ তাঁহারই-রূপে প্রবিষ্ট আছেন।

গীতায় ভগবান্ আবার বলিয়াছেন—

[illegible] ভক্তি বিনা যে জ্ঞানমার্গ তুচ্ছ চেষ্টামাত্র। ১০।১৯

বিশ্বে [illegible] বাহিরের কোথাও কিছুই অস্তিত্ব নাই। অথচ তিনি কিছুতেই নাই। তিনি সর্ব্বাতীত। সর্ব্বময় হইয়াও সর্ব্বাতীত। তিনি বলেন তাহাই আমার স্বরূপ-বিশেষণ। তিনি সমস্তে আছেন—আবার কিছুতেই নাই এই দুই কথার সত্য। তিনি—অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম সমস্ত আছেন প্রকৃতি-রূপে। তিনিই মায়াময়। তিনি প্রকৃতি। তিনি ত্রয়ী। তিনি—অর্থাৎ গুণাতীত পরম পুরুষ কিছুতেই নাই। তাঁহার নিগুণ ব্রহ্ম নিষ্কলরূপে, নিষ্প্রপঞ্চে, Absolute

অব্যক্তা ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্। ৭।২৪

এই কথার পরে বলিয়াছেন

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।

এই যোগমায়া ভগবানের নিজেরই শক্তি। তদ্দ্বারাই তিনি সমাবৃত থাকেন। ইনিই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। আমরা এই ত্রিগুণেরই স্থূল কার্য্যাবলী বহির্জগৎরূপে বিস্তৃত দেখিতে পাই। ইহার অন্তরালে যে পরমাত্ম-শক্তি সূক্ষ্ম আছে, তাহা আমাদের সহজ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। তাই আমরা তাঁহাকে জানি না। তাঁহাকে খুঁজিও না। তিনি যে আছেন তাও অনেক সময় স্বীকার করিতে চাই না। পরমাত্ম-শক্তিকে শ্রুতি 'বস্তুতন্ত্রনিগূঢ়া' বলিয়াছেন—এই জন্যই। শ্রুতি এই প্রকৃতি বা যোগমায়াকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ (সরূপাং)
। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগা মজোঽন্যঃ। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ৪।৫

তিনি একা কারণ তিনি ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই। তিনি অজা* জন্মরহিতা, অনাদি। লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা অর্থাৎ রজ, সত্ত্ব ও তমো গুণান্বিতা। তিনি আপনার অনুরূপে (অর্থাৎ তিনি নিজে ত্রিগুণাত্মিকা, তাই তিনি যত কিছু সৃজন করেন সমস্তই ত্রিগুণাত্মক) বহু প্রজা সৃজন করেন। 'সরূপাঃ' পাঠ ধরিলে—রূপে একটিতা—গীতার ভাষায় হয় 'ব্যক্তিসম্পন্ন'। শ্রুতিতে প্রকৃতিকে 'একা' বলা হইয়াছে।

চণ্ডীতে দশম অধ্যায়ে শুম্ভাসুর ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রাণী, কৌমারী, বারাহী, নার-সিংহী, কালী, শিবদূতী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"দুর্গে! তুমি আমার অন্যান্য সৈন্য ও সেনাপতিসমূহ বিনাশ করিয়া খুব সাধুতা করিয়াছ; কিন্তু তোমার গর্ব্ব করিবার কিছু নাই। কারণ তুমি অন্যের সাহায্য পাইয়া যুদ্ধ করিতেছ। এই কথায় দেবী কহিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ। ১০।৫

এ জগতে আমি ত' একই! আমি-ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেহই নাই। হে দুষ্ট! দেখ, আমার বিভূতি-সকল আমাতেই লয় পাইয়া গেল।" অমনি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি সমস্ত দেব-শক্তি কালী ও শিবদূতী দেবীর দেহে বিলীন হইয়া গেল। থাকিলেন শুধু 'একা'—দুর্গা ভগবতী চণ্ডা সঙ্গেতে থাকাতে জগৎ। এইজন্যই শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন—"অজামেকাং"।

(৮)

গীতা ও চণ্ডীর তুলা-ভাবাত্মক যে সব শ্লোকের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এখন তাহা দেখাইব।

(ক) ত্রয়োদশম্ ক্ষেত্রম্..... গীতা ৭।৮
অথাং স্বয়মধিষ্ঠিতা দ্বৈতেষ্বং আপ্যায়তে। চণ্ডী। ১১।৪

(খ) প্রণয়ঃ সর্ব্বভূতেষু শশ্বঃ যে ... গীতা। ৭।৮
পঞ্চাত্মিকা সুনিয়তপর্ব্ব বহুধাং বিধানৈঃ
উদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সামাং। চণ্ডী। ৪।১০
বেদঃ পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুষেব চ। গীতা। ৯।১৭

(গ) বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি। গীতা। ৭।১০
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে চণ্ডী। ১১।৮

(ঘ) পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। গীতা। ৯।১৭
যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। চণ্ডী। ৫।৭১

(ঙ) যথাবৎ—গীতা। ৯।১৩
তং যাহা তং স্বধা। চণ্ডী। ১।৭৩

(চ) অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন। গীতা। ৯।১৯
তথা সংহৃতি-রূপান্তে। চণ্ডী। ১।৭৯
কৈর্জীব্যতে হি ক্ষুধিতাস্তন্যদর্শনেন। ৪।১৩
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং। চণ্ডী। ১১।৮২

(ছ) যচ্চন্দ্রমসি...তেজো বিদ্ধিমামকং। গীতা। ১৫।১২
জ্যোৎস্নায়ে চেন্দুরূপিণ্যৈ। চণ্ডী। ৫।১০

(জ) মত্ত স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। গীতা। ১৫।১৫
যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু স্মৃতি-রূপেণ সংস্থিতা। চণ্ডী। ৫।৭২
যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু ভ্রান্তি-রূপেণ সংস্থিতা। চণ্ডী। ৫।৭৩

চণ্ডীর ৫ম অধ্যায়ে দেবীকে সর্ব্বময়ী সর্ব্ব-স্বরূপিণী বলিয়া স্তব করা হইয়াছে।

সর্ব্ব-রূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ
অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীং।

এ প্রণামটী চণ্ডীর নয়, কিন্তু চণ্ডীর ৫ম অধ্যায়ের ইহাই মূল কথা।

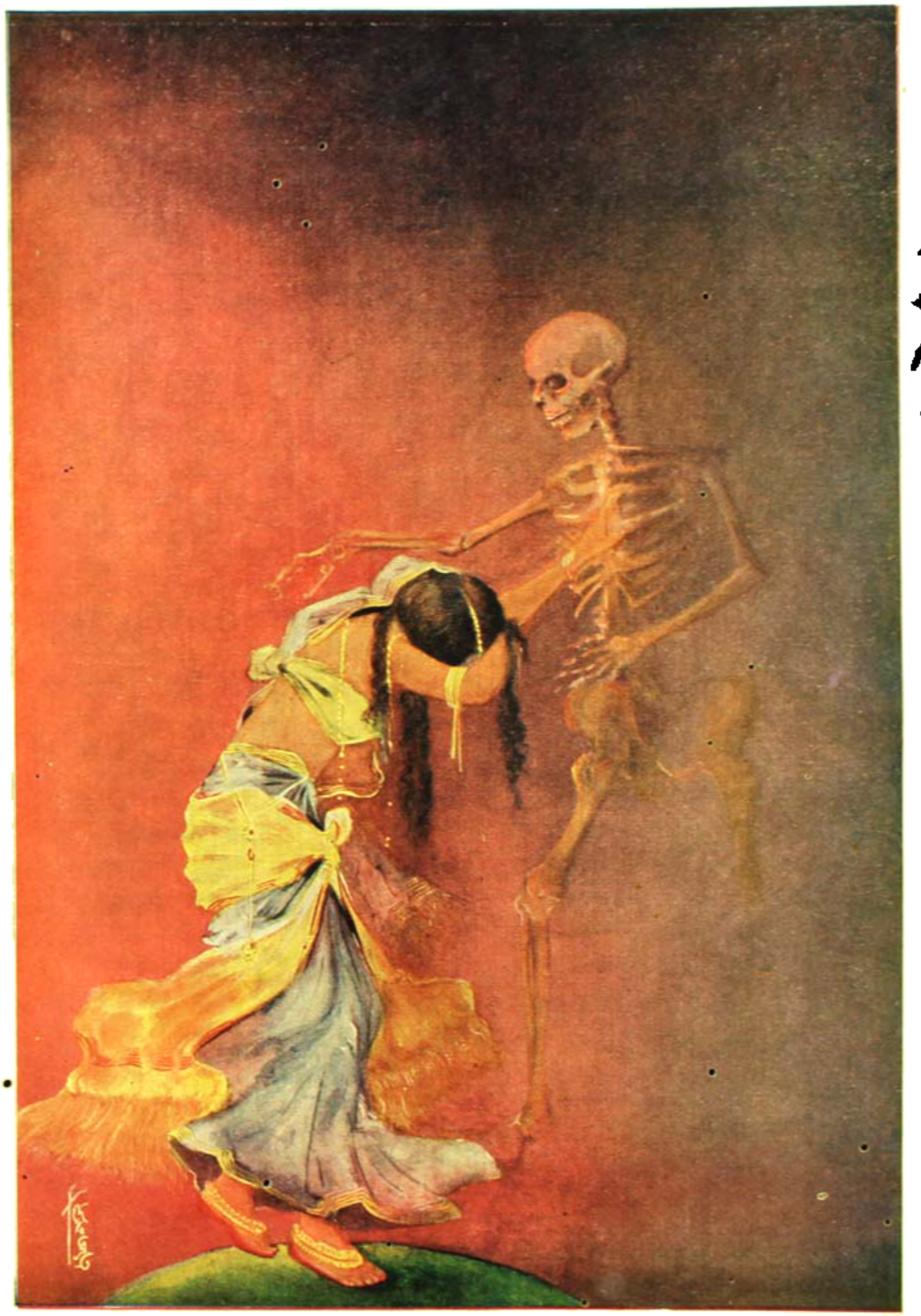

নিয়তির পরিহাস

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবব্রত ঘোষ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

দেবী—কল্যাণ, শোভা, জ্যোৎস্না, সুখ-রূপা, বুদ্ধি, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, খ্যাতি, গৌরী, কৃষ্ণা, ধূম্রা, ভেজনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী,—মানুষের হৃদয়ে মনে যত ভাব, যত প্রবৃত্তি —সমস্তই তিনি।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মার স্তোত্রে আছে—দেবী স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কার, সুধা, ও ব্রহ্মবাদি বর্গ, সাবিত্রী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি, মহামোহা, মহাদেবী, মহা-অসুরী, প্রকৃতি, কালরাত্রি, মোহরাত্রি, মহারাত্রি, শ্রী, ঈ, বুদ্ধি, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি—ইত্যাদি।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ

কাব্য-ইতিহাস সকল চরিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হয় না; কোনো সুমধুর মহান্ চরিত্রকে তাহারা অকারণ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, কোনো চরিত্রকে বা তাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। এইরূপে সাহিত্য পক্ষপাতিত্ব দোষশূন্য নহে। কবি বা ঐতিহাসিক প্রত্যেকেরই প্রিয় নায়ক-নায়িকা আছে। ইহাদের প্রতি তাঁহারা অত্যধিক অনুরক্ত। তাঁহারা হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি ঢালিয়া এই নায়ক-নায়িকাদের চিত্র অঙ্কন করেন; তাহাদের হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কার্য্য-কলাপ ভাবনা-চিন্তার মধ্যে যে অপরূপ সুষমার সন্ধান পান, প্রভূত প্রয়াস সহকারে ভাষার বর্ণচ্ছটায় তাহা রঞ্জিত করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করেন।

আবার কোনো কোনো চরিত্র অসেষ গুণবত্তা, মাধুর্য্য ও মহিমার অধিকারী হইয়াও লেখক সম্প্রদায়ের নিকটে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে না। শুদ্ধ আপনার হৃদয়-মন্দিরে ইহাদের বিভূতে পূজা করিয়া থাকে, রস-পিপাসু চিত্ত ইহাদের নির্জ্জনে এই সকল চরিত্র আলোচনা করিয়া তৃপ্ত হয়; কিন্তু জনসাধারণের নিকটে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে কোনো লেখনী উদ্যত হয় না বলিয়া সাগরের অতল গহ্বরস্থ মণি-মাণিক্যের ন্যায় ইহারা চিরকাল অপ্রকাশিত থাকে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্র অনেকটা এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্যে, লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা তিনি জগতের শিরোধার্য্যা,—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, চিন্তা প্রভৃতি আদর্শ সতীসাধ্বীর সমকক্ষ। স্বভাবের অনাবিল মাধুর্য্যে ও পতিভক্তির পরাকাষ্ঠায় তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিয়া যায় নাই। তিনি ত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত, সহিষ্ণুতার অটল প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্র সুধীসমাজের নিকটে তাহার প্রাপ্য পূজা লাভ করে নাই। পৌরাণিক নারীরত্নদের অবলম্বন করিয়া কত শত গাথা, কবিতা, কাহিনী, আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে; কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন-লীলা, যাহার উৎকর্ষ ও যাথার্থ্য সম্বন্ধে ইতিহাস নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের আলোচনার বস্তু হইয়া রহিয়াছে,—সাধারণ লোক অদ্যাবধি এ মধুভাণ্ডারের আস্বাদ লাভ করে নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপের ধনবান্ রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তিনি অতি সুশী, লজ্জাশীলা ও ভক্তি-সম্পন্না। গঙ্গার ঘাটে শচীমাতার সহিত দেখা হইলেই তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া মাতাকে প্রণাম করিতেন; শচীদেবী আশীর্ব্বাদ করিতেন 'মা, তোমার সুন্দর বর হউক।' বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় ও আনন্দে বিহ্বল হইতেন; কারণ, তিনি নিমাইকে ইহার পূর্ব্বেই নিজ অন্তরে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন,—শচীকে প্রত্যহ নমস্কার করিয়া যেন তাঁহার বহুল লাভের জন্য তাঁহার আবেদন জ্ঞাপন করিতেন।

শচীদেবী বালিকার রূপ-লাবণ্যে ও নম্র ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং নিমাইয়ের সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া সনাতন মিশ্রের নিকট ঘটক প্রেরণ করিলেন। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের প্রশংসায় ও যশোকীর্ত্তনে তখন নবদ্বীপ শতমুখ। তাঁহাকে জামাতৃপদে বরণ করা অতি সৌভাগ্যের কথা। সনাতন মিশ্র শচীদেবীর প্রস্তাবে আহ্লাদে আত্মহারা হইলেন,—অতি সমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বরকন্যা যখন বাসর ঘরে চলিয়াছেন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে দারুণ ব্যথা পাইলেন, রক্ত পড়িতে লাগিল,—তিনি নিমাইয়ের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন। নিমাই প্রিয়ার অঙ্গুল আপনার অঙ্গুলির দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন,—বিষ্ণুপ্রিয়ার সমস্ত বেদনা দূর হইয়া গেল। হয়ত এই সামান্য-চিহ্ন ভাবী সুমধুর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সূচনা করিয়াছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া বেশী দিন স্বামি-সঙ্গ-সুখ অনুভব করেন নাই; বিবাহের পর কয়েক বৎসর কাল মাত্র নিমাই সংসার-আশ্রমে ছিলেন, তাহারও অধিকাংশ সময় সঙ্কীর্ত্তনে ব্যয়িত হইত। প্রভু ত একা বিষ্ণুপ্রিয়ার নহেন, তাঁহার উপর সকলেরই সমান অধিকার। যে রাত্রে নিমাই শয়ন করিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া পদসেবা করিতেছেন, এমন সময়ে গদাধর আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার স্থান অধিকার করিলেন,—বিষ্ণুপ্রিয়া নিঃশব্দে অপর কক্ষে গমন করিলেন। কোনো দিন বা নিমাই সঙ্কীর্ত্তনের রসে বিভোর হইয়া শয়নগৃহে আগমন করিতেন, তখনও ভক্তিতে তাঁহার চক্ষে অবিরাম অশ্রু ঝরিত, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা কি বলিয়া স্বামীকে সান্ত্বনা দিবেন? তিনি ভীত হইয়া শচীর কাছে ছুটিতেন। শচী আসিলে নিমাই অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইতেন এবং কৃষ্ণপ্রসঙ্গে রজনী অতিবাহিত হইত।

নিমাইয়ের গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, তথাপি শচীর অনুরোধে তিনি কিয়ৎকাল সংসারী হইয়াছিলেন। নিমাই ভোজন করিতে বসিয়া শচীর সহিত তাঁহার পুত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া যে রহস্যালাপ করিতেন, তাহা অন্তরালবর্ত্তিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বড় প্রীতিসুখকর বোধ হইত। নিমাই যখন পরিষৎ-সমভিব্যাহারে আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেন, তখন, বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামিদর্শনে কতবার বাধা রাখিতে ইচ্ছা হইত, কে জানে! কিন্তু তিনি হিন্দুঘরের কুলবধূ, তাঁহার স্থান অন্তঃপুরে,—সর্ব্বজনসমক্ষে যাইবার অধিকার তাঁহার নাই। তাই

অন্তরের ভাব অন্তরে গোপন করিয়া তিনি ভবদেবের মুক্তাহীন দুটি নয়ন তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার তরুণীত্বের উপর চতুর্দশ বসন্ত বিচিত্র-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; যৌবনের কামনা, অভিমান, ঘন আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ। তাঁহার সলজ্জ দৃষ্টির বিহ্বল বিভা যায়; তাঁহার বক্ষে আশা উদ্বেল হইয়া ওঠে; তাঁহার তাপিত দৃষ্টি কাহাকে অন্বেষণ করে। কত রজনী তিনি সঙ্কীর্তনরত নায়কের উদ্দেশে বিকলে যাপন করিতেন, কে তাঁহার সংবাদ রাখিয়াছে! কত অস্ফুট অভিলাষ তাঁহার হৃদয়ে অহরহ গুঞ্জরিত হইত—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! হায় অন্তর্যামিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, কেন্দ্রচ্যুত গতিসঙ্কল্প হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়া কবে না প্রেম তুমি নীরবে সহিয়াছ!

শ্রীগৌরাঙ্গ লোকশিক্ষার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মানবচিত্তে ভক্তির উদ্রেক করিয়া কৃষ্ণভক্তির বীজ বপন করিবার জন্য তাঁহাকে সকল তাপসুখক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মানুষের হৃদয় সাধারণতঃ কঠোর। বিপদের বা শোকের তীব্র আঘাত না পাইলে তাহা কোমল হয় না। নিমাইয়ের গৃহত্যাগে চতুর্দ্দিকে যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল, সেই অশ্রুর বন্যায় হৃদয়ের সকল কঠোরতা ভাসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার ত্যাগের উজ্জ্বল দিপ্তিতে সমস্ত গ্লানি, সমস্ত মলিনতা ভস্মীভূত হইয়াছিল। এইরূপে নিমাইয়ের সন্ন্যাস-গ্রহণে সার্থকতা ছিল।

কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার যে ক্ষতি হইল, তাহা অপরিমিত। অগ্রহায়ণ মাস,—বিষ্ণুপ্রিয়া তখন শিয়রে,—তাঁহার মন স্বভাবতঃ আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল;—

"আর কেন নিবাঈ ঐসে মোরে।
অগে নাহি পাই দুখ দুহুঁ আঁখি ঝুরে॥"

জ্ঞানী অনন্তর পূর্ব্বাভাস দ্বারা বিস্তার করিয়াছিল। তিনি লোক-পরম্পরায় অবগত হইলেন—নিমাই নবদ্বীপ ত্যাগ করিবেন তখনও তিনি আপন দুঃখ চাপিয়া আসিলেন। শচীর অনুরোধে প্রভু কয়েক সপ্তাহ সংসারী হইলেন। এই কয়টী দিবস বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়।

যেদিন প্রভুর নিমাই চিরতরের মত পত্নীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিবেন, তাহার পূর্ব্বের রাত্রে প্রভু প্রিয়ার সকল সাধ পূর্ণ করিলেন শ্রীমতী অলকা, তিলকা, চন্দন, মালতীর মালা দ্বারা নিমাইকে সজ্জিত করিলেন। নিমাই অতিরিক্ত সৌন্দর্য্যের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার বেশবিন্যাস করিয়া দিলেন। গৌরাঙ্গ মুগ্ধ হইয়া প্রিয়তমাকে দর্শন করিলেন—শ্রীমতী লজ্জায় হর্ষে চরিতার্থ হইলেন।

রাত্রি প্রেমালাপে রজনীর অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইল। প্রদীপ নির্ব্বাপণ করিয়া গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া ভ্রমণ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া যখন সন্তোষে নিশ্চিন্ত হইয়া পতিক্রোড়ে সুপ্ত, নিমাই তখন শয্যাত্যাগ করিলেন। প্রিয়া বক্ষের যে মৃদু ঘর অধিকার করিয়াছিলেন, সে স্থলে অতি সন্তর্পণে উপাধান রক্ষা করিয়া, চুম্বন করিয়া ধীরে বহির্গত হইলেন। অর্গলহীন কক্ষে বায়ু কক্ষান্তরে কাঁদিতে লাগিল, কৃষ্ণসার মন্দির-আলিয়া দ্বারা বিলাপ করিল, রজনীর তারকা ম্লান হইয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া চমকিয়া দেখিলেন—পালঙ্ক শূন্য।

"যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নবীন,
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া।" প্রেমদাস

কবন-কুন্তল, রত্ন-অভিরণ, বিলাস-লজ্জা বর্জ্জন করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইলেন। কখনো গৌরাঙ্গকে বিষ্ণু ভাবিয়া দোষ দিতেছেন। কখনো বা তাঁহার অতুল প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইতেছেন। কখনো বা নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর অবস্থা চিন্তা করিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু সাধ মিটাইয়া ক্রন্দন করিবারও তাঁহার অবকাশ নাই। সম্মুখে শোকাতুরা শচীমাতা, পুত্রবধূর রোদনধ্বনি শুনিলে তাঁহার মাথা যে শতখণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইবে! বিষ্ণুপ্রিয়া দুঃখের আবেগ সম্বরণ করিয়া শচীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। নবদ্বীপের লোক এই দৃশ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল,—গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের অপরিমীম মূল্য পলকে তাহাদের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইল।

নিমাই কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম মুণ্ডিত হইয়াছে, অঙ্গে কৌপীন ও বহির্ব্বাস, করতল রাজপথে নৃত্য করিয়া চরণকমল অতিক্রান্ত। তিনি বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অস্থির। ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক প্রার্থনায় অজন-গণকে দর্শন দিতে একবার শান্তিপুরে আসিলেন।

নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, সকলেই আসিতে পারিবেন ত?"

প্রভু বলিলেন, "তাহার আর সন্দেহ কি? যিনি আসিতে চান, তাঁহাকেই আনিবে। আমি সকলের নিকট মহানন্দে বিদায় লইব।"

অনুমতি দিয়াই তাঁহার শ্রীমতীর কথা মনে পড়িল। তিনি সন্ন্যাসী—শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দর্শন নিষিদ্ধ। তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "শ্রীপাদ সকলকেই আনিবেন, যে আসিতে চায় তাহাকেই আনিবেন,—কেবল একজন ছাড়া।"

নিতাই ললাটে করাঘাত করিলেন।

চৈতন্যের আগমনের কথা যখন নবদ্বীপে প্রচার হইয়া গেল, তখন আবালবৃদ্ধবনিতা শান্তিপুর যাইবার জন্য সজ্জিত হইল। আজিনার শচীর নিমিত্ত খোলা আসিয়াছে, তিনি তিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক অবগুণ্ঠনাবৃত নবযুবতী শচীর অঞ্চল ধরিলেন। সকলে দেখিল—বিষ্ণুপ্রিয়া।

নিতাই কাতর স্বরে বলিলেন, "প্রভু সকলকে যাইতে আদেশ দিয়াছেন—কেবল একজন ছাড়া।"—কাহার উদ্দেশে এই নির্ম্মম বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া জনমণ্ডলী বেদনায় নির্ব্বাক্ হইল।

কোনো উক্তি না করিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে, আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃতা বিষ্ণুপ্রিয়া নিঃশব্দে সখীর অঙ্গে ভর দিয়া ফিরিয়া গেলেন।

শচী ক্ষুব্ধিত কণ্ঠে বলিলেন, 'তবে আমিও যাইব না,—আমাকে বধূমাতার কাছে লইয়া চল।"

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে বিনীত বাক্যে প্রবোধ দিয়া শান্তিপুরে প্রেরণ করিলেন। কহিলেন, "সন্ন্যাসধর্ম্মে আমাকে দর্শন নিষিদ্ধ, সেই জন্য আমার যাওয়ার আজ্ঞা নাই। এই তুচ্ছ ঘটনায় আপনি কেন বৃথা অভিমান করিবেন।"

শ্রীমতী যখন প্রভুর আদেশ প্রথম শুনিলেন, তখন বজ্রাহতার ন্যায় স্তব্ধ হইলেন। কি অন্যায়! কি অন্যায়! ত্রিলোকের সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায়, কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া নহে? যদি তিনি প্রভুর ঘরণী না হইতেন, তবে ত যাইতে পারিতেন; তাঁহার কেবল অপরাধ তিনি প্রভুর ঘরণী।

পরক্ষণেই আবার মনে হইল, প্রভু ত্রিজগৎ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়াছেন; ইহা ত কম সৌভাগ্যের কথা নহে। তিনি যে প্রভুর অর্দ্ধাঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া অর্দ্ধাঙ্গ দেখে, না অর্দ্ধাঙ্গিনী না হইয়া দর্শনে সুখ? না হয় দেখা হইল না—প্রভু ত তাঁহারই। সকলে তাঁহার নামগ্রহণে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিতেছে, বিষ্ণুপ্রিয়ার শুভাদৃষ্টের প্রশংসা করিতেছে,—তিনি কিসের জন্য দুঃখ করিবেন।

সন্ন্যাসের অর্থ—ত্যাগ। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা বল্লভা, তাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভু সর্ব্বাগ্রে ত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাসে অনন্ত দুঃখ, যে দুঃখ দেখিয়া লোকের হৃদয় বিগলিত হইবে। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বর্জ্জন করিয়া প্রভু কঠোরতম দুঃখ বরণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বর্জ্জন করা যদি প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ হয়, তবে তাঁহার সহিত মিলন প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা সুখ—অর্থাৎ তিনি প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা নিজ-জন।

কিন্তু যুক্তির বাঁধ দিয়া হৃদয়ের আবেগ প্রতিরোধ করা যায় না। যখন হরিধ্বনি করিয়া সকলে শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন শূন্য মন্দিরে বিষ্ণুপ্রিয়া এলাইয়া পড়িলেন।

"কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে।"

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ কয়েক বৎসর নীলাচলে বাস করেন। শ্রীমতীর বিরহ দিবস-রজনী অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। প্রেমিক ভক্তের তিন ভাব—পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব বিরহ।

"সম্ভোগবিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈবৈকা ত্রিভুবনমেতন্মযো বিরহে॥"

"মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহ উৎকৃষ্ট, কারণ মিলনে তাহার এক মূর্ত্তি দেখি, বিরহে সে মূর্ত্তি ভুবনের সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করি।"

এই সুদীর্ঘকাল শ্রীমতী প্রভুর সেবা ও প্রিয়তমের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কাটাইতেন। রথযাত্রার সময়ে ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিতেন। তাঁহারা ফিরিলে চৈতন্যের সংবাদ পাওয়া যাইত। শচী নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে পাঠাইয়া নিমাইয়ের শরীরের অবস্থা, শয়ন-ভোজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন।

"এক দিন যারে না দেখি নদিয়া
বাড়ীর বাহির দ্বারে।
সে এখন দূরে চাড়িয়া আমায়
কোথা নীলাচল পুরে॥

ভক্তগণ নিমাইয়ের কাহিনী সবিস্তারে বলিতেন, আর শ্রীমতী অন্তরালে বসিয়া সেই সব আস্বাদন করিতেন।

কঙ্গণার অবতার প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুলেন নাই। উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপ রুদ্র প্রভুকে বহুমূল্য প্রবারী বস্ত্র উপঢৌকন দিতেন। তিনি সন্ন্যাসী—সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত বস্ত্র লইয়া কি করিবেন? ঐশ্বর্য্য বা ধাবোধের হস্তে তিনি তাহা শচীমাতার নিকটে প্রেরণ করিতেন; অবশ্য বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম পর্য্যন্ত করিতেন না, কিন্তু বৃদ্ধা মাতৃদেবীর নিকট রাজদত্ত মহার্ঘ শাটী প্রভুর প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রীতিরই নিদর্শন ছিল। শ্রীমতী প্রত্যেক উপহারের বস্ত্রতে প্রিয়বিরহের দুঃখ অনুভব করিতেন।

সন্ন্যাসীর একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় ছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল। চৈতন্য যে দিন নবদ্বীপে পদার্পণ করিলেন, সে দিন চতুর্দ্দিকে ঘোষণা পড়িয়া গেল। অসংখ্য লোক প্রভুর সঙ্গ লইলেন। স্ত্রীলোকগণ অলিন্দে দাঁড়াইয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। প্রভু পূর্ব্বপরিচিত বৃক্ষ-লতা-নদ দেখিতে দেখিতে নিজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমতী স্বামী সন্নিধানে যাইবেন কি না, ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। প্রভু স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন না,—কিন্তু কেন এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিবেন! বিশেষতঃ তিনি হিন্দুগৃহের অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ, বয়ঃক্রম উনবিংশতি। কি সাহসে প্রকাশ্য স্থলে লক্ষ-লক্ষ লোক-বেষ্টিত ব্যক্তির পদধূলি গ্রহণ করিবেন!

বিষ্ণুপ্রিয়া সেদিন কবরী বাঁধেন নাই, বেশভূষা করেন নাই; অন্তরালে দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে পতির বদনসুধা পান করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। তিনি ভাবিলেন, পতি ইহ-কালের পরকালের আশ্রয়—তাঁহার নিকটে যাইবেন, ইহাতে আবার লোকলজ্জা কি? তখন আপাদমস্তক অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া,—অগ্রসর হইয়া চরণযুগলের চরণে কাতর ধ্বনি করিয়া পড়িলেন

প্রভু পশ্চাৎপদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?"

অবগুণ্ঠিত জনমুখ তখন পাশ্ব বিস্তর ভাব ধারণ করিয়াছে। লোকে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দেখিল—গৌরাঙ্গের অসাধারণ উন্নত সুন্দর দেহ, আর পদতলে পতিত অনিন্দ্যবেশা একটী পরমাসুন্দরী যুবতী।

শ্রীমতী মৃদু উত্তর করিলেন "আমি তোমার দাসীর দাসী।"

প্রভু বুঝিলেন। দুঃখে তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল।

তিনি বাষ্পরুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিলেন "তোমার কি প্রার্থনা?"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "প্রভু ত্রিজগৎ উদ্ধার করিলেন, কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী তরুরূপে পড়িয়া রহিল।"

তখন চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সকলের নেত্রে অশ্রুর বন্যা বহিয়াছে—কেবল প্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়ন শুষ্ক।

প্রভু কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অবনতমস্তকে কহিলেন, "তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি তোমার নামের সার্থকতা কর, তুমি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া হও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর করিলেন "আমি তোমাকে ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই না।"

প্রভু আবার নীরব হইলেন; পায়ের দুখানি খড়ম খুলিয়া শ্রীমতীকে বলিলেন, "হে সাধ্বি, আমি সন্ন্যাসী, আমার কিছু নাই। তুমি আমার খড়ম লও। ইহা দ্বারা আমা-অর্পিত তোমার যে বিরহ, তাহার শান্তি করিও।"

শ্রীমতী সেই পাদুকা প্রণাম করিয়া মস্তকে রাখিলেন। পরে চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

সমবেত জনমণ্ডলী হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

জীবনের শেষ অঙ্কটী নিমাই যখন বিষ্ণুপ্রিয়া অতি বিষাদে যাপন করিয়াছিলেন, তখন প্রভুর পাদুকাদ্বয় তাঁহার একান্ত আশ্রয় হইয়াছিল।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৪)

"উঠে আসুন মিস ঘোষ! ওদিকে বাজি আরম্ভ হয়ে গেছে! সকলেই দেখতে গেছে! আপনাকে না দেখতে পেয়ে আমি তাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম!"

মিঃ সেন লীলার হাত ধরিয়া বারাণ্ডার অন্য প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীচে ময়দানে অগ্নিক্রীড়া হইতেছিল। নিমন্ত্রিতেরা সকলে জানালা, বারাণ্ডা বা ছাতের উপর হইতে বাজি দেখিতেছিলেন।

লীলা অতৃপ্তচিত্তে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মিঃ সেনের অজস্র গল্প, বাজির নানাবিধ আশ্চর্য্য ও মনোহর ক্রীড়া—সমবেত জনগণের আনন্দ, উৎসব কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কিরণের সঙ্গে অনিবার্য্য বিচ্ছেদের দুঃখ ও বেদনায় তাহার সমস্ত চিত্ত ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। যে পথে সে স্বেচ্ছায় চলিয়াছে, তাহার শেষ ফল—অরুণের সঙ্গে তাহার বিবাহ; আর তাহার ফলে কিরণের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ—তাহার নিজের এ মৃত্যুপাশ সে নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়াছে। আজ আর ইহাকে এড়াইয়া চলিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই! যত ক্ষতি, যত যন্ত্রণাই হোক্, ইহা তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে!

অগ্নি-ক্রীড়া শেষ হইল। মিঃ সেন তবুও লীলাকে ছাড়িয়া যাইবার কোন লক্ষণ দেখাইলেন না। কিছু দিন হইতে লীলা তাহার প্রতি মিঃ সেনের অতিরিক্ত মনোযোগ দেখিয়া উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সাধ্যমত তাঁহার সঙ্গ এড়াইয়া চলিত। বিশেষ আজিকার এই বাধিত-কাতর চিত্তে তাঁহার সঙ্গ ও আলাপের ধটায় সে একেবারে বাতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মিঃ সেন লীলার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করেন নাই। তিনি আজ নিজের চিন্তা ও আশায় বিভোর। কথায় কথায় লীলার গান গাহিবার শক্তির কথা তুলিয়া তিনি সে সম্বন্ধে অজস্র চাটুবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন—'আমি মনে করি, এ বিষয়ে আপনার যে অতুল শক্তি আছে, আপনি তার কোন সদ্ব্যবহার করেন না—এটা কিন্তু বড় অন্যায়! চর্চ্চা না থাকলে ক্রমশঃ কণ্ঠের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

লীলা উত্তর না দিয়া শুধু হাসিল। কি কুক্ষণেই সে ক্লাবে গান গাহিয়াছিল! আর ত সেই একঘেয়ে কথা জনে জনের মুখে শোনা যায় না!

"আপনি হাসছেন! কিন্তু সত্যিই বলছি আমি—আপনার গান যে আমায় কি মুগ্ধ করেছে, তা আমি বলতে পারি না! আমার অবশ্য বলা উচিত নয়—কিন্তু না বলেও থাকতে পারছি না—আপনাকে যিনি বিবাহ করবেন, তিনি কি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ। মনে হলে সেই অজ্ঞাত লোকটির উপর আমার এত হিংসা হয়!"

লীলা হাসিয়া বলিল, আপনি ভুল করছেন! সে লোকটির উপর হিংসা না করে আপনার করুণা হওয়া

উচিত। আপনি জানেন না—আমি বড় জেদী ও একগুঁয়ে—সেইজন্ত কারুর সঙ্গে আমার বনে না।

মিঃ সেন অবিশ্বাসের হাসির সহিত লীলার দিকে চাহিলেন—ঠাট্টা করছেন আপনি! আমি এ কথা কখনো বিশ্বাস করতে পারি না! মিঃ সেন একটু থামিলেন, একবার কাসিয়া—একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট মৃদুস্বরে বলিলেন, বলতে সাহস হয় না মিস্ রায়! তবে যদি অভয় দেন—ত বলি—আমি যদি সে স্থান পাই, তবে সব দায়িত্ব নিতে রাজি আছি!

লীলা নীরবে অভিভূতের মত বসিয়া রহিল। সে কাহাকেও নিরাশ করিয়া বেদনা দিতে কষ্ট পাইত, কিন্তু দলশুদ্ধ সকলে যদি তাহাকেই বিবাহ করিবার জন্ত ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে সেই বা কি করিবে?

তাহাকে নীরব দেখিয়া মিঃ সেন আবার বলিলেন, আমার কথাটা ভেবে দেখবেন—মিস্ রায়! আমি আপনাকে স্ত্রীরূপে পেলে নিজেকে ধন্ত বলে জানবো! আমি যে কত ভালবাসি আপনাকে—সে কি করে জানাবো। আপনার কথা ছাড়া আর কিছু আমি আজকাল ভাবতে ভুলে গেছি! যখন কোর্টে থাকি—খালি আপনার মুখই আমার মনে জাগতে থাকে—রায় লিখতে গিয়ে কত দিন আপনার নাম—আপনার কথাই ভুলে লিখে ফেলি—'

"সেই সব ক্রিমিন্যাল আসামীর বদলে!" লীলা বিরক্তির তীব্র হাসির মধ্যে কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিল!

'আপনি অবশেষে আমার সঙ্গে ঠাট্টা আরম্ভ করলেন?' মিঃ সেন নিরাশ ভাবে লীলার মুখের দিকে চাহিলেন—'নিজের বিষয় বলবার মত আমার কিছু নেই মিস রায়! শুধু আমার মনের একাগ্র ভালবাসার কথাই আপনার কাছে নিবেদন করছি আমি,—মানুষ নিজে যেমন তুচ্ছই হোক্ না কেন—তার অন্তরের একনিষ্ঠ পবিত্র প্রেম—সে ত উপেক্ষার বস্তু নয়! যে দিন থেকে আমি আপনাকে এ ভাবে দেখেছি,—সেদিন থেকে আমার—"

সেনের উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল! বীণা সে সময় অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল! তাহার সঙ্গে—চৌধুরী!

[illegible] সেন! আপনি ততক্ষণ একটু মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করুন? লীলার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে!' বীণা কথাটা বলিয়া মধুর হাসিয়া সেনের দিকে চাহিল।

সেন সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার নিকট হইতে মুক্তির আশায় লীলা এতক্ষণ কক্ষনেত্রে এদিক ওদিক চাহিতেছিল, বীণার কথা শুনিয়া সেনের উত্তরের অপেক্ষা-মাত্র না করিয়া সে তখনি উঠিয়া পড়িল।

বীণা লীলাকে একটু অন্তরে আনিয়া অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে চুপি চুপি বলিল—'কিরণ কোথায়? তাকে দেখতে পাচ্ছি না যে? এই ত খানিক আগে দেখেছি—সে তোমার কাছেই ছিল?'

বীণার হিংসাপূর্ণ মুখ দেখিয়া লীলার হাসি আসিতেছিল—তবু সে গম্ভীর মুখে বলিল—'হয় ত ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে থাকবে—ছেলেমানুষ।'

'ঠাট্টা করো না লিলি! সব সময় তোমার ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না!' বীণা রাগিয়া বলিল—'কোথায় গেল সে—বলতে হবে তোমায়। আর তোমারি বা কি আক্কেল? তুমি এতক্ষণ ধরে তার কাছে একলা বসে কি এত গল্প কচ্ছিলে? এ সব নির্লজ্জ ব্যবহার দেখলেই ত লোকে পাঁচ কথা বলতে পারে! একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার?"

'সে নিজেই এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল,'—লীলা বীণাকে আরও জ্বালাইবার জন্ত বলিল,—'আমি মিঃ দত্তের সঙ্গে সেতার শুনছিলুম, সে এসে আমায় ডেকে বারাণ্ডায় নিয়ে এল, বল্লে, চল—একটু গল্প করা যাক্। তার পর থেকে ত ততক্ষণ এই খানেই ছিল। বাজি আরম্ভ হলে সেন আমায় বাজি দেখতে এদিকে নিয়ে এলেন,—সেই সময় সে যে কোন দিকে গেল, তা আমি দেখি নি।'

বীণা অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল, বলিল, 'তার সঙ্গে আমার কথা ছিল—আজ সমস্তক্ষণই সে আমার কাছে থাকবে, ছিলও সে বরাবর! খাবার সময় গোলমালে ও ভিড়ের মধ্যে সে যে কোন দিকে গেল—বুঝতে পারি নি! তার পরই দেখি তোমার সঙ্গে ছুটেছে সে! কি যে তোমাদের এত কথা, তা তো কিছু বুঝতে পারি না!'

লীলা আর কিছু বলিল না। চারিদিকের গোলমাল ও নানা উত্তেজনায় তাহার শরীর কেমন অবসন্ন বোধ হইতেছিল। বীণা অত্যন্ত বিরক্তি ভরে কিরণের সন্ধানে এদিক ওদিক চাহিতেছিল।

হলের ভিতর একদিকে লীলা ও বীণার বন্ধুর দল জটলা করিতেছিল। অমিয়া বলিল, 'আজ কাল মিলিকে কোনখানে দেখতে পাই না কেন—বল দেখি? ক্লাবে যাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছে এক রকম, তা ছাড়া কোন পার্টি কি সভা-সমিতিতেও যেতে দেখি না—হল কি ওর?'

ঐ বেলা এতক্ষণ দেওয়ালে বিলম্বিত বৃহৎ মুকুরে নিজের পরিপুষ্ট সুন্দর মুখখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তিনি এখন মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, তার কিছুই হয় নি—মিঃ ঘোষের শরীর আজকাল ভাল থাকে না—তাই আসতে পারে না। সেদিন ওদের নূতন বাগান বাড়ীতে যে পার্টি দিলে মিলি—তাতে মিঃ ঘোষকে দেখলে না? কি রকম বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে?

নীলিমা বলিল, তা যাই বল ভাই! মিলির বরাত ভালো! মিঃ ঘোষের অবর্ত্তমানে ওঁর অত বড় সম্পত্তি—সবই ত মিলির—পাঁচটী ভাই বোন নেই—যে ভাগাভাগি হবে। মা বাপের এক সন্তান যারা—তাদের জীবনটা বড় সুখের হয়—নয় কি?

রেবা দলের মধ্যে কিছু গম্ভীর ও চিন্তাশীল, সে বলিল, টাকা থাকলেই যে জীবনটা সুখের হবে, এ কথা তোকে কে বলেছে? অফুরন্ত টাকার ওপর বসে আছে, টাকার বিনিময়ে যত রকম বিলাস-ভোগ আছে, সবই সচ্ছে উপভোগ কচ্ছে—এরকম লোককে বাইরে থেকে খুব সুখী বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু সন্ধান করলে দেখতে পাবে, হয় ত তার মত দুঃখী জগতে খুব কমই আছে। বাস্তবিক সুখ জিনিষটা সংসারে এমন জটিল—

অমিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, রক্ষে কর্ ভাই রেবা—সময়ে অসময়ে, স্থানে অস্থানে, তোর দার্শনিক বক্তৃতা অনেক হজম করেছি নির্ব্বিবাদে,—কিন্তু আজ এ জায়গায় ওটা সুরু করলে বড় অবিচার করা হবে! পার্টিতে এসেছিস—দু দণ্ড আমোদ কর, হাসি গানগুলোর মধ্যে সময়টা স্ফূর্ত্তিতে কেটে যাক—তা—না—এখানেও মুখ গম্ভীর করে ওই সব বুলি আওড়াতে আরম্ভ করলে সব আমোদ আহ্লাদ মাটি হয়ে যাবে!

রেবা এ সমস্ত ক্ষণস্থায়ী চাপল্য ও অসার আমোদের বিরুদ্ধে আরও কথা বলিতে উদ্যত হইতেই বেলা বাধা দিয়া বলিল, কি সব বাজে কথা নিয়ে তোরা বকে মরতে লাগলি? ও সব কথা ছেড়ে দে! বীণা লীলা—এদের কারুকে দেখতে পাচ্ছি না—এরা এখনো আসে নি না কি? বীণা না থাকলে পার্টিটা জমেই না মোটে—

অরুণা সেনের সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ছিল। বীণা আসিবার পর হইতে সে খ্যাতি প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। সেই জন্য অরুণা বীণার রূপের প্রশংসা শুনিলে ঈর্ষায় জ্বলিয়া মরিত। বেলার কথা শুনিয়া সে রাগিয়া বলিল, তোদের ঐ সব কথা শুনলে আমার হাড়ে জ্বালা ধরে; বীণা না থাকলে পার্টিই জমে না, কেন বীণা ছাড়া আর কি সমাজে কোন মেয়ে নেই? ওই করে করে তোরা তাকে এমনি বাড়িয়ে তুলেছিস—যে তার আর গর্ব্বে মাটিতে পা পড়ে না। আর এখানকার পুরুষের ও তেমি জুটেছে! তাদেরো আর কোথাও স্থান নেই—কেবল বীণা—আর বীণা—

নীলিমা বলিল, তা ভাই, যা বলেছিস—সত্যি! বীণা ও বেচারাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে—এখন নাকে দড়ি দিয়ে ওদের নিজের খেয়ালে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়, আর মজা দেখে। এই ত একটু আগে দেখে এলাম, কিরণ চৌধুরীর হাত ধরে বাগানে বেড়াচ্ছে! তাই কি সহজ ভদ্র ভাবে? সে হাব ভাব, সে কথা বলার ভঙ্গী, হাসি, যদি দেখতিস তোরা—আমাদের ত কেটে ফেলেও ও সব চং করতে পারবো না— ছিঃ! কি ঘেন্না!

নীলিমা ঘৃণা ও লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইতেই অরুণা বলিয়া উঠিল, তা কিরণের সঙ্গে আর ও-সব কিছু খাটবে না বীণার! সে তো আর সবাইয়ের মত আনোয়ার নয়? এবার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান অত সহজ কথা নয়!

তরুণীর দল যখন বীণার নির্লজ্জতা ও পুরুষদের অন্ধ স্তাবকতার আলোচনায় ব্যস্ত—প্রবীণা গৃহিণীদের মধ্যে তখন মিসেস সেন তাঁহার বন্ধুমহলে চুপি চুপি বলিতে-ছিলেন—

জজগিন্নীর দিকে একবার চোখটা ফেরাও দিদি—চক্ষু সার্থক হয়ে যাবে! বলি বয়সটা ত কিছু কম হয় নি—অত বড় বড় দুই মুন্সি মেয়ে সঙ্গে! তবু সাজ-সজ্জার ঘটাখানা দেখ! মাগো! আমাদের ত দেখলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়!

মিসেস তরফদার একবার হলের বাহিরে চক্ষু ফিরাইয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, ওমা! তাই ত! বুড়ো বয়সে এত সাজ! লোকে কথায় বলে—যে বয়সের যা—তাতেই ভাল দেখায়! এ বয়সে এত বাহার দিতে লজ্জা হয় না? বলি—ওঁর ঘরে যে হীরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি—এ কথা আর কে না জানে? তা আর লোককে এত দেখাবার কি দরকার বাবু?

মিসেস রায় বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া কাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া মিসেস পালিত বলিলেন, তা এ যে তোমার অন্যায় কথা অবলা! যার ঘরে হীরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি—যার প্রাণে সাধ-আহ্লাদ আছে, সে পরবে না কোন্ দুঃখে? আর যাই বল,—সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়,—এ সহরে রূপে বল, ধন ঐশ্বর্য্যে বল, আর শিক্ষা সভ্যতাতেই বল—ওদের পরিবারের মত আর কটা আছে, বল ত?

মিসেস তরফদার এ প্রতিবাদে একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, আরে রাখ রাখ—ওদের শিক্ষা-সভ্যতার ছায়াও যেন আর কোন পরিবারে না লাগে! আমি ওদের না জানি কি? আমার না কি চর্চ্চা করা স্বভাব নয়, তাই; না হলে যে সব কথা আমি ওদের বিষয়ে শুনি—সে শুনলে লোকে কাণে হাত দেবে! আমি কোন কথা বলি না তাই—

এবার আর কাহারও ধৈর্য্য রহিল না! সহরের একটা পদস্থ ও সম্মানিত পরিবারের সম্বন্ধে কি কুৎসা ও রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা জানিবার জন্য উপস্থিত মহিলা-বৃন্দ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

তখন মিসেস তরফদার গম্ভীর মুখে বলিলেন, এই জজ সাহেবের মেয়েদের কথা বলেছিলুম। তোমরা ত বীণার সম্বন্ধে সব সময় নিজের চোখে দেখছো,—পুরুষদের সঙ্গে ও কি নির্লজ্জ ভাবে মিশে চলিয়ে বেড়ায়! তার পর এই অরুণের সঙ্গে ওর কি কেলেঙ্কারিটাই ওরা মায়ে-ঝিয়ে করলে, তাও তো সবাই দেখলে—যত দিন তার সময় ভাল ছিল, তত দিন আদর-যত্ন সবই ছিল। যেদিন দুঃসময় এলো—ব্যস্! যাও বাবা! নিজের পথ দেখ! কিন্তু এ সবও তো পচে আছে। আবার ছোট মেয়েটি আজ দিন কতক ধরে যা কেচ্ছা সুরু করেছেন, সে যদি শোন,—ঐ যে কিরণ বসন্তপুরের জমীদার—ও ছোকরা ত বিয়ে করে নি—বাড়ীতে শুধু লোক জন আর নিজে থাকে। সেখানে রোজ রোজ ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে সকাল থেকে আর বেলা এগারটা পর্য্যন্ত লীলাকে আচ্ছা দেওয়া কেন বল ত? তার বাড়ীতে কি পাঁচটা মেয়েছেলে আছে—যে তোর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তুই আলাপ করতে যাস? সমাজের বুকের উপর বসে এই সব যথেচ্ছাচার চলছে! জজসাহেবের মেয়ে বলেই কি সব অনাচার সইতে হবে? কেন, আমাদের ঘরেও পাঁচটা মেয়ে রয়েছে, আমাদের কি উচিত—ঐ সব মেয়েদের দৃষ্টান্তে নিজেদের মেয়েদের দেখান, ওদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া? তোমরা নিজেরাই কথাটা বুঝে দেখ না?

কথাটা শুনিয়া উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রথমটা কিছুক্ষণ লজ্জা ও ঘৃণায় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তাহার পরই চারিদিক হইতে একটা চাপা সুরে মিসেস তরফদারের প্রতি নানা প্রশ্ন বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইল "ওমা! সত্যি না কি?" 'কি ঘেন্না! গলায় দড়ি!' 'তখনি জানি—ও যা না পাহাড়ে মেয়ে—ও একটা না একটা কিছু অঘটন ঘটাবেই!' 'বলি—মা বাপে কি চোখে ঠুলি দিয়ে দিন রাত বসে আছে! ওই সব থুবড়ো মেয়েরা কোথায় কি ধিঙ্গীপিরি করে বেড়াচ্ছে, তা কি একবার চোখ তুলে দেখে না?'

"হুঁ! ওরা আবার দেখবে!" মিসেস তরফদার বিজয়-গর্ব্বে একবার মিসেস পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ওদের মতে এতে দেখাদেখি কি আছে আবার? ওর মা তো বীণার মত মেয়ের রূপে গুণে একেবারে গরবে আত্মহারা! ওরা জানে এ তো মেয়েদের বাহাদুরি! দেখি—তাবি—তুমি—আমি—যাদের অত শিক্ষা-দীক্ষা নেই,—অত সভ্যতার জ্ঞান নেই—তারাই—

'সে যা হোক্—এ সব কথা যদি সত্যি হয়, তা চলে এর একটা প্রতিকার করা উচিত!' মিসেস সেন তাঁহার বিপুল দেহভার কষ্টে তুলিয়া চেয়ারের উপর উত্তেজিত ভাবে সোজা হইয়া বসিলেন—'জজ সাহেবের মেয়ে বলেই যে

সমাজে যা খুশি, তাই করবে, এ-আধিপত্য আমরা কখনো সহ্য করবো না—তা দিদি! তুমি কথাটা জানলে কি করে?" ...

'জানবার ভাবনা কি?' মিসেস তরফদার সদর্পে বলিলেন 'যে নিজের চোখে প্রতিদিন দেখছে, শুনছে, তারই কাছ থেকে আমার শোনা! দরকার হয়, সকলের মুখের উপর তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস দেবো। আমার কিছু এ বানিয়ে বলাও নয়, আর গল্প শুনে বলাও নয়। কিরণের সর্দ্দার বেহারা—আমার বেহারার ভাই হয়—তারি কাছ থেকে এ কথা আমি শুনেছি! কই! নিরুদি যে আর কোন কথা বোলছো না?'

মিসেস পালিত একটা কথা বলিয়া ফেলিয়া এতক্ষণ অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত ভাবে মিসেস তরফদারের দর্পিত দৃষ্টির সম্মুখে অপরাধীর মত বসিয়া ছিলেন। এ ভাবে সম্বোধিত হইয়া তিনি উত্তর দিবার জন্য মুখ তুলিতেই, মিসেস রায় ধীরে ধীরে রাজরাণীর মত পদোচিত গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সহিত হলের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে সেই মহিলা-সভায় সমস্ত উত্তেজনা, বিরক্তি, চর্চ্চা—সবই আশ্চর্য্যরূপে অন্তর্হিত হইয়া গেল! পরক্ষণেই দেখা গেল, মিসেস সেন হাসিমুখে মিসেস রায়কে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, এই যে, কমলাদি! এসো! এতক্ষণ তাই আমি এঁদের বলছিলুম—বলি, সবাইকে দেখছি, কমলাদিকে দেখছি না কেন? তা এত দেরি হলো যে?

মিসেস তরফদার নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিলেন, যাই বলুন—আপনি না থাকলে আমাদের সভাটা যেন কেমন খালি খালি বোধ হয়, যেন কিছুতে জমাট বাঁধে না! বীণা, লীলা এরা সব কোথায়? এসেছে ত?

নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পালা সাঙ্গ করিয়া মিসেস রায় ঈষৎ হাসিয়া মিসেস সেনের কথার উত্তরে বলিলেন, এসেছি আমি অনেকক্ষণ! মিসেস দত্তর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলতে দেরি হয়ে গেল। বীণা, লীলা সবাই এসেছে,—তারা বোধ হয়, বাগানের দিকে বেড়াতে গেছে! মিসেস দত্ত আজ তাঁর ভাইপোর সঙ্গে আলাপ করে দিলেন কি না, দিব্যি ছেলেটি! ওরা বাংলার মস্ত জমীদার! রাজা উপাধি। তা ছেলেটিকে দেখলেই বোঝা যায়—বনেদী ঘরের ছেলে বটে! যেমন চেহারা, তেমনি ভদ্র। চমৎকার কথাবার্ত্তা। তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

'কই না! মিসেস দত্ত ত হলের মধ্যে একবারও আসেন নি এখনো!' মিসেস তরফদার বলিলেন, তাঁর ভাই পো এখানে বেড়াতে এসেছেন বুঝি? তা কোথায় গেলেন তাঁরা?

বারান্দার শেষ প্রান্তে লীলা অবসন্নের মত নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। হলের বাজনা তখন থামিয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে অনেকে তখন বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। বীণা তাহার পাশে দাঁড়াইয়া বিরক্তিভরে বলিতেছিল—'আমার আজকার প্লানটা মাটি করে সব আমোদটাই নষ্ট করলে কিরণ! কথা ছিল খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বাগানে আমায় নিয়ে বেড়াবে,—তা' না, এখন নিজেরই দেখা নেই। শেষকালে নেহাত ঐ চৌধুরীটার সঙ্গেই যেতে হবে দেখ্‌ছি!" (ক্রমশঃ)

হিমাচলের পাদমূলে

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা এম্-এস্‌সি

গত বৎসর চৈত্র মাসে সহসা এক দিন মনে হ'ল, বাড়ীর আবহাওয়াটা পড়াশুনার পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। অতএব গ্রীষ্মের মাস দুই কোনও নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব স্বাস্থ্যকর জায়গায় কাটাতে হবে। কিন্তু কোথায়? চিন্তা অনেক করলুম; কিন্তু কিছুই স্থির করে উঠ্‌তে পারলুম না। অবশেষে আমার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরণাপন্ন হলুম। তিনি সব শুনে বিজ্ঞ ভাবে আমার জন্য ব্যবস্থা করলেন,—কালিম্পং। অধিকন্তু তাঁরই এক বন্ধুর সেখানকার স্বাস্থ্য-নিবাসে আমাদের বাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহখানাকে আমাদের অভ্যর্থনার উপযোগী করে রাখবার জন্য নেপালী মালী মকরধ্বজের উপর

হুকুমনামা প্রেরিত হল। তার পর সেখানে অবস্থান কালে আমাদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখবার জন্য তাঁর এক ছাত্র শ্রীমান কৃষ্ণ বাহাদুরকে ও সেখানকার ডেপুটী ও গবর্ণমেণ্ট খাসমহল ষ্টেটের ম্যানেজার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মতিচাঁদ প্রধানকে চিঠি লিখলেন। অচিরেই এক দিন অপরাহ্ণে আচার্য্য রায়ের অনুমতি ও চরণধূলি নিয়ে বিজ্ঞানকলেজের দুর্গন্ধদুষ্ট রসায়নাগার ছেড়ে ভ্রাতা বিপিন ও শ্রীমান নরেন্দ্র এবং প্রচুর মোট-পেটরা সঙ্গে করে শিয়ালদার শিলংমেলে উঠে বসলুম। রাত্রি বারটায় পার্ব্বতীপুরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করতে হল। সকালে জেগে বেশ শীত অনুভব করলুম। বিপিন বল্লে, দাদা, শিলিগুড়ীতে এসেছি। আবার গাড়ী বদল করে ছোট গাড়ীতে উঠ্‌লুম। গাড়ীর চেহারা দেখে হাসি পেল—যেমন তার চেহারা, তেমনি তার চলন। ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনি এখানে পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী করেন। ভদ্রলোক পরের ষ্টেশনে আমাদের গরম চা পান করিয়ে বড়ই আপ্যায়িত করলেন। পথের দুধারে শালবন ও উত্তরে বহুদূরে অনন্ত-বিস্তৃত কাল পাহাড় দেখতে দেখতে আনন্দে চলেছি। আমরা ছিলুম পথে নারী বিবর্জ্জিতা। কিছুক্ষণ চলার পর যে দৃশ্য দেখলুম, তা'তে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল—বামে উচ্চ পাহাড়ের গোড়া বেঁসে গাড়ী চলেছে; আর দক্ষিণে রেল লাইনের সীমানা আক্রমণ করে' করে' চলেছে পাতালে প্রবাহিতা খরধারা তিস্তার সরলোন্নত প্রস্তরময় তীর। নদীর অপর পারেও অনন্ত-বিস্তৃত শৈলমালা। ক্ষণে ক্ষণে তিস্তাগর্ভে আসন্ন পতনের ভয়ে দেহ রোমাঞ্চিত হতে লাগল। যাক্, ভয়ে ভয়ে ত রিয়াং ষ্টেশনে আসা গেল। মংপো (Mongpo) যেতে হলে এখানে নামতে হয়। মংপোতে গবর্ণমেণ্টের কুইনিন ফ্যাক্টরী আছে। বেলা প্রায় এগারটার সময় আমরা কালিম্পং পাহাড়ের পাদমূলে তিস্তা ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি, পূর্ব্বনির্দ্দেশমত শ্রীমান মকরধ্বজ আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। বলতে ভুলে গেছি—রিয়াং ষ্টেশনে সহযাত্রী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—ইনি দার্জ্জিলিংএর

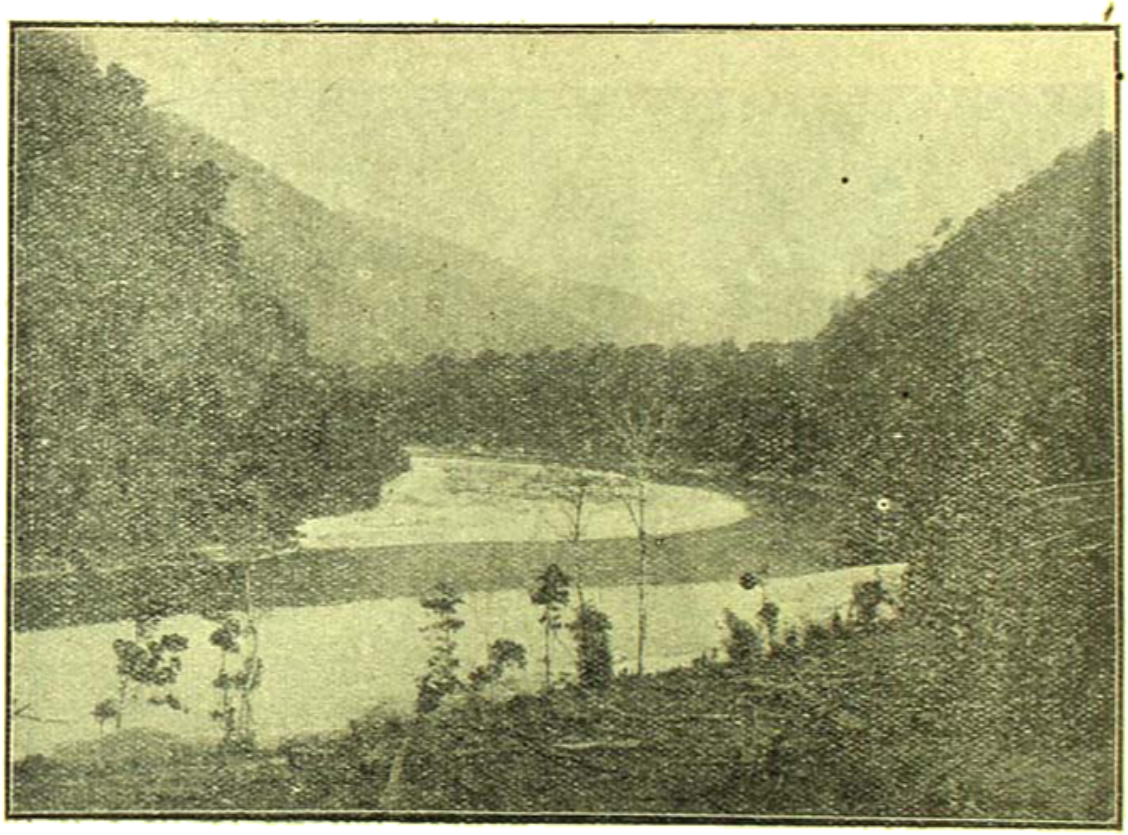

তিস্তা নদী (ত্রিস্রোতা)

ছেপুটী। সম্প্রতি উইলওয়ালা সাহেবের সঙ্গে সরকারী কাজে কালিম্পং চলেছেন। তিস্তা ষ্টেশনে পাহাড়ী কুলীদের সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক করে মোট-পেটরাগুলি তাদের জিম্মায় ছেড়ে দিব কি না ভাবছি, এমন সময় যতীনবাবু বল্লেন, কোন ভয় নেই. এরা খুব বিশ্বাসী লোক, সমস্ত মাল ঠিক যায়গায় পৌঁছে দেবে। বাস্তবিক পরে বুঝেছি—এদের মত সরলপ্রাণ, সরল, বিশ্বস্ত লোক বিরল। আমাদের মালবাহকও ছিল ঠিক এই প্রকৃতির।

তিস্তা ষ্টেশনের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ (sea level) হতে ২০০ ফিট। এখান থেকে সহরের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় সাড়ে এগার মাইল; আর উচ্চতা হচ্ছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফিট। পাঁচুবাবু পূর্ব্বাহ্নেই বলে দিয়েছিলেন, এটুকু রাস্তা ঘোড়ায় চড়ে উঠ্‌তে হবে। দেখলুম, ষ্টেশনে বিশ পঁচিশটী ঘোড়া যাত্রীর জন্য কয়েকটী গরুর গাড়ী, রিক্সা ও ডাণ্ডীও যাত্রীর আশায় অপেক্ষা করছে। ঘোড়াগুলিকে ঘোড়া ও গাধার মাঝামাঝি জীব বল্লেই চলে। উহাদের ভাড়া ১৷৷০ থেকে ৩৲ টাকা, রিক্সা ৯৲—২২৲ টাকা, গরুরগাড়ী ৬৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা ও কুলী ৷৵০—১৲ টাকা। ভাড়ার হ্রাস-বৃদ্ধি যাত্রীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। অনেক কসাকসির পর জনপ্রতি এক টাকা বারআনা স্বীকার করে আমরা ঘোড়ায় চাপলুম। সহিস লাগাম ধরে খানিক টেনে নিয়ে গিয়ে চাবুক ক'সে ছেড়ে দিলে—কদমে চলেছি—অহো কি অভিনব অনুভূতি! ঘোড়া পাছে বেইমানী করে নদীতে ফেলে দেয়, এই ভয়ে প্রাণপণে লাগাম টেনে রাগে দুঃখে আর্ত্তনাদ করে হতভাগা সইসকে ডাকলুম। সে এসে লাগাম ধরলে পর একটু অভয় পেলুম। যতীন বাবু অবশ্য বরাবরই সাহস দিয়েছেন। এইরূপে দুমাইল পথ অতিক্রম করে

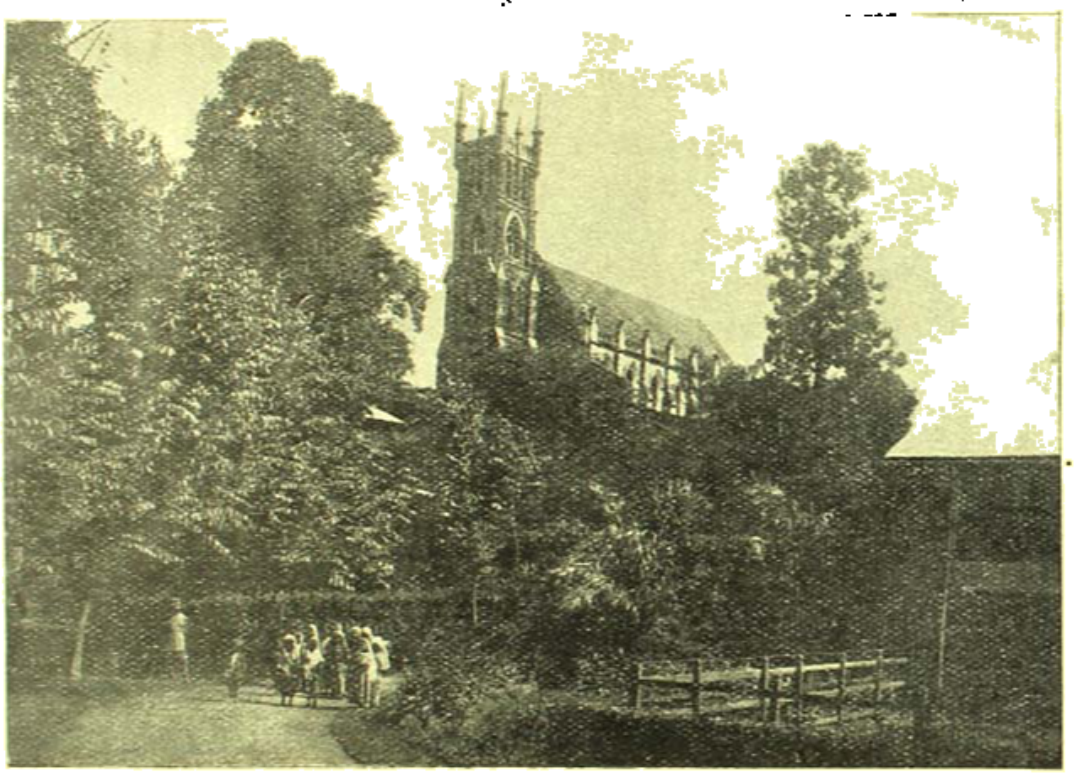

ম্যাকফারলেন মেমোরিয়েল গির্জ্জা—কালিম্পং

আমরা তিস্তাবাজারে এসে হাজির হলুম ও পুল পার হয়ে পূর্ব্বমুখী পথে চল্লুম। এই তিস্তাবাজার থেকে বামদিকে যে রাস্তা চলে গেছে, তাহা সিকিমের রাজধানী গেণ্টকে (Ghantak) যাবার পথ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই পুল থেকেই পাহাড় চড়াই আরম্ভ হল। ক্রমশঃই বেশ শীতানুভব করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে পাহাড়ীদের চা, বিস্কুট, পান, সিগারেট প্রভৃতির দোকান ও পাহাড়ের গায়ে অনেক বাড়ীঘর ও চাষের

জমী দেখলাম। দোকানগুলিকে আড়গড়া বলে। এই সব দোকানে গাড়োয়ান, কুলি, সহিস এরা চা-পান ও বিশ্রাম করে থাকে। যতীন বাবু বল্লেন, পায়ে চলার পথে কালিম্পং পুল থেকে মোটে ৫ মাইল। বেলা প্রায় ৩টার সময় একটা মস্ত পাহাড়ের আড়াল অতিক্রম করে সহসা যে দৃশ্য আমরা দেখলাম, ও প্রাণে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক হ'ল, তাঁহা বর্ণনাতীত। মনে হল যেন অকস্মাৎ কাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে গগনভেদী পাষাণ-প্রাকার অপসারিত হয়ে গিয়ে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, বিচিত্র সৌন্দর্য্যভরা

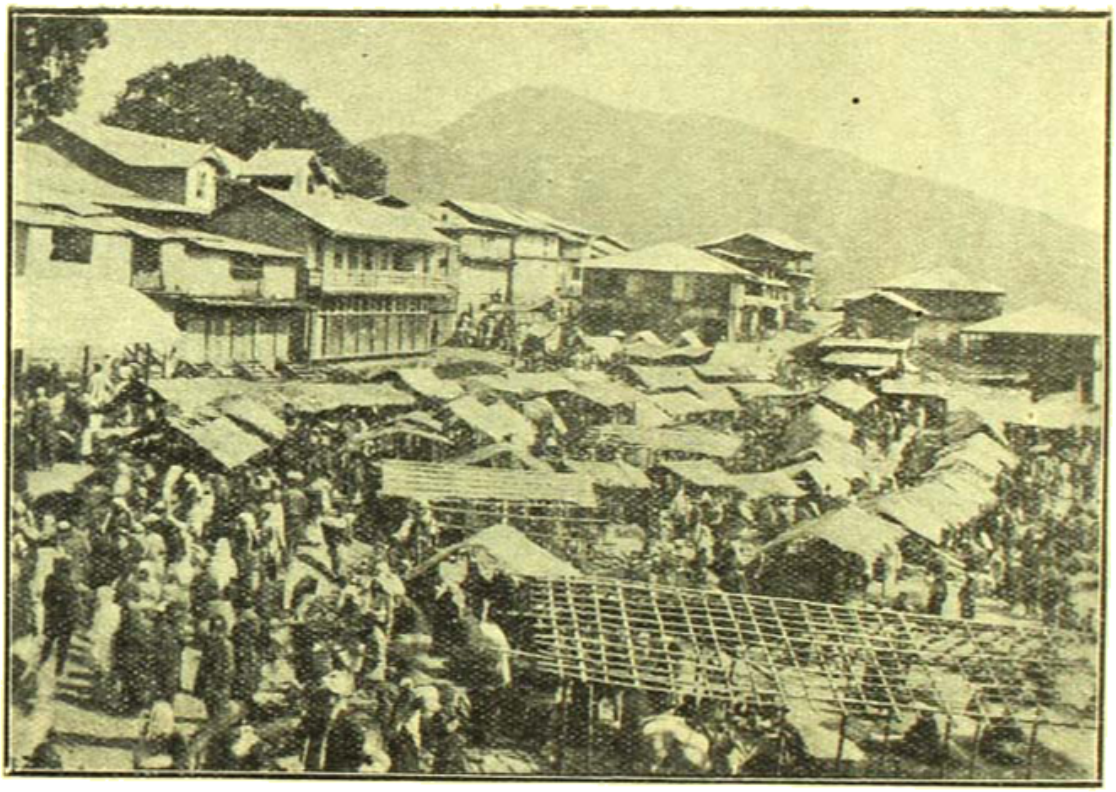

কালিম্পং—বাজার

এক স্বপ্নপুরী ভেসে উঠেছে। বিস্ময়-মুগ্ধ নয়নে ধ্যান-চৈতন্য হয়ে সেই অলৌকিক শোভা উপভোগ করতে লাগ্‌লাম। সে দিনের সে আনন্দের কথা জীবনে ভোলবার নয়। বোধ হয় সদ্যুদ্র-মন্থনোত্থিতা চিরযৌবনা অপূর্ব্ব-শোভনা উর্ব্বশীকে দেখে স্বর্গের দেবতা ও মর্ত্ত্যের দানবেরা আমার মত এম্‌নি বিস্মিত, এম্‌নি মুগ্ধই হয়েছিল।

বিকালে ৪টা আন্দাজ আমরা নির্দ্দিষ্ট ভবনে এসে লাগির হলাম। মকরধ্বজ বরাবর আমাদের সঙ্গেই ছিল। ৫টার সময় কুলীরা এল। তাদের বিদায় করে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে প্রায় ৭টা হয়ে গেল। এমন সময়ে যতি-চাঁদবাবু ও তাঁর ভাই এসে উপস্থিত। প্রায় এক ঘণ্টাকাল বসে আমাদের সব খবর-বার্ত্তা নিয়ে ও সময়োচিত উপদেশ দিয়ে তাঁরা বিদায় হলেন। আমরাও ডাল ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লুম। আমাদের পৌঁছিবার দ্বিতীয় দিনে একটা মহার ঘটনা ঘটে। রাত্রি তখন ৯টা। আমরা খানিক আগে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছি। বিপিন এরই মধ্যে নাক ডাকাতে সুরু করেছে, (কারণ ভ্রাতাটী ছিল আমার এ বিষয়ে Modern অর্থাৎ আধুনিক কুম্ভকর্ণ বিশেষ) এমন সময় খটাখট শব্দে স্বল্পালোকে চেয়ে দেখি, দক্ষিণ দিক্‌কার জানালার ভাঙ্গা কাচের ভিতর দিয়ে একখানা প্রকাণ্ড হস্ত ভিতরে ঢুকে ছিট্‌কিনি খোলবার চেষ্টা করছে। আমি ত একেবারে হতভম্ব। তবুও সাহস করে বালিসের তলা থেকে বড় ছুরীখানা হাতে করে আস্তে আস্তে উঠে বসলুম। ওদিকে চেয়ে দেখি, মহেন্দ্রও একখানা প্রকাণ্ড

লোহার দাবল নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। আমি যেই এগিয়ে গিয়ে ঘা দিতে যাব, অমনি হাতখানা অসাড় হয়ে গেল। তার পর অনেকক্ষণ ধরে রুদ্ধশ্বাসে দুজনে জানালার দুধারে সশস্ত্র, ওৎপেতে বসে রইলুম—কিন্তু হায়! সে আর এল না—শুধু নিশি জাগাই আমাদের সার হল। যখন একান্তই এল না, তখন খুব হৈ চৈ করে বিপিনকে ও পাশের ঘরে মতিবাবুকে ডেকে জাগালুম। সব শুনে এরা একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেল। আমরা দুজনে

দস্যুরা সর্ব্বদাই সীমান্তের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন ও তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করত। অবশেষে এই অত্যাচার নিবৃত্তির জন্য অনুরোধ করে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ভুটান দরবারে পুনঃপুনঃ আবেদন ও ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন টার্ণারের ও ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন পেম্বার্টনের অধীনে সৈন্যদলও প্রেরণ করা হয়। ভুটানরাজ মুখে সুব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্য্যে তাহা পালন করেন নাই। এই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের শাস্তি স্বরূপ

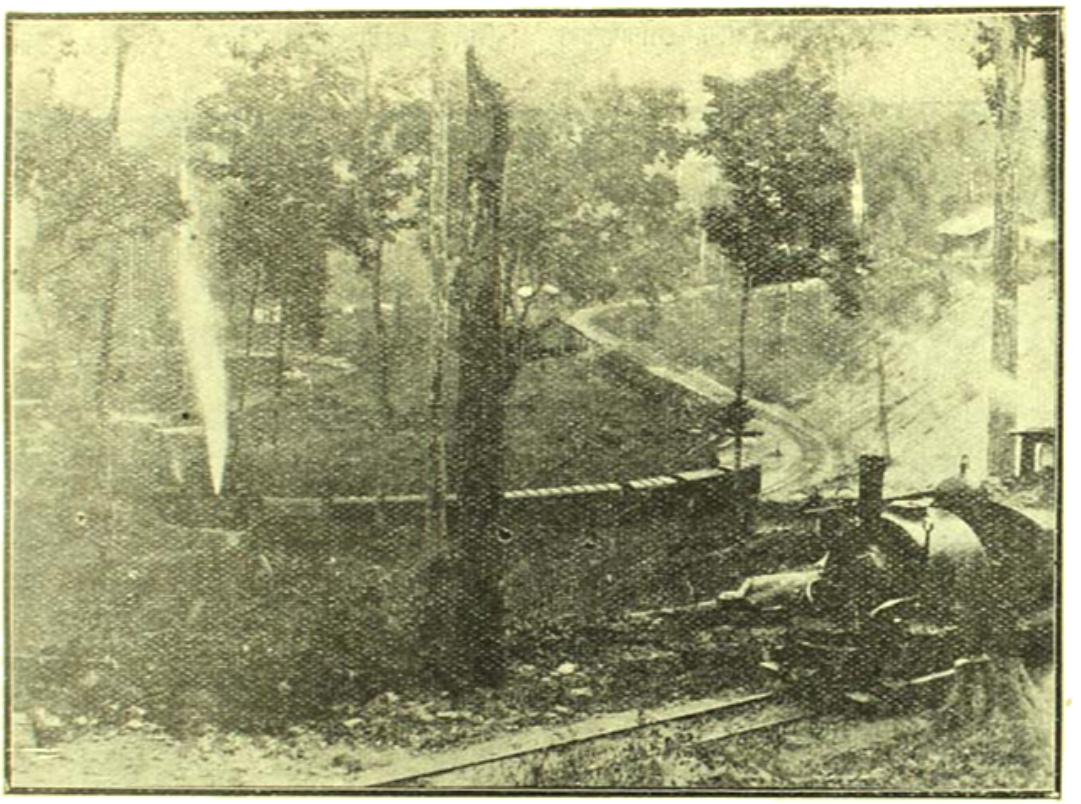

রিয়াং ষ্টেশন

কিন্তু খুব খানিক প্রাণভরে হেসে নিলুম। তবে মনে মনে ভয় একটু পেয়েছিলাম বৈ কি! নতুবা পরদিন সকালে উঠেই সর্ব্বপ্রথমেই কেন জানালাটা মেরামত করে ফেলুম!

(২)

কালিম্পং সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্ব্বে ইহার পূর্ব্ব-ইতিহাস একটু বলা আবশ্যক। সে আজ প্রায় সেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন কালিম্পং ভুটান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সেই সময় ভুটানের কাছাকাছি বাঙ্গালার সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। ভুটানী

বৃটিশ সরকার ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভুটানরাজের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদান স্থগিত করেন ও অবশেষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অনারেবল এস্‌লী ইডেনের (Hon. Ashley Eden) কর্ত্তৃত্বাধীনে সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ভুটানের রাজধানী পুণাখাতে (Poonaka) এক অভিযান প্রেরণ করেন, দৌত্য-দলের পথে বহু বাধা-বিপত্তি ঘটে; এমন কি এক সময় দলপতির জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়। কিন্তু কালিম্পংএর বর্ত্তমান রাজা উগ্যেন্ দর্জ্জির (Ugyen Dorji) পিতা টেন্‌দুক (Ten duk) তাঁহাকে বাঁচান। রাজধানীতে পৌঁছিলেও তাঁহাকে নানারূপে অপমানিত করা হয় এবং

প্রাণের ভয় দেখিয়ে জোর করে তাহাদের ইচ্ছাবিরুদ্ধে রচিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধা করা হয়। অভিযান প্রত্যাবর্ত্তন করলে পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উক্ত সন্ধিপত্র অস্বীকার করেন ও এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ফলে সন্ধি সংশোধিত

লাল কুঠি—প্রাতঃকৃত্য

হয়; কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই তাহারা পূর্ব্ব-ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি করে। অগত্যা ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট বিরাট এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে ভূটান যুদ্ধ তাহাদিগকে পরাজিত করেন; ও শাস্তি-স্বরূপ ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ভূটান রাজ্যের সমস্ত ডালিং পাহাড় এবং বাঙ্গালা ও আসামের ডোয়ারস্ (Duars) নামক বিস্তৃত ভূখণ্ড বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অন্তর্ভুক্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বৈনাগুড়ি, বক্সা ও ডালিংকোট নামক তিনটী মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। পরে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ডার্জ্জিলিং জেলার সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু ১৯১৭ সালে ইহা স্বতন্ত্র মহকুমায় পরিণত ও কালিম্পং আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে। অধুনা গবর্ণমেণ্ট ভূটান-রাজকে ভূমির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বার্ষিক এক লক্ষ ও আবগারী আয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আর এক লক্ষ টাকা দেন। কারণ বৃটিশ সীমান্তের সন্নিকটে ভূটান রাজ্যে যে সকল আবগারী দোকান ছিল, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভূটানাধিপতি সে সবের উচ্ছেদ করেছেন।

(৩)

চিরতুষার-মণ্ডিত হিমাচলের ক্রোড়দেশ থেকে যে বরধারা স্রোতস্বিনী কালিম্পং সহরের পশ্চিম দিক্ দিয়ে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে, তাহার নাম তিস্তা। উহার পশ্চিমে উপনদী রঙ্গীত (Rangit) ও তাহার উপত্যকা। তিস্তাপুলের ২৫ মাইল উত্তরে বেণী নামক স্থানে ইহা তিস্তার সহিত মিলিত হয়েছে। সূর্য্যাস্তে রঙ্গীতের দৃশ্য বড়ই মনোরম। উহার উপরে স্বাধীন সিকিম ও দক্ষিণে বৃটিশ-অধিকৃত সিকিম রাজ্য। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে সিকিমরাজ স্বাস্থ্যনিবাসের জন্য উহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন। দক্ষিণে দূরে বনানী-পরিবৃত সেঞ্চাল (Senchal) পাহাড় ও কালিম্পং পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনেকগুলি চা-বাগান, সরকারী সিঙ্কোনা-বাগান ও কুইনিন প্রস্তুতের কারখানা আছে। পূর্ব্বের পাহাড় থেকে আর একটি

উপাসনার প্রাঙ্গণে

ক্ষীণ নির্ঝরিণী দক্ষিণে রিঙ্গাং ষ্টেশনের সন্নিকটে তিস্তা-ধারায় মিশে গেছে। উহার নাম রিলী (Rille)। কালিম্পং প্রকৃতি-রাজ্যের এক পরম রমণীয় লীলানিকেতন। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৪।৫ হাজার ফিট উঁচুতে নগ্ন সৌন্দর্য্যে-ভরা। চারিদিকে অনেক

ছোট বড় পাহাড়ে ঘেরা এই নির্জ্জন ছোট সহরটী স্বাস্থ্যান্বেষী এবং সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিদের পক্ষে বড়ই চিত্তাকর্ষক। এখানেও পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় চিরপরিচিত ধানের ক্ষেত দেখতে পাওয়া যায়। সম্মুখে, বামে, পশ্চাতে, চারিদিকে দেখা যায়, শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়। উত্তরে বহু দূরে, চিরতুষারাবৃত গিরিশ্রেণী। তাহার মাঝে চিরদিন চির-ধাত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে—কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্রভেদী ধবল-শৃঙ্গ। মনে হয় যেন

তিব্বতীদের তাঁবু

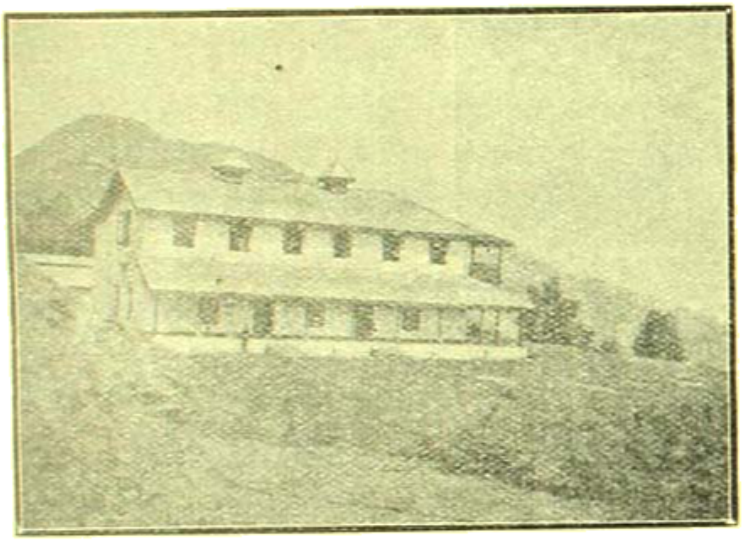

রবার্টসন হোটেল

শুভ্রকেশ পিতামহ তাঁর স্নেহাস্পদ কুদ্র পাণ্ডবে পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। প্রভাত ও সন্ধ্যার ক্ষণকালই দ্বিপ্রহরের শুভ্র সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে রক্তবর্ণ আভায় পরিণত হয়। এখানকার মেঘের খেলাও বড়ই মনোরম। কোন দিন সকালে উঠে দেখা যেত—বিস্তীর্ণ, তিস্তা, রিলীর উপত্যকা ছেয়ে পেঁজা তুলার মত কাঁকে কাঁকে স্তরকে স্তরকে শুভ্রমেঘগুলি গা ঢেলে পড়ে আছে—প্রভাতে শিশু যেন মায়ের কোলে ঘুমুচ্ছে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মেঘগুলি মৃদু হাওয়ায় উর্দ্ধে ভেসে ভেসে চলেছে—ঘুম-ভাঙ্গা শিশু যেন কখনও মায়ের স্তনের উপর লুটিয়ে পড়ছে, আবার কখনও মুখে চুমু খাচ্ছে—অভিনব দৃশ্য !!!

আবার কোনও দিন দেখতে পেতুম—ভোর থেকেই পাহাড়গুলি ও সমস্ত আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে,—সমস্ত দিনেও আর ভোর কাটছে না। মনে হত, হয় ত পতিপ্রাণা সতীর বিচ্ছেদ-ব্যথায় প্রকৃতি মাঝে মাঝে এমন ম্লান হয়ে যায়; অথবা ওপারের তিব্বত, চীনের mysticismএর পূর্ব্বাভাষ এই ম্লানতা। কত দিন জ্যোৎস্না-রাত নীলাম্বর-তলে বহু দূরে। ঐ অস্পষ্ট তোরাঙ্গের দিকে

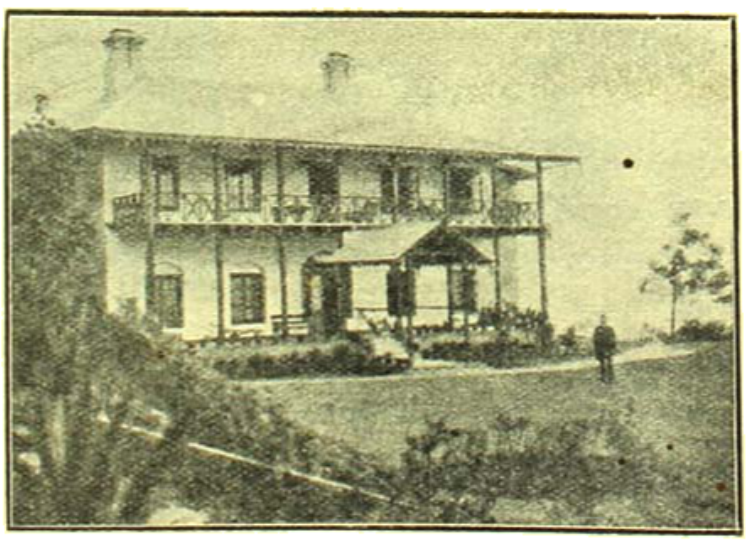

এ্যালান প্রাসাদ

বশ করে দাঁড়িয়ে কাণ পেতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে—ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে—পশ্চিমাকাশে চাঁদ ঢলে পড়েছে—চরাচর সুপ্তিমগ্ন,—আকাশে দুটি একটি ম্লান তারা, দূরে পাহাড়ের বুকে দুটি একটি ক্ষীণ দীপ—তবু আমার প্রতীক্ষার বিরাম নাই। কিন্তু কৈ, একটি দিনের তরেও ত নটরাজ শিবের রুদ্র নৃত্য, ডমরুর গুরুনাদনি, কিম্বা নন্দীর শিঙ্গারব শুনতে পাইনি। কিন্তু হাঁ, পেয়েছি শুধু গভীর তল হ'তে অগভীর ত্রিধারার সুগভীর কল-ধ্বনির ক্ষীণ প্রতিধ্বনিটুকু—আর মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, যেন পুষ্প-গন্ধে ভরা চাওয়ার সঙ্গে বহুদূরাগত কার দীর্ঘ-শ্বাসের মৃদু শব্দ (হয় তো আমার রাতের মোহে পেয়েছিল); কিন্তু যদি অলীক না হয়ে বাস্তব হয় তবে কার এ দীর্ঘশ্বাস! স্বপ্নময় স্বজন-বিরহ-কাতরা বালিকা উমার, না বিরহী যক্ষবালার?

কি বিপদ! পদে পদেই ভুলে যাচ্ছি যে আমি বিজ্ঞানসেবী।—

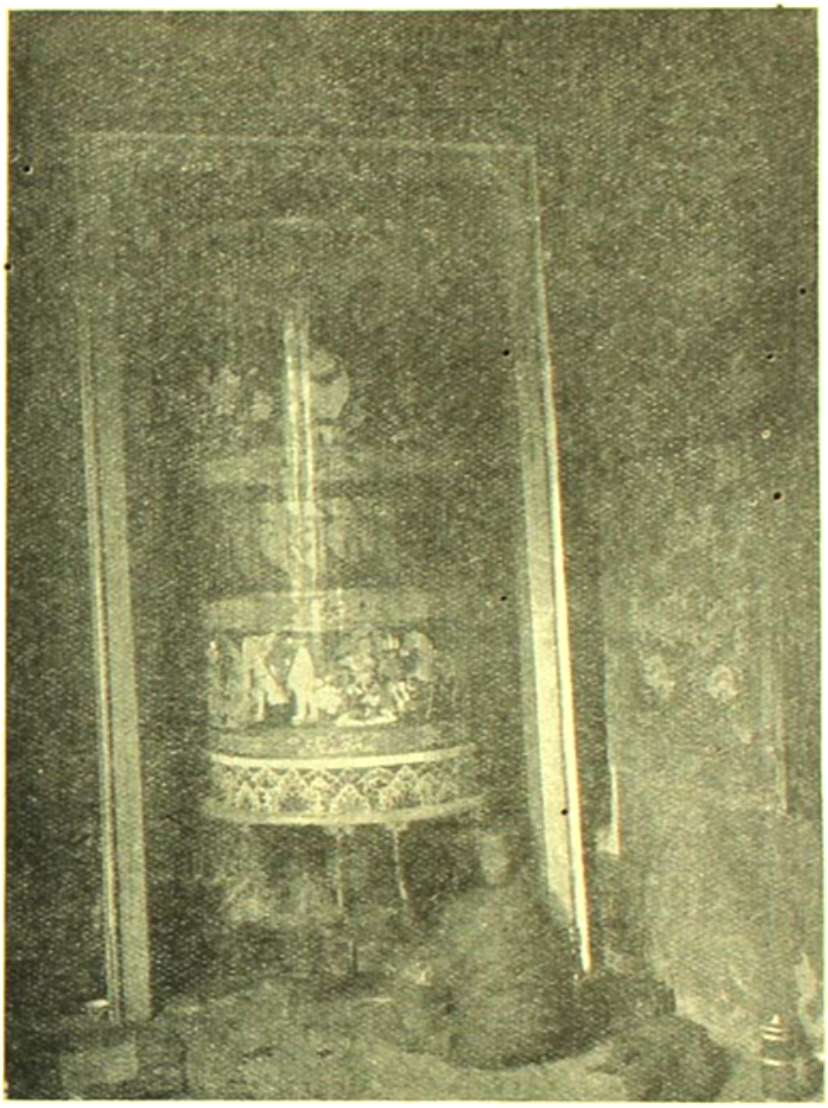

দাতের মঠে সুবৃহৎ প্রার্থনা চক্র

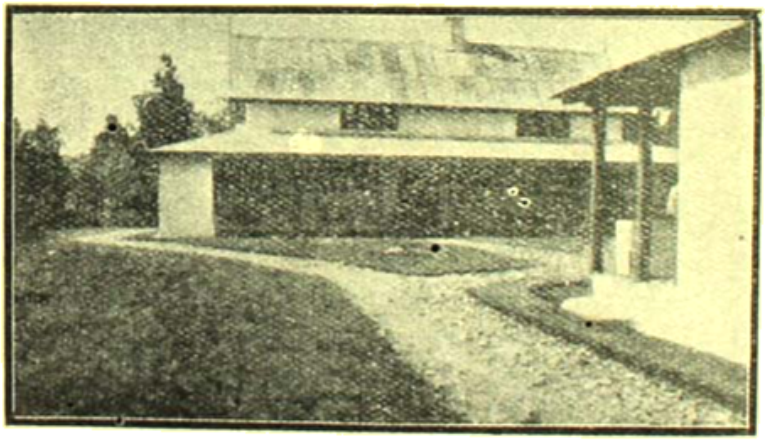

চার্টারের হাসপাতালের বহির্দৃশ্য

(৩)

কালিম্পং সহর বা বাজার সমতলভূমির উপর অবস্থিত। উত্তরে যে উচ্চ পাহাড়, তাহাতে ডাক্তার গ্রেহাম (Rev. Dr. Graham) প্রতিষ্ঠিত St. Andrew's Colonial Home বা অনাথ ফিরিঙ্গী বালক-বালিকা-দিগের আশ্রম ও শিক্ষায়তন। বাজারের দক্ষিণে রিং কিং পং (Rin-kid-pong) পাহাড় ও তাহার দক্ষিণে দুর্পিন্দারা (Durpindara) পাহাড়। প্রায় ৫ হাজার ফিট উচ্চ এই পাহাড় দু'টী লইয়া কালিম্পংএর

Development area। আদর্শ স্বাস্থ্যনিবাস গঠনেচ্ছায় গবর্ণমেণ্ট এই স্থান মনোনীত করে, উন্নতা হিসাবে প্রথম

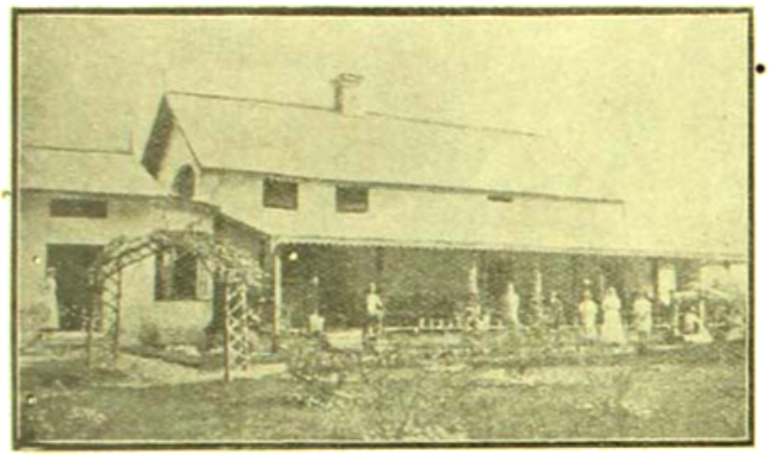

চার্টারেস হাসপাতাল—রোগীনিবাস

শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে আবার এক একটি বাড়ী করবার মত স্থান নির্দ্দিষ্ট রয়েছে। শ্রেণীভেদে জায়গার মূল্যের তারতম্য হয়; কিন্তু সেই মূল্য পূর্ব্বাহ্নেই নির্দ্দিষ্ট করা আছে। যাহার যে অংশ ইচ্ছা কিনে নিতে পারেন। তবে প্রত্যেকটি বাড়ীই কর্তৃপক্ষের সম্মতি আইন্ কানুন ও বিধিমতে করতে হবে। আমরা এই development areaতে থাকতাম।

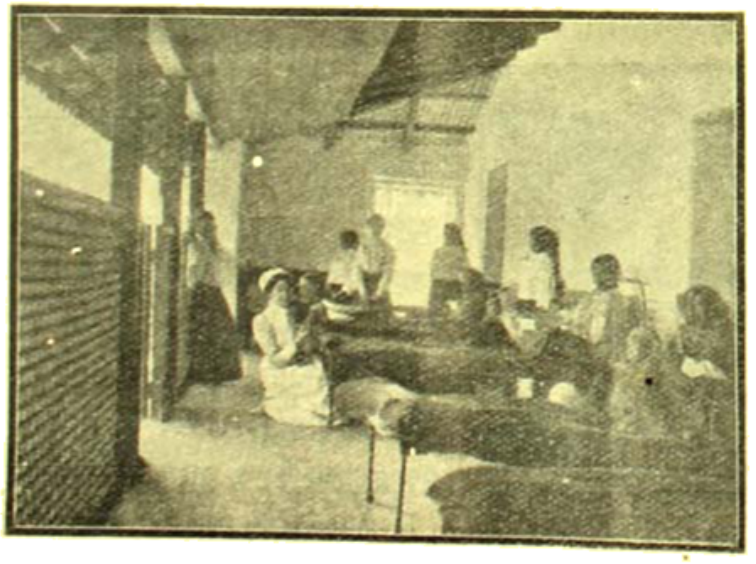

চার্টারেস হাসপাতালের অভ্যন্তর দৃশ্য

অনেক বাঙ্গালী এখানে জায়গা কিনে রেখেছেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও স্বনামধন্য চক্ষুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এখানে অতি সুরম্য ভবন নির্ম্মাণ করেছেন। এতদ্ব্যতীত এখানে সাহেবদের একটি হোটেল, সরকারী ডাক বাংলা, বন-বিভাগের কর্ত্তার ভবন ও অন্যান্য অনেক সুন্দর সুন্দর বাংলো আছে।

স্বাস্থ্যকর স্থান ছাড়া নানা কারণে কালিম্পং বিখ্যাত। ইহা দার্জ্জিলিং জেলার মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের ও সমগ্র তিব্বতের একমাত্র বহির্ব্বাণিজ্য কেন্দ্র। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত

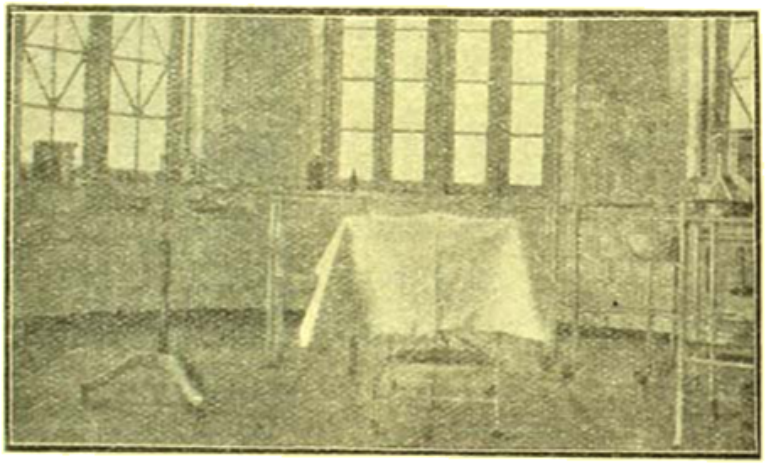

অস্ত্রচিকিৎসা-কক্ষ

বন-বিভাগের (Reserved Forests) ও খাস মহল রক্ষণাবেক্ষণের ও তহশীলের সদর। এই মহকুমাতে কয়েকটী চা বাগান ও একটি সিনকোনা বাগানও আছে। খাস মহলে নেপালী, ভুটিয়া, ও লেপচা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জমি চাষ-আবাদ করতে দেওয়া হয় না। বিদেশীরা শুধু নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতরে বসবাস করতে পারে। তিব্বতে যাবার একমাত্র রাস্তা কালিম্পংএর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। গৌরীশৃঙ্গ-অভিযানকারীদের

সকলকেই এই পথ দিয়েই যেতে হয়েছে। ভুটানরাজের বৃটিশ-রাজের পোলিটিকেল এজেন্টের সহকারীর কার্য্যও দেবজিম্পন্ (Dev Zimpon) বা প্রধান মন্ত্রী কুমার করেন।

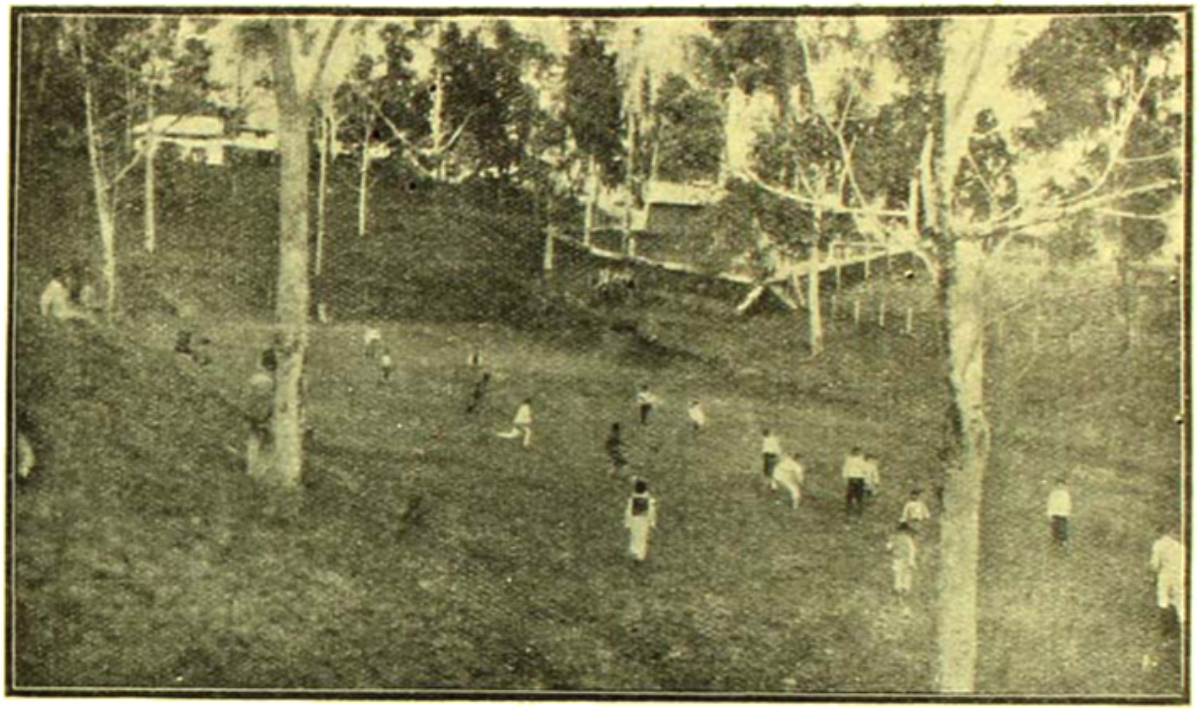

স্কুলের ছাত্রদের ফুটবল খেলা

সোনাম্ তপ্‌গেদর্জীও (Sonam Topgay Dargi) প্রায় সারা বৎসরই এখানে থাকেন। ইনি সিকিমে

পূর্ব্বেই বলেছি, কালিম্পং তিব্বতের বহির্ব্বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্র (Harbour of Tibet)। তিব্বতীরা

লাল কুঠি—বালিকা বিদ্যালয়

বর্ষাকাল ব্যতীত সারা বছর জেলাপ পাসের (Jelap Pass) ভিতর দিয়া খচ্চরে করে' তাহাদের নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার এখানে নিয়ে আসে। এক একটি খচ্চর প্রায় তিন মণ ভার বইতে পারে এবং আস্‌তে ৭ থেকে ৩০ দিন সময় নেয়।

বৎসরে প্রায় ৮০০০০ মণ তিব্বতী পশম এখান হতে কানপুর, বম্বে, ইংলণ্ড, ক্যানাডা প্রভৃতি স্থানে চালান হয়। মূল্য মণপ্রতি ৩৫৲ থেকে ৪৫৲ টাকা। ব্যবসাটী মাড়োয়ারীদের একচেটে। কার (Fur) বা লেজসমেত লোম-ওয়ালা শিয়ালের চাম্‌ড়ার ব্যবসাটী পেশোয়ারী মুসলমানদের একচেটে। মেম সাহেব ও তদ্রূপ্রায় মহিলাদের গলাবন্ধ প্রস্তুতের জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। দাম শতকরা ৫০৲—৪০৲ টাকা। হিমালয়ের Golden fox ও Silver foxএর চাম্‌ড়াই এখান হ'তে বৎসরে হাজার হাজার টাকার গন্ধ, ভেড়া, মহিষ, সম্বর (এক রকমের হরিণ) প্রভৃতির উৎকৃষ্ট চাম্‌ড়া, কস্তুরী বা মৃগনাভি, সুদৃশ্য গালিচা, কম্বল (চুক্‌টুক্), নখ্‌ (ইহাও একরকমের কম্বল) চামর, লেপ্‌চা চামর, গালা,

তিব্বতীদের চা-পান

গৌরীশৃঙ্গ যাত্রীদল

বেশী মূল্যবান্। অধিকাংশই ইংলণ্ডে চালান হয়। ব্যবসাটীর পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৬০০০০ টাকা। এতদ্ব্যতীত বড় এলাচ, রীঠা, প্রভৃতি নানাস্থানে চালান হয়। সমগ্র ভারতের বড় এলাচের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কালিম্পং ও

সিকিমে উৎপন্ন হয়। মূল্য ৩০—হ'তে ৪০৲ টাকা মণ। যীঠা এখানে বৎসরে প্রায় ৫ হাজার মণ পাওয়া যায়। যীচিতক অতি উৎকৃষ্ট যীঠার দাম ছটাকা মণ। এই ব্যবসাটীর মজা এখনও এখানকার লোকে টের পায়নি। বাঙ্গালীরা চেষ্টা করলে সহজেই এটী আয়ত্ত কর্ত্তে পারে। অন্য ব্যবসাগুলি মাড়োয়ারী ও পেশোয়ারীরা প্রায় একচেটে করে রেখেছে। শুনলাম, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় কে, এন্, মেডান এককালে এখানকার প্রধান পশম-ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসাটী একচেটিয়া করবার জন্য এখানে নানা মেলার অনুষ্ঠান করেন। সেই উপলক্ষে এখানে হাজার হাজার ভূটানী, নেপালী, সিকিমি, তিব্বতী প্রভৃতির সমাগম হয়। কিছুদিন হল গবর্ণমেণ্ট তিস্তা ষ্টেশন হ'তে কালিম্পং সহর পর্য্যন্ত রাস্তাটীকে মোটর চলাচলের উপযোগী চওড়া করতে আরম্ভ করেছেন এবং তিস্তার পুরাতন পুলটীর স্থানে একটি নূতন সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মাণের জল্পনা-কল্পনাও চল্‌ছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার গিলেণ্ডার ও আরবুথনট্ (Gillander and Arbuthnot Co) কোম্পানী রিঙ্গাং ষ্টেশন হ'তে কালিম্পং সহর পর্য্যন্ত মালপত্র

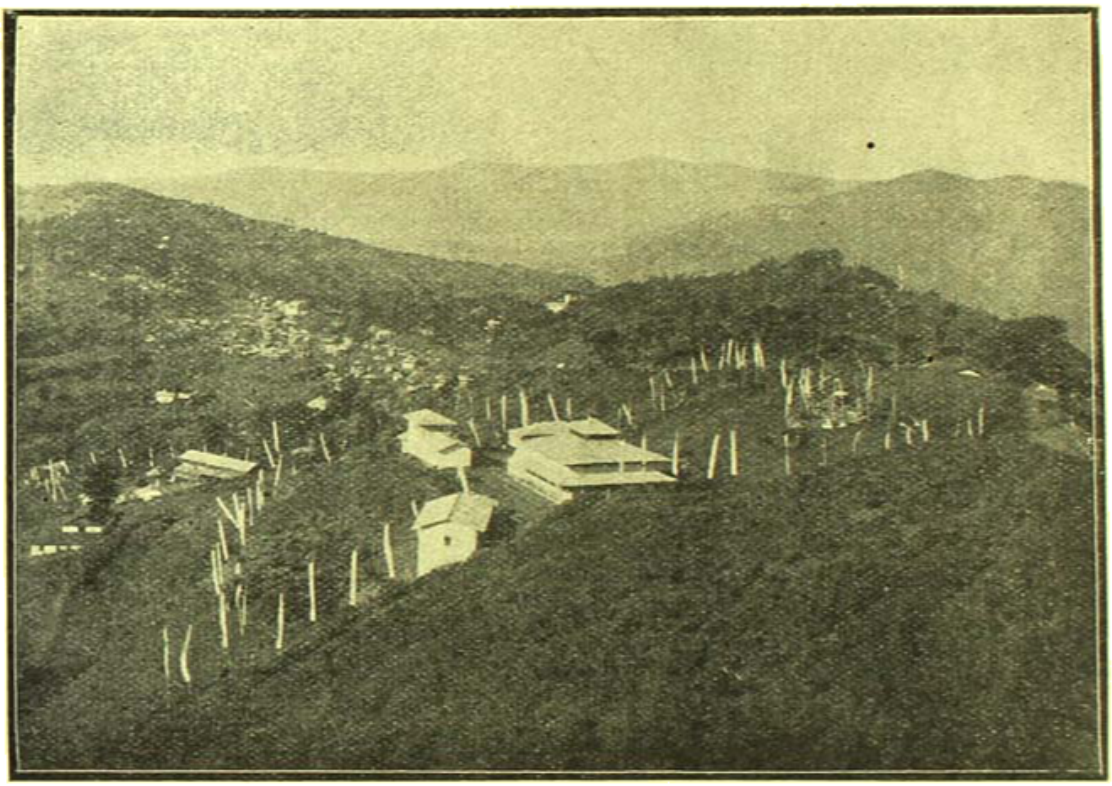

দূর হইতে কালিম্পং—সামনে বৌদ্ধ মঠ

তিনি তিব্বতী ব্যাপারীদের প্রায় ২০ লাখ টাকা দাদন দেন। তিব্বত গবর্ণমেণ্ট এ কথা জানতে পেরে রাজ্য থেকে পশম রপ্তানী বন্ধ করে দেন। তাইতে তিনি পথে বসেন। কারণ দাদনের টাকার একটি পয়সাও আর তিনি ফিরে পান্‌নি।

দার্জ্জিলিংএর বিখ্যাত কমলা লেবু ও নাশপাতি প্রায় সবই কালিম্পং থেকে চালান হয়। অতি উৎকৃষ্ট আনারস, আলুবখরা, পেপে, পিচ্‌ফলও এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর বহনোপযোগী রজ্জুনির্ম্মিত আকাশ পথ (Rope way) প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বাহ্নিক জরিপ আরম্ভ করেছেন। এ সমস্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত হলে কালিম্পংএর ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে।

কিছুদিন থেকে সিকিমরাজ কালিম্পং হতে পশম ব্যবসার কেন্দ্র রাজধানী গেণ্টকে স্থানান্তরিত করবার চেষ্টায় আছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও চাষারা ভয় কচ্ছে—তাহ'লে কালিম্পংএর সব ব্যবসা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। এখানে

বৎসরে হাজার হাজার পশমবাহী খচ্চরের শোভাগমন হয়। স্থানীয় উৎপন্ন শস্য ও বিচালী (grains and hay) তাহাদের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া উহাদের বাজার-দর বেশ চড়া। পশম ব্যবসায়ের স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের মূল্য একেবারে কমে যাবে—ফলে চাষাদের সর্ব্বনাশ হবে।

পূর্ব্বেই বলেছি কার্শিয়াংয়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশই মাড়োয়ারীদের হাতে। কিন্তু এরা যে এখানকার শুধু ক্রেতা তাহাই নহে—বিলাতী কাপড়, ও অন্যান্য বিদেশী দ্রব্য আমদানীর ভারও এদেরই হাতে। তবে

নেপালী। তিব্বতী, লেপ্‌চা, লিম্বু, তামাং, লিম্‌দার, গুরুং, শেরপা ইত্যাদি ভাষারও বেশ চলন আছে। চীনা এবং মঙ্গোলীয় ভাষাভাষীও আছে অনেক। বিদেশী ভাষা-ভাষীর মধ্যে মাড়োয়ারীর সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। ছোট বড় মিয়ে বোধ হয় প্রায় ৪০০ শত। বেহারী হিন্দুস্থানীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। মুদীখানা, খাবারের দোকান, পানের দোকান, ধোপা, নাপিত, ছুতোর, মিস্ত্রী ইত্যাদি সবই হিন্দুস্থানী। মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। দরজী মিস্ত্রী, ও দোকানদারের কাজই সাধারণতঃ তাদের পেশা।

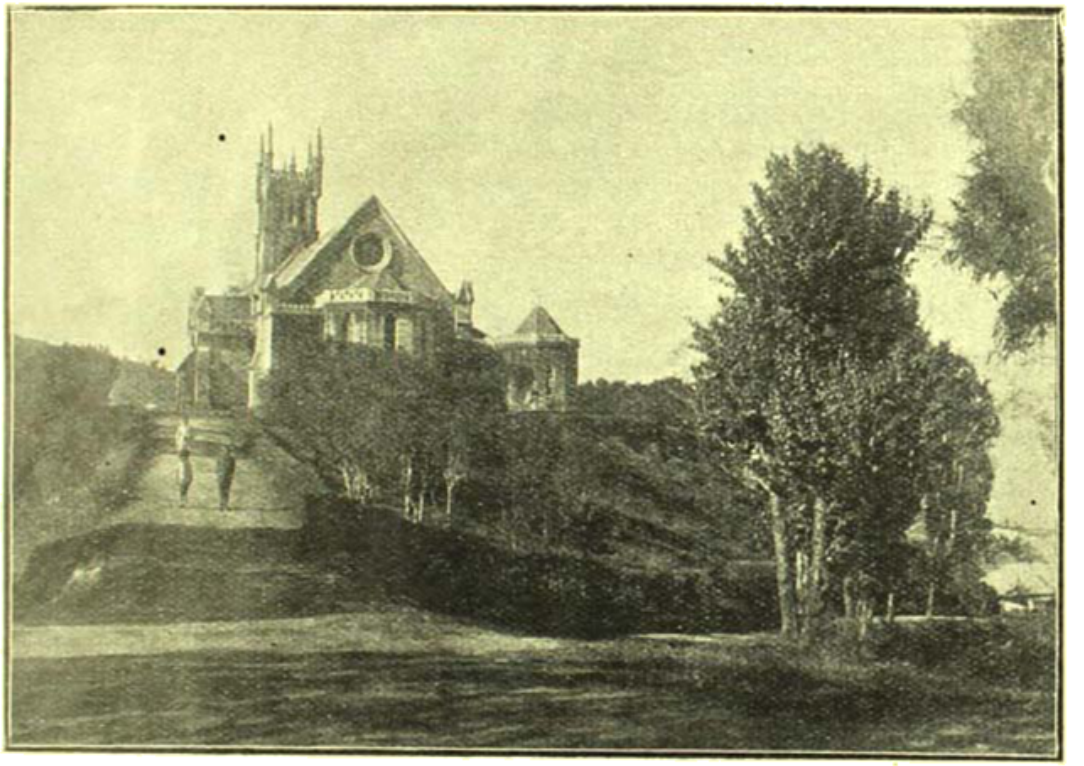

ম্যাকফারলেন মেমোরিয়েল গির্জা—কার্শিয়ং

ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে টাকা ধার দেওয়াই এদের প্রধান উদ্দেশ্য। একবার যে এদের কবলে পড়েছে, সহজে তার নিস্তার নাই। শতকরা ৭৫৲ টাকা হারে, চক্রবৃদ্ধি সুদ হল এখানকার সাধারণ দর। কিন্তু এখানে একটি কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক হওয়ার পর সুদের হার অনেকটা কমেছে।

(৫)

অনেকগুলি পাহাড়ী জাতি থাকার দরুণ এখানে অনেকগুলি ভাষার চলন হয়েছে। তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে—

এতদ্ব্যতীত কতিপয় ব্যবসায়ী পেশোয়ারী মুসলমানও আছে। বাঙ্গালীর সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী হবে না। তার মধ্যে ৪ জন ব্যবসাদার, দুজন উকিল, আর বাকী সবই চাকুরে। আমরা যখন ছিলুম, তখন সেখানকার বন-বিভাগের Deputy Conservator ছিলেন একজন বাঙ্গালী—মিষ্টার জে, এম্, বোস্। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র দাস এখানকার এসিষ্ট্যাণ্ট এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের অধিকাংশই থিয়োসোফিষ্ট (Theosophist)। স্থানীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত

লোকও এই সম্প্রদায়ভুক্ত। শুনলাম, বিখ্যাত থিয়োসোফিষ্ট শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অনুপম চরিত্র-প্রভাবই ইহার কারণ। বর্ম্মার সিংহাসনচ্যুত রাজা থিবোর (Thibow) একমাত্র জামাতা সপরিবারে এখানে থাকেন—অনেকটা বনবাসের মত। বৃটিশ সরকারের প্রদত্ত সামান্য মাসহারার উপর নির্ভর করে তিনি লোকালয় হতে কিছুদূরে নির্জ্জন স্থানে কালাতিপাত কচ্ছেন। সর্ব্বপ্রকার রাজ-নীতির সংস্রব ত্যাগ করে তিনি এখন ধর্ম্মচর্চ্চায় অবহিত আছেন। তিনিই এখানকার থিয়োসফিকেল সোসাইটীর সভাপতি। সম্পাদক হচ্ছেন শ্রীযুক্ত মতিচাঁদ প্রধান। আমাদের অবস্থান কালে স্যার চার্লস্ বেলের ভগ্নী মিস বেল (Miss Bell), শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাদ্রাজের থিয়োসফিকেল হেড্ কোয়ার্টার্স্ থেকে মিস্ ব্যারী (Miss Barrie), ও মিস্ এঙ্গাস্ (Miss Angus) প্রভৃতি সুবিখ্যাত থিয়োসফিষ্টগণের শোভাগমন হয়েছিল। মিস্ ব্যারী অতি উচুদরের বিদুষী মহিলা। অধ্যাপক ক্রিম্‌জার* শেষোক্ত মহিলাদ্বয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়েছিলেন। ইঁহারা হীরেন্ বাবুর বাড়ীতে থাকতেন। অনেক দিন ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। কখনও মনে হয়নি—বিদেশী মহিলার সঙ্গে বাক্যালাপ কচ্ছি। ঠিক যেন আপনার লোক বলে মনে হোত। ডাক্তার ক্রিম্‌জার মিস্ ব্যারীর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হতেন।

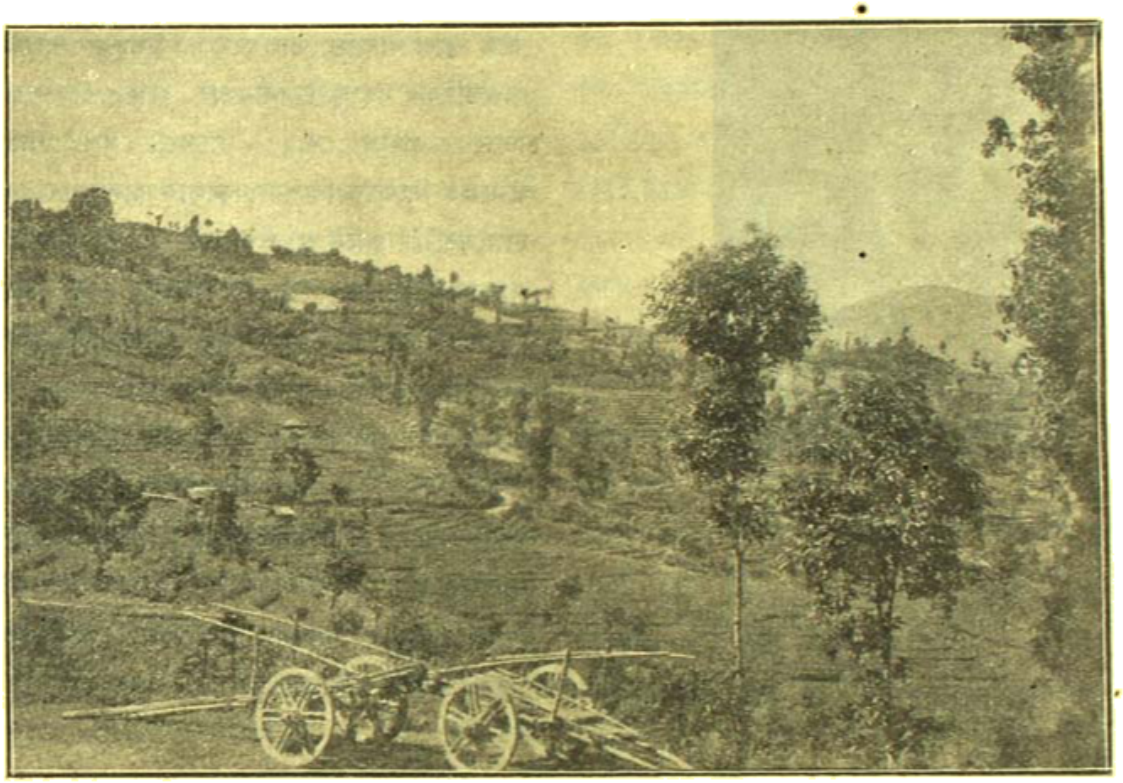

কালিম্পং—পার্ব্বত্য দৃশ্য

দার্জ্জিলিংএর চেয়ে ঠাণ্ডা কম বলে এ সহরটা বাঙ্গালীর পক্ষে খুবই ভাল এবং স্বাস্থ্যকর। এখানে বৃষ্টিপাতও

---

* বড়ই দুঃখের সহিত জানাচ্ছি—স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের সুপণ্ডিত, অমায়িক অধ্যাপক Dr. Scrimgeour আর ইহজগতে নাই। গত ৮ই আগষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পেটে অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়েছে। তিনি একাধারে আমার অধ্যাপক, উর্দ্ধতন সহকর্ম্মী ও হিতাকাঙ্ক্ষী, অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনিও গ্রীষ্মাবকাশে কালিম্পংএ বেড়াতে গিয়েছিলেন। ৪ বৎসর কলিকাতায় ও কালিম্পংয়ে আমি তাঁহার সান্নিধ্যলাভের প্রায় নিত্যসাথী ছিলাম। তখন তিনি অকপটে আমাকে তাঁর জীবনের সুখ দুঃখের কথা বলতেন এবং আমারও সকল প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা উৎসাহভরে শুনতেন। এই কাহিনী লিখতে বসে তাঁর কথা মনে হয়ে চোখ বার বার জলে ভরে আসছে। অশ্রুজলে তাঁর স্মৃতি-তর্পণ হবে কি?—লেখক।

কুলনায় কম হয়। তবে যাতায়াতের অসুবিধা হেতু ও ভাড়াটে বাড়ীর অপ্রাচুর্য্য হেতু বাঙ্গালী সমাগম বেশী হয় না। কালিম্পং স্বাস্থ্যকর স্থান হলেও এখানকার পাহাড়ীদের

শ্রীযোগেশচন্দ্র সাহা এম-এসসি

ভিতর যক্ষ্মা ও টাইফয়েডের বেশ প্রাদুর্ভাব। এর কারণ বোধ হয় অতিরিক্ত পরিশ্রম, খুব বেশী উঁচু নীচু জায়গায় উঠা নামা, উপযুক্ত আহারের অভাব ও অত্যধিক সিগারেট খাওয়া। আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখে সর্ব্বক্ষণ সিগারেট লেগেই আছে। চা-পানের নেশাও এদের অত্যধিক প্রবল। আধ ঘণ্টা ধরে জলে সিদ্ধ করে, দুধ চিনির পরিবর্ত্তে একটু নুন্ দিয়েই অধিকাংশ লোকের চা-পান চলে। ভাত, ভুট্টা, মাড়োয়া ও কমলা লেবুর রস থেকে "পচাই" (Prepared by fermentation) নামক এক প্রকার মদ এরা প্রস্তুত করে। মেয়েরা সর্ব্বদাই প্রজাপতির ন্যায় রং-বেরংএর পোষাকে পরিচ্ছদে সেজে গুজে থাকতে ভালবাসে। উপযুক্ত সংযমের অভাব এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীনতাই হচ্ছে এদেশের লোকের চরিত্রের প্রধান দোষ। পকেটে দশ টাকা থাকলে অনেকেই নিজেকে বিশেষ বড়লোক বলে মনে করে এবং কাপড়ের দোকানে ও সুরাদেবীর চরণে (বিলাতী মদের দোকানও এখানে কয়েকটী আছে) তাহা দিয়ে আসে। যখন আর চলে না, তখন সর্ব্বস্ব মাড়োয়ারীর কাছে বাঁধা দিয়ে ধার করতে আরম্ভ করে। এদের পারিবারিক বন্ধনটাও খুব শিথিল। কাজে কাজেই বিয়ের ধার এরা বেশী ধারে না। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনে আমাদের দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে; কিন্তু এ দেশে তার গন্ধমাত্রও নাই। বিলাতী প্রীতিটা এদেশের লোকেদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী স্বর্গীয় দলবাহাদুর গিরির জন্মস্থান কালিম্পং।*

* এই ভ্রমণ-কাহিনীর মাল-মসলা সংগ্রহ বিষয়ে কালিম্পং এডুকেশন হাইস্কুলের শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ বি-এ, ডেপুটী ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত রবিবাবু প্রধান, ও শিল্প বিদ্যালয়ের মিসেস্ অড্‌লিং (Mrs. Odling) আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। Mr. Purdie আমাকে অনেকগুলি ফটোগ্রাফ দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত মনীষী গ্রেহামের ডাক্তার গ্রেহাম (Dr. Graham) আমাকে "A gladdening River" ও "On the Threshold of Three closed lands" নামক দুখানি বই উপহার দিয়েছিলেন। তা' থেকেও আমি প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। এজন্য আমি ইঁহাদের সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কচ্ছি।—লেখক।

বিধবার ব্যথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম-এ

খোলার ঘরে অনেক দিনের হোটেল।

আশে-পাশে কোঠা বাড়ী—মাঝে দুখানি খোলার ঘর—সিমেন্টের মেঝে—একটি ঘরে খাওয়া, অপরটিতে রান্না। দরজার ঠিক উপরে একটি আলকাতরা-মাখানো কালো টিনে চকের গুঁড়ো ও রেড়ীর তেল দিয়া লেখা—'বিদ্যু হিন্দু হোটে'—হোটেলের 'ল'-টি নাই—হয় ত লেখার সময় বাদ পড়িয়া গিয়াছিল—অথবা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

খাওয়া-দাওয়া নাকি ভাল। হোটেলের অধিকারিণী মানদা বলিত, চোদ্দ পয়সা কি বেশী হোল বাবু? তবে মাসের হিসেবে যদি খাও, তবে এগার টাকাই দিও। এখানে ডালের সঙ্গে ভাতের কেন পাবে না। তরকারী আছে, ভাজা আছে, মাছও দুখানা। চালও মিহি বালাম—বুঝলে না বাবু? তার ওপর আমড়া কি চালতের টক বাঁধা—

মানদা যখন হোটেলের প্রশংসায় ব্যস্ত, তখন হোটেলের বাঁকুড়াবাসী রাঁধুনি ঠাকুর একবার গাঁজার কল্‌কের টান দিয়া, সেকেণ্ড-দুই পরে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মানদাকে বলিত, মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপির ঘন্টটা বাবুরা কেমন খেলে বল তো? বলিয়াই, মানদা কিছু বলিবার আগে, নিজের কৃতার্থতায় হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিত। তার পর বলিত, হেঁ বাপু, বলে রাখচি,—আসচে মাস থেকে ও চোদ্দ টাকা মাহিনেয় আর চলচে না। আগে চাল আর তেলটা আমার হাতে ছিল—পুষিয়ে যেতো; কিন্তু এখন আর ওতে চলচে না—বলিয়া পার্শ্ববর্তিনী হোটেলের ঝি রাধাকে বলিত, তুই বল না রাধি, যা বলচি হক্ কথা কি না? বলিয়াই কলকের আর এক টান।

ঠাকুরের মনটা ছিল সাদা।

রাধা ঠাকুরের মেজাজ জানিত। গত দুই বছর যাবৎ ঠাকুরের মুখে এই কথা সে প্রায়ই শুনিয়াছে; কিন্তু শোনাই মাত্র। ঠাকুরও যায় নাই—রাধাও শুনিয়াছে। রাধা ঐদিন দিনের মতই জবাব দিত—'সত্যি বই কি, একশ বার' বলিয়া ঝিপ্রহস্তে এঁটো মুক্ত করিতে থাকিত। একগাল হাসিয়া ঠাকুর বলিত, তুই ভালোমানুষের মেয়ে—তুই বলবি যে—সেদিন ডালনাটা খেয়ে ছিরিশ বাবু বয়ে জীবন ঠাকুর যেড়ে রেঁধেচ। আরে আমি কি রাঁধুনি ছই! তালতলায় পুলিশ সাহেবের শালার ছেলের অন্নপ্রাশনে কালিয়া যা রেঁধেছিলুম, তা খেয়ে তারা আমাকে একেবারে কনষ্টেবলি চাকরি দিতে চেয়েছিল—গুপুরি কাজ করলুম—নিলুম না। নইলে এত দিন একটা হাকিম-টাকিম—বুঝেচিস—পিথ্‌বিবীর যত সাহেবসুবো সবাই জীবন মুখুয্যেকে চেনে।

এমনি করিয়া তাহাদের দিন কাটিত। রাধিত জীবন, দাসী ছিল রাধা—অধিকারিণী ছিল মানদা; কিন্তু সেও রাধার সঙ্গে দাসীর ন্যায়ই কাজ করিত।

আজ দিন-সাতেক হইল রাধার পোনাঃক যমুনা আসিয়াছে। যমুনা তাহার গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে বাকুণী স্নানে আসিয়াছিল। সে আজ দেড় বছর হইল বিধবা হইয়াছে; কিন্তু দুঃখী মানুষ—লোকের বাড়ী ধান কুটিয়া—মুড়ি ভাজিয়া দিন কাটিতেছিল। মা নাই,—এই মাসিই তাহাকে মানুষ করিয়া, ন' বছর বয়সে অনাথ পাকের আড়তের গোমস্তা গোকুলের সঙ্গে সাত কুড়ি টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দিয়াছিল।

গোকুল উনিশ টাকা মাহিনা পাইত। বিয়ের পর এ কয়টা বছর যমুনার ভালোই কাটিয়াছিল। গোকুল ছোকরাটিও ভালোই ছিল—মেশা-ভাঙ করা, কিংবা তাহার সমবয়সীদের সঙ্গে অস্থানে কুস্থানে যাওয়া—এসব তাহার ছিল না। সে যমুনাকে ভালোবাসিত। রাত্রি নয়টার পর দোকান বন্ধ করিয়া ভাঙা কেরোসিনের আলোটি হাতে করিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিত যে, যমুনা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া তবে দরজা খোলাইতে হইত। কোনও দিন দেখিত, যমুনা তেলের প্রদীপটি সামনে রাখিয়া সিকে বুনিতেছে—সে আসিলে তবে যমুনা ভাত

চড়াইবে—গোকুল যে ভাত ঠাণ্ডা হইলে খাইতে পারিত না, তাহা ময়না জানিত—যদিও গোকুল কোনও দিন মুখ ফুটিয়া তাহাকে এ কথা বলে নাই।

এক দিন গোকুল তাহাকে বলিয়াছিল, তোকে ছেড়ে সমস্ত দিন আড়তে থাকতে আমার বড় মন কেমন করে ময়না,—কেবল পেটের দায়েই থাকতে হয়। সে কথায় ময়নার চোখেও জল আসিয়াছিল। গোকুলের ইচ্ছা ছিল যে, কিছু টাকা জমাইয়া তাহারা নিজের বাড়ীতেই একটি দোকান খোলে; কিন্তু তাহা আর হইয়া ওঠে নাই।

যখন ময়না সতেরো বছরে পা দিয়াছে—এক দিন গোকুলের পাশের বাড়ীর জাতি-খুড়ি আসিয়া হাসিয়া গোকুলকে বলিল, হাঁরে গোকুল, বৌ যে পোয়াতি—খবর দিলুম—কি খাওয়াবি বল।

শুনিয়া গোকুল আনন্দ ও লজ্জায় মুখ নত করিয়া ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছিল।

তার পর ময়না, শিশু কোলে আসিবে ভাবিয়া, লুকাইয়া বসিয়া কাঁথা সেলাই করিয়াছে। শাশুড়ী ননদ সংসারে তো কেউ নাই—নিজে না করিলে চলিবে কেন? শীতকালে শিশু জন্মিবে—এসব লইয়া বাঁচিবে কেমন করিয়া? রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া, ছয়ার ভেজাইয়া, আর একখানি কাঁথা লইয়া গোকুলও সেলাই করিতে বসিত। গোকুল নিজের সেলাই দেখাইয়া বলিত, ছাখ তো—আমার তোলা পাখীটে কেমন হোল? পা দুটো তোর পাখীর মতো সুন্দর তবু হোল না রে—

ময়না বলিত, এই তো বেশ হয়েছে—সোন্দর হয়েছে। পরীবের ঘরে যেমন তাহাদের পক্কামৃত হয়, তাহা হইল। সাধের দিন গোকুল সতেরো আনা দিয়া একখানা লাল চওড়া পাড় কোরা সাড়ি আনিয়া দিল—ময়না তাই পরিয়া সাধ খাইল।

ধুমধাম করিয়া পরীবের ঘরের এই আগন্তুক শিশুর জন্য আয়োজন তাহারা করিয়াছিল।

শিশু আসিল—কিন্তু জীবিত নয়। ময়না মৃত সন্তান প্রসব করিল। ময়না তো তখন বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু একটু সুস্থ হইতেই গোকুলকে দেখিল—তার সে কি কালো মুখ—চোখে জল। এর মাঝে কখন যে গোকুল পাশের বিপিন কবিরাজকে ডাকিয়া লইয়া আসিয়াছে—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে যে, শিশুটি সত্যই জীবিত কি মৃত—তাহা ময়না জানিত না। আহা এমন ছট্‌-ছট্‌ করিতেছে শিশুটি—'একবার ভাল কোরে দেখুন না কবরেজ মশাই'—গোকুলের সে কি মিনতি-ভরা ব্যাকুল কণ্ঠস্বর!

বিপিন কবিরাজ একটু ইতস্তত: করিয়া শিশুটিকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তার পর মুখ ভেংচাইয়া বলিল—ন্যাকা—কখন মরে ভূত হয়েচে তার ঠিক নেই—এখন বলে কি না 'একবার দেখুন না কবরেজ মশাই'—

গোকুল অবরুদ্ধ কণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল—বিপিন কবিরাজ তাহাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়া বলিল—যা—যাঃ—বকিসনে—ভর সন্ধ্যেবেলা ছোঁড়া আমার মড়া ঘাঁটিয়ে ছান করিয়ে তবে ছাড়লি- উঃ—ও একটা ভিজিটে আজ আর হচ্ছে না—দুটাকা দিতে হবে—উঃ, শীতের দিনে এখন মাথায় জল ঢালি কি করে বল তো? বলিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া দুটি টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

এক দিনের কথা ময়নার বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। সেদিন গরুর ঘাস কাটিতে তাহার ডান হাতটা অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছিল। তার কি ব্যথা—হাত নাড়িবার জো নাই। সে রান্নাবান্না কিছু করিতে পারে নাই। পাশের বাড়ী হইতে গোকুলের খুড় ভাত দিয়া গিয়াছিল। ময়না নিজহাতে খাইতে পারিবে না,—গোকুল তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়াছিল—তাহার আপত্তি শোনে নাই। সস্নেহে খাওয়াইতে খাওয়াইতে গোকুল হাসিয়া তাহাকে বলিয়াছিল, 'বৌ, তোর হাত কেটেছিল তাই না ভাগিস তোকে খাইয়ে দিতে পেলুম।'

একটি ছেলের জন্য গোকুলের বড় সাধ ছিল। তাহাকে সে লেখাপড়া শিখাইবে; সে সহরে বড় চাকরি করিবে—এই তার আশা ছিল। সে বলিত, আমরা হলুমই বা কৈবর্ত—আমার পিসতুত ভাই বৃন্দাবন—সেও তো ইংরেজী শিখে রেলের ইষ্টিশানে বড় কাজ কচ্ছে—আশী টাকা মাইনে পায়। সেই বেশ হবে কেমন ময়না?

কিন্তু সব আশাই তাহার মিটিয়া গেল এক দিনের কলেরায়। সে জল-পিপাসায় জল জল করিয়া, কত চেঁচাইয়াছে—হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এক ফোঁটা জল দেয় নাই। তাই আজও জলের বটি [illegible] তুলিতেই ময়নার

বুকের ভেতরটা কেমন করিতে থাকে! বর্ষার আকাশ হইতে যখন অঝর-ঝরে বর্ষণ হয়, তখন তাহার চোখও জলে ভরিয়া ওঠে। নদীতে জল, রায়েদের পুকুর জলে ভরা—তবুও গোকুল জল না পাইয়াই চলিয়া গেল—এই তার বড় বাথা!

গোকুলের সঞ্চিত কিছুই ছিল না। থাকিবেই বা কেমন করিয়া? উনিশটে টাকা মাস কাঁবারে পাইত—তাহাতেই তো সব গুছাইয়া লইতে হইত।

ঘরে অসময়ের জন্য অনেক কষ্টে তোলা যে সাতাশটি টাকা ময়না একটা মাটির ভাঁড়ের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছিল, গোকুলের শ্রাদ্ধাদি কাজে তাহা বাহির করিল। হাতের দুই ভরির সোনার বাজুটাও গেল। সেটা গাঁয়ের মহাজন কাশী নন্দীর কাছে বেচিয়া পঁচিশটে টাকা পাইয়াছিল। ময়না বলিয়াছিল, নন্দী-মশাই আর পাঁচটা টাকা পুরিয়ে একেবারে ত্রিশটে টাকাই দাও—নইলে ছাদ্দটার খরচ কুলোবে না। কাশী নন্দী বাজুটা বাক্সে বন্ধ করিয়া খাতা লিখিতে লিখিতে বলিল, তুই কি হলি বল তো কৈবর্ত্ত বৌ,—পঁচিশ টাকা তুই বলেই দিচ্ছি—সোণার কি আজকাল দর আছে রে! বলে গিয়ে—তার পর চোক গিলিয়া বলিল, গোকুল আমাকে কত ভালবাসত—সে বারে তাল নবমীর দিন—

সেই বিশেষ তাল নবমীর দিন কি হইয়াছিল, তাহা শুনিবার জন্য ময়না আর অপেক্ষা করে নাই। ময়না আর কিছুই বলে নাই। আঁচলে চোখ মুছিয়া এই সদ্য-বিধবা পঁচিশটে টাকা লইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

গোকুলের মৃত্যুর পর যখন তাহার ঘরে বসিয়া দুবেলা দুমুটো দুটিবার সম্ভাবনা রহিল না, তখন সে বাধ্য হইয়া মিত্তিরদের বাড়ী যাইয়া কাজে লাগিল,—খাওয়া পরা আর মাসিকে মাইনে। তাহাতেই তাহার দিন একপ্রকারে চলিয়া যাইত। এমনি করিয়া সে তাহার দিনগুলি একটি একটি করিয়া স্বামীর ভিটায় থাকিয়া কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু বিনোদ মিত্তিরের বড় ছেলে যখন একদিন রাত্রিতে এদিক ওদিক চাহিয়া কাছে কেহ নাই দেখিয়া খপ্ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ভাখ ময়না, একবার শোন লক্ষীটি, আমার পা দুটো বড় কামড়াচ্ছে—পা দুটো একটু টিপে দিয়ে যা না—পা দুটো বড়—উঃ

সেই যে সে তখন পলাইয়া আসিয়াছিল, আর কাজে যায় নাই,—লজ্জায় কাহাকেও কোনও কথা বলে নাই। পাড়ার লোক বলিল, গোকুল নাই বিয়ে ওর মাথাটা খেয়ে গিয়েচে—ও খাবে কার করে—তবেই হয়েচে!

তাই দুঃখের দিনে মাসিকে একখানা চিঠি লিখিয়া, তাহার শেষ-সম্বল রূপোর উনিশভরির সোটছড়া সাড়ে সাত টাকার কাণ্ড নন্দীকেই বেচিয়া ঘরের দরজায় তালা দিল। তার পর দুতিনখানা কাপড় একখানি গামছায় বাঁধিয়া একটি পেতলের ঘটি হাতে—তাহাদের গাঁয়ের যাহারা কলিকাতায় বারুণীর স্নানে আসিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। আসিবার আগে সে তাহার অতি প্রিয় গাইটিকে তাহার খুড়শাশুড়ীকে দিয়া বলিল, খুড়ি, কাজলিকে আমার দেখো—কেউ যেন খোঁয়াড়ে টোয়াড়ে না দেয়—বলিয়া চোখের জল মুছিল। এই গাইটিকে গোকুল বড় ভালবাসিত। এই বাকশক্তিহীন গৃহপালিত প্রাণীটিকে অত্যন্ত বশ করিত বলিয়া ময়না ঠাট্টা করিয়া গোকুলের সাম্‌নে গাইটিকে 'সতীন' বলিয়া ডাকিত। ইহা লইয়া স্বামীস্ত্রীর মধ্যে তাহাদের কত হাস্য পরিহাসই না হইয়াছে! তাহাদের কত দিনের কত মধুর দাম্পত্য কলহের নীরব সাক্ষী ছিল এই প্রাণীটি!

ষ্টেশনে আসিবার পথে অনাথ পালের আড়তের সামনে দিয়া আসিতেই তাহার চোখ হইতে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এই আড়তেই গোকুল চাকরি করিত যে! গোকুল নাই—কিন্তু চলিতে ফিরিতে গোকুলকে মনে পড়াইয়া দিবার জিনিস তো ঢের আছে—গোকুলের বসিবার পিঁড়ি—তার মুখ ধোবার ঘটি—তার পায়ে-চলা পথ—মেটে দেয়ালের গায়ে গোকুল পান খাইয়া হাতের চুনটুকু যে মুছিয়াছে সে দাগটি পর্য্যন্ত! লোকের মুখে 'গোকুলের বৌ' এ কথা দুটি!

বাঙালী জাতটাই বুঝি এমনি ভাবপ্রবণ—~~ভাবে ভিজিয়া~~—পড়িয়া মরে, তবু ঘর ছাড়িতে চায় না।

* * * *

ও ময়নি, পাশ সাজা হোল তোর—নটা বাজতে চল্লো—এখুনি সব বাবুরা খেতে আসবে—একবার হাতটা চালিয়ে নে মা.—বলিয়া ময়নার মাসি রাধা ঠাই করিতে লাগিল।

ময়না আজ দেড়মাস হইতে এই হোটেলে মাসির সহিত কাজ করিতেছে। সে পান সাজিতে সাজিতে বলিল, হাঁ মাসি, এই হোল।

একটু বেলা হইয়াছে—দুই-এক বৈঠক লোক খাইয়া গিয়াছে। তার পর অমর বাবু আসিলেন। এঁর বয়স বেশী নয়; কোন সদাগরি আফিসে কাজ করেন। মানদার হোটেলের ইনি বাঁধা খদ্দের, মাসকাবারে টাকা দেন,—মাহিনা পাওয়ার দিনই সব চুকাইয়া দেন,—একটি পয়সাও বাকী থাকে না। এই জন্য মানদা তাঁহাকে অপর পাঁচজনের চাইতে বেশী খাতির-যত্ন করিত। খাইতে বসিলে বলিত, ঠাকুর, অমর বাবুকে আর একখানা কালের মাছ দাও না—বাবু আর ভাত নেবেন—এত কটি—কিছুই খেলেন না আপনি—এমনিধারা কথা প্রায়ই মানদার মুখে শোনা যাইত।

সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় ইহা সকলে জানিয়াছিল যে, অমর বাবু নিজে কখনও কিছু চাহিতেন না। চুপ করিয়া খাইয়া উঠিয়া যাইতেন। হোটেলের পানও তিনি খাইতেন না। এক দিন মানদা বিশেষ করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, না গো, ও পান আমি খেতে পারিনে—খালি সুপুরি—অন্য কোনও মশলা নেই—

এই বাবুটিকে ময়নার বড় ভালো লাগিত। বেশ স্তব্ধ, শান্ত, সংযত স্বভাব—মনে কোনও অনুযোগ নাই—আহা, ঠিক যেন তাহার গোকুলের মত। ময়না নিজে পয়সা খরচ করিয়া, এলাচ, লবঙ্গ, পানের মশলা লইয়া আসিয়া আলাদা করিয়া রাখিল। তার পর তাহা দিয়া সে দুটি পান বিশেষ করিয়া সাজিল।

অমর বাবু যখন খাইয়া উঠিলেন, তখন সেখানে আরোও পাঁচ-ছয়জন লোক ছিল। ময়না তাহাদের সবাইকে পান দিল; কিন্তু অমর বাবু পান খান না সকলে জানে, তাই সে মুখ ফুটিয়া এ কথা বলিতে পারিল না, 'আপনার জন্যে ভালো করে নেজেচি'। খিলিদুটি রহিয়া গেল—অপর কাহাকেও তাহা তুলিয়া দিতে তাহার মন সরিল না। বেলা গোটা দেড়েকের পর হোটেলের কাজ করিয়া গেলে, মাসি রাধার সঙ্গে গঙ্গা নাইতে যাইয়া সে খিলি দুটি জলে ফেলিয়া দিল—যেমন পূজা হইয়া গেলে লোকে পূজার ফুল জলে ভাসাইয়া দেয়।

রাত্রেও সে আবার দুটি পান সাজিল; কিন্তু রাত্রে খাওয়ার পর, যদিও তখন অমরবাবুর কাছে লোকজন আর কেহ ছিল না বটে, কিন্তু তিনি মুখ ধুইয়া তখনি সোজা চলিয়া গেলেন—একটুখানি অপেক্ষাও করেন নাই। তাই সে পানও নষ্ট হইল। এমনি করিয়া সে রোজ পান সাজিত; কিন্তু দিন দুয়েকের মধ্যে কোনও দিন দিতে পারিল না। সাজা পানগুলি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া আসিত।

এইরূপে দিনের পর দিন তাহার নীরব অর্ঘ্য এমনি বৃথাই নষ্ট হইল।

সেদিনটি ছুটির দিন। তাড়াতাড়ি ছিল না। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। বেলা প্রায় দুটো—তখন অমর-বাবু আসিলেন। তাঁহাকে সকাল বেলায় কি কাজে নৈহাটি যাইতে হইয়াছিল—আসিতে তাই এই দেরীটুকু হইয়াছে।

তাঁহার খাওয়া শেষ হইয়া গেল। মুখহাত ধুইবার পর যখন তিনি যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছেন, মাত্র তখন ময়না আসিয়া বলিল, বাবু পান খাবেন?

অমরবাবু গেল দেড়বছর হইতে এখানে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করেন। সেই প্রথম দিনটিতে তিনি যে বলিয়া-ছিলেন—পান খাইবেন না—আর কেহ তাঁহাকে অনুরোধ করে নাই।

আজ এই অল্প বয়সের মেয়েটির অনুরোধের জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ক্ষণকালের জন্য থতমত খাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন—ময়না মাথা নীচু করিয়া পান হাতে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বলিলেন, পান দেবে—আচ্ছা দাও।

পান খাইয়া অমর বাবুর ভালোই লাগিয়াছিল—অনেক যত্ন করিয়া সাজা যে! তাই তিনি নিজেই রাত্রে রাধাকে বলিলেন, ওগো রাধা দাও তো পান খাই—ওবেলা খেলুম মন্দ লাগেনি তো—ঠিক যেন আমাদের বাড়ীর সাজা পান—

ময়না পান হাতে করিয়া কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল—অমর বাবুর কাছে আরোও ঢের লোক ছিল বলিয়া সাহস করিয়া পান দিতে পারিতেছিল না। কিন্তু অমর বাবুর এই কথা শোনামাত্র তাড়াতাড়ি আসিয়া পান দুটি হাতে দিল। অমর বাবু পান লইয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি সেই যে বলিয়া গিয়াছেন—পান তাঁহার মন্দ লাগে নাই—ইহাতেই ময়না যেন অনেকখানি আনন্দ পাইল।

ইহার পর ময়না রোজ দুবেলাই পান সাজার সময়

অতি যত্ন করিয়া দুটি পাণ সাজিত—যাহা সে অমরকে দিত এবং দিয়া সুখী হইত।

অমর বাবু দুধ খাইতেন—রাত্রে দুধ জাল দিয়া অমরের বাটিতে দিতে হইত। তিনি পাতিনেবু, ঘি, আচার—এসব কিনিয়া দিতেন। খাওয়ার সময় এসবও তাঁহাকে দিতে হইত। এমনি করিয়া দুপুরে ঘি, দৈ, নেবু, আচার, রাত্রে দুধ ইত্যাদি যমুনাই রোজ আগাইয়া দিত। এসমস্ত জিনিসের খরচা সবই অমর বাবুর—যেমন আগেও ছিল। কেবল এগুলি ঠিকমত দেওয়ার ভার যমুনা লইয়াছিল।

এমনি করিয়া অমরবাবুর খাওয়ার সমস্ত ভার যমুনার হাতে আসিয়া পড়িল।

যমুনার মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিত যে, অমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করে—তাঁহার দেশ কোথায়—বাড়ীতে কে কে আছেন এইসব; কিন্তু লজ্জা হইত বলিয়া পারিত না। সে হোটেলের কি—তাহার এ অর্থহীন কৌতূহলে প্রয়োজন কি? লোকেই বা কি বলিবে?

অমরবাবু যেখানে থাকিতেন, এক দিন সেখান হইতে একটি লোক আসিয়া খবর দিল—অমরবাবুর জ্বর হইয়াছে—এখানে আসিতে পারিবেন না। মানদা যেন তাঁহার দুধ, সাবু এ সব দিয়া আসে।

মানদা রাধাকে পাঠাইল—সঙ্গে যমুনা দুধের বাটি হাতে করিয়া গেল। যাইয়া অমর বাবুর ঘর দেখিয়া আসিল। একটি ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীর সামনের একটি ঘর ভাড়া করিয়া থাকেন; ভিতরে গৃহস্বামী সপরিবারে নিজেই বাস করেন।

ইহার পর যমুনার ইচ্ছা হইত যে, সে-ই রোজ পথ্য লইয়া যায়—সন্ধ্যায় লাম্প-এ তেল ভরিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া আসে,—খাটের পাশে টিপয়ের ওপরে খাবার জল রাখিয়া আসে—বিছানা ঝাড়িয়া পাতিয়া দিয়া আসে।

কিন্তু এ সবের দরকার হইল না। দুদিনের মধ্যেই অমর সারিয়া উঠিলেন; এবং পূর্ব্বের ন্যায় যেমন হোটেলে আসিয়া দুবেলা খাওয়া দাওয়া করিতেন তেমনি করিতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া সকাল হয়। রাত্রি আসে।

একটি অল্প বয়সের অক্ষর পরিচয়হীনা কৈবর্ত্তের মেয়ে—একটি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তানের জন্য যেটুকু যত্ন করা দরকার—তাহা করিত—বোধ হয় বা একটু বেশীই করিত। অমর বাবুর চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, মুখ ধোওয়া—এ সবই যমুনা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আগ্রহের সঙ্গে দেখিত। দেখিয়া দেখিয়া মনে হইত, তাহার গোকুলেরও এমনি ছিল—এমনি করিয়াই তো গোকুলও কোলের উপর তাহার বাঁ হাতখানি রাখিয়া খাইতে বসিত; চলিবার ভঙ্গীটি ঠিক যেন গোকুলের মত।

স্বামীকে যমুনা বড়ই ভালবাসিত।

তাই স্বামীর সাদৃশ্য অমরের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া সে অপর দশজনের তুলনায় তাহাকে অন্য চক্ষে দেখিত। কিন্তু তাহাতে কোনও দিন সে কিছুমাত্র অসংযম প্রকাশ করে নাই—এতটুকু কুচিন্তাকে মনে স্থান দেয় নাই।

স্বামীকে সে ভালবাসে। স্বামীর ভালোবাসার আগুনে অন্য সব পুড়িয়া ছাই হইত।

আকাশের নীলিমায়, মধুকের কণ্ঠে, যমুনার কালো জলে দয়িতের গায়ের রং দেখিয়া কবে কোন্ চিরন্তন কিশোরী যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন—এও যেন কতকটা তেমনি! সে ভালোবাসে গোকুলকে; কিন্তু অপরের মধ্যে গোকুলের যে সাদৃশ্য সে দেখিতেছে—গোকুলকে ভালোবাসে বলিয়াই সেই সাদৃশ্যকে সে অবহেলা করিতে পারিল না। যে লোকটির মধ্যে গোকুলের সাদৃশ্য সে দেখিতেছে—তাহাকে তো সে ভালবাসে নাই। সে পরপুরুষ। তাই সে—অমরকে না ভালোবাসিলেও অমরের ভিতরের গোকুলটুকুকে সে ভালোবাসিল।

স্বামীর উপরে যমুনার যে ভালোবাসা—তাহাই অন্য ভাবে রূপান্তরিত ও বিকসিত হইয়া উঠিল—মনে যখন তাহার একটি কালির দাগও লাগে নাই। কিন্তু কেবল এইটুকুই—আর কিছু নয়।

অমর বাবু নিজেও সংযত স্বভাবের ছিলেন। কোনও দিন কোনও পরিহাস, কোনও বাঁকা চাহনি—এ সবের দিক দিয়া তিনি যাইতেন না। নিজের খাওয়া হইলে, গোকে অপেক্ষা করিতেন না। পাণ লইয়া ধীর ভাবে চলিয়া যাইতেন। সেই প্রথম দিনটি ছাড়া আর পাণের প্রশংসা করেন নাই।

এক পক্ষের কোনও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, ছিল না; অমরের আগেও যেমন দিন যাইতেছিল, এখনও তেমনি যাইতেছে। কিন্তু যমুনার দিক হইতে ঠিক এ কথা বলা চলে না

তাহার সুখ দুঃখ যেন অনেকটা অমরকে অবলম্বন করিয়া-ছিল। যদিচ অবলম্বনের সামগ্রী বিশেষ কিছুই ছিল না. —কখন দিনে দুটি পাশ দিবে—খাবার সময় দুএকটা জিনিষ আগাইয়া দিবে—রাত্রিতেও তাই—তবুও তাহার মন তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিল। ইহার বেশী এই গরীব গৃহস্থের দুঃখী মেয়েটি চাহিতও না। অমরের সঙ্গে মিলিবার আকাঙ্ক্ষা একটি দিনের তরেও তাহার মনে জাগে নাই—তাহা সে নিদারুণ পাপ বলিয়াই মনে করিত। অমর চলিয়া গেলে তাঁহার কথা যে মন্নার মনে হয় না তাহা নয়; তবে সে মনে-হওয়া অন্য রকমের। তাহার স্বামীর অকাল-মৃত্যুর ব্যথাতেই তাহার বুক তখনও ভারী হইয়া আছে। বড় দুঃখেই সে গাঁ ছাড়িয়া এই বিদেশে আসিয়াছে—যেখানে চেনা লোকের মুখে—চলিবার ফিরিবার পথে গোকুলকে মনে পড়াইয়া দিবার অন্য কিছুই ছিল না। অতীতের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন-বর্ত্তমানে যেন সে বাস করিতেছে। অপরিচিত লোকের সামনেও নিজের শুধু হাত দুটি বাহির করিয়া নিজেকে তাহাদের একান্ত নগ্ন দৃষ্টির সামনে ধরিতে তাহার লজ্জা হইত। হোটেলে যখন বেশী লোকজন খাইতে আসিত, তখন সে ছড়মুড় কোণ-ঘেঁষা হইয়া থাকিত—অথবা পেছন ফিরিয়া কাজ করিত।

সে এখানে আসিয়াই বলিয়াছিল, মাসি—আমি কিন্তু বাজার কর্ত্তে যেতে পার্ব্ব না।

মাসি বলিয়াছিল, না—তা তোকে যেতে হবে না। সে হোটেলের রান্নাঘরে বসিয়া রান্নার জোগাড় দিত বা ঐ ধরণের অন্যান্য কাজ করিত; বাটনা বাটা কুটনো কোটা এই সব লইয়াই ব্যস্ত সে থাকিত।

সেদিন পৌষ-সংক্রান্তি। মন্না সকাল-সকাল মাসির সঙ্গে গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিল। তাহার মাসি রাধা ~~বোষ্টমী~~ বোষ্টমই বা হোটেল—যা নিয়ম তা তো রাখা চাই—মন্নি, তুই দু' একটা পিঠে তৈরী কর—বেশ হবে 'খন। তার পর সে চালের গুঁড়ো, নারকেল, গুড় আর যা যা দরকার আনিয়া দিল।

মন্না আনন্দিত হইয়া বলিল—আমি আটআনা দিচ্ছি আমায় দুসের দুধ এনে দাও না?

রাধা বিরক্তির সঙ্গে বলিল—দুধ দিয়ে আবার কি হবে লা?

মন্না চোখ নাচু করিয়া বলিল,—আমি পুলি পিঠে ভাল দেবো—তুমি যে সব এনেচ, তাতে শুকনো পিঠে হবে। পুলি পিঠে যে গোকুল বড় ভালোবাসিত!

সেদিন মন্না আর হোটেলের কাজে ভিড়িল না। রান্নাঘরের ওপাশের বারান্দায় একটা তোলা উনানে সে পিঠে তৈরি করিতে লাগিল। ভোরবেলা হইতে এক হাতে দুতিন রকম পিঠে তৈরি করিতে করিতে দুপুর হইল। অমর বাবু খাইতে আসিলেন—মন্নার ইচ্ছা হইতেছিল যে অমরকে দুচারখানা পিঠে দেয়। কিন্তু শুধু যে লজ্জা আসিয়া বাধা দিল তাহা নয়, বামুন মানুষকে সে তাহার তৈরি পিঠে খাইতে দিবে এমন দুঃসাহসের কাজ সে কি করিয়া করিবে?

মন্নার হাত জোড়া বলিয়া আজ রাধা পাশ দিল। অমরবাবু চলিয়া গেলেন। তখন মন্নার মনে হইল যে সমস্তই নিরর্থক। নিরর্থকই সে ভোরবেলা হইতে খাটিতেছে! এক মুহূর্ত্তে তাহার কর্ম্মের সকল আনন্দ চলিয়া গেল। কাহাকে খাওয়াইবার ক্ষীণ অস্পষ্ট আশা লইয়া সে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল—যাহা তাহার নিজেরও অগোচর ছিল; কিন্তু তাহারই ব্যর্থতা তাহার মনকে অবিরত বিঁধিতে লাগিল; অথচ মুখে কিছুই বলিবার নাই!

কতকগুলি পিঠে তৈরি করিতে তখনও বাকী ছিল; কিন্তু মন্নার সমস্ত উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছে। সে মাসিকে বলিল, মাসি আর করে দরকার নেই, এই থাক যথেষ্ট হয়েছে—আমার শরীরটাও ভালো লাগচে না।

মাসি পীড়াপীড়ি করিল না।

মন্না তাহার মাসিকে, ও মানদাকে পরিবেশন করিল; কিন্তু নিজে একটাও মুখে তুলিল না। কতকগুলি যত্ন করিয়া একখানা রেকাবীতে সাজাইয়া রাখিল—যদি অমরকে রাত্রিতে দিতে পারে সেই ভরসায়।

মাসি একবার জিজ্ঞাসা করিল,—হাঁ রে, তুই পিঠে তৈরি কল্লি—তুই নিজে কই খেলি নে?

সে বলিল, সকাল থেকে আগুন তাতে থেকে এখন আর খেতে ইচ্ছে কচ্ছে না মাসি, ওবেলায় খাব বলে রেখে দিয়েচি।

রাত্রে অমরবাবু খাইতে আসিলে মন্না মাসিকে বলিল,—'মাসি, ওই বাবুটিকে পিঠে দুএকখানা দেবো—আমাদের হাতের গড়া খাবেন তো? একবার জিগ্‌গেস কর না', বলিয়া

ফেলিয়া নিজেই লজ্জিত হইল—মাসি কি মনে করিবে? সে সময়টা সৌভাগ্যক্রমে অমরের পাশে আর কেউ ছিল না। রাধা কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, বাবু, আমরা দুএকখানা পিঠে গড়েচি—আজ সংক্রান্তি—আপনি বাড়ীতে থাকলে তো কত খেতেন—খাবেন দুএকখানা—দেবো—আমাদের তৈরি জিনিস কিন্তু···

অমর অনেক দিন হইতে এখানে খাওয়া-দাওয়া করেন,—তাঁহার দুধ দৈ ইত্যাদি দেওয়া,—ধোপাবাড়া কাপড় দেওয়া আনা—এসব ছোটখাট কাজের ভারও তাহাদেরই উপরে—এইসবের জন্যে অপর দশজন বাবুর চাইতে তাঁহার সহিত যেন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে—এই ঘনিষ্ঠতার দাবী হইতেই রাধা এ কথা বলিল।

অমর বলিলেন,—পিঠে? পিঠে খাবো কি গো, বল কি? এ কথার পর আর কথা চলে না। রাধা অপ্রস্তুত হইয়া মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

আড়াল হইতে মহনা সবই শুনিয়াছিল। রাধা যাইয়া কণ্ঠস্বরে অনেকখানি ব্যঙ্গ মিশাইয়া যখন বলিল, তোর যেমন আবদার—বাবুন মানুষ কখনও আমাদের তৈরি পিঠে খায়?

মহনা কিছুই বলিল না,—চুপ করিয়া বিবর্ণ মুখে রান্না-ঘরের কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোকুল পুলিপিঠে এত ভালবাসিত—তাই তো সে অমরের জন্য সংক্রান্তিতে এই পুলি পিঠে তৈরি করিল—দুপুরে অমরকে দিতে পারে নাই বলিয়া সে নিজেও একখানা মুখে তুলিতে পারে নাই। জাতের ব্যবধানের কথাটা তাহার মনে হয় নাই তাহা নয়; তবে তেমন বড় করিয়া মনে হয় নাই। সে চুপ করিয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিল।

হোটেলের কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে। রাধা ও মানদা পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছে। নিকটে একটি পেতলের কারখানায় নানা রকম ঢালাই পেটাই কাজ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হইত—তাহার শব্দও আর শোনা যাইতেছে না।

রাধা ডাকিয়া বলিল,—ও মহনি, কোথা গেলি—রাত যে একটা হোতে চল্ল—খাবি আয়—

মহনার চোখে কেবলই জল আসিতেছিল। সে তাহা মুছিয়া কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া বলিল, মাসি আমার জ্বর-জ্বর কচ্ছে—আমি আর খাবো না—এই বলিয়া, তাহারা কিছু বলিবার আগেই, বিছানায় যাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন দুপুরেও তাহার খাওয়া হয় নাই, রাত্রিও উপবাসেই কাটিল।

ইহার পর হইতে সে আর অমরের জন্য কিছু করিতে সাহসী হইত না। অমরা ইচ্ছা হইত যে ছানা কিনিয়া সন্দেশ করে। সে নিমকি কচুরি এসব করিতে জানিত। এক একবার মনে হইত যে, এগুলিতে তো দোষ নাই, এগুলি করিলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহা করে নাই—কতকটা রাগ, কতকটা অসহায় অভিমান—এ সব ভাব আসিয়া তাহাকে আর করিতে দিত না। আর কি উপলক্ষ করিয়াই বা মহনা এ সব করিতে বসিবে? মাসিকেই বা কি বলিবে? রোজ তো পৌষ-সংক্রান্তির দোহাই দেওয়া চলিবে না।

সেই যে দিনে ও রাত্রে যথাক্রমে দৈ, দুধ, নেবু ইত্যাদি দেওয়ার পর দুবেলায় দুটো দুটো করিয়া চারটে পাণ—ইহাই যেন অমর ও তাহার মধ্যে মাধুর্য্যের সেতুবন্ধরূপে বিরাজ করিতেছে।

দিন সাতেক পরে রাধা বলিল,—মহনি, এক কাজ কর্ব্বি—ওই যে মোড়ের মাথায় কটকওলা বড় বাড়ী—ও বাড়ীর গিন্নিমার সঙ্গে আমার অনেক কালের জানাশোনা। তিনি কাশী যাচ্ছেন এই সামনে অঘ্রাণকোটে—তার পর সেখানেই পাঁচ ছ মাস থাকবেন—কাশীতে বড় বাড়ী রয়েচে কি না—একজন লোক চাইছিলেন বেশ বিশ্বেসী—আমার তো যাবার জো নেই—আমি তোর কথা বল্লুম—যা-না—ঘুরে আয় কাশী থেকে—বেশ ভাল মানুষ এঁরা—পরের খরচায় তিথি ধন্ম হবে সেটাও তো·····যাবি?

মহনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা যাবো।

যাইবার আগের দিন যখন মহনার ডাক পড়িল, তখন সে বলিল, না মাসি, আমি যাবো না—

বিস্ময়ের সহিত রাধা বলিল, বলিস কিরে—আমি কথা দিয়েচি—এখন তাঁদের কি বলি আমি?" ~~অনেক দূর~~ বলিয়া রাধা রাগে গরগর করিতে লাগিল।

মহনা বলিল, কথা দিলে কেন? আমি রাঁধি বাড়ি করে খেড়াবার জন্যে কি গাঁ ছেড়ে তোমার কাছে এলুম—আজ তুমি আমায় বিদায় দিচ্ছ—আমার যা হোলে কি—বলিয়া সে চোখে আঁচল দিল।

আসল কথা অমরকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন সরিতে

ছিল না। অমরের ভিতরের যে গোকুলটুকুকে সে দেখিতে পাইতেছে—বিদেশে গেলে সে তো তাহার এ ক্ষুদ্র অবলম্বনও হারাইবে। শত যোজন দূরে কেমন করিয়া সে তাহার এই দুঃখময় দিনগুলি কাটাইবে?

মা-মরা বোনঝির চোখে জল দেখিয়া রাধা বলিল, না বাপু তোকে যেতে হবে না—

তাহার পরলোকগতা ভগিনীর কথা ওঠায় তাহার চোখও জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল—সে তাহা বাঁ হাতে মুছিয়া ফেলিল। সত্যই তো—তার মা বাঁচিয়া থাকিলে কি তাহাকে বিদেশে হোটেলে দাসীবৃত্তি করিতে আসিতে হইত—আর গোকুল—সে তো তাহাকে সাধ্যমত যত্নেই রাখিয়াছিল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

ময়না রাত্রের ফুলুরির জন্য ডাল বাটিতেছিল। এমনি সময় অমরবাবু আসিয়া 'ও-মানদা—ও-রাধা'—তার পর ময়নাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'এরা সব কই?'

ময়না ডাল বাটা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাতের উল্টো পিঠ দিয়া মাথার কাপড়টা টানিতে টানিতে বলিল, মাসি ডাকঘরে চিঠি দিতে গিয়েছে এই এলো বলে—

অমর বাবু বলিলেন, আর মানদা?

সে কোথায় গিয়েছে জানিনে,—বলিয়া সে জড়সড় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখনি রাধা আসিল। অমর বাবু বলিলেন, আর আমার দুধ নিও না,—আর আমিও এখানে খাবো না—বুঝলে?

রাধা বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, কেন—খাওয়ার কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি বাবু? ঠাকুর মিনসের যে আক্কেল—আচ্ছা আমরা তাকে—

অমর বাধা দিয়া বলিলেন, না, না—সে জন্যে নয়—আমি কানপুরে বদলি হয়েচি—আমাদের কোম্পানীর সেখানেও আফিস আছে কি না—মাইনেও বেড়েচে—আজ রাত্রিরেই যাচ্ছি—

তার পর একটু থামিয়া বলিলেন, তোমাদের এ কদিনে পাওনা প্রায় সাড়ে ছ টাকা হবে—কেমন?—দুধের দামও টাকা পাঁচেক হবে—এই সাড়ে এগার টাকা—আচ্ছা, এই পনেরোটি টাকা রাখ। হোটেলের টাকা আর দুধের দাম দিয়ে যা বাঁচবে, তা তোমরা নিও—মানদাকে বলো—বুঝলে?—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু যে মেয়েটি তাহার কম্পিত হৃদয় ও সজল দৃষ্টি লইয়া তখন এক হাতের একটি আঙুল আর হাতে ধরিয়া নির্মমভাবে রগড়াইতেছিল, তাহার দিকে ফিরিয়াও তিনি চাহিলেন না বা একটি কথাও বলিয়া গেলেন না।

কার্যান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া মানদা বলিল, বাবুটি বড় ভালো লোক ছিলেন গো—পুজোপরবে আমাদের দিতথুতো—আর সব বাবুরা যা হয়েচে—হাত দিয়ে জল গলে না—বাপ্।

ময়না তাহার হাতের কাজ কোনও প্রকারে শেষ করিয়া রান্নাঘরের পাশের বারান্দায় আসিয়া বসিল। তাহার চোখ হইতে জল ঝরিতে লাগিল, অথচ ইহার কারণ তাহার নিজের কাছেও সুস্পষ্ট নয়।

কিছুক্ষণ বাদে রাধা সেখানে আসিয়া তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন রে ময়নি, কি হয়েচে—কেউ কিছু বলেচে?

নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া সে জানাইল যে, কেউ কিছু বলে নাই।

'তবে কাঁদচিস কেন বল তো—এই ভর সন্ধ্যে বেলা?'

ময়না কথা কহিল না—তবুও তাহার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল।

রাধা আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে বল না তোর?

ময়না এবারও কোন উত্তর দিল না। সে কি বলিবে—তাহার কি বলিবার আছে? অনেক কষ্টে সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কি বলিল তাহা বোঝা গেল না—শুধু 'চলে গেল' এই দুটি কথা শোনা গেল।

রাধা বলিল, কে—অমর বাবু?

ময়না কোনও উত্তর করিল না।

রাধা বিরক্তির সঙ্গে বলিল, বাবু গেল তা তোর কি লা?

এই মুখচোরা মেয়েটি এবার কণ্ঠ একটু পরিষ্কার করিয়া, জলভরা চোখে যেন একটু সাহস করিয়াই বলিয়া ফেলিল, ওঁর চলন খাওয়া দাওয়া এ সব তোর জামাই-এর মতন—

রাধা ময়নার কথা ঠিক ধরিতে না পারিয়া তাহার মুখে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল, কার মতন?

ময়না একটু ঢোঁক গিলিয়া 'আমার সোয়ামীর মতন' বলিয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার মাসি অবাক হইয়া এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

শিশু-মৃত্যু ও মাতৃজাতি

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

১

মায়ের সন্তান হারানোর সঙ্গে তুলনা হইতে পারে এমন দ্বিতীয় দুঃখ জগতে আর নাই। কিন্তু, আমাদের এই হতভাগ্য দেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মৃত্যুর হার এত বেশী যে, তাহার কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সরকারী স্বাস্থ্য বিবরণ অনুসারে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডে হাজার-করা ৬৯টী (লণ্ডন সহরে ৬১টী) শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। আর সেই বৎসরে ভারতে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল,—মাদ্রাজ—১৭৮·৯, বোম্বাই—১৫৯·৪১, বাংলা—১৮·৮, আঃ অঃ সংযুক্ত প্রদেশ—১৮৯·০৪, পাঞ্জাব—১২৬·৫ , ব্রহ্ম—১৮৮·১২, বিহার ও উড়িষ্যা—১৪৬·২৭, মধ্যপ্রদেশ—২১৯·৯৪, আসাম—১৭৯·১৬, উঃ পঃ সংযুক্ত প্রদেশ—১৪৮·৯০, আজমীর ও মাড়োয়ার—২৩৬·০২ কুর্গ—২১২·৩৫, দিল্লী—১৪২·৪৩, (বোম্বাই সহর—৬২৪, কলিকাতা—২৯৪)।

উপরি লিখিত বিবরণ অনুসারে দেখা যায়, গড়ে প্রতি হাজারে ১৭৮·২৮ টী ভারতীয় শিশু এক বৎসর কালের মধ্যেই মারা যায়। শুধু তাহাই নহে, বোম্বাই সহরে শতকরা ৬০ জনের অধিক এবং কলিকাতায় শতকরা প্রায় ৩০জন শিশু মারা যায়। 'কানপুর' ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসা-কেন্দ্র। তথায় শিশুমৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের বিবরণীতে বিলাতের বিভিন্ন অংশে হাজারকরা শিশুমৃত্যুর হার নিম্নলিখিতরূপ আছে—

লণ্ডনসহর—১১৮, গ্লাসগো—১১৯, এডিন্‌বার্গ—৮৯, লীডস্—১০২, বোর্ণমাউথ্—৪১। গ্লাসগো ও লণ্ডন সহরে মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইলেও ভারতের তুলনায় কিছুই নহে।

প্রতিবৎসর সমগ্র ভারতে ২০ লক্ষেরও অধিক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯২২-২৩ সালের আধা-সরকারী রিপোর্টে এ বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে—

It has been calculated that every year no fewer than two million Indian babies die ; while many of those who survive continue weak and feeble through unhygienic surroundings in their infancy. Indeed, although birth registration is still too inaccurate to make precise figures reliable, it may be sta-

ted with confidence that one in five, or perhaps even one in four, of the infants born in India dies within the first year of life. In crowded cities, particularly industrial cities, the rate is still higher.

সার মর্ম্ম—হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি বৎসর ২০ লক্ষের বেশী ভারতীয় শিশু মারা যায়; বাকি শিশুরাও জীবন্মৃতের মত কোন্ রূপে কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে মাত্র। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় বলিয়া তাহারা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ দুর্ব্বলতার আধার হয়। এখন পর্য্যন্ত জন্মের খুব বিশুদ্ধ হিসাব না পাইলেও, ইহা নিশ্চয় যে, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে (এমন কি প্রতি ৪ জনের মধ্যে) একজন শিশু এক বৎসর কালের মধ্যেই মারা যায়। ঘনবস্তি সহরে এবং বিশেষভাবে ব্যবসার কেন্দ্রগুলিতে শিশুমৃত্যুর হার আরও বেশী।

এই শেষোক্ত যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করিতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। ভারত, ইয়োরোপ ও আমেরিকার কয়েকটী বড় সহরের ও ব্যবসাকেন্দ্রের উদাহরণ দিলেই চলিবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর বড় বড় ৯টী সহরের হাজারকরা শিশুমৃত্যুর হার ছিল—খৃষ্টিয়ানা—৫৪, নিউইয়র্ক—৭১, লণ্ডন—৮০, হামবার্গ—৯৫, বার্লিন—১৩৫, কোলোন—১৪০, ভিয়েনা—১৫৬, বোম্বাই—৬৬৬, কলিকাতায়—৩৯২, কানপুর—৫৮০।

২

ভারতে শিশুমৃত্যুর হার ভয়াবহ, সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহার কারণ কি? আর প্রতিকারই বা কি? এ যে আমাদের জাতির জীবন-মরণ-সমস্যা।

আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর অসংখ্য কারণের মধ্যে মাত্র কতিপয় প্রধান কারণের উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। ধাত্রীবিদ্যা ও শিশু প্রতিপালন বিষয়ে মেয়েদের অজ্ঞতা।

২। সূতিকাগৃহের যথোচিত পরিচ্ছন্নতার অবহেলা।

৩। প্রসূতির উপযুক্ত খাদ্যাভাব জনিত দুর্ব্বলতা সন্তানের স্বাস্থ্যভঙ্গ করে।

৪। মাতাপিতার অজ্ঞতাপ্রসূত সংযমের অভাব।

৬। ব্যাধিগ্রস্ত মাতাপিতা ও সাধারণ সংক্রামক ব্যাধি।

৭। মাতার স্নেহপ্রবণতা অনেক সময় কর্ত্তব্যজ্ঞানকে ছাপাইয়া উঠে।

৮। সন্তানের প্রতি পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের ঔদাসীন্য।

৯। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব।

১০। সহরের ঘন বসতি, অপরিচ্ছন্নতা এবং বিশুদ্ধ জল বায়ুর অভাব।

এ-সব অসংখ্য অভাব-অভিযোগের মূল স্বরূপ তিনটী প্রধান কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে—

(ক) বাল্যবিবাহ।

(খ) (বিশেষ ভাবে) মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার অভাব।

(গ) জনসাধারণের দারিদ্র্য।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই তিনটী দোষের সংমিশ্রণেই আমাদের দুরদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে হইতেছে।

বিদেশী সরকার আমাদের অভিযোগ শুনিয়া আমাদের অভাব দূর করিতে কখনও আসিবে না। নিজের উদ্ধারের পথ নিজেদেরই আবিষ্কার করিতে হইবে। দেশের নেতৃস্থানীয় ২।১ জন দেশের চিন্তায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেও আমাদের দুঃখ দূর হইবে না, যদি, জন সাধারণ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের কথা না শুনে এবং একনিষ্ঠ ভাবে নিজেদের জন্য না ভাবে। সকলেরই ইহা বুঝা উচিত যে, শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করিতে না পারিলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাতিহিসাবে ভারতবাসীর ধ্বংস অনিবার্য্য। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয়ের জীবনীশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে। স্ত্রীপুরুষের সম্মিলিত ভাবে এই আসন্ন বিপদের করাল গ্রাস হইতে জাতিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করা উচিত নয়। এখনও প্রতিকারের চেষ্টা করিলে ফল পাইবার আশা করা যায়। কিছু দিন পরে প্রতিকারের আর কোনও উপায় থাকিবে না।

মেয়েদের চেষ্টাই শিশুমৃত্যুর হার কমাইবার পক্ষে অধিকতর কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমাদের দেশে, এরূপ একটা কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত অভিজ্ঞতা ও সাহস অতি অল্প স্ত্রীলোকের আছে। শুধু স্ত্রীলোকেরই বা বলি কেন? অন্যান্য দেশের তুলনায়

এ দেশে এরূপ উপযুক্ত পুরুষের সংখ্যাও মোটেই সন্তোষজনক নহে। ইহা জানিয়াও প্রধানতঃ দুই কারণে আমরা এবিষয়ে মাতৃজাতির উপরেই অধিকতর নির্ভর করিতেছি।

প্রথম কারণ এই যে, সন্তান প্রতিপালনের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ কাজ বাধ্য হইয়া মাতাকেই করিতে হয়; এবং পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসবশতই হউক অথবা ঈশ্বরদত্ত বিশেষত্বের জন্যই হউক, তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর ধৈর্য্যশীলতা ও কার্য্যকুশলতা দ্বারা দায়িত্ব সুপালন করিতে পারেন।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, সুযোগবশতঃ সাধারণ শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় পুরুষ নারীকে যেমন অতিক্রম করিয়াছে, তেমনি, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তাহাদের অধিকতর কর্ত্তব্যও রহিয়াছে। উপযুক্ত মহিলারা এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিলে, অন্ততঃ একটা কাজের দায়িত্ব-মুক্ত হইয়া পুরুষেরা অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইতে পারে।

আজকাল এ বিষয়ে উপযুক্তা ও উৎসাহিনী মহিলার খুব বেশী অভাব হইবে না বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য প্রয়োজনমত পুরুষের সাহায্য তো তাঁহারা পাইবেনই।

৩

এই শিশুমৃত্যুর জন্য মেয়েরা কতদূর দায়ী, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। মেয়েরা দৃঢ়সংকল্প হইয়া এ কাজে অগ্রসর হইলে নিশ্চয় শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। শিক্ষিতা মহিলারা সংঘবদ্ধ ভাবে সত্বর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। তাহা হইলে, অচিরে আমাদের এ মর্ম্মন্তুদ হতাশা দূর হইবে, সন্দেহ নাই।

শিশুমঙ্গলের দিকে মহিলাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ফলবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবল যে জাতিহিসাবে আমরা অনিবার্য্য ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইব তাহা নহে, সমগ্র নারীজাতিরও গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

সুসংঘ-বদ্ধ হইয়া মহিলারা শিশুমঙ্গলের জন্য অনেক কাজ করিতে পারেন। এখানে মাত্র ২।১টী কাজের কথা বলিতেছি—

১। মহিলারা ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের সন্তানের বাল্যবিবাহ রহিত করিতে পারেন। সাধারণতঃ আমাদের বাংলা দেশে ১০—১৫ বৎসরের মধ্যেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হয়। ২।১৩ বৎসরের মাতার অভিজ্ঞতা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানই বা কত হইবে, আর সন্তানের শারীরিক ও মানসিক শক্তিই বা কতটুকু আশা করা যায়। এই অল্প বয়সে মাতৃত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় মাতা ও সন্তান উভয়ের জীবনীশক্তি নষ্ট হয় এবং পরিণামে উভয়েই অসময়ে মারা যায়।

এই বাল্য-মাতৃত্বের দরুণ মাতা চিররোগিনী হয়, সন্তান নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে এবং এই বাল্য-মাতৃত্বের দরুণই ১৫-৩০ বৎসরের মেয়েরা সাধারণ মৃত্যুর হার হইতে শতকরা অন্যূন ৩০ জন অধিক হিসাবেই মরিয়া থাকে।

বাল্যবিবাহের জন্য মেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবার সময় পায় না। মেয়েদিগকে উপযুক্ত 'মা' তৈরী করিবার মত সুব্যবস্থাও আমাদের দেশে নাই। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব তো আছেই; তা'ছাড়া, পুস্তকাদিরও নিতান্ত অভাব। মাতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য মেয়েদের বিশেষ বিশেষ পাঠ্য-পুস্তক থাকা আবশ্যক।

অন্ততঃ ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কোন মেয়েরই বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মাতারা সাধারণতঃ তাঁহাদের মেয়েদের অতি অল্প বয়সে বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক থাকেন। তাঁহারা বাল্যবিবাহ শাস্ত্রের বিধান বলিয়া জানেন। যে শাস্ত্রে বাল্যবিবাহের কথা আছে, আবার সেই শাস্ত্রেই যৌবন বিবাহের কথাও লিখিত আছে। ইহা মনীষীরা বহুবার পরিষ্কার রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। অতএব, শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন হইবার ভয়ে যাঁহারা সঙ্কোচ বোধ করিতেন, তাঁহারাও এখন অনায়াসে নির্ভয়ে যৌবনবিবাহ প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। এই কুসংস্কার দূর হইলে মেয়েরা অন্ততঃ ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিয়া উপযুক্ত "মা" হইবার সুযোগ পাইতে পারে।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এখন পর্য্যন্ত অনেকের অন্ধবিশ্বাস রহিয়াছে যে, লেখাপড়া শিখিলে মেয়েরা অকর্ম্মণ্যা হইয়া যায়। তাহাদিগকে এখন আর আমরা কিছু বলিতে চাই না। শিক্ষিতা মহিলারাই এ বিশ্বাসের অযাথার্থ্য প্রমাণিত করিতেছেন ও করিবেন।

২। দেশের শোচনীয় আর্থিক সমস্যাও শিশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মাতা-পিতার আয়ের অনুপাতে শিশুমৃত্যু হারের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে। দরিদ্র পরিবারে খাওয়ার অভাবের সঙ্গে বসবাসের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রধানতঃ এই দুই কারণে দরিদ্র পরিবারে শিশুমৃত্যুর হার বেশী। (আবার দরিদ্র পরিবারে

হারও বেশী)। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য-বিভাগের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বাৎসরিক ৪৫০ ডলার (একডলার=৩৲০) আয় বিশিষ্ট পরিবারে প্রায়ই একাধিক ব্যক্তি একঘরে বাস করে; কিন্তু, বাৎসরিক ১২৫০ ডলার আয়-বিশিষ্ট পরিবারে প্রায়ই এক ব্যক্তি একাধিক ঘর ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত পরিবারে শিশুমৃত্যুর হার গড়ে, শেষোক্ত পরিবার অপেক্ষা, তিনগুণ বেশী। আমাদের দেশে জনপ্রতি বাৎসরিক আয় মাত্র ৩৷৷৩৬ টাকা। বাসস্থানের অভাব অভিযোগের তো অন্তই নাই। ডাক্তার বার্ণিসের মাতৃমঙ্গল বিবরণী (১৯২২ খৃঃ) হইতে জানা যায় যে, বোম্বাই সহরে মিল এরিয়ার মধ্যে ১৫×১২ ফিট ঘরে ছয়টী পরিবার পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। এরূপ ছয়টী পরিবারে প্রায় ত্রিশজন লোক থাকে। সেই একই ঘরে ছয়টী উনুন একসঙ্গে জ্বলিতে থাকে। শুধু তাহাই নহে, এই ক্ষুদ্রগৃহের ৩×৪ ফিট স্থান পর্দ্দা দ্বারা পৃথক করিয়া সূতিকাগার রূপে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দারিদ্র্য যে শিশুমৃত্যু ও অকালমৃত্যুর জন্য কতটা দায়ী—ইহা হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

দারিদ্র্য অনেক সময় সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের বাহন হয়। এ স্থলে আমাদের প্রয়োজনীয় একটীমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। বেহ, গর্ম্মী প্রভৃতি ঘৃণ্য সংক্রামক ব্যাধি দরিদ্রদের মধ্যেই প্রায় দেখা যায়। অন্ধ, খোঁড়া এবং অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত সন্তান দরিদ্র-গৃহেই প্রায় জন্মিয়া থাকে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেনসাস্ অনুসারে সমগ্র ভারতে প্রতি ১,০০,০০০ লোকের মধ্যে ১৫২ জন অন্ধ আছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই অন্ধদের অন্ততঃ অর্দ্ধেক শুধু মাতাপিতার পাপের ফল।

পুরুষ ও নারীর সমবেত চেষ্টা ভিন্ন এই সর্ব্বগ্রাসী সোস্যাল ইভিল মহাপাপকে দেশ হইতে দূর করা অসম্ভব।

৪

প্রতি বৎসর, গড়ে প্রায় তিন লক্ষ শিশু শুধু বাংলা দেশেই মারা যায়। বাংলার হাজারকরা প্রায় ৩০০ শিশু জন্মের বৎসর কাল মধ্যে ভবলীলা শেষ করে।

সাধারণতঃ—বীরভূম, কলিকাতা, বর্দ্ধমান ও খুলনা জেলায় শিশুমৃত্যুর হার হাজার-করা ৩০০-৪০০ পর্য্যন্ত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের স্বাস্থ্যবিভাগের বিবরণে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য লিখিত হইয়াছে—

In existing circumstances, infantile death-rates as low as these indicate carelessness in reporting rather than satisfactory state of health, and serve to reflect the apathy with which public health problems are still regarded in many quarters. Much of the excessive infantile mortality of the province is undoubtedly due to ill-health of the mothers and other anti-natal causes. Investigation has shown for example, that about 70 percent of the infants that die do not live a month; and of these twothirds die within a week of birth. It is probable that of the remainder a larger proportion die of tetanus neonatorum. Owing to the fact that breast-feeding is resorted to in the large majority of cases, infantile diarrhoea is not such a frequent cause of death in the succeeding months as in western countries. On the other hand, there are grounds for believing that when a mother dies during the infancy of her child, the chance of the latter surviving is highly precarious. There are indications that measures for reducing infantile mortality must first aim at providing better care for the mothers before, during and immediately after child birth."

সার মর্ম্ম:—বর্ত্তমান ব্যবস্থায় শিশুমৃত্যুর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা খুব বিশুদ্ধ হিসাব নহে। এরূপ হিসাব দেখিয়া বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলার শিশুমৃত্যুর হার ইহা অপেক্ষা আরও বেশী। অনেক স্থলে, স্বাস্থ্যবিভাগের প্রতি লোকের ঔদাসীন্যও এইরূপ অবিশুদ্ধ হিসাবের অন্যতম কারণ।

মাদকালের মধ্যে মৃত শিশুদের শতকরা ৭০ জনের জন্য মাতার ভগ্ন স্বাস্থ্যই দায়ী এবং বাকি ৩০ জনের মধ্যে অধিকাংশই ধাত্রীর দোষে বা গর্ভাবস্থার কোন দোষে মারা যায়। আমাদের দেশে শিশু সাধারণতঃ মাতৃস্তন পান করে বলিয়া পরবর্ত্তী মাস সমূহে অন্যান্য দেশের তুলনায় পেটের পীড়া হইতে কম শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। অন্যদিকে

দৈবক্রমে প্রসবের পর মাতার মৃত্যু হইলে শিশুকে বাঁচান প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সব কারণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, শিশুর জীবনধারণের পক্ষে মাতার স্তনই প্রশস্ত। অতএব, শিশুমৃত্যুর হার কমাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে গর্ভাবস্থা হইতে প্রসবের পর অন্ততঃ একবৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রসূতির বিশেষ যত্ন নেওয়া আবশ্যক।

"কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে" লণ্ডন ও কলিকাতা সহরের তুলনামূলক একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে দেওয়া গেল—

(১৯২৩ খৃঃ)

লণ্ডন	কলিকাতা
লোক সংখ্যা ৪৪,৪২,৫২৩	১০½ লক্ষ।
আয়তন ১১৭ বর্গমাইল।	৩০½ বর্গমাইল।
মোট জন্ম ৯১, ৬৬২	১৮,২১২
মোট মৃত্যু ৫১,১৯১	২৬,৩৮১
হাজারকরা মৃত্যু ১১·৪	২৮·৫
মোট শিশুমৃত্যু ৫,৬১৫	৫,৩৬৬
হাজারকরা শিশুমৃত্যু ৬১	২৯৪

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, কলিকাতায় লণ্ডন অপেক্ষা মোট মৃত্যু সংখ্যা ২½ গুণ বেশী এবং শিশুমৃত্যু প্রায় পাঁচগুণ বেশী।

পাশ্চাত্য দেশে মাত্র ১৯১০ বৎসর আগে শিশুমঙ্গলের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ ভাবে সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা হয়। এই কয়েক বৎসরের যত্নে তথাকার কোন কোন স্থানে হাজারকরা ৪০টীরও কম শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। সন্তান সম্ভাবনা হইবামাত্রই দরিদ্র পরিবারের প্রসূতিকে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বৎসরের পর বৎসর আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে। মিস্ এ, এইচ্, কেলম্যান তাঁহার "ভারতীয় শ্রমিক" বিবরণীতে দেখাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা এ দেশে প্রসবকালে বা প্রসবের ঠিক পরেই ৬।৮ গুণ বেশী প্রসূতির মৃত্যু হয় এবং প্রতি ৫টী শিশুর মধ্যে ২।৩টীর মৃত্যু হইয়া থাকে। মিস্ মেরী ম্যাকেথার কথায় বলিতে গেলে, সত্যসত্যই আমাদের মেয়েরা তিন-টানায় পড়িয়া অকালে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হয়। সন্তান ধারণ, মজুরী অর্জ্জন, এবং গৃহস্থালী এই তিনটী গুরুভারের চাপে পড়িয়া মেয়েরা দিবারাত্রি সমভাবে নিষ্পিষ্ট হইতেছে। একটু বিশ্রাম লইবার তাহাদের সময় নাই। এমন মাতারও সুস্থতা আশা করা যায় কি? এরূপ মাতার সন্তান মরিবার জন্যই যে জন্মিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমাদের দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা মোটেই সন্তোষ-জনক নহে। বাংলাদেশে অন্যূনাধিক ৪৫০ কোটী লোকের বাস। শুনিয়া হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন যে, মাত্র অন্যূনাধিক ৪ হাজার চিকিৎসক এই বাংলাদেশে আছেন। তার মধ্যে নামেমাত্র ডাক্তার-কবিরাজও অনেকে আছেন। প্রসবের সময়ে এবং অন্যান্য প্রয়োজনের সময়ে গ্রামে ও সহরে উপযুক্ত ডাক্তারী সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দেখাইলে কেমন ফল পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইলে শীঘ্রই সুফল পাওয়া যাইতে পারে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে এবং যথোপ-যুক্ত খেলার মাঠ ইত্যাদি না থাকায় সহরের বালকবালিকা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় ও তেজোহীন হয়। আশার কথা এই যে, নেতৃবৃন্দের এবিষয়ে অবধান আকৃষ্ট হইয়াছে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য (direct suggestion) এই—সমগ্র ভারতের (প্রায় ৫ কোটী বিধবার) কথা ছাড়িয়া দিলেও, কেবলমাত্র বাংলাদেশেই মোট ৯,৪৫২,৮৩৩ জন বিধবা মহিলা আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একদশমাংশ বিধবা পাওয়া যাইবে যাঁহারা কার্য্যক্ষম, পুনরায় বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক এবং নিঃসন্তান। বলিতে গেলে, সংসারের কোন দায়িত্ব তাঁহাদের নাই। এমন কি, শুধু নিজের ভরণপোষণের জন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে বাধ্য হন। অন্ততঃ তাঁহারা সুসংঘবদ্ধ ভাবে এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে, অথবা তাঁহাদিগকে এরূপ কাজের জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ ও ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইলে, এইসব অনাদৃত বিধবারা স্বাধীনভাবে জীবন অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে স্বদেশের ও স্বজাতির সেবা করিয়া জীবনের সার্থকতা প্রমাণিত করিতে পারেন। তখন জনসাধারণ তাঁহাদের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

হাইকেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবারণ মনমথের মাসতুতো ভগিনীর স্বামী। নিবারণের স্ত্রী রমা তাহার শাশুড়ীর সহিত কলহ করিয়া কুলত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। নিবারণ বেচারা স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালো বাসে; সে প্রেয়সী স্ত্রীকে আদর করিয়া নাম দিয়াছিলো প্রেয়সী; সেই প্রেয়সীকে হারাইয়া ব্যথিত হৃদয়ে সে তাহার অনেক সন্ধান করিয়াছে, কিন্তু কোথাও সে তাহার উদ্দেশ পায় নাই। সে স্ত্রীকে এতো বেশী ভালো বাসে যে সে কুলটা স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া তাহার সুমতি ও প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ক্ষণিক ক্রোধের উত্তেজনায় অথবা শাশুড়ীর অবিচারে অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া সে যদি ভুলক্রমে একটা অপকর্ম করিয়া ফেলিয়া থাকে তবে তাহার আর মার্জনা নাই, তাহার স্বামী গৃহ ও স্নেহ হইতে তাহার চিরনির্ব্বাসন হইবে, তাহার একবার পদস্খলন হইয়াছে বলিয়াই তাহাকে অধঃপাতের অতল পঙ্কতলে নিমজ্জিত হইয়াই থাকিতে হইবে, এমন মনোভাব নিবারণের নহে। মানুষের জীবন পাপ-পুণ্যের সংগ্রামক্ষেত্র; পাপের কাছে চিরপরাজয় স্বীকার যে করে সে মানবাত্মার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করে, ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করে; এইরূপ ধারণার বশেই নিবারণ কুলত্যাগিনী পত্নীর স্বধর্ম্মে পাতিব্রত্যের পথে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য এমন উৎসুক ও সচেষ্ট হইয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলো, এবং কোনো উদ্দেশ না পাইয়াও হতাশ হইয়া বা বিরক্ত হইয়া বিরত হয় নাই। তাহার মনের এই সঙ্কল্প সাধারণ সমাজের নিতান্ত বিরোধী; সেখানে নারী যেনো মাটির প্রতিমা—'একদিন তার পূজা হয়ে গেলে চিরদিন তার বিসর্জন!' যতক্ষণ সেই মৃন্ময়ী প্রতিমা নিখুঁৎ পবিত্র থাকে, ততোদিন তাহার পূজা হয়, কিন্তু কোনো অঙ্গ একটু ভগ্ন হইলে বা কোনো প্রকার কল্পিত অশুচিতা সেই দেবীপ্রতিমাকে স্পর্শ করিলে তাহার আর পূজা করিবার জো থাকে না, তাহাকে জলে বিসর্জন করিতে হয়। এইজন্য নিবারণ আপনার অসাধারণ ও অভিনব সঙ্কল্প নিজের মনের মধ্যেই গোপন রাখিয়া পথভ্রষ্টা পত্নীর সন্ধানে নিজের সময় সামর্থ্য ও অর্থ নিযুক্ত করিয়াছিলো। তাহার বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনেরা ভাবিয়া স্থির করিয়া লইয়াছে নিবারণ পত্নীবিরহে নিজের চরিত্র কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে, সে নির্লজ্জের ন্যায় বারবনিতার পাড়ায় ও বাড়ীতে যখন-তখন গতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। তাহার হিতৈষীরা তাহাকে নিন্দা করিয়াছে, ধিক্কার দিয়াছে, ভর্ৎসনা করিয়াছে, উপদেশ দিয়াছে; মাতা শুনিয়া চোখের জল ফেলিয়া পুত্রকে সেই সর্ব্বনাশীর জন্য নিজের সর্ব্বনাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আবার চাঁদপানা লক্ষ্মীর মতন বধূ বরণ করিয়া গৃহে আনিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, পুত্রকে প্রলোভন দেখাইয়াছেন; কিন্তু নিবারণ নীরবে সকল অনুযোগ সহ্য করিয়াছে, কাহারো কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই, স্বচরিত্রের মিথ্যা কলঙ্ক ক্ষালন করিতে চেষ্টা করে নাই, অপবাদের প্রতিবাদ করে নাই, নিজের সঙ্কল্পও ব্যক্ত করে নাই।

আজ নিবারণ থিয়েটারের প্লাকার্ডে তাহার স্ত্রীর নাম দেখিয়া যেমন মর্ম্মাহত তেমনি আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলো। শ্রীমতী প্রেয়সী দেবী বিরাজ-বৌ সাজিয়া অভিনয় করিবে। এই সংবাদ পাঠ করিয়া নিবারণের হৃদয় হর্ষবিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলো; দুশ্চরিত্র পুরুষদের সঙ্গে থিয়েটারে অভিনয় করা দেবীর প্রেয়সী গতি নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু যাহাকে সে এতদিন নিজের নিন্দা গ্লানি অগ্রাহ্য করিয়া অস্থানে কুস্থানে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে তাহার সন্ধান পাইয়া সে তুষ্ট না হইয়াও থাকিতে পারে নাই। সে আদর করিয়া গোপনে স্ত্রীকে যে নাম দিয়াছিলো সেই নামের অমর্য্যাদা করিয়া তাহার স্ত্রী এখন সেই নামে সকলের নিকট পরিচিত হইতেছে! ইহাতে নিবারণ ব্যথিত হইলেও এই ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা করিলো যে প্রেয়সী নামে এক সে ছাড়া আর কেউ তাহার আসল পরিচয় পাইবে না। নিবারণ থিয়েটারের

লোকেদের কাছে অনেক বিদ্রূপ ও ভৎর্সনা সহ্য করিয়া অনেক কষ্টে তাহাদের নূতন স্টেজ অভিনেত্রী শ্রেয়সী দেবীর বাসস্থানের ঠিকানা সংগ্রহ করিলো। সে গিয়া দেখিলো সুন্দরী অভিনেত্রীর বাড়ীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎকামী ধনীদের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে; কিন্তু থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত দারবান কাহাকেও প্রবেশের অনুমতি দিতেছে না। সকলে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলে নিবারণ হতাশ-হৃদয়েই সঙ্কল্প করিলো ব্যর্থতা নিশ্চয় জানিলেও সেও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। দারবানকে মোটা বক্‌শিশ কবুল করিয়াও যখন সে প্রবেশের অনুমতি পাইলো না তখন সে মরণাধিক লজ্জার মাথা খাইয়া দারবানের কাছে প্রকাশ করিলো যে এই বারবনিতা একদিন তাহারই বনিতা ছিলো; সে তাহাকে আবার তাহার স্বগৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে আসিয়াছে। নিবারণের এই স্বীকারোক্তি যদিও থিয়েটারের কর্তৃপক্ষদের স্বার্থবিরোধী, তথাপি দারবান নিবারণের কাহিনী শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহার নিকট হইতে পঞ্চাশটি টাকা পারিতোষিক লইয়া তাহাকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিলো। কিন্তু এইখানেই নিবারণের লাঞ্ছনার অবসান হইলো না। প্রবেশ ভিক্ষা করিতে করিতে দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছিলো; দাসীকে পারিতোষিক দিয়া বশ করিয়া যখন বাড়ীর কর্ত্রীর নিকটে পাক্ষাতের প্রার্থনা পাঠাইতে পারিলো তখন তিনি আহারাদি করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন, আজ রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে। নিবারণ অক্লুক্ত অজ্ঞাত অবস্থায় দারবানের দরার পাশে একখানা টুলের উপর বসিয়া ঢুলিতে লাগিলো। বেলা সাড়ে তিনটার পর দাসী আসিয়া সংবাদ দিলো কর্ত্রীর ঘুম ভাঙিয়াছে। নিবারণ নিজের অপমানের লজ্জায় ও ব্যথায় অভিভূত হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে যখন শ্রেয়সীর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলো তখন সে দেখিলো শ্রেয়সী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া নূতন রূপার ফরসীতে সোনালি আলবোলা লাগাইয়া তামাক খাইতেছে। সে স্বামীকে সমাগত দেখিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত না হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলো—ও তুমি! আমি মনে করি কে নিবারণ এসেছে। একেবারে পতিদেবতার শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য যে আমার হবে এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নি! আসতে আজ্ঞা হোক। কি মনে করে'? কিন্তু আমার দর্শনী এখন এক শো টাকা শুনেছো বোধ হয়। এই কথা বলিয়াই শ্রেয়সী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলো।

নিবারণ দেখিলো তাহার স্ত্রীর ঘরে ঐশ্বর্যের চিহ্ন বিবিধ আসবাব সুসজ্জিত আছে, সে কুলনারীর শালীনতা একেবারে বিসর্জন দিয়া অভব্যতায় বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে তাহার অনেক অনাচারের ফল তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিবারণের হৃদয় বেদনায় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইলো। সে স্ত্রীর রসিকতার কোনো উত্তর না দিয়া ম্লান মুখে বাষ্পিত স্বরে বলিলো—তুমি চলে' আসা অবধি আমি তোমাকে পাগলের মতন খুঁজে বেড়াচ্ছি! নরককুণ্ড আমার বিচরণক্ষেত্র হয়েছে, লোকনিন্দা আমার অঙ্গের ভূষণ হয়েছে, লোকের ঘৃণা তিরস্কার বিদ্রূপ আমার পুরস্কার হয়েছে, তবু আমি তোমার সন্ধান থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে পারি নি।

শ্রেয়সী আশ্চর্য্য হইয়াও ব্যঙ্গভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করিলো—কেনো, এতো দরদ কিসের জন্যে?

নিবারণ বলিলো—তুমি আমার স্ত্রী, তোমায় আমি ভালো বাসি, তোমায়……

শ্রেয়সী উচ্চরবে হাস্য করিয়া বলিলো—বাঃ! তুমি তো তোফা থিয়েটার করতে পারো? ঢুকে পড়ো আমাদের থিয়েটারে! দুজনে একসঙ্গে প্রেমের অভিনয় করা যাবে! রাজী হও তো বলো, আমি ম্যানেজারের কাছে সুপারিশ করে' দেবো!

নিবারণ স্ত্রীর নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া বলিলো—তুমি এমন কঠিন হয়ো না, ফিরে চলো, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি!

শ্রেয়সী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলো—আমি এই সুখৈশ্বর্য্য ছেড়ে দিয়ে যাবো সেই বুড়ী মাগীর কাঁচা নাথি খেতে! রাজা অলীক মল্লিক আমাকে রাখবার জন্যে সাধ্য-সাধনা করছে, তাই রাজী হই নি, তো তোমার কুঁড়ে ঘরে যাবো কোন্ সুখের লোভে?

নিবারণ কাতর স্বরে বলিলো—সুখের লোভে নয়, ধর্ম্মের লোভে, মনুষ্যত্বের লোভে……

শ্রেয়সী বিদ্রূপভরা স্বরে বলিলো—বাঃ! তুমি যে একেবারে ব্রাহ্ম হয়েছো দেখছি! দাড়ি রেখে ফেলো।

নিবারণ স্ত্রীর লঘুতায় ব্যথাতুর হইয়াও শেষ চেষ্টা করি-

যার জন্ত তাহার হাত ধরিয়া বলিলো—তোমার হাতে ধরে' অনুনয় কর্‌ছি, তুমি একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখো·····

নিবারণ যখন স্ত্রীর হাতে ধরিয়া অনুনয় করিতেছিলো তখন সে মুচকি মুচকি হাসিয়া আল্‌বোলার ঞ্চপার মুখনল দিয়া ঠেলিয়া কলিকার উপরের প্রতপ্ত সরপোষটা গড়াইয়া স্বামীর হাতের উপর ফেলিয়া দিলো, এবং নিবারণ দগ্ধ হইয়া চমকিত ভাবে স্বার হাত ছাড়িয়া হাত সরাইয়া লইতেই প্রেয়সী পরম কৌতুকভরে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলো।

নিবারণ স্ত্রীর এই নির্ম্মম ব্যবহারে যে জ্বালা অনুভব করিলো তাহার তুলনায় তাহার হাতের জ্বালা সামান্ত বোধ হইলো। সে হতাশ হইয়াও শেষ চেষ্টা স্বরূপ বলিলো—তুমি আমার অনুরোধটা একটু ভেবে চিন্তে দেখো। আমি একদিন মলয়কে নিয়ে·····

মলয়ের নাম শুনিয়াই প্রেয়সী অত্যন্ত ত্রস্ত ও ব্যস্ত হইয়া বলিলো—না না, তুমি দাদাকে এই নরককুণ্ডে নামিয়ে এনো না··· আমি তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বো না.....

নিবারণ স্ত্রীর কথা শুনিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিলো—যাক, একটা জায়গা এখনো তাহার কোমল আছে, একজনের উপর এখনো তাহার দরদ ভক্তি শ্রদ্ধা আছে! সে আর কোনো কথা না বলিয়া স্ত্রীর কক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলো।

নিবারণ চলিয়া যাইতেই প্রেয়সীর কৃত্রিম প্রফুল্লতা ও নির্ম্মমতার মুখোস খসিয়া পড়িলো, সে তাকিয়ার উপর ম্লান মুখ চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলো—মেয়েমানুষ মাটির বাসন, ছুঁড়ে ফেলে আর কি তাকে ঘরে তোলা যায়! তুমি এখনো আমাকে ভোলো নি? আমি কতো দিন ভেবেছি আমার আবার সতীন হয়েছে, তুমি তাকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর্‌ছো! এই পাপিষ্ঠাকে তুমি এতো ভালো বাসো!·····দাদা আমাকে কী ভাব্‌ছেন! তিনি আমাকে যে আদর করে শ্রী বলে' ডাকতেন·····আমি যে তাঁর বড়ো আদরের বোন ছিলাম!·····উনিও আমাকে আদর করে' প্রেয়সী বলে' ডাকতেন! ·····দূর হোক সে ছাই ও-সব স্বপ্নের কথা!. এখন আমি কতো লোকের প্রেয়সী!·····

প্রেয়সী পাগলের মতন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলো। সেই রাত্রে প্রেয়সীর অভিনয় এমন স্বাভাবিক হইলো যে তাহার প্রশংসায় সহর সরগরম হইয়া উঠিলো।

নিবারণ প্রেয়সীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একেবারে মলয়ের কাছে গেলো। নিবারণকে দুশ্চরিত্র মনে করিয়া সকলে ঘৃণা করিতো, মলয় ঠিক ঘৃণা করিতো না—অনুকম্পা করিতো। কিন্তু আজ যখন নিবারণ লজ্জিত কুণ্ঠার সহিত তাহার নিকট নিজের আচরণের কারণ প্রকাশ করিয়া বলিলো তখন নিবারণের প্রতি শ্রদ্ধায় ভালো বাসায় মলয়ের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলো। সে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলো নিবারণের জন্ত, প্রেয়সীকে সৎপথে আনিবার জন্ত সে প্রেয়সীর বাড়ীতে গিয়া তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ত অনুরোধ করিবে।

নিবারণ মলয়ের প্রীতির পরিচয় পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া বলিলো—আর তুমি তো অনেক উকীল এটর্ণীকে চেনো; কাউকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারো আইনের বলে পলাতকা পত্নীকে আয়ত্ত কর্‌তে পারা যায় কি না। হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন তো অচ্ছেদ্য, অন্ত ধর্ম্মের বিবাহের মতন তো একটা সাময়িক চুক্তি নয়!

মলয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিয়া বলিলো—আমাদের এই পাশের বাড়ীতেই আমার এক বন্ধু ব্যারিষ্টার আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে' দেখ্‌বো। তার পর না হয় তাঁকে দিয়েই আপর কোনো বড়ো ল-ইয়ারকে কন্‌সাল্‌ট্ করাবো, আমি নিজে কাউকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো না।

নিবারণ বিদায় লইবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলো—দেখো, এ কথা যেনো বৌদিদিও না জান্‌তে পারেন।

মৃদুলা জলখাবার লইয়া ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলো, নিবারণের মুখে তাহার নামের উল্লেখ শুনিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইলো। সে শুনিলো নিবারণের কথার উত্তরে মলয় বলিলো—নিজের কলঙ্কের কথা কেউ কি কখনো প্রকাশ করে?

মৃদুলা নিবারণের দুশ্চরিত্রতার কুখ্যাতি শুনিয়াছিলো। তাহার পর আজ নিবারণের ও স্বামীর কি একটা কলঙ্কের কথা তাহার নিকট হইতে লুকাইবার প্রয়াসের পরামর্শ শুনিয়া মৃদুলার মন অনিশ্চিত সন্দেহে পূর্ণ হইয়া উঠিলো। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার আর পা উঠিতে চাহিলো না।

নিবারণ ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতে মলয় বলিলো—বোসো, একটু জল খেয়ে যাও।

নিবারণ যাইতে যাইতে বলিয়া গেলো—না, এখনো

আমার মান করা হয় নি, সমস্ত দিনের সঞ্চিত অশুচিতা না ধুয়ে ফেলে কিছু মুখে দিতে রুচবে না।

মৃদুলা জানিতে পারিলো যে নিবারণ বাহিরের দরজা দিয়া চলিয়া গেলো, তখন সে জোর করিয়া ভূমিসংলগ্ন পা তুলিয়া পাশের দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে গম্ভীর বিমর্ষ মুখে প্রবেশ করিলো। মলয় তখন ঘর হইতে বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য সেই দরজার দিকেই অগ্রসর হইতেছিলো। সে মৃদুলার সম্মুখীন হইয়াই তাহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া থতোমতো খাইয়া বলিয়া উঠিলো—নিবারণ চলে' গেছে।

স্বামী যে তাহাকে দেখিয়া থতোমতো খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া গেলো ইহা লক্ষ্য করিয়া মৃদুলা অধিকতর সন্দিগ্ধহৃদয়ে ঘর হইতে ফিরিয়া বাহির হইয়া আসিলো।

• • • •

সেই দিনই সন্ধ্যার পর মলয় অনন্তের কাছে গেলো। অনন্ত খাতির করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলো—আসুন মলয়-বাবু। বেড়াতে বেরোন নি?

মলয় আসনে উপবেশন করিয়া বলিলো—না, আজ আর বেড়াতে যাওয়া হয় নি।.....একটা বিশেষ পরামর্শের জন্য আপনার কাছে এলাম.....

অনন্ত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলো—কিসের পরামর্শ?

মলয় একটু কুণ্ঠিত লজ্জিতভাবে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলো—আপনাকে আমি বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে'ই মনে করি.....

অনন্ত উৎসাহের সহিত বলিলো—এ কথা ব্যক্ত করে' আমাকে শোনাচ্ছেন এতেই আমি চরিতার্থ হচ্ছি মলয়-বাবু! আপনার বন্ধুত্ব লাভ আমার জীবনের একটি মহৎ সৌভাগ্য!

মলয় অনন্তের কথায় তুষ্ট হইয়া বলিলো—আপনি আমাদের পরিবারের অনেক সংবাদই জানেন...

অনন্ত বলিয়া উঠিলো—এই আত্মীয়তার সৌরব আপনারাই আমাকে দিয়েছেন!

মলয় বলিতে লাগিলো—তাই একটি বিশেষ গোপনীয় লজ্জার কথা আপনার কাছে.....

মলয় যে কী বলিতে চাহিতেছে তাহা আন্দাজ করিতে না পারিয়া অনন্ত অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলো—আপনি স্বচ্ছন্দে অসঙ্কোচে আমাকে বলুন, আপনার যেটা গোপনীয় সেটা আমারও গোপনীয় জান্‌বেন।

মলয় ঢোক গিলিয়া বলিতে লাগিলো—আপনি নাট্যমন্দিরে বিরাজ-বৌ অভিনয়ের বিজ্ঞাপনটা দেখেছেন...

অনন্ত বলিয়া উঠিলো—হ্যাঁ, কে এক নতুন অ্যাক্‌ট্রেস্ প্রেয়সী দেবী বিরাজ-বৌ সাজ্‌ছে।

মলয় মুখ নত করিয়া বলিলো—সে আমাদের আত্মীয়া... সম্পর্কে সে আমার.....

অনন্ত অত্যন্ত উৎসুক ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াও বাহ্যিক উদাসীনতা দেখাইয়া বলিলো—ও সে সব্বী মলয়-বাবু! থাক সব কথা না হয় নাই বল্‌লেন.....

মলয় লজ্জিত মলিন মুখ তুলিয়া বলিলো—না, সব কথাই আপনার শোনা দরকার।.. প্রেয়সীর আসল নাম রমা; সে এখন নাম ভাঁড়িয়ে প্রেয়সী নাম নিয়েছে। রমা সম্পর্কে আমার বোন হয়; রমার স্বামী নিবারণ আমার বিশেষ প্রিয় বন্ধু। রমা শ্বশুর-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু নিবারণ এখনো তাকে পুনর্গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত আছে। কিন্তু রমা ফিরে আস্‌তে সম্মত হচ্ছে না। আচ্ছা, এ রকম কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে তার স্বামী কি আইনের বলে আয়ত্ত কর্‌তে পারে না?

অনন্ত এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলো; কিন্তু সে মনের আনন্দ যথাসম্ভব দমন করিয়া বলিলো—এখনই অত-ছাও তো কিছু বল্‌তে পারছি না, হিন্দু-ল দেখে বল্‌তে হবে। আমি বরং এই লিগ্যাল্ পয়েন্ট্‌টা আরো দু-চার-জনের সঙ্গে কন্‌সাল্‌ট্ করে' দেখ্‌বো।

মলয় বলিলো—নিবারণ বল্‌ছিলো, আমি অনুরোধ কর্‌লে রমা হয়তো শুন্‌লেও শুন্‌তে পারে। এককালে সে আমার খুব বাধ্য অনুগত ছিলো, এখনো নাকি সে আমাকে শ্রদ্ধা করে...

অনন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিলো—তা হলে তো একদিন আপনি গেলেই সব মীমাংসা হয়ে যায়।

মলয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলো—কিন্তু ঐ-সব জায়গায় যেতে মন সরে না.....

অনন্ত বলিয়া উঠিলো—তা কি কর্‌বেন বলুন! অন্ এ মোবল্ মিশন আপনি যাচ্ছেন—কোন পাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তো যাবেন না।

মলয় বলিলো—তার চেয়ে আমি চিঠি লিখ্‌লে কেমনহয়?

অনন্ত পরম উৎসাহিত হইয়া বলিলো—এ অতি উত্তম

প্রস্তাব। আপনি চিঠি লিখে আমাকে দিন; আমি বরং নিজে সেই চিঠি নিয়ে যাবো। আপনার চিঠিতে যতোখানি ফল হবার তা তো হবেই, যদি কিছু বাকী থাকে আমি ব্যারিষ্টার বলে' পরিচয় দিয়ে তাকে মামলা-মকদ্দমার ভয় দেখিয়ে ফিরে আসতে ঠিক রাজী করিয়ে আসবো।

মলয় অনন্তের প্রস্তাব সমীচীন মনে করিয়া বলিলো—এ-কথা মন্দ নয়।

অনন্ত মলয়কে আর অন্য কথা ভাবিবার অবসর না দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে চিঠির কাগজ খাম ও ফাউণ্টেন-পেন রাখিয়া দিলো। মলয় মাথা নত করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলো। অনন্তর মুখ কুটিল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া সয়তানের মুখের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিলো।

মলয় প্রেয়সীকে এই চিঠি লিখিলো—

প্রেয়সী,

নিবারণের কাছ থেকে তোমার সন্ধান পেলাম। তুমি এতো নিষ্ঠুর হৃদয়হীনা তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। সামাজিক শাস্ত্র ধর্ম নীতি প্রভৃতির কথা না হয় নাই তুললাম; কিন্তু তোমাকে পাবার জন্যে যে লোক এমন ব্যাকুল হয়ে তোমাকে প্রার্থনা করছে তাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারছো কোন্ প্রাণে? একদিন তুমি আমাকে ভালো বাসতে, আমার কথার বাধ্য ছিলে; আমার এই বিনীত অনুরোধও শোনো, আবার তুমি প্রেমের সম্মান রক্ষা করো। তোমার সম্মতিসূচক অনুকূল উত্তরের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে রইলাম জানবে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

মলয় চট্টোপাধ্যায়

মলয় চিঠি লিখিয়া খামের মধ্যে ভরিয়া খামের উপর শিরোনামা লিখিলো এবং তার পর সেই চিঠি অনন্তর হাতে দিলো।

অনন্ত চিঠি লইয়া বলিলো—আমি ভেবে দেখলাম, আপনার চিঠি ডাকে যাওয়াই ভালো। কি উত্তর আসে দেখা যাক। যদি অনুকূল উত্তর না আসে, তখন বরং আমি গিয়ে চেষ্টা দেখবো; প্রথমেই ভয় দেখিয়ে কাজ নেই—ভড়কেও যেতে পারে, আবার বিদ্রোহ করে ডিফায়ান্ট অ্যাটিচিউডও ধরতে পারে। আপনি কি বলেন?

অনন্ত মলয়ের পত্রবাহক হইয়া প্রেয়সীর কাছে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে মলয়ের মনে ঈষৎ সন্দেহ উঁকি মারিতেছিলো যে অনন্ত বোধ হয় মলয়ের পরিচয়-পত্র অবলম্বন করিয়া মুহূর্লভা প্রেয়সীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ সন্ধান করিতেছে। কিন্তু অনন্তর এই কথাতে মলয়ের সে সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া গেলো; বরং সে যে মনের কোণেও অনন্তর প্রতি সন্দেহকে স্থান দিয়াছিলো তাহার জন্য সে লজ্জিত অনুতপ্ত হইয়া যেনো ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ লাভের আগ্রহের সহিত বলিলো—আমি সম্পূর্ণই আপনার পরামর্শের অধীন। আপনি যা ভালো বিবেচনা করেন তাই করুন।

অনন্ত খুতু দিয়া চিঠির খাম বন্ধ করিয়া ডাকিলো—বয়!

অনন্তর ভৃত্য আসিয়া ঘরে দাঁড়াইলো।

অনন্ত ভৃত্যের হাতে চিঠিখানা দিয়া বলিলো—এই চিঠিটি আজি ডাক-বাক্সে ছেড়ে দেও।

ভৃত্য পত্র লইয়া প্রস্থান করিলো।

অনন্ত মলয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলো—কাল সকালেই এ চিঠি সে পেয়ে যাবে।……এক্সকিউজ মি প্লিজ, এক মিনিট……

বলিতে বলিতেই অনন্ত চট করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলো।

অনন্ত বাহিরে গিয়াই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহার ভৃত্যকে পথে থামাইয়া বলিলো—চিঠিটা দেও তো… উসমে আউর থোড়া বাত লিখনে হোগা…কাল ভেজেগা… আভি তোম আপনা কাম করো যাকে…

ভৃত্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলো।

অনন্ত সদ্যজোড়া ভিজা খামের চাকনি সন্তর্পণে খুলিয়া ফেলিলো এবং তাহা খুলিয়া রাখিয়াই উপরে লইয়া গিয়া একটা বাক্সের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলো।

সে বৈঠকখানা-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলো—সরী, আপনাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলাম……

মলয় বলিলো—না, তাতে কি। তবে আমি এখন যাই। আপনাকে আর মৌখিক ধন্যবাদ দেবো না। আমার আর নিবারণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আপনি পাবেন যদি এই কুশ্রী ব্যাপারের একটা কূলকিনারা দেখিয়ে দিতে

পারেন।···ব্যাপারটা খুব গোপনে রাখবেন। এমন কি মৃদুলও যেনো না জানতে পারেন।···

অনন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলো—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা ল-ইয়ার, লোকের সিক্রেটস্ নিয়েই আমাদের কারবার!

মলয় আশ্বস্ত হইয়া বলিলো—"তা বটে!" এবং সে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলো।

মলয় চলিয়া যাইবামাত্র অনন্ত তিন লাফে উপরে গিয়া মলয়ের লেখা চিঠিখানা বাক্স খুলিয়া বাহির করিলো এবং তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া তাহা পড়িয়া লইলো এবং তাহার পরে তাহারই যে কলম দিয়া মলয় সেই চিঠি লিখিয়াছিলো সেই কলম দিয়া চিঠির মধ্যকার "মামুলি শাস্ত্র ধর্ম নীতি প্রভৃতির কথা না হয় নাই তুলিলাম; কিন্তু" কথাগুলির উপর কালির আঁচড় কাটিয়া কাটিয়া সেগুলিকে বেমালুম করিয়া ঢাকিয়া ফেলিলো। এবং সম্বোধনের শ্রেয়সী শব্দের তালব্য-শ'টাকে প অক্ষরে রূপান্তরিত করিয়া দিলো। তাহার পর আবার চিঠির খামের মধ্যে চিঠি ভরিয়া খাম আঠা দিয়া আঁটিয়া বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলো।

• • • • • •

পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় মলয় যখন আপিসে তখন অনন্ত হাইকোর্ট হইতে পলাইয়া আসিলো এবং একেবারে মলয়ের বাড়ীর মধ্যে গিয়া ডাকিলো—বৌঠান কোথায়?

মৃদুলা আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া একটা বই পড়িতে পড়িতে একটু ঘুমাইবার চেষ্টায় ছিলো। সে ধড়মড় করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া ঘর হইতে বাহিরে যাইতে যাইতে মনে মনে বলিলো—এই এলো জ্বালাতে! সময় নেই, অসময় নেই, ওরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে আমাকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করে' একেবারে অতিষ্ঠ করে' তুললে!

মৃদুলা ঘর হইতে বাহিরে গিয়া বিরক্ত মুখ যথাসম্ভব প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়া বলিলো—আসুন। কোর্টে যান নি আজ?

অনন্ত মৃদুলার সঙ্গে সঙ্গে বসিবার ঘরে যাইতে যাইতে বলিলো—গিয়েছিলাম। কিন্তু একটা বিষম দুঃসংবাদ জানতে পেরে আপনাকে তাড়াতাড়ি সাবধান করে' দিতে এলাম।

অনন্তর কথা শুনিয়া মৃদুলার মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেলো; সে পাংশুমুখে অনন্তর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলো—কি দুঃসংবাদ?

অনন্ত ঘরের চৌকাঠ ডিঙাইতে ডিঙাইতে পকেট হইতে একখানা ছাপা কাগজ বাহির করিলো এবং তাহার ভাঁজ খুলিয়া মৃদুলার হাতে দিয়া বলিলো—এটা দেখেছেন?

মৃদুলা সেই কাগজখানা হাতে লইয়া দেখিলো একটা থিয়েটারের অভিনয়ের বিজ্ঞাপন হ্যাণ্ডবিল, তাহার মধ্যস্থলে একটি অভিনেত্রীর ছবি অস্পষ্ট ছাপা আছে, তাহার নীচে লেখা আছে "বিরাজ-বৌ শ্রীমতী শ্রেয়সী দেবী।" ইহা দেখিয়া মৃদুলা অনন্তর মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলো—এর মধ্যে দুঃসংবাদ কি?

অনন্ত বলিলো—এর সঙ্গে মলয়-বাবুর একটু অন্যায় রকম ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে!

মৃদুলা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলো—মিথ্যা কথা!

অনন্ত পকেট হইতে মলয়ের চিঠিখানি বাহির করিয়া মৃদুলার হাতে দিয়া বলিলো—আমি বিশেষ রকম প্রমাণ সংগ্রহ না ক'রেই কি স্বামীর নামে স্ত্রীর এজলাসে নালিশ দায়ের করতে এসেছি? আমরা ব্যারিষ্টার-মানুষ; হাতে নজিরের নথি না নিয়ে কথা বলি না।

মৃদুলার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি একমাত্র দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছিলো; সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া খামের উপর মলয়ের হাতে লেখা শ্রেয়সীর নাম ঠিকানা দেখিতেছিলো, অনন্তর রসিকতার চেষ্টায় বাগ্‌বিস্তারের দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিলো না।

অনন্ত বলিয়া যাইতে লাগিলো—মলয়-বাবুর সঙ্গে কে একজন নিবারণ-বাবু এসে জুটেছেন!·····

মৃদুলা মলয়ের লেখা শ্রেয়সীর নামের চিঠিখানা হাতে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলো খাম খুলিয়া চিঠি পড়িবে কি না। কিন্তু অনন্তর মুখে মলয়ের নামের সঙ্গে নিবারণের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়াই মৃদুলার সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিলো—সে তো জানে নিবারণ কী দারুণ দুশ্চরিত্র, তার গতিবিধি কিরূপ অস্থানে কুস্থানে! সেই নিবারণ তো বাস্তবিকই তাহার স্বামীর সঙ্গে জুটিয়াছে! কালই তো সে আসিয়াছিলো এবং মৃদুলা স্বকর্ণে শুনিয়াছে সে ও তাহার স্বামী একটা কোনো অশুচি কলঙ্কের কথা তাহার নিকট হইতে গোপন করিবার পরামর্শ করিয়াছে! সেই পরামর্শের সঙ্গে এই পত্রের কোনো সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলিয়া সন্দেহ মনে উদয় হইতেই মৃদুলা সেই পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলো।

মৃদুলা উৎসুক দৃষ্টিতে একাগ্র মনে চিঠি পড়িতেছে দেখিয়া অনন্ত মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলো। কিন্তু সে সেই আনন্দ বাহিরে প্রকাশ না করিয়া মৃদুলার মনের সন্দেহ আরো প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য বলিলো—এই প্রেয়সীর সঙ্গে মলয়-বাবুর বোধ হয় কোনো রকম প্রণয়-কলহ হয়েছে; প্রেয়সী মলয়-বাবুকে আর আমল দিতে চাচ্ছে না, সে অন্য লোককে অনুগ্রহ বিতরণ করছে। এতে মলয়-বাবু বিব্রত হয়ে আমাকে এই চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন প্রেয়সীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন ঘটিয়ে দিতে হবে; এই চিঠিতে তিনি কি লিখেছেন আমি জানি না; এই চিঠি পড়ে' তার মন যদি না ফেরে, তা হলে তাকে মকদ্দমা করে' জব্দ করবার ভয় দেখাবার জন্যে ব্যারিষ্টার আমাকে মলয়-বাবু দূত করে' পাঠাচ্ছেন। আমি তাঁকে অনেক করে' বোঝালাম, কিন্তু তিনি প্রেয়সীর জন্যে একেবারে পাগল! তখন আমি সমস্ত ব্যাপারটা আপনাকে জানানো উচিত মনে করলাম; যদি আপনি কোনো রকমে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেন।

পত্র পড়িয়া মৃদুলার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিলো, অনন্তর অনর্গল বক্তৃতাখানি তাহার কানে কর্কশ শিল্পীরবের ন্যায় বোধ হইতেছিলো। তাহার সমস্ত চেতনা ও বোধশক্তি আচ্ছন্ন করিয়া কেবল এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার স্বামী দুশ্চরিত্র কুক্রিয়াসক্ত! আহুতির সহিত তাহার স্বামীর অনাচার সে সহ্য করিয়াছিলো নিজেকে স্বামীর মনোরঞ্জনে অক্ষম প্রতিপন্ন করিয়া; কিন্তু বারনারীর প্রতি তাহার স্বামীর প্রসক্তি সে কী বলিয়া ক্ষমা করিবে অথবা সহ্য করিবে? এই গৃহে তাহার অবস্থান এখন অসম্ভব, দুঃশীল স্বামী-সম্ভাষণ তাহার পক্ষে এখন অসম্ভব। এই নরকবাস হইতে সে উদ্ধার পাইবে কেমন করিয়া, কাহার সাহায্যে? পিতাকে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে আনাইয়া চলিয়া যাইতে তো অনেক দিন লাগিবে। তখন তাহার মনে পড়িলো বিলোপকে যে তাহাদের বিবাহের ঘটকালি করিয়া তাহাকে এই অপমানজনক দুঃখভাজন করিয়াছে সেই তাহাকে এই অপমানিত অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে বাধ্য। এই কথা মনে হইতেই সে অনন্তর দিকে ফিরিয়া গম্ভীর সংযত ভাবে সংক্ষিপ্ত কথায় বলিলো—আপনি বন্ধুর কাজ করেছেন। এর জন্য আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। এখন আমাকে একটু অন্য কাজে যেতে হচ্ছে। ক্ষমা করবেন।

এই বলিয়া মৃদুলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলো।

অনন্ত নিজের চাতুরীর জন্য আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া একটু হাসিয়া নিজের বাড়ীতে প্রস্থান করিলো।

মৃদুলা ঘরে গিয়া বিলোপকে তখনি পত্র লিখিয়া ডাকিয়া আনিতে উদ্যত হইল। কিন্তু হাতে কাগজ কলম লইয়া তাহার পিতার একটি উপদেশ মনে পড়িলো—"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্!" অমনি সে কলম রাখিয়া ভাবিতে বসিলো—তাহার স্বামী কি বাস্তবিকই এমনই অপদার্থ! অনন্তর কথা কি সত্য? কিন্তু সে তো চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়াছে তাহার স্বামীর নিজের হাতের লেখা চিঠিতে প্রেয়সীকে প্রেয়সী বলিয়া সম্ভাষণ ও তাহার করুণা লাভের জন্য প্রণয়ভরা মিনতি! কিন্তু তাহার স্বামী যদি এই প্রেয়সীর প্রণয়াসক্ত তবে সে তাহার কাছে যাইতো কখন? সমস্ত দিনই তো তাহার স্বামী অবসর-সময় তাহার সাহচর্য্যে যাপন করিয়াছে; কোথাও তাহার বিরাগ বা কৃপণতার পরিচয় পাইয়াছে বলিয়া তো সে অনুভবও করিতে পারে নাই! ঐ চিঠি যদি সত্য হয় তবে বলিতে হইবে তাহার স্বামী একজন আশ্চর্য্য প্রতারক, দক্ষ মনোভাব-গোপন-ক্ষম; আর সে নিজে নিতান্ত মূঢ়, মানবচরিত্রবোধে অনভিজ্ঞ! ঐ চিঠিখানা অনন্তর কোনো কারসাজি নয় তো? তাহার স্ত্রী আমার স্বামীর প্রতি অনুরক্ত বলিয়া সে কি জাল চিঠি প্রস্তুত করিয়া প্রতিহিংসা লইতে চেষ্টা করিতেছে?

মৃদুলার মনে এই সন্দেহ উদয় হইতেই তাহার স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস ও আশঙ্কা অনেকখানি পরিত্রাণ হইয়া গেলো। সে স্থির করিলো খুব সাবধান সতর্কতার সহিত তাহার স্বামীর স্বভাব ও গতিবিধি পর্য্যালোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সে দেখিবে অনন্তর উদ্ভাবিত পত্রের কোনো সত্যতা আছে কি না। সে মলয়ের লেখা প্রেয়সীর নামের চিঠিখানা নিজের বাক্সর তলায় লুকাইয়া রাখিয়া দিলো।

(আগামী বারে সমাপ্য)

নৃতত্ত্বে জাতি-নির্ণয়

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পিএইচ-ডি

আফ্রিকা

অষ্ট্রেলেসিয়া হইতে আমাদের আফ্রিকা মহাদেশের জাতি-নির্ণয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কারণ, এখানে যে প্রকারে অতি-আদিম নরজাতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ সর্ব্ববর্ণের ও সর্ব্বপ্রকারের লক্ষণাক্রান্ত জাতি-সমূহও এ মহাদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমের আটলাস্ পর্ব্বতের অধিবাসী নীল-চক্ষু, কটা-চুলবিশিষ্ট উজ্জ্বল গৌরবর্ণের (blond) কাবিল, তুয়ারেগ, প্রভৃতি নামধারী বার্বার জাতি হইতে দক্ষিণের কালাহারি মরুভূমির ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণের বুশম্যান নামে অভিহিত জাতি এই মহাদেশে বাস করিতেছে।

আফ্রিকা নাম প্রাচীন লাটিন এফার (Afer) শব্দ হইতে উদ্ভূত,—ইহার অর্থ কৃষ্ণ। রোমানেরা কার্থেজ জয় করিয়া উত্তর-আফ্রিকায় শাসন বিস্তার করিয়া তাহাকে তাহাদের আফ্রিকা নামে উপনিবেশ বলিয়া অভিহিত করে। ক্রমে সমগ্র মহাদেশ ইয়োরোপীয়দের নিকট আফ্রিকা নামে বিদিত হয়। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের জাতিবিষয়ক আলোচনা-কালে ইহাকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা যাউক ; যথা, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ।

উত্তর আফ্রিকা

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব হিসাবে উত্তর-আফ্রিকা দক্ষিণ-ইয়োরোপের সদৃশ। অতীত-কালে ভূমধ্য-সাগর বর্ত্তমান ছিল না, উভয় মহাদেশ সংযুক্ত ছিল ; সেই জন্য উভয় স্থানের জীব-জগতে সাদৃশ্য আছে। উত্তর-আফ্রিকার এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে একটি প্রাচীন বৃহৎ জাতি বাস করিতেছে ; ইহা নানা স্থলে নানা জাতীয় নামে পরিচিত হয়। এই জাতিকে হামিত্ (Hamite) বলে। পুরাতন বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, নোয়ার তিন পুত্র যাফেত্, সেম্ ও হাম হইতে মানব-জাতির তিন প্রধান শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। হিব্রু ভাষায় হাম্ অর্থে কৃষ্ণ। এই হামের বংশধরগণ আফ্রিকায় বসবাস করে ও কৃষ্ণজাতিসমূহের

আদিম পিতা। যাহাই হউক, এই নাম হইতে উত্তর-আফ্রিকার জাতিসমূহের নাম হামিত্ হইয়াছে—যদিচ তাহারা বেশীর ভাগ গৌরবর্ণের লোক।

এই হামিত্ নামে অভিহিত বৃহৎ জাতি সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা, নীল নদের উপত্যকা ও পূর্ব্ব-আফ্রিকায় সাধারণতঃ বাস করে। কিন্তু ইহাদের বাহিরেও তাহাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। লুশান (১) বলেন, দক্ষিণের জাতিদের মধ্যেও হামিত্দের রক্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা হিসাবে, হামিত্ভাষা অন্যান্য ভাষা হইতে স্বতন্ত্র; যদিচ সেমিতিক ভাষার সহিত বংশ সম্পর্কতা টানিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। আবার জনকতক ফ্রান্সের ভাষাবিদের (২) এলজিরিয়ার Shlud কাবিলদের ভাষা আর্য্য ভাষার এক শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাতে বিফল হইয়াছেন।

হামিত্রা নিম্নোক্ত বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত:— (৩)

পূর্ব্ব শাখা—

১। প্রাচীন ও বর্ত্তমান মিসরের লোক (আরব ব্যতীত কপ্ত ও ফেলাহিন্) ইহার অন্তর্গত)

২। নিউবিয়ান, বেজারা

৩। আবিসীনিয়েরা

৪। গাল্লা, ডানাকিল, সোমালীরা

৫। মাসাই

৬। ওয়াহুমা বা হিমা অথবা ওয়াটুসি বা টুসি

উত্তর শাখা—

১। ভূমধ্যসাগর ও অতলান্টিক কূলবর্ত্তী এবং সাহারার বার্বারেরা।

২। তেবুরা বা টুকুরা

৩। কুশারা বা কুলবেরা

৪। কানারি দ্বীপের গোয়ানচেরা

এই হামিত্দের মধ্যে মিসরের লোকেরাই বিশেষ বিখ্যাত। তৎপরে বর্ত্তমানের বার্বার (Barber) নামধারী জাতি—যাহা মরোক্কো, এলজিরিয়া, ত্রিপোলি প্রভৃতি দেশে বসবাস করে। ইহারা একটি প্রাচীন জাতি। পুরাকালে ইহাদের লাইবিয়ান (Libyan) বলিয়া অভিহিত করা হইত। সারগি (৪) ('Sergi) বলেন যে উপরিউক্ত জাতি সমূহের শারীরিক লক্ষণ সকল এক প্রকারের বলিয়া ইহাদের মানবজাতির একটি বিশিষ্ট শাখার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যায়; এবং ইহাও সম্ভব যে আফ্রিকাই তাহাদের উৎপত্তি স্থল। ইনি বলেন যে, এই বৃহৎ জাতির মূলের উৎপত্তি স্থান পূর্ব্ব-আফ্রিকার হ্রদসমূহের নিকট অর্থাৎ নীলনদের উৎপত্তি-স্থল ও সোমালীল্যাণ্ডের কাছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অনেক কারণের বশীভূত হইয়া তিনি এই মত ব্যক্ত করিতেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ কারণ; যথা—একটি প্রাচীন জনবৃন্দের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়—যাহাদের মিসরীয় স্থাপত্য-কার্য্যে তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের "পুন্টি" (Punti) জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং যাহাদের শারীরিক লক্ষণসমূহ মিসরীয়দের সহিত মিলে ও অনেক সময়ে একই প্রকারের। তৎপরে, চকমকি প্রস্তরের (flint) যন্ত্রপাতিসমূহ (৫) আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা ইয়োরোপের প্রাচীন প্রস্তর-যুগের সদৃশ; শেষে ডিনকা (Dinka) ও সোমালীদের দেশে প্রাচীন স্তূপ সমূহের (tumuli) অস্তিত্ব একটি নিদর্শন। জার্ম্মাণ জাতি-তত্ত্ববিদ্ Schlit বলেন সারগির অভিমত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়; কারণ, এই স্থলের লোকদের মুখাকৃতির সহিত ক্লাসিক জাতিদের সাদৃশ্য বেশ লক্ষিত হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই হামিত্ ভাষী জাতিসমূহ কোন্ মূল মানবজাতির শাখা? সকলেই বলেন, ইহারা ভূমধ্যসাগরীয় জাতি (Mediterranean Race) সম্পর্কীয়। ব্রোকা (Broca) বলেন, বার্বারেরা পুরাতন cro-magnon মূলজাতির বর্ত্তমান বংশধর।' সারগি বলেন, ভূমধ্যসাগরীয় জাতি ও তৎসম্পর্কীয় জাতিসমূহের মাথার আকৃতি অ্যামিতির পঞ্চ কোণার (pentagonal) ন্যায় আর cro-magnon জাতির মাথার আকৃতি তদ্রূপ। অতএব বুঝা যায় যে, হামিতেরা cro-magnon সম্পর্কীয়। সারগি বলেন, আফ্রিকার এই জাতিই অতি প্রাচীন কাল

১। Luschan—"Die Hamiten"

২। Quartrefageset Hamy—"Crania Ethnica" দ্রষ্টব্য।

৩। Sergi—"Africa"

৪। Sergi—The Mediterranean Race

৫। Seton-kerr—"Discovery of Evidences of the Palaeolithic Stone Age in Somaliland in Jour. Anth. Inst. 1896.p271

হইতে quarternary সময় পর্য্যন্ত ইয়োরোপের অধিবাসী জোগাইয়াছে। এই জন্য আজকাল উত্তর আফ্রিকা ও ইয়োরোপের লম্বাকৃতি মস্তকবিশিষ্ট জাতিসমূহকে Eurafrican race বলা হয়। লুশান (৬) বলেন। হামিতেরা লম্বাকৃতি মস্তকবিশিষ্ট (dolicocephalo)। সারগি বলেন, এই বৃহৎ জাতি সাদা লোহিত-সমুদ্রের তীর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বসবাস করিতেছে, তাহাদের মস্তক ও মুখের আকৃতির ঐক্য রহিয়াছে, (৭) কেবল গাত্র-চর্ম্ম ও শরীরের নরম স্থলের লক্ষণ-সমূহের প্রভেদ আছে। গাত্র রংয়ে ইহারা brunette কিংবা brown ; চক্ষুর তারার (iris) রং চেষ্টনাট অথবা কাল ; চুল, দাড়ীর রং brown ; শরীর সুগঠিত ও মধ্যমাকৃতি ১.৬০—১.৭০ মিলিমিটার লম্বা, নাক লম্বা (leptorhine) বা মধ্যমাকৃতি (Mesorhine), মুখ Oval আকৃতি, ইত্যাদি। সারগি আরও বলেন যে, মাথার ও মুখের আকৃতি দ্বারাই আফ্রিকার লালচে রংএর (red-brown) এবং কৃষ্ণবর্ণ হামিতদের সহিত ভূমধ্যসাগরীয় জাতিদের এক সম্পর্ক মানিয়া লইতে হয়। অবশ্য এই রংএর পার্থক্য তিনি বাহ্যিক প্রভাবের দ্বারা গঠিত বলিয়া গণ্য করেন।

সভ্যতা ক্ষেত্রে এই প্রাচীন জাতি সর্ব্বত্রই এক প্রকারের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন দেখায়। ইয়োরাফ্রিকান জাতি উত্তর মহাদেশে অতি প্রাচীন কালে একই প্রকার সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। De Mortillet, যাহাকে ম্যাগ্‌ডালেনিয় (Magdalenian) যুগ বলেন, যাহা ইয়োরোপের প্রাচীন-প্রস্তর-যুগের শেষাংশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, সেই যুগের কারুকার্য্যের নির্ম্মাণ-প্রণালীর উচ্চতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়। সারগির মতে—এই সভ্যতার অধিকারীরা নব-প্রস্তর-যুগে জীবিত ছিল। পরে তাহাদেরই বংশধরেরা মিশর ও ক্লাসিক শিল্প ও কারুকার্য্যের উদ্ভাবনা করে। নব-প্রস্তর-যুগের এই সভ্যতা প্রাচীন মিশর হইতে সুইডেন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমান। এই একতা হাঁড়ি-কলসীর (pottery) গঠন ও কারুকার্য্যে, প্রস্তর-কার্য্যে, মৃত শরীরকে পা মুড়িয়া হাঁটু-গেড়ে বসাইয়া সমাধি দিবার প্রণালী প্রভৃতিতে প্রকাশ পায়। এই সভ্যতাতে এসিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। পেট্রি (Petrie), আমেলিনো (Amelineau), ডি'মরগানের (De Morgan) আবিষ্কৃত প্রাচীন মিশরের সভ্যতার নিদর্শন-সমূহ দেখায় যে, তাহা প্রাচ্যের সভ্যতার প্রভাবের অধীনে আসে নাই ; কিন্তু এ সমস্তার মতের বিভিন্নতা আছে।

তৎপরে এই ইউরাফ্রিকান জাতি ভাষাকে লিখিবদ্ধ করিবার জন্য লিপির উদ্ভাবনা করিতেছিল। মাগ্‌ডালেনীয় যুগে ইহা একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে ; এবং যে সব জায়গায় এই জাতি বসবাস করে, সেই সব স্থানে এই লিখিবার প্রণালী প্রচলিত হয়।

বার্ব্বার জাতি

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইল হামিত্ ও ভূমধ্যসাগর-তীরবর্ত্তী জাতির প্রাচীন ও বর্ত্তমানের সাধারণ পরিচয়। এক্ষণে হামিত্ জাতির বিভিন্ন শাখার পরিচয় লওয়া আবশ্যক। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এই জাতির একটি প্রাচীন ও বৃহৎ শাখা বসবাস করিতেছে। তাহাকে বার্ব্বার বলে। প্রাচীন-কালে ইহাদের লিবিয়া (Libyans) বলিত। বার্ব্বার নামের উৎপত্তি লইয়া নানা মত প্রচলিত আছে ; কারেট (৮) (Carette) বলেন, যাহাই হউক, মুসলমান বিজয়ের সময় হইতে লিবিয় নামের পরিবর্ত্তে বার্ব্বার নাম প্রচলিত হয়, এবং আরব ভৌগোলিকেরা বার্কা হইতে আটলান্টিক পর্য্যন্ত ভূখণ্ডকে বেলাদ-এল-বার্ব্বার কিংবা বার্ব্বারিয়া বলিয়া অভিহিত করে। আজকাল কিন্তু বার্ব্বার নামও অপ্রচলিত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে রাজনীতিক জাতীয় নাম মুর, কাবিল, তুয়ারেগ শেলাহ (Schlachs) প্রভৃতি নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কার্থেজিনিয়ানদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এত বিপ্লব সত্ত্বেও তাহাদের ভাষা জীবিত রহিয়াছে। বিজীত বার্ব্বারেরা নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব চিরকাল রক্ষা করিয়া রাখিয়া আসিতেছে। এই স্থানে শ্বেতকায় মুর কাবিল, তুয়ারেগ ; মলিনবর্ণের আরব ও কৃষ্ণবর্ণের নিগ্রো—প্রত্যেক জাতিই স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। পাহাড়ের ভিতরের বার্ব্বারেরাও নিজের ভাষা

৬। Luschane—Die Hamiten

৭। Sergi—The Mediterranean Race.

৮। Carette—"Recherches Surl'origine et les migrations des principales tribus de l' Afrique Septentrionnle" bk III.

ব্যবহার করে, এবং অনেক প্রাচীন জাতীয় রীতিনীতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। তাহারা অনেকটা নামমাত্র মুসলমান। অবশ্য সমুদ্রতীরবর্তী ও সহরে বার্বারেরা আরবী কহে। হ্যামিটদের বিষয় বর্ণনা করিবার কালে ইহাদের শারীরিক লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

বার্বারেরা সাধারণতঃ মলিন শ্বেতবর্ণ (dark white or brunette)। ইহাদের বর্ণ দেখিলে দক্ষিণ ইয়োরোপের লোকের গাত্রবর্ণের ন্যায় প্রতীত হইবে। আমি কোন ব্রুস ও আলজিরিয়ার লোক দেখিয়াছি, যাহাদের দেখিলে মধ্য ইয়োরোপের লোক বলিয়া ভ্রম হইবে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ blond অর্থাৎ নীল-চক্ষু, কটা-চুল লক্ষণাক্রান্ত। এই লইয়া নৃ-তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে তুমুল মত-বিরোধ আছে। অনেক ইয়োরোপীয় পর্য্যটক মরক্কো ও আলজিরিয়ার আবিল ও তুয়ারেগদের মধ্যে উত্তর-ইয়োরোপীয়দের ন্যায় blond পুরুষ নিরীক্ষণ করিয়াছেন। পিয়েরলোটি ইঁহাদের অন্যতম। একদল ঐতিহাসিক বলেন যে, ইহারা হয় ত মধ্যযুগের ভাণ্ডালদের বংশধর। রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বলে যে ভাণ্ডালেরা স্পেন হইতে এই স্থলে আসে ও নব-কার্থেজ জয় করিয়া তথায় বসবাস করে। কিন্তু শেষে তাহারা রোমান সেনাপতি বেলিসারিয়সের দ্বারা পরাজিত হইয়া সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইতিহাসের এই উল্লেখ সম্পূর্ণরূপে সত্য না হইতেও পারে। তাহারা হয় ত সন্ততি রাখিয়া গিয়াছিল, বা তাহাদের রক্ত হয় ত আজকালকার এই blond বার্বারদের ধমনী মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। আবার অন্যদিকে Pan Germanistরা বলেন (৯) যে, সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন কালে উত্তর-ইয়োরোপ হইতে লম্বা-মাথা কটা-চুল নীল-চক্ষু-বিশিষ্ট লোকেরা (dolichocephal blonds) স্পেন দিয়া এই স্থলে আসিয়া বসবাস করে। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, উত্তর-আফ্রিকার জল বায়ুতে blond জাতির উদ্ভব হইতে পারে না, উত্তর-ইয়োরোপেই ইহা সম্ভব। তৎপর, যে সব megalith monuments টিউনিস, আলজিরিয়া, মরক্কো প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়, তাহা ইয়োরোপের স্পেন, পর্টুগাল, পশ্চিম-ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন, ডেনমার্ক, ও ভূমধ্যসাগরের অনেক দ্বীপের সহিত সমান লক্ষণাক্রান্ত। বার্ট্রাণ্ড (Bertrand) বলেন (১০) যে একটি dolmenবাসী জাতি ইয়োরোপ ও আফ্রিকায় পরিভ্রমণ করিয়াছে এবং সর্ব্বত্র এক প্রকারের monument স্থাপন করিয়া পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু কাতারফাজ্ (Quatrefages) বলেন—এ রহস্য ভেদ করা যায় না! আবার প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রাচীন মিশরীয়েরা লেবু (Lebu) ও তামাহু (Tamahu) নামধারী blond জাতিদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছে। ১৭০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ফরৌন্ অর্থ আমেনহোতেপের মাতা blond ছিলেন। তিনি আবার বিদেশিনী ছিলেন। আবার ২য় রমাসিসের সময় পশ্চিম হইতে blondদের মিশর আক্রমণ ভীষণ ভাবেই হয়। মিশরীয় স্থাপত্যকার্য্যে এই লেবু ও তামাহুদের আকৃতি অঙ্কিত করা আছে। কিন্তু ডেসর (Desor) বলেন যে আটলাস্ পর্ব্বতের বর্ত্তমান অধিবাসীদের আকৃতির সহিত ঐ মিশরীয় তামাহুদের আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। প্রুনারবে (Pruner Bey) ও হার্টমান (১২) আবার ঐ blond জাতির অস্তিত্ব মানেন না। তাঁহারা বলেন যে, দুই চার জন উক্ত শারীরিক লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির অস্তিত্বের দ্বারা একটা পৃথক জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এই ব্যক্তিরা অন্য সব শারীরিক লক্ষণ বিষয়ে তাহাদের মলিনবর্ণের স্বজাতির লক্ষণাক্রান্ত। আর এই blond element এমন কিছু বেশী নয়। বোনা সহরে পরীক্ষিত ৪০০ টুর্কোর মধ্যে ৫ জনের চুলের রং পাটের মতন (fair); আর কুড়ি জনের চেষ্টনাট রং। বার্থোলঁ (১৩) (Bertholon) টিউনিসের উত্তর-পশ্চিমে ৩৪৪ জন লোককে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে শতকরা ২·০৩ জন blond ও লাল চুলের লোক, ৯·০১ মাঝারি রংএর, এবং ৮৮.৯৫ কালো রংএর চুলওয়ালা লোক পাইয়াছিলেন। হার্টমান blondএর এই পরিমাণ দেখিয়া বলিয়াছেন যে, blond তামাহু ও লালচে চুলবিশিষ্ট মাগ্রেবির

৯। Penka—Die Arier

১০। Bertrand—"De la Distribution des Dolmens a' la surface de la France."

১১। Quartrefages—Histoire Gene'rale des Races Humaines'

১২। Hartmann—"Die Nigritier'

১৩। Bertholon—"Exploration Anthropologique de la khoulmirie in Bull. Geog. Hist. et Descrip. 1891, No41।

(বার্বার বা মুর) উৎপত্তির রহস্য ঐ আফ্রিকাতেই পাওয়া যাইবে।

আর যদি এই লেবু ও তামাহুদের উত্তর ইয়োরোপ হইতে আগত বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ইহাদের পরিচ্ছদাদিতে সে চিহ্ন লক্ষিত হয় না; বরং ইহাদের বেশ-ভূষা লিবির ধরণের। মিশরের স্থপতি-কার্য্যে খোদিত উক্ত জাতিদের প্রতিমূর্ত্তিতে আফ্রিকান ধরণের বেশ-বিন্যাস, ও মস্তকে অষ্ট্রিচ্ পক্ষীর পালক দেখা যায়। এই জাতিদের প্রতিমূর্ত্তিতে বিভিন্ন type অঙ্কিত আছে। যেটিকে খাঁটি type বলিয়া কেহ কেহ ধরেন, সেইটি একটু বেঁকান (aquiline) নাক, পাতলা ঠোঁট, বাহির হওয়া (elongated) চিবুক, স্বল্প দাড়ি ও গোঁপ-বিশিষ্ট; আর মাথার চুল কোঁকড়ান, বেণী গুচ্ছে দোদুল্যমান, এবং মাথায় অষ্ট্রিচ্ পক্ষীর পালক। এই প্রথম typeটির বেশ বিন্যাস প্রাচীন পুন (Pun) জাতির ন্যায়। দ্বিতীয়টির বেঁকান নাক, কপাল ভিতরে ঢোকা (receding forehead), পুরু ঠোঁট, স্বল্প দাড়ি ও চক্ষুর ভ্রূমূলের স্থান (supra-orbital arches) বিশেষভাবে উচ্চ। এপ্রকারের লক্ষণাক্রান্ত লোকদের সহিত উত্তর-ইয়োরোপীয় blondদের কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। আবার অন্য দিকে দক্ষিণ-ইয়োরোপের প্রাচীন সার্ড, সিকুলি প্রভৃতি জাতির বেশভূষার সহিতও ইহাদের সাদৃশ্য নাই। অন্যপক্ষে Flower ও পুল তৃতীয় typeটিকে নিয়ানডারথালয়ড (neanderthaloid) বলেন। কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি সমীচীন নহে,—একটি চিত্রের conventional form দ্বারা biotype ঠিক করা যায় না। আবার প্রথম চিত্রটিতে বরং আফ্রিকান চিহ্ন স্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়। আর এ প্রকারের চিত্র কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন মিশরীয় স্থপতি-কার্য্যে অঙ্কিত হইয়াছে। সারগি বলেন, এই typeটির কোঁকড়া চুল ও অল্প দাড়িতে হামিত্ জাতির লক্ষণই প্রকাশিত হইতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকেরা লিবির জাতির শারীরিক লক্ষণের কোন বর্ণনা রাখিয়া যান নাই। কেবল ষ্ট্রাবো, ও টলেমি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঐ স্থলে মলিন-গেটুলি, ফরসা ইথিয়োপীয়ান জাতি সমূহ আছে। আর এ বিষয়ে আধুনিক পর্য্যটকদের পর্য্যবেক্ষণের সহিত মিলে। তাঁহারা বলেন, দক্ষিণের লোকেরা ময়লা (dark) রংয়ের, কিন্তু চুল ও মুখাকৃতি উত্তরের লোকের ন্যায়। সারগির মতে—ইহা সম্ভব, কারণ জলবায়ুর গুণে এ বিভিন্নতার উদ্ভব হয়। আবার দাহোমার আদিম অধিবাসীদের বংশধরেরা কৃষ্ণবর্ণের; কিন্তু নিগ্রো হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহারা নিজেদের "খমরি" (Khomri) অর্থাৎ brunette বলিয়া অভিহিত করে। এই সঙ্গে কারেটের (Carette) মত উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন ওয়েড রিয়ের (Wed-righ) আদিম অধিবাসীরা শ্বেত ও কৃষ্ণ জাতির মধ্যের শৃঙ্খলস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। তাহাদের গাত্রের রং এক বিচিত্র প্রকারের,—কৃষ্ণবর্ণের কাছাকাছি; তাহাদের নিগ্রোজাতির ন্যায় চেপ্টা নাক ও পুরু ঠোঁটও নাই—যদিচ শ্বেতজাতির শারীরিক লক্ষণের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলে না। সারগির মতে এই পর্য্যবেক্ষণটী লিবির জাতিদের এবং বিশেষতঃ হামিত্দের উৎপত্তি বিষয়ে বড়ই মূল্যবান্। ইহার দ্বারা দেখা যায় যে পূর্ব্বাঞ্চলের হামিত্-দের সহিত একপ্রকারে উত্তর-পশ্চিমের হামিত্দের সম্পর্ক রহিয়াছে; এবং তাহাদের সহিত ভূমধ্যসাগরের শ্বেতজাতিদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই প্রকারে ময়লা রংয়ের পূর্ব্ব হামিত্রা একটি শৃঙ্খলের সহিত আর একটি শৃঙ্খল দ্বারা শ্বেত ভূমধ্যসাগরীয়দের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।

ইহার দ্বারা আমরা হামিত্দের উৎপত্তি ও তাহাদের বিভিন্ন শাখার পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলাম। আরও বুঝিলাম যে, প্রাচীন লিবির বা বার্বারেরা এই স্থলের আদিম অধিবাসী। অত্রাচ এই উত্তর-পশ্চিম কোণের blond elementএর আবির্ভাবের রহস্য সম্পূর্ণ রূপে উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই blondদের বেশীর ভাগ মরক্কোতে দৃষ্ট হয়। আর তাহারা আটলাস পর্ব্বতের উত্তর দিকেই দৃষ্ট হয়। এই উচ্চস্থানের জলবায়ুর গুণেই, এবং-প্রকারে তাহাদের রূপান্তর হয় বলিয়া সারগি এ প্রশ্নের খতম করিয়া দিতে চান। আবার কেডেনফেল্ডট (Quedenfeldt) (১৪) ইহাদের মধ্যযুগের ভান্ডালদেরই বংশধর বলিয়া গণ্য করিতে চান। কারণ, তিনি বলেন যে, আটলাস পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে এই blondরা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই মীমাংসাও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

১৪ : Quedenfeldt " Eintheilung und Verbreitung der Berberbevolkerung in Morokko" H. F. Ethnologie XX. 1888, pp 115, 189, 190.

আমার বিশ্বাস, এই blondদের উৎপত্তি বিষয়ের তর্ক লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। প্যানজারমানিষ্টেরা কোথাও নীলচক্ষু ও কটাচুলের লোকের প্রমাণ পাইলেই তাঁহারা তাহাদের উত্তর-ইয়োরোপের "গার্মাণ" (Germen বা Teuton) বংশোদ্ভব বলিয়া টানিতে চান। এই প্রকারে একবার পামীর উপত্যকায় (১৫) blond জাতি বাস করিতেছে বলিয়া চৈ চৈ করা হইয়াছিল। তৎপরে (তুর্কীস্তানের পূর্ব্ব তুর্কীস্থান) ইউচিদের প্রত্নতত্ত্বীয় দ্রব্য সমূহ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্যানজারমানিষ্টেরা আবার সেই রব তুলিয়াছেন।

আমি নিজে একদল কাফির সিপাহীদের (যাহারা করাশী সৈন্যদল হইতে ভাঙ্গানিতে কয়েদীরূপে আনীত হইয়াছিল) নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। তাহাদের দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, যদিচ ইহারা গাত্রের ও চুলের রংএ দক্ষিণ-ইয়োরোপীয়দের ন্যায়, তত্রাচ তাহাদের মুখাকৃতি একেবারে দক্ষিণ-ইয়োরোপীয়ানদের ন্যায় নহে। কিন্তু কোনও জার্ম্মাণ অধ্যাপক একজন ইতালীয়-সদৃশ কাফিরকে ইহার মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার আকৃতি, অঙ্গভঙ্গি দেখিলেই দক্ষিণ ইতালীয় বলিয়া ভ্রম হইত। কিন্তু এই লোকটিকে দেখিয়া কোন মত প্রকাশ করা যায় না। উত্তর-আফ্রিকায় ইয়োরোপীয়দের সম্বাগম কার্থেজের সময় হইতে হইতেছে; তৎপরে, মধ্যযুগে বার্বার বোম্বেটেরা (Corsairs) দলেদলে ইয়োরোপীয়দের কয়েদ করিয়া আলজিয়ার্স, টিউনিস, ত্রিপোলীর বাজারে গোলামরূপে বিক্রয় করিত। এই গোলামদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান হইয়া দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিত। ইয়োরোপীয় খৃষ্টানেরা তাহাদের "renegade" (ধর্ম্মচ্যুত) বলিত। এই সব কারণে যে উত্তর-আফ্রিকায় ইয়োরোপীয় সদৃশ লোক বা blond ব্যক্তি দৃষ্ট হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

হিন্দুকুশের কাফিরদের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণের লোক দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করায়, আমি উত্তর পাইয়াছিলাম, "আমরা কাফির আর এই কৃষ্ণকায়েরা সেনেগালের লোক, আর যাহারা ভারতীয়দের ন্যায় মলিন বর্ণের লোক তাহাদের "আরব" বলিয়া অভিহিত করিত। এই সব লোকেরা সাম্যবাদী মুসলমান হইলেও গাত্রবর্ণের পার্থক্যের জন্য পরস্পরকে বিভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য করে। এই শ্বেতকায় কাফিরদের মধ্যে আমি blond লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি দেখি নাই। কিন্তু লুসান আমায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কোন পুরাতন ছাত্র ইহাদের আধুনিক নৃবৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং নীলচক্ষু-বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আর এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই ব্যক্তির শরীরের মাপ ও ফটোগ্রাফও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বহু লোকের মধ্যে (হয়ত কতিপয় শত বা সহস্র) একজনের নীলচক্ষু আবিষ্কার করিয়া কোন মত প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। যাহাই হউক, উত্তর-আফ্রিকায় বার্বার জাতিদের মধ্যে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, নীলচক্ষু, কটাচুল-বিশিষ্ট লোক (blond) অনেক পাওয়া যায়—ইহা অস্বীকার করা যায় না। আর বার্থেলোঁর মতে—ইহারা লম্বা-মাথা বিশিষ্ট (dolicocephal)। কি প্রকারে ইহাদের এ স্থলে উদয় হইয়াছে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই।

উত্তর আফ্রিকায় মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে নানা-প্রকারের বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইয়াছে। এই মিশ্রণ সঙ্কীর্ণভাবে কার্থেজিনিয়ানদের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। তৎপরে নিগ্রোরা আনীত হয়। কালে অনেক বার্বার নিগ্রো উপপত্নী রাখে। ইহারই ফলে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। আর এই মিশ্রিত লোকেরা নিজেদের "আরব" বলিয়া পরিচয় দেয়। তুর্কিতেও এই ঘটনা লক্ষিত হয়; তথায়ও মলিনবর্ণের মুসলমানকে (অবশ্য হিন্দি অর্থাৎ ভারতীয় বাদ) আরব বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আরব উপনিবেশের বন্যা উত্তর আফ্রিকায় দুইবার আসে। প্রথমবার, মুসলমান বিজয়ের সময়, দ্বিতীয়বার মধ্যযুগে ১১১২ খৃষ্টাব্দে। এই ঔপনিবেশিক যাযাবর tribeরা নিজেদের স্ত্রী, পুত্র, জন্তু, তাঁবু প্রভৃতি লইয়া দলে দলে এই স্থানে আগমন করে। তাহারা আজ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবেই বেদউইন অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। তাহারা ওউলেদ-নে ইল প্রভৃতি বিভিন্ন কৌমে (tribe) বিভক্ত)।

যাঁহারা, উত্তর-আফ্রিকাকে মুসলমান ও আরব সভ্যতার অধীন বলিয়া ধারণা করেন যে সমগ্র উত্তর-আফ্রিকার লোক "আরব", তাঁহারা ভুল ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন। উত্তর-আফ্রিকায় (মরক্কো হইতে মিশর পর্য্যন্ত) তিনটি মানব

১৫। Leitner—Kafirs of the Hindukush.

জাতি পৃথকভাবে পাশাপাশি বসবাস করিতেছে : হামিত্ ও তাহার বিভিন্ন শাখা সমূহ, আরব ও নিগ্রো। জার্মাণ পর্যটক বার্থ (Barth) চাদ (Tchad) হ্রদের দিকে পর্যটনকালে সাহারার অভ্যন্তরে এই তিনটি জাতিকে পৃথকভাবে বাস করিতে দেখিয়াছেন। গাত্রবর্ণের দ্বারা ইহাদের পরস্পরের সহিত বিভিন্নতা উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে, এবং অনেক বার্বার ও নিগ্রো আরবী ভাষায় কথা কহে। কিন্তু প্রাচীন বার্বার জাতি রোমান বিজয়ের সময়েও স্বীয় জাতীয় ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল এবং আরব বিজয়ের যুগ হইতেও নিজের ভাষা ও রীতি নীতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। (১৬) টিউনিসের শিক্ষিত লোকদের মুখ হইতে অবগত হইয়াছি যে, তথায় অনেক প্রকারের আচার ব্যবহার ও রীতির বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় যাহা আরব বা মুসলমানী নহে। তাঁহারা বলেন যে প্রাচীন কার্থেজিনীয় রীতি ও কুসংস্কৃতি এখনও তথাকার লোক মধ্যে প্রচলিত আছে। আবার একজন মিশরী ভদ্রলোক আমায় বলিয়াছেন যে সাইরিনিকা (Cyrenica, ত্রিপোলির অন্তর্গত) সমুদ্রতীরবর্ত্তী লোক মধ্যে যে প্রকারের চালচলন ও রীতি প্রচলিত আছে তাহাও আরব বা মুসলমানী নহে। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল এই যে, এই সব লোক মুসলমান বিজয়ের সময় মিশর হইতে পলায়ন করিয়া এই সমুদ্রকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ছিল ও তথায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। পরে এই সব লোক মুসলমান হইয়াও সেই বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান উত্তর-আফ্রিকার লোকদের শারীরিক লক্ষণের বিষয় ইহা বলা যাইতে পারে যে, বেশীর ভাগ লোক লম্বা মস্তকের আকৃতি বিশিষ্ট (dolichocephal)। সারগি ইহাদের মস্তকাকৃতি Ellipsoid, ovoid pen tagonoid, Belold, Traperoid প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহারা সবই লম্বাকৃতির অন্তর্গত। আর যে সব গোলাকৃতি মস্তকের খুলি (skull) পাওয়া যায় (যাহার পরিমাণ অতি অল্প) তাহা বৈদেশিক প্রভাবেরই পরিচয় দেয়। জাতি-তত্ত্ববিদ কীণ (১৭)(Keane) বলেন যে, Brachycephalরা আফ্রিকায় উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অন্য বৈজ্ঞানিকেরা ইহার প্রতিবাদ করেন। সারগি বলেন, কেবল বর্ত্তমান সময়েই গোলাকৃতি মস্তক উত্তর-আফ্রিকায় পাওয়া যায়; প্রাচীনকালে বৈষম্য ভাবে; আর পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ইহা বিরল।

কানারী দ্বীপপুঞ্জ

কানারী দ্বীপসমূহের নৃ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান বার্থেলে (Berthelet) ব্রোকা, ফেদার্ব (Faidherbe) চীল (Chil), ভার্ণো (Verneau), মাইয়ার (Myer) সুসান প্রভৃতির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এইখানকার লোকদের উৎপত্তি লইয়া নানাপ্রকার তর্ক ও মত প্রচলিত আছে। বার্থেলে (১৮) ভাষার উপর তাঁহার মতের ভিত্তি স্থাপন করিয়া বলেন যে, এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা পশ্চিম আটলাস পর্ব্বতের জাতিসমূহ হইতে উদ্ভূত। ব্রোকা বলেন, (১৯) ইহারা উত্তর আফ্রিকা হইতে আসিয়াছে। ফেদার্ব (২০) বলেন যে, ইহারা (Wolof)লিবিয়,blond ইয়োরোপীয় ও কনানের লোকেদের সংমিশ্রণের ফল। ভার্ণো (২১) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ইহারা Cro-magnon জাতির অন্তর্গত ও উত্তর হইতে আগত। মাইয়ার ও সুসান(২২)গোয়ানচেদের (Guanches) blond জাতির অন্তর্গত বলেন। ইহা ব্যতীত, সুসানের মতে (২৩) অত্যন্ত চওড়া মাথাবিশিষ্ট (Hypsibrachy cephals) লোক-সমষ্টি আছে যাহারা পশ্চিম এসিয়ার Armenoid জাতি সম্পর্কীয়।

এই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ফলে ইহা দেখা যায় যে, এই দ্বীপপুঞ্জে তিন প্রকারের racial types বর্ত্তমান আছে। প্রথমটি হইতেছে গোয়ানচেরা। ইহারা ১·৭০—১·৯০ মিটার লম্বা, দৃঢ়কায়, মাথার আকৃতি লম্বা, সুগঠিত কপোল দেশ, মুখ নীচু ও চওড়া, চক্ষু বড়, মাথার index হইতেছে ৭৮, উচ্চতার ইন্‌ডেক্স (vertical

৭৬। Boissier "L' "Afrique Romaine."

৭৭। Crania Ethnica ও হাডনের "Man Past and Present দ্রষ্টব্য।

১৮। Antiquites Canariennes, Histoire naturelle des Iles canaries.

১৯। Revue Anthropologie IV, 1874.

২০। Quelquemots sur lethnologie de Archipel canarien.

২১। Rapport sur une illusion scienti fique dans h, archipel canarien.

২২। ueber urbewohner der canaris chen nseln.

২৩। Von Luschen's appendix to Die Insel Tenerife.

index) ৭৩। নাক অপেক্ষাকৃত ছোট ; চুল, লালচে বা চেষ্টনাট রংএর, গাত্র ও চক্ষুর বর্ণ উজ্জ্বল। এই typeটি প্রাচীন cro-magnon মানবের সহিত অনেক বিষয়ে মিলে এবং ইহারা সর্ব্বত্রই বাস করে, যদিচ খাঁটি ও বহুসংখ্যক ভাবে টেনেরিফ দ্বীপে বাস করে।

দ্বিতীয়টি হইতেছে ১·৬৫- ·৬৭ মিটার লম্বা ; শরীরের গঠন পাতলা, মধ্যাকৃতির মস্তক (meso-cephal), মুখ লম্বা ও সরু, নাক সরু, চুল ও চক্ষু কাল, গাত্রবর্ণ light brown ; মাথার index ৮১, উচ্চতার index ৭৩। এই typeটির সহিত হামিতিক type এর সাদৃশ্য দেখা যায় ; ইহাদের বড়কানারী, পালমা, লেরো দ্বীপে পাওয়া যায়।

তৃতীয়টি, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়, মাথা বড় চওড়া, মুখ লম্বা ও সরু, মাথার index ৮৪, উচ্চতার index ৭৯৫। সুসান ইহাকে পশ্চিম এসিয়ার প্রাচীন হেতিত সম্পর্কীয় জাতির সহিত এক বলেন ; ইহা তাঁহার armenoid type। ইহারা সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়াছিল এবং গোমারায় খাঁটিভাবে থাকে। কিন্তু সারসির অনুসন্ধান এই যে, অত্যন্ত চওড়া মাথাগুলি armenoidদের সহিত একেবারে মিলে না এবং এ ধরণের গঠন অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই জন্য ইনি তাহাদের Canariense নামকরণ করিয়াছেন।

শেষে ইহা দেখা গেল যে, এই দ্বীপপুঞ্জের জাতিরা নিকটবর্ত্তী আফ্রিকার হামিত্ ও দক্ষিণ-ইয়োরোপীয় ভূমধ্য-সাগরীয় জাতিসম্পর্কীয়। অবশ্য নানাপ্রকারের মিশ্রণ হইয়াছে এবং তজ্জন্য বাহিরের elementও আসিয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে চওড়া মাথাবিশিষ্ট typeটি—যাহার সারসি "Sphenoides Canariensis" নামকরণ করিয়াছেন—একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। আর গোয়ানচেদের বিষয়ে অনেক মত (তন্মধ্যে একটি এই যে, তাহারা গল্পের Atlantis দেশের জাতি) প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের skullএর cro-magnon skullএর সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। সারসি বলেন তাহাদের এবম্প্রকারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাহারা উত্তরাগত নহে, তাহারা আফ্রিকা হইতে পশ্চিমদিকের শেষ ঔপনিবেশিক বন্যার চিহ্নস্বরূপ। ইহা তাহাদের জাতি-তত্ত্ব ও বিভিন্ন ধরণের লিপির দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ব্রহ্ম-প্রবাসের চিত্র

শ্রীগণেশচন্দ্র মৈত্র, বি-এস্‌সি

ব্রহ্মদেশে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীকে ফুঙ্গি (Hpoongyi) বলে। বাঙ্গালার সাধু-সন্ন্যাসীর ন্যায় ফুঙ্গিদের ব্রহ্মবাসীরা সন্দেহের ও অবিশ্বাসের চোখে দেখে না ; বরং ইঁহারা সকলের নিকটই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ও সম্মানিত। ইঁহাদের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুঙ্গি থাকেন, তিনি সকল ফুঙ্গির গুরু। এই ফুঙ্গি-গুরুর দেহত্যাগ হইলে দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া যায় এবং মহা সমারোহে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে রীতিমত একটা মেলা বসে এবং নানা দেশ হইতে ফুঙ্গিরা সেখানে সমবেত হইয়া স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এই মেলার নাম "ফুঙ্গি-বিয়ান" (Hpoongyi Byan)। ব্রহ্মদেশের সুদীর্ঘ বর্ষার মধ্যে দেহত্যাগ ঘটিলে বর্ষা অবসানের অপেক্ষা করিতে হয় এবং মৃতদেহ মধুর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। গত ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে সোরে ড্যাগন প্যাগোডা-প্রাঙ্গণে ফুঙ্গি-বিয়ান খুব সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সময় গৃহীত কয়েকখানি আলোক-চিত্র হইতে এ সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইতে পারে।

ফুঙ্গি-বিয়ানের বিভিন্ন চিত্র, চিত্রের হস্তী ব্যাঘ্রাদি—কাগজ ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত। কয়েক দিন ধরিয়া নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদ অন্তে শবাধার ঐ হস্তী বা ব্যাঘ্র-মূর্ত্তির উপর রাখিয়া উহাতে আগুন লাগাইয়া মৃতদেহ ভস্মীভূত করা হয় এবং দেহাবশেষ কোনও কায়ার মধ্যে সমাহিত হয়।

ক্যাপা শিয়াল কুকুরে কামড়াইলে পূর্ব্বে তাহার একমাত্র চিকিৎসালয় ছিল কলোলিতে। কিছুদিন হইতে শিলংএ ঐরূপ আর একটী চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্ম দেশের ঐরূপ চিকিৎসাগার রেঙ্গুনে নির্ম্মিত হইয়াছে।

ফুজি বিদ্যালয়ের দৃশ্য (১)

ফুজি-বিদ্যালয়ের দৃশ্য (২)

ফুজি-বিদ্যালয়ের দৃশ্য (৩)

ফুজি-বিদ্যালয়ের দৃশ্য (৪)

রেঙ্গুনের ফুবিলী হল রেঙ্গুনবাসীর আমোদ-প্রমোদ ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে সমবেত হইবার প্রধানতম কেন্দ্র। রেঙ্গুনে রীতিমত নাট্যালয় নাই, কাজেই এখানে বিভিন্ন বিভিন্ন নাট্যসমাজ আছে, তাঁহারা এখানে অভিনয় করিয়া থাকেন। গত বৎসর অহীন্দ্র চৌধুরী-প্রমুখ কলিকাতা আর্ট থিয়েটারের একদল অভিনেতা অভিনেত্রী এই ফুবিলী

ফুজি-বিরানের দৃশ্য (৫)

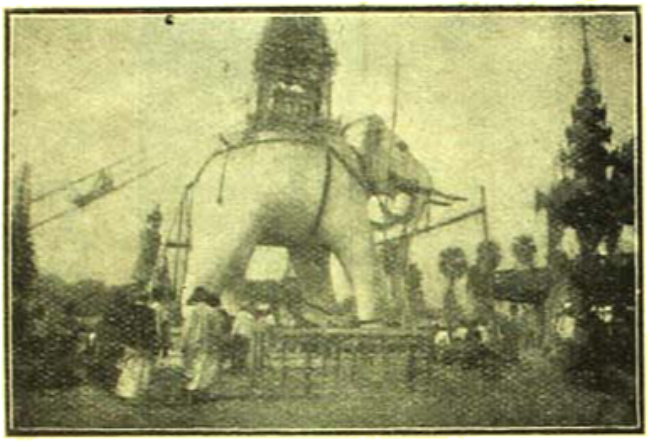

ফুজি-বিরানের দৃশ্য (৬)

সম্প্রদায়ের লোক মাঝে মাঝে উক্ত হলে নৃত্যগীত ও অভিনয়াদি করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীদেরই এখানে ৩৫টী হলে একমাস যাবৎ প্রায় প্রতি রাত্রেই প্রবাসী বাঙ্গালীর মনোরঞ্জন করিয়া গিয়াছেন। চীন যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথকে

একদল ফুজি ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে।

রেঙ্গুনে সর্ব্ব সম্প্রদায় হইতে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, ব্যাপার, স্বাস্থ্য ও কলা প্রদর্শনীর জন্য—সকল ক্ষেত্রেই তাহা এই জুবিলী হলেই হইয়াছিল। গত চই এই জুবিলী হল নিতান্ত আবশ্যক। এক কথায়

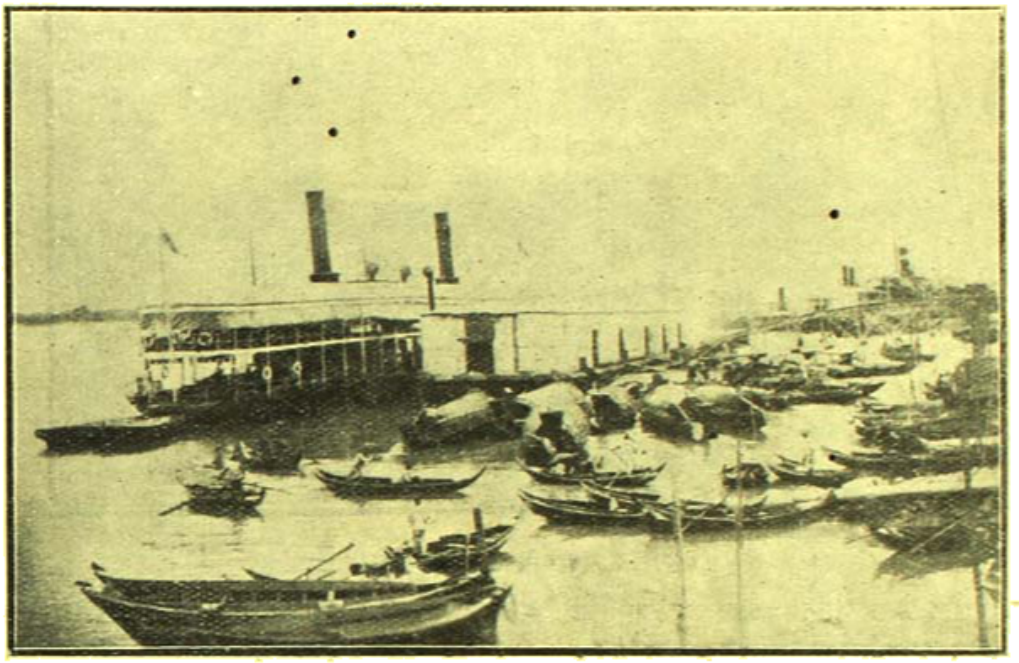

রেঙ্গুন বন্দর

বৎসর যাবৎ উক্ত হলে স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর মেলা জুবিলী হল রেঙ্গুনবাসীর "ছাই ফেলতে ভাঙ্গা হইতেছে। সভা সমিতি, নৃত্যগীত ও অভিনয়াদি কুলো।"

রেঙ্গুন বড় বাজার বা স্যুর্ত্তি বাজার—
বাজার পথের চিত্র

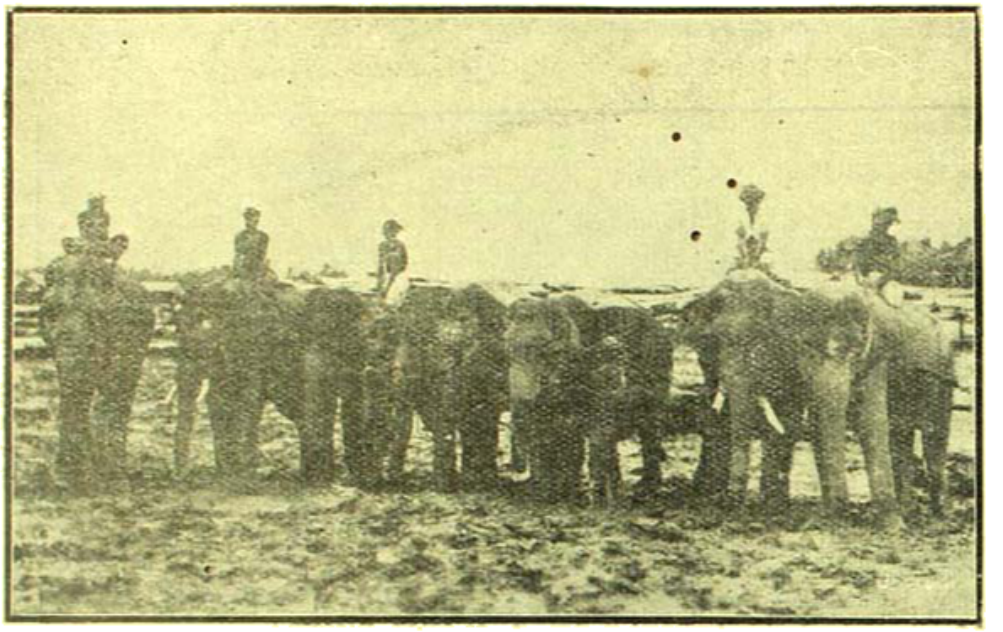

কাঠের কারখানায় একদল হস্তী

ব্রহ্মদেশ যে হস্তীর জন্য প্রসিদ্ধ তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। আর ব্রহ্ম দেখই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিয়া থাকে। বড় বড় কাষ্ঠ খণ্ডকে নাড়াচাড়া করিবার জন্য জঙ্গলের মধ্যে ও কাষ্ঠের কারখানায় (Timber yard) এই সব "মহাকায় বলিষ্ঠ বারণ"কে নিযুক্ত করা হয়। জঙ্গল হইতে কারখানায় অধিকাংশ কাষ্ঠ নদীতে ভেলার মত করিয়া ভাসাইয়া আনা হয়। পরে হাতীর সাহায্যে নদী হইতে কাষ্ঠ টানিয়া তোলা হয়।

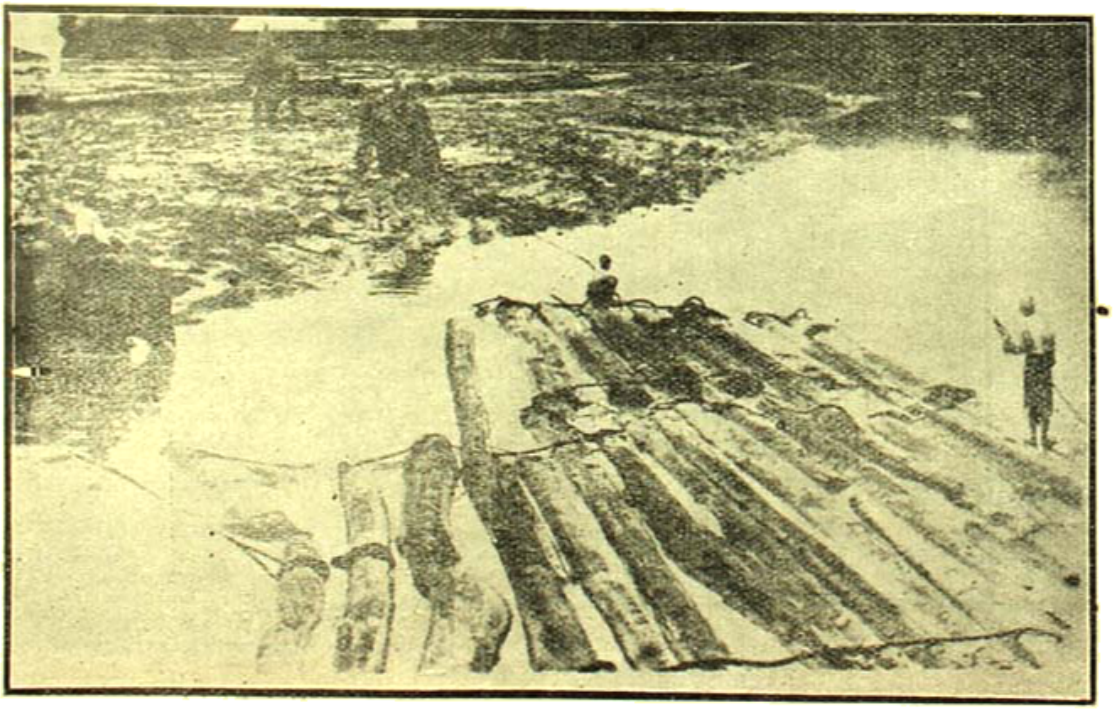

হস্তী দ্বারা নদী হইতে কাষ্ঠ উঠান

শান্তি : রেঙ্গুন চিত্র

সেণ্ট এণ্ড্রুজ—খ্রীষ্টান বালিকা বিদ্যালয় (St. Andrew's Convent)

হ্রদ-শ্রী হ্রদ (Hlawga Lake)

হ্রদ-শ্রী হ্রদের জল সহরে পানীয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। এই হ্রদ সহর হইতে ১৬ মাইল দূরে

ছবিনী হল, রেঙ্গুন

শ্বেডাগন্ পাগোডা—অঙ্গনে মন্দির-শ্রেণী

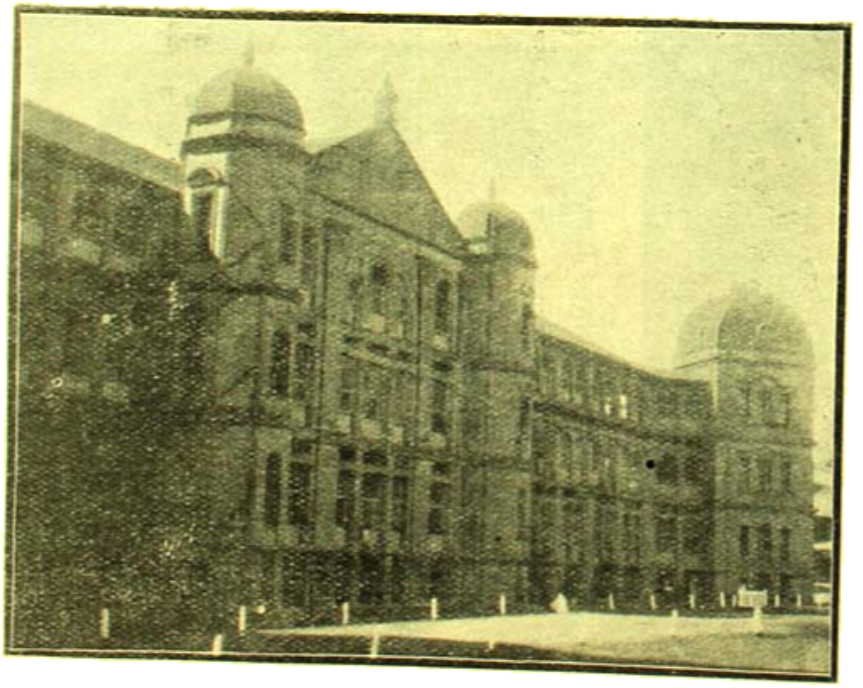

সরকারী হাসপাতাল (পূর্ব্বদিক)

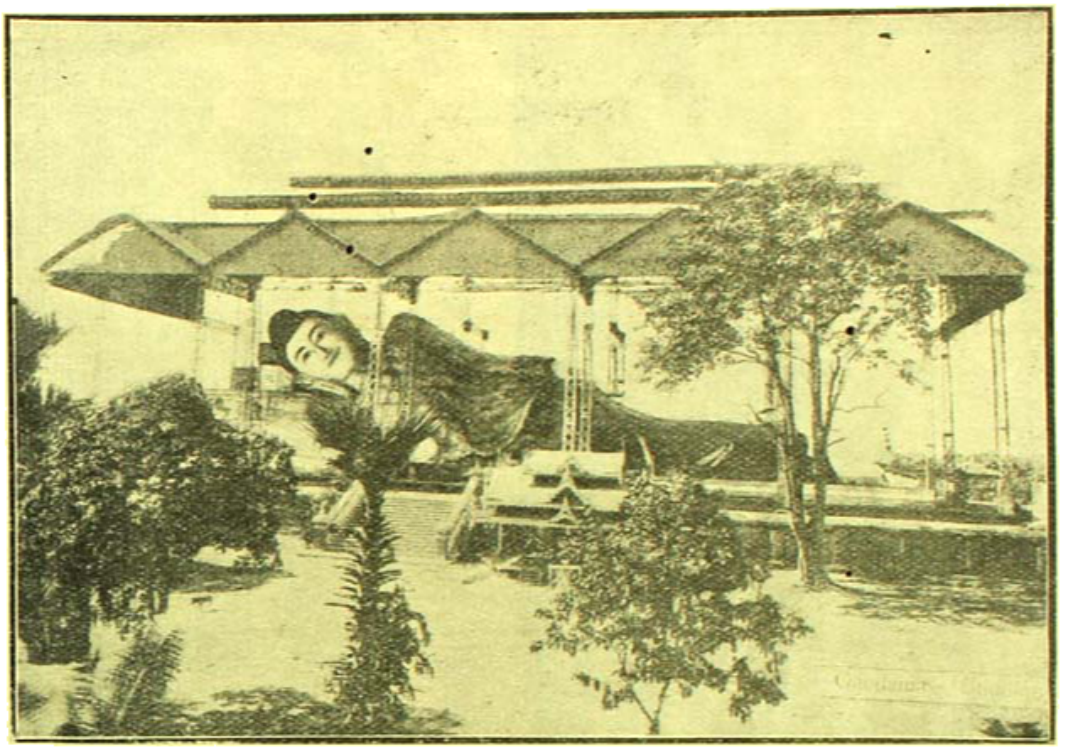

অন্তরঙ্গ মন্দিরে বুদ্ধদেব শায়িত

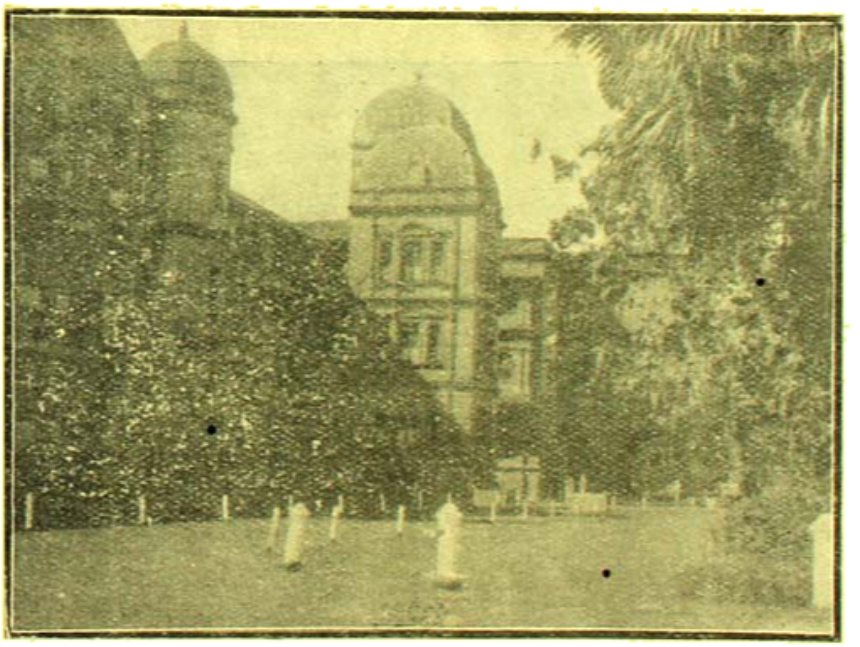

সরকারী হাসপাতাল (পশ্চিম দিক)

প্যাগোডা—অন্দরে ধনীর অর্ঘ্য বুদ্ধ-বিগ্রহ

হাইকে ও—দাতুগ [illegible]

প্রাসাদ চীনা ধনী লিম চিং হুংএর বাড়ী, সোকাইন

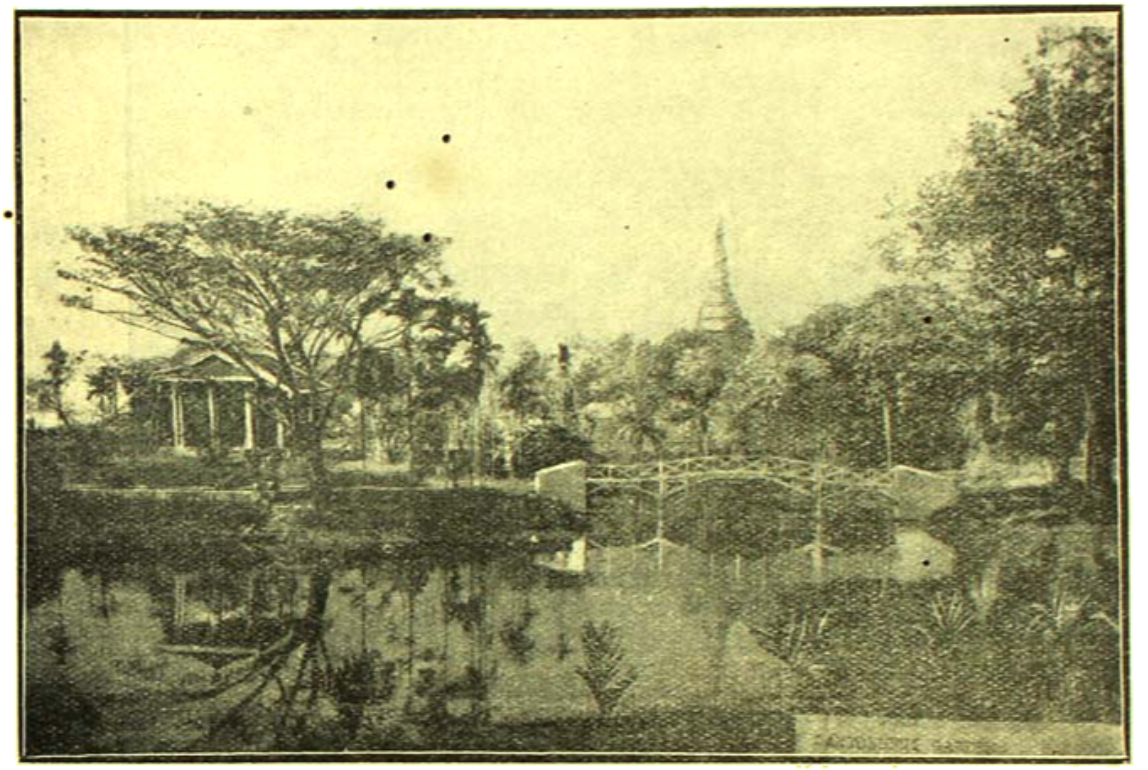

ক্যান্টন্‌মেন্ট্ বাগান (কয়েকদিন পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মরাজ মহিষী সুপায়ার সমাধি
দর্শনোপলক্ষে এই বাগানে হইয়া গিয়াছে)

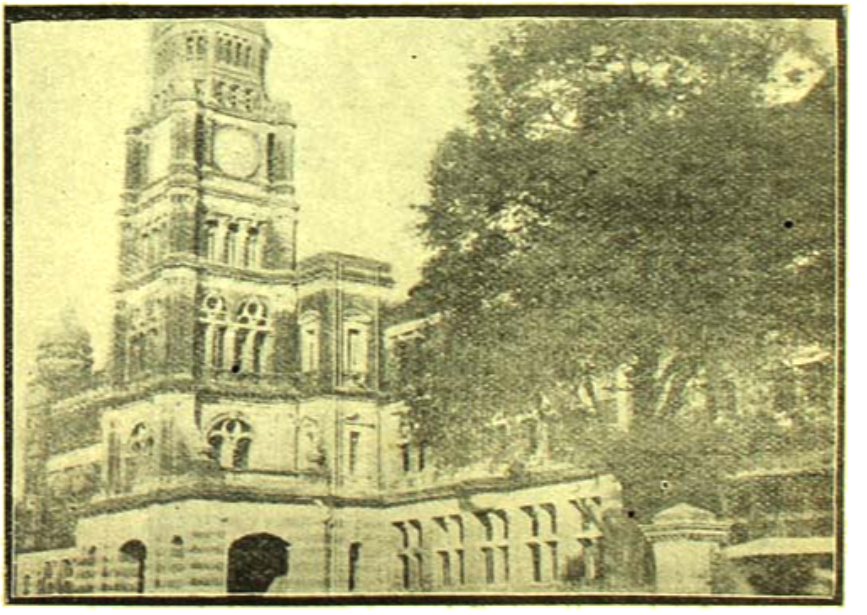

হাইকোর্ট—উত্তর দিক হইতে

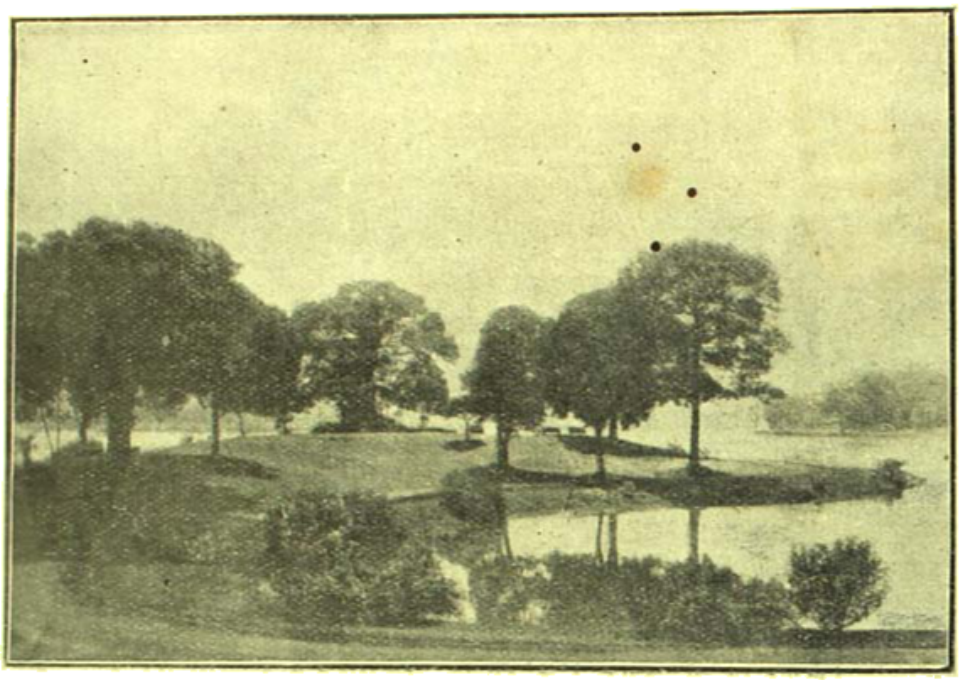

ভিক্টোরিয়া হ্রদ—রেঙ্গুন (Royal Lake, Rangoon)

ফুবিলী হল—সম্মুখ হইতে

ক্রীতদাসের 'ফারক'-পত্র

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সম্প্রতি ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ থানার অধীন যৌথা ঘোষপাড়ার একটি জমী সংক্রান্ত মামলায় কিশোরগঞ্জের হাকিম শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সরকার মহাশয়ের এজলাসে বিচারের জন্য উপস্থিত হ'য়েছিল। এই মামলার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল কাগজপত্র ও দলীল প্রভৃতি দাখিল হয়, তার মধ্যে একশত বৎসর পূর্ব্বের এমন একখানি দলীল পাওয়া গেছে, যা থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এত অল্প দিন পূর্ব্বেও এদেশে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় ও মুক্তি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল!

এই দলীলটি একখানি 'ফারক'-পত্র অর্থাৎ ছাড়-পত্র। এতে দেখা যায় যে, ১২৩২ সালে ৬ই মাঘ তারিখে নন্দীপুর নিবাসী শ্রীরামসঙ্কর দেব শ্রীরামকিশোর দেব ও শ্রীরামরতন দেব তাঁদের 'পৈতৃকমনুষ্য' অর্থাৎ ক্রীতদাস শ্রীবলরাম ঘোষকে তার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে 'ফারক'-পত্র লিখে দিচ্ছেন। এই বলরাম ঘোষের সহিত শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ নন্দী মহাশয়ের ক্রীতদাসী শ্রীমতী অম্বা দাসীর শুভ বিবাহ স্থির হওয়ায় উপরিউক্ত রামাদি দেবগণ তাঁদের মনিবীর দস্তরী বুকে নিয়ে তাঁদের মনুষ্যটিকে এই ছাড়পত্র লিখে দিয়েছিলেন।

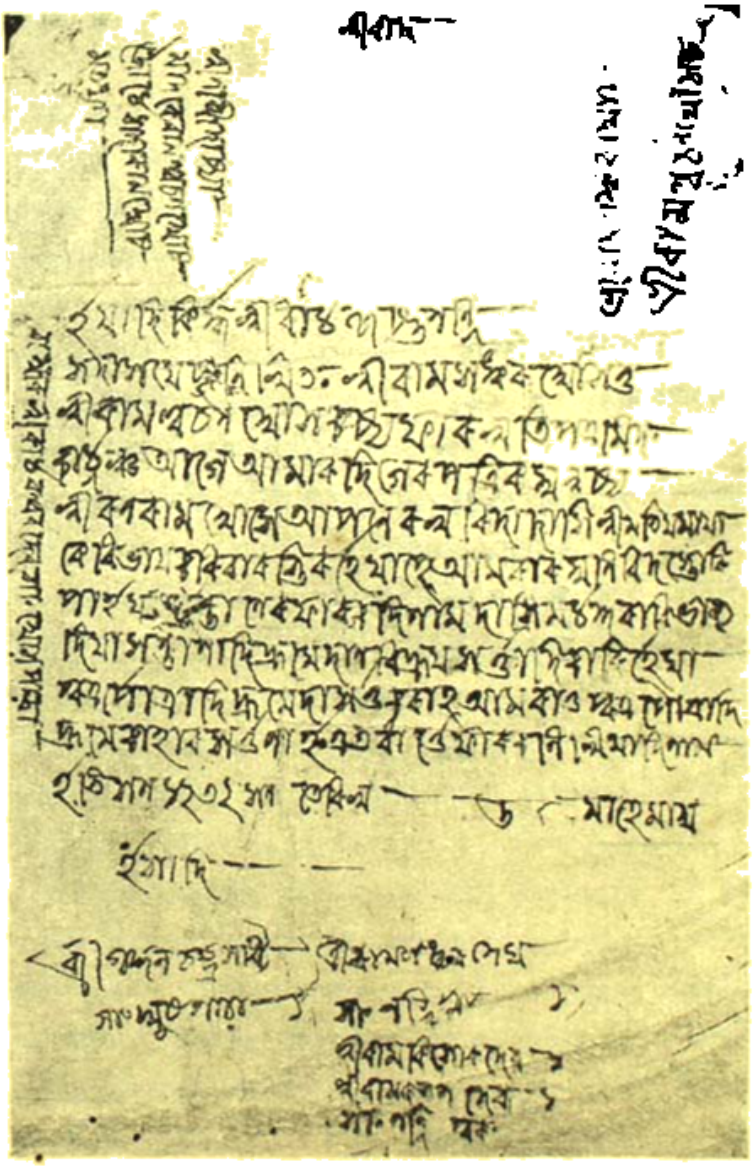

মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙলাদেশে যে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর অস্তিত্ব ছিল—এই দলীলখানি থেকে সেটা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয়; এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও যে সে সময় এই দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন করতেন এবং এ সংক্রান্ত দলীলপত্রও যে তখনকার আদালতে গ্রাহ্য হতো, এ সংবাদটাও জানতে পারা যায় আলোচ্য দলীলখানির উপর ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণের ১৮২৪ খৃঃঅব্দের শীলমোহর ছাপ দেখে! শ্রীযুক্ত সুবোধ বাবুর সৌজন্যে ভারতবর্ষের পাঠকপাঠিকাদের জন্য উক্ত দলীলের একখানি প্রতিলিপি ও তার অবিকল চিত্র প্রকাশ করা সম্ভবপর হওয়াতে তাঁর নিকট ঋণী রইলেম।

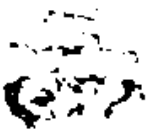

শ্রীরাম

ইয়াদিবিহ্ন শ্রীরাজকৃষ্ণ নন্দি
সদাসয়েষু লিখিত শ্রীরামসঙ্কর ঘোষ ও
শ্রীরামঘটন ঘোষ কস্য কারখতি পত্র মিদং
কার্জ্জঞ্চ আগে আমারদিগের পত্রিক স্বত্ব
শ্রীরঘুরাম ঘোসে আপনার খরিদা দাসি শ্রীমতি রমাবা
কে বিভায় করিবার স্তির হৈয়াছে রামরায় মনিবি দস্তোরি
পইয়া সন্তানের কারক দিলাম দাসি মজস্বরা বিভাহ
দিয়া সন্তানাদিক্রমে দান বিক্রয় সর্ত্তাধিকারি হৈয়া
পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দাসত্ব করাহ আমারও পুত্রপৌত্রাদি
ক্রমে কাহার সর্ত্ত নাই এতধার্ত্তে কারক লিখিয়া দিলাম
ইতি সন ১২৩২ সন তেরিখ ৬ মাহে মাঘ

শ্রীরামসঙ্কর ঘোষ
শ্রীরামঘটন ঘোষ

ইসাদি—
শ্রীগকুলচন্দ্র সাধ্য
সাং ঘুঘুপাড়া—১

শ্রীরামসঙ্কর দেব
সাং নন্দিপুর—১
শ্রীরামকিসোর দেব—১
শ্রীরামরতন দেব—১
সাং নন্দিপুর

শ্রীনন্দি রাজা
সাং ঘুঘুপাড়া

শ্রীরামরতন ঘোষ
কোং সরারাম ঘোষ

শঙ্কর শ্রীরামরতন দেব সাং ঘোষপাড়া

পণরক্ষা

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিনের ডাকসাইটে বনেদী বংশ। খ্যাতি-প্রতিপত্তির অবধি নেই। মস্ত বড় চক্-মিলানো দু'মহল বাড়ী—চূণ-বালী খ'সে, জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জর বের ক'রে, রুক্ষতার প্রতিমূর্ত্তির মতো কোন রূপে খাড়া হ'য়ে আছে। বাড়ীর মালিক রামলোচন মুখুজ্যেরও মেজাজ রুক্ষ ও খামখেয়ালী; তিনি সকল রকমে বংশের গৌরব রক্ষা ক'রে চলেন। তাঁর কথার এক চুলও কেউ এদিক ওদিক করতে পারে না। কৌলিন্য-গর্ব্বও তাঁর বড় কম ছিলো না। ভূতের হাত হ'তে বাড়ী রক্ষা করতে যেমন মন্ত্র প'ড়ে বাড়ীর আট্‌ঘাট্ বন্ধ ক'রে দেয়, রামলোচনও সেই রকম নিজেকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলেছিলেন। গণ্ডী বাঁচিয়ে কাজ করতে তিনি ভালোবাসতেন। উপরোধ-অনুরোধ বজায় ক'রে কোন কাজ করা তাঁর কোষ্ঠিতে লেখেনি। নিজে যা ভালো বুঝতেন তাই করতেন। তাঁকে সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে কেউ পারতো না। এই জন্য স্ত্রী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গেও সময় সময় তাঁর ঝগড়া হ'তো। শেষে কিন্তু রাজলক্ষ্মীকেই হার মানতে হ'তো। রাশভারী ব'লে তাঁর একটা খ্যাতি ছিলো। বয়স যে তাঁর ক'য়ের কোঠায় এসে পৌঁছেছে তা বলা কঠিন। তবে চল্লিশ হ'তে পঞ্চাশ-পঞ্চান্নোর ভিতর যে ছিলো, এ কথা বলা যায়। কৃপণ ব'লেও বদ্‌লোকে তাঁর অপযশ ঘোষণা করতো। তাঁর এক মস্ত দোষ এই ছিলো যে, তিনি সকল রকমে হিসাব বজায় রেখে চল্‌তেন।

তাঁর একমাত্র ছেলে অমল কলেজে পড়ে। তিনি তা'র এখনও বিয়ে দেন্ নি। কারণ পছন্দ-মতো মেয়ের বাপ এখনও খুঁজে পান্‌নি। মেয়ে যে রকম হয় হোক্, তা'তে কিছুমাত্র যায়-আসে না, তবে বংশ ভালো হওয়া চাই এবং মেয়ের বাপ সর্ব্বতোভাবে ভালো হওয়া চাই,—সদ্‌গতীর তো হবেই উপরন্তু ধনী হওয়া চাই। কারণ, রামলোচনের পণ ছিলো যে, ছেলের বিয়েতে নগদ হাজার-ছয় ও গহনা ইত্যাদিতে হাজার-চারেক,—খুব কম ক'রে এ না হ'লে ছেলের বিয়ে দেবেন না। সম্বন্ধ অনেক এসেছিলো এবং আস্‌ছেও; কিন্তু রামলোচনের একটিও পছন্দ হয় নি। এবং কেউ অত পণ দিতেও রাজী হয়নি।

রাজলক্ষ্মী এই জন্যে কত বলেছেন যে, পরের টাকায় কেউ বড়লোক হয় না। টাকা নিয়ে কি হবে? মেয়েটি যাতে সুন্দর হয় এই দেখে ছেলের বিয়ে দাও।

তা'র উত্তরে রামলোচন গম্ভীর ভাবে রাজলক্ষ্মীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন—তুমি বল কি! আমাদের কি বংশ তা তুমি জানো! কোনও পূর্ব্বপুরুষ আমাদের পণ না নিয়ে বিয়ে করেন নি। এই আমাদের প্রথা। আর ওটা মর্য্যাদা ছাড়া আর কিছু তো নয়। বংশ-গৌরব রক্ষা করতে পণ নিতেই হবে—এতে গরীব-বড়লোক নেই। আর আমি যা পণ চেয়েছি—এ তো আমার বংশের সম্মানের পক্ষে অতি সামান্য। এ যে দিতে না পারবে, তা'র এ বংশে মেয়ে দিতে আসাই ধৃষ্টতা। এই ধর না, আমার বিয়ের সময় তোমার বাবাকে সর্ব্বস্ব বেচে পণের টাকা যোগাড় করতে হয়েছিলো। আমার বাবাও জিদ্ ধরেছিলেন যে, তিনি যা পণ চান, তা নেবেন-ই—তা'তে কেউ সর্ব্বস্বান্ত হয় হোক, তার কমে ছেলের বিয়ে দেবেন না। আর তোমার বাবাও তুমি সুখে থাকবে বলে সর্ব্বস্ব বেচে বিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে, এ বংশের মর্য্যাদা ঐ রকমই। সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না।

রাজলক্ষ্মী উপদেশ বর্ষণের ধারায় এবং পূর্ব্ব-বিস্মৃত কথা স্মরণ হওয়ায়, বিষণ্ণ মনে সেখান হ'তে দূরে সরে যেতেন—কোন কথাই বল্‌তেন না। আর বল্‌বার আছেই বা কি। কেন যে তাঁর বাবা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন, তা তিনি জানেন না। আবার কোন্ এক হতভাগা এই বংশের সম্মান রাখ্‌তে সর্ব্বস্বান্ত হবে। তা'রা বুঝবে না

যে, এর ফল কি। অনন্ত প্রদীপে পতঙ্গ যেমন মরণ নিশ্চয় জেনেও লাফিয়ে পড়ে, সেটা যে কোন্ মোহের বশে তা যেমন সে জানে না, তেমনি মেয়ের নির্ধন বাপও এই অলীক মোহিনী-মায়াচ্ছন্ন বংশ-মর্য্যাদায় আকৃষ্ট হ'য়ে কি এক মোহের বশে সর্ব্বস্ব হারিয়ে চিরজীবন দুর্ব্বহ ভাবে কাটায়। নিজের নিজের কষ্টের কারণ তো হয়ই; পরন্তু মেয়ের জীবনও তারাক্রান্ত ক'রে তোলে। চিরদিন এই শোচনীয় অবস্থা মেয়ের প্রাণে খচ্‌খচ্ করতে থাকে। তারপর দরিদ্রের মেয়ে ব'লে তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অন্ত থাকে না। শেষ ফল দাঁড়ায় হয় তো মেয়ের আত্ম-হত্যা। এইটাই সব চেয়ে মজার যে, নিজের ছেলের বেলা কেউ ভেবে দেখে না যে, নিজের মেয়ের বিয়েতে পণ দিতে যেমন কষ্ট হয়, তেমনি অন্যেরও মেয়ের বিয়ে দিতে তা'র চেয়ে কিছু মাত্র কম কষ্ট হয় না। এ কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়! এই সংঘাতে প্রতি-নিয়ত যে কত ক্ষুদ্র প্রাণ বলি পড়্‌ছে, তা কেউ চোখ মেলে দেখে না। সকলেই চোখ-বাঁধা কলুর বলদের মতো নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরছে। চোখ যদিই বা কেউ খুলে দেয়, তা হ'লেও অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ থাকার দরুণ সে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখে না। কাজেই খোলা না খোলা একই দাঁড়ায়।

কালের গতিকই দাঁড়িয়েছে এই রকম। মুখে চীৎকার আছে, কিন্তু কাজের বেলায় প্রাণের সাড়া নেই। কাজেই রামলোচনকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সে পূর্ব্ব-পুরুষদের কীর্ত্তি যে রকম দেখেছে বা শুনেছে, সেই রকম ভাবে নিজেকে গ'ড়ে তুলেছে। নিজের স্বাধীন মত পঙ্গু হ'য়ে গেছে। তার ধারণা, কেন মেয়ের বাপ পণ দেবে না? একটা ছেলে মানুষ করতে কি কম খরচ! সেই খরচের কিছু পরিমাণ অংশ দেওয়াও তো মেয়ের বাপের উচিত। সেটা তো তা'র কর্ত্তব্যের একটা অংশ। আর দেবার ক্ষমতাই যদি না থাকে, তবে ভালো বংশ খোঁজা কেন?

বরের বাপেরা এক-একজন মহাজন বিশেষ। মাল একচেটে ক'রে বসে আছে। নিজের সুবিধা মতো দরে এক একটি ক'রে বাজারে বেচ্‌বে। যে কোন মূল্য সে চাইবে, তা মেয়ের বাপকে দিতেই হবে। এতে সে দেউলেই হোক আর যাই হোক, বরের বাপ তা দেখ্‌বে না। সনাতন মামুলি প্রথায় সে চল্‌বে। তোমাকেও দায়ে প'ড়ে উচ্চ দরে মাল কিন্‌তে হবে। কিন্তু এ দায় কেন?

* * *

অনল আর সকলের মতোই কল্‌কাতায় কলেজে পড়্‌তো, বক্তৃতা শুন্‌তো, আর হৈ হৈ ক'রে সময় কাটিয়ে দিতো। কিন্তু ছেলে সে ভালোই ছিলো। বছর বছর পাশ করে এইবার এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। তার বন্ধু সনৎ ছিলো তার সব,—মন্ত্রণাদাতা, ভয়ত্রাতা ইত্যাদি। সে সব সময়েই সনতের বাড়ী যেতো। সনতের বাপ মা তাকে খুব ভালোবাস্‌তেন। তাদের অবস্থা তত ভালো ছিলো না বলে' অনল মধ্যে মধ্যে নানা রকমে তাকে সাহায্য কর্‌তো। সনতের বোন বেণুকে অনল মনে মনে ভালোবাস্‌তো। অবশ্য মুখে এ কথা সে কারো কাছেই প্রকাশ করেনি, এমন কি সনতের কাছেও না। বিকালবেলা তিনজনে বসে গল্প কর্‌তো। কোন দিন বেণু গান গেয়ে তাদের তুষ্ট কর্‌তো। বেণুকে দেখেও মনে হতো—সেও যেন অনলকে ভালোবাসে। বেণু যদি দৈবাৎ কোনো কিছু ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌তো, তা' হ'লে তা সাধ্য-মতো পূরণ করাই ছিলো অনলের কাজ। এর জন্য অনলকে অনেক অনুযোগ-অভিযোগ শুন্‌তে হয়েছে, তবু সে ক্ষান্ত হ'তো না।

কবে একদিন বেণু একখানা কাপড় দেখে ভালো বলেছিলো, তাই সেদিন অনল অনেক খুঁজে সেই রকম একখানি কাপড় ও তারই মিল করা একটি জামা এনে বেণুকে উপহার দিলে। বেণুর কি আনন্দ! মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে সেই আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বসিত আবেগ ফুটে উঠ্‌লো। অনলেরও শ্রম সার্থক হ'লো। সে নিজেকে ধন্য মনে করলে।

এই রকমেই দু'জনে দু'জনের প্রতি নিজেদের অজ্ঞাত-সারে অনুরক্ত হ'য়ে পড়্‌ছিলো। অথচ কোন পক্ষই বিয়ের কথা উত্থাপন কর্‌তে পার্‌ছিলো না। কারণ, সনতের বাবা জান্‌তেন যে, তাঁর মতো লোকের ও-রকম ঘরে সম্বন্ধ কর্‌তে যাওয়া পাগ্‌লামি। আর অনলও তা'র বাপকে ভালো রকমই জান্‌তো।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন একটা অঘটন ঘ'টে গেলো। অনেক কষ্টে নিজের সামর্থ্য-অনুযায়ী ঘর-বর দেখে সনতের বাবা

বেণুর বিয়ের ঠিক করেছিলেন। কিন্তু সামান্য দু' একশ' টাকার জন্য সম্বন্ধ ভেঙে গেলো। এই খবর নিয়ে যখন সনতের বাবা বাড়ী আসেন, তখন অনল সেখানে ছিলো। এই খবরে সে খুব আনন্দ অনুভব করলে।

অনেক দিন হ'তে সে এমনি একটা সুযোগ খুঁজছিলো, যার অছিলায় সে নিজের বিয়ের প্রস্তাব করতে পারে। ইচ্ছা করলেই সে ঐ টাকাটা অনায়াসে দিয়ে দিতে পারতো; কিন্তু তা না ক'রে ব'লে ফেললে যে, সে বেণুকে বিয়ে করবে। তা'র এই কথায় সকলেই যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো।

অনল কিন্তু ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলে বেশ একটু মুস্কিলে প'ড়ে গেলো। বাপকে কি ক'রে রাজী করাবে এই তার প্রধান ভাবনা। তবে এক ভরসা যে, তা'র মাকে দিয়ে বলালে হয় তো রাজী হ'লেও হ'তে পারেন। কিন্তু সেখানেও বিশেষ সংশয়।

ছুটিতে বাড়ী গিয়ে সে রাজলক্ষ্মীকে সব খুলে বললে। তিনি শুধু চুপ ক'রে শুনলেন—কোনো কথা বললেন না। কারণ, রামলোচনের প্রকৃতি তাঁর অজানা ছিলো না। তাঁকে কিছু অনুরোধ করলে তার ফল কি দাঁড়াবে তা' রাজলক্ষ্মী ভালোই জানতেন। সেই জন্য ছেলেকে ভালোমন্দ কিছুই বলতে পারলেন না। অথচ ছেলেকেও ক্ষুণ্ণ করতে মন চাইছিলো না। কি করবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না।

কি ক'রে রামলোচনকে কথাটা বলবেন—কদিন ধ'রে মায়ে-বেটায় তাই পরামর্শ চলতে লাগলো। পরে ঠিক হ'লো অনল চ'লে গেলে রাজলক্ষ্মী রামলোচনের কাছে কথা তুলবেন। অনল অগত্যা রাজী হ'লো। সে থাকতে থাকতে বললে হয় তো সমস্ত ভার পড়বে তা'র উপর—এই ভয়েই রাজলক্ষ্মী, অনল চ'লে গেলে বলবার মত করলেন।

ছুটি অন্তে অনল কলকাতায় এসে লজ্জায় সনতদের বাড়ী গেলো না। ঝোঁকের মাথায় কথা দিয়ে এখন সেই কথা রাখতে না পারলে সকলের কাছে লজ্জার অবধি থাকবে না। বিশেষতঃ তা'র কথায় বেণু কি রকম আনন্দোৎফুল্ল হয়েছিলো, চোখের নীরব ভাষায় সে তা'র অন্তরের গোপনতাকে কি রকম ক'রে মুক্ত করেছিলো এবং লজ্জাবনত হ'য়ে কি রকম ক'রে তা'কে অভিনন্দন করেছিলো, এ সমস্তই তো অনলের কাছে ধরা পড়েছিলো। কাজেই আর কারো কাছে লজ্জিত হোক বা না হোক, বেণুর কাছে সে নিজের অপৌরুষের হীনতা জানাতে পারবে না। বেণু এখন একান্ত ভাবে তা'র উপরই নির্ভর ক'রে আছে। কিন্তু যখন সে তা'র কথার অসারতা জানতে পারবে, তখন তা'কে কি ভাববে, এইটাই অনলকে বেশী ক'রে পীড়া দিচ্ছিলো।

অনল সকলের কাছেই বড় গলা ক'রে বলেছে যে, সে বিনাপণে গরীবের মেয়ে বিয়ে করবে। কিন্তু এই কথাগুলি বলবার সময় তা'র একবারও মনে হয় নি যে, তা'র বাপের কঠোরতা তা'র কথাকে কতখানি অসার প্রতিপন্ন করতে পারে। আজ সকলেই বলবে যে, কোথায় রইলো তা'র কথার মূল্য, তার মনুষ্যত্ব! অথচ রামলোচনকে বোঝালেও তিনি বুঝবেন না। তাঁর মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে টলানো তার কাজ নয়—এ সে পূর্ব্বে জেনেও জানেনি। টাকা যে রামলোচনের কি রকম প্রিয়, তা সে জানে। কাজেই তাঁর কাছে বিনা পণে বিয়ের কথা বলাই বৃথা। বেশীর ভাগ সে বাপের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়বে। কিন্তু তবু যা অন্যায় তা গ্রহণ করতে তা'র মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিলো না। ঘৃণায় লজ্জায় সে মুহ্যমান হ'য়ে পড়লো।

মনে পড়লো বেণুর যখন অন্য জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হয়, তখন কি রকম অসহায় ভাবে সে তার মুখের দিকে চেয়েছে। সেই চাহনিতে সে চেয়েছে তা'র কাছ হ'তে উপায়। অনলও তখন কোনো উপায় না পেয়ে হতাশ হ'য়ে উঠেছে। অথচ আজ যখন উপায় হ'লো তখন সব চেয়ে সে নিরুপায় হ'য়ে পড়লো। তার প্রতি বেণুর নির্ভরতা সে কি করে ভাঙবে, এইটাই তা'র সমস্যা হ'লো। সে ভাবনার অতল তলে ডুব দিলে।

• • •

রামলোচন যখন রাজলক্ষ্মীর কাছে সব শুনলেন, তখন ভালোমন্দ কোনো কথাই তিনি বললেন না। মুখ গম্ভীর ক'রে চুপ ক'রে বসে রইলেন। রাজলক্ষ্মীও কিছু বুঝতে পারলেন না যে, রামলোচনের মত কি। তার পর হঠাৎ এক দিন রামলোচন কলকাতা চ'লে এলেন।

সেদিন সকালে অনলের ঘুম ভাঙলো রামলোচনের ডাকে। সে পিতাকে অসময়ে কলকাতায় আসতে দেখে

একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো, এবং তাও যে একটু না হ'লো এমন নয়।

রামলোচন অন্য কোনো কথা বলবার আগেই গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—শুনলাম, তুমি না কি নিজের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছো। এখন জ্ঞান-বুদ্ধি হ'য়েছে—যা ভালো বুঝেছো তাই করেছো। কিন্তু জান তো, আমি যা পণ চাই, তা'র এক পয়সা কমে আমি বিয়ে দেবো না। এতে যদি মনঃক্ষুণ্ণ হও, তা হ'লে নাচার। পরে একটু থেমে বল্‌লেন—চলো, কোথায় ঠিক করেছো, সেখানে নিয়ে চলো।

অনল কোনো কথাই বল্‌লে না। আর এর উপর বল্‌বারই বা কি আছে। তা'র ভয় হ'তে লাগ্‌লো, পাছে রামলোচন সেখানে গিয়ে কিছু রূঢ় ব্যবহার করেন। তাহ'লে তার লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাক্‌বে না। মনে হতে লাগ্‌লো—কেন সে এ কথা বল্‌লে। নিজের উপর দিয়ে সকল অত্যাচার সইতে সে প্রস্তুত; কিন্তু তার নিজের জন্য অপরকে লাঞ্ছিত কর্‌তে সে মোটেই ইচ্ছুক নয়। কিন্তু এখন উপায় কি। ঢিল ছোড়া হয়েছে, আঘাত বুক পেতে নিতেই হবে। সে রামলোচনকে সনতদের বাড়ী নিয়ে গেলো।

রামলোচনকে সনতের বাবা অভ্যর্থনা করে বসালেন। রামলোচন ঘরের চারিধার দেখে মুখ সিঁট্‌কালেন—সর্ব্বত্রই দারিদ্র্য তার জীর্ণ পঞ্জর মেলে আছে। সনতের বাবা এই সম্মানিত অতিথির কাছে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রামলোচন বিরক্তভাবে বল্‌লেন—আমার ছেলে আপনার মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায়। আমার যা পণ তা শুনেছেন বোধ হয়।

সনতের বাবা কুণ্ঠিত হ'য়ে উত্তর কর্‌লেন—কিন্তু আমি তো অত দিতে পার্‌বো না। আমার অবস্থা তো দেখ্‌ছেন।

রামলোচন বল্‌লেন—অবস্থার দিকে দেখতে গেলে আমার চলে না। যাক্, আপনি কত দিতে পারেন?

সনতের বাবা একটু আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লেন—হাজার চারেক; তাও এই বাড়ী বাঁধা দিয়ে।

রামলোচন মুখ কুঞ্চিত ক'রে শুধু বল্‌লেন—হুঁ। একটু থেমে কি ভেবে বল্‌লেন—মেয়ে আনুন। এত কমে রাজী হচ্ছি বলে মনে কর্‌বেন না যে, খুব দাঁও মার্‌লেন। পরে আরো কিছু দিতে হবে।

সনতের বাবা মেয়ে আন্‌তে চলে গেলেন। অনল এতক্ষণ লজ্জায় চুপ করে নিস্পন্দ হয়ে বসে ছিলো। রামলোচনের কথায় আশ্চর্য্য হয়ে ভাব্‌লে যে, কি ক'রে তিনি এত কমে রাজী হলেন। যাক্, এখন তো কাজ মিটে যাক্, তার পর সুবিধা মতো সে নিজে এঁদের এই টাকা শোধ করে দেবে। এবং পরে রেণুকে সব বলে সে লজ্জার হাত হতে মুক্ত হবে।

রামলোচন মেয়ে দেখে ভালোমন্দ কিছু না ব'লে তাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন এবং বিয়ের দিন ঠিক করে বল্‌লেন—বিয়ের দিন দুয়েক আগে আমার গোটা কুড়ি টাকা পাঠিয়ে দেবেন। মেয়ের গহনা আপনাকে কিছু দিতে হবে না। আমি পরে গড়িয়ে দেবো। শুধু ফুলি হাতে দিয়ে মেয়ে সম্প্রদান কর্‌বেন। টাকা সব নগদ দেবেন।

সনতের বাবা তাতেই রাজী হলেন।

বিয়ে হয়ে গেলো। সম্প্রদানের সময় শুধু ফুলি হাতে দিয়ে সনতের বাবা মেয়ে দান কর্‌লেন। রামলোচন পণের টাকা ভালো করে বাজিয়ে এক একটি করে গুণে নিয়ে তাঁর সরকারের হাতে জিম্মা করে দিলেন। তাঁর এই ব্যবহারে ভিড়ের ভিতর হতে একজন কে বলে উঠলো—লোকটা কি চামার! রামলোচন সে কথায় ভ্রূক্ষেপ কর্‌লেন না।

পরদিন বর কন্যা বিদায়ের সময় রামলোচন সরকারকে ডেকে বল্‌লেন—গাড়ী থেকে কুড়িটা নামিয়ে আনো।

কুড়ি এলে তার ডালা খুল্‌তেই সকলে আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌লে তার মধ্যে রয়েছে ডালা টাট্‌কা ফুলের নানাবিধ গহনা—মাথা থেকে পায়ের পর্য্যন্ত।

রামলোচন সনতের বাবাকে সেই ফুলের গহনা দিয়ে মেয়ে সাজিয়ে দিতে বল্‌লেন।

বেণু যখন ফুলের গহনায় সেজে বাইরে এলো, তখন রামলোচন তার মুখটা উঁচু করে তুলে ধ'রে হাসিমুখে বল্‌লেন—দেখো দেখি বেয়াই, মাকে কেমন মানিয়েছে! পার্ব্বতী যখন বাপের বাড়ী যাবেন ব'লে কুবেরকে তাঁকে সাজিয়ে দিতে বল্‌লেন, তখন কুবের তাঁর ভাণ্ডার খালি ক'রে শ্রেষ্ঠ রত্ন এনে মাকে সাজাতে লাগ্‌লেন। মার তা

পছন্দ হলো না। কুবের লজ্জিত হলেন। মা নন্দীকে সাজাতে বল্‌লেন। নন্দী হাকে আগাগোড়া ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। মা খুশী হয়ে বাপের বাড়ী গেলেন। এর চেয়ে কি আমার এই মা'টিকে গহনায় মানাতো?

সকলে ভাবলে, রামলোচন এই ফুলের গহনা দিয়েই কাজ সেরে টাকাগুলি আত্মসাৎ কর্‌লেন। কিন্তু রামলোচন সকলের বিস্ময়কে আরো বাড়িয়ে দিলেন, যখন পণের সমস্ত টাকা সনতের বাপের হাতে দিয়ে বল্‌লেন—পণের সমস্ত টাকা এতে আছে। এ টাকা তোমায় বিনা সুদে দিলাম। ইচ্ছে হয় পরে তোমার মেয়ে জামাইকে শোধ দিও। আমার ও টাকায় দরকার নেই। আমি ঐ কুড়ি টাকা নিয়ে নিজের পণ রক্ষা করেছি। সস্তায় কিস্তি মেরে তারী ঠকাবে ভেবেছিলে না? আমায় আজ পর্য্যন্ত কেউ ঠকাতে পারেনি। আমার কথায়ও ধা, কাজেও তা। ব'লে হো হো করে হেসে উঠলেন।

তাঁর হাসি থামার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ছুটো হাত-বাক্‌সো এনে তাঁর সাম্‌নে রেখে দিলে। তিনি তার একটা খুলে বেণুর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—এতে মা তোমার আটপৌরে গহনা রইলো। আর একটা বাক্‌সো খুলে বল্‌লেন, এতে জড়োয়া গহনা রইলো। তোমার যখন যেটা ইচ্ছে হয়, প'রো।

তার পর সনতের বাবার দিকে ফিরে বল্‌লেন—চলি বেয়াই, অনেক কাজ আছে। চলো মা চলো।

অনল ও বেণু অসীম শ্রদ্ধায় আভূমি নত হয়ে প্রণাম কর্‌লে। সকলে বিস্ময়মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল

১ই সেপ্টেম্বর সকালে আমাদের প্রথম কাজ হলো, গাড়ী দু'খানি ওখানকার কোনো মোটরের কারখানায় পাঠিয়ে তাদের আগাগোড়া পরখ আর মেরামত করানো। কাশ্মীর-গেটের কাছে ইষ্টার্ণ মোটর-কার কোম্পানির কারখানাই এ-কাজের খুব যোগ্য মনে হওয়ায় সেইখানে গাড়ী পাঠানো হলো। তারপর আমরা দু'খানি টঙ্গা ভাড়া করে দিল্লী-ফোর্ট দেখতে বেরুলুম।

এই দিল্লীই ছিল এককালে রাজা যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ। পরে ঐতিহাসিক যুগে রাজা অনঙ্গপালের যে রাজধানী ছিল, সে দিল্লী হলো কুতব-মিনারের কাছে। সে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের কথা—অনঙ্গপালের রাজধানীর নাম ছিল লালকোট্। তারপর ১১৮০ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ আবার নতুন করে রাজধানী গড়েন অনঙ্গপালের সেই ধ্বংস-স্তূপের উপর। আজো তার চিহ্ন পড়ে আছে—এবং বেশ উজ্জ্বল সে চিহ্ন! পুরানো দুই দুর্গ এবং লৌহস্তম্ভ হিন্দু-আধিপত্যের বিজয়-নিশান—আজো দিল্লীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয় নি।

পাঠান আমলের প্রধান কেল্লা সিরি—আলাউদ্দিন তৈরী করান ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে; কুতব-মিনার গড়েন এই আলাউদ্দিন খিলিজি হিন্দু মন্দির এবং হর্ম্ম্যরাজি ভেঙ্গে তার বুকের পাঁজরার উপর। তারপর তোগলক বংশের পালা। ফিরোজশাহ তোগলকাবাদ নাম দিয়ে নতুন রাজধানীর পত্তন করলেন। তার পর লোদি-বংশ প্রাধান্য লাভ করে; সেকন্দর লোদি ও বেহলল্ লোদির দুই সমাধি দিল্লীর বুকে লোদি-বংশের প্রাধান্যের রেখার মত পড়ে আছে, আজও!

পাঠান বাদশা শের শাহও দিল্লীতে আধিপত্য করে গেছেন; তবে হুমায়ুনের হাতেই মোগল-দিল্লীর আসল গড়ন সুরু হয়। তাঁর পরে আকবর দিল্লী থেকে আগ্রায় রাজধানী তুলে নিয়ে যান্। আকবর এবং জাহাঙ্গীর দিল্লীর

সৌষ্ঠব-সাধনে ততটা মনোনিবেশ করেন নি। দিল্লীর শ্রী-সম্পাদনে মনোযোগী হন বাদশা শাহ্ জাহান। দিল্লীর দুর্গ তাঁর আমলেই তৈরী হয়। দুর্গটি লাল রঙের বেলে-পাথরে তৈরী (sand stone)—এ মহল্লারও নাম হয় তখন শাহ্-জাহানাবাদ। শত্রুর অস্ত্র দিল্লীকে চিরকাল বিপর্য্যস্ত করে এসেছে;—এই দিল্লীতে পৃথ্বীরাজ পরাস্ত হন্ শাহাবুদ্দিন ঘোরীর হাতে; তারপর তৈমুর-লঙের আক্রমণ ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে; নাদির শাহের আক্রমণ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এবং আফগান আহমদ শাহ দুরাণির আক্রমণ

এমনি নানা জিনিষের দোকান। সামনেই নহবৎখানা। বাদশাহী-আমলে ঘোড়ায় চড়ে আমীর-ওমরাওদের দলের কেউ দুর্গে এলে তাঁদের ঘোড়া থেকে এখানে নামতে হতো। শুধু শাহ্জাদাদের সম্বন্ধেই এ নিয়ম খাটতো না; তাঁরা ঘোড়ার পিঠে চড়েই সোজা দুর্গে প্রবেশ করতেন; ঘোড়া থেকে তাঁদের আর নামতে হতো না।

ফটকের সামনে খিলান, তারি নীচের পথ পার হলে মস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন পথের পূর্বদিকে দেওয়ান্-ই-আম্। এর উত্তরে দেওয়ান্-ই-খাস্। দেওয়ান-ই-খাসে

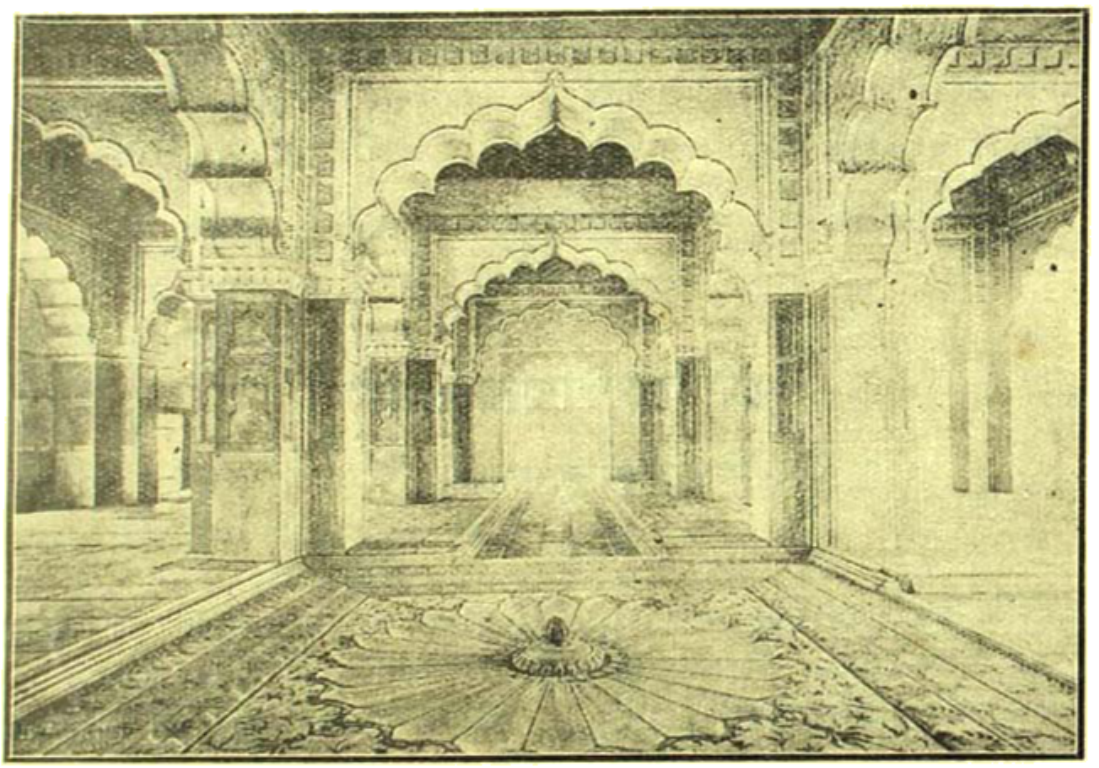

দিল্লী—রঙ্গমহাল

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে। নর-শোণিতে দিল্লী যেমন রঞ্জিত হয়েছিল, পৃথিবীর বুকে আর কোনো দেশের ভাগ্যে বোধ হয় তেমনটি ঘটেনি! সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক বলেছেন,—

.....শোণিতের কথা
তোমারে ঘিরিয়া ঘুরিয়া নাচে!

যাক্—যে কথা বলছিলুম। দিল্লীর দুর্গে প্রবেশ করলুম; —যে-ফটক দিয়ে প্রবেশ করলুম, তার নাম লাহোর গেট্। ফটক দিয়ে ঢুকে পথের দুধারে অনেকগুলি কামরা। এ কামরাগুলিতে এখন বাইশিক্, ছুতা, সোডা-লেমনেড্

তখ্ত-ই-তাউস বা ময়ূর-সিংহাসন ছিল। তাতে বাদশা বসতেন—এর ছাদ ছিল রূপার মোড়া। আঠেরো সে রূপা খুলে নিয়ে গেছে। দেওয়ান-ই-খাস্ শ্বেত পাথরে তৈরী; বারোটী সুন্দর থামের উপর ছাদ। এই দেওয়ান-ই-খাসের সামনের খিলানে ফারসী হরফে লেখা আছে,—

অগর ফিরদৌস্ বরুয়ে জমীনস্ত্।
হমীনস্ত, ওয়া হমীনস্ত, ওয়া হমীনস্ত।

অর্থ যদি কোথাও থাকে মর্ত্যলোকের মাঝখানে।
এইখানে সে, এইখানে সে, এইখানে সে এইখানে।

এই 'দেওয়ান্-ই-খাসে'র কামরায় বসে নাদির শাহ দিল্লী লুঠ করবার আদেশ দেন্; এইখানেই আহ্মদ শাহ দুরাণি গুসে নিজের জয়-বার্ত্তা ঘোষণা করেন, আর এই কামরাতেই রোহিলা গোলাম কাদের হতভাগ্য বাদশা শাহ আলমকে

দিল্লী—নিজামুদ্দিন কুয়ায় ঝাঁপ খাওয়া

অন্ধ করে দেন! আর এই কামরায় বসেই বাদশা ফরুক-শিয়র ইংরাজ ডাক্তার গেব্রিয়েল হামিল্টনকে হুগলিতে কুঠি-স্থাপনার সনন্দ দেন্!

দেওয়ান্-ই-খাসের দক্ষিণে রঙ-মহাল—সম্রাজ্ঞীর বাস-গৃহ। তার দক্ষিণে মমতাজ-মহল; এই মহলে এখন দিল্লীর আর্কিওলজিকাল মিউজিয়ম স্থাপিত হয়েছে।

দেওয়ান-ই-খাসের উত্তরে বাদশাহী হামাম। হামামে তিনটি ঘর; তাছাড়া মতি মসজিদও এর পাশে। মতি-মসজিদ শ্বেতপাথরে তৈরী;—ছাদের উপর তিনটি গম্বুজ, তার উপর সোনার কলাই-করা কাজ। এ মসজিদটি তৈরী করান্ বাদশা ঔরংজীব, বাদশাহ ও বেগমদের উপাসনার জন্ত। এই গৃহগুলির উত্তরে বাগান। বাগানের মধ্যে শাহজাহান আর তাজই নামে ছোট্ট দুটী মহল—এ মহলে বসে বেগমদের নিয়ে বাদশা বর্ষার বারিধারার উৎসব-লীলা দেখতেন।

দুর্গের একপ্রান্তে যুদ্ধ-মিউজিয়ম—সম্পূর্ণ একালের। সেখানে গত মহাযুদ্ধের বহু স্মৃতিচিহ্ন জড়ো করা আছে।

দুর্গ দেখা শেষ করে দিল্লীর পথে চক্র দিয়ে খানিক ঘোরা গেল। দিল্লী যেন ভারতবর্ষের ইতিহাস! নানা-জাতির উত্থান-পতনের ধারা এই দিল্লী বয়ে চলে এসেছে, সে কোন্ অতীত অনাদি যুগ থেকে! সত্যেন্দ্রনাথের 'দিল্লী-নামা'র কয় ছত্র কেবলি মনে পড়ছিল,—

পাণিপথে

অতুল! বিরাট! বিপুল দিল্লী!
শত-সম্রাট-প্রেয়সী ধন্যি!
গজমোতি গুঁড়া তব পথধূলা
মোহিনী! রূপসী! মহিমময়ী!
... ...

মোগল মরেছে, মরেছে পাঠান,
কেঁপে আছে তার কীর্ত্তি যত,
কেল্লা-কসর পাহাড়-সোধের
বুকের-বীণার সমুদ্ভূত !
... ...
অতীতের রাগী রক্তে রঙীন !
অতীত-সাক্ষী চির তুমি,
তুমি রণমহাবিস্ত কলিন্দ।
শক্তির তুমি লীলার ভূমি !

দিল্লী সত্যই অতীতের সাক্ষী। তার অসংখ্য মসজিদ, অসংখ্য সমাধি-স্তম্ভ—প্রাচীন সভ্যতার কি কাহিনীই না বুকে নিয়ে আজ মৌন পাষাণ দাঁড়িয়ে আছে !

মসজিদগুলির মধ্যে প্রধান হলো জুমা মসজিদ,—এটি ঔরংজীব তৈরী করান। মসজিদটি তৈরী হতে চৌদ্দ বৎসর সময় লেগেছিল। তার সুবিস্তীর্ণ সোপান-শ্রেণী দেখলে তাক্ লাগে ! মসজিদের উপর পারসী হরফে লেখা আছে,—ইয়া হাদি ! অর্থাৎ, হে গুরু !

কালান-মসজিদ—ফিরোজ সাহ তোগলাকের তৈরী। সোনেরী মসজিদ—রৌশন-উদ্দৌলার তৈরী। এই মসজিদের মঞ্চে বসে নাদির শাহ দিল্লীর ভীষণ নরহত্যা দেখে আনন্দে স্ফীত হয়েছিলেন ! চাঁদনী চকের কাছে ফতেপুরী মসজিদ শাহ জাহান বেগমের তৈরী। আর-একটি ছোট মসজিদ আছে দেখবার মত—সে মসজিদের নাম জিন্নৎ-উন্নিসা বেগমের মসজিদ। জিন্নৎ ছিলেন বাদশা ঔরংজীবের কন্যা।

তারপর সমাধি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হুমায়ুনের সমাধি। হুমায়ুন-পত্নী হামিদা বেগম এই সমাধি তৈরী করান্। এই বিস্তীর্ণ সমাধি-মন্দিরে হুমায়ুন, হুমায়ুন-বেগম হামিদা বানু ও হুমায়ুনের অন্য পুত্র-কন্যাদের সমাধি

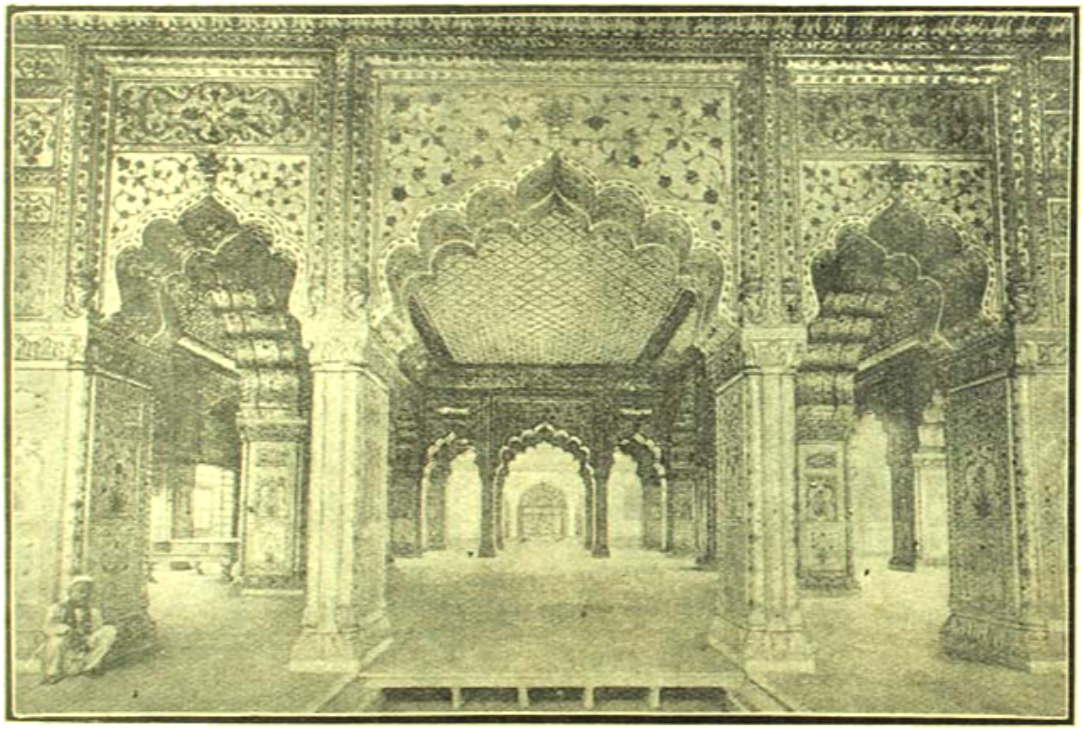

দিল্লী—দেওয়ান-ই-খাস্ অভ্যন্তর

আছে। এই সমাধি-মন্দিরের এক কক্ষে শেষ মোগল বাদশা মহম্মদ শাহ এসে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে-ছিলেন—শেষে এই ঘরেই তিনি ইংরাজের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। অদৃষ্টের এমনি বিধান ! যে-হুমায়ুন ভারতে মোগল-শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন, সেই হুমায়ুন যে-মন্দিরে শেষ শয়নে চিরনিদ্রায় অভিভূত, সেই মন্দিরেই মোগল-শক্তির বিসর্জ্জন হলো ! হাসি ও অশ্রুর, আনন্দ ও শোকের এমন মিলন বুঝি কল্পনাতীত ! এই সমাধির দক্ষিণ দিকে একটু দূরে আরো দুটী সমাধি-মন্দির আছে। একটির নাম

নীল বুরুজ। শুনলুম, সেটি হুমায়ুন-বেগমের চুড়িওয়ালীর কবর, তার পাশে আর একটি সমাধি আছে, গাইড বললে, সেটি হুমায়ুনের নাপিতের সমাধি। তারপর উল্লেখযোগ্য সফদরজঙ্গ, রহিমা বেগমের কবর ও নিজামুদ্দিন।

নিজামুদ্দিন। নিজামুদ্দিন ফকির; বাদশা আলাউদ্দিন খিলিজি ছিলেন তাঁর শিষ্য। মুসলমানরা নিজামুদ্দিনকে খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। এঁর সমাধি আর মসজিদ চতুর্দিকে মস্ত প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহের মত। এই গৃহে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাধি আছে। এ মন্দিরে ঢুকে প্রথমেই দেখি, মস্ত একটি কূয়া বা বাউলী। কূয়াটি লম্বে ১২০ হাত, চওড়ায় ৮০ হাত, জল ৩০ হাত। গভীর এ কূপ নিজামুদ্দিনের আমলের—কূপের জলের বর্ণ আজ সবুজ। এই সমাধি-গৃহের খিলান-দেওয়া পথের ডান দিকে গম্বুজওয়ালা একটী ঘর; সেই ঘরের ছাদ থেকে অনেক লোক আট আনা পয়সা পেলে কূপের মধ্যে ঝাঁপ খেয়ে নিজেদের সাহস আর শক্তির পরিচয় দেয়।

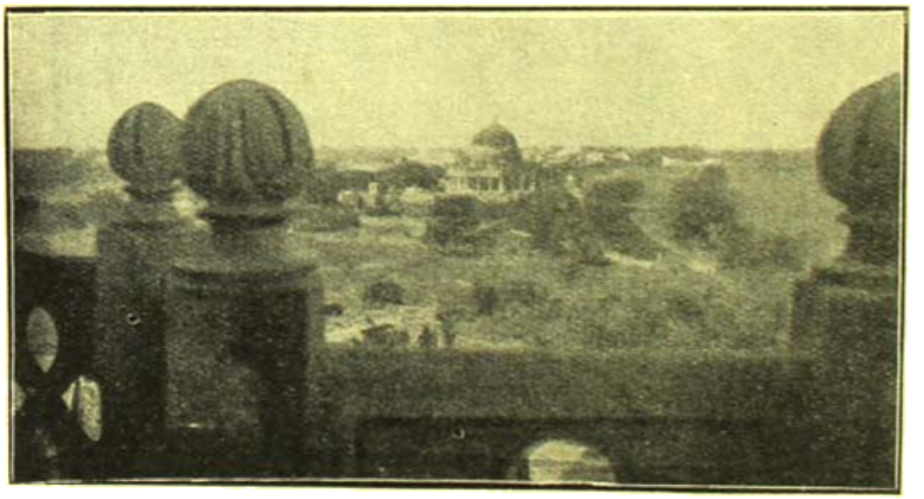

দিল্লী—টোগলকাবাদ কুতব মিনারের বারান্দা হইতে

খিলান-দেওয়া যে-পথের কথা বলেচি, সেই পথের পরেই প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে নিজামুদ্দিন সাহেবের সমাধি শ্বেত পাথরে তৈরী—ধূপের গন্ধে সারাক্ষণ মশগুল। সমাধির দেওয়ালে নানা কারুকার্য্য। এই গৃহের প্রাঙ্গণের একধারে

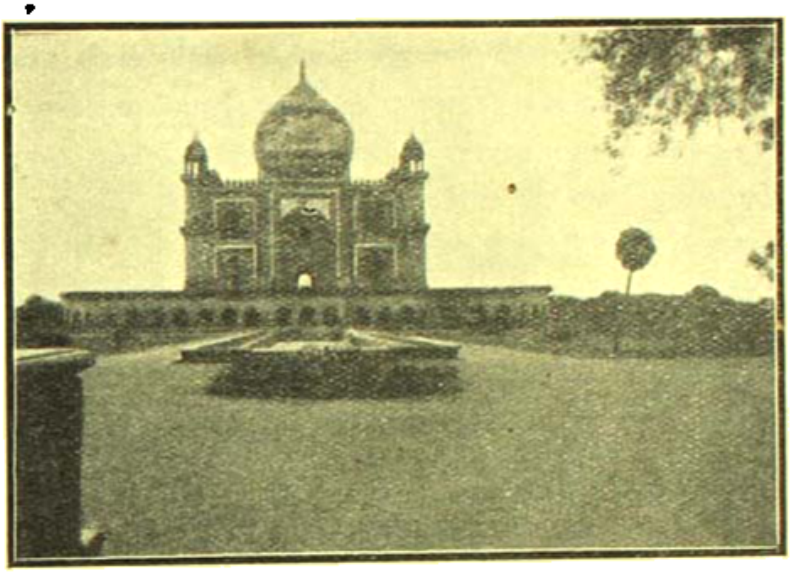

দিল্লী—সফদরজঙ্গ

শাহজাহান-কন্যা জাহানারার সমাধি। চারি পাশে জাফরি-দেওয়া শ্বেতপাথরের দেওয়াল। সমাধিতে কোনো কারুকার্য্য নেই, আড়ম্বর-হীন। শ্বেতপাথরে লেখা আছে—"আমার কবরের উপর কোনো মণি-রত্ন আভরণ চাপিয়ো না—শাহজাহান-কন্যা দীন জাহানারার কবরের উপর তৃণগুচ্ছই যোগ্য আবরণ!"

এগুলি ছাড়া আরো বহু সমাধি এ-মন্দিরে আছে; তার মধ্যে মহম্মদ শাহ, মহম্মদ শাহের স্ত্রী, শাহজাদা মির্জ্জা জাহাঙ্গীর ও কবি খসরু—এঁদের কবরগুলিই উল্লেখ-যোগ্য। এখানে ছোট একটি জলাধার আছে। মুসলমানরা বলেন, এ জল মন্ত্রপূত। মানসিক করে এ জল পান করলে বা স্পর্শ করলে দুরারোগ্য রোগও নাকি আরাম হয়।

নিজামুদ্দিনের দক্ষিণে চৌষট্টি খাম্বা মির্জা আমিরের সমাধি।

সফদরজঙ্গ ছিলেন অযোধ্যার নবাব-বংশের পূর্ব্বপুরুষ। এঁর সমাধি-মন্দিরটি হুমায়ুনের সমাধির অনুকরণে নির্ম্মিত। সফদরজঙ্গ, হুমায়ুনের কবর, নিজামুদ্দিন—এগুলি দিল্লী সহরের বাহিরে—কুতবে যাবার পথে। এই পথেই মন্তর-মন্তর—জয়পুরের রাজা জয়সিংহের তৈরী মান-মন্দির। জয়সিংহের মৃত্যু হওয়ায় এটি সম্পূর্ণ গড়ে ওঠে নি। লোকেরা এই মন্দিরের অনেক জিনিস লুঠ-পাট করে নিয়ে গেছে।

কুতব হলো দিল্লী থেকে সাত মাইল দূরে। কুতব-মিনার তৈরী করান কুতবুদ্দিন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কুতব-মিনারের গঠন সুরু হয়, শেষ হয় ১২২০ খৃষ্টাব্দে। সুলতান আলতামাস তখন দিল্লীর সিংহাসনে। মিনারটি পাঁচতলা। সব তলাগুলি সমান উঁচু নয়। কেউ বলেন, এর খানিকটা তৈরী করান পৃথ্বীরাজ—তাঁর রাণী এর উপর থেকে যমুনা দর্শন করতেন। তারপরে কুতবুদ্দিন একে আরো উঁচু করে গড়েন। এর চূড়ায় ওঠবার সিঁড়ি আছে—সিঁড়ির সংখ্যা ৩৭৯টি। সর্ব্বোচ্চ তলাটি ভূমিকম্পে পড়ে গেছে—এখন সে জায়গা লোহার রেলিংয়ে ঘেরা।

কুতব-মিনারের কাছেই কুতব মসজিদ। আশে-পাশে বহু সমাধি। মসজিদটি তৈরী হয়েছে পৃথ্বীরাজের রাজপ্রাসাদ আর মন্দির ভেঙ্গে তারই উপর;—মসজিদ-সংলগ্ন দেওয়ালে এখনো শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলার নানা ছবি খোদা আছে। এই মসজিদের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ। স্তম্ভটি নিরেট লোহার—স্তম্ভের অঙ্গ এমন মসৃণ আর উজ্জ্বলবর্ণ দেখলে মনে হয় সদ্য তৈরী হয়েছে। স্তম্ভে যে লেখা খোদা আছে তা থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় অনঙ্গপাল ১০৫২ সালে দিল্লী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ফার্গুসন বলেন, এ স্তম্ভটি পাণ্ডবদের আমলের। কিন্তু এর গায়ে খোদা আছে,—এই পৃথিবীর অধিপতি চন্দ্র—বিষ্ণুপাদগিরিতে

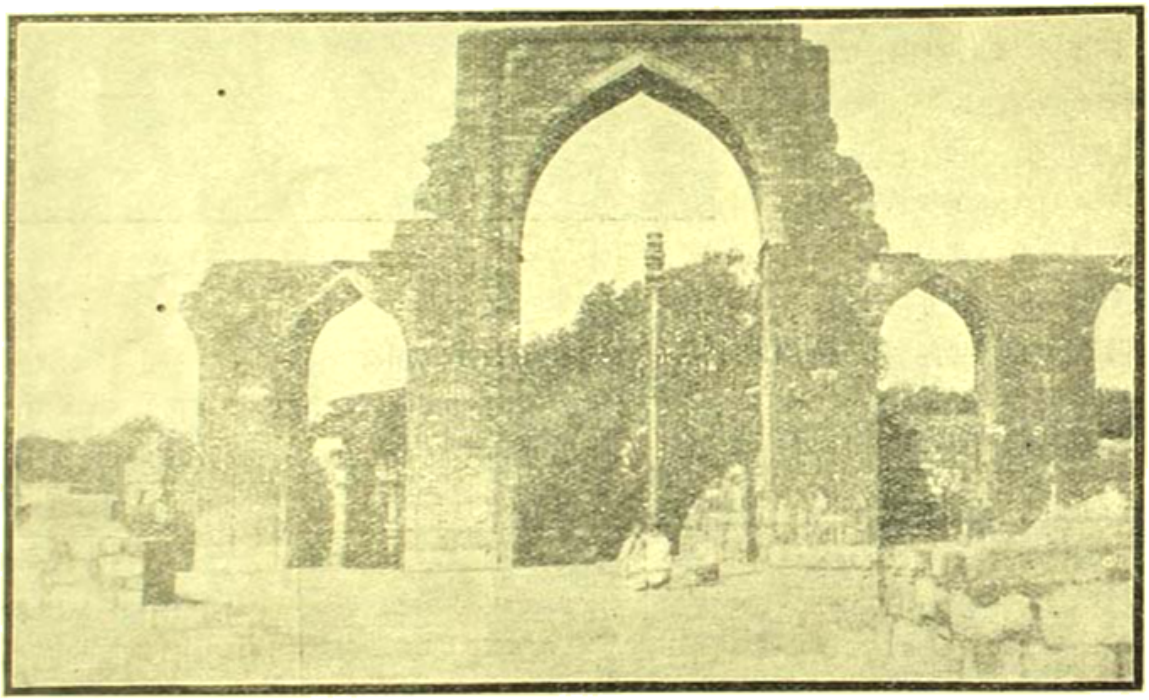

দিল্লী—লৌহ স্তম্ভ

বিষ্ণু-ধ্বজ ওড়াবার জন্য এই সুবৃহৎ স্তম্ভ তৈরী করান।

দিল্লীর এই বিবিধ প্রাসাদ ভবন, সমাধি-মন্দির, মসজিদ প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন যুগের শিল্পকলার এমন প্রকৃষ্ট রেখা আজো বর্ত্তমান আছে যে তা উপভোগ করবার মত। আদি পাঠান-যুগের শিল্পকলার নমুনা পাই, কুতব মিনার আর কুতব মসজিদে; আলতামাসের সমাধি, আলাই দরোয়াজা,—(এটি কুতব মিনারের দক্ষিণে আলাউদ্দিন খিলিজির তৈরী); খিজরী বা জমাৎখানা মসজিদে (নিজামুদ্দিন)। মধ্য পাঠান যুগের শিল্পকলার পরিচয় পাই, টোগলক খাঁর

সমাধি, কালান মসজিদ, কদম সরিফ্ (ফিরোজ শাহের পুত্র শাহজাদা ফতেখাঁর সমাধি); হৌজখাঁর সমাধি ও নিজামুদ্দিনে। শেষ পাঠান যুগের শিল্পকলার নিদর্শন—সৈয়দ ও লোদি-বংশীয় বাদশাহদের সমাধি; পুরাণো কেল্লা ও

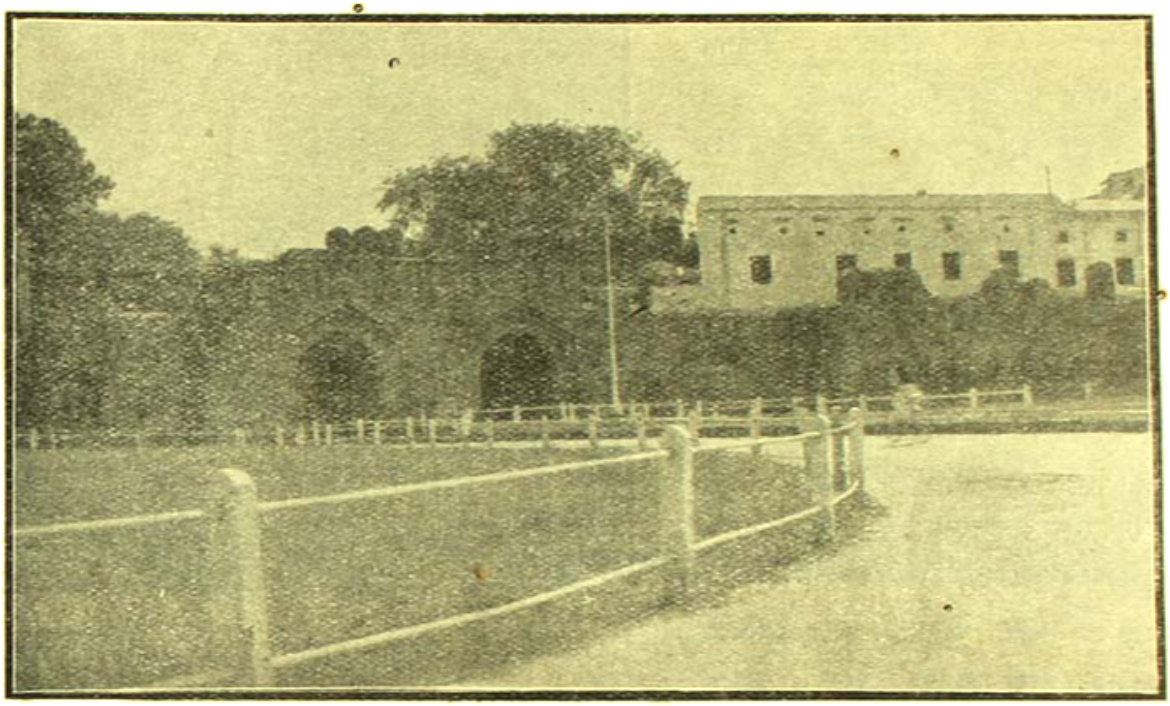

কাশ্মীর গেট্

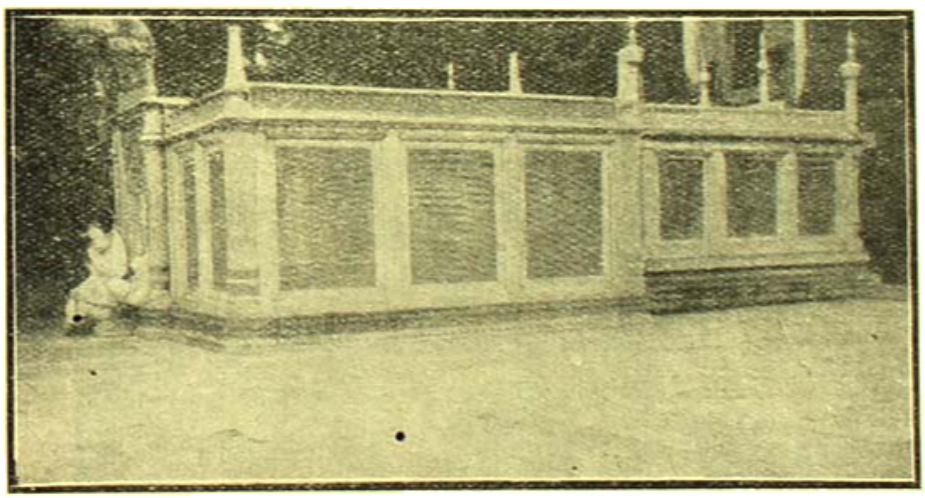

দিল্লী—নিজামুদ্দিন

মসজিদ; জু'লি মসজিদ ও ঈশা খাঁর সমাধি। আদি মোগল যুগের শিল্পকলার নিদর্শন—হুমায়ুনের সমাধি, আলমবাঁর সমাধি। মধ্যযুগের মোগল শিল্পকলা—দিল্লীর দুর্গ ও প্রাসাদ; জুমা মসজিদ ও ফতেপুরী মসজিদ। আর শেষ মোগল যুগের শিল্পকলার নিদর্শন হলো,—জিন্নৎ বেগমের মসজিদ, মতি মসজিদ, সোনেরী মসজিদ ও সফদরজঙ্গ।

দিল্লীতে ক'দিন থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভোরে ৪৪০টায় আমরা দিল্লী ছাড়লুম। দিল্লী ছাড়বার পূর্ব্বক্ষণে দুখানি গাড়ীতে ১৪ টীন পেট্রোল ভরা হলো। সমস্ত সহর তখন নিশুতি। আমরা আলিপুর রোড ধরে কর্ণালের পথ নিলুম। সহর পেরিয়ে পথের দু'ধারে পেলুম প্রশস্ত মাঠ—উল্টো দিক্ থেকে মালপত্র বয়ে সার-সার মোষের গাড়ী আসছিল;—গাড়োয়ানগুলো মোষের দড়ি ধরে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। মাঠের বুকে মাঝে মাঝে মাটীর ঢিপি,—সেকালের কত সমাধি, কত কীর্ত্তিরই না জানি ধ্বংস-স্তূপ! সোণপথে (দিল্লী থেকে ২৭ মাইল) এসে

বেলা ৭.২৫ মিনিটে ৪১৩১নং গাড়ীর টিউব পাংচার হলো। এই দীর্ঘ যাত্রা-পথে এই আমাদের প্রথম ব্রেক্-ডাউন্। তখনি দোসরা চাকা পরানো হলো। ইতিমধ্যে সকলে জলযোগ সেরে নিলুম। মহাভারতে যে পাঁচটী পথের নাম আছে, গোপথ তারি একটি। বাকীগুলির নাম পাণিপথ, বারপথ, ইন্দ্রপথ ও তিলপথ। ইন্দ্রপথ হলো ইন্দ্রপ্রস্থ। জলযোগান্তে দেখি, পথে উটের সার চলেছে দিল্লীর দিকে। লোভ হলো, উঠে চড়ি। একজন চালককে ডেকে অভিপ্রায় জানালুম, সেলাম করে তখনি সে ব্যবস্থা করলে। উটে চড়ে তার ছবি নেওয়া হলো। উটওয়ালাকে কিছু বখশিস দিয়ে বেলা ৮-৫ মিনিটে আবার যাত্রা সুরু। একটু পরেই পাণিপথ পৌঁছুলুম। ফকির কালন্দরের সমাধি আছে এখানে। এই ফকিরের সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। ফকির যেখানে বসেছিলেন, যমুনার জল নাকি সেখানে স্রোতের বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে আসে। ফকির যমুনাকে আদেশ করেন, সপ্তপদ পেছিয়ে যেতে। নদী ভয়ে সপ্তপদ পেছুতে একেবারে সাত মাইল পেছিয়ে যান্! এই পাণিপথে বড় বড় যুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেছে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর ও ইব্রাহিম লোদির যুদ্ধ হয়—সে যুদ্ধে পাঠান-বংশের উচ্ছেদ আর মোগল-বংশের অভ্যুত্থান ঘটে। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে এইখানে হিমুর পরাজয় ঘটে আকবরের সুশিক্ষিত বাহিনীর হাতে; তার পরে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে আফগান আহমদ শাহ দুরাণির হাতে মার্হাট্টার পরাজয় হয় এইখানেই।

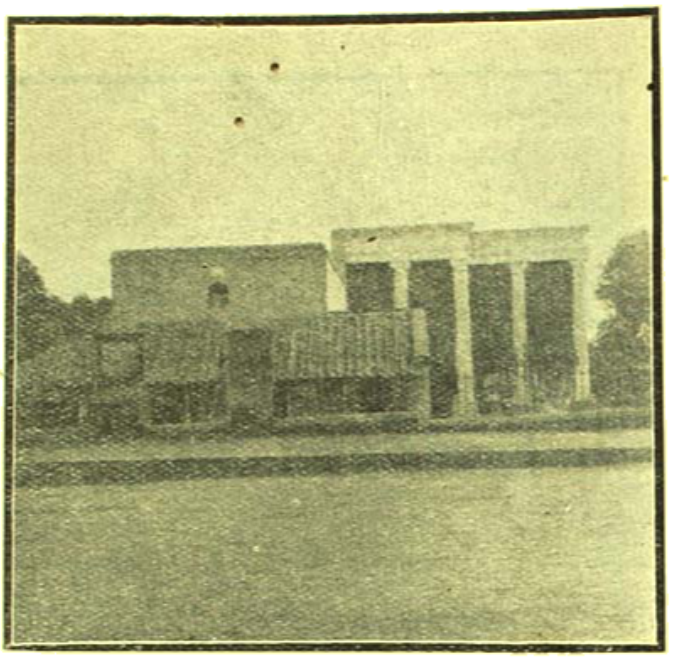

দিল্লী—দারাশেকোর পাঠাগার

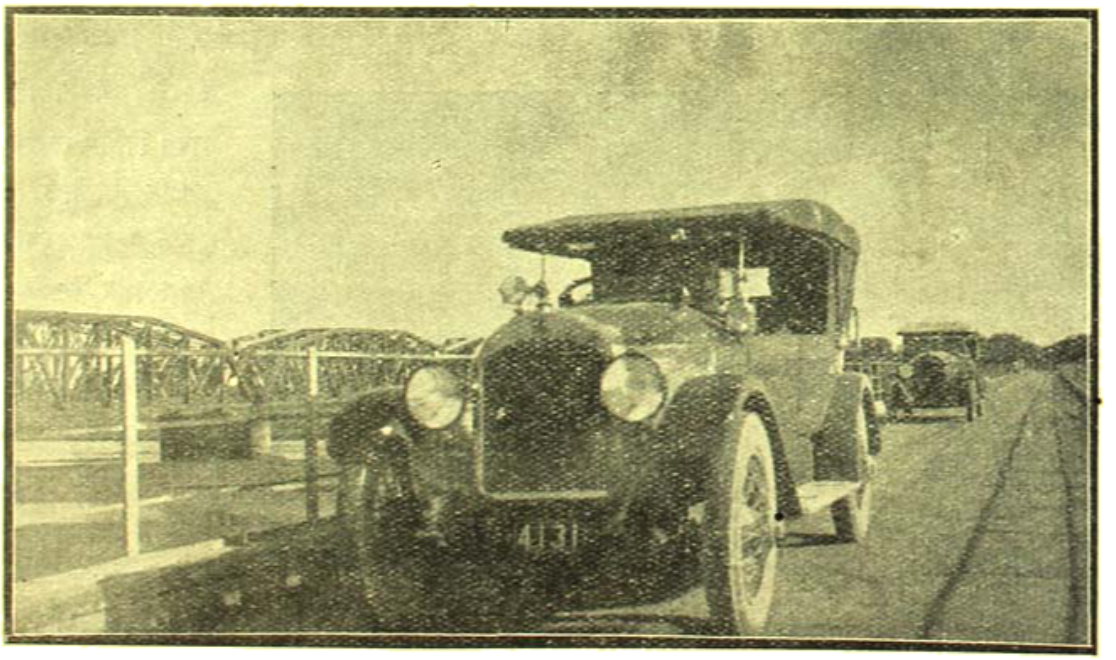

শতদ্রুর পুল—ওপাশে রেলের ব্রিজ্

পানিপথের পর কর্ণাল। কর্ণাল খুব প্রাচীন সহর। বিল্বদন্তী, মহাভারতের যুগে কর্ণরাজা এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসের যুগে দিল্লী-প্রবেশের পূর্ব্বাহ্নে এই কর্ণালেই তৈমুরলঙ্ প্রথম বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আর ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এই কর্ণালেই মোগল বাদশা মুহম্মদ শাহ নাদির শাহের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হন্। তার পর ঝিন্দের রাজা গুরদিৎ সিং কর্ণাল অধিকার করেন এবং কর্ণাল বহুকাল মহারাষ্ট্র-অধিকারে থাকে; পরে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ অধিকার-ভুক্ত হয়। এই কর্ণালে কাবুলের আমীর দোস্ত্ মহম্মদ খাঁকে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রাজ-বন্দী করে রাখা হয়। তার পর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। কর্ণালে বহু হিন্দু-মুসলমানের বাস; হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। কর্ণাল থেকে ৩৫ মাইল ঘুরে দৃষদ্বতী নদী পার হয়ে কুরুক্ষেত্র-থানেশ্বর। দৃষদ্বতী এখন বালির রেখা। দুধারে শুধু ধূ-ধূ মাঠ—কোথাও বা বন জঙ্গল। এইখানেই মহাভারতের বিরাট যুদ্ধ হয়! এইখানেই সাহাবুদ্দিন ঘোরীকে পরাভূত করেন হিন্দু-রাজা পৃথ্বীরাজ (১১৯২ খৃষ্টাব্দ)। রেলওয়ে ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে ব্রহ্মসর—প্রকাণ্ড হ্রদ। এটি হলো মহাভারতের সেই বৈপায়ন হ্রদ। হ্রদটি এক মাইল লম্বা, আর মাইল চওড়া—দুধারে বিস্তর ঘাট। ঘাটের অবস্থা জীর্ণপ্রায়। ঋগ্বেদেও এই হ্রদের উল্লেখ আছে। এ হ্রদে

শোণপথ—টিউব পাংচার

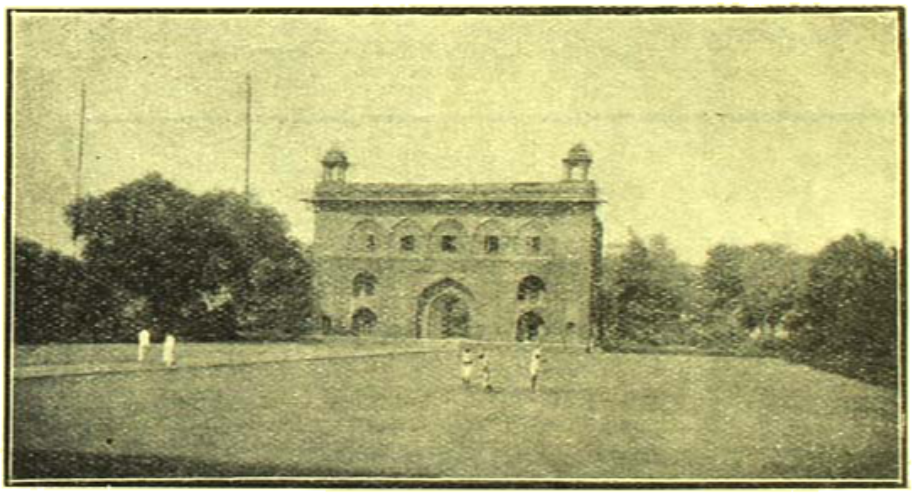

দিল্লী—ফোর্ট নহবৎখানা

wild fowls, wild ducks প্রচুর—কিন্তু মারবার উপায় নাই। হ্রদের জল অপরিষ্কার। চারিধারেই প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংস-স্তূপ। মাঝখানে দ্বীপের মত একটা জায়গা—সেখানে শিবের মন্দির আছে। শুনলুম, ছত্রপতি শিবাজী না কি এ মন্দিরটি তৈরী করিয়ে দেন! এই মন্দির-সংলগ্ন জায়গাটুকুর নাম ধর্ম্ম-ক্ষেত্র। আর্য্যজাতি এইখানে এসে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন—এইখানেই হিন্দুত্বের প্রথম প্রভাত-উদয়! এখানকার 'বন-ভবনেই প্রথম প্রচারিত, জ্ঞান-ধর্ম্ম কত পুণ্যকাহিনী!' এ জায়গাটি হলো কুরুক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে। কুরুক্ষেত্রের পর সরস্বতী নদী—সেটী এখন শুধু বালির রেখায় পর্য্যবসিত। অম্বালার কাছে সরস্বতীর অঙ্গ বর্ষাকালে জলে ভরে ওঠে! এখানে তাঁর

অবস্থা বর্ষাকালেও শোচনীয় থাকে। কুরুক্ষেত্রে সেকেলে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, লাল মসজিদ, ও সেখ চিল্লির কবর আছে। এখানে সরস্বতী নদীর সঙ্গে মিশেছে মার্কণ্ড নদ—নদের অঙ্গ বালির রাশিতে ভরা।

কুরুক্ষেত্রে মন উদাস হয়ে উঠলো। গীতার প্রথম ছত্র বার বার মনে পড়তে লাগলো—

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।

মৌন মূক দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা···মূক ঐ পথের ধূলা··· একদিন অশ্বরথচক্রে গজ-পদক্ষেপে পথের এ ধূলারাশি কি বিপর্যস্তই না হয়েছিল! কুরুক্ষেত্র আজো হিন্দুর মহাতীর্থ।

কুরুক্ষেত্র থানেশ্বর থেকে এক পথ গেছে সাহারাণপুর। এই পথে সাহারাণপুর হয়ে হরিদ্বার যাওয়া যায়। থানেশ্বর ছেড়ে আমরা সোজা উত্তর-মুখে চললুম। রৌদ্র তখন বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে! পঞ্জাবী রৌদ্র! আর পথে ধূলাও তেমনি! আশেপাশে ক্ষেতগুলোর দিকে চেয়ে দেখি, গরমে মাটী যেন ফুটি-ফাটা হয়ে রয়েছে। পথের ধারে মাঝে মাঝে Persian wheel অর্থাৎ কূয়া। এই কূয়ার উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদে এর নাম অক্ষচক্র। ইংরাজীতে Persian wheel হলো কি করে, সেটা গবেষণার বিষয়! কূয়াগুলির বৈশিষ্ট্য

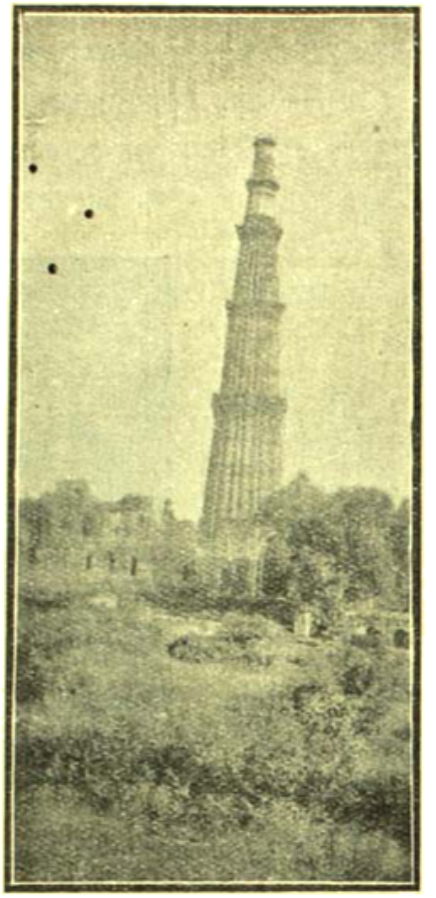

কুতব-মিনার—দিল্লী

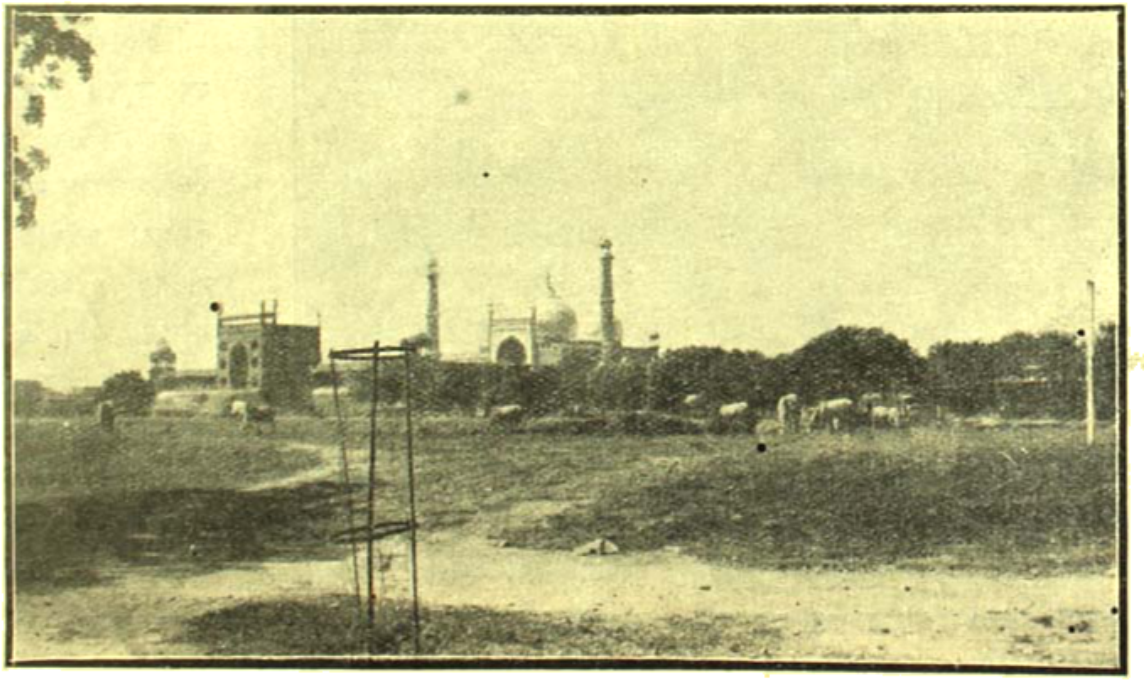

দিল্লী—জুমা মসজিদ

আছে। সমতল ভূমির একটা জায়গায় মস্ত গহ্বর—আর সেই গহ্বরের সামনে কলুর ঘানির মত একটা লম্বা কাঠ আছে; সেই কাঠের সঙ্গে একটা খুঁটী জোড়া। খুঁটীর গায়ে লম্বা দড়িতে বাঁধা এক প্রকাণ্ড চাকা। সেই চাকায় কুড়ি-পঁচিশটা টিনের মগ কি মাটীর ভাঁড় কাৎ করে বাঁধা, একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি। ঘানির

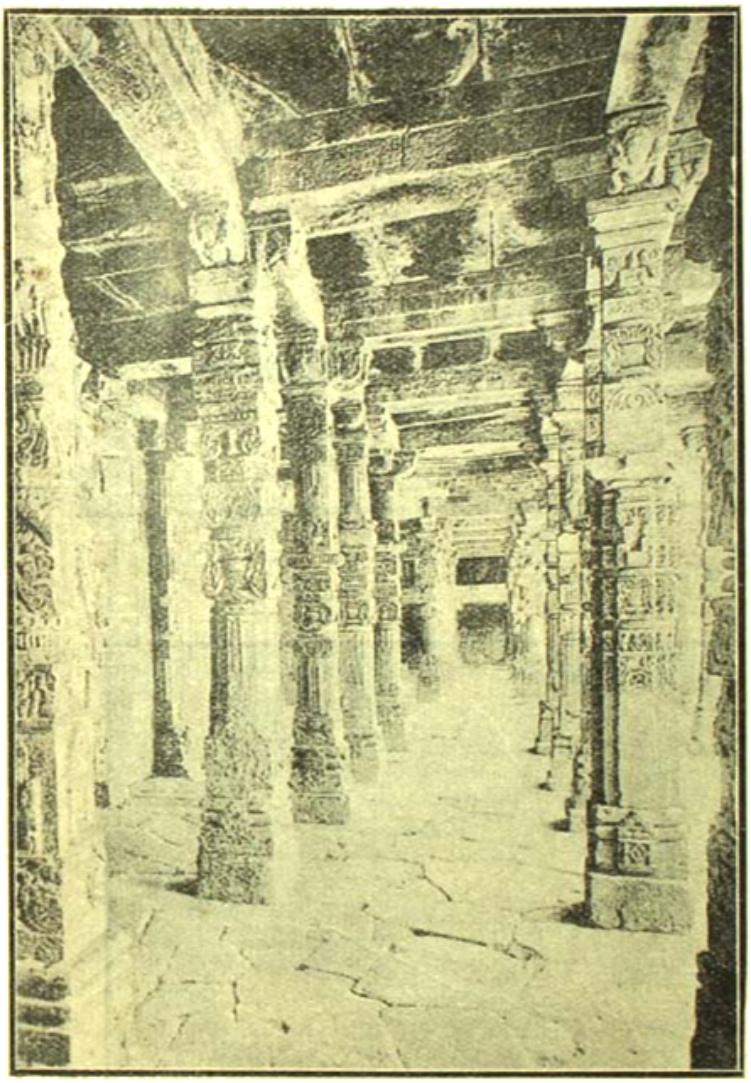

দিল্লী—পৃথ্বীরাজের মন্দির

লম্বা কাঠটা পরু দিয়ে টানা হয়। একজন মানুষও সেটা টানতে পারে। ঐ টানে চাকাটা ঘুরার মধ্যে চলে যায়, আর সেই টানে চাকাটা ঘুরতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মগের পর মগ জলে ভরতি হয়ে উপরে ওঠে। দেখতে বেশ মজার।

এই দীর্ঘ পথ রৌদ্র আর ধূলা খেয়ে এসে পেলুম সাহারাণপুর। সাহারাণপুরে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য দেখলুম না। থাকলেও তা দেখবার জন্য অপেক্ষা করা পোষালো না। বেলা ১০টা বাজে—রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, কোন মতে মাথায় জল ঢালতে পারলে বেঁচে যাই, অবস্থা তখন এমন! কাজেই দ্রুত গাড়ী চালিয়ে এগিয়ে চললুম। ১০-১৫ মিনিটে পেলুম অম্বালা। বাঁয়ে রেল-ষ্টেশন! ধূলি-ধূসরিত হয়ে ষ্টেশনের হিন্দু রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে এসে খাবার ব্যবস্থা করতে বলে আমরা সোজা গেলুম, ওখানকার পঞ্জাব মোটর এণ্ড ব্যাটেরি-ওয়ার্কসে। ট্রাঙ্ক রোডের উপর তাদের মস্ত কারখানা। সেখানে গিয়ে দুখানি গাড়ীতে ৯ টীন পেট্রোল আর ২ টিন মোবিল অয়েল (বি) ভরতি করা হলো। এখানে পেট্রোলের দাম পড়লো টীন-পিছু ৩৮৵০ করে; আর মোবিল অয়েল ৫৸০ করে। যে টায়ারের টিউবটা ফুটো হয়েছিল, এদের কারখানায় সেটা বার করে নিয়ে আমাদের কাছে আরো যে টিউব ছিল তারি একটি পরিয়ে নেওয়া হলো। তখন রৌদ্রের তাপে কাণ মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। প্রাণ যাবার জো! ওখান থেকে ফিরে অম্বালা রেলোয়ে-ষ্টেশনে আশ্রয় নিলুম। ওয়েটিং-রুমে ঢুকে জল পেলুম প্রচুর। মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেক-বাথ সেরে নিলুম। তার পর হিন্দু রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে ঢুকলুম আহার করতে। তাদের রান্না চমৎকার—মাছটা বিশেষ তারিফের যোগ্য। খাওয়ানোর এদের বন্দ-আতিও খুব। খাওয়া হলে রেলোয়ে প্লাটফর্ম্মে এলুম। প্লাটফর্ম্মে দু-একজন বড় মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে আলাপ হলো। কলকাতা থেকে মোটরে সস্ত্রীক সব কাশ্মীর চলেছি শুনে তাঁরা খুব তারিফ করলেন। এক-জন বললেন, আমার হিংসা হচ্ছে! ইচ্ছা করছে, আপনাদের দলে ভিড়ে যাই। তাঁরা পথ সম্বন্ধে খুব ভরসা দিলেন, পথ খুব চমৎকার। তবে অম্বালার খানিক আগে একটু হুঁসিয়ার হতে হবে; কারণ সোজা পথ গেছে একেবারে খালকা—আর বাঁয়ে রেল-লাইনের উপর পুল পার হয়ে যে পথ, সেই পথে গেলে সোজা অমৃতসরে গিয়ে পৌঁছুবো।

অম্বালায় অম্বা দেবীর মন্দির আছে। কেউ বলেন, ওঁর নাম থেকেই দেশের নাম অম্বালা; আবার কেউ বলেন, অম্বা নামে এক রাজপুত এই প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। অম্বালা ক্যান্টনমেন্ট-ষ্টেশন;—এখানে ব্রিটিশ-লোকের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব পদার্থই আছে,—পার্ক, রেস-কোর্স, ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি। একটি কালীবাড়ী আছে—বাঙালীর তৈরী। কালীবাড়ীতে বাঙালী শিল্পিকের বাসের যে আয়োজন আছে, তা চমৎকার।

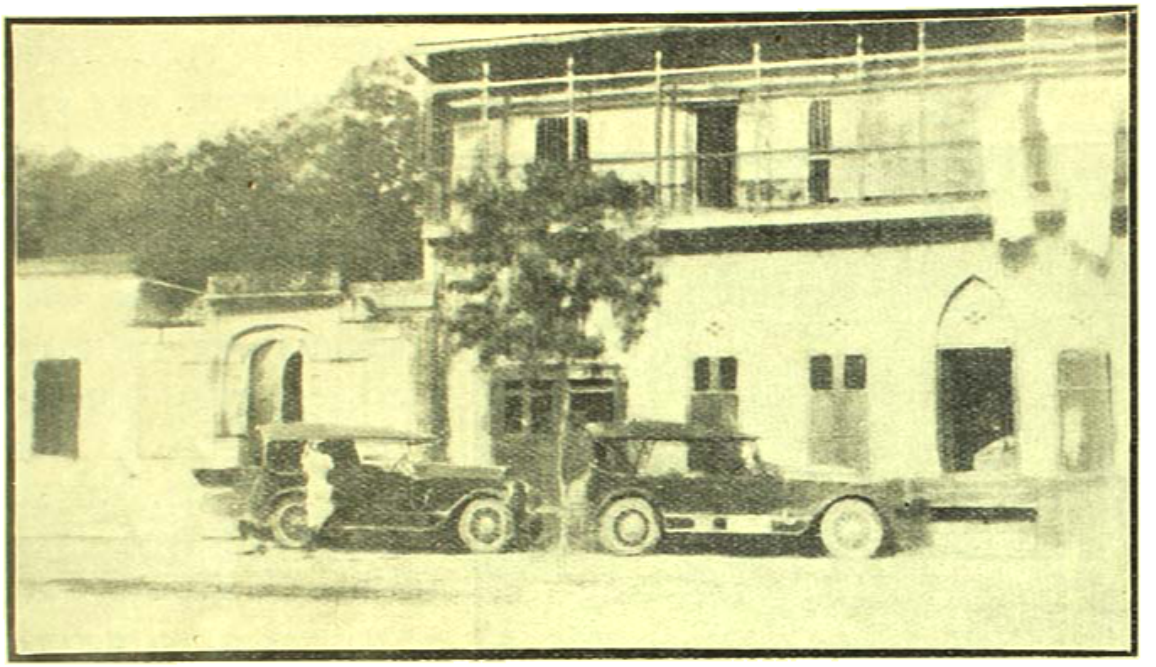

দিল্লী—বিশ্রাম বাস

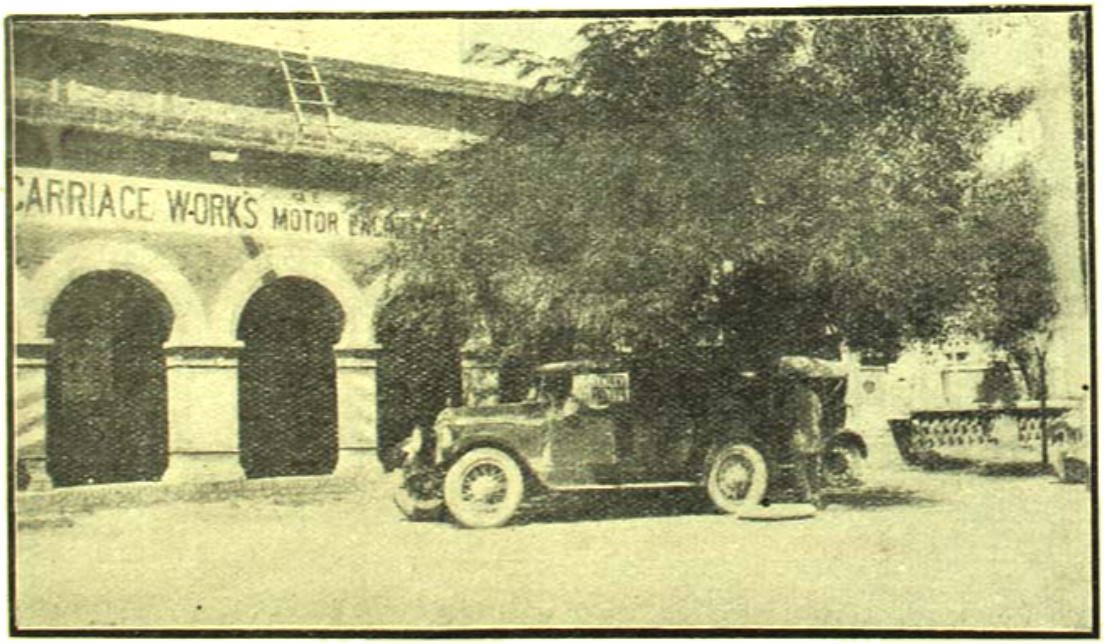

অম্বালা—পেট্রোল দেওয়া

অম্বালা ছাড়লুম ১২-২৫ মিনিটে। মাথার উপর তখন তপ্ত সূর্য্যদেব প্রচণ্ড অনল বর্ষণ করছেন! রেলোয়ে-লাইনের

ডাইনের পথ ধরে সোজা এসে ৪।৫ মাইল পরে বাঁয়ে রেলের ওভারব্রিজ পার হলুম। অম্বালা থেকে ৭ মাইল পরে দেখি, বাঁয়ে এক পথ গেছে পাতিয়ালা। এ পথে পাতিয়ালা হয়ে নাভাতেও যাওয়া যায়। ১২ মাইল পরে পেলুম রাজপুরা। রাজপুরা থেকেও বাঁয়ে এক পথ গেছে নাভা। রাজপুরা থেকে নাভা ২৭ মাইল মাত্র। রাজপুরার কিছু আগে পেলুম শিরহিন্দ্। ইতিহাসের দিক দিয়ে শিরহিন্দের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। এখানে কাবুলের সুজা-বংশের বহু শাহজাদার কবর আছে। ফেরিস্তার মতে শিরহিন্দ্ স্বরূপ শিরহিন্দের শাসন-কর্ত্তা ওয়াজির খাঁকে হত্যা করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিরহিন্দ্ শিখ-কবলে আসে। এখানে দেখবার বস্তু হলো, মির নিরাণ, সৈয়দ পীর পাঠান, খোজা খাঁ, পীরবন্দী নক্কাশওয়ালা (চিত্রকর) —এদের সমাধি ; শালাবৎ বেগের হাভেলী বা প্রাসাদ, মোগল সরাই (পাতিয়ালা এ সরাই-বাড়িকে আদালত-স্বরূপ ব্যবহার করছেন) এবং গুরুদোয়ারা সাহেব।

শিরহিন্দ্ ছাড়িয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ১৯১ মাইলে লুধিয়ানা। যখন লুধিয়ানায় প্রবেশ করলুম, বেলা তখন

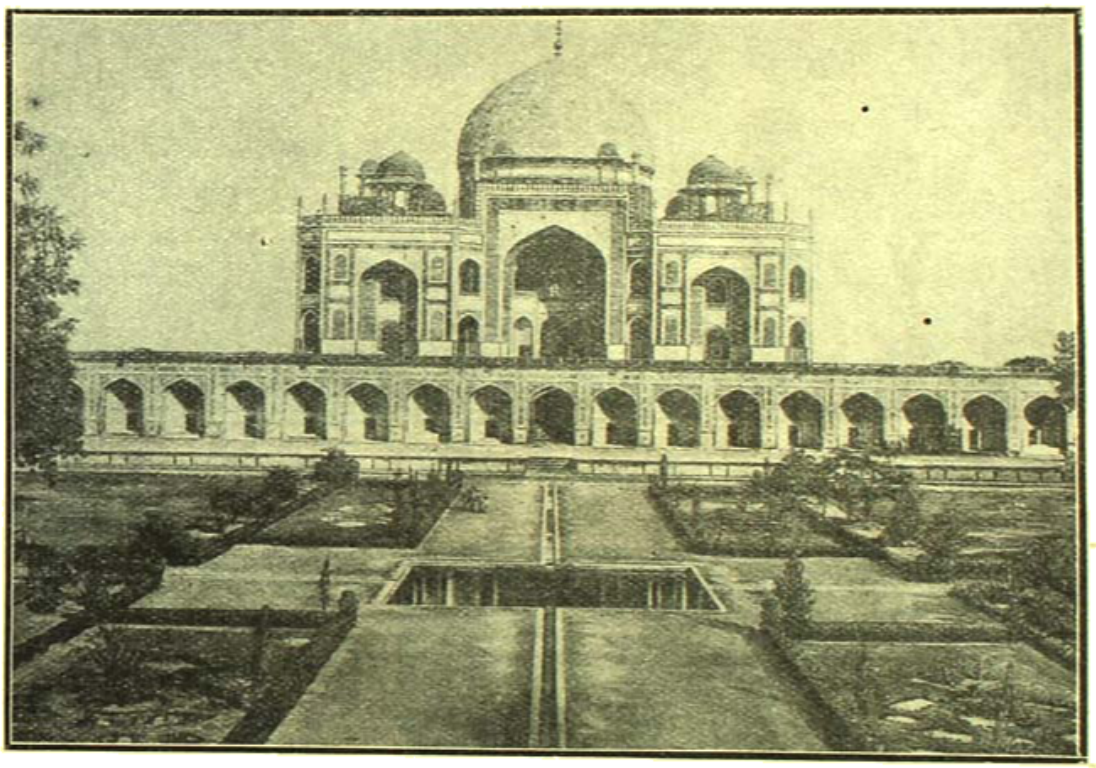

দিল্লী হুমায়ুনের সমাধি

একদা এ কাবুলের ব্রাহ্মণ-রাজার অধিকারভুক্ত ছিল। মুসলমান-অধিকারে আসার পর এ জায়গার নাম হলো শিরহিন্দ্, অর্থাৎ হিন্দ্ বা হিন্দু স্থানের শির বা সীমান্তদেশ। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দিন ঘোরী শিরহিন্দ্ দখল করেন; পরে পৃথ্বীরাজ আবার শিরহিন্দ্ পুনরধিকার করেন। আকবরের সময় থেকে ঔরংজীবের সময় পর্য্যন্ত শিরহিন্দ্ খুব বর্দ্ধিষ্ণু সহর ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে শিরহিন্দ্ প্রাধান্য পেয়েছিল বিশেষ রকমে। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে শিখ্ সর্দ্দার বাণ্ডা শিরহিন্দ্ আক্রমণ করেন, এবং গুরুগোবিন্দের মাতৃহত্যার প্রতিশোধ-স্বরূপ শিরহিন্দের শাসন-কর্ত্তা ওয়াজির খাঁকে হত্যা করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিরহিন্দ্ শিখ-কবলে আসে। এখানে দেখবার বস্তু হলো, মির নিরাণ, সৈয়দ পীর পাঠান, খোজা খাঁ, পীরবন্দী নক্কাশওয়ালা (চিত্রকর) —এদের সমাধি ; শালাবৎ বেগের হাভেলী বা প্রাসাদ, মোগল সরাই (পাতিয়ালা এ সরাই-বাড়িকে আদালত-স্বরূপ ব্যবহার করছেন) এবং গুরুদোয়ারা সাহেব।

শিরহিন্দ্ ছাড়িয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ১৯১ মাইলে লুধিয়ানা। যখন লুধিয়ানায় প্রবেশ করলুম, বেলা তখন তিনটে বেজে গেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। লুধিয়ানায় বরফ কিনে জলে দিয়ে সেই ঠাণ্ডা জল পান করে যেন বর্ত্তে গেলুম। লুধিয়ানা বেশী দিনের সহর নয়। লোদি-বংশীয় শাহজাদা ইব্রাহিম ও নিজাং এ সহর স্থাপনা করেন। এখানে শিখ, কাশ্মীরী আর পাঠানেরই বাস। পাঠানরা কাবুলের আমদানি। লুধিয়ানায় একটি নদী আছে ; নদীর নাম বুঢ্ঢ়। চৈত্র মাসে বহু পুণ্যকামী এই নদীতে স্নান করতে আসেন। নদীর অবস্থা এখন তেমন সুবিধে-গোছের নয়। লুধিয়ানায় পশমী শাল, আলোয়ান,

রামপুরী চাদরের বিস্তর কারখানা আছে। এক পুরোনো কেল্লা আছে; এই কেল্লার ঠিক নীচেই পীর-ই-দস্তগির পীরের আস্তানা। এই পীরের নাম সেখ আবুল কাদির

লুধিয়ানা ছাড়াবার পর খানিকটা পথ ঘন বৃক্ষের ছায়ায় গেলুম। বেলা ঠিক চারটের সাট্‌লেজের পুল পার হলুম। সাট্‌লেজ—মহিং আমাদের শতদ্রু। ছেলেবেলায়

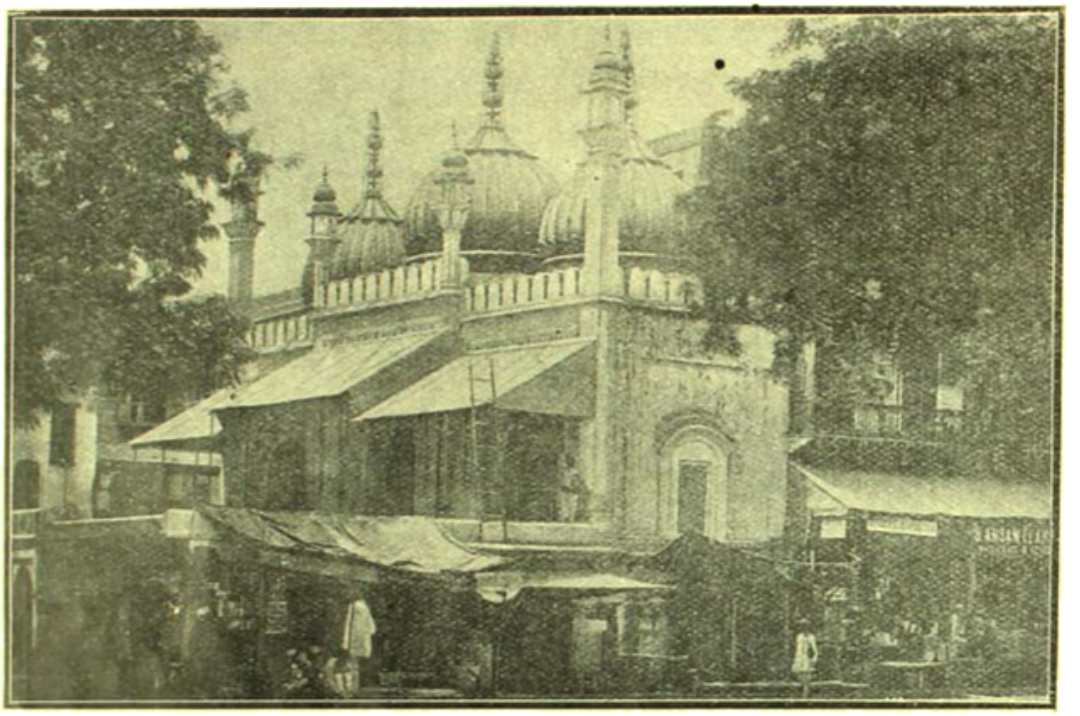

দিল্লী—মোতিয়া মস্জিদ্

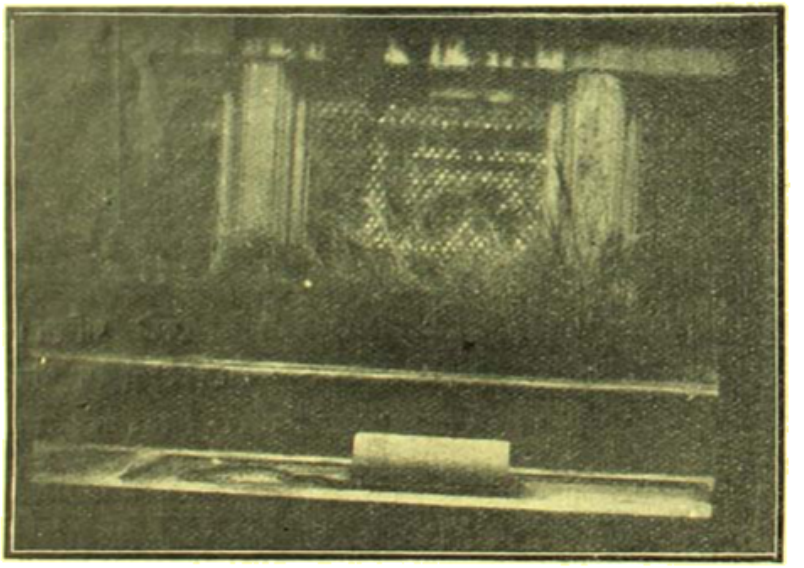

জাহানারার সমাধি

কিলানী। লুধিয়ানার কাছেই প্রথম শিখ-যুদ্ধের রঙ্গক্ষেত্র রণভূমি।

পড়া একটি কবিতার সেই ছত্র মনে পড়ছে।—

একটা বাঁকিত যদি, পারিতা শতদ্রু নদী
আসিতে কি পারিত যবন?

পুলটি চমৎকার—যেমন মজবুৎ, দেখতেও তেমনি সুন্দর! পাশাপাশি দুটি পুল। একটির উপর দিয়ে ট্রেণ চলে, অপরটিতে গাড়ী-ঘোড়া, মোটর, লোক-জন পার হয়। পুলের মাঝামাঝি গাড়ী থামিয়ে ছবি তোলা হলো। ওপারে দূরে গাছ-পালা, মন্দির, ঘর-দ্বার··· পটে আঁকা ছবির মত...দুপুরের রৌদ্র পড়ে বালি ঝক্‌ঝক্ করছে—বালির তট জলের রেখা মৃদুতরঙ্গে চুম্বন করে চলেছে! পুল পার হয়ে ডান দিকে দেখি, মস্ত এক দুর্গ। এটি ফিরোজের দুর্গ। দুর্গটি শিখ-আমলের;

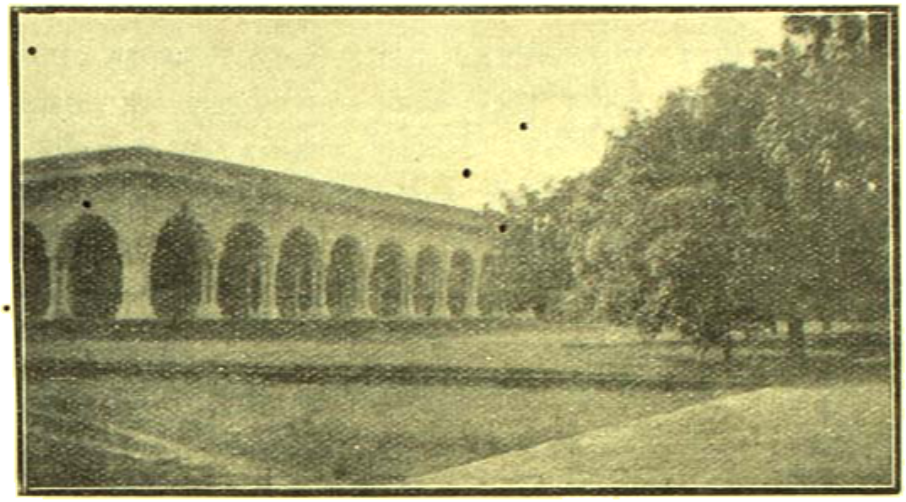

দেওয়ান-ই-আম দিল্লী

এখন এ দুর্গে পুলিশ-ট্রেনিং স্কুল বসেছে। ফিরোজের মোগল আমলের এক প্রাচীন সরাই আছে।

ফিরোজের পর দুধারে মাঠ পার হয়ে বেলা পাঁচটায় এসে পৌঁছুলুম জালন্ধর। রাজা-ও-রাণী পড়ে অবধি জালন্ধর যেন মনে গেঁথে বসে আছে! পথে চাষাভুষো লোকজন চলেছে। কৌতূহলে ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাদের পানে চেয়ে-চেয়ে দেখছিলুম। মাঠের মাঝে গাড়ী থামালুম। জালন্ধর সেকালের ত্রিগর্ত্ত-রাজের রাজধানী ছিল। তখন এর নাম ছিল কতোচ্-রাজ্য। কতোচ্ না কোচ্? দুটী বহুকালের প্রাচীন দীঘি এখনো আছে। এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে এক পথ গেছে—সেই পথে কর্পূরতলা। জালন্ধর থেকে ডান দিকে কাংড়া হয়ে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে শুনলুম জ্বালামুখী তীর্থ। পৌষ মাসে এই দীঘির ধারে গানের মস্ত জল্‌সা বসে। ভারতের নানা দেশ থেকে ওস্তাদ গাইয়ের দল এসে গানের-সুরের-তালের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহা সোরগোল বাধিয়ে তোলেন। কর্পূরতলার মহারাজ এই জল্‌সা-ব্যাপারে এষ্টেট্ থেকে অর্থ সাহায্য করেন প্রচুর। জালন্ধরের অধিবাসীদের মধ্যে জাঠ-শিখের সংখ্যাই বেশী। ডাকাতিতেও নাকি জাঠ শিখের বেশ নাম আছে! এ কথা পরে শুনেছিলুম।

জালন্ধরে গাড়ীর ছড় নামিয়ে দেওয়া হলো। রৌদ্রের তাপ কতক তখন কমে এসেছে। জালন্ধর থেকে খানিক এগিয়ে সোজা একেবারে কৌজের কুচ-কাওয়াজের aero-drome এ ঢুকে পড়লুম। এখানে পথ নাই; ফিরতে হলো। ফিরে বাজারের একটু দূরে ডান-দিকে অনেকগুলো পথ। ওখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে তারি একটা পথ ধরে নিলুম। খানিক এসে বাঁয়ে অন্য পথ ধরতে হলো। এ পথে দেখি অসংখ্য মোড়। কোন্ মোড় নি—

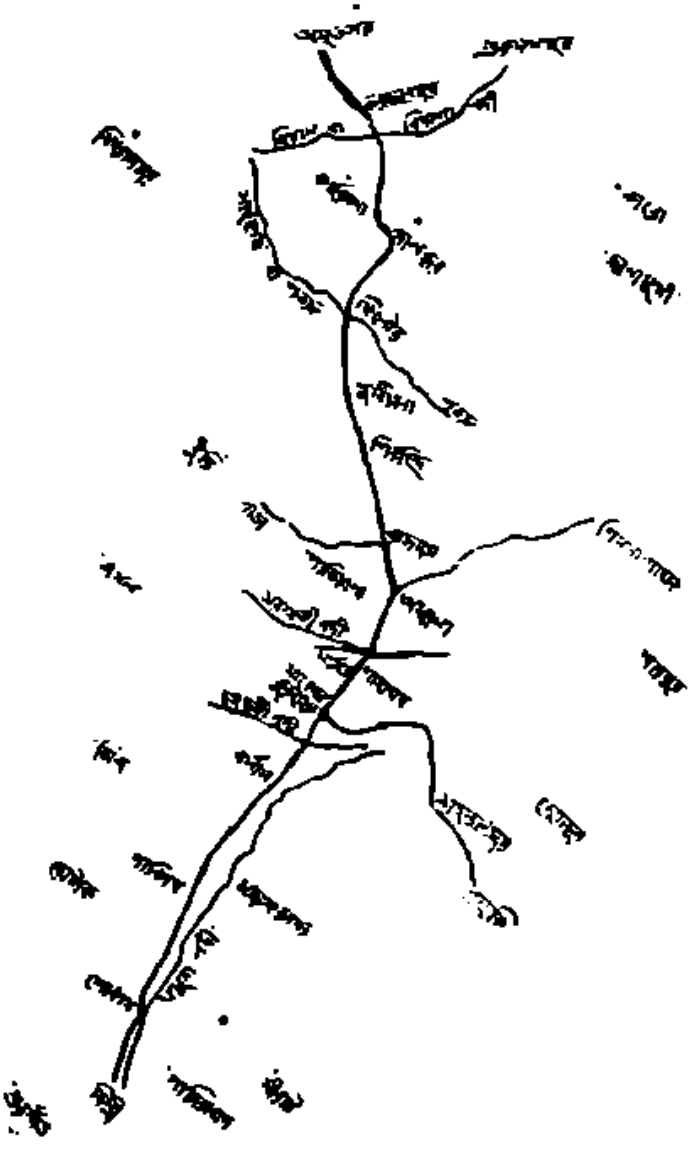

পথের নিশানা

পথে নির্দ্দেশক কাউকে দেখতে পেলুম না, পথিকও দেখছি না। খানিক প্রতীক্ষা করে দু-একজন পথিকের দর্শন মিললো। তাদের কাছ থেকে দিশা নিয়ে এগুতে লাগলুম। একটু পরেই দেখি, বহুকালের প্রাচীন প্রাচীর ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়ে রয়েছে। প্রাচীরগুলি দুর্গ-প্রাচীরের কঙ্কাল বলে মনে হলো। কোন্ আমলের—তা আর প্রশ্ন করেও জানা গেল না। আরো খানিক এগিয়ে বিয়াস-নদীর পুল পার হলুম—; বিয়াস হলো আমাদের বিপাশা। এ পুলটিও শতদ্রুর পুলের অনুরূপ—পাশাপাশি দুটী পুল—একটি রেলোয়ের, অপরটি সাধারণের। শতদ্রু, বিপাশা—দুই নদীই প্রকাণ্ড বালির চরের মত পড়ে আছে—মাঝে মাঝে জলস্রোত।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বনের দুধারে অনিবিড় বনভূমি জেগে উঠলো। তার মধ্যে মাঝে মাঝে কাপটার মত জাঠ শিখ পথিকের রুক্ষ মূর্ত্তি দেখে ভাবলুম, এ রাত্রে লাহোর অবধি আর যাওয়া যাবে না। সাতটা নাগাদ্ কর্ত্তারপুর পেলুম। শিখদের তীর্থস্থান হলো কর্ত্তারপুর। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে গুরু অর্জ্জুন এ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পিতা রামদাস এ জায়গাটি বাদশা জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে জায়গীর পান্। এখানে চেয়ার টেবিল বাক্স প্রভৃতি তৈরী হয়। এখানকার কাঠের কাজের নাম আছে। থানার সামনে একটি সরাই আছে; তা ছাড়া একটি ধর্ম্মশালাও আছে।

রাত্রি আটটায় এসে অমৃতসরে পৌঁছুলুম। মিষ্ কালো অন্ধকারে চারিধার তখন ভরে গেছে। পথের আলো আর ওড়া ধূলার অন্ধকারের মাঝে মন কেমন নিঝুম হয়ে এলো! দিল্লী থেকে অমৃতসর প্রায় ২৫০ মাইল। এদিনের পাড়ি ভালোই হয়েছে, কাজেই অমৃতসরে রাত্রি-বাস করবো ভেবে খুঁজে-পেতে ওখানকার কেন্ট্রিজ হোটেলে গিয়ে আমরা উঠলুম। ঘরগুলি চমৎকার। খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, ইলেক্ট্রিক আলো-পাখা দেখে বিশ্রাম-সুখের জন্য মন কাঙ্গালিত হয়ে উঠলো। আরামে সকলে আহার সেরে বিশ্রাম-লাভের উদ্দেশ্যে শয্যায় আশ্রয় নিলুম। (ক্রমশঃ)

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[৯]

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই একটা দুঃসহ বিরক্তিতে রমাপদর মন ভরিয়া উঠিল! আবার সেই রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত বিরক্ত-বিড়ম্বিত জীবন লইয়া জাগিয়া থাকিতে হইবে! তাহার পর নিদ্রা! তৎপূর্ব্বে এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া অন্নের চিন্তা, বস্ত্রের চিন্তা, পাওনাদারের চিন্তা, অভাবে, দৈন্যে, পরিশ্রমে, চিন্তায় সরমা দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে তাহার চিন্তা, পলে পলে ভোগ করিতে হইবে!

রমাপদ পাশ ফিরিয়া শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। এত শীঘ্র দুঃখ-কণ্টকিত জাগরণের হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু অসময়ে প্রয়োজনের নিদ্রা ধরা ত' দিলই না, অধিকন্তু তন্দ্রা-জাগরণে অস্পষ্টতার ভিতর চিন্তার মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে বিকটরূপে দেখা দিতে লাগিল। কিছুকাল তদবস্থায় কষ্টে যাপন করিয়া বিরক্তি-ভরে রমাপদ শয্যা পরিত্যাগ করিল।

নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাতের পর ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে,—শুধু বৃথাই নহে, সংসারের অবস্থা অনেকখানি হীনতর করিয়া। যেখানে যাহা কিছু সোনারূপার টুকরা ছিল, তপ্ত পাত্রে জলবিন্দুর মত, সমস্ত নিঃশেষে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; এমন কি রমাপদর পত্নীকার সময়ে তাহার মঙ্গল-কামনায় সরমাদেবী পূজার জন্য যে পাঁচটি টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারও মধ্যে চার টাকা। মাত্র

একটি টাকা কোনো প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিয়া সরমা সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিল, ঠাকুর, অপরাধ নিয়ো না! একান্ত বাধ্য হয়ে যা নিলাম, তুমি যখন মুখ তুলে চাইবে তখন তার চতুর্গুণ দিয়ে তোমার পূজা দেব! তাহার পর, একজন পরীক্ষার্থী ছাত্রের একমাস অধ্যাপনা করিয়া রমাপদ ত্রিশটি টাকা পাইয়াছিল, তাহাও ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়া কা'ল একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সে যে কি করিবে, ঋণ করিবে, না বাড়ী বেচিবে, অর্দ্ধাহারে থাকিবে, না অনাহারে মরিবে, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া রমাপদ পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে!

ঋণও যে নূতন করা হইবে তাহা নহে। মুদীর নিকট টাকা বাকি পড়িয়াছে, কাপড়ের দোকানে ধার হইয়াছে। বিশুয়া চাকর কয়েকমাস মাহিনা পায় নাই, অধিকন্তু একান্ত অভাবের সময়ে তাহার সঞ্চিত অর্থ হইতে কখনো ধার দিয়াছে; ধোপা কিছুদিন হইতে টাকা না পাইয়া কাপড় দিতে বিলম্ব করিতেছে, কিন্তু তাহাকে তাগিদ করিবার উপায় নাই, তাহা হইলে সে তাহার প্রাপ্য চাহিয়া বসিবে। সমস্ত অবস্থাটা মনে মনে নিমেষের মধ্যে ভাবিয়া লইয়া রমাপদ অপ্রসন্ন চিত্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

চৈত্রমাস। ক্রমবর্দ্ধনশীল রৌদ্রের তাপে উঠানের ভিজা মাটি দিন দিন শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। সরমা প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে অবস্থিত পুদিনা গাছগুলিতে যত্নে জল সেচন করিতেছিল; রমাপদ পুদিনা ভালবাসে।

বারান্দা হইতে অবতরণ করিয়া রমাপদ ধীরে ধীরে সরমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

পদশব্দে ফিরিয়া দেখিয়া সরমা স্মিতমুখে বলিল, "উঠেছ? কখন উঠলে?" তাহার পর পুনরায় ফিরিয়া স্বামীর মুখ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "আজ উঠতে এত দেরী হ'ল কেন? শরীর ভাল আছে ত?"

গভীর বিরস মুখে রমাপদ বলিল, "আছে। কিন্তু তোমার চাটনির ব্যবস্থা করে কি হবে সরমা, চালের ব্যবস্থা যদি আমি না করতে পারি!"

স্বামীর এই বেদনা-গর্ভ কথায় ব্যথিত হইয়া সরমা বলিল, "চালের ব্যবস্থা তুমি করছ না ত কি করছ? এই যে এতদিন কাটল, কোন্ দিন আমাদের না খেয়ে কেটেছে বল ত?"

ম্লানমুখে রমাপদ বলিল, "কাটেনি, কিন্তু এবার হয় ত' কাটবে!"

সরমা দৃঢ়স্বরে বলিল, "কখ্খনো কাটবে না! দেখ, পুরুষমানুষের অতটা ভয় ভাল নয়। মনে সাহস রেখে চেষ্টা করে যাও, একটা না হয় উপায় হবেই।"

রমাপদ মৃদু হাস্য করিল; বলিল, "সেই জন্যেই যে মনে সাহস নেই! কোনো রকম চেষ্টা না করে আজ যদি এ অবস্থা হ'ত তা হলে মনে সাহস থাকত যে চেষ্টা করলে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। তুমি ত' জান সরমা, এই ছ'মাস আমি কত রকম চেষ্টা করেছি?"

"করেছ; কিন্তু সময়েরও ত' একটা গুণ আছে। সুসময়ই বল, আর দুঃসময়ই বল, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আজ পুবে হাওয়া বইছে বলে কি তুমি মনে কর আর পশ্চিমে হাওয়া বইবে না?"

এই চির-প্রচলিত সাধারণ আশ্বাসে রমাপদ বিশেষ আশ্বস্ত বোধ করিল না; বলিল, "পশ্চিমে হাওয়া যখন বইবে তখন পশ্চিমে হাওয়ার কথা, কিন্তু উপস্থিত ত' আজ থেকে পুবে হাওয়া একটু জোরেই বইবে বলে মনে হচ্ছে।"

সরমা বলিল, "কেন?"

বিষণ্ণমুখে রমাপদ বলিল, "চাল ত' বোধ হয় একেবারে ফুরিয়েছে?"

সরমা বলিল, "চাল ফুরিয়েছে বলতে নেই; চাল বাড়ন্ত হয়েছে। তা হ'ক, যে চাল আছে তা'তে আমার আর বিশুয়ার একবেলার মত হয়েই হবে।"

"আর আমি?"

সরমা হাসিয়া বলিল, "তোমার ত' আজ নিমন্ত্রণ আছে।"

প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "না নেই! তুমি ভেবেছ না কি সরমা? তুমি বাড়ীতে আধ-পেটা ভাত খাবে, আর আমি পরের বাড়ী গিয়ে চর্ব্বচোষ্য খেয়ে আসব? তা' কখনই হবে না। তোমার ভাগ্যে যা আছে আমার ভাগ্যেও তাই হবে। যা আছে আমরা তিন জন ভাগ করে খাব।"

রমাপদর কথা শুনিয়া সরমা হাসিতে লাগিল। বলিল, "ঠিক উল্টো! তুমি নিমন্ত্রণ গেলে আমাদের বরং পেট-ভরা হবে। তুমি বাড়ীতে খেলে কার কি সুবিধে হবে তা বল?"

এ কথার মধ্যে আর যে জিনিসেরই অভাব থাকুক না

কেন, যুক্তির অভাব ছিল না। তাই রমাপদ প্রথমটা কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু পরক্ষণেই বলিল, "শুধু পরিমাণের হিসাবেই ত' একমাত্র হিসাব নয়। তুমি সামান্য ডাল-ভাত খাবে, আর আমি পোলাও কালিয়া খাব, তা' আমার ভাল লাগবে কেন?"

সরমা একটু উচ্ছ্বসিত ভাবে স্মিতমুখে বলিল, "ওগো, তুমি পোলাও কালিয়া ফেলে, আমার ডাল-ভাতও পোলাও কালিয়ার মত ভাল লাগবে।" কিন্তু মনের এতখানি কথা সরমা এমন করিয়া বলিয়া ফেলিয়া লজ্জায় সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

মিলনমুখির মধ্যে বিভোর হইতে হইতে প্রথম শীতল সন্ধ্যার স্পর্শ যেমন মধুর লাগে, সংসারের দুঃখদাহের মধ্যে সরমার প্রেমের এই স্নিগ্ধ অনুভূতিটুকু রমাপদর ঠিক তেমনি মিষ্ট লাগিল। সে নিঃশব্দ স্মিতমুখে ক্ষণকাল পত্নীর প্রেমোদ্ভাসিত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি ডাল-ভাত খেলে আমার পোলাও কালিয়াও যে ডাল-ভাতের মত খারাপ লাগবে!"

সরমার চক্ষুদুটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "তাই যদি হয়, তা হ'লে আর নিমন্ত্রণ গিয়ে পোলাও কালিয়া খেতে তোমার আপত্তি কিসের বল?"

এতক্ষণে রমাপদ উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "স্বীকার করছি—আমার হার হয়েছে!"

স্থির হইল রমাপদ নিমন্ত্রণ যাইবে।

রমাপদ বলিল, "কিন্তু ও-বেলার কি হবে?"

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালীটোলার ঘোষেদের বাড়ী কয়েকদিন ধরিয়া কথোপকথন হইয়াছিল; রমাপদ সরমাকে লইয়া প্রত্যহ শুনিতে যাইত। সরমা হাসিয়া বলিল, "এত কথকতা শুনেও ভগবানের উপর নির্ভর করতে শিখলে না? ভগবানের উপর নির্ভর কর, ও-বেলার ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই হবে।"

রমাপদ আশ্বস্ত হইয়া উৎফুল্লমুখে বলিল, "ভগবানের উপর নির্ভর পরে না হয় করব, আজ আমি তোমারই উপর নির্ভর করলাম।"

সলজ্জ আনন্দে সরমার মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, আমারই উপর নির্ভর কর। ভগবান তাঁর দাসদাসীদের দিয়েই ত' তাঁর নিজের কাজ করিয়ে নেন!"

সরমার বিশ্বাস এবং ভক্তিপূর্ণ এই কথা শুনিয়া রমাপদ ক্ষণকাল সহর্ষ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সরমা, ভগবানের অস্তিত্বের উপর তোমার ধ্রুব বিশ্বাস আছে?"

সোজাসুজি কোনও উত্তর না দিয়া প্রশ্নের দ্বারা সরমা এ প্রশ্নের উত্তর দিল; বলিল, "কেন, তোমারই কি বিশ্বাস নেই?"

সহাস্যমুখে রমাপদ বলিল, "আমাদের কথা ছেড়ে দাও, লেখাপড়া শিখে আমরা পণ্ডিত হয়েছি; আমাদের পাণ্ডিত্যের মর্ম্ম ভেদ করে ভগবানের বিশ্বাস সহজে প্রবেশ করতে পারে না। তোমার কি মনে হয়—ভগবান আছেন?"

অকপটতার সহিত সরমা বলিল, "নিশ্চয়ই আছেন! না থাকলে বিশ্ব হয়েছে কেন? চন্দ্রসূর্য্য হয়েছে কেন?"

এই দুরূহ বিষয়ের এরূপ সহজভাবে মীমাংসা হইয়া গেল দেখিয়া রমাপদ পুলকিত হইয়া বলিল, "তা বটে! কিন্তু ভগবান ত' করুণাময়? তবে আমরা এত রকম কষ্ট পাই কেন?"

সরমা অবিলম্বে বলিল, "সে আমাদের কর্ম্মফল।"

রমাপদ স্মিতমুখে বলিল, "কিন্তু কর্ম্মে ত' তিনিই আমাদের প্রবৃত্ত করান, তবে কুকর্ম্ম আমরা করি কেন?"

এ প্রশ্নে সরমা একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল, "সে তাঁর লীলা!"

রমাপদ উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "কথকতা শোনা তোমারই সার্থক হয়েছে সরমা! আমার দেখছি একেবারেই পণ্ডশ্রম হয়েছে।"

সরমা বলিল, "তুমি সবই জানো, শুধু আমাকে পরীক্ষা করছিলে।" তাহার পর সহসা গম্ভীরমুখে বলিল, "দেখ, এ-সব কথা নিয়ে এমন করে তর্ক-বিতর্ক করতে নেই।"

"কেন?"

"তাতে বিশ্বাস কমে যেতে পারে।"

"কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস ত ভাল নয়? বিশ্বাসকে যুক্তি তর্ক দিয়ে পাকা করে নেওয়াই ত' উচিত। আমাদের শাস্ত্রে আছে 'যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।' যুক্তি-বিহীন বিচারের দ্বারা কোনো জিনিস প্রতিপন্ন করলে ধর্ম্মহানি হয়!"

সরমা বলিল, "সে ছোট-খাট ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হয়; এ সব বড় ব্যাপারে নয়।"

সরমার এই সহজ বিচার-শক্তির ভিতর দিয়া তাহার বিশ্বাস-পূত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া রমাপদ প্রসন্ন মুখে বলিল, "ঠিক কথা সরমা! ভগবান যেন চিরদিন তোমার মনে বিশ্বাসকে যুক্তি-বিহীন করেই সরল রাখেন।"

উত্তরে সরমা কিছু বলিল না, শুধু তাহার হর্ষোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি নিমেষের জন্য রমাপদর মুখের উপর স্থির হইয়া চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল।

[১০]

স্নানান্তে ঘরের ভিতর রমাপদ মাথা আঁচড়াইতেছিল, সরমা একটি রেকাবে দুইটি রসগোল্লা, এক গ্লাস শীতল জল এবং দুই খিলি পান আনিয়া সম্মুখে রাখিল। রমাপদ চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "এখনি খেতে যাচ্ছি, এ-সব মিছে কেন দিয়েছ? এ তুমি তুলে রেখে দাও।"

সরমা বলিল, "সব ত' ভারী! পরের বাড়ী খেতে যাচ্ছ; কখন খেতে দেবে; শেষকালে পিত্তি পড়ে মাথা ধরবে। ও-টুকু খেয়ে ফেল।"

রমাপদ মিষ্টান্নের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দেখ দেখি এ চার পয়সা মিছে খরচ করলে! এ থাকলে ও-বেলা কাজে লাগত।"

সরমা শান্তভাবে বলিল, "আজ সমস্ত দিনের ভার যখন আমার উপর দিয়েছ—তখন আবার ও-বেলার ভাবনা কেন তুমি ভাবছ?"

আর কোনও আপত্তি না করিয়া রমাপদ একটা রসগোল্লা খাইয়া মুখে জলের গ্লাস তুলিল।

সরমা তাড়াতাড়ি রমাপদর হাত ধরিয়া ফেলিয়া গ্লাস নামাইয়া দিয়া বলিল, "না, সে হবে না, ও-টা খেয়ে ফেল।"

রমাপদ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও আর খাব না; ওটা তোমার জন্যে প্রসাদ রইল।" এ কৌশল সময়ে সময়ে ফলপ্রদ হইয়াছে, রমাপদ তাহা জানিত।

এবার কিন্তু কৌশল খাটিল না। সরমা বলিল, "আচ্ছা, প্রসাদ থাকবে এখন; তুমি ও-টা খেয়ে ফেল।" বলিয়া রমাপদকে সাবধান হইবার সময় না দিয়া অকস্মাৎ রসগোল্লাটা তুলিয়া লইয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল।

অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সময় এবং সুবিধা না পাইয়া অগত্যা রমাপদকে খাইতেই হইল। জল খাইয়া মুখে পান পুরিয়া সে বলিল, "প্রসাদ ত রাখলেই না; উপরন্তু স্বামীর সঙ্গে ছলনা করলে! শুধু দেবতাকে মানলে কি হবে?—স্বামীকেও একটু মানো চাই।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "তা জানি; এই দেখ তোমার প্রসাদ রয়েছে।" বলিয়া রেকাবে রসগোল্লার যে রসটুকু লাগিয়া ছিল অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে দেখাইয়া রেকাব ও গ্লাস আলমারীর উপর তুলিয়া রাখিল।

রমাপদ সবিস্ময়ে বলিল, "রাখলে যে? ও-টা খেতে হবে না কি?"

সরমা স্মিতমুখে বলিল; "তা হবে না?"

"এত ভক্তি?"

সরমা চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল।

রমাপদ বলিল, "ভক্তি-টা একটু কমালে প্রসাদ যদি একটু বাড়ে ত তাই কোরো।"

রমাপদ প্রস্থানোদ্যত হইলে সরমা স্মিতমুখে বলিল, "ভাল করে খেয়ো। আমাদের খাবার যথেষ্ট আছে।"

রমাপদ একবার নীরবে সরমার প্রতি চাহিয়া দেখিল; তাহার পর বলিল, "নুন-জল দিয়ে সজনের ডাঁটা সিদ্ধ আর পেঁপে-ভাতে ত?"

রমাপদর কথায় পুলকিত হইয়া সরমা বলিল, "তাই যদি হয় তা হলেই বা মন্দ কি?"

রমাপদ প্রস্থান করিলে সরমা কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিল; স্বামীর কথা, নিজের কথা, সংসারের কথা, বর্ত্তমানের কথা, ভবিষ্যতের কথা—অনেক কথা সে অনেক রকম করিয়া ভাবিল। কিন্তু স্রোতে যেমন মরলা জমিতে পারে না, ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়, তেমনি তাহার চিন্তা-প্রবাহের মধ্যে কোনো দুশ্চিন্তাই স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। অবশেষে সে নিজেকেই সাক্ষী মানিয়া নিজের মনে মনে কতকটা এইভাবে বলিতে লাগিল—আমার অবস্থাই বা মন্দ কি? যার এমন বিদ্বান্, গুণবান্, সচ্চরিত্র স্বামী; স্বামীর ভালবাসা যে এমন বিপুল পরিমাণে পাচ্ছে; সে যদি না অর্থাভাবের কষ্ট সহ্য করবে ত' কি সহ্য করবে সে? অর্থ ত' চোর ডাকাতেরও থাকে, কিন্তু এমন স্বামী ক'জন পুণ্যবতীর থাকে?

ভাবিতে ভাবিতে সরমার মনে হইল যতটা তাহার হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততটা সে স্বামীগত-প্রাণ নহে! তাহার স্বামীর দুঃখ এবং দাবীর হিসাবে যতটা নিজেকে সমর্পণ করা আবশ্যক ততটা সে হয় ত করিতেছে না! অকারণ সে নিজের প্রতি অনুযোগ করিল, অভিযোগ করিল; অবশেষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল অতঃপর আর নিজের কথা কিছুই সে ভাবিবে না, স্বামী-সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করিবে।

স্বামীর অনুজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে প্রবলভাবে মনে মনে বলিতে লাগিল—কখনো না না, কখনো না! কখনো আমি স্বামীর সঙ্গ ছাড়ব না! কোনো শাপের কুহক, কোনো পুণ্যের প্রলোভন, কোনো দুঃখের বেদনা, কোনো সুখের আকর্ষণ আমাকে স্বামীত্যাগিনী করতে পারবে না! তোমার আশীর্ব্বাদে আমি ছায়ার মত চিরদিন স্বামীর আগে পাছে থাকব!

স্বামী-কল্পনায় সুধা ক্ষরিত হইয়া হইয়া সরমার মন সিক্ত হইয়া উঠিল।

"বিশ্বনাথ!"

অদূরে কলতলায় বিশুয়া বাসন মাজিতেছিল। প্রভুপত্নীর আহ্বানে তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

"মায়ঝী?"

"একবার মতিবাবুর দোকানে যেতে হবে।"

"কেন মায়ঝী?"

"বল্‌ছি।"

ঘরের ভিতর গিয়া পেটী হইতে টানাসুতার কাজ-করা দুইখানা টেবিল-ক্লথ বাহির করিয়া আনিয়া সরমা বলিল, "এই দুটো টেবিল-ক্লথ্ মতি বাবুর দোকানে বিক্রী করতে দিয়ে আয়। এতে তিন টাকার কাপড় লেগেছে। বলিস্, কাপড়ের দামটা আজই আমার চাই; বিশেষ দরকার আছে। পরে বিক্রী হলে লাভ যা হবে তার অর্দ্ধেক তিনি নিজে রেখে বাকী অর্দ্ধেক আমাকে দেবেন। বুঝলি?"

শুধু শব্দার্থেই নয়, শব্দার্থের অতিরিক্ত যাহা বুঝিবার ছিল, তাহাও বুঝিয়া বিশুয়া বলিল—"বুঝেছি মায়ঝী।" তাহার পর টেবিল-ক্লথ দুইটি লইয়া মতিবাবুর দোকানে উপস্থিত হইল।

পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃক্রমের সহিত বালসুলভ উল্লাস এবং তরুণতা যুক্ত রাখিয়া আবৃদ্ধ-বালকবালিকা সকলেরই সহিত মতিবাবু যোগ রাখিয়া চলেন। অভিভাবকের মিত্র, যুবকের সখা এবং শিশুর সুহৃৎ রূপে তাঁহার প্রসার সর্ব্বজনবিস্তৃত। আকাশের বায়ু যেমন সর্ব্বত্র প্রবহনশীল, স্থান অস্থান ভেদ করিয়া বহে না; তাঁহার সৌহৃদ্য তেমনি পাত্র-অপাত্র বিচার করিয়া চলে না।

মতিবাবু তখন একদল বালক-বালিকাকে লজেঞ্জস্ বিক্রয় করিতেছিলেন। লজেঞ্জস লইয়া একে একে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলে একটি চার-পাঁচ বছরের বালক বলিল, "মতিবাবু, আমায় দিন!"

হস্ত-প্রসারিত করিয়া মতিবাবু বলিলেন, "কই, পয়সা দাও। ক' পয়সার?"

বালকটি একটু বিস্মিত ভাবে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি আজ কিন্‌ব না ত'; আমাকে ফাউ দিন!"

শুনিয়া মতিবাবু উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তা' বটে! সে কারবারটা আমার মনেই পড়ে নি!" বলিয়া বালকের দুই হস্ত ফাউ দিয়া ভরিয়া দিলেন।

ভাষা প্রাপ্য আদায় হইল; চেষ্টা করিয়াও মতিবাবু ফাঁকি দিতে পারিলেন না, মনে করিয়া বালক প্রসন্নমুখে দোকান পরিত্যাগ করিল।

তখন বিশুয়া টেবিল-ক্লথ দুইটা মতিবাবুর হস্তে প্রদান করিল।

"এ কি হবে?"

বিশুয়া সংক্ষেপে বক্তব্য প্রকাশ করিল।

মতিবাবু রুক্ষস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আরে হামারা কি কাপড়াকা দোকান হ্যায় যে টেবিল-কাপড়া বিক্রী করেগা? ভাগলপুরমে এ চিজ্ কোন্ লেগা! কোই নেহি লেগা! একরুপেয়া মে ভি নেহি লেগা! এহাকা আদমী বহুৎ চালাক হ্যায়; উস্‌নি দেগা তো লেগা!"

তখন বিশুয়া সভয়ে জানাইল যে বিক্রয় ত করিতেই হইবে, অধিকন্তু কাপড়ের দাম তিনটাকা তখনি অগ্রিম দিতে হইবে।

"কাহে?"

বিশুয়া কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্র কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল বিশুয়ার দিকে তীক্ষ্ণভাবে চাহিয়া থাকিয়া মতিবাবু ধীরে ধীরে টাকার দেরাজ টানিলেন; তাহার পর পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া বিশুয়ার হস্তে দিয়া বলিলেন, "বহুমার কো বোলো, চিজ বহুৎ আচ্ছা হুয়া। হাম তিন তিন রুপৈয়ামে বেচেগা। অভি হিসাবমে পাঁচ রুপেয়া দিয়া। সমঝা?"

এবারও সহজ সদর্থের অতিরিক্ত কিছু বুঝিয়া বিশুয়া দুষ্টচিত্তে বলিল, "সমঝা বাবু।"

"আচ্ছা, যাও।"

বিশুয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

ঘণ্টা দুই পরে মতিবাবু নিবিষ্ট-চিত্তে হিসাব লিখিতেছিলেন, রমাপদ দোকানে প্রবেশ করিল।

নিমেষের জন্য আগন্তুককে দেখিয়া লইয়া পুনরায় হিসাবের খাতায় দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া মতিবাবু বলিলেন, "কি খবর?"

রমাপদ বলিল, "আমি অপেক্ষা করছি; আপনার লেখা আগে শেষ হ'ক!"

ক্ষণকাল লিখিয়া খাতা বন্ধ করিয়া রমাপদর দিকে চাহিয়া মতিবাবু বলিলেন, "বল।"

টেবিল-ক্লথ্ দুইটি বিক্রয়ার্থে গ্রহণ করিয়া এবং তদ্ব্যতীত পাঁচটাকা অগ্রিম দিয়া মতিবাবু যে উপকার করিয়াছেন প্রথমে রমাপদ তজ্জন্য ধন্যবাদ জানাইতে উদ্যত হইল।

মতিবাবু তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "কাজের কথা কিছু থাকে ত বল।"

তখন পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া মতিবাবুর সম্মুখে রাখিয়া রমাপদ বলিল, "আটআনা পয়সা আপনি বেশী দিয়েছেন।"

"কেন?"

"তিন টাকা করে এক-একটা টেবিল-ক্লথ বিক্রী হলেও কাপড়ের দাম আর লাভের অংশে আমাদের পাওনা সাড়ে চার টাকা হয়। তা ছাড়া তিন্ টাকাই বোধ হয় একটু বেশী দাম হবে।"

দেরাজ টানিয়া একটা আধুলি বাহির করিয়া রমাপদর টাকার উপর তাহা স্থাপন করিয়া মতিবাবু বলিলেন, "লাভের অংশে বউমা আরও আটআনা পাবেন। তিন টাকা করে ছখানা টেবিল-ক্লথ বিক্রী হয়ে গেছে।"

"এরি মধ্যে বিক্রী হয়ে গেছে? কে নিলে?" সানন্দ বিস্ময়ে রমাপদর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মতিবাবু উচ্চ স্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কে নিলে সে খবরে তোমার কাজ কি? খদ্দের নিয়েছে। আমি আমার খদ্দেরের নাম বলে দিই, আর তুমি তার সঙ্গে সোজাসুজি কারবার আরম্ভ কর!"

খরিদ্দারের নাম বলিবার আপত্তির প্রকৃত কারণ এই ছিল যে তাহা হইলে নিজেরই নাম প্রকাশ করিতে হইত। মতিবাবু টেবিল-ক্লথ্ দুইটি নিজেই ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন!

রমাপদ কিন্তু মতিবাবুর তাড়না খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল; "না, না, আমি সে জন্যে জানতে চাই নি; আমি এমনি জানতে চাচ্ছিলাম।"

ততক্ষণে মতিবাবুর চক্ষু কৌতুক-হাস্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোমল স্বরে তিনি বলিলেন, "বউমাকে বোলো অবসর-মত আরও ছখানা যেন তৈরী করে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এবারও যে এমনি শীঘ্র বিক্রী হয়ে যাবে তা আশা করো না।"

"না, অতটা আশা নিশ্চয়ই করব না। কিন্তু আপনার লাভ ত' দেড় টাকা হবে; আপনি আরও আটআনা আমাকে দিচ্ছেন কেন?"

মতিবাবু বলিলেন, "তুমি মেপেছ রমাপদ; পরিশ্রমের পাওনা আর ফাঁকির লাভ, এ দুই কখনো সমান হতে পারে না। ছ-টাকায় ছয়-আনা লাভ হলেই আমার যথেষ্ট হ'ত, দু-আনা বেশী নিয়েছি।" তাহার পর টাকা ও আধুলী রমাপদর হস্তে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এখন সরে পড়; আমার কাজ আছে।"

পথে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে রমাপদর বুকের পকেটে টাকা ও আধুলি ঠিন্ ঠিন্ করিয়া মৃদু-মধুর শব্দ করিতেছিল; শুনিতে শুনিতে রমাপদর মনে হইল, সুখ-চক্র অবশেষে বুঝি চলিবারই উপক্রম করিল! প্রত্যূষে অভাব ও দৈন্যের যে বিভীষিকা তাহাকে বিকল করিয়াছিল, মনে হইল তাহার অবসান যেন সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে। অথচ মাত্র একটি টাকা এবং একটি আধুলী বুকের কাছে ঠিন্ ঠিন্ শব্দ করিতেছিল; কাণের কাছে আশা কিন্তু সজোরে বলিতেছিল—ঠিক্ ঠিক্। (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের প্রতিকৃতি এবার 'ভারতবর্ষের' প্রচ্ছদ-পট সুশোভিত করিল। রাজা রাধাকান্ত শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা গোপীমোহনের একমাত্র পুত্র। বিপুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইলেও বিদ্যানুশীলনে ইঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল; বিখ্যাত শব্দ-কল্পদ্রুম রাজা রাধাকান্তের নাম অমর করিয়া রাখিয়াছে। সেকালে ইনিই সনাতন হিন্দু-সমাজের শিরোমণি ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত সংস্কৃত, আরবী, পারসী, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৩১ অব্দে ইনি রাজা উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৬৬ অব্দে সে-সি-এস-আই হন; বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম শেষোক্ত উপাধি-ভূষিত হন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত হইলে ইনিই প্রথম তাহার সভাপতি হন এবং জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত উক্ত পদেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। জীবনের শেষভাগ ইনি বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন। আমরা এবারের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে তাঁহার প্রতিকৃতি সংযোজিত করিয়া এই বাঙ্গালী পুরুষশ্রেষ্ঠের স্মৃতি-তর্পণ করিলাম।

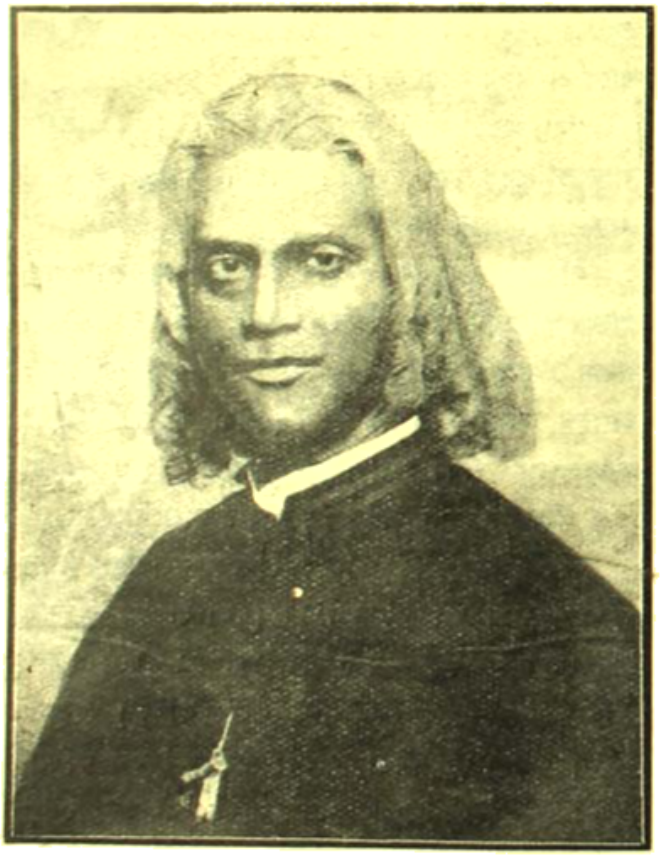

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
(বীরভূম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের মূল সভাপতি)

বিগত ২০এ ও ২১শে চৈত্র গুডফ্রাইডের অবকাশ-সময়ে বীরভূম সিউড়িতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বীরভূম লাভপুরের জমিদার, সুপরিচিত সাহিত্যিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত নিশ্বলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় কার্য্য-সম্পাদক হইয়াছিলেন। মূল সভাপতি হইয়াছিলেন নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়। সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী হইয়াছিলেন শ্রীযুক্তা সরলাদেবী-চৌধুরাণী মহোদয়া। ইতিহাস-শাখায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞান-শাখায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত ও দর্শন-শাখায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাপতি মহোদয়গণের অভিভাষণ তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের অনুরূপই হইয়াছিল। বিভিন্ন শাখায় অনেকগুলি সুলিখিত ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। বীরভূমের অভ্যর্থনা-সমিতির আয়োজন, আদর আপ্যায়ন বড় চেষ্টা বীরভূমের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আগামী বর্ষে পাবনা সহরে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। পাবনা-বাসীদিগের পক্ষ হইতে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমরা বীরভূমের অভ্যর্থনা-সমিতিকে সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

এই গুডফ্রাইডের অবকাশ-সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে কাণপুর সহরে প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্য-সম্মেলনেরও

অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। লক্ষ্ণৌয়ের বারিষ্টার সুকবি ও জননেতা শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থান হইতে সাহিত্যিকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন; অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধও পঠিত হইয়াছিল। আমরা এই দিল্লীতে

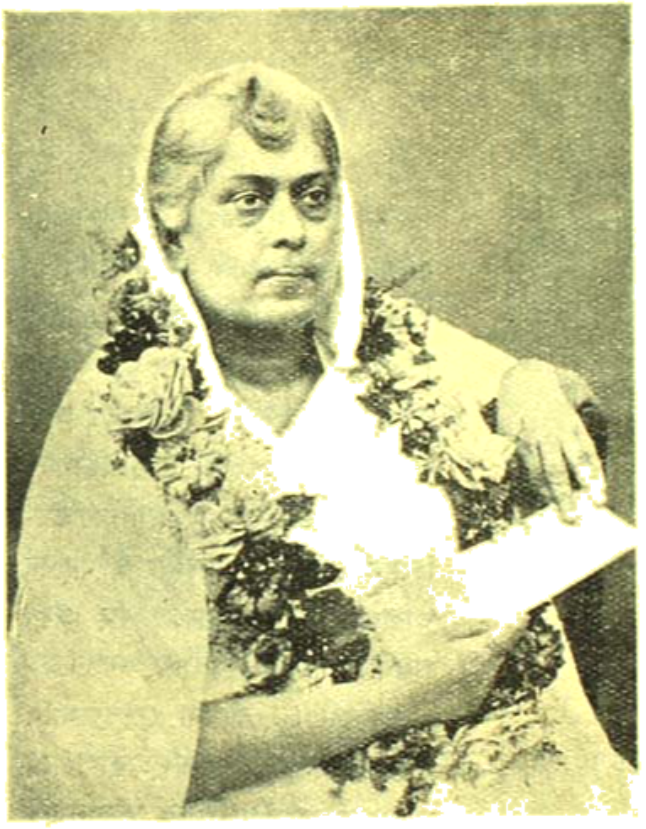

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী-চৌধুরাণী
(বীরভূম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী)

এই সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের এই অনুষ্ঠান, এইভাবে মিলন যে সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়, তাহা আর বলিতে হইবে না। বৎসরান্তে দুই তিন দিনের জন্যও সুদূর-প্রবাসী বাঙ্গালীগণ যে একস্থানে সমবেত হন, ইহাতে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও সৌহৃদ্য স্থাপনের যে সুযোগ হয়, প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের কাহারও সে সুযোগ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। বাঙ্গালা দেশে যে সকল সাহিত্য-সেবী আছেন, তাঁহাদেরও এই প্রবাসী-সম্মেলনে যোগদান করা আমরা একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ও এই প্রবাসী সম্মেলনের অধিবেশন একই সময়ে না হইলে পরস্পরের মিলনের

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস তর্কবাগীশ
(বীরভূম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের দর্শন-শাখার সভাপতি)

বিশেষ সুবিধা হয়। আমাদের অনুরোধ, অতঃপর উভয় সম্মেলনের অনুষ্ঠাতৃগণ এই বিষয়ে অবহিত হইবেন।

গুড্ ফ্রাইডের অপরাহ্ণকাল হইতে কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতা সহরে যে দৃশ্যের অভিনয় হইয়া গেল, তাহা যেমন অচিন্তাপূর্ব্ব, তেমনই শোচনীয়! কলিকাতা সহরে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ও গোলমাল ইতঃপূর্ব্বেও দুই চারিবার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এবারের ব্যাপার, বলিতে গেলে, একেবারে চরমে উঠিয়াছিল। এমন শোচনীয় কাণ্ড যে শান্তি ও শৃঙ্খলার রাজ্যের বুকের উপর অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এ কথা কেহ কখনও কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। এই বিরোধ, এই নৃশংস অভিনয়ের ফল যে কি হইবে,

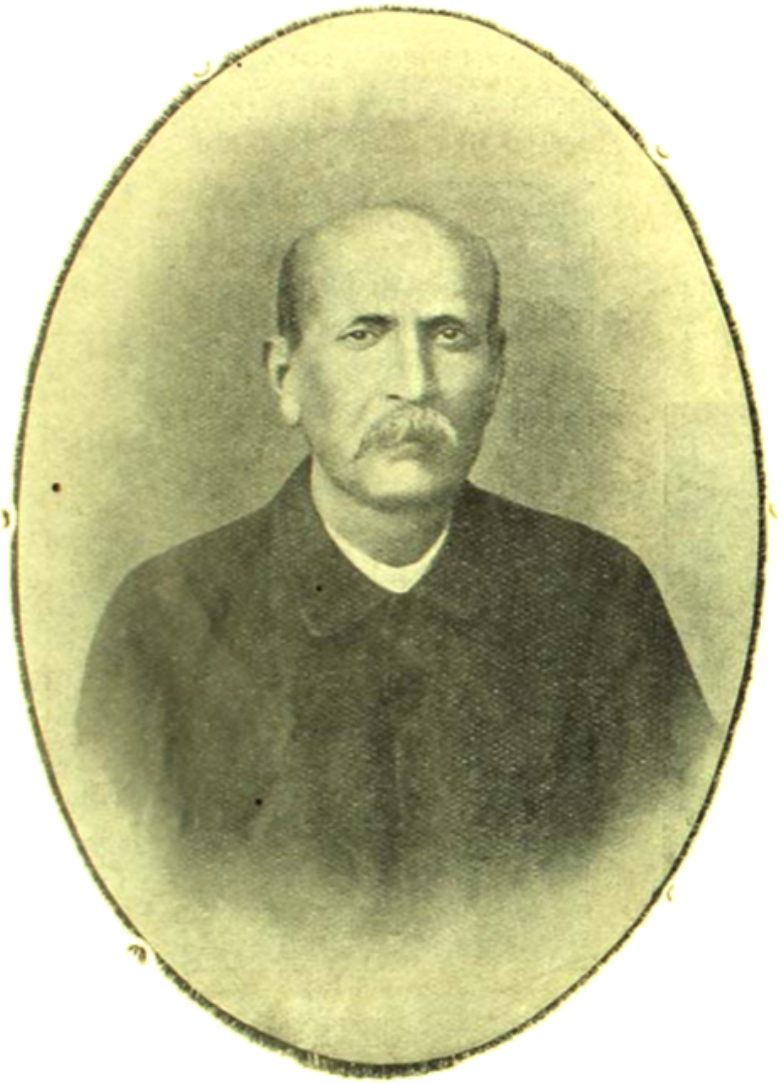

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
(বীরভূম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
(বীরভূম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি)

তাহা হিন্দু-মুসলমানের যিনি পরম দেবতা তিনিই বলিতে পারেন। আমরা তাঁহারই নিকট সকাতরে প্রার্থনা করি, এইবার যেন এ দুঃখের উপর শেষ যবনিকা পতিত হয়, হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমিতে শান্তি স্থাপিত হয়।

মুসলমান রাষ্ট্র-নায়ক, সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় মৌলানা সৌকতআলি মহোদয় কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। অল্প কয়েক দিন কলিকাতায় অবস্থানের পর তিনি খিলাফতের কার্য্য উপলক্ষে ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন ব্রহ্মদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মান্দালয় ও ইন্‌সিন কারাগারে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ অন্তরীণে আবদ্ধ যুবকগণ অনশন-ব্রত গ্রহণ করেন। মৌলানা সৌকতআলি মহোদয় এই যুবকগণের সহিত কারাগারে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে অনশন-ব্রত পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। অন্তরীণে আবদ্ধ যুবকগণ এই শ্রদ্ধেয় দেশনেতার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; বাঙ্গালা দেশের নেতৃগণও মৌলানা মহোদয়ের অনুরোধ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহার পর মৌলানা মহোদয় কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে কলিকাতার মিউনিসিপাল্ সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। সেই সময় তাঁহার যে আলোকচিত্র গৃহীত হয়, আমরা তাহা

সসম্মানে প্রকাশিত করিয়া মহামান্য স্বদেশ-নেতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম।

ভারতের রাজ-প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ড রেডিং বাহাদুরের পাঁচ বৎসর কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় তিনি তাঁহার কার্য্যভার বিগত ১লা এপ্রিল তারিখে নবাগত রাজ-প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ড আরউইনের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি বোম্বাই হইতে দিল্লীতে গমন করিয়া রাজ-প্রতিনিধির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার যাঁহার উপর অর্পিত হইল, তিনি কি ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিবেন, ভবিষ্যৎ তাহা নির্দ্দেশ করিবে; যিনি চলিয়া গেলেন, তিনি কি করিয়া গেলেন, ভারতবর্ষের তাহা অবিদিত নহে। আমরা আগামী পাঁচ বৎসরের এই অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতেছি।

মৌলানা সৌকত আলি

শোক-সংবাদ

সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

বিগত ১৫ই চৈত্র অপরাহ্নকালে প্রবীণ সিবিলিয়ান, দেশনায়ক সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (কে, জি, গুপ্ত) মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃভূমি ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণার ভাটপাড়া গ্রামে। তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি লণ্ডনে গমন করেন এবং মিডল টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করেন। ঐ বৎসরই তিনি ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসে যোগদান করেন। ১৮৮৭—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি একুণাইজ কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ডিভিসন্যাল কমিশনার হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রেভেনিউ বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হন। ভারতীয় আবগারী বিভাগে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তিনি তাহার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মৎস্য বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। মৎস্যের চাষ শিক্ষা করিবার জন্য তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হন। ঐ বৎসর তিনি ইণ্ডিয়া

কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। কার্য্যকাল শেষ হইয়া যাওয়ায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আমরা পরলোকগত গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র কন্যা ও আত্মীয় বন্ধুগণের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

'ভারতবর্ষে'র শেষ ফর্ম্মা যখন ছাপা আরম্ভ হইবে, তখন নিম্নোক্ত সংবাদ আসিল রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী আর ইহজগতে নাই; ২৪শে চৈত্র বুধবার অপরাহ্ণে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। আমরা আমাদের বন্ধুকালের বন্ধু, সুধী, সৌম্য-দর্শন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আজীবন কর্ম্মধার, সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম বন্ধু, সুপণ্ডিত, পরহিতব্রত যতীন্দ্রবাবুকে শেষ দেখাও দেখিতে পাইলাম না, তাঁহার চিতা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবিন্দু অশ্রুত্যাগেরও অবকাশ পাইলাম না;—নিদারুণ কাল দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালার একজন কৃতী সন্তানকে অন্তর্হিত করিয়া দিল। কি বলিয়া যতীন্দ্রবাবুর জন্য শোক প্রকাশ করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না—আমরা যে আজ কি রত্ন হারাইলাম, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব। টাকীর যতীন চৌধুরী যে বাঙ্গালা দেশের একটা বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া ছিলেন, আজ সে অংশ অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হইল। তাঁহার পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব। এবার আর সময় নাই; আমরা আগামী সংখ্যায় যতীন্দ্রবাবুর প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিব।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত "মঞ্চ ও চিত্রপট" একত্রিত অভিনব সংস্করণ মূল্য—২৲

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "হরিলক্ষ্মী" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "রাণা দুর্জ্জনশাল" ৸৹, "ছোট সরকার" ৸৹

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব বহু প্রণীত "মানস কমল" মূল্য—১৲

শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী প্রণীত "নেহেরের ব্রতকথা বা আষাঢ়ে" মূল্য ১।৹

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত "ভাল বেতাল" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত "ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব ও প্রার্থনা" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ভাই ও ভগিনী" মূল্য—৷৹

শ্রীযুক্ত সুরীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "পাঠশ্রেষ" মূল্য—৷৹

শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সতীর তেজ" মূল্য—১৲

নিবেদন

'ভারতবর্ষ' আগামী আষাঢ় মাসে চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিবে

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৩।৹, ভিপিতে ৩৷৵৹ ষাণ্মাসিক ১৷৹ আনা, ভিপিতে ১৷৵৹। এই জন্য ভিপিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক। ভিপির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়, সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২৫শে বৈশাখের** মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভিপি করা হইবে। পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ব্ব নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নং দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ নূতন বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

দ্রষ্টব্য—ত্রয়োদশ বর্ষের 'ভারতবর্ষে'র একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠক পাঠিকাগণের গোচর করিতেছি। এই বৎসর ২০০০ পৃষ্ঠারও পরিচয় বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত বহু বাঙ্গচিত্র, একাধিক বর্ণ চিত্র ১০ খানি ও একবর্ণ চিত্র ন্যূনাধিক ১২০০ প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এই ত্রয়োদশবর্ষে কি গ্রন্থ-বৈচিত্র্যে, কি দ্বিবর্ণ চিত্রে, কি একবর্ণ চিত্র—সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিভিন্ন বিভাগের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকগণ 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিয়াছেন;—বাঙ্গালাদেশে কেন, ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেরই কোন মাসিকপত্রই এত অধিক লেখক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messers Gurudas Chatterjee & Sons.
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA

ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশঙ্করাচার্য্যদেব ও বিবর্ত্তবাদ

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম-এ

এই জগতের মূল তত্ত্ব কি? কোন্ উপাদান-কারণ দ্বারা এই জগৎ রচিত হইয়াছে? ন্যায় ও বৈশেষিক বলিতেছেন, পরমাণুপুঞ্জই জগতের উপাদান-কারণ। অন্যান্য দর্শনকার এই পরমাণুবাদের বহু ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমাণুপুঞ্জ বলিলে বস্তু-বহু বুঝায়। এই বহুর দ্বারা জগতের মূল তত্ত্ব-বিনির্ণয় কি যুক্তিযুক্ত? সাংখ্যকার বলিতেছেন, প্রকৃতি হইতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উদ্ভব। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব দ্বারা জগত্তত্ত্বের মীমাংসা হইতে পারে। পূজ্যপাদ পতঞ্জলি ঋষিও তাঁহার যোগদর্শনে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য ও যোগের এই প্রকৃতি বা প্রধানবাদ বেদান্তদর্শন স্বীকার করেন নাই। এই প্রধানবাদের প্রধান অসামঞ্জস্যের বিষয় এই যে, প্রকৃতি জগতের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী; অথচ সেই প্রকৃতি অচেতন—তাহার চেতনা নাই। গাভী স্তনোদ্ভূত ক্ষীর যেমন বৎসের জীবনরক্ষার জন্য সতধারে প্রবাহিত হইতেছে, মেঘবারি যেমন ধরিত্রী রক্ষণের নিমিত্ত বর্ষিত হইয়া থাকে, তেমনই প্রকৃতি জড়পদার্থ হইলেও পুরুষের নিমিত্ত প্রবৃত্তিময়ী হইয়া থাকে। এই হেতু এই বিশাল বিশ্বের বিকাশ সংঘটিত হইয়াছে। এই যে অচেতন প্রকৃতির দ্বারা সাংখ্যাচার্য্য জগৎ-রচনার কথা বলিলেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? সাংখ্যকার প্রকৃতিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন; আবার পুরুষ স্বতন্ত্র ও চেতন,—ইহাও বলিয়াছেন। সাংখ্যের মতে এই যে দ্বৈতভাব রহিয়াছে, ইহার খণ্ডন কি প্রকারে হইতে পারে?

শারীরক ভাষ্যকার শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য দেব এই দ্বৈতভাব নিরাকৃত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, জগতের মূল তত্ত্ব এক ব্যতীত বহু হইতে পারে না;—যাঁহারা একাধিক বস্তুকে জগতের মূল তত্ত্ব বলিয়া থাকেন,

তাঁহারা ব্রাহ্ম। এই হেতু ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণুবাদের দ্বারা জগতত্ত্বের নিরূপণ করা যায় না। আবার সাংখ্যের দ্বৈতবাদও বিরোধাত্মক বাক্যে পরিপূর্ণ। আচার্য্য যে, অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, ইহা ভারতে নূতন নহে। তাঁহার বহু কাল পূর্ব্বে মহর্ষিগণ অদ্বৈতবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও তাঁহার ভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উপনিষদের বাক্যসমূহে অদ্বৈতবাদই নিহিত রহিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তাহা ইতিহাসবেত্তামাত্রেই অবগত আছেন। কেবল ভারতবর্ষ কেন, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ও সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে নাস্তিকতা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। বৌদ্ধ দর্শন হিন্দু দর্শনের উপর সংস্থাপিত। অথচ বৌদ্ধগণ বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। যখন বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উপর লোকের ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ডের কুব্যাখ্যাও আরম্ভ হইয়াছিল, এবং পশু-হননকেই অনেক লোকে প্রধান ইষ্টব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করিত।

এই সকল ব্যাপারে বুদ্ধদেবের প্রাণে খুবই আঘাত লাগে। তিনি প্রচার করিলেন, 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'। ইহা যে পরম সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও প্রচারিত হইল, বেদের সম্মান কেন করিতে হইবে? ব্রাহ্মণের প্রাধান্য যুক্তিসঙ্গত নহে; সকল মানব সমান। এইরূপে বৌদ্ধগণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, এবং একটী স্বতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি হইল। কিন্তু দর্শন বিষয়ে তাহারা হিন্দুগণের নিকটই ঋণী। সাংখ্যদর্শন বৌদ্ধদর্শনের ভিত্তি স্বরূপ। নানা কারণে কপিলের সাংখ্যদর্শনকে ষড়্‌দর্শনের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক, বৌদ্ধগণও সাংখ্যের দ্বৈতভাব নিরাকরণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তবে নিরীশ্বর সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ তাঁহারা প্রকারান্তরে গ্রহণই করিয়াছিলেন। এইরূপে বৌদ্ধগণ তাঁহাদিগের শূন্যবাদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বজায় রাখেন নাই। তাঁহাদিগের মতে সবই শূন্য। জগৎ শূন্য; জগতের অস্তিত্ব ত তাঁহারা স্বীকার করেনই না। তাঁহাদিগের মতে জগতের যে মূল তত্ত্ব তাহাও শূন্য। শূন্যের উপরই তাঁহাদিগের দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

আচার্য্যের বিবর্ত্তবাদে বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইল; তিনি তাঁহাদিগের শূন্য স্থলে ব্রহ্ম স্থাপন করিলেন। বৌদ্ধদিগের মতে জগৎ নাই; আচার্য্যও বলিলেন, জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃতই হইতে পারে না। তিনি বলিলেন, মূল তত্ত্ব একাধিক বস্তু হইতে পারে না। পরমাণুপুঞ্জকেও মূল তত্ত্ব ভাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না; প্রকৃতি-পুরুষও মূল তত্ত্ব হইতে পারে না। আর শূন্যকেই বা আমরা কি প্রকারে মূল তত্ত্ব বলিব? শূন্য ত অবস্তু। জগতের মূল তত্ত্ব সারাৎসার নিত্য বস্তু হইবে; তাহাকে শূন্য কখনই বলিতে পারা যায় না। এইরূপ ভাবে দেখা যায়, শূন্যবাদের পর আচার্য্যের অদ্বৈতবাদই স্বাভাবিক; এবং বিবর্ত্তবাদ আচার্য্যের অদ্বৈতবাদের মূল ভিত্তি।

এক্ষণে বিবর্ত্তবাদ কি, তাহাই কথিত হইতেছে। অদ্বৈত মত স্থাপন করিতে গেলে বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ আবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ বলা হইতেছে, জগতের মূল তত্ত্ব ব্রহ্ম; তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু এই যে জীব-জগৎ দেখা যাইতেছে, এই যে নানা বস্তুর সমাহার দেখা যাইতেছে,—একের দ্বারা এই নানাত্বের ব্যাখ্যা কি প্রকারে সম্ভব? আচার্য্য বলেন, মায়াই এই নানাত্বের সৃজনকর্ত্রী।

মায়া কর্ত্তৃক এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কি প্রকারে গঠিত হইয়া থাকে? আচার্য্য একটি দৃষ্টান্ত দেন। এক খণ্ড রজ্জু সম্মুখে পড়িয়া আছে। ভ্রম-ক্রমে ইহাকে সর্প মনে করা হইতে পারে। যে সময় ইহাকে সর্প মনে করা হইবে, তখন বাস্তবিকই মনে হইবে ইহা সর্প। এমন কি ইহার ভয়ে ছুটিয়া পলাইতে গিয়া আমাদের অঙ্গহানিও ঘটিতে পারে। অথবা, একখণ্ড শুক্তি ভূপতিত দেখিয়া তাহাকে রজত মনে করা হইতে পারে। শুক্তিটীকে রজত ভাবিয়া তৎকালে চিত্তের মধ্যেও নানা প্রকার কল্পনার উদ্ভব হইতে পারে। এমন কি, বস্তুটী গ্রহণের জন্য হস্ত-প্রসারণও করিতে পারি। এই যে রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি, অথবা শুক্তিতে রজত-ভ্রান্তি,—এই ভ্রান্তির দ্বারা আমাদের মনে সর্প বা রজতের উদ্ভব ঘটিল। আচার্য্য বলেন, ইহা যেমন সম্ভব, তেমনই মায়া বা অজ্ঞানের প্রভাবে এই জগৎ-প্রপঞ্চের উদ্ভব হওয়াও সম্ভব।

আচার্য্যের মতে আত্মা ও ব্রহ্ম একই কথা। তিনি বলেন, শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই আত্মা ব্রহ্ম। সুতরাং আমিই ব্রহ্ম,—'অহং ব্রহ্মাস্মি'; আমি তাহাই—'সোঽহং,'; তুমি তাহাই, 'তত্ত্বমসি'। আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম—ইহা যদি প্রকৃত কথা হয়, তাহা হইলে আমি, তুমি, ঘট, পট ইত্যাদি বিভেদ কিসে ঘটিল? আচার্য্য বলেন, ইহা মায়ার কার্য্য; মায়ার দুইটী শক্তি আছে, আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তি। ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘ বহু যোজন বিস্তৃত আদিত্য-মণ্ডলকে লোক চক্ষুঃ হইতে আবরণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়; তদ্রূপ এই আত্মা, যাহা অপরিচ্ছিন্ন ও অনন্ত, তাহাকে অজ্ঞান যেন আবরণ করিয়া রাখে,—ইহাই হইল আবরণ-শক্তি। আর ঐ যে রজ্জুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, সেই রজ্জু সম্বন্ধীয় অজ্ঞান যেমন নিজ শক্তিতে সর্প উদ্ভাবন করিতে সমর্থ, সেইরূপ মায়া বা অজ্ঞান নিজ শক্তিতে আকাশাদি প্রপঞ্চকে উদ্ভাবন করিয়াছে। এই প্রকারে আচার্য্য বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদের দ্বারা অদ্বৈত মত স্থাপন করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই যে রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান, ইহা ভ্রম জ্ঞান। কেন? যেহেতু ইহা বাধিত হইবে; অর্থাৎ রজ্জু বলিয়া আমার যখন জ্ঞান হইবে, তখন ইহাতে সর্পভ্রান্তি ঘুচিয়া যাইবে। আচার্য্য বলেন, এই যে ঘট পট ইত্যাদি জ্ঞান, ইহা ব্যবহারিক জ্ঞান। পারমার্থিক জ্ঞান হইলে দেখা যাইবে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই নাই; এবং 'সোঽহং' আমি সেই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানেই মোক্ষ; 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি,' যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন, 'ন স পুনরাবর্ত্ততে,'।

রজ্জুতে যেরূপ সর্পের আরোপ করা হয়, ব্রহ্মে তেমনই জগতের আরোপ বা অধ্যাস করা হইতে পারে কি না, আচার্য্য শারীরক ভাষ্যের প্রারম্ভে তাহার বিশেষ বিচার করিয়াছেন। দার্শনিকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টীকা অবলম্বন করিয়া সেই বিচার সম্বন্ধে এ স্থলে কিছু বলা হইতেছে। সেই বিচারের দ্বারা আচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, দ্বৈতবাদীরা এই অধ্যাস সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, সেইগুলি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

যে প্রকার ভ্রান্তির কথা বলা হইল, তাহা দুই প্রকারের হইতে পারে,—ধর্ম্মীতে ধর্ম্মীর ভ্রান্তি, যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তি। অথবা ধর্ম্মীতে ধর্ম্মের ভ্রান্তি, যেমন একটী স্ফটিকের পার্শ্বে যদি একটী জবাকুসুম থাকে, তাহা হইলে স্ফটিকটীকে জবা মনে না করিতে পারি, অর্থাৎ ধর্ম্মীতে ধর্ম্মীর ভ্রান্তি হইবে না। কিন্তু জবার রক্তবর্ণ স্ফটিকে আরোপিত হইবে, অর্থাৎ স্ফটিকটীকে রক্তবর্ণ মনে করা হইবে, ইহাই হইল ধর্ম্মীতে ধর্ম্মের ভ্রান্তি।

এখন যদি ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঐ প্রথম প্রকারের ভ্রমের কথা বলা যায়, তাহা হইলে কি আপত্তি হইতে পারে? রজ্জু দেখিয়া মনে করা হয়, 'ইহা সর্প'; 'ইহা' বলিয়া বিশেষ্যটী বুঝিলাম, এবং তাহাতে 'সর্প' এই বিশেষণ আরোপ করিলাম। 'ইহা' বলিয়া যে রজ্জুকে জানিলাম, সেই রজ্জুটী ত আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইল এবং আমার জ্ঞেয় বস্তুও হইল। কিন্তু, 'ইহা জগৎ'; যখন ব্রহ্মকে 'ইহা' বলিয়া জানিলাম, তখন ব্রহ্ম কি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং জ্ঞেয় বস্তু হইল? 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'; ব্রহ্ম কি প্রকারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়া জ্ঞেয় বস্তু হইবে? ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, তাহাকে আবার জ্ঞেয় স্বরূপ বলা হইতেছে কেন? এই হইল প্রথম আপত্তি।

আর যদি জগৎকে বিশেষ্য ও ব্রহ্মকে বিশেষণ বলা যায়; তাহা হইলে জগতের সত্তা ত স্বীকারই করা হয়। এই প্রকার ভ্রমের কথা ত আচার্য্য বলিতেছেন না।

আর যে ধর্ম্মীতে ধর্ম্মের ভ্রান্তি বলা যায়, সেস্থলে স্ফটিক ও জবাকুসুমের মধ্যে নৈকট্য সম্বন্ধ থাকে। জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সেই প্রকার নৈকট্য সম্বন্ধ আছে না কি? আরও ঐ প্রকার ভ্রম ত প্রত্যক্ষ ভ্রম; রূপ-বিশিষ্ট দ্রব্যের পক্ষেই ঐ প্রত্যক্ষ ভ্রম হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কি স্ফটিকের মত রূপবিশিষ্ট বস্তু?

একটু বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে ভাবিতে গেলে দেখা যাইবে, যখন রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি হয়, তখন রজ্জু আমার সম্মুখে থাকে এবং 'আমি বস্তু' হইতে পৃথক্ বস্তু রূপে থাকে। ব্রহ্মও আমার সম্মুখে থাকিবে এবং 'আমি বস্তু' হইতে ব্রহ্মের পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। তাহা কি সম্ভব?

আপত্তিকারী আরও বলিতে পারেন, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ কি পরাধীন-প্রকাশ? জড় বস্তু পরাধীন-প্রকাশ; কারণ, জড় বস্তু আত্মার দ্বারাই প্রকাশিত হয়; আর পরাধীন, প্রকাশ বস্তুস্থলেই ভ্রান্তির সম্ভাবনা। তাহার এক অংশ

জ্ঞাত হইয়া অন্যান্য অংশ জ্ঞাত না হইলেই ঐ প্রকার ভ্রান্তি হয়। কিন্তু ব্রহ্ম পরাধীন-প্রকাশ হইতে পারে না। ইহা স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ বস্তুর এক অংশ জ্ঞাত হইল, অন্যান্য অংশ জ্ঞাত হইল না, ইহা ত অসামঞ্জস্য-পূর্ণ কথা।

বিবর্ত্তবাদী এই সমুদায় আপত্তির উত্তরে বলিবেন, ব্রহ্ম সত্তাই স্বপ্রকাশ বটে, সে যে 'আমি বস্তু' হইতে পৃথক্ বস্তু নহে বা আমার সম্মুখে রজ্জুটির মত থাকিতে পারে না, তাহাতে নৈকট্য সম্বন্ধের আরোপ করিতে পারি না, এবং কাজে কাজেই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞেয় বস্তু রূপে বিজ্ঞাত হইতে পারে না—ইহা সবই সত্য বটে। কিন্তু অনির্ব্বচনীয় ও অনাদি যে অবিদ্যা রহিয়াছে, তাহার দ্বারা পরিকল্পিত যে বুদ্ধি মনঃ সূক্ষ্ম স্থূল শরীরাদি রহিয়াছে, তৎসমুদায় দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্ম বাস্তবিক পরিচ্ছিন্ন না হইলেও পরিচ্ছিন্নের ন্যায়, হইলেও কর্ত্তার ন্যায়, অভোক্তা হইলেও ভোক্তার ন্যায়, অবিষয় হইলেও 'আমি' এই বিষয়ের ন্যায় জীবভাব-আপন্ন হইয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই কারণে ব্রহ্ম বা আত্মার আমাদের জগৎ-ভ্রান্তি হয়।

এই রূপে আত্মায় জগতের অধ্যাস সিদ্ধ হয়। কিন্তু একটী আপত্তি করা যাইতে পারে। অধ্যাস সিদ্ধ হইলে আত্মার বিষয়ত্ব সিদ্ধ হয়, এবং বিষয়ত্ব সিদ্ধ হইলে অধ্যাস সিদ্ধ হয়; এই রূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিতে পারে। বিবর্ত্তবাদী বলেন, এই দোষের ভয় এ স্থলে নাই। বীজাঙ্কুর যেমন অনাদি ধারায় চলিয়াছে, এই ভ্রান্তিও তেমনই অনাদি। যেমন প্রথমে বৃক্ষ কি প্রথমে বীজ ইহার উত্তর দিতে পারা যায় না, বৃক্ষ ও বীজ অনাদি ধারায় চলিয়াছে—ইহাও তদ্রূপ।

আরও অপ্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রত্যক্ষ ভ্রম হইতে পারে না—এই যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, ইহার উত্তরে আচার্য্য আকাশের দৃষ্টান্ত দেন। আকাশ রূপ ও স্পর্শহীন, সুতরাং অপ্রত্যক্ষ; তাহাতে নীলত্ব, ধবলত্ব ইত্যাদি আরোপ কি করিয়া হইয়া থাকে? ইহা যেমন সম্ভব, আত্মায় জগৎ-ভ্রান্তিও তদ্রূপ সম্ভব।

আপত্তিকারী আর একটী আপত্তি তুলিতে পারেন। যখন রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি হয়, তাহার পূর্ব্বে সর্প সম্বন্ধে নিশ্চিতই আমাদের যথার্থ জ্ঞান থাকে। পরে ভ্রমক্রমে সেই সর্পত্ব রজ্জুতে আরোপিত করি। ব্রহ্মে জগৎভ্রান্তি বলিতে গেলেও সেইরূপ জগতের যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্ব হইতেই আমাদের থাকা স্বীকার্য্য বলিতে হইবে।

বিবর্ত্তবাদী ইহার উত্তরে বলেন, জগতের যথার্থ জ্ঞান না থাকিলে যে এই ভ্রম উৎপাদিত হইতে পারে না, এমন কথা বলা যায় না। জগতের ভ্রান্তি-জ্ঞান পূর্ব্ব হইতে থাকিলেই এই ভ্রমের উৎপাদন হইতে পারে। ভ্রমের পূর্ব্বে যে একটী যথার্থ জ্ঞান থাকাই চাই, এমন কথা নহে। এই যে দেহে আত্মজ্ঞান রূপ যে ভ্রান্তি-জ্ঞান হয়—এই ভ্রান্তির পূর্ব্বে দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ কি একটী যথার্থ জ্ঞান আছে? ইহা ত অসম্ভব। এই যে দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ ভ্রান্তি ইহা দ্বৈতবাদীরাও স্বীকার করেন। সুতরাং দ্বৈত-বাদীরাও স্বীকার করিবেন, ভ্রমের পূর্ব্বে যে তত্ত্বং একটী যথার্থ জ্ঞান থাকিবে, ইহা ঠিক নহে।

আপত্তিকারী বলিতে পারেন—এই যে প্রথমতঃ আত্মাই ব্রহ্ম বলা হইল, ইহা ত প্রকৃত কথা নহে। বিভিন্ন জীবসমূহ রহিয়াছে, তাহাও আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি। সে ক্ষেত্রে আত্মাই ব্রহ্ম—ইহা কি করিয়া বলা চলিতে পারে? এই যে 'আমি আছি' ইহা ত বেশ অনুভব করিলাম। বিবর্ত্তবাদী বলেন, 'আমি' বলিয়া যে অনুভব করিলাম, এই অনুভব করা ঠিক অনুভব করা নহে। যখন বলিতেছি, 'আমি আছি', তখন ভাবিতেছি, এই ত গৃহের মধ্যে আমি আছি। কিন্তু এ ত গৃহপরিচ্ছিন্ন 'আমি'র অনুভব, কিন্তু আত্মা যে অপরিচ্ছিন্ন। ইহা ত অপরিচ্ছিন্ন আত্মার অনুভব নহে। এই 'আমি' বোধ অনেকবিধ শোক দুঃখ আদি প্রপঞ্চ কর্ত্তৃক উপপ্লুত আত্মাকে অনুভব করা মাত্র।

এই সকল যুক্তি ও আপত্তি খণ্ডনের দ্বারা আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে আত্মাই ব্রহ্ম। এক অনাদি মায়া রহিয়াছে, সেই মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে। অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব কিছুই ঠিক বলিতে পারা যায় না। অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মের অনন্তত্বে আঘাত লাগে; আবার অস্তিত্ববিহীন বলিলেও জগৎ-প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা করা যায় না। যাহা হউক আচার্য্য প্রমাণ করিলেন,—জগৎ নাই, ইহা ভ্রান্তি মাত্র; এই জগতের জননিত্রী মায়া; আর জীবই ব্রহ্ম:—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।"

মনের পরশ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(৩৩)

মাদাম রিশার রুমাল বাহির ক'রে নিজের অশ্রুবলিন মুখখানি আবার সন্তর্পণে মুছে মাটির দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন :—

"আমার পিতা ছিলেন বণিক্। বোর্দোতে আমাদের কাপড়ের প্রকাণ্ড দোকান ছিল। আমাদের কারবার ছিল মস্ত বড় ও আমরা ছিলাম মস্ত ধনী। আমার একটিমাত্র ভাই ছিল, আমার চেয়ে বছর ছয়েকের ছোট—যার কথা আপনাকে ব'লেছি। সে দেখতে আপনার চেয়ে একটু কম লম্বা হ'লেও আপনার আকৃতির মধ্যে কেমন যেন তার একটা সাদৃশ্য আসে। প্রথম দিন হ'তেই হয়ত এই কারণেই আপনার ওপর আমার একটা মমতা প'ড়ে গিয়েছিল। যাক্ একথা—আজ সে কোথায় আর আমি কোথায়।···তবু মনে হয় মসিয়ে বাক্চি, আজ যদি সে বেঁচে থাকত তবে অন্ততঃ স্বদেশে একজনের কাছেও আমি আজ একটুখানি স্নেহের দাবী দাওয়া রাখতে পারতাম।"

ব'লে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন :—

"আজ আমাদের লণ্ডনের খরচ সঙ্কুলান করার জন্যে আমাকে বাড়ীতে অতিথির কাছ থেকে টাকা নিতে হচ্ছে। কিন্তু একদিন ছিল যখন আমাদের বাড়ী অতিথি-অভ্যাগতে ভরতি থাকত। তাদের কি আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থাই না ছিল। আমাদের প্রাসাদটির সংলগ্ন একটি বাড়ীই ছিল তাদের জন্যে; ও বোর্দোসহরে আমার পিতা ছিলেন তাঁর আতিথেয়তার জন্যে বিখ্যাত।···কিন্তু মানুষের ভাগ্যলক্ষ্মী কি চঞ্চলা!···"

ব'লে মাদাম রিশার চুপ করলেন। পল্লব মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইল। দেখল তিনি জানালার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে কি এক চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে গেছেন।···হঠাৎ তাঁর চমক ভাঙল। তিনি বলতে লাগলেন: "আমাকে ভুল বুঝবেন না মসিয়ে বাক্চি। ঠিক্ অবস্থাবৈগুণ্যের জন্য আজ আমি কোত করছি না—অতিথির কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য করছি। বিলাসের সে বন্যা এখানে বহাতে পাচ্ছিনা ব'লে আমার দুঃখ নয়, কারণ আশৈশব বিলাসের মধ্যে যে অসারতা আমি দেখেছি তাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অজস্র অর্থাগমের ওপর আমার অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। আমার ভাইটি আমাকে প্রায়ই বলত যে খ্রীষ্টদেবের সর্বচেয়ে বড় বাণীর একটি হচ্ছে তাঁর সেই কথাটি যাতে তিনি ব'লেছেন যে ধনীর পক্ষে Kingdom of

Heidelbergএ প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। আমার এক-একবার এমনও মনে হয় যে আমার প্রথম স্বামীও বোধ হয় ধনী সন্তান না হ'লে এত সহজে আমার হৃদয়ের দ্বারকে পদাঘাত ক'রে একজন সামান্য গণিকার জন্য আমার হৃদয় ভেঙে দিতে পারতেন না। হয়ত তিনি সামান্য অবস্থার লোক হ'লে আমার বিশ্রব্ধ ভালবাসার মূল্য দিতে পারতেন।...কিন্তু সব কথা যেখানে বলাই ভাল।...আমার ক্ষণে ক্ষণে এ রকম অসংযমতার জন্য অধীর হবেন না আশা করি—"

পল্লব বল্‌ল: "মাদাম রিশার, বিশ্বাস করুন, এই রকম ভাবে আপনার কাহিনী শুনতেই আমার বেশি ভাল লাগছে। কারণ এতেই আপনার মনটির পরিচয় আমি বেশি সত্য ক'রে পাচ্ছি।"

মাদাম রিশার বল্‌লেন: "ধন্যবাদ। তবে শুনে যান। বাড়ীতে আমি বরাবরই পিতামাতার অতি আদরিণী কন্যা ছিলাম। আমার একটা মুখের কথা সরতে না সরতে আমার ইচ্ছা অভিলাষ পূর্ণ করতে দাসদাসী ছুটত। হয়ত এরূপ শিক্ষার ফলে আমার চরিত্রের সর্বনাশ হ'য়ে যেত যদি না বিধাতা একটি দেবদূতকে আমার ভাই ক'রে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমার ভাইয়ের কাছে আমি শুনতাম যে স্বাবলম্বী হওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, বিলাসে মানুষের চরিত্রের নেরুদণ্ড নষ্ট হ'য়ে যায়, জগতে সভ্যতার সৃষ্টি ক'রে এসেছে কেবল অনলস সামান্য অবস্থার লোক ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এসব কথা আমার তার কাছ থেকে ক্রমাগত শুনতে শুনতে ভাল লাগলেও আমি তার মতন স্বাবলম্বী থাকতে পারি নি। কারণ আমার পারিপার্শ্বিক তার মতন অনুকূল ছিল না। সে প্যারিসে Sorbonne Universityতে দর্শন পড়ত ও হাত-খরচের অল্প টাকা দান ক'রে দিয়ে নিজে একটা সামান্য বাসায় দুটি ঘর নিয়ে থাকত। এ রকম ভাবে থাকতে বাধা দেবার তার কেউই ছিল না। কাজেই বাড়ীর বিলাসের আবহাওয়া তার মনের উপর সে-রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কিন্তু আমি নারী; আমাকে আমাদের বাড়ীর দূষিত আবহাওয়ার ও খোষামোদের শঙ্খধ্বনির মধ্যেই অশৈশব কাটাতে হ'য়েছে। কাজেই আমি আমার ভাইয়ের ইচ্ছা ও উপদেশ সত্ত্বেও তার আদর্শ অনুসারে চলতে পারি নি ...কিন্তু থাক্ একথা।...

"সে ছুটিতে মাঝে মাঝে বাড়ী আসত। কিন্তু বোর্দোতে আমি ছাড়া তার কেউ সাথী বা বন্ধু ছিল না ব'লেই হোক্, বা আমাদের পরিবারের আত্মীয়বন্ধুদের সে চক্ষে দেখতে পারত না ব'লেই হোক্, ছুটি ফুরোবার অনেক আগেই চ'লে যেত। হয় জার্মাণীর Black Forestএ ঘুরে বেড়াত, না হয় Alpsএ চড়ত, না হয় দেশ ভ্রমণ করত। বাড়ী যেন তার ভাল লাগত না।...

"কেবল আমার উপর তার স্নেহ ছিল গভীর। কারণ বোধ হয় বাড়ীর মধ্যে একা আমিই তাকে খানিকটা বুঝতে পারতাম। অন্য সকলেই তাকে হয় একগুঁয়ে না হয় মাথা-খারাপ ব'লে সমস্বরে নিন্দা করত ও অবজ্ঞার চোখে দেখত। বাবা-মার ইচ্ছে ছিল সে তাঁদের ব্যবসাটাই চালাতে শেখে। কিন্তু সে বলত যে সে সামান্য অধ্যাপক হ'তে পারলেই সন্তুষ্ট হবে। অর্থে শুধু অনাসক্তি নয়, তার যেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল।...আমাকে সে প্রায়ই নানা বই পড়ে শোনাত, নানা বিদেশী সাহিত্য ও সাহিত্যিকের কথা বলত, ও কখনও কখনও তার অধীত দর্শন শাস্ত্রের অনেক তথ্য সরল ভাষায় বোঝাবার চেষ্টা করত। আমি কখনও কখনও শুনতে না চাইলে সে বলত—'তোমাকে শুনতেই হবে। কারণ মানুষের মনের পক্ষে সব সময়েই সে যতটুকু গ্রহণ করতে পারে তার চেয়ে বেশি পাওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এসব শোনার ফল একদিন না একদিন ফলবেই ফলবে।' ক্রমে ক্রমে হ'লও অনেকটা তাই। ক্রমে আমার তার চিন্তা, আলোচনা ও মতামত শুনতে ভাল লাগতে আরম্ভ করল। শেষে এমন হ'ল যে আমি প্রতি ছুটিতে সত্যিই তার আশাপথ চেয়ে থাকতাম কবে সে প্যারিস থেকে আসবে নতুন নতুন কথা শোনাতে, জগতের চিন্তাধারার খবর দিতে ও তার নিত্যই-নব উপলব্ধির অংশদান করতে।

"এমন সময়ে যুদ্ধ বাধল। আমি Boulogneএ এক কনভেন্টে পড়তে গেলাম ও সে গেল যুদ্ধ করতে। যুদ্ধের প্রথম বৎসরেই সে বিষাক্ত গ্যাসে মারা গেল। আমার তখন বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। একজনের অভাবে যে এ হাস্যময় উজ্জ্বল জগৎ কি নিষ্প্রভ পরিহাস ব'লে মনে হাত পায়ে তা তখন প্রথম উপলব্ধি করলাম।..."

বলতে বলতে মাদাম রিশারের কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে এল।

কিন্তু তিনি জোর ক'রে আবেগ দমন ক'রে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌লেন: "থাক্ সে কথা। মানুষের গভীর দুঃখের কাহিনী নিয়ে বেশি আলোচনা না করাই ভাল। তাতে তার পবিত্র মধুরতা নষ্ট হয়।...

"আমি তখন ঠিক্ করলাম যে আমি আজীবন সেই কন্‌ভেণ্টে থেকেই পরহিতে জীবন নিয়োজিত করব। কারণ জগতের আকর্ষণী শক্তি সব আমার কাছে এক মুহূর্ত্তে কেমন যেন অন্তঃসারশূন্য বোধ হ'তে লাগ্‌ল। মনে আছে সে সময়ে আমার মনে হ'ত যে মানুষের সব উৎসবানোদের চাকচিক্যই যেন নরকঙ্কালের হাসির মতনই একটা বিরাট্ উপহাস।...মনে হ'ত যে জীবনটা যেন একটা বুদ্‌বুদের মতনই অর্থহীন বস্তু।...কিন্তু হায়...যৌবনের ধর্ম্ম কে রোধ কর্‌তে পারে? যখন জগতের প্রতি ফুলের হাসি, তারার চাহনি, বিহঙ্গের কাকলি, সবুজের হাতছানি ও প্রেমের অগ্নিশিখা আমাদের চোখে প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের অভিনবত্বের গৌরব নিয়ে প্রতিভাত হয় তখন অতীতকে কোলে ক'রে কয়দিন থাকা যায়?...

"যুদ্ধ তখন সবে শেষ হ'য়েছে ও আমি একটা লম্বা ছুটিতে বাড়ী ফিরেছি। এমন সময়ে একটা 'বল' নাচে আমার মসিয়ে জুল রেনার (Jules Renan) সঙ্গে পরিচয় হয়।

"পুরুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল আমার খুবই কম। শৈশবে ও বাল্যে ধরতে গেলে আমার একমাত্র পুরুষ সঙ্গী বা বন্ধু ছিল আমার ভাইটি; ও যৌবনের প্রারম্ভ হ'তে আমি কন্‌ভেণ্টে মানুষ যেখানে পুরুষের গতিবিধি নিষিদ্ধ। কাজেই মানবচরিত্র সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাও ছিল যেমন কম, ধারণাও ছিল তেম্‌নি কাঁচা। বিশেষতঃ বাল্য হ'তে আমার ভাইয়ের কাছে সদাদর্ব্বদা সুন্দর ও মহৎ আলোচনাদি শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মন চৈতন্তে কেমন যেন একটা বিশ্বাস গেঁথে গিয়েছিল যে দুই লোক বুঝি এমন একটা বিভীষিকা গোছের বস্তু যার কপালে ছাপ মারা আছে, যাকে দেখ্‌লেই চেনা যায়।...কাজেই আমি শুধু যে মসিয়ে রেনার চরিত্রের অসারতা ধরতেই পার্‌লাম না তাই নয়, তাঁর সুন্দর চেহারা, পরিপাটি বেশভূষা, ও মধুর আলাপে আমার বিমুগ্ধ হৃদয় এক মুহূর্ত্তে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। এক মাসের মধ্যেই আমি তাঁর প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে বাগ্‌দত্তা হ'লাম। বাগ্‌দানের দিন সন্ধ্যায়ই পিতামাতাকে বল্‌লাম। পিতা ক্রোধে আগুন হ'য়ে বল্‌লেন যে বাগ্‌দান কর্‌বার আগে আমার কর্ত্তব্য ছিল তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা। আমি মার্জ্জনা চাইলাম, বল্‌লাম আমি ভেবেছিলাম মত চাইলেই পাব, তাই অতশত ভেবে কাজ করি নি। পিতা আরও রাগ ক'রে বল্‌লেন যে বোধ হয় এই জন্তই লোকে বলে যে পুত্রকন্যাকে অত্যধিক স্নেহ দেওয়া কিছু নয়, তারা অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন ইত্যাদি। শেষে বল্‌লেন মসিয়ে রেনা ধনীসন্তান হ'লেও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অসচ্চরিত্র, তার সঙ্গে আমার বিবাহ অসম্ভব, আমি যেন অবিলম্বে বাগ্‌দানভঙ্গ করি ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য আমি এসব কথার একবর্ণও বিশ্বাস করলাম না। মনে আছে মসিয়ে রেনা শুনে আমাকে প্রবোধ দিয়ে বল্‌লেন যে, জগতের শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌স্‌পীয়র লিখেছেন যে সত্য ভালবাসার পথ কখনও সরল ও সুগম হয় না; বৃদ্ধ পিতামাতা আজ অবধি কখনও পুত্রকন্যার বিবাহে প্রেমের মূল্য বোঝে নি ও বুঝবে না, যেহেতু তারা চায় সুবিধা প্রতিপত্তি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি আমাকে বল্‌লেন যে আমার পিতা তাঁর পিতার প্রতিপত্তির জন্ত তাঁকে হিংসা করেন; তাই তিনি তাঁর নামে মিথ্যা ক'রে আমার কাছে লাগিয়েছেন। আমি সরল মনে তাঁর প্রতি কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আমার পিতামাতার অমতের কি হবে? মসিয়ে রেনা আমাকে বুঝিয়ে বল্‌লেন যে আমি যখন আমার পিতামাতার একমাত্র আদরিণী কন্যা ও সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী তখন একটু জোর করলেই পিতার সম্মতি পাব।...আমি তাঁর কথামত পিতার পা জড়িয়ে ধ'রে তাঁর মত চাইলাম। পিতা তাতে আরও অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে বল্‌লেন যে এ বিবাহে তিনি যে শুধু মত দিতে পারেন না তাই নয়, যদি আমি তাঁদের অমতে বিবাহ করি তাহ'লে তিনি আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করবেন।"

মাদাম রিশারের স্বর ক্রমেই নীচু হ'য়ে আস্‌ছিল—যেন এসব ভূত-কাহিনী বর্ণনায় তিনি কি একটা বাধা পাচ্ছিলেন। এতদূর ব'লে তিনি একটু থাম্‌লেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার যেন জোর ক'রেই বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন:

"মসিয়ে রেনাকে একথা বল্‌তে না বল্‌তে তিনি সব হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বল্‌লেন ও তাঁর জানা আছে

বিবাহের সময় সব বাপমাই অমন ব'লে থাকে। কিন্তু বিবাহ হ'তে না হ'তে সব দুদিনে ঠিক্ হ'য়ে যায়। ব'লে তিনি তাঁর পরিচিত দু তিনটি বন্ধুর নাম করলেন যাঁরা অনুরূপ ক্ষেত্রে পিতামাতার অমতে বিবাহ করার দু চার দিন পরেই পিতামাতার সম্মতি পেয়েছিলেন। সত্যিই কি কখনও কোনও বাপমা সন্তানকে ত্যাগ করতে পারে—তাঁর ওপর একমাত্র সন্তান!...তিনি প্রস্তাব করলেন যে আমরা পালিয়ে বিবাহ করব ও পরে আমাদের বাপ-মাকে জানাব।...

"আমি ভয় পেলাম ও বল্লাম তাতে কাজ নেই, কিছুদিন অপেক্ষা করা যাক্ ও পিতামাতাকে সাধ্যসাধনা ক'রে রাজি করান যাক্। তাতে তিনি অভিমান করলেন যে তাঁর চেয়ে আমার পিতাই আমার কাছে বড় হ'লেন!... অগত্যা আমি রাজি হ'লাম। বিশেষতঃ তাঁর এ অভিমানকে তাঁর গভীর ভালবাসার একটা প্রমাণ মনে ক'রে আমার সমস্ত চিত্ত নেচে উঠ্ল ও ব'ল্ল যে আর কালবিলম্ব নয়।...

"কিন্তু এখানে মুস্কিল হ'ল। মসিয়ে রেনা বল্লেন বিবাহের পর আমরা পারিস, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি বেড়াতে যাব, কিন্তু তাঁর হাতে টাকা নেই। কারণ এক বন্ধুকে তিনি একবার কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক ধার দিয়েছিলেন ব'লে তাঁর পিতা রাগ ক'রে তাঁকে টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রেছেন। সামান্য হাত-খরচ ব'লে যা দেন তাতে তাঁর নিজেরই চলে না। তাছাড়া আমার সঙ্গে বিবাহে তাঁর পিতারও আপত্তি হবেই হবে রেষারেষির দরুণ। কাজেই আমার শ্বশুরের কাছ থেকেও আমাদের বিবাহে সম্মতি বা টাকা পাওয়া যাবে না।...

"নিরাশায়, দুঃখে, ক্ষোভে চোখে অন্ধকার দেখ্লাম। আমার আকাশকুসুম সব ধূলিসাৎ হ'ল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তবে কি হবে? তিনি একটু ভেবেই বল্লেন যে উপায় হয় যদি আমার মার কাছ থেকে লুকিয়ে হাজার পঞ্চাশেক ফ্রাঙ্ক যোগাড় করতে পারি। আমি মাকে গোপনে সব কথা বল্লাম। মা আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেল্লেন। বল্লেন যে আমি সর্ব্বনেশে লোকের পাল্লায় প'ড়েছি, ও মসিয়ে রেনার কথামত তাঁকে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করলে আমার সর্ব্বনাশ হবে। কারণ তাহ'লে শুধু যে আমি পিতার ত্যাজ্যকন্যা হব তাই নয়, দুদিন বাদে সব মিট্লেই মসিয়ে রেনাও আমাকে হেলায় ত্যাগ করবেন। কারণ মসিয়ে রেনা একজন নামজাদা জুয়াড়ি, উচ্ছৃঙ্খল যুবক, নানা যায়গায় ধার করার দরুণ তাঁর পিতা প্রকাশ্যে ব'লে দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে পুত্রের ঋণের জন্য তিনি দায়ী হবেন না,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

"মসিয়ে রেনার চরিত্র ও সঙ্গীদের বিপক্ষে মা কত কথাই না বল্লেন! কিন্তু হায়, আমি তখন প্রথম প্রণয়ের উদ্দাম ঝোঁকে অন্ধ। মার কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করলাম না। মসিয়ে রেনাকে সব বল্লাম। তিনি অবুঝ হ'য়ে ক্রমাগত আমাকে বল্তে লাগ্লেন যে হাজার পঞ্চাশেক ফ্রাঙ্ক যোগাড় করাই চাই, নইলে তিনি বুঝবেন যে আমি তাঁকে ভালবাসি না। আমি আমার নিঃসহায় অবস্থার কথা বলাতে তিনি আমাকে বিশ্বাসই করলেন না। বল্লেন মেয়ে মাকে কাতর অনুরোধ জানালে কি মা কখনও টাকা না দিয়ে থাকতে পারে?...তাছাড়া পঞ্চাশ ষাট হাজার ফ্রাঙ্ক ত আমাদের বাড়ীর যেখানে সেখানে প'ড়ে থাকে। পরে যখন সে সব টাকাই আমার হবে তখন প্রেমের জন্য কোথাও থেকে সে টাকা হস্তগত করলেই তাতে অন্যায় কোথায়?... ক্রমাগত তাঁর অভিমান, অনুযোগ ও ভৎর্সনায় প'ড়ে শেষটা আমি একদিন রাতে মার হাতবাক্স ভেঙে তার মধ্যেকার পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে মসিয়ে রেনার সঙ্গে গৃহত্যাগ করলাম।"

পল্লব এতক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে শুন্ছিল, কিন্তু এ কথায় একটু চম্কে উঠ্ল। এ যেন এক উপন্যাসের রোমান্স! অথচ এর প্রতি কথাটির মধ্যে একটা খাঁটি হৃদয়ের অনুরাগ বেজে উঠ্ছিল যেটা উপন্যাসে প্রায়ই মেলে না।

মাদাম রিশার করুণ হেসে বল্লেন: "আপনি ভাব্ছেন মসিয়ে বাক্চি যে আমি পিতামাতার কি অকৃতজ্ঞ কন্যা হ'য়েই জন্মেছিলাম, না? নইলে কি না শেষটা মোহের জন্যে চুরি করলাম? এই কথা ভেবেই আপনি চম্কে উঠ্লেন না?"

পল্লব মুখ নীচু ক'রে বল্ল: "না মাদাম রিশার, তা ভেবে আমি চম্কে উঠিনি। আমি চম্কে উঠেছিলাম একটা সরল হৃদয় প্রথম প্রণয়ে কি রকম আত্মহারা হ'তে পারে তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে। কারণ বিশ্বাস করুন, আমি যেন আপনার বর্ণনার প্রতি চিত্রটি চোখের সাম্নে

দেখ্‌ছি। তাই আমার অনুরোধ—আপনি ব'লে যান থামবেন না। আপনার প্রতি কথা যে আমার মনে কি প্রগাঢ় ছাপ এঁকে দিচ্ছে তা আপনি জানেন না।"

মাদাম রিশার বল্‌লেন: "আপনার সমবেদনা আজ আমার কাছে অমূল্য মনে হচ্ছে কেন জানেন মসিয়ে বাক্‌চি?—কারণ আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে এ বস্তুটির পরশ আমি বোধ হয় এমন ভাবে আর কখনও পাই নি।···যাক্···যা বল্‌ছিলাম।...

"পারিসে আমাদের বিবাহ হ'ল, কিন্তু অতি গোপনে। কারণ, শুন্‌লাম যে আমার পিতা পুলিশ লাগিয়েছেন আমাকে খুঁজে বাহির করার জন্যে।···

"বিবাহের অব্যবহিত পরেই আমরা সটান চ'লে গেলাম—রোমে। হায়···সেইখানে প্রথম আবার সুখস্বপ্ন ভাঙ্‌তে আরম্ভ হ'ল।···

"সেখানে মাসখানেক যেতে না যেতেই মসিয়ে রেনা প্রথমে সপ্তাহে একদিন, তারপর দুদিন তারপর তিনদিন তারপর প্রায়ই রাত ক'রে বাড়ী ফিরতে আরম্ভ কর্‌লেন। তাতেও আমি কিছু বল্‌তাম না, যদিও একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা আমার মনে জেগেছিল তিনি প্রথম দিন একটু মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফেরার পর থেকে। কিন্তু তবু আমি ভাব্‌তে চেষ্টা করতাম যে নিজের এ সামান্য অসংযম তিনি অবিলম্বে নিজেই বুঝতে পারবেন।

"কিন্তু ক্রমে তাঁর ফিরতে রাত-হওয়া ও মাতাল-হওয়ার মাত্রাও বেড়ে চল্‌ল। শেষে একদিন দুটি ভদ্রলোক তাঁকে ঘোর মাতাল অবস্থায় ধরাধরি ক'রে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলেন। সেদিন আমার মনের অবস্থা যে কি রকম হ'ল একবার অনুমান করবার চেষ্টা করুন মসিয়ে বাক্‌চি।··· যার জন্যে আমি পিতামাতা, অর্থ, সুনাম—সব ছেড়েছি ও যার ক্যাশবাক্স ভেঙে টাকা চুরি ক'রেছি···সে কি না··· থাক্; আমার দুঃখের কাহিনীর এখনই হ'য়েছে কি? এই ত সবে আরম্ভ···

"পরদিন তাঁর সঙ্গে প্রথম ঝগড়া কর্‌লাম। তার পর থেকে কিছুদিন তিনি আবার সংযমী হ'য়ে চল্‌লেন। কিন্তু তাঁর কোনও কাজ ছিল না ব'লে আবার একদিন দুদিন ক'রে রাত ক'রে ফিরতে আরম্ভ করলেন। শেষটা আমি লোক লাগিয়ে সন্ধান নিতে বাধ্য হ'লাম তিনি কোথায় যান। তাতে যা জান্‌তে পার্‌লাম তাতে মনটা আরও ভেঙে পড়ল। তিনি যেতেন রোমের একটা অতি নামজাদা ও ভয়ানক জুয়ার আড্ডায়। শুধু জুয়া নয়, সেটা ছিল একটা মর্ত্ত্যে নরক। কিন্তু এ আক্ষেপে এখন ফল কি?···

"আমার চোখ ফুট্‌ল যে পুরুষ নারীর মতন শুধু প্রেম নিয়ে ঘর করতে পারে না। তার কাজ চাই, উচ্চাশা চাই, দায়িত্ব চাই—তবে তার প্রেম সার্থক হয়। প্রেমের উদ্দাম অবস্থায় এসব কথা ভাবি নি। কিন্তু প্রেমের যিনি স্রষ্টা তিনি ত অন্ধ ভেবে অন্ধকে ক্ষমা করেন না। যা বপন ক'রেছিলাম তারই ফল ফল্‌তে আরম্ভ হ'ল।··· ক্রমে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম যে তাঁর প্রেম বদ্‌লে হ'য়ে আস্‌ছে।"

পল্লব বল্‌ল: "আমার মনে হয়, মাদাম রিশার, যে মসিয়ে রেনা কখনও আপনাকে ভালই বাসেন নি, নইলে কি কখনও তিনি আপনাকে টাকা চুরি করতে বাধ্য করতেন?"

মাদাম রিশার বল্‌লেন: "আমার বোধ হয় এক্ষেত্রে আপনি ভুল ভেবেছেন মসিয়ে বাক্‌চি। প্রথমে তিনি আমাকে সত্যই ভালবাস্‌তেন। কিন্তু বরাবর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন ক'রে আমার দরুণ তাঁর প্রেমে উদ্দাম ভাব যতখানি ছিল তার শতাংশের একাংশও গভীরতা জন্মায় নি। তাই বিবাহের পর নতুন প্রেমের নেশায় তাঁর পূর্ব্ব-জীবনের তৃষ্ণা দুচার দিনের জন্যে চাপা প'ড়ে গেলেও আবার তার কবলে তাঁর না প'ড়েই উপায় ছিল না। কয়দিনের কদভ্যাসে তাঁর চরিত্রের সৎসঙ্কল্পগুলির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু তাই ব'লে একথা বল্‌লে তাঁর ওপর সুবিচার করা হবে না যে সৎসঙ্কল্প তাঁর মনে কখনও হ'ত না বা প্রেম তাঁর মনে কখনও উদয় হয় নি।"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু মাদাম রিশার, যে প্রেম প্রেমাস্পদকে হীন করে সে প্রেম যে সত্য প্রেম একথা বিশ্বাস করা কি একটু শক্ত নয়?"

মাদাম রিশার একটি ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন: "হায় মসিয়ে বাক্‌চি, সে রকম প্রেম আপনি কটা দেখাতে পারেন বলুন ত, যে প্রেম প্রেমের চরিতার্থতা ছেড়ে প্রেমাস্পদের স্থায়ী সত্য কল্যাণ খুঁজে বেড়ায়? স্বীকার করি যে আদর্শ জগতে এই রকম প্রেমই সব চেয়ে বড়।··· আমার ভাইও এই রকম ধরণের গল্প ও থিওরি আমাকে

শোনাত।—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বাস্তব জগতে কি এ-রকম আদর্শ প্রেম কখনও দেখে? কখনও দেখেছেন কি? একথা নিয়ে কটা লোক মাথা ঘামাবার শক্তি ধরে বলুন ত?"

পল্লব বলল: "মোহের ক্ষেত্রে হয়ত লোকে ঘামায় না, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রেও কি তাই?"

মাদাম রিশার বললেন: "হায়, মসিয়ে বাকৃচি, যখন মানুষ মোহে পড়ে তখন কি তার বোঝবার অবস্থা থাকে সেটা প্রেম না মোহ? আপনি কাগজের গোলাপ দেখেছেন কি? দূর থেকে কি বোঝা যায় যে সেটা নকল গোলাপ? প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। তার কষ্টিপাথর তার সৌরভে ও স্নিগ্ধত্বে; কিন্তু সে-বিচার মানুষ তখনই-তখনই করতে পারে না; পারে—পরে, সময়ের অতিপাতে। অনুরাগের প্রথম অবস্থায় কোন্‌টা প্রেম ও কোন্‌টা মোহ কেউই সাহস করে বলতে পারে না। যাক্—আবার কথার কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে। এবার আমার কাহিনী শেষ করবার সময় এসেছে। বাকিটুকু সবিস্তারে বলার বিশেষ দরকার দেখি না—সে এক নিছক করুণ গাথা। তবু আপনি জানতে চেয়েছেন ব'লে সংক্ষেপে ছত্রিশটে ঘটনা মাত্র বলি, যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে এ বাস্তব জগতেও মানুষ কি ভাবে দুঃখের পর দুঃখ পেতে পারে।" ব'লে রুমালে কপালের ঘাম মুছে আবার বলতে আরম্ভ করলেন: "আমার স্বামী ত আবার পুরো দমে জুয়া খেলা সুরু করলেন। কারণ আমাদের বিবাহের মাস তিনেকের মধ্যেই জুয়া খেলা সম্বন্ধে চক্ষুলজ্জাটা তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছিল। আমি দেখলাম যে তিনি যে রেটে জুয়ায় টাকা ওড়াচ্ছেন তাতে আর মাসখানেকের মধ্যেই আমাদের সামান্য পুঁজি নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। ইতিমধ্যেই তিনি প্রায় ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক জুয়াতে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বোর্দোতে ফিরে যেতে অনুরোধ করলাম ও বললাম যে আমি আমার পিতার পায়ে ধ'রে মার্জনা চেয়ে নেব যদি তিনি জুয়া খেলা ছাড়েন। তিনি বিরস বদনে বললেন যে তা অসম্ভব, আমার পিতার তিনি মুখ দর্শন করতে পারেন না। এমন সময়ে আমার মার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম যে বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি একটা হাঁসপাতালে দান ক'রে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গেছেন। মা আরও লিখেছিলেন যে পিতার সন্ন্যাস রোগে মারা যাবার কারণও আমি। একদিন মা বাবার কাছে আমার হ'য়ে কি-একটা কথা বলবামাত্র তিনি এত উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন যে মাথার রক্তকোষটা ছিঁড়ে যায়। সে আঘাত তিনি সামলাতে না পেরে তিন দিনে মারা যান। মা সে চিঠিতে আমাকেই আমাদের সুখময় পরিবারের অভিসম্পাত ব'লে ভর্ৎসনা করেছিলেন।"

বলতে বলতে ব্যথা-অভিমানে মাদাম রিশার চুপ করলেন। পল্লবও কিছু বলবার খুঁজে পেল না। একটু পরে তিনি আবার ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন:

"পিতার মৃত্যুসংবাদে আমার মনের অবস্থা বর্ণনা ক'রে আর আমার কাহিনী দীর্ঘতর ক'রে তুলব না মসিয়ে বাকৃচি। কেবল একটা কথা বলব যেটা একটু ভেবে দেখলে হয়ত আমার তখনকার মনকষ্টের খানিকটা পরিমাপ করতে পারবেন। ভাবুন দেখি যে এ অদৃষ্টের কি পরিহাস যাতে পিতার পক্ষে কন্যাকে অভিশাপ দিতে যাওয়া তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'তে পারে! আমি যে তার পরে কত রাত স্বপ্নে পিতাকে অভিশাপ দিতে শুনেছি তা কি বলব!···যাক্···

"বিপদ একা আসে না ব'লে একটা কথা আছে না মসিয়ে বাকৃচি? এ গভীর উক্তিটির প্রমাণ বা সত্যতা সম্বন্ধে যদি কখনও আপনার মনে সংশয় আসে তবে শুধু আমার জীবনীটা একবার স্মরণ করবেন। পিতার মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যেই মা ধনুষ্টঙ্কারে মারা যান। শুধু তাই নয়, আমার স্বামী আমি পিতার সম্পত্তিচ্যুত হ'য়েছি শুনে একেবারে অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠলেন। তিনি তখন থেকে আমার সঙ্গে যে কুৎসিত ব্যবহার আরম্ভ করলেন তা স্মরণ করলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। সে সব কথা আমি আপনার কাছেও উচ্চারণ ক'রতে পারব না। কেবল দু একটা কথা বলি।···

"বিবাহের পর ছয় সাত মাসের মধ্যেই আমার সমস্ত নগদ টাকা যখন জুয়া ও মদে নিঃশেষ হ'য়ে গেল তখন আমার স্বামী একদিন লুকিয়ে আমার মুক্তা ও হারকের অলঙ্কারের অর্দ্ধেক চুরি করলেন ও মাসের পর মাস সে সবগুলি এক একখানা ক'রে বিক্রয় ক'রে জুয়ার অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন।"

পল্লব স্তম্ভিত হ'য়ে বলল: "মানুষ এত নীচেও নামতে পারে?"

মাদাম রিশার বললেন: "মসিয়ে বাকৃচি, মানুষ যখন

একবার পড়তে সুরু করে তখন পর্ব্বতশিখরের পাথরের মতন তলা পর্য্যন্ত না নেমে আর থামে না। যাক্, শুনে যান, এখনও ঢের আছে।" ব'লে একটু সহজ সুরে বলতে চেষ্টা করলেন—যদিও কৃতকার্য্য হ'লেন না, আবেগে তাঁর স্বর কাঁপতে লাগল—"তবুও আমি কোন মতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কারণ আমার শত দুঃখের মধ্যে একটি ক্ষীণ আশার শিখা তখনও নেভেনি যে আমার স্বামী জুয়াসক্ত মাতাল হ'লেও মনে মনে আমায় ভালবাসতেন। কিন্তু আমি ভেঙে পড়লাম যখন একদিন হঠাৎ একটা ক্যাসিনোতে এক অতি সাধারণ গণিকার সঙ্গে তাঁকে উন্মত্তবৎ নাচতে দেখলাম।···সেদিন রাতে আমি তাঁকে প্রথম তিরস্কার করলাম লম্পট ব'লে। তাতে তিনি কি উত্তর দিলেন জানেন?"···বলতে বলতে অলক্ষিতে দুফোঁটা অশ্রু গণ্ডদেশ বেয়ে তাঁর কোলে পড়ল।

"তিনি বললেন যে যে কন্যা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি সংযম করতে না পেরে গৃহত্যাগ ক'রে পিতামাতার মৃত্যুর কারণ হয় সে আবার অপরকে লম্পট বলে কি হিসেবে?"

ব'লে তিনি টেবিলের উপর মাথা রেখে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

ভালবাসার জন্য কষ্ট পাওয়ার কথা পল্লব এ যাবৎ শুনে ও প'ড়েই এসেছিল। এভাবে কখনও প্রত্যক্ষ করে নি। মাদাম রিশারের গভীর বেদনার প্রতি কথা যেন তার চোখের সামনে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে উঠছিল।···সে কথা কইল না। তার মনে হ'ল এ-সময়ে গভীর সহানুভূতির কথাও কেমন যেন বিদ্রূপের মতন শোনাবে। সে শুধু মাদাম রিশারের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। সঙ্গে সঙ্গে তার মন একটা অপূর্ব্ব পুলক গৌরবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল যে সে আজ কোথা হ'তে কোথায় এসে প'ড়েছে বিধাতার দূত হ'য়ে—এই ব্যথাতুর নারীকে একটু সান্ত্বনা দিতে।···

এম্‌নি নিস্তব্ধতায় অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর মাদাম রিশার মুখ তুলে বললেন: "আরও কি কিছু শুনতে চান?"

পল্লব সঙ্কুচিত হ'য়ে বলল: "না, কাজ নেই মাদাম রিশার। অনর্থক দুঃখ কাহিনী স্মরণ করিয়ে আপনাকে আর ব্যথা দিতে চাই না।"

মাদাম রিশার ঘাড় নেড়ে বললেন: "না, তবু বাকীটুকু শুনুন। দুঃখের পিয়ালা যখন উপ্‌চে পড়ে তখনও যে বিধাতা কি অজ্ঞাত উপায়ে তাতে ধারাসারে দুঃখ ঢেলে দিয়ে থাকেন সে সম্বন্ধে আরও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন।···আমার মনে হয় মসিয়ে বাকুচি, যে বিধাতা খুঁজে খুঁজে সেই-সব লোককে বড় চমৎকার আবিষ্কার করতে জানেন দুঃখ বোধ করবার ও বহন করবার শক্তি যাদের অফুরন্ত। কেন না মসিয়ে রেনা—যাঁর জন্যে আমার আজ এ দশা—তাঁকে নিয়ে ত কই বিধাতা বিশেষ কিছু নাড়াচাড়া করেন নি! তিনি আজও প্যারিসে তাঁর পিতার অগাধ সম্পত্তি পূর্ব্ববৎ জুয়ায় উড়াচ্ছেন।"

ব'লে একটু থেমে বললেন: "যাক্। বাকিটুকু তাড়াতাড়ি সেরে নিই—মসিয়ে রিশারের ফিরে আসবার সময় হ'ল।···

"ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত কথাবার্ত্তার দুদিন পরেই আমার স্বামী মদ্যপানে চোখ লাল ক'রে আমাকে এসে বললেন যে আমি আমার বাকী গহনাগুলি কোথায় লুকিয়ে রেখেছি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি চুপ ক'রে রইলাম। বিতৃষ্ণায় আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে গিয়েছিল। এই লোকের জন্য আমি সব ছেড়েছিলাম!···আমার স্বামী আমাকে নিরুত্তর দেখে বললেন: 'গহনা দাও, টাকা চাই।'

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'কেন?' তিনি হেসে জড়িত-কণ্ঠে বললেন যে তাঁর বান্ধবী গারট্রুডকে ক্যাসিনোতে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে যেতে তিনি প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন। ব'লে খিল্ খিল্ ক'রে হাসতে লাগলেন যেন কি এক অপূর্ব্ব রসিকতাই না ক'রেছেন।

"আমি কোনও কথা না ব'লে নীচের ড্রয়িংরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে কৌচে শুয়ে পড়লাম। আমার মাথা ঘুরছিল। তিনি বার কয়েক দরজায় আঘাত ক'রে বললেন: 'গহনা দাও, টাকা চাই।' আমি উত্তর দিলাম না। তিনি ভীষণ রেগে একটু বেশি ধাক্কাধাক্কি করতেই সে হোটেলটির লোকজন এসে তাঁকে জোর ক'রে উপরে নিয়ে গিয়ে আমাদের শয়নকক্ষে শুইয়ে দিল। তিনি বন্দী অবস্থায় উপরে যেতে যেতেই চেঁচিয়ে বললেন:

'আচ্ছা এর প্রতিফল পাবে'—যেন এ কেলেঙ্কারির জন্যও দায়ী আমি।

"সেদিন রাত্রে আমি কিছু খেলাম না ও শয়ন কক্ষেও গেলাম না। সারারাত্রি ড্রয়িংরুমেই কাটিয়ে দিলাম। রাত্রে আমার স্বামীর সঙ্গে একলা দেখা করতেও আমার সমস্ত চিত্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল।...বছর না ঘুরতেই কি উদ্দাম প্রেমের কি পরিণাম!...

"পরদিন সকালে হোটেলের একজন পরিচারিকা এসে আমায় বল্‌ল যে আমার ঘরের আলমারিটি কে ভেঙে গেছে, আমার স্বামীর দেখা নেই, কেবল বিছানার উপর আমার নামে একখানি চিঠি প'ড়ে ছিল।

চিঠিটিতে লেখা ছিল:—'লিদিয়া, আমি তোমাকে আর ভালবাসি না। গারট্রুডের সঙ্গে চিনিস চল্‌লাম। হাতে টাকা না থাকায় আলমারি ভেঙে তোমার গহনার বাক্সটি থেকে তোমার হীরার নেকলেস ও অলঙ্কারগুলি নিয়ে যেতে হ'ল। ক্ষমা কোরো।—তোমার জুল্‌"

পল্লব চিত্রার্পিতের মতন ব'সে রইল। তার মনে হ'ল একটা ইংরাজী প্রবচন যে সত্য অনেক সময়ে কল্পনার চেয়েও আশ্চর্য্য হ'য়ে ওঠে। প্রবচনটি একদিন সে অবিশ্বাস ক'রে মোহনলালের সঙ্গে তর্ক ক'রেছিল।

পল্লবের কাছ থেকে মাদাম রিশার একটা উত্তর আশা করছিলেন ব'লেই হোক্ কি অন্য কোনও কারণেই হোক্ খানিকটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু পল্লব কোনও উচ্চবাচ্য না করাতে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলেন:—

"আমার তখন শরীরের অবস্থা, খুবই দুর্ব্বল।...কারণ ইভেতের জন্ম প্রায় আসন্ন। তবু আমাকে জীবন ধারণের জন্যে কাজ নিতে হ'ল। কারণ আমার শেষ অলঙ্কারটিও আমার স্বামী বাক্স ভেঙে নিয়ে পালিয়েছেন ব'লে আমার গহনা বিক্রয় ক'রে দিন কাটাবার উপায়ও বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।"

পল্লবের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল; সে অস্ফুটস্বরে বল্‌ল: "উঃ, কি অবস্থা!"

মাদাম রিশার ম্লান হেসে বল্‌লেন: "এখনও শেষ হয় নি মসিয়ে বাকি, চম্‌কে উঠ্‌ছেন কি?—আরও আছে।...ভয় নেই, দারিদ্র্যের সে খুঁটিনাটি কষ্ট ও তার উপর অসৎ লোকের বক্র কটাক্ষের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাসে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি কর্‌ব না। কথায় কথায় শুধু কথা বেড়ে যাবে। তবু শেষটা শুনুন—এত যখন শুনেছেন তখন আরও দুএকটা কথা নিশ্চয়ই শুনতে পার্‌বেন।

"তখন আমি আসন্নপ্রসবা। অথচ ভদ্রলোকের হাঁসপাতালে যাবার টাকা হাতে ছিল না। শুধু তাই নয়, জগতে এমন কেউ আমার ছিল না যে আমায় কিছু টাকা ধার দেয়। শেষটায় আমাকে বাধ্য হয়ে নেপ্‌ল্‌সে একটা শ্রমজীবীদের সামান্য অপরিচ্ছন্ন হাঁসপাতালে আশ্রয় নিতে হল। সেখানেই ইভেতের জন্ম হয়। ...তারপর শরীর একটু সারতে না সারতেই সদ্যোজাত শিশুটিকে বুকে ক'রে নিজের বিবাহের যা কিছু দামী বস্ত্রাদি ছিল বিক্রয় ক'রে কোনও মতে তৃতীয় শ্রেণীতে পারিসে এলাম। সেখানে চার পাঁচটা বারগায় গভর্ণেসের (governess) চাকরি পাবার সম্ভাবনা হ'ল, কিন্তু সুপারিশ পত্র দেয় কে? তার ওপর যদি বা দুএকজন ভদ্রলোক বিনা সুপারিশেই দয়াপরবশ হ'য়ে আমাকে রাখতে রাজি হ'লেন কিন্তু তাঁদের পরিবারের সকলে আমার চরিত্র সংক্রান্ত আপত্তি জানাল আমার বুকে সন্দেহজনক শিশুকন্যা দেখে। ...তারপর আরও ঢের আছে মসিয়ে বাকি, কিন্তু সে সব বল্‌বার আর সময় নেই। ...শুধু এইটুকু ব'লে রাখি যে শেষটায় আমাকে হোটেলে কাজ নিতে হ'ল।" ...ব'লে তিনি হঠাৎ একবার অল্প কেঁপে উঠ্‌লেন, যেন সে চিন্তায়ও তাঁর মনে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। ...পরে আবার আত্মসংবরণ ক'রে বলতে লাগলেন:

"কিন্তু দুর্ভাগ্য সেখানেও আমার পিছু নিল। কারণ যদি বা উপায় ভাবে অবশেষে হীন কাজ নিয়ে দুবেলা দুমুঠো অন্নসংস্থানের যোগাড় হ'ল ত আর এক বিপদ আমাকে আবার নিরাশ্রয় করল। ...হোটেলের পর হোটেলের কর্ত্তাগুলি আমার কাছে অযথা প্রস্তাব আরম্ভ করলেন। শেষে নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হ'য়ে একদিন সীন নদীর তীরে ম্লান গোধূলিতে আত্মহত্যা করব ঠিক করলাম। ...কিন্তু ইভেতের প্রতি মমতা আমার সে শান্তিরও অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াল। ...মনে আছে সেইদিন আমি প্রথম ভগবান্‌কে সত্যি ডেকেছিলাম। প্রায় দুঘণ্টা অনর্গল অশ্রুর সঙ্গে হৃদয়ের আকুল কামনা জানিয়েছিলাম যে ইভেতকে

যখন তিনি দিয়েছেন তখন অন্ততঃ তার জন্যও আমার বাঁচবার উপায় একটা যেন তিনি ক'রে দেন।"

বলতে বলতে মাদাম রিশারের অঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি থর থর ক'রে কেঁপে উঠ্‌লেন। এবং এবার চেষ্টাসত্ত্বেও সে কম্পন তিনি তৎক্ষণাৎ রোধ করতে পারলেন না। পল্লব কি করবে ঠিক্ ভেবে না পেয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বল্‌ল: "আজ আর এসব কথা থাকুক মাদাম রিশার। আপনার শরীর হয়ত একটা উত্তেজনায় অসুস্থ হ'য়ে পড়বে।" কিন্তু তার কথা শেষ হ'তে না হ'তে মাদাম রিশার জোর ক'রে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে আবার পূর্ব্ববৎ ম্লান সুরে বলতে লাগলেন: "ও কিছু নয় মসিয়ে বাকৃচি ব্যস্ত হবেন না। ওরকম আমার মাঝে মাঝে হয়। তাছাড়া আর বেশি বল্‌বারও কিছু নেই। তাই শেষটুকু শুনে নিন। নইলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।···

"ঠিক্ সেই সময়ে একটি ভদ্রলোক সেই জনবিরল গাছতলা দিয়ে সান্ধ্যভ্রমণ করতে যাচ্ছিলেন। আমার বাহ্যজ্ঞান প্রায় ছিল না। হঠাৎ আমার কাঁধে তাঁর মৃদুল স্পর্শে আমার চেতনা হ'ল। তিনিই মসিয়ে রিশার।"

ব'লে একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন:—"মসিয়ে রিশার পারিসে একটি স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। আমাকে তিনি সেই স্কুলে একটি টাইপিষ্টের কাজ দেন।···পরে... পরে···কি আর বল্‌ব···সবই অনুমান ক'রে নিতে পারবেন বোধ হয়···মাস ছয়ের মধ্যে আমরা পরস্পরের প্রেমমুগ্ধ হই।

"এবার আমার দুঃখ একরকম শেষ হ'ল বটে কিন্তু সে দুঃখ ভর করল মসিয়ে রিশারের কাঁধের ওপর। আমার প্রেমে প'ড়ে মসিয়ে রিশার ক্রমে ক্রমে শুধু যে তাঁর পারিসের বন্ধুবান্ধবদের ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ন তাই নয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দেখে তাঁর জবাবদিহি চায়। বাধ্য হ'য়ে তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে আমায় নিয়ে Lyonতে একটি স্কুলে চাকুরি নেন। সেখানে আমাকে তাঁর স্ত্রী ব'লে পরিচয় দেন। কিছুদিন সেখানে আমাদের সুখেই কেটেছিল।···কিন্তু আমি কর্ত্তব্যবোধে মসিয়ে রিশারের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর চার-পাঁচজন বন্ধুকে আমার সত্য পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কি সৌভাগ্যক্রমে জানি না তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নির্ম্মলা সমাজহিতৈষী। তিনি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে একটি বেনামী চিঠি লেখেন। ফলে মসিয়ে রিশারের সে চাকুরিও যায়।···"

বলে একটু করুণ হেসে বল্‌লেন:

"এবার মসিয়ে রিশারের ভাবনা সুরু হ'ল। বোধ হয় এটা সঙ্গ গুণে। এক একজনকে বিধাতা সৃষ্টি করেন না শুধু অপরকে তাদের জন্যে কষ্ট দিতে? আমি বোধ হয় সেই শ্রেণীর সৃষ্টি মসিয়ে বাকৃচি। তাই আমার জন্য পিতা—মাতা মসিয়ে বেনা মসিয়ে রিশার সকলের কষ্ট না পেয়েই বোধহয় উপায় ছিল না।···যাক্। মসিয়ে রিশার আমাকে নিয়ে লুলোনে আসেন;—সেখানে একটি স্কুলে ইংরাজী পড়াবার কাজ পান। অনেক চেষ্টার পর তিনি এ সামান্য চাকরিটি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই সমাজহিতৈষী বন্ধুটির হিতৈষণার ফলে সেখানেও একটি বেনামী চিঠি আমাদের আবার নিরাশ্রয় করে।···

"মসিয়ে রিশারের হাতে অল্প স্বল্প যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল ইতিমধ্যে আমাদের জন্য খরচ হয়ে যায়। কাজেই তিনি লুলোনে মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়ে পড়লেন। নানা চাকুরির চেষ্টার পর শেষে কোনও মতে চার পাঁচটি ছেলেকে বাড়ী গিয়ে পড়িয়ে জীবিকা উপার্জ্জন করবার প্রয়াস পান। কিন্তু তাতে ত আর একটা পরিবারের ভরণপোষণ চলে না। অবশেষে বাধ্য হ'য়ে তাঁকে ইংলণ্ডে আসতে হয় তাঁর দু'চারটি মূল্যবান্ জিনিষপত্র বিক্রয় ক'রে।

"অবশেষে এখানে ত আশ্রয় পেয়েছি মসিয়ে বাকৃচি, কিন্তু কবে যে সে সমাজহিতৈষীর চিঠি আমাদের নিরাশ্রয় করে সমাজের হিতসাধন করবে জানি না। বোধহয় তিনি এখনও খোঁজ পান নি আমরা কোথায় ব'সে দুর্নীতির নীড় বাঁধছি ও সমাজের নীচে সুড়ঙ্গ কেটে তার ধ্বংসসাধন করবার চেষ্টা পাচ্ছি।..এখানে আমরা চার বৎসর আছি।"

খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে এক কম্প্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।···ঘণ্টাখানেক ধ'রে বাইরের চঞ্চলমতি আকাশে শুভ্র রৌদ্রালোক কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল ও তার স্থলে সেখানে রাশি রাশি কালো মেঘ জমছিল; মাঝে মাঝে দমকা আর্দ্র বায়ু জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশও করছিল। কিন্তু এতক্ষণ কারুরই এদিকে লক্ষ্য ছিল না। মাদাম রিশারের কাহিনী সমাপ্ত হ'লে পল্লব হঠাৎ লক্ষ্য করল যে স্তূপীকৃত ধূসরকালো মেঘের জমাট

বাঁধার ষড়যন্ত্রে বিলাতের একেই-কৃপণ আলোর দাক্ষিণ্যের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে। ঘরটা এত অন্ধকার হ'য়ে উঠেছিল যে মাদাম রিশারের মুখখানির একান্ত শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই ভাল দেখা যাচ্ছিল না।...হঠাৎ তিনি ঘরের মধ্যে বাইরের বিরল বাদ্‌লার ছায়াপাত লক্ষ্য ক'রে কোনও কথা না ব'লে হাতের কাছে ঘরের মধ্যে একটি সবুজ ঝাড়ের বিজুলি বাতি জেলে দিলেন।...সে নীল-হরিৎ আলোক-সম্পাতে তাঁর মুখখানি পল্লবের চোখে এক অপূর্ব্ব বিষাদমাখা ও করুণাভরা রঙে রঙিয়ে উঠ্‌ল।...সে কিছু না ব'লে আবার তাঁর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল।—বাইরের কালো মেঘ হঠাৎ বর্ষণ সুরু ক'রে দিল। পল্লবের কাণে সে বর্ষণ যেন এক কোন্ লুপ্ত বেদনোচ্ছ্বাসের স্মৃতি বহন ক'রে আন্‌ল। তার মনের অন্তস্তলে একটা গানের একটা চরণ তার ম্লানিমার পক্ষ-বিস্তার ক'রে গুণ্‌গুণিয়ে উঠ্‌ল—'জীবনের সন্ধিপথে খুঁজে পথ হবে নিতে কেউ জানে না কোথায় যাবি কেউ দিবে না ব'লে।' সে অন্যমনস্ক ভাবে অনেকক্ষণ মনে মনে এই চরণ দুটি গুণ গুণ করে গাইতে লাগ্‌ল। তার পর হঠাৎ তার চমক ভাঙ্‌ল—মাদাম রিশারের একটি দীর্ঘশ্বাসে। সে ব'লে উঠ্‌ল :

"আজ আমার একটা শিক্ষা আবার নতুন ক'রে হ'ল মাদাম রিশার। সেটা এই যে মানুষকে তার বাইরেটা দেখে বিচার করতে গিয়ে আমরা অনেক সময়ে তার উপর গভীর অবিচার ক'রে বসি।...মসিয়ে রিশারের সদা-প্রফুল্লতা ও রসিকতাপ্রিয়তা দেখ্‌লে কে বল্‌বে যে ভালবাসার জন্যে তিনি এত কষ্ট সহ্য করবার শক্তি ধরেন!"

মাদাম রিশারের ঠোঁট দুখানি হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌ল। কিন্তু তিনি তখনি দন্তে ওষ্ঠাধর চেপে আবেগ দমন ক'রে প্রায় অস্ফুটস্বরে বল্‌লেন : "সত্যি কথা মসিয়ে রাকৃচি। পুরুষের প্রেমে আমি বিশ্বাস হারিয়ে ব'সেছিলাম। মসিয়ে রিশার সে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর হীরে-দিয়ে-গড়া হৃদয়টি সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় কথা অন্ততঃ আমি ত বল্‌তে জানি না। নইলে ভগবান্ আমার সেদিনকার ডাক শুনে যদি মসিয়ে রিশারকে না পাঠিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ মানব-প্রেমিককেও পাঠিয়ে দিতেন বোধ হয় তাহ'লেও আমার দুঃখ এবারে দূর হ'ত না।...পথের একজন ভিখারিণী—যাকে আইনানুসারে নিজের বলে দাবী করবারও কোনও উপায় নেই—তার জন্যে তিনি স্বদেশ, স্বজন, বন্ধুবান্ধব কি না ছেড়ে এখানে সামান্য মাষ্টারি করতে এসে প'ড়ে আছেন বলুন ত?...বোধহয় ভগবান্ আমায় দেখিয়ে দিলেন যে যে ত্যাগের অহঙ্কার আমি অনুক্ষণ করতাম তার চেয়েও বড় ত্যাগ পুরুষ করতে পারে।...কে জানে?..."

ব'লে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি চুপ করলেন।

পল্লব বল্‌ল : "আচ্ছা, আপনি আপনার পূর্ব্ব স্বামীকে ডাইভোর্স ক'রে মসিয়ে রিশারকে বিবাহ করলেই ত সব গোল মিটে যায়?"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "হায়, সে যে সম্ভব নয়। তার জন্যে আমার স্বামীর অসচ্চরিত্রতার প্রমাণ চাই যে। সে প্রমাণ আমি কোথা থেকে যোগাড় করব মসিয়ে রাকৃচি?"

পল্লব বল্‌ল : "আর মসিয়ে রেনা? তিনি ত আপনাকে ডাইভোর্স করতে পারেন? তিনি তা করছেন না কেন? তাহ'লেও ত আপনার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান হয়?"

মাদাম রিশার ম্লান হেসে বল্‌লেন : "তা হয়। কিন্তু তিনি আমাকে ডাইভোর্স করতে চান না।"

পল্লব বল্‌ল : "কেন?"

মাদাম রিশার কি বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গেলেন, বল্‌লেন : "সে কথাটা নাই বা শুন্‌লেন মসিয়ে রাকৃচি। সে আর এক কাহিনী।"

পল্লব ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল : "না না কাজ নেই। এ আলোচনা আজ এখানেই চাপা দেওয়া যাক্। আসুন অন্য কথা পাড়া যাক্।" ব'লে সে চুপ ক'র্‌ল। কিন্তু ঘরের মধ্যকার হাওয়াটাও এমন ঘন হ'য়ে উঠেছিল যে কোনও সহজ প্রসঙ্গের অবতারণা করতে তার কেমন বাধ-বাধ ঠেক্‌তে লাগ্‌ল।...কারণ দুজনেরই মনে ঐ একই চিন্তা ঘোরাফেরা করছিল।...শেষটায় হঠাৎ পল্লব যেন বাধ্য হ'য়েই ব'লে বস্‌ল : "অন্য কথা আলোচনা এখন অসম্ভব। তাই যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই মাদাম রিশার। তবে যদি বাধা পান তাহ'লে—"

মাদাম রিশার বিষাদভরা সুরে বল্‌লেন : "জিজ্ঞাসা করুন না মসিয়ে রাকৃচি। বাধা?...এতক্ষণ শুনেও কি

আপনার বিশ্বাস হয় নি যে কথায় ব্যথা পাবার সময় আমার বহুদিন গত ?"

পল্লব বল্‌ল : "আমার জান্‌বার ইচ্ছে হচ্ছিল যে মসিয়ে রেনা এখন কোথায় ও কি করেন ?"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "তিনি এখন পারিসে। তাঁর পিতার মৃত্যুতে তাঁর হাতে এখন অগাধ সম্পত্তি। তাছাড়া জুয়াখেলায় তাঁর আর কোনও প্রতিবন্ধকই আজ নেই। কাজেই তিনি যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন।"

পল্লব বল্‌ল : "আচ্ছা—মাপ কর্‌বেন মাদাম রিশার, আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে ব'লেই আবার আপনার ব্যথার তারে ঘা দিচ্ছি—তিনি কি আজকাল তাঁর পাশবিক ব্যবহারের জন্য একটুও অনুতাপ বোধ করেন না ?"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "তাহ'লে আশ্চর্য্য খবরটা আজই বল্‌তে হ'ল—যদিও ভেবেছিলাম যে আজ আর এ-কথাটা আপনাকে বল্‌ব না। তিনি এখন কি চান জানেন ?—আমাকে। শুধু তাই নয় আমাকে ফিরে পাবার জন্য প্রায় পাগল হ'য়ে প'ড়েছেন।—এর চেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষ কিছু কল্পনা করতে পারেন কি ?"

পল্লব কথাটা ঠিক্ বিশ্বাস করতে পারল না, বল্‌ল : "সে কি !"

মাদাম রিশার একটু কঠিন হেসে বল্‌লেন : "বিশ্বাস না হবার কথা বটে অথচ বিশ্বাস না করবার পথ নেই। গত সপ্তাহেও তিনি আমাকে কাতর মিনতি জানিয়েছেন যে আমি যেন ইভেতকে নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে যাই। কারণ আমার অভাবে তাঁর আমোদ প্রমোদ, বিলাস, অর্থ, —কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।"

পল্লব জিজ্ঞাসা কর্‌ল : "আপনি···মাপ কর্‌বেন মাদাম রিশার···আপনি যে মসিয়ে রিশারের সঙ্গে একসঙ্গে আছেন সে কথা বুঝি আপনি তাঁকে জানান নি ?"

মাদাম রিশার একথায় একটু উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লেন : "আপনি কি এত কথায়ও আমার প্রকৃতিটির সম্বন্ধে কোনও সত্য পরিচয়ই পান নি মসিয়ে বাক্‌চি ? আমি পাতিব্রত্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করিনা বটে—যদিও একদিন কর্‌তাম—কিন্তু সত্যকথা বলায় করি। তা না কর্‌লে কি ইভেতের স্নেহও আমাকে সেদিন সীন নদীতে আত্মহত্যা করা থেকে রক্ষা করতে পার্‌ত মনে করেন ? সত্যে যদি আমি আস্থা হারিয়ে ব'সে থাক্‌তাম তাহ'লে আমার স্বামীর বন্ধুদের বা আপনাকে এ সমস্ত কথা খুলে বলার আমার কি দরকার ছিল শুনি ?—···শুনুন, আমি এখানে এসেই আমার স্বামীকে চিঠিতে সব কথা খুলে লিখি ও তাঁকে অনুরোধ করি যেন তিনি আমাকে অবিলম্বে ডাইভোর্স করেন, যেহেতু আমার হাতে তাঁকে ডাইভোর্স করার প্রমাণাভাব।"

পল্লব কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌ল : "আমায় মাপ করবেন মাদাম রিশার ! আমি অত শত ভেবে বলি নি।"

মাদাম রিশার সুর একটু নামিয়ে বল্‌লেন : "সেজন্য আপনার অতটা অনুতপ্ত হওয়ার দরকার নেই মসিয়ে বাক্‌চি। বরং আমারই আপনাকে এ সামান্য প্রশ্নের জন্যে এতটা তিরস্কার করা উচিত হয় নি, মাফ করবেন।··· যাক্, সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপারটা আপনাকে এখনও বলা হয় নি।"

পল্লব সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা কর্‌ল : "কি রকম ?"

মাদাম রিশার বল্‌লেন : "আমি অবশ্য ভেবেছিলাম যে আমার চিঠি পাবামাত্র তিনি আমাকে ডাইভোর্স করবেন —বিশেষতঃ যখন তাঁর হাতে অত টাকা। কারণ পারিসের কোন্ সুন্দরী এখন তাঁর আয়ত্তের মধ্যে নয় বলুন ?···এক্ষেত্রে আমার মতন তুচ্ছ কাঁটাকে কে না উপ্‌ড়ে ফেলে দিয়ে নিজের পথ ক'রে নিতে চায় বলুন ত ?"

ব'লে কি একটা কথা বল্‌তে গিয়ে আত্মসংবরণ ক'রে শুধু বল্‌লেন : "কিন্তু যা অভাবনীয় তাই অনেক সময়ে বাস্তব জীবনে ঘ'টে থাকে মসিয়ে বাক্‌চি—আর এমন ভাবে ঘ'টে থাকে যে তাকে অবিশ্বাস করার বা তার কারণ নির্দ্দেশ করারও কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না।····· আমার স্বামী আমার পত্রের উত্তরে কি লিখ্‌লেন জানেন ?"

পল্লব রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল : "কি ?"

মাদাম রিশার কোনও কথা না ব'লে কাছের একটা ডেস্ক থেকে একটা মলিন, অনাদৃত পত্র বাহির ক'রে তার হাতে দিলেন।

পল্লব পড়্‌ল :—

"প্রিয়তমা দিদিরা,

তোমার চিঠি পেয়ে অবধি আমার জীবন বিষময় হ'য়ে উঠেছে। সব কথা পত্রে লেখ্‌বার নয়। দেখা হ'লে বল্‌ব। লেখা আমার ভাল আসেও না। আমার কাতর মিনতি

যে তুমি আমায় আর একবার বিশ্বাস কর ও ভালবাসতে চেষ্টা কর—যেমন একদিন বাসতে। কারণ বিশ্বাস কর আমি জীবনে একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছিলাম। অন্য সকলের প্রতি সব আকর্ষণই আমার সাময়িক মোহমাত্র ছিল। সে সব ছিল মাত্র আলেয়ার আলো।—কেবল তোমার প্রেমই আমার এ অভিশপ্ত জীবনে কেবল একবার ভাদ্রের তারারূপে জ্বলেছিল।···তুমি ফিরে এসো। আমার কাতর অনুরোধ রক্ষা কর। আমি কুসঙ্গ, সুরা, মদ সব ছাড়ব যদি তোমাকে আবার ফিরে পাই। তুমি যাই ক'রে থাক না কেন, তুমি একান্ত আমারই—সেনাত আমি চাই না।

তোমার হতভাগা স্বামী

ভুল।"

পল্লবের মুখে বাক্য সরল না।···এ-ও কি সম্ভব?··· কিম্বা এ প্রকৃতির শোধবোধের পালা! সে মাদাম রিশারের মুখের পানে চেয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করল: "আপনার এসব কথা বিশ্বাস হয়?"

মাদাম রেনা স্থির স্বরে বললেন; "হয়। হেতু ত এইমাত্র ব'লেছি। অর্থাৎ উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাকে ভাল না বাসলে এরকম চিঠি লেখার তাঁর অন্য কোনও উদ্দেশ্যই থাকতে পারত না। নয় কি?"

পল্লব চিন্তিত সুরে বলল: "আমার পক্ষে অবশ্য এক্ষেত্রে জোর ক'রে কিছু বলা শোভা পায় না। কারণ এ বিষয়ে আপনিই সব চেয়ে ভাল বুঝবেন।···তবে আমার ত মনে হয় যে এ চিঠিটার মধ্যে আর যাই থাকুক কপটতা নেই।"

মাদাম রেনা শান্ত স্বরে বললেন: "এক্ষেত্রে আপনার ভুল হয় নি মসিয়ে বাকচি। আমার মনের সহজ অনুভূতিও আমাকে বলছে যে আমার স্বামীর আমার প্রতি সেই বিবাহের আগেকার তীব্র ভালবাসা আবার জেগে উঠেছে।—যদিও···যদিও···হয় ত ফিরে গেলেই তাঁর এ উদ্দীপ্ত প্রেম আবার আগেকার মতনই নিভে যাবে।"

পল্লব বলল: "তার মানে?"

মাদাম রিশার বললেন: "আমাদের মধ্যে একটা কথা বলে জানেন কি মসিয়ে বাকচি যে স্ত্রীকে ভালবাসতে হ'লে প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তাকে পরস্ত্রী ভাবা? যখন স্কুলে পড়তাম তখন কথাটা শুনে খুব হাসতাম মনে আছে। কিন্তু সংসারে হাসির কথার মধ্যেও অনেক সময়ে সব চেয়ে গভীর সত্য নিহিত থাকতে পারে।" ব'লে তিনি একটু বাঙ্গের হাসি হাসলেন।

পল্লবের একথাটা ভাল লাগল না। সে কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল: "ঠাট্টা যেতে দিন—জিজ্ঞাসা করি—"

মাদাম রিশার তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হ'য়ে বললেন: "আমি ঠাট্টা করি নি মসিয়ে বাকচি। আমরা ফরাসী জাতি—অনেক সময়ে গভীর বেদনা প্রকাশ করবার সময়েও হেসে থাকি। তবে যদি গম্ভীর মুখে কথা না শুনলে সে-কথা বিশ্বাস না করেন তাহ'লে শুনুন আমি না হেসেই বলছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমি এখন আমার পূর্ব্ব স্বামীর কাছে পরস্ত্রীর সামিল হয়ে উঠেছি ব'লেই তাঁর সে পূর্ব্ব প্রেম আবার জেগে উঠেছে,—অর্থাৎ যে-প্রেম বিবাহের আগে তাঁর আমার উপর ছিল।"

পল্লব একথাটাও ঠিক পরিপাক করতে না পেরে পূর্ব্ববৎ ক্ষুব্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করল: "মাপ করবেন মাদাম রেনা। আপনার শেষ কথাগুলির ধরণ আমার কাণে যেন কেমন বিসদৃশ ঠেকল। কারণ···আপনার অনুতপ্ত স্বামীর প্রতি—না মাফ করবেন আমি অনধিকার চর্চ্চা করতে উদ্যত হচ্ছিলাম।" ব'লে সে থেমে গেল।

মাদাম রিশার তৎক্ষণাৎ বললেন: "না, না মসিয়ে বাকচি,—আপনাকে বলতেই হবে। বলুন কি বলছিলেন।··· বলবেন না? এ আমার অনুরোধ—আমি কথা দিচ্ছি আমি কিছু মনে করব না।···তবু বলবেন না?···বললে একটুও রাগ করব না, বিশ্বাস করুন—বরং খুসি হব। সত্যি বলছি।"

পল্লব ভরসা পেয়ে এবার বলল: "আমি শুধু এই কথাটি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম যে অনুতাপে মানুষের দোষক্রটির কি প্রায়শ্চিত্ত হয় না? যদি হয় তবে পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম অনুসারে স্ত্রীর কি অনুতপ্ত স্বামীর প্রতি একটা কর্ত্তব্য নেই?"

মাদাম রিশার বললেন: "আপনার প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার বিশেষ দরকার দেখি না মসিয়ে বাকচি, যেহেতু তার সঙ্গে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই ব'লেই আমার মনে হয়। কারণ অনুতাপে দোষ পাপ কাটে কি না কাটে সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার—সেটা সমাজের

বিচার্য্য নয়। কারণ খুন করে হাজার অনুতাপ করলেও মরা মানুষ বাঁচে না, বা একটা হৃদয় ভেঙে দিলে শত কোমল কথায়ও তা জোড়া লাগে না। অর্থাৎ এক কথায় অনুতাপের ফলাফলটা সমাজের এলাকার মধ্যে পড়ে না—পড়ে বিধাতার এলাকার মধ্যে। কেননা সমাজের প্রধান কাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে বিধিব্যবস্থার শৃঙ্খলা ও আনুকূল্য করা। অতএব অনুতাপে প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন ছেড়েই দেওয়া যাক্। ওটা অবান্তর প্রশ্ন।

"তবে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আমি দিতে চাই ও খুব জোর ক'রেই দিতে চাই। সেটা হচ্ছে এই, স্বামী ও স্ত্রীর কর্ত্তব্য কখনও একতরফা হ'তেই পারে না। এই কথাটা আমি অতি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছি বটে, কিন্তু করেছি দেহখানির সমস্ত রক্ত দিয়ে। একটু আগেই আমি বল্‌ছিলাম না যে পাতিব্রত্য যে একটা ধর্ম্ম তা-ই আমি মানি না? অর্থাৎ পতি যে রকমই হোন্ না কেন স্ত্রীর তার শত অপরাধ ক্ষমা করা উচিত এ কথা আমি মানি না।"

পল্লব বল্‌ল: "কিন্তু···"

মাদাম রিশার উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠলেন: "একটু থামুন আমার কথাটা শেষ হয় নি। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হ'তে পারত যদি সেটা কর্ত্তব্য বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু আমার মনে হয় কর্ত্তব্য কখনও একতরফা হ'তে পারে না, যেমন স্নেহ বা প্রেম পারে। এই দুটো জিনিষ নিয়ে আমরা প্রায়ই গোলমাল করে বসি। কর্ত্তব্যের আইডিয়াটার মধ্যে একটা বাধ্যবাধকতা আছে। তাই যদি একজন অপরের জন্য কিছু না করে তবে 'ন্যায়তঃ' অপরের তার প্রতি কিছু 'কর্ত্তব্য' নেই—অবশ্য দয়া ক'রে সে যদি কিছু করে ত সে অন্য জিনিষ। তাই পাতিব্রত্য কর্ত্তব্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে যদি পত্নীচর্য্যাও সঙ্গে সঙ্গে সমান কর্ত্তব্য ব'লে মেনে নেওয়া যায়।"

পল্লব বল্‌ল: "আমাদের দেশের এ বিষয়ে ধারণা কিন্তু অন্যরূপ।"

মাদাম রিশার একটু কঠিন হেসে বল্‌লেন: "জানি মসিয়ে বাক্‌চি। কোথায় আমি পড়েছিলাম আপনাদের কোন্ এক ভিক্ষুক বিল্বমঙ্গলের গল্প—যাঁর কাছে সতী নারী এসে নিজের দেহ নিবেদন ক'রেছিলেন স্বামীর আদেশে। এবং এই নাকি আপনাদের দেশের পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। আমাদের কিন্তু মনে হয় নারীত্বের এর চেয়ে বড় অপমান আর কিছু হ'তে পারে না। না মসিয়ে বাক্‌চি, না। এ একটা আদর্শই হ'তে পারে না। এ শুধু পুরুষজাতির নিজেদের সুবিধের জন্য একটা মিথ্যা আদর্শকে বড় ক'রে প্রচার করার হিপ্‌নটিস্‌ম্। দেখ্‌বেন মসিয়ে···· নারীত্ব-গৌরব উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে এ সব অসার ধর্ম্ম-প্রচারকদের মহিমা লোপ পাবে। ইতিমধ্যেই অনেকটা পেয়েছে। পায় নি কি? স্বামী যে মুহূর্ত্তে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য করতে বিরত হয় সে মুহূর্ত্তে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য লুপ্ত হয়। অবশ্য সে যদি প্রেমের অনুপ্রেরণায় বা দয়াবশে তখনও স্বামীর প্রতি ভাল ব্যবহার করে তবে সে তার মহত্ব; কিন্তু সেটা তার কর্ত্তব্য নয়, কথা মাত্র,—এইটেই আমার বক্তব্য। আজকাল য়ুরোপে একদল নারী গ'ড়ে উঠ্‌ছে বারা এই নূতন আইডিয়ার অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাদের নারীত্বের বিকাশ করতে বদ্ধপরিকর। আমি তাদেরই মতাবলম্বী।"

একথাগুলি পল্লবকে স্পর্শ করল। তবু সে বল্‌ল: "কিন্তু...কিন্তু..মাদাম রিশার···একসময়ে ত আপনি মসিয়ে রেনাকে ভালবেসেছিলেন? শুধু ভালবাসা নয় প্রাণ ঢেলেই ভালবেসেছিলেন। নারী যদি একবার একজনকে ভালবাসে তাহ'লে কি তার পরে সে কখনও আর একজনকে ভালবাস্‌তে পারে?"

মাদাম রিশার একটু হেসেই তৎক্ষণাৎ গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন: "মাপ করবেন মসিয়ে বাক্‌চি, আপনার মুখে এ কথাগুলি নিতান্ত পুঁথিপড়া কথার মতন শোনায়। কিছু মনে করবেন না—আমার একটা অনুরোধ আছে। সেটা এই যে এ সব বই-পড়া নীতি নিয়ে জীবনকে বিচার করতে যাবেন না, জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই জীবনের বিচার করতে অগ্রসর হবেন।···আশা করি এ উপদেশটির জন্যে আহত বোধ করবেন না। আমি নিজে আমার ভাইটির কাছ থেকে এরকম অনেকগুলি বই-পড়া নীতি মেনে ঠ'কেছি ব'লেই আপনাকে জোর করে এ অনুরোধটি করতে সাহস করলাম।

"যাক্। তবু আপনার প্রশ্নটির সাধ্যমত উত্তর দিতে চেষ্টা করব। আপনি জিজ্ঞাসা করছেন নারী একাধিক পুরুষকে

ভালবাসতে পারে কি না। আমার মনে হয় সে-রকম সুযোগ হ'লে নারী পরপর একাধিক পুরুষকে প্রাণ ভ'রে ভালবাসতে পারে। কারণ প্রেম যে প্রতিপদে বাড়ে কমে মসিয়ে বাকৃচি। গভীরতর কারণের কথা ছেড়ে দিন, শুধু দূরত্বের ব্যবধানের দরুণ কি প্রগাঢ় বন্ধুত্ববন্ধনও অনেক সময়ে শিথিল হ'য়ে গিয়ে থাকে না? তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই বা তা না হবে কেন? তাই আমার মনে হয় যে স্বামীকে একসময়ে গভীর ভাবে ভালবাস্‌লেও নারী পরে অপরকে সমান বা আরও গভীর ভাবে ভালবাসতে পারে। এটা শুধু আমার থিওরি নয় মসিয়ে বাকৃচি, এটা আমার জীবনের একটা জলন্ত অভিজ্ঞতা। দেখুন না কেন যাঁর জন্যে এক সময়ে আমি সব ছেড়েছিলাম, আজ আর একজনের জন্যে তাঁকেও ছাড়তে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না কেন? কেন আজ আমার হৃদয়ের মধ্যে আমার পূর্ব্ব স্বামীর প্রতি সে গভীর মমতার একটুকুও খুঁজে পাচ্ছি না বলতে পারেন? আর কেনই বা আজ মসিয়ে রিশারের জন্য সমাজ ত্যাগের দুর্ব্বহ কষ্টও আমি হাসিমুখে বহন করছি। এর কারণ কি শুধু এই নয় যে গভীর প্রেমের জোয়ার ভাঁটা হ'তে পারে ও হ'য়ে থাকে? গভীর প্রেমও পদদলিত হ'লে সুন্দর সুগন্ধ ফুলের মতন নিষ্পিষ্ট ও গন্ধহীন হ'তে পারে। অবশ্য তা না-ও হ'তে পারে একথাও আমি মানি। কিন্তু কখন যে সে বিকশিত হয়, কি উপায়ে যে সে স্থায়ী হয় ও কেন যে সে শুকিয়ে যায় এ রহস্যের সমাধান কে করবে?"

পল্লব গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে কথাগুলি শুন্‌ল। পরে একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌ল: "আর একটা প্রশ্ন মাত্র। মাপ করবেন, আপনার জীবনের-অভিজ্ঞতা-দিয়ে-যাচানো মতামতগুলি আমার মনে এক অপূর্ব্ব সুর তুলেছে ব'লেই আপনার ব্যথার তন্ত্রীতে বার বার ঘা দিতে বাধ্য হচ্ছি।... আমার শুধু আর একটা মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে ও সেটা এই যে আপনার স্বামী কি বলতে পারেন না যে ভুলচুক তাঁরও হ'য়েছে আপনারও হ'য়েছে?—সুতরাং আজ যখন তিনি সে-সব ভুলে আপনাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছেন তখন আপনার পক্ষে ফিরে না যাওয়াটা কি অনুচিত নয়?—"

মাদাম রিশার একটু অধীর স্বরে বাধা দিয়ে বল্‌লেন: "কিন্তু মসিয়ে রিশারেরও যে এ বিষয়ে কিছু বলার থাকতে পারে সেটা যে আপনি অত্যন্ত সহজে ভুলে যাচ্ছেন মসিয়ে বাকৃচি! অথচ তাঁর প্রেমের গভীরতা ও ত্যাগ সম্বন্ধে আপনি নিজেই খানিক আগে কত উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করছিলেন? কিন্তু তাঁর ত্যাগের কথা ছেড়ে দিলেও আমাকে তিনি কি দিয়েছেন একবার ভেবে দেখুন দেখি! তিনি শুধু যে আমাকে ও ইভেতকে অনাহার বা অকালমৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছেন তাই নয়..." বল্‌তে বল্‌তে তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে এল:—

"আমাকে তাঁর জীবনে সব-চেয়ে সম্মানের পদে—অর্থাৎ সত্য প্রেমের সিংহাসনে—প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমাজ সেটা অস্বীকার বল্‌তে পারে ও আইনে সেটা না মান্‌তে পারে, কিন্তু সব সমাজ ও আইনের যিনি নিয়ন্তা তিনি কি মান্‌ছেন না?...আমার অন্তরাত্মার প্রতি অণুপরমাণু মান্‌ছে না? তাছাড়া চাকৃরির পর চাকৃরি হ'তে চ্যুত হ'য়ে তিনি আমাকে একদিনও রূঢ় কথা শোনান নি, হাসিমুখে বেশছাড়া হ'য়েছেন। অথচ আমি ত জানি যে ফরাসীজাতির পক্ষে দেশত্যাগী হওয়া কত বড় ব্যথার কথা?...এসব চোখের উপর দেখে ও মনেপ্রাণে অনুভব ক'রে আজ যদি আমি বলি যে যিনি আইন-অনুসারে আমার স্বামী তাঁরই প্রতি কর্ত্তব্য আমার সব চেয়ে বড়—তাহ'লে কি মসিয়ে রিশার বল্‌তে পারেন না যে মানুষের জীবনে অনেক সময়ে সমাজের আইনের চেয়ে উঁচু আইনের দাবীদাওয়াও বড় হ'য়ে উঠ্‌তে পারে? তিনি কি আমাকে সাম্‌নাসাম্‌নি একবার শুধু এই সাদা কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন না যে তাঁর কাছে আমি যে গভীর অটল প্রেমের পরশ পেয়েছি তার কাছাকাছি কোনও দানও আমার আইনের-চোখে-স্বামী আমাকে কখনও দিয়েছেন কি না।"

ব'লে একটু থেমে তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বাইরের ঘনায়মান মেঘের দিকে চেয়ে যেন আপন মনেই ব'লে যেতে লাগ্‌লেন:

"তা ছাড়া আসল কথা হচ্ছে কে জীবনে কি খোঁজে। যারা সমাজের বাহবা বা কলের-মতন ঘাড় নাড়ার জন্যে প্রেমহীন বিবাহকেই বরণ ক'রে নিতে চায় তারা তাই নিয়েই জীবন কাটাক। তাদের সঙ্গে আমার বিবাদ নেই। কেবল আমার প্রকৃতি অন্যরূপ। এই মাত্র। আমি প্রেমের দাবীকেই জীবনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দাবী ব'লে মনে করি।

প্রেমের ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা সব-চেয়ে বড় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের এ-বন্ধন প্রেমের রসধারায় পুষ্ট কি না। যদি তা না হয় তবে আমি যা-ই করি না কেন আসে যায় না। কিন্তু যদি তা হয় তবে আমার পক্ষে এ ছেড়ে যাকে ভালবাসি না তার কাছে ফিরে যাওয়া কি শেষটায় অভিশাপ হবে না? কারণ সত্য বিবাহ কোন্‌টা? যেখানে সমাজের শাস্ত্রিরক্ষকের অনুমোদন আছে সেইটা, না যেখানে গভীর প্রেম আছে সেইটা? বসিয়ে রাখছি, আমার কর্ত্তব্য আমি সেই শুভ-লগ্নেই বেছে নিয়েছিলাম যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমার অন্তরাত্মার শতদল প্রেমে বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল। তখন সে-প্রেম আমার পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের অপেক্ষা রাখে নি, গির্জ্জার শান্তিবারিরও মুখচেয়ে ব'সে থাকে নি। আজ আমার এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে তিনি আমাকে ভালবাসেন ও আমি তাঁকে ভালবাসি। এটা শুধু মুখের কথা নয় বসিয়ে রাখছি, অনভিজ্ঞের আত্ম-প্রবঞ্চনাও নয়। আমাদের এ সেই ভালবাসা যার জন্যে আমরা মানুষের একটা শ্রেষ্ঠ সম্পৎ—সমাজকেও—ত্যাগ করতে পশ্চাৎপদ হই নি। অন্তর্যামী যদি কেউ থাকেন তবে কি তিনি শুধু সমাজের গণ্ডীর বাইরে ব'সেই এ হেন ভালবাসার মহিমা বুঝতে অক্ষম হ'য়ে পড়বেন মনে করেন?"

(ক্রমশঃ)

সীতারাম-প্রশস্তি

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, এম-এ, বি-এল

আবিষ্কার-কাহিনী

যশোহর জিলার অন্তর্গত মহম্মদপুর গ্রামে রাজা সীতারাম রায়ের পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন বহু পরিমাণে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির হস্তে ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক একখানি লিপিযুক্ত গোলাকৃতি প্রস্তর-ফলক সম্প্রতি অর্পিত হইয়াছে। স্থানীয় পরলোকগত ৺হরকুমার সরকার মহাশয়ের গৃহে সুরক্ষিত গ্রন্থনিচয় "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" গ্রন্থাগারে অর্পণ করিবার কালে স্বর্গীয় সরকার মহাশয়ের পুত্রগণ "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে সমিতির গৃহে সংরক্ষিত হইবার মানসে এই শিলা-লিপিখানি ন্যস্ত করিয়াছেন। উক্ত পরলোকগত সরকার মহাশয়ের জনৈক আত্মীয় শ্রীযুত নিত্যানন্দ নন্দী মহাশয় কিয়ৎকাল কানাইনগর কাছারীর নায়েব পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ কৌতূহলবশতঃ এই লিপিযুক্ত প্রস্তর-ফলকখানি আনয়ন করেন ও তদবধি এতাবৎকাল তাহা ৺হরকুমার সরকার মহাশয়ের গৃহেই সংরক্ষিত ছিল। অধুনা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত হওয়ায় ইহার কথঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্য সুধীসমাজে সুপরিচিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে এবং ইহার স্থায়িত্বও কিয়ৎপরিমাণে নিরাপদ হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা কাহিনী

মূল ফলক যথাস্থানে সংলগ্ন না থাকায় এবং তাহা কোথায় গেল তাহাও অপরিজ্ঞাত থাকায়, এই প্রস্তর-লিপিখানির এ পর্য্যন্ত নানাবিধ অসঙ্গতি ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ চলিয়া আসিতেছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের যশোহর রিপোর্টও সম্ভবতঃ এই ভ্রম-প্রমাদে কিয়দংশে সহায়তা করিয়াছে। এমন কি শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ ঐতিহাসিক আচার্য্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহাশয়-ও এই ফলকখানি এতদিন স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত না হওয়ায়, সম্ভবতঃ লোকপরম্পরায় শ্লোকটি শ্রবণ করিয়া ও ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া তদীয় 'সীতারাম' নামক 'সাহিত্যে' প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে কয়েক স্থানে

অশুদ্ধ ও বিকৃত পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম পংক্তিতে ওয়েষ্টমাকট ধৃত 'চন্দ্রঃ' স্থানে 'চন্দ্রে' এবং "কৃষ্ণ তোষাভিলাসঃ" স্থানে "কৃষ্ণ তোষাভিলাষী" মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পংক্তিতে "বিশ্বাস-খাসো" স্থানে "বিশ্বাস ভাষো" পাঠ দিয়াছিলেন। তৃতীয় পংক্তিতে "ব্রাজছিল্লোঘযুক্তং" স্থলে "অতঃ সৌধযুক্তে রুচিরুচিরে" এই অংশের "সুন্দর হইতেও সুন্দর" এইরূপ অর্থ নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং "হরেকৃষ্ণ" মন্দিরকে "কৃষ্ণ মন্দির" রূপে মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। এক্ষণে মৈত্রেয় মহাশয় প্রস্তর-ফলকখানি এবং তাহার প্রতিলিপি স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়ায়, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বের স্খলিত মতের আর অবতারণা করেন না; পরন্তু, "রুচি রুচি" শব্দটি "হরেকৃষ্ণ গেহং" পদের বিশেষণ বলিয়া স্থির করেন এবং 'রুচির' (মনোজ্ঞ) 'রুচি' (কান্তিবিশিষ্ট) এইরূপ অর্থে 'রুচির রুচি' পদ 'হরেকৃষ্ণ গেহং'এর বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

মূল শিলা-লিপিতে বিকৃত-পাঠ-সমন্বিত "বিশ্বাস ভাবোদ্ভব", "অতঃ সৌধযুক্তে" প্রভৃতি স্থানে পরিষ্কার ভাবে "বিশ্বাস খাসোদ্ভব" ও "ব্রাজছিল্লোঘযুক্তং" সন্নিবেশিত আছে। "অতঃ সৌধযুক্তে" পাঠ কষ্ট-কল্পনার দ্বারাও স্থির করা যায় না। যদিও 'ধ' অক্ষরটি কিয়দংশে আধুনিক 'ধ'এর ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং 'ছিল্লো' শব্দটি কিয়ৎ পরিমাণে আধুনিক কালের 'ছিন্টে'এর ন্যায় দৃষ্ট হয়, তথাপি 'ব্রাজছি' শব্দটি কোনক্রমেই 'অতঃ' পাঠ হইবার সম্ভাবনা নাই।

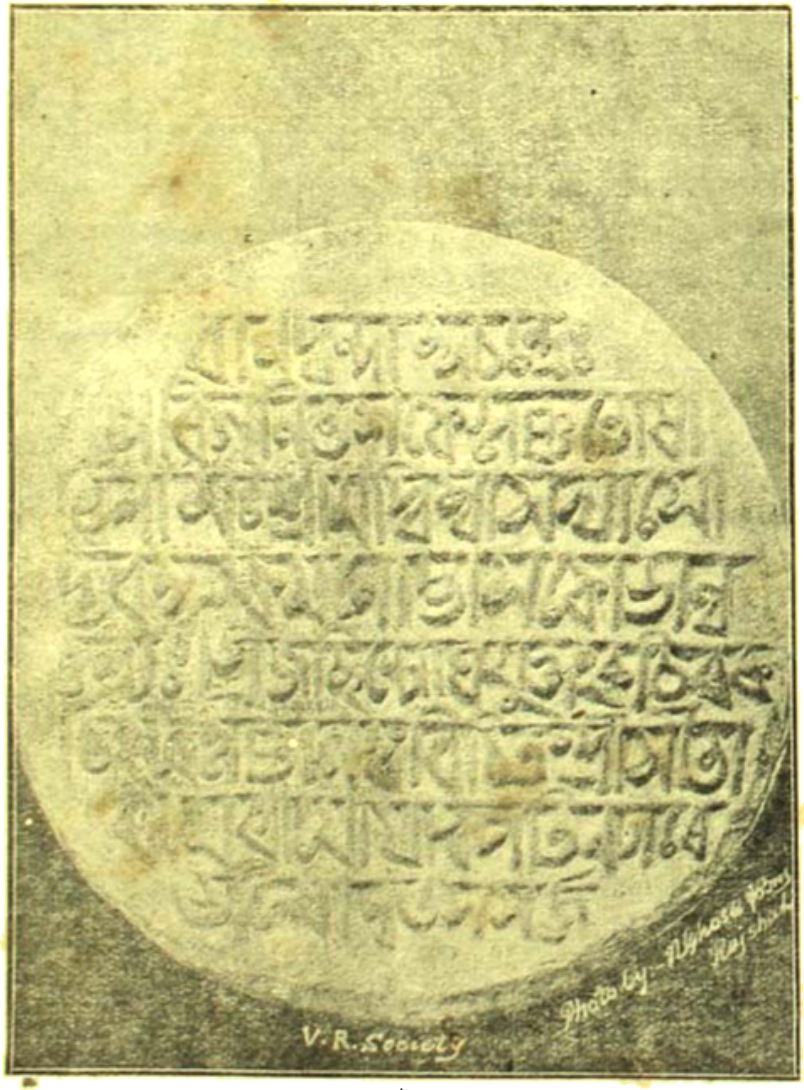

শিলালিপি

লিপি-পরিচয়

এই গোলাকৃতি প্রস্তর-ফলকখানির আয়তন ১০ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি। এই প্রস্তর-ফলকে অষ্টম পংক্তিতে সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ একটি সংক্ষিপ্ত লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার দুই একটি অক্ষর অস্পষ্ট হইলেও অধিকাংশ অক্ষর এখনও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। অক্ষর-গুলি যেরূপ উত্তোলিত (Relief) ভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা মুসলমান শাসনকালের শাসনলিপি-বিজ্ঞাপক বঙ্গাক্ষরের পরিচয় প্রদান করে।

লিপি বিবরণ

সূর্য্যের ন্যায় যিনি 'বিশ্বাস-খাস' বংশরূপ পদ্মকে প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন সেইরূপ ভক্তিমান শ্রীসীতারাম রায় 'কৃষ্ণের' তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত 'বাণ' = ৫, 'রন্ধ্র' = ২, 'অঙ্ক' = ৬, 'চন্দ্র' = ১ (অঙ্কের বামা গতি) ক্রমে ১৬২৫ পরিগণিত শকে অর্থাৎ ১৬২৫ + ৭৮ = ১৭০৩ খৃঃ অঃ, 'মহপতিনগরে' (কানাইনগরে) উজ্জ্বল শিল্পসমূহযুক্ত মনোজ্ঞ কান্তিবিশিষ্ট বিচিত্র 'হরেকৃষ্ণ মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

তোড়ি রাগিণী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রণদাচরণ উকীল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ঐতিহাসিক তথ্য

এই লিপি অধিক পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য-বিজ্ঞাপক না হইলেও, ইহা হইতে রাজা সীতারাম রায়ের শাসনকাল, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, ও আত্মবংশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন "কৃষ্ণ তোষাভিলাসঃ" পদে কেহ কেহ অনুমান করেন যে তদীয় গুরুদেব "কৃষ্ণবল্লভের" তুষ্টি-সম্পাদনের ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। "বাণ বন্ধা (শ্ব) ঙ্ক চন্দ্রৈঃ পরিগণিত শকে"—অঙ্কের বামাগতি ক্রমে ১৬২৫ + ৭৮ = ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী।

তখন দিল্লীশ্বর মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শেষ সময় সমাগতপ্রায়। বাঙ্গলার মসনদে মুর্শিদকুলী খাঁ উপবিষ্ট হইয়া ঢাকা হইতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

এই প্রস্তর-লিপিতে শ্রীসীতারাম রায় আত্মবংশের উল্লেখ করিয়া আপনাকে "শ্রীমদ্বিশ্বাসপাদোদ্ভবকুলকমলো-দ্ভাসকোভানুতুল্যঃ" বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়াছেন। যশোহরের নিকটবর্ত্তী পুঁড়ো-পাড়ার বটকণ্ঠে সীতারামের পূর্ব্ব-পুরুষের সম্বন্ধে লিপিয়া রাখিয়াছেন :—

"চাল চষে তাল খায় খিদিরপাতে বাস
তা'র বেটা কায়েত হ'ল বিশ্বাস-খাস।"

খাস-বিশ্বাসের পিতা যে "হাল চষ, তাল খাওয়া"—নিতান্ত নগণ্য কায়স্থ—একেবারে হাল ছাড়িয়া গিয়া নবাবের খাস-দপ্তরে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইয়া বসা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব না হইলেও সহজ ব্যাপার নহে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা মানসিংহ যখন রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ তখন সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীরামদাস তাঁহার নিকট হইতে "খাস-বিশ্বাস" উপাধি লাভ করেন। তিনি সুবাদারের খাস সেরেস্তার হিসাব-বিভাগে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তৎপুত্র হরিশচন্দ্র অল্পবয়সে পিতার সহিত রাজ-সরকারে কার্য্যারম্ভ করেন এবং রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় যান (১৬০৯)। তিনি তথায় কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়া রায়রায়া উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র উদয়নারায়ণ ভূষণার ফৌজদারের অধীন সাজোয়াল বা তহশীলদার নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা।" ‡

মোগল-শাসনের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টায় সীতারাম মহম্মদপুর নামক স্থানে দুর্গ ও রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া রাজা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বাধীনতা ঘোষণাকে মোগল রাজ-সরকার বিদ্রোহ বলিয়া তাহা দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম চেষ্টা সফল না হইয়া বিফল হইয়াছিল। প্রকাশ্য যুদ্ধে মোগল সেনাপতি আবু তোরাপ্ নিহত হইয়াছিলেন। পরে সীতারামের পতন ও নিহত হইবার কথা মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে ও ইংরাজ লেখকদিগের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বদন্তী ও কল্পনার সাহায্যে সীতারামের উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য স্বদেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও প্রায় সকল গ্রন্থেই এই দেব-মন্দির-লিপির উল্লেখ আছে; কিন্তু মূল লিপির অসদ্ভাবে অনেক গ্রন্থেই প্রকৃত পাঠ সন্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই। এক্ষণে ঘটনাসূত্রে সেই লিপিখানি আবার লোক-সমাজের সম্মুখীন হইয়াছে। সুতরাং তদবলম্বনে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রতিকৃতিসহ বিশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

প্রশস্তি-পাঠ।

বাণ-বন্ধা (শ্ব) ঙ্ক চন্দ্রৈঃ
পরিগণিত শকে কৃষ্ণ তোষা
ভিলাসঃ শ্রীবিশ্বাসখাসো—
দ্ভব কুল কমলোদ্ভাসকো-ভানু
তুল্যঃ। ব্রাজদ্বিন্নৌঘযুক্তং রুচিরক
চি হরেকৃষ্ণ গেহং বিচিত্রং শ্রীসীতা—
রাম রাজো বহুপতি নগরে
ভক্তিমানুৎস সর্জ্জ *

‡ যশোহর খুলনার ইতিহাস—পৃঃ ৫১৭।

* এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সঙ্কলন করিবার সময় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে, তজ্জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি—

(১) শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি-এ-ই মহাশয়ের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত "সীতারাম।

(২) শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "যশোহর খুলনার ইতিহাস।"

(৩) ওয়েষ্টমাকট সাহেবের রিপোর্ট।

(৪) শ্রীযুত এস, পি, ভট্ট মহাশয়ের Ruins of Mohammadpur.

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম্-এ, ডি-এল

(১৫)

রেখা তার সমস্ত অন্তর দিয়া সৌরীনকে ভালবাসিয়াছিল। ভালবাসায় সে তার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছিল, আর কোনও দিক সে চাহিয়া দেখে নাই। তার মা ছিল তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তাঁহাকে সে স্পর্দ্ধাভরে ছাড়িয়া আসিয়াছিল। তার সমাজ-শুদ্ধ সকল নারী তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছে, তাহা সে অগ্রাহ্য করিয়াছে; তার সুনাম সে অনায়াসে বিলাইয়া দিয়াছে—কেবল সৌরীনকে পাইবার আশায়।

তাই আজ এক মুহূর্ত্তে অন্তর তার পরিপূর্ণরূপে শূন্য হইয়া গেল। সে আর তার জীবনে কোনও রস খুঁজিয়া পাইল না। সৌরীন অনায়াসে তার মুক্তি গ্রহণ করিল তাও তার সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে সে যে কঠোর কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিল, সম্পূর্ণ নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে বিবাহ করিতে বলিল, তাহাতে সে একেবারে বসিয়া পড়িল। তার মনে হইল যে সৌরীন তাকে একটুও ভালবাসে না, কোনও দিন ভাল বাসে নাই। না হইলে কি সে এত বড় একটা কঠোর কথা বলিতে পারে! সৌরীন তাকে যে কেবল এখন তার প্রেমে বঞ্চিত করিয়াছে তাহা নয়, চিরদিনই তাকে বঞ্চনা করিয়াছে। তাই বিদায়ের কালে সে শুধু তাহাকে বিরহের ব্যথা দিয়া যায় নাই, তার সকল সম্বল লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। সৌরীন যে তাকে আগে ভালবাসিয়াছে, এই স্মৃতিটুকুও তার সম্বল রহিল না।

এত শূন্য, এত অন্ধকার তার হৃদয়—তার বর্ত্তমানের এতটুকু সম্বল, ভবিষ্যতের এতটুকু আশা নাই—রেখার মনে হইল যে তার ব্যথার বুঝি আর শেষ নাই।

কিন্তু সে ব্যথার চেয়েও বেশী করিয়া তাহাকে পীড়ন করিল এখন দারুণ একটা লজ্জা! কেমন করিয়া আর সে লোক-সমাজে মুখ দেখাইবে? সৌরীনের প্রেমের স্পর্দ্ধায় সে এতদিন সমস্ত জগতের মতামত তুচ্ছ করিয়াছে। তার বন্ধুবান্ধবের সমস্ত নিষেধ, সতর্কতার সব উপদেশ সে উপেক্ষা করিয়াছে। সৌরীনের সঙ্গে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণে সমাজে যে একটা মৃদু আন্দোলন ও নিন্দার স্রোত সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে সে লজ্জা না পাইয়া বরং তার প্রেমের বিজয়-মুকুট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। নিন্দুকদের কাছে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া সে বিপুল স্পর্দ্ধায় বুক ফুলাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ তাকে প্রত্যাখ্যাত ও প্রেম-বঞ্চিত দেখিয়া যখন সারা জগৎ তাহাকে বিদ্রূপ দিয়া লাঞ্ছিত করিতে আসিবে, অজস্র নিন্দা ও গ্লানি স্বচ্ছন্দচিত্তে তার উপর বর্ষণ করিবে, তখন সে কোথায় লুকাইবে? কাল যখন তার মা এ সংবাদ পাইয়া বিদ্রূপ ও তিরস্কার মিশাইয়া বলিবেন, "এ আমি আগেই ব'লেছিলাম", তখন কোন্ গহ্বরে সে আত্ম গোপন করিয়া মান বাঁচাইবে? স্কুলের অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা—যাদের চোখ টাটাইয়া সে এতদিন বিজয়িনীর মত প্রিন্স-সম্ভাষণে যাত্রা করিয়াছে, তারা যে আজ তাকে হাসির বন্যায় ভাসাইয়া দিবে, তাদের কাছে সে আত্মরক্ষা করিবে কেমন করিয়া?

জীবন-সর্ব্বস্ব প্রণয়ী হারাইয়া তার বিরহের ব্যথার চেয়ে এই লজ্জাই আজ তার চিত্তে অসহ্য মর্ম্মপীড়া জন্মাইতে লাগিল।

সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাটাইল। প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া কাপড় চোপড় পরিয়া সে অনেকটা সুস্থির চিত্তে ভাবিতে বসিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল যে, কলিকাতা হইতে পলায়ন ছাড়া আর তার উপায় নাই। কলিকাতায় আর তার মুখ দেখাইবার উপায় নাই।

সাত আট দিন পূর্ব্বে প্রিন্সিপ্যাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সে পশ্চিমে দেরাদুনে যাইতে প্রস্তুত আছে কি না। সেখানে একটা চাকরী খালি ছিল—সেই চাকরী সে চাহিলে পাইতে পারে। রেখা তখন আসন্ন পরিণয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সে একটু হাসিয়া লিখিয়াছিল, "না,

আমি কলিকাতা ছাড়িয়া যাইব না।" কলিকাতা ছাড়িয়া রোজ রোজ সৌরীশের সঙ্গে সম্ভাষণের সম্ভাবনা ছাড়িয়া যাইবার কল্পনাও তখন তার অসহ্য ছিল। আজ তার মনে হইল, যদি দেরাদুনের সে চাকরীটা সে পাইত, তবে সে বাঁচিয়া যাইত। এতদিন সে চাকরী আছে কি না সে জানিত না, তবু আশা করিয়া সে প্রিন্সিপালের কাছে গেল।

প্রিন্সিপাল বলিলেন, "আমি পরশু দিন আর একজনকে মনোনীত করিয়া লিখিয়া জানাইয়াছি। তুমি আমায় আগে কেন বলিলে না!"

রেখা দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য।" সে যখন মুখখানা অন্ধকার করিয়া ফিরিয়া চলিল, তখন প্রিন্সিপাল তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি একটা দরখাস্ত নিয়ে এসো, দেখি, কি ক'র্‌তে পারি।"

তারপর প্রিন্সিপাল একখানা টেলিগ্রাম করিয়া রেখার দরখাস্তের কথা দেরাদুনে জানাইলেন, এবং তাকে দরখাস্ত পাঠাইয়া দিলেন।

রেখার সৌভাগ্যক্রমে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই টেলিগ্রামে উত্তর আসিল, রেখা সেই পদে নিযুক্ত হইল। সে অবিলম্বে সেখানে চলিয়া গেল।

এদিকে সৌরীন সেদিন সারা ময়দানে পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইল। তার মনটা ভয়ানক অস্থির হইয়া উঠিল, সে কিছুই পরিষ্কার করিয়া ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। কেবল তার মনে হইল যে আজ সব অন্যায় হইয়া গিয়াছে, যাহা তার বলা উচিত নয় তাই সে বলিয়াছে, যাহা তার অত্যন্ত অকর্ত্তব্য তাই সে করিয়াছে। যখন সে স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে পারিল, তখন তার মনে হইল যে, রেখা তাহাকে মুখের কথায় মুক্তি দিয়াছে, কিন্তু সে মুক্তি গ্রহণ করিবার তার কোনও অধিকার নাই। সে মুক্তি মানিয়া লওয়া তার পক্ষে ঘোর কাপুরুষতার কার্য্য হইয়াছে। সে নিতান্ত স্বার্থপরের মত তার নিজের স্বার্থের কাছে এই পরম বিশ্বাসী প্রেমপূর্ণ নারীকে বিসর্জ্জন করিয়াছে। তা ছাড়া, এখন তার মনে হইল যে, রেখাকে সে যে বন্ধন মনে করিয়াছিল, তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, সে বন্ধন মোচন করিতে তার প্রাণের গোড়ায় টান পড়িয়াছে। রেখা-শূন্য জীবন তার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন অনর্থক বলিয়া মনে হইল।

কল কথা, অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর সে ঠিক করিল আজ সে ঘোর অবিবেচক ও পাষণ্ডের কাজ করিয়াছে। সে নিজের মনকেই এতক্ষণ বুঝিয়া ওঠে নাই; তাই সে তার পরম সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্য মনে করিয়া অথথা কুণ্ঠিত ও দুঃখিত হইয়া আসল দুর্ভাগ্য টানিয়া আনিয়াছে।

পরের দিন বৈকাল বেলায় সে ছুটিল রেখার সন্ধানে। যেখানে রেখা আসিয়া তার সঙ্গে দেখা করিত, সেইখানে সে ছুটিয়া গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া আসিল, কিন্তু রেখাকে দেখা গেল না। ফিরিবার সময় সে মনে করিল, সে কি মূর্খ! আগের দিনই ত রেখা বলিয়াছিল যে, সে আর তার কাছে আসিবে না,—আজ সে কি আশায় এখানে আসিয়াছে? তার পরদিন সে বেথুন কলেজ হোষ্টেলে গিয়া দ্বারবানের কাছে শুনিল, রেখা বাহির হইয়া গিয়াছে। অমনি সে পাগলের মত ছুটিল তাদের মিলন-কেন্দ্রের দিকে—তার আশা হইল, বুঝি রেখা সৌরীনের সন্ধানে সেইখানেই গিয়াছে। কিন্তু সেখানে রেখাকে দেখা গেল না। তার পরদিনও সে রেখার দেখা পাইল না। সে-দিন রাত্রে সে রেখাকে চিঠি লিখিল—

"রেখা, আমি ভুল বুঝেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে ছাড়া আমার জীবন নিরর্থক; আমার কাছে ফিরে এসো। আজ হ'তে তিন দিন আমি যথাস্থানে যথাসময়ে তোমার প্রতীক্ষা করব।"

তিন দিন সে বৃথা প্রতীক্ষায় কাটাইল। তার পর বেথুন কলেজে সংবাদ লইয়া জানিল, রেখা কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; তার ঠিকানা দিতে সে বারণ করিয়া গিয়াছে।

সৌরীন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কোথায় গেল রেখা? সৌরীনের উৎপাতেই হয় তো সে কাজ ছাড়িয়া পলাইয়াছে,—কোথায় সে কি কষ্টে আছে কে জানে? সৌরীনের আপনাকে কশাঘাত করিতে ইচ্ছা করিল। তার মাথার ভিতর এমন একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল যে, সে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না যে সে কি করিবে। এক সপ্তাহ সে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ভাবে কেবল বিছানায় শুইয়া কাটাইল। তারপর উঠিয়া একখানা পত্রে সে তার সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া জানাইল।

(১৬)

প্রথমে কিছুদিন এদিক ওদিকে কর্ম্মের অবসর অনুসন্ধান করিয়া সৌরীন দেখিল যে, কোনও দিকে বিশেষ কোনও কাজের সুবিধা দেখা যায় না। অপর দিকে সে দেখিতে পাইল—নিত্যরঞ্জনের সেবা-সঙ্ঘ বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। তাদের কাজ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ কল্পনা নাই, কোন্ পথে কি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা তাদের নাই; কিন্তু এখানে কতকগুলি লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে চাহিতেছে এবং তাদের হাতে টাকা আছে। সুতরাং ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেলে সৌরীন ইহাদিগকে অভিনবিত পথে পরিচালিত করিয়া দেশের প্রভূত হিতসাধন করিতে পারিবে।

এই স্থির করিয়া সৌরীন সেবাসঙ্ঘের আফিসে গেল। নিত্যরঞ্জন তখন আফিসে ছিল না, নবজীবন তার কাজ করিতেছিল। ঘরের চারিদিকে সেবাসঙ্ঘের সভ্যেরা এলোমেলো ভাবে নানা কথা আলাপ করিতেছিল।

নবজীবন সৌরীনকে দেখিয়া একটু বাঁধা নোয়াইয়া নমস্কার গোছের করিয়া, একটি ছোকরা সভ্যকে বলিল, "তোমার পাঁচটাকার হিসাব দিলে না যোগেন?"

যোগেন হিসাব বাহির করিয়া দিল। নবজীবন তার উপর একটু চোখ বুলাইয়া তাহা আর একজনের কাছে চালান করিল; সে তাহা মনোযোগ সহকারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

নবজীবন ষষ্ঠীশ নামে একটি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক লোককে জিজ্ঞাসা করিল—"ষষ্ঠীশবাবু, আপনার নারায়ণগঞ্জ থেকে যে দশজন ভলান্টিয়ার আসবার কথা ছিল, তার কি হ'ল।"

"এই তো তারা এলো বলে'। আজ ভোরের ট্রেণে এসে পৌঁছেছে। তা' নবজীবন বাবু, তাদের থাকবার ব্যবস্থা কি হ'বে? তাদের তো কাণাকড়ি সম্বল নেই।"

"হাঁ, সে আমরা ঠিক করে রেখেছি,—এ বাড়ীর দোতলাটা ভাড়া করা হ'য়েছে—এখানে এসে থাকবে। খাওয়া দাওয়ার জিনিষ পত্তর আমরা দেব, নোদ্দা নিজে রেঁধে খেতে হ'বে।"

"নিজে বাজার করতে, রাঁধতে খেতেই যদি দিন গেল, তবে আর কাজ করবে কখন? একটা রাঁধুনী বামুন রেখে দেবেন,—কতই খরচ হ'বে?"

"আহা খরচের জন্যে কি? টাকার জন্য তো ঠেকছে না, চাই discipline। নিজের কাজ নিজে না ক'রলে সেই discipline হ'বে না। মনে রাখবেন ষষ্ঠীশ বাবু, যে আমাদের এটা সন্ন্যাসীর আশ্রম, এখানে দেহকে কোনও মতে টিকিয়ে রাখবার জন্যে যা' দরকার তার বেশী কোনও রকম ভোগ বরদাস্ত করা হ'বে না। ওহে সুধাকান্ত, তোমার নয়নসিং থেকে ক'জন আসছে?"

"আসছে জন-পাঁচ-সাত, কিন্তু আনা যেতে পারে ঢের। অনেকে রাজী আছে, কিন্তু তাদের কতকগুলি condition আছে। আপনারা একজন গিয়ে যদি তাদের সঙ্গে সামনা-সামনি কথা-বার্ত্তা কয়ে' আসতে পারেন, তবে অনেক কাজ হয়।"

নবজীবন একটা পেন্সিল দাঁতের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া একখানা ডায়ারী বাহির করিল। খানিকক্ষণ তাহা দেখিয়া শেষে সে বলিল, "না, এ মাসের ভিতর নড়বার উপায় নেই। এই দেখ না—সমস্ত মাসটা কাজে ভর্ত্তি। নিত্যদা কাল দিল্লী যাবে, এখন সে গেলে এখানে আফিস সামলানই দায়। তার উপর আবার দেখ রোজই মীটিং। কেমন করে' যাই বল।"

"আজ্ঞে তা' যোগেন বাবুকে পাঠালে হয় না?"

"না হে না, এ সব গুরুতর কাজ, যাকে তাকে পাঠান যায় না। কোথায় গিয়ে ওরা সব কি বলে আসবে? কিন্তু তুমি বলেছ মন্দ নয়, কয়েকজন Recruiter শিক্ষিত করে না নিলে কাজ চলছে না। আমরা দুটি প্রাণী কতদিকে আর দৌড়াদৌড়ি ক'রবো—নোট করে' রাখছি।"

এমন সময় নিত্যরঞ্জন সশরীরে আসিয়া উপস্থিত। ছাতা ও চাদর দড়াম করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়াই নিত্যরঞ্জন হাতের ঘড়ি ওয়াচের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল। তার পর সে ষষ্ঠীশকে বলিল, "ওহে ট্যাক্সী ভাড়াটা দিয়ে দাও তো, বার টাকা বার আনা হ'য়েছে। তার পর নবজীবন, তোমার volunteer campএর ব্যবস্থা করেছো?"

নবজীবন কাছে আসিয়া বলিল, "তা' তো হ'য়েছে নিত্যদা, কিন্তু,"—বলিয়া মৃদুস্বরে তারা দুজনে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

শেষে নিত্যরঞ্জন বলিল, "আচ্ছা তাই হ'বে এখন নিয়ে এসো তো যে কার কি কাজ আছে, এখনি আবার যেতে

হ'বে চেৎলা। সেখান থেকে এসে ট্রেণ ধর্‌তে হ'বে—জান বেরিয়ে যাবে।"

সন্ত্রস্ত হইয়া চারিদিক হইতে সবাই খাতাপত্র লইয়া অগ্রসর হইল। ইত্যবকাশে একবার সৌরীনের দিকে চাহিয়া নিত্যরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "এই যে সৌরীন? কি মনে করে।"

কথা বলা শেষ হইতে না হইতে একজন একখানা খাতা আনিয়া তার সামনে রাখিল এবং নিত্যরঞ্জন অবিলম্বে তাহার উপর চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "এ কি! মাত্র ৭৬২ খানা চিঠি গেছে এতদিনে! তুমি কিছু ক'রছো না। আমাদের আসল কাজই হ'ল এখন এই চিঠি ছাড়া, propaganda, লোককে এতে করে educate ক'রতে হ'বে; আর এইটাই তুমি এমনি করে neglect করছো। ওহে নবজীবন, এর উপর একটু নজর রেখো। তিন দিনের মধ্যে অন্ততঃ হাজার পোরা চাই।—চিঠি হ'ল আসল।"

বলিতে বলিতে সে ঘস্ ঘস্ করিয়া তিন চার পাতায় সহি করিয়া গেল। তার পর আর একজন আসিয়া কতকগুলি বিল সই করাইল। আর একজন আসিয়া বলিল, "নবকথা লিখেছে যে পয়সা নইলে বিজ্ঞাপন ছাপবে না।"

"হুঁ, ওদের খুব একটা strong চিঠি লিখে দেও, আর কথাটা কাগজে খুব করে রটনা করে' দেও যে ও আমাদের সঙ্গে এমন ছেঁচড়ামি ক'রছে। দেখি বাছাধন কেমন করে' কাগজ বেচেন। হাঁ নবজীবন, তোমার আর কি আছে?"

"এই চাটগাঁয়ের চিঠিখানা পড়।"

নিত্যরঞ্জন দ্রুত বেগে চিঠিখানা পড়িয়া গেল। অর্দ্ধ-পথেই ভ্রূকুঞ্চিত করিল। পড়া শেষ হইলে বলিল, "একে লিখে দেও, সেখানকার লোকে rival organisation করে করুক। তাকে আমি পিষে মারতে পারবো কি না, সে আমার look out। সত্য যেন তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে খুব জোরের সঙ্গে তার মুষ্টিভিক্ষা ও সঙ্কীর্ত্তন চালায়। Rival organisation! আসি আগে দিল্লী থেকে। একবার চাটগাঁয় গেলে সাবে দুই বক্তৃতায় সব ফয়সা করে দেবো। ওটা কি?"

"রংপুরের খবর ভাল। বেশ recruiting চলছে; টাকা পয়সাও মন্দ আদায় হ'চ্ছে না। তবে রংপুরের volunteerরা চায় যে, তাদের যে টাকাটা আদায় হ'বে সেটা সেখানকার Co-operation Bankএ জমা থাকুক, আর সেখানকার কাজেই খরচ হ'ক। আমি তাদের বারণ করে লিখেছি—এরকম separation হ'লে discipline থাকবে না।"

"তা লিখেছ বেশ ক'রেছ, কিন্তু আবার যদি ওরা পীড়া-পীড়ি করে, তবে রাজী হওয়াই ভাল হ'বে। রংপুরের ওরা ভাল কাজ করছে, ওদের চটিয়ে কাজ নেই—ওদের ছেড়ে দিলে আমাদের মফঃস্বলে কাজ দেখানেই দায় হবে। তুমি লিখো যে টাকাটা রংপুরেই থাক, কিন্তু আমার নামে। তা' হ'লেই আমার বিনা হুকুমে তো ওরা খরচ কর্‌তে পারবে না।"

"তা' বেশ।"

এমনি করিয়া নিত্যরঞ্জন ও নবজীবন মহা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ভয়ানক কাজ করিতে লাগিল। শুধু তারা নয়, সে ঘরের ভিতর যতগুলি লোক ছিল, সকলেরই মুখে একটা মহা ভারিক্কী ভাব—ভাব এই যে তারা একটা মস্ত বড় কাজে ব্যস্ত আছে, সে কাজটা সৌরীনের মত অকর্ম্মণ্য লোক কিছুই বোঝে না।

বসিয়া বসিয়া সৌরীনের বিরক্তি ধরিয়া গেল। সে হঠাৎ উঠিয়া বলিল, "তবে যাই নিতাদা, একটা কথা ছিল, তা' তোমরা তো ভারী ব্যস্ত দেখছি।"

নিতা হাসিয়া বলিল "হাঁ ভাই। এই আজই দিল্লী যেতে হবে কি না! বুঝতেই তো পারছো—কত বড় দায়িত্ব আমার ঘাড়ে।" তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "এ তো আর রেখার সঙ্গে প্রেম করা নয়।"

একটা তীব্র বিষ-শায়কে যেন সৌরীনের অন্তর বিদ্ধ হইয়া গেল। বাণবিদ্ধ হরিণের মত কাতর নয়নে সে একবার নিত্যরঞ্জনের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল। তার পর বলিল "তবে আসি নিতাদা।"

"বসো, কি কথা বলতে এসেছিলে তুমি?"

সৌরীন বলিল, "থাক—সে কথা পরে হ'লেও চলবে। হাঁ, তা' একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি? তোমরা এখন কি কি কাজ ক'রছো।"

"এখন? কাজের অন্ত নেই। এখন আমরা mainly recruit ক'রছি। এরই মধ্যে ৫০০ ভলাণ্টিয়ার আমাদের

প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করেছে। এক হাজার আমার আর এক মাসের মধ্যেই পূর্ণ ক'রতে হ'বে। তার জন্য intensive propaganda চলেছে, আর recruiting চলেছে। বেশ চলছে কাজ, এক মাসের মধ্যে হাজার লোক আর এক লক্ষ টাকা আমি তুলে ফেলতে পারবো নিশ্চয়।"

"এখন এই যে ভলাণ্টিয়ার করছো, এরা করছে কি?"

"এদের এখন আমি কয়েকটা concentration campএ জড়ো ক'রছি। এদের সংগ্রহ ক'রে এদের training দিতে হ'বে। সেই training দেবার লোক আনবার জন্যেই দিল্লী যাচ্ছি।"

"কিন্তু training পেয়ে এরা কি ক'রবে? কি কাজের training পাবে?"

"সেটা এখনো ঠিক করি নি। Village organisationএর কাজটাই আমরা প্রথম হাতে নেবো মনে ক'রেছি।"

"তার মানে?"

"মানে গ্রামটাকে একটা economically self-contained unit করে গড়ে তোলা, পাটের চাষ বন্ধ করে ধানের ও তুলোর আবাদ করে যাতে লোক জন গাঁয়ের উৎপন্ন জিনিসে খেয়ে-প'রে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করা, এই সব। কিন্তু details সব আমরা ঠিক করি নি কিছু এখনও। ঠিক করা বড় কঠিনও। কেন না, ধর আমাদের কয়েকজন পাটের মহাজন প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছে, আরও নানারকমে help করবে। পাট আবাদ বন্ধ ক'রতে গেলেই তো তাদের সঙ্গে লাঠালাঠি হ'বে।"

"কিন্তু ভেবে দেখে শুনে ঠিক করেছ কি যে পাটের আবাদ বন্ধ করাই গ্রামবাসীর পক্ষে মঙ্গল?"

"অবশ্য, এ সম্বন্ধে কত লেখা, কত বক্তৃতা হ'য়ে গেছে, এ সম্বন্ধে কি আর ভাববার কিছু বাকী আছে?"

"অনেক আছে। মোটের উপর এই বলা যেতে পারে যে, তোমরা যদি পাটের আবাদ সত্যি বন্ধ করতে পার, তবে দেশের লোকে না খেয়ে মরবে।"

হাসিয়া নিত্যরঞ্জন কহিল, "এ তোমায় কেতাবে পড়া Economics, Chamber of Commerceএর ধার করা বুলি—লোকে কি পাট খায় না ধান খায়?"

"চুলোয় যাক, তা নিয়ে তর্ক করে কি হ'বে? তোমরা তো আর তা করছো না, কোনও দিন করে উঠতে পারবেও না। হাঁ, তা যে পর্য্যন্ত তোমাদের programme ঠিক না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমার volunteerরা করবে কি? এখন তারা কি করছে?"

"এখন তারা meeting organise করছে, recruit করছে, প্রোসেসন, গান এই সব করছে; আর অবসর সময়ে চরকায় সুতো কাটছে।"

"সুখী হলাম। যাই ভাই, তোমার কাজে আর ব্যাঘাত করবো না।"

নিত্যরঞ্জন বলিল, "আচ্ছা ভাই, এখন আমি বড় ব্যস্ত! দিল্লী থেকে ফিরে এসে এক সময় এ সব discuss করা যাবে তোমার সঙ্গে।"

সৌম্যেন:— হাঁ ভাল কথা, খিদিরপুরের ক্লাবের খবর কি ভাই?

নিত্য:। সে গেছে। বেটারা মাথা-ফাটাফাটি করে ভেঙ্গে দিয়েছে। ওই সব ছোটলোক মেড়ুয়া গাঁওয়ারদের দিয়ে কিছু কি হবার জো আছে।

"তা বটে" বলিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিতে করিতে সৌম্যেন চলিয়া গেল।

এই তবে নিত্যরঞ্জনের সেবাসঙ্ঘ! দেশ হইতে লুটিয়া টাকা আদায় করিয়া দলে দলে ছেলেদের পড়াশুনা ও কাজ কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া ইহারা কোনও কাজই করিতেছে না, কোনও দিন করিতে পারিবেও না। কেবল কাজের আয়োজন অনুষ্ঠান, কাগজ কলম, আফিস হিসাব, লেখা পড়া, বক্তৃতা, প্রোসেসন—দেশের সেই সব সনাতন কাজ! আর যে একটা কাজ সত্য সত্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ইহারা অশ্রদ্ধার সহিত বর্জ্জন করিয়াছে—কেন না, ওই সব ছোটলোক মেড়ুয়া গাঁওয়ারদের দিয়া কিছু হইবে না। দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি এই শ্রদ্ধা লইয়া নিত্যরঞ্জন কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে; যাদের সব চেয়ে সেবার দরকার তারাই বর্জ্জিত হইবে! তা ছাড়া সব কাজের চেয়ে বড় কাজ এই অবনত শ্রেণীদের নৈতিক অধঃপাত হইতে মুক্তি দেওয়া। এই কাজটাই নিত্যরঞ্জন করিতে নারাজ!

সৌম্যেন ঠিক বুঝিল, নিত্যরঞ্জনের কাজ কেবল দল-বাঁধায় পর্য্যবসিত হইবে। এ দলের ভিতর তার কার্য্যের ক্ষেত্র মিলিবে না। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদবিদ্যা

অধ্যাপক শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এম্-এ

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, অর্থাৎ যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বৃক্ষ, গুল্ম, লতা প্রতানাদির আকৃতি, প্রকৃতি, কার্য্য, জন্ম, মৃত্যু, বংশ-বিস্তার প্রভৃতির বিষয় জানিতে পারি, তাহা অত্যন্ত আধুনিক। উদ্ভিদ-বিদ্যা "প্রাণবিজ্ঞানের" (Biology) অন্তর্ভুক্ত। প্রাণী শব্দে আমরা যাহার 'প্রাণে' আছে তাহাকেই বুঝি। প্রাণী মাত্রেরই কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে। বর্ত্তমান উদ্ভিববিদ্যার চরম উৎকর্ষ—উদ্ভিদে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করা। প্রাচীনকালের মনীষিগণও যে উদ্ভিদে 'প্রাণের' অস্তিত্ব স্বীকার ও বিশ্বাস করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য ও প্রবাদের মধ্যে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ কেবল মনু হইতেই কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল। মনু বলিয়াছেন—'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতা'। যাহাতে প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহার একটা যে জন্ম, বৃদ্ধি, প্রসার, জরা, মৃত্যু ও আনুষঙ্গিক কার্য্যাবলীর ইতিহাস থাকিতে পারে, এবং সেই ইতিহাস যে মানুষের জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে—প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ-বিষয়ক কোন বিশেষ জ্ঞান ছিল কি না, এবং সেই জ্ঞান ব্যবহারিক কোন কার্য্যে প্রয়োগ করা হইত কি না, তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

বৃহৎসংহিতা ও অগ্নিপুরাণ এই দুইখানিই অতি পুরাতন প্রামাণিক গ্রন্থ। এই দুইখানি গ্রন্থেই 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' নামে দুইটি অধ্যায় (১) আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "সীতাধ্যক্ষ' অর্থাৎ কৃষি-বিভাগীয় অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহযোগিগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে"(২) 'গুল্মবৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' কথাটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাই হৌক, এই 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' ও 'গুল্মবৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' যে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানেই 'বৃক্ষ' কিম্বা 'গুল্মবৃক্ষ' কথার ব্যবহার হইয়াছে, সেইখানেই কেবলমাত্র গুল্ম কিম্বা বৃক্ষকেই বুঝায় নাই, পরন্তু সমস্ত উদ্ভিদজাতিকে বুঝাইয়াছে, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লইতে পারি। প্রমাণ স্বরূপ ঋগ্বেদে (৩) 'বনম্' এবং 'বৃক্ষ' একই অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উপরিউক্ত তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে অগ্নিপুরাণে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের, বৃহৎসংহিতায় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও হোরা বিজ্ঞানের বাস্তব-জীবনে ব্যবহারের, এবং অর্থশাস্ত্রে রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহাদের কোনখানিই উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তক নহে। আবার, 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' অধ্যায় বিবৃত করিতে গিয়া ইঁহারা তিনজনে ঠিক একই কথা বলেন নাই। অগ্নিপুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় বৃক্ষের রোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু অর্থশাস্ত্রে এ বিষয়ের বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। অথচ অর্থশাস্ত্র কেবল যে অতি পুরাতন প্রামাণিক গ্রন্থ তাহাই নহে, ইহাতে 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' ও 'কৃষিতন্ত্র' দুইটী বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র জ্ঞান-বিভাগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সীতাধ্যক্ষঃ কৃষিতন্ত্র গুল্মবৃক্ষায়ুর্ব্বেদতন্ত্রজ্ঞৈঃ বা সর্ব্বধান্যপুষ্পফলশাকমূল পালীক্যকৌমকার্পাসবীজানি যথাকালং গৃহ্ণীয়াৎ।"

উপরি-উদ্ধৃত বাক্যে ইহাই বুঝা যায় যে, কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারিবৃন্দকে 'কৃষিক্ষেত্র' (কৃষিবিজ্ঞান) ও "গুল্মবৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' (গুল্মবৃক্ষাদির জীবন-বিষয়ক জ্ঞান—উদ্ভিদ-বিজ্ঞান) আয়ত্ত করিতে ও তাহার ব্যবহারে অভিজ্ঞ হইতে হইত। কৃষিতন্ত্র ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ হইলেও, তাহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত ছিল। কেন না, কৃষিতন্ত্রের বিষয়ই হইতেছে, গুল্ম, ফলতাদি এবং তাহা-

(১) বৃহৎসংহিতা—৫৪ অধ্যায়; অগ্নিপুরাণ—২৮০ অধ্যায়।

(২) অর্থশাস্ত্র—২৯ অধ্যায় ২য় ভাগ)

(৩) ঋগ্বেদ—১০, ৮১, ৪।

ষের আধারস্থান মৃত্তিকা (ক্ষেত্র)। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, আধুনিক কালের কৃষিবিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর মত প্রাচীন কালের শিক্ষার্থীকেও আগে উদ্ভিদবিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইত ; নতুবা তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না।

কিন্তু অগ্নিপুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় কৃষিতন্ত্রের উল্লেখ মাত্রও নাই। এই তিনখানি সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিত পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে—উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের নিত্য-ব্যবহারিক কয়েকটী বিষয় লিপিবদ্ধ করা। এখন আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, উপরিউক্ত গ্রন্থত্রয়ের রচয়িতৃগণ বৃক্ষাদি সম্বন্ধে কতকগুলি নিত্যকরণীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান শেষ করিয়াছেন কি না ? আমরা বলিব—না, শেষ করেন নাই। এই যে তিনখানি পুস্তকে তিনটী অধ্যায় লিখিত হইয়াছে, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যখন এই গ্রন্থগুলির রচনা হইয়াছিল, তখন এমন কোন গ্রন্থ ছিল, যাহাতে বৃক্ষাদির জীবনেতিহাস সবিস্তারে লিপিবদ্ধ ছিল ; এবং যাঁহারা কৃষিতন্ত্র শিক্ষা করিতেন, তাঁহাদিগকে আধুনিক কালের মত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানও শিক্ষা করিতে হইত। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পুস্তক হয় নষ্ট হইয়াছে, আর না হয় আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

তাহা হইলে কি আমরা ইহাই বুঝিব যে, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান কেবলমাত্র কৃষি-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে উক্ত যুগে এমন কোন পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায় কি না, যাহাতে কেবলমাত্র কৃষি-বিজ্ঞান কিম্বা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বিষয়ই বলা হইয়াছে। বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টোপল বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ অধ্যায়ের টীকায় আরও তিনজন লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা, কাশ্যপ, পরাশর ও সারস্বত। আমাদের মনে হয়, ইঁহারা তিন জনেই কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কারণ 'কৃষিপরাশর' নামে কৃষিতন্ত্রের একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইঁহারা কোথাও কিন্তু কৃষি-বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞান একই অর্থে ব্যবহার করেন নাই। বরং অগ্নিপুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় বৃক্ষের রোগ ও তাহার প্রতীকার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ ও চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, 'আয়ুর্ব্বেদ' ও 'উদ্ভিদ-বিজ্ঞান' অতি নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ। ঋগ্বেদে (১০,৯৭) উদ্ভিদের ১০৭ রকম রোগ-নিবারণী শক্তির উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদেও বিভিন্ন প্রকারের বহু বৃক্ষ, লতা, গুল্ম-প্রভৃতির বর্ণনা, শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদের রোগ-নিবারণী শক্তির প্রশংসা ও উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত বেদদ্বয়ের কোথাও কৃষিকার্য্যে উদ্ভিদ বিষয়ক জ্ঞানের ব্যবহারের বিশেষ ভাবে উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এমন কি, প্রচলিত 'ঔষধ' কথাটী ফলপাকান্ত ওষধি (herbs) হইতে গৃহীত হইয়াছে। এবং 'দারু' (কাষ্ঠ) শব্দও কখন-কখনও ঔষধ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সর্ব্বোপরি, 'ভেষজ' (vegetable drugs) শব্দ হইতেই ভিষক্ (physician) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

চরকসংহিতায় (সূত্রস্থান, ১-৫১-৫৩) অতি স্পষ্টভাষায় লিখিত আছে :—"যিনি ওষধিসমূহের নাম ও আকৃতি জানেন এবং গুণকর্ম্মানুসারে তাহাদের যোগ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহাকেই ওষধির তত্ত্ববিদ্ ভিষক্ বলা যায়।"

ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন :—

"একস্য নাম প্রথিতং বহূনাম।
একস্য নামানি তথা বহূনি।
দ্রব্যস্য জাত্যাকৃতিবর্ণবীর্য্য—
রসপ্রভাবাদিষু তৈর্ভবদ্ভি॥
বহূন্যতঃ প্রাকৃত সংস্কৃতানি।
নামানি বিজ্ঞায় বহূংশ্চ পৃষ্ট্বা।
দৃষ্ট্বা চ সংস্পৃশ্য চ জাতিলিঙ্গে
বিজ্ঞাস্যিসগ্ ভেষজমাদরেণ॥

"জাতি, আকৃতি, বর্ণ, বীর্য্য প্রভাবাদি অনুসারে এক দ্রব্যের বহু নাম ও বহু দ্রব্যের এক নাম প্রথিত আছে। অতএব ভিষক্ প্রাকৃত সংস্কৃত বহু নাম জানিয়া এবং বহু লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া, স্পর্শ করিয়া এবং ভেষজের জাতি লক্ষণাদি বিবেচনা করিয়া আদর সহকারে "ভেষজবিদ্যা" আহরণ করিবেন।" এখানে আমরা 'ভেষজবিদ্যা' বলিয়া স্পষ্টভাবে উদ্ভিদ-বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। এ বিদ্যায় শুধু উদ্ভিদের গুণ ও প্রয়োগের শিক্ষাই (materia medica) দিত না, পরন্তু তাহাদের জাতি, আকৃতি, বর্ণ, ও জাতিলক্ষণাদি (Specific characters) প্রভৃতিরও শিক্ষা দিত। এই বিদ্যা আধুনিক কালের মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদিগের মত প্রাচীন কালে প্রত্যেক

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থীকেও শিক্ষা করিতে হইত। প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত উদাহরণটী দিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক জীবক, তক্ষশীলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক ভিক্ষু আত্রেয়ের নিকট অধ্যয়ন সমাপনান্তে বিদায় প্রার্থনা নিবেদন করিলে, ভিক্ষু আত্রেয় জীবকের আয়ুর্ব্বেদাধিকার পরীক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন—তুমি এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চতুর্যোজনের মধ্যে যত উদ্ভিদ আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আন এবং তাহাদের জাতি, আকৃতি নির্ণয় করিয়া প্রত্যেকের গুণ কি বল। জীবক তাহাই করিলে অধ্যাপক তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন।

আশমানী

শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালবাসার আতরদানী—
মনখানি যার আশমানী ;
—আজ করেছে উতল মোরে
আঁখির তাহার হাতছানি।
গোপন-চাওয়ার বালক শয়ন
ভাসায় আমার ভাবের ভুবন
তন্দ্রালোকের সবুজ স্বপন
চৈতী হাওয়ায় যায় হানি'
জীবন-মরণ মধুর বরণ
সুবাস ছুটায় ফুলদানি।

আলতা-রঙা পায়ের তলায়
উঠে ও পড়ে বুকখানি,
রূপ-সায়রের কমল-বনে
বিহার তাহার এই জানি।
গৌরী-চাঁপার অঙ্গবরণ
চিকণ করে চন্দ্র-কিরণ
বঙ্ক সরু কালির ভুরু
সুরের চলে রেশ টানি'
পদ্ম-পলাশ লোচন কোণে
মূর্ত্তা প্রেমের কল্যাণী।

জোৎস্নারাতের কর্ণাতলে
ভুবন-বীণায় সুর দানি'
মালকোষে গান গায় বসিয়া
উদাসিনী সেই তুফানী।
শুক্তি টুটি' মুক্তা ফুটে
প্রবাল ঘরে অধর-পুটে
কপোল ঘামে লালকরমচা—
আঁচল টুটে আঙ্গুরাণী ;
তপ-আরতি-অর্চ্চনাতে
উন্মনা হয় সাবধানী।

দেহের সীমায় স্পর্শে মিশায়
গন্ধে গানে তার বাণী ;
অনুভূতির রসের রতি
সুপন জাগে সন্ধানী।
শুনতানা সে যায় লাগিয়া—
দেওয়ানা হয় ভোর গুনিয়া
কল্পলোকের শীসমহলে
সেই-ই আমার পাটরাণী ;
—আজ করেছে উতল মোরে
আঁখির যাহার হাতছানি।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫

সুরভি পুষ্পসারের তীব্র সৌরভে সহসা সে স্থানের বাতাস আমোদিত হইয়া উঠিল। মিসেস দত্তের পারাচত কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া লীলা ও বীণা ফিরিয়া চাহিল। মিসেস দত্তের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র—কুমার গুণেন্দ্রভূষণ!

"ওমা! এই যে লীলা-বীণা! তোমরা এখানে। তোমার মা বল্লেন, তোমরা বাগানে বেড়াতে গিয়েছ! এসো গুণেন্দ্র! এদের সঙ্গে তোমার আলাপ করে দি!" মিসেস দত্ত আগাইয়া আসিয়া লীলার হাত ধরিয়া বলিলেন—"মিসেস রায়ের ছোট মেয়ে লীলা, আর এইটি বড় বীণা। এই আমার ভাইপো—বীণা, সেই যে যার কথা তোমাদের বলেছিলুম"—

কুমার গুণেন্দ্রভূষণ অত্যন্ত বিনম্রভাবে দুই পদ অগ্রসর হইয়া লীলাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন। পর মুহূর্ত্তে বীণার দিকে চাহিতেই তাহার সেই প্রখর উজ্জ্বল রূপে সহসা যেন তাঁহার নয়ন ঝলসাইয়া গেল! নমস্কার করিতে ভুলিয়া গিয়া তিনি এক মুহূর্ত্ত অপলক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

লীলা ও বীণাও দেখিল—কুমার চমৎকার সুপুরুষ! তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর—সুগঠিত দীর্ঘ আকৃতি। পরিচ্ছদ—সূক্ষ্ম, রমণীয় ও সুরুচি-সঙ্গত। দুই হস্তের অঙ্গুলীতে হীরার অঙ্গুরীয় দপ্ দপ্ জ্বলিতেছিল!

মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া কুমার বীণাকে নমস্কার করিয়া অত্যন্ত নম্রভাবে বলিলেন, "পিসীমার কাছে আপনাদের দুজনের কথা এতবার এবং এত বিশদ ভাবে শুনেছি যে, এখন আর আপনাদের সঙ্গে নূতন পরিচয় বলে মোটে মনে হচ্ছে না—"

কুমারের সেই অল্পকালের স্তব্ধ ও মুগ্ধ দৃষ্টির অর্থ বীণার বুঝিতে বাকি ছিল না। তাহার অন্তরের সমস্ত বিরক্তি সেই মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। নবীন উল্লাসে ও আবেশে তাহার চক্ষু দুটি মনোহর জ্যোতিতে জ্বলিয়া উঠিল। সে মধুর হাসিয়া একবার মিসেস দত্তের দিকে চাহিয়া বলিল, মাসিমা ছোট-বেলা থেকেই আমাদের এত ভালবাসেন, আমাদের কথা সর্ব্ব সময়েই ওঁর মুখে লেগে আছে। তবে আমাদের সম্বন্ধে ওঁর সমস্ত কথা যেন নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করবেন না; কারণ, স্নেহের আধিক্যে অনেক সময় ওঁর মাত্রা ঠিক থাকে না!

'হাঁ গো মেয়ে! তাই ত!' মিসেস দত্ত একটু প্রীতির হাসি হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের কথা আমি সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলি—নয়? আহা! কমলার সঙ্গে আমার ভাব কি আজকের! সেই ছোট বেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে খেলেছি, একসঙ্গে খেয়েছি, একসঙ্গে ঘুমিয়েছি! তার পর বিয়ে হতেই দুজনে কে কোথায় একবারে কতকালের ছাড়াছাড়ি! শেষ কত জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে আবার এখানে এসে দেখা হলো! সেই কমলার মেয়ে তোমরা—আমার কত আদরের—

বীণা মিসেস দত্তের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিল, চল মাসিমা! হলের ভিতর গিয়ে বসবে চল! এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে! অনেক রাত হয়ে গেছে।

মাসিমার উদ্দেশে বলা হইলেও বীণা কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া কথাটা বলিল।

সকলে হলের দিকে অগ্রসর হইলেন। লীলা নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিল। হলের ভিতর অত লোকের মধ্যে ও আলোর উত্তাপে তাহার যাইতে ইচ্ছা ছিল না। সকলের পশ্চাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে তাহার কাঁধের উপর কাহার হাত পড়িল।

লীলা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, কিরণ তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে!

"তোমায় বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে লীলা! এস, আমার সঙ্গে বাইরের ফাঁকা হাওয়ায় বসবে চল।"

কিরণের এই সহজ ও স্নেহপূর্ণ কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে লীলা তাহার অনুসরণ করিল।

পাশের একটি ছোট ঘরে গিয়া কিরণ এক গ্লাস সোডায় বরফ মিশাইয়া লীলার হাতে দিল। টেবিলের উপর ছোট ছোট প্লেটে মিষ্টান্নের সামান ছিল—সে একখানা প্লেট লীলার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, একটু কিছু খাও! তোমার মুখ এমন শুকিয়ে গেছে! এ ভাবে থাকলে অসুখ করবে।

এ আদর-যত্ন প্রত্যাখ্যান করিবার মত শক্তি লীলার ছিল না। সে সত্যই তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রান্ত হইয়াছিল। নীরবে গ্লাসটি শেষ করিয়া সে বলিল, তুমি কিছু খেলে না, কিরণ?

'আমার ত কিছু দরকার নেই—আমি বেশ আছি। এসো—হাওয়ায় একটু বসবে।'

বারাণ্ডায় দুইখানা চৌকি টানিয়া লইয়া দুইজনে বসিল। কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না।

লীলার হৃদয়ে একটা বেদনাময় সুখের হিল্লোল উঠিতেছিল। এখনো—এখনো—কিরণ তাহাকে কত ভালবাসে! সে তাহার অন্যায় ব্যবহারে রাগ করিয়াছে, সে তাহার নিকট হইতে অভিমান করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু—তবু তো সে তাহার প্রতি পূর্ব্বের সে স্নেহ হারায় নাই! দূরে থাকিলেও সে এখনো ত আগের মতই তাহার দিকেই দৃষ্টি সজাগ করিয়া রাখিয়াছে—তাহাকে ক্লান্ত দেখিয়া সে তাহার রাগ অভিমান সব ভুলিয়া তাহার কাছে আসিয়াছে,—সেই অতীত দিনের মতই তাহাকে খাওয়াইয়া বাতাস করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিয়াছে! লীলা শত দোষ করিলেও কিরণ এখনো তাহার সেই প্রিয়তম বন্ধু!

লীলার ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা নিঃশব্দে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল! কিরণের প্রীতি, তাহার সে অফুরন্ত ভালবাসা পাইয়া হারানো—কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট! আর কি কোন দিনই তাহাদের মধ্যে এ ব্যবধানটুকু ঘুচিয়া পূর্ব্বের সেই সহজ সরল জীবন ফিরিয়া আসিবে না?

লীলা একবার কিরণের শুষ্ক গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল! কত নিকটে—তবু—যেন সে আজ লীলার নিকট হইতে কোন সুদূরে চলিয়া গিয়াছে!

কিরণ নীচে বাগানের দিকে চাহিয়া জ্যোৎস্নার আলোয় কোমল তরুপল্লব ও কিশলয়দলের নৃত্য দেখিতেছিল। আজ তাহার মন এত অন্যমনস্ক—সে যে কখন কি করিতেছে, কিই বা সে বলিতে বা করিতে চায়,—তাহা কিছুই স্থির-চিত্তে ভাবিতে পারিতেছিল না। তাহার হৃদয় আজ একান্ত ভাবে লীলার দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু যে অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাকে আজ তাহার বলিবারই বা কি আছে? মনের ভিতর এত দিনের রুদ্ধ অনুরাগ প্রবল আবেগে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিতেছিল। সে প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল!

সহসা এক সময় কিরণ তাহার স্বপ্ন হইতে জাগিয়া লীলার দিকে চাহিল! লীলার তরুণ মুখে ক্লান্তি ও বেদনার ছায়া। তাহার বড় বড় কালো চোখ দুটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে! এলোমেলো চুলের গোছা চোখে মুখে কপালের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার ম্লান বিষণ্ণ মূর্ত্তিকেও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে!

কিরণ একবার তাহার দিকে চাহিয়াই চকিত হইয়া উঠিল! "এ কি! তুমি কাঁদছো?" সে তখনি লীলার পাশে চৌকি টানিয়া আনিয়া লীলার হাত চাপিয়া সস্নেহে বলিল, কি হয়েছে লিলি? কাঁদছো কেন?

লীলা এই স্নেহের স্পর্শটুকুর জন্য কতদিন হইতে তৃষিত হইয়া ছিল! আর সে আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না! সে হঠাৎ কিরণের দুই হাত ধরিয়া, গভীর আবেগে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বালিকার মত কাঁদিতে লাগিল!

কিরণ সব ভুলিয়া একেবারে অস্থির ও বিব্রত হইয়া উঠিল! সে তাহার রুমাল দিয়া পূর্ব্বের মত স্নেহে ও আদরে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, ছি! এমন করে কেঁদো না! চুপ কর! এখনি মাথা ধরে উঠবে যে! কি হয়েছে বল আমায়—বলবে না?

'আমি তোমার কথা শুনবো! কিন্তু তার আগে একটা কথা—শুধু একটা কথা তুমি আমায় বলে যাও—বল একবার—আমায় মাপ করলে? তুমি জান না, তুমি রাগ করে আছ বলে আমি মরে যাচ্ছি!" আবার তাহার চোখের জল অসংবরণীয় হইয়া উঠিল!

কিরণ এ কথা শুনিয়া একবার গভীর দৃষ্টিতে লীলার অশ্রুপ্লাবিত কাতর মুখের দিকে চাহিল! লীলার অন্তরের প্রচ্ছন্ন ছবি সে যেন চোখের সামনে পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পাইল! তাহার অন্তরের সমস্ত অভিমান ও রাগ সেই মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া গেল! সে তখন নিজেকে ভুলিয়া বলিয়া ফেলিল, "এই জন্যে এত কান্না? সে ত অনেক—দিন আগেই করেছি লিলি! তোমার মাপ না করে আমি নিজে থাকতে পারি কখনো?"

'বাঁচলুম! আমার বুকের ভার নেমে গেল! আমি সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও তোমার বন্ধুত্ব হারাতে চাই না! তাহলে আর আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে না তো কিরণ?'

লীলার মুখে সুখে, লজ্জায় হাসি, চোখে জল;—কিরণ কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "পাগল আর কি! তুমি কি জান না—লিলি? তোমার কাছ থেকে দূরে থেকে আমারি বা জীবনে কি সুখ আছে?" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিরণ তখনি আবার সামলাইয়া লইল। সে এ কি করিতেছে! তাহার একমাত্র বন্ধু লীলাকে যে কথা বলা যাইত, অরুণের বাগ্‌দত্তা লীলাকে তো তাহা বলা চলে না!

লীলার সর্ব্ব শরীর প্রবল শীতের তাড়নায় কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তাহার শুষ্ক মুখ ও রক্তিম চোখের দিকে চাহিয়া কিরণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল, "তোমাকে বড় খারাপ দেখাচ্ছে লিলি! তুমি কি কিছু অসুখ বোধ কোরছো? চোখ মুখ বসে গেছে যে একেবারে!"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না! কেবল সমস্ত শরীরে বড্ড কাঁপুনি ধরছে! বোধ হয় আমার অত্যন্ত ঠাণ্ডা লেগে গেছে!"

কিরণ তাহার কপালে হাত রাখিয়া দেখিল অত্যন্ত উত্তাপ! সে বলিল, "তোমার জ্বর এসেছে লিলি! এখন এখানে থাকলে তোমার অসুখ আরো বাড়তে পারে! আমি যাই, মিসেস রায়কে বলিগে—তোমার এখনি বাড়ী যাওয়া দরকার!"

'না—না—মাকে চাই না আমার! তাঁকে আর বীণাকে জানো ত তুমি? তাঁরা এখানকার শেষ আমোদটুকু পর্য্যন্ত উপভোগ না করে নড়বেন না! কারুকে চাই না—আমার —শুধু তুমি—তুমি আমার কাছে থাক! তা হলেই ভাল থাকবো আমি! তুমি এখন চলে যাবে না ত?"

'কি পাগল তুমি লিলি? তোমাকে এখানে এই অবস্থায় ফেলে বাড়ী যাব আমি? কিন্তু তোমার যে এখন একটু গরমে থাকা দরকার! আমার বড় ভয় হচ্ছে তোমার জন্যে!'

কিরণ এদিক ওদিক চাহিয়া একটা ছোট শয়নকক্ষ দেখিতে পাইল। তখন সে জোর করিয়া লীলাকে খোলা বারাণ্ডা হইতে সেই ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। নিজের গায়ের শাল খুলিয়া তাহাকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিয়া বলিল, "এইবার তুমি চুপ করে শুয়ে একটু ঘুমোও দেখি! এখন উঠলেই আবার তোমার ঠাণ্ডা লাগবে! আমি একবার মিসেস রায়কে তোমার খবরটা দিয়ে আসি!"

সে উঠিবার চেষ্টা করিতেই লীলা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, না—কিরণ! তুমি এইখানে বসো—আমায় একলা ফেলে তুমি উঠে যেও না!

সর্ব্ব শরীরে একটা অসহ্য উত্তাপ ও অবসাদে তাহাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছিল। ক্রমে প্রবল জ্বরে তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়া গেল! সে মাঝে মাঝে জ্বরের ঘোরে অসংলগ্ন প্রলাপ বকিতে লাগিল। কিরণ তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সহসা এক সময় লীলা ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল! একবার বিহ্বল ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, এই যে! তুমি রয়েছ! আমি স্বপ্ন দেখছিলুম যেন চলে গেছ তুমি! মাথাটা যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! কি বলছি—বুঝতে পাচ্ছি না! বুকে যেন একটা ব্যথা মনে হচ্ছে—নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি না! কি হলো আমার—বল ত?

কিরণ তাহাকে আবার বিছানায় শোয়াইয়া দিল; বলিল, একটু ঘুমিয়ে পড় ত! ঠাণ্ডা লেগে তোমার জ্বর হয়েছে বলে ওরকম মনে হচ্ছে! ঘুম হলেই ওসব সেরে যাবে!

'তুমি চলে যাবে না ত? বল—তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোই। বুকে কেমন একটা ব্যথা মনে হচ্ছে! নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি না! আমায় ফেলে চলে যেও না কিরণ!'

'কোথায় যাব লিলি? তোমায় ফেলে কি আমি যেতে পারি? তুমি ঘুমোও—আমি এখানেই বসে আছি।'

'আর একটা কথা—শুধু একটা—এই কথাটা বলেই আমি ঘুমিয়ে পড়বো! তুমি বিশ্বাস কর কিরণ, আমি ইচ্ছে করে অরুণকে ঠকাতে চাই নি—উদ্দেশ্য আমার যা ছিল—হঠাৎ অন্য রকম হয়ে গেল! আমি সত্যই প্রতারক, ঠক নই—কিরণ—এইটা শুধু তুমি—'

তীব্র বেদনা ও আত্মগ্লানিতে কিরণের মুখ কালি হইয়া গেল! সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "মাপ করো লিলি! মাপ করো আমাকে! আমি যা বলেছি, সে সব ভুলে যাও। তুমি জান না—কি যন্ত্রণাই আমি পেয়েছি সেদিন! রাগে তখন যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলুম! না হলে তোমাকে এত বড় অন্যায় কথা বলতে পারি কখনো?"

লীলা আর কিছু বলিল না। শান্তি ও তৃপ্তির হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল! সে কিরণের হাত ধরিয়া ছোট শিশুর মতই নির্ভরের আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িল।

কিরণ নিজের মনের সুখ শান্তি সব হারাইয়া, উদ্বিগ্ন চিত্তে লীলার অচৈতন্য মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। লীলার এই কঠিন রোগের অবস্থা দেখিয়া ও তাহার কাতরতা দেখিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে চাহিতেছিল। তাহার নির্ম্মম ব্যবহারে লীলা মর্ম্মে মর্ম্মে কি আঘাত পাইয়াছে। আজ এক মাস হইতে সে মনের ভিতর যে উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করিতেছে, হয় ত বা তাহাই তাহার এই বিষম রোগের কারণ! নিজের প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঈর্ষার জ্বালার কথা ভাবিয়া কিরণ মর্ম্মাহত হৃদয়ে নিজেকে ধিক্কার দিতেছিল—সে নিজেই কি অবশেষে তাহার লীলার মৃত্যুর কারণ হইল!

কিন্তু সমস্ত উদ্বেগ ও ভাবনার মধ্যেও একটা অতি অস্পষ্ট—অতি সূক্ষ্ম আনন্দের তড়িৎরেখা যেন তাহার সর্ব্ব শরীরের ভিতর বহিয়া যাইতেছিল। আজ সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে—লীলা একান্ত মনে তাহার নিজের অজ্ঞাতে তাহাকেই ভালবাসে। অরুণের প্রতি তাহার যে ভাব—যাহা সে নিজে ভালবাসা বলিয়া জানে, তাহা কেবল করুণা ও সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যে তাহার হাত ধরিয়া একান্ত নির্ভর ও বিশ্বাসের উপরে নিশ্চিন্ত মনে লীলা ঘুমাইতেছে, এ বিশ্বস্ত ভাব—এ নির্ভর কি সে কিরণ ছাড়া আর কাহারও প্রতি করিতে পারিত? অচৈতন্য লীলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কিরণ সংশয় ও সুখের মধ্যে দোল খাইতে লাগিল।

২৮

অকস্মাৎ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে অসিতকে দেখিয়া নির্ম্মলা অত্যন্ত চকিত ও বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন এত বাড়িয়া উঠিল—যেন তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে।

অসিত নিজেও কম আশ্চর্য্য হয় নাই। এখানে এমন ভাবে নির্ম্মলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে, এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেও কিছুক্ষণ নির্ম্মলার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার বলিল, আপনি হঠাৎ আমায় এখানে দেখে খুব অবাক্ হয়ে গেছেন দেখছি! তা—আমাদের দিন তো এই রকম পথে পথেই চিরকাল কেটে আসছে! বলিয়া সে ঈষৎ হাসিল!

নির্ম্মলা তখনো প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই, তবু সে নিজেকে কতকটা সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু আপনাকে বড় রোগা ও দুর্ব্বল বলে মনে হচ্ছে! এত দিন এখানে ছিলেন না বুঝি? আমরা আপনাদের সেই ঠিকানায় অনেকবার আপনাদের খোঁজ করেছিলুম!

সেই লজ্জাকম্পিত মধুর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া অসিত কিছুক্ষণ নির্ম্মলার রক্তিম সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। বহু দিন পূর্ব্বের এক প্রভাতের চিত্র ধীরে ধীরে তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিতেছিল। সেদিনের সেই মধুর প্রভাত—চারিদিকে সোনার আলো,—আর সেই বিজন প্রান্তরে ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে নির্ম্মলার যন্ত্রণা-কাতর করুণ সুন্দর মুখ যেন তাহার বলিষ্ঠ সবল চিত্তে কোন মায়ালোকের স্বপ্নজাল বুনিতে লাগিল।

নির্ম্মলা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিল, আপনার সেই বন্ধুটি? সেই যে সেদিন যাঁকে দেখেছিলুম, তিনি কোথায়? ভাল আছেন ত?

এই প্রশ্নে অসিত তাহার জাগ্রত স্বপ্ন হইতে চমকিয়া সচেতন হইয়া উঠিল, বলিল, ও, পরেশের কথা বলছেন? সে ভাল আছে। আমরা দুজনেই এখানে ছিলুম না ত! আপনাদের সঙ্গে যেদিন দেখা হয়, তার পরদিনই আমরা বিশেষ কাজে পাঞ্জাবে চলে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে

তিন চার দিন আগে এসেছি। দানাপুরে একটা কাজ ছিল, সেটা সেরে আসতে আসতে পথে জ্বর হয়ে পড়ে, একটা ভাঙ্গা শিবমন্দিরে পড়ে থাকতে হয়েছিল। তার পরে আজ সকালে উঠে দেখি—সর্ব্ব প্রথম কিছু আহার্য্যের বন্দোবস্ত দরকার—না হলে শরীর আর বইছে না। এই বাড়ীটা সামনে দেখে তাই—বলিয়া সে একটু হাসিয়া আবার বলিল—অবশ্য আপনাকে যে এখানে দেখতে পাব, এ আশা কখনো করি নি—

নির্ম্মলাকে কে যেন চাবুক মারিল! সে সহসা অসিতকে দেখিয়া এমন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল যে, বিহারী তাহাকে কি বলিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে, সে কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে! লজ্জায় ও অনুতাপে সে মরমে মরিয়া গেল! বলিল, দেখুন ত,—আমার কি অন্যায়—আপনার চুলিন খাওয়া হয় নি, আর আমি কি না দাঁড়িয়ে গল্প করছি! আপনি একটু বসুন—আমি এখনি আসছি!

সে দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই অসিত বলিয়া উঠিল, কিন্তু একটা কথা আগে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে;—'আমার বেশি দেরী হবে না—এখনি আসছি' বলিয়া সে অসিতকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া চঞ্চল চরণে বাহির হইয়া গেল।

মিনিট দশ পরে এক থালা খাবার সাজাইয়া নির্ম্মলা ফিরিয়া আসিল। সে থালাখানি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া এক গ্লাস গরম দুধ অসিতের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, "এই দুধটা আগে খেয়ে ফেলুন! বেশ গরম আছে।"

অসিত একবার খাদ্যপূর্ণ থালাখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিল, পরে হাসিয়া বলিল, আয়োজনটা মন্দ করেন নি, দেখছি! এতে আমার একটা দিন বেশ কেটে যেতে পারে! কিন্তু একটা কথা আছে—বাড়ীটা কার? আপনিই বা এখানে কোথা থেকে এলেন—কিছুই বুঝতে পারছি না ত?

'এই কথার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এ বাড়ী আমাদেরই! আপনি খেতে বসুন! আমি উপর থেকে বাবাকে ডেকে আনছি।'

অসিতের মুখ এক মুহূর্ত্তে গুরুগম্ভীর হইয়া উঠিল! সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল, এটা আপনাদের—অর্থাৎ মিঃ ঘোষের বাড়ী?

নির্ম্মলা সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সে বলিল, আপনি এত কি ভাবছেন? অন্য কারুর বাড়ীতে আপনাকে আমরা অভ্যর্থনা করছি না! এ বাগানবাড়ীটা বাবা কিছু দিন আগে কিনেছেন! সেদিন এইখানে আসতে গিয়েই ত—

তা হলে আমাকে মাপ করবেন! এখানে আমি আতিথ্য স্বীকার করতে অপারগ! বলিয়া চৌকি ছাড়িয়া গম্ভীর মুখে অসিত উঠিয়া দাঁড়াইল!

নির্ম্মল বিবর্ণ-মুখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল! কিসে যে কি হইয়া গেল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

অসিত আর কোন কথা না বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল! সে সত্যই চলিয়া যায় দেখিয়া, নির্ম্মলা আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'একটু দাঁড়ান, অসিত বাবু! চলে যাবেন না—আপনি যে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন! এই অসুস্থ শরীরে না খেয়ে আবার কোথায় যাচ্ছেন? একটু কিছু খেয়ে যান্!'

অসিত যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, অসম্ভব! আপনাদের এখানে আতিথ্য গ্রহণ আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব! বৃথা আপনাকে কষ্ট দিলুম! মাপ করবেন!

নির্ম্মলার উদ্যত হস্ত হইতে দুগ্ধপূর্ণ কাঁচের গ্লাস পড়িয়া গিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে চুরমার হইয়া গেল।

অসিত আর দাঁড়াইল না। একবার নির্ম্মলার রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—পরক্ষণে ঝড়ের মত গৃহ হইতে বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

চন্দননগরের সেবা-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান

শ্রীহরিহর শেঠ

কাহারও সেবাধর্ম্মের কথা ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে; সুতরাং চন্দননগরের অধিবাসীদিগের এ সম্বন্ধে ঠিক-মত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর না হইলেও, এখানকার কেবল বহু প্রাচীন সুবৃহৎ মন্দিরাদি ও গঙ্গাতীরের সুবৃহৎ জীর্ণ স্নানের ঘাটগুলি দেখিলেও মনে হয়, পূর্ব্বে এখানকার অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিলেন। এখানে এখনও সর্ব্বপ্রকার মন্দিরাদির সংখ্যা দেড় শতাধিক এবং সাধারণ স্নানের ঘাটের সংখ্যা কিছু কম প্রায় অর্দ্ধশত।

মেজর জেনারেল ক্লড্ মার্টিন

অর্থশালী বলিয়া যাঁহারা পূর্ব্বকালে পরিচিত ছিলেন, তন্মধ্যে অনেকের অতিথিশালা ও সদাব্রতাদির প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া মনে হয়, সেবাধর্ম্মের প্রতিও সামর্থ্যবান লোকের আস্থা ছিল। এই প্রবন্ধে সেই সকল এবং অন্যান্য চিকিৎসা ও দুস্থ আতুর ও অনাথ বালক-বালিকাদের সাহায্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের কথা যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সেই সম্বন্ধে পরিচয় মাত্র দিব।

চন্দননগরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যে সেবাশ্রমের কথা জানিতে পারা যায়, তাহা ফরাসী জেসুইট্ কাদারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম। এই জেসুইট্রা ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় একশত বৎসর কাল এখানে পল্লী-যাজকের কার্য্য করিয়াছিলেন। (১) মেটো রিপা (Abbate D. Matteo Ripa) ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে যখন চন্দন-নগরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি দুইজন জেসুইট্ কাদারের তত্ত্বাবধানে একটি ভজনালয় ও একটি আশ্রম (hospice) দেখিয়াছিলেন। তখন এখানে, ক্যাপুচীন্ (Capuchin) নামক রোমান্ ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মযাজকদিগেরও একটি আশ্রম ছিল। উহার তত্ত্বাবধারক ছিলেন Father Fra Felice da Moulacchid ও Father Fra Giovanni da Fans। বর্ত্তমান কনভেণ্ট্ বাটীটিতেই এই শেষোক্ত আশ্রম ছিল বলিয়া লেখক অনুমান করেন। (২)

আগরার খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাজকদিগের (Vicar Apostolic at Agra) অন্তর্ভুক্ত ইটালীর ক্যাপুচীন্ সম্প্রদায়ের তিব্বত মিশনের লোকেদের দ্বারা বর্ত্তমান গঙ্গার ধারে (Situe sur le ghat) প্রতিষ্ঠিত পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালক-বালিকাদের জন্য যে আশ্রমের (hospice des enfants trouves) কথা জানা যায় (৩) উহাই সম্ভবতঃ রিপার দৃষ্ট আশ্রম। উহা কুড়ান শিশু রক্ষার আশ্রম (foundling hospital) বলিয়াও উল্লিখিত আছে।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ফরাসী জেসুইট্দের আর একটি হাসপাতাল এবং অনাথাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। (৪) এই হাসপাতালে সময় সময় তিনশত রোগীর স্থান হইত্

(১) Bengal District Gazetteers—Hughly.

(২) Abbate D. Matteo Ripa in Calcutta in 1709. —Bengal Past and Present, Vol.—VIII

(৩) Echoes from old Chandernagore—Bengal Past and Present, Vol.—II.

(৪) Bengal District Gazetteers—Hughly.

এবং আশ্রমে দারিদ্র্যক্লিষ্ট পিতামাতা কর্তৃক বিক্রীত ১০৫টি বালিকা ছিল। তাহারা তথায় ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। উক্ত হাসপাতালের নাম ছিল হস্‌পিটাল্ ন্যাসন্যাল্ (Hospital National) (৫)। এই সুবৃহৎ হাসপাতালটি ঠিক কোন্ স্থানে ছিল, তাহা জানা যায় না। অনুমান হয়, লালদীঘির উত্তরে বর্তমান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, যাহা এখানে স্ত্রু-দে-বেনারস্ নামে অভিহিত, তাহার উত্তর পার্শ্বে হাসপাতালের মাঠে যেখানে পূর্বে জেসুইট্ পাদ্রীদের গির্জ্জা ও বাড়ী ছিল তাহার নিকটেই উহা ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে হাসপাতাল বলিয়া যে উল্লেখ পাওয়া যায়, উহাই জেসুইট্-দিগের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল হইতে পারে। এই নক্সা দৃষ্টে বর্তমান হাসপাতালের দক্ষিণাংশে কোম্পানির হাসপাতাল বলিয়া আর একটি চিকিৎসাগার ছিল বুঝা যায়।

এতদ্ব্যতীত যে কয়টি দরিদ্রের আশ্রমাদির কথা বলা হইল, তাহা সবই খৃষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত। চিকিৎসালয়গুলি জাতি-ধর্ম-নির্ব্বিশেষে সাধারণের জন্য হইলেও, আশ্রমগুলি সম্ভবতঃ খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে সময় স্থানীয় লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

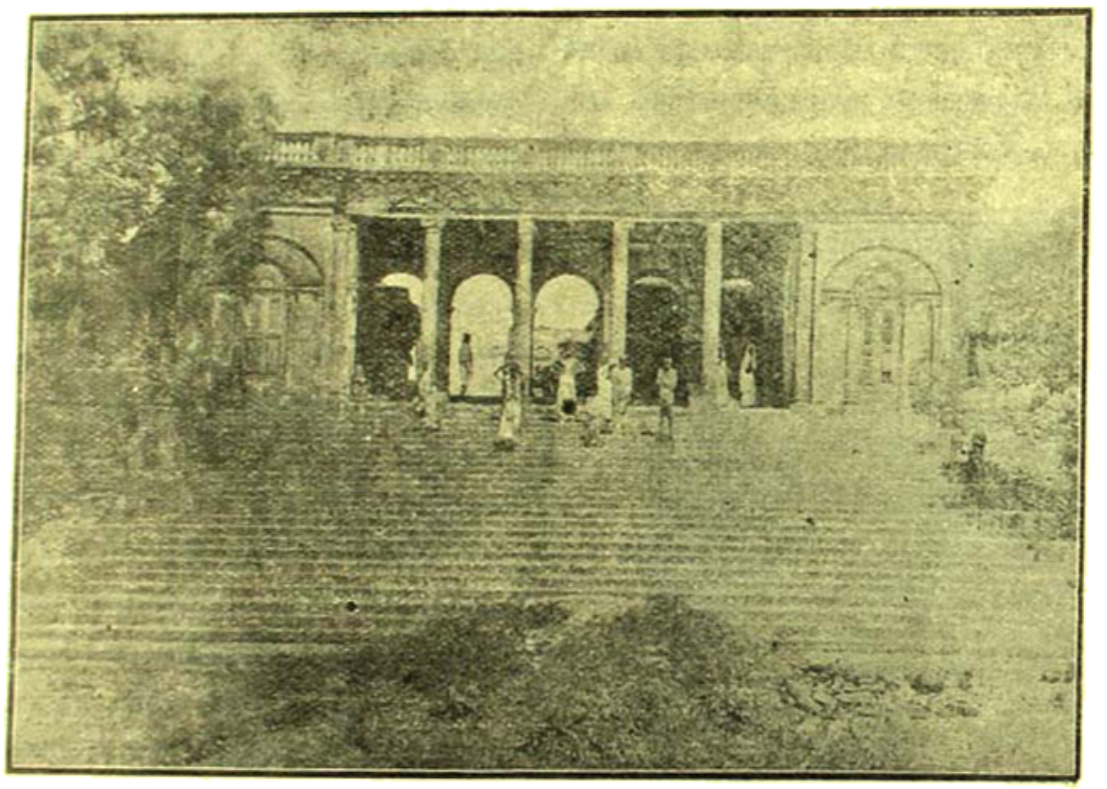

নিমাই তীর্থের ঘাট—বৈদ্যবাটী

আর্মাঁতুর্গ দখল করিবার পর তদানীন্তন গভর্ণর মসিয়ে রেনো (Mons Renante) কর্তৃক উক্ত গির্জ্জা ও বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় (৬) এবং তাহার ফলে ও যুদ্ধের পরিণামে তাঁহাদের স্থানান্তরিত হইতে হয়, সেই সময় হাসপাতালটি সম্ভবতঃ বন্ধ হয়। আর্মাঁতুর্গের নক্সায় গোরস্থানের পশ্চিমে বর্তমান স্ত্রু-দে-বিবিরহাটের পূর্ব্ব দিকে দরিদ্রদিগের এইরূপ কোন আশ্রম ছিল বলিয়া জানা যায় না। তখন স্থানীয় দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি — ওলন্দাজ কোম্পানির দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দুইটি অতিথিশালা ছিল বলিয়া শুনা যায়। প্রথমোক্তটি গোন্দলপাড়ায়, দ্বিতীয়টি কালীতলায় নন্দদুলালের মন্দির-সংলগ্ন ছিল। ইন্দ্রনারায়ণ ১১৪৬ সালে উহা স্থাপন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, উহাতে প্রত্যহ যত লোকই আসুন, কাহাকেও অভুক্ত অবস্থায় ফিরিতে হইত না। এই অতিথিশালা উপলক্ষ করিয়া ইন্দ্রনারায়ণ কিছুকাল

(৫) Echoes from Chandernagore—Bengal Past and Present, Vol—II.

(৬) Bengal District Gazetteers—Hughly

সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, এক চর্ম্মকার জাতীয়া স্ত্রীলোক নিজেকে ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া কিছুকাল তথায় দাসীর কার্য্য করিয়াছিল। অজ্ঞতা-বশতঃ তাহার স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করায় অপরাধে তাঁহার এই বিড়ম্বনা ভোগ ঘটিয়াছিল। (৭) তৎকালে কেহ-কেহ এই স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে তাঁহার প্রতি চরিত্রগত অপবাদও দিয়াছিলেন। (৮)

ইহার পর প্রায় দেড় শত বৎসর হইল গোন্দলপাড়ার শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালাও খুব সুব্যবস্থা-

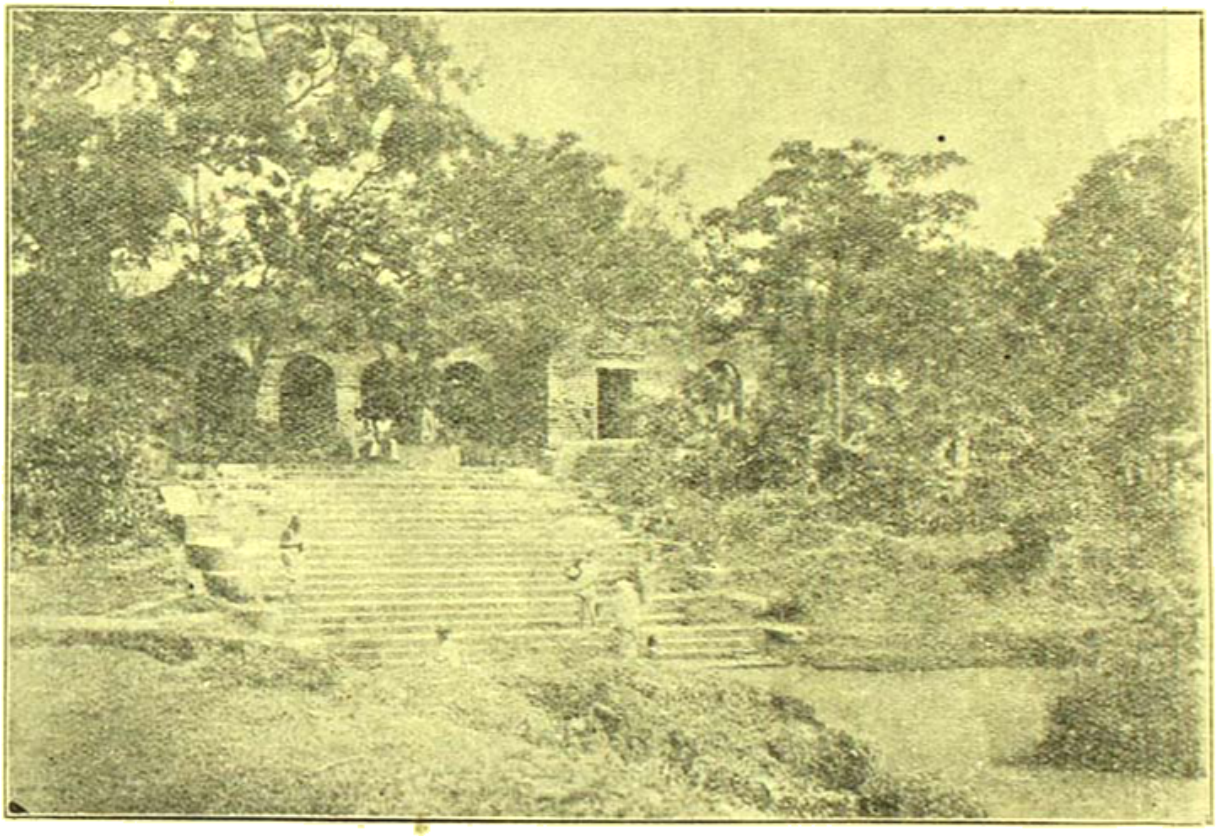

কাশীনাথ কুণ্ডুর ঘাট

সম্পন্ন ছিল। কেহ ইচ্ছা করিলে সেখানে কিছু দিনের জন্য আশ্রয় পাইত এবং আবশ্যক মত চিকিৎসাদিরও তথায় ব্যবস্থা ছিল। আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন ব্যক্তিকেও শিবুবাবু যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। (৯)

প্রসিদ্ধ দেশ-বিধ্বংসি ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পর দেশের অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় হয়, তখন অনেকে পেটের দায়ে নিজ নিজ সম্মানদের পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছিল। ঐ সকল শিশুদের জন্য ইটালীর সন্ন্যাসীগণ এখানে একটি আশ্রম এবং চন্দ্র দরিদ্রদের জন্য আর একটি আশ্রয় স্থান (asylum) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ফ্রাপুশিনদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত উহার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত একটি দরিদ্রাবাস বা অন্নসত্র (Alms-house) ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০] উহা ইংরাজি ১৮৩০ সালেও বর্ত্তমান ছিল। (১০)

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এখানে বিশিষ্ট ধনবানদের মধ্যে অনেকের গৃহে নিত্য অতিথি-সেবা বা সদাব্রতের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বৃদ্ধদের নিকট শুনিতে পাই। তন্মধ্যে যাদবেন্দু ঘোষ, প্রেমনারায়ণ বসু, ভগবান চন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাদের দেব-সেবার সহিত যে অতিথিশালা ছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। ইহাঁরা সকলেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া এখনও লোকে

(৭) ৺ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, আষাঢ় ১৩২৯ সাল।

(৮) ৺ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, মাঘ ১৩২৮ সাল।

(৯) শিবুবাবু—বিবরণ ৩য় খণ্ড।

(১০) Echoes from old Chandernagore—Bengal Past and Present, Vol.—II.

নাম করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে সব দেব-মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, শিবুবাবু ও কাশীনাথ কুণ্ডু ভাগীরথীতীরে যে সকল বড় বড় সুন্দর স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কালের নিষ্ঠুরে তাহা ক্রমে জীর্ণ হইয়া গেলেও, তাহা আজিও তাঁহাদের "পুণ্য" নামের সহিত বিজড়িত। বৈদ্যবাটীর সুপ্রসিদ্ধ নিমাইতীর্থের সুবিস্তৃত ঘাটটীও কাশীনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দ্বারকানাথ শীল, ভুবনচন্দ্র গুড়, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ভীরস্থ করিবার ঘর এবং দত্তের ঘাটের উপর ভূকৈলাসের রাণী তারাসুন্দরীর দ্বারা ১২৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ও চৌধুরী ঘাটের উপর শ্রীযুত শ্যামাচরণ রক্ষিত মহাশয় দ্বারা ইং ১৯২১ সালে নির্ম্মিত হইয়া তদীয় পিতৃদেবের নামে উৎসৃষ্ট বিশ্রাম-কক্ষ ও সুদৃশ্য চাঁদনী উল্লেখযোগ্য। সবদাহের জন্য এখানে দুইটি স্থান আছে, একটি বোড়াই চণ্ডীতলায় ও একটি গোন্দলপাড়ায়। এই স্থানের গৃহ-প্রাচীরাদি যাহা আছে, তাহা যথাক্রমে মিউনিসিপ্যালিটি ও

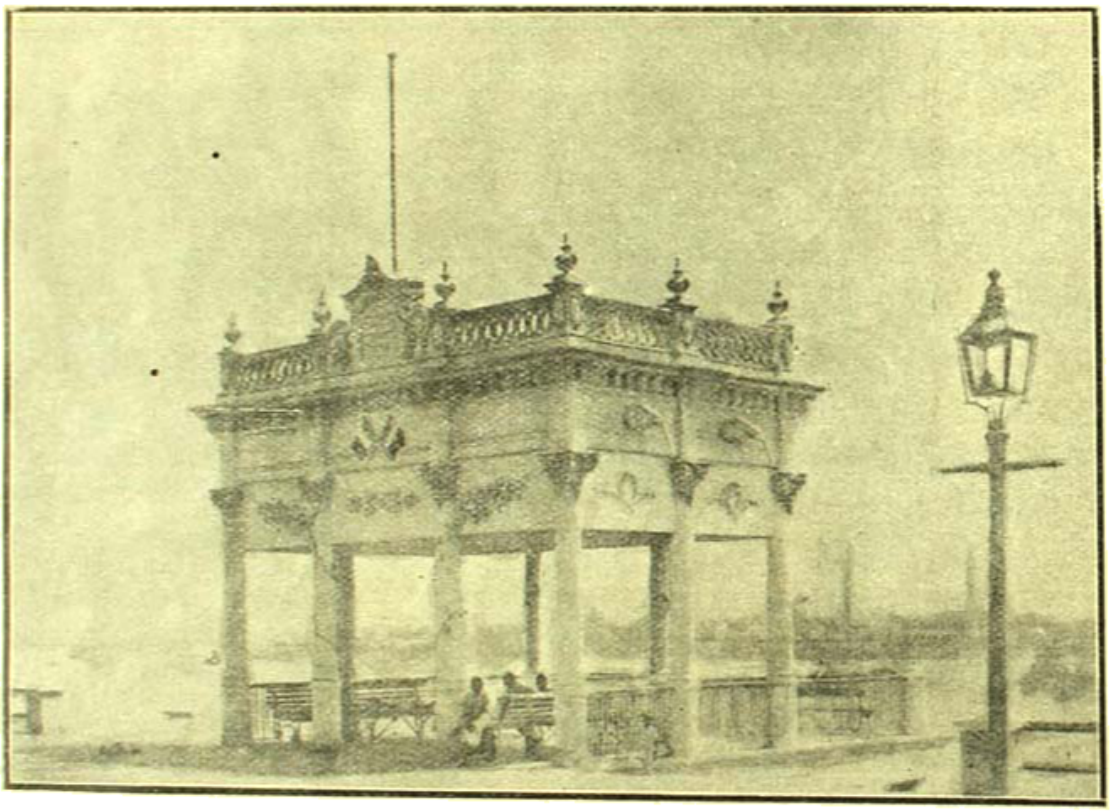

চৌধুরী ঘাটের উপরের চাঁদনি

এখানে অন্যান্য ঘাট প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কানাই সরকার, বৈকুণ্ঠ মুন্সী, কাশীনাথ শ্রীমানী, চাঁদখানসামা, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এবং দত্তের ঘাট, বিনোদতলার ঘাট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কনভেন্টের ঘাটটি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক, চন্দননগরে গঙ্গাযাত্রীদের তীরস্থের জন্য ও লোকের বিশ্রাম বা স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য কতিপয় গৃহ ও সুন্দর চাঁদনী আছে। তন্মধ্যে কাশীনাথ কুণ্ডু, স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা নির্ম্মিত। এখানে মুসলমানদের গোর দিবার জন্য দুইটি এবং সাহেবদের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। সাহেবদের গোরস্থানটি অতি প্রাচীন এবং এখানে অনেক খ্যাতনামা লোকের গোর আছে।

উপস্থিত এখানে প্রকৃত অতিথিশালা বলিতে একটিও নাই। কেবল পালপাড়ার দে মহাশয়দিগের একটি সদাব্রত আছে। তাঁহাদের শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর ঠাকুর-

বাড়ীতে মধ্যাহ্নে সমাগত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিদের ভোজনের ব্যবস্থা আছে। জগন্নাথ মল্লিক মহাশয় দ্বারা ইহা স্থাপিত।

দুস্থ ও আতুরদের সাহায্যের জন্য বর্ত্তমানে এখানে যে সব প্রতিষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে কমিতে দে বিয়ে ফেসান্ (Comite de Bien faisance) প্রধান ও পুরাতন।

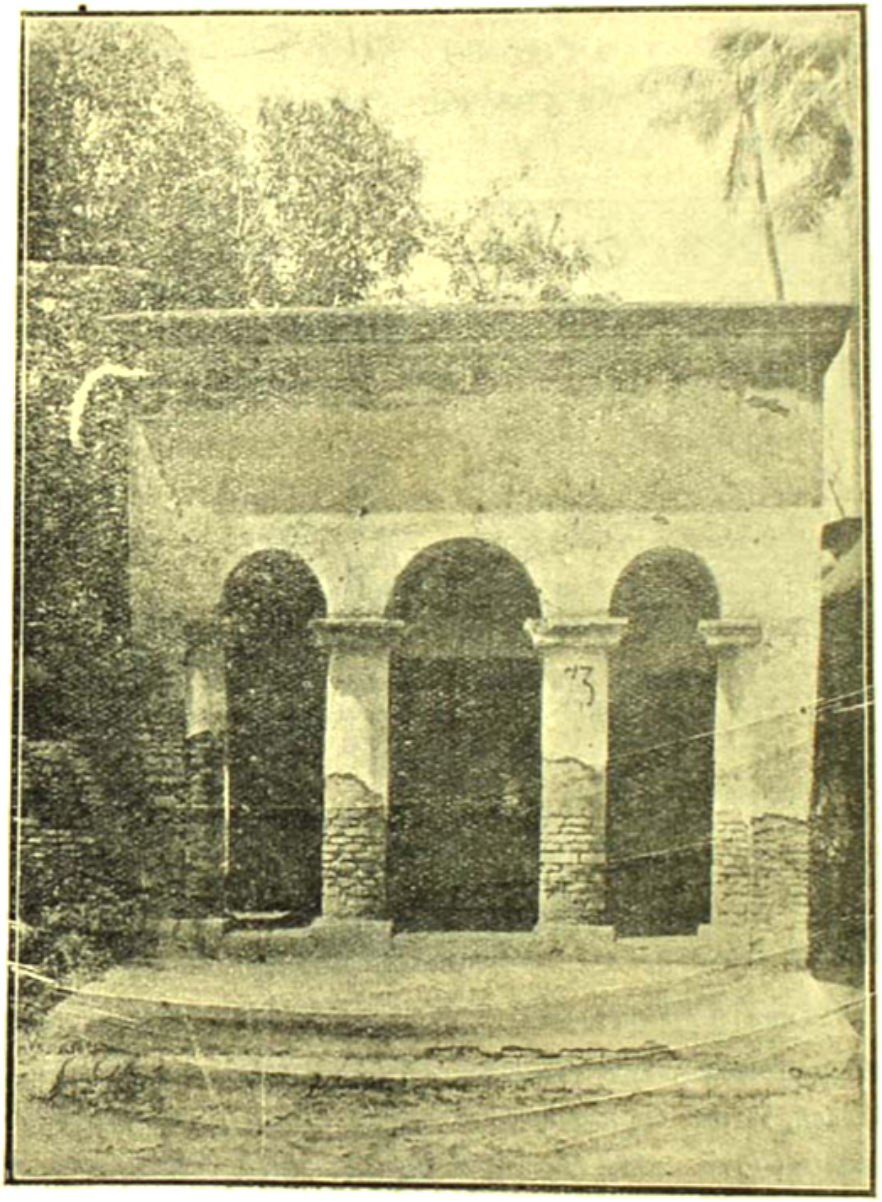

বিনোদতলার ঘাট

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভারতের গভর্ণরের প্রবর্ত্তিত আইন (arrete) অনুসারে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে দুস্থদের সাহায্য, সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া, বন্যায় ঘর নষ্ট হইলে কর্জ্জ দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য ছিল। গভর্ণর বাহাদুর এই কমিটির সভ্য মনোনয়ন করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতেই একজন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেন। উহার প্রথম সভাপতির নাম মসিয়ে নিয়েল্ (Mons Niel)। ইংরাজি ১৯০৭ সাল হইতে ন্যায় সভাপতি, গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ৪ জন সভ্য এবং মিউনিসিপ্যাল সভার একজন সভ্য লইয়া কমিটি গঠিত হয়।

১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত সরকারি হাসপাতালটি এই কমিটির অধীন ছিল। তখন মোট আয় বৎসরে প্রায় দশ সহস্র টাকা ছিল। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট পাঁচ হাজার ও মিউনিসিপ্যালিটি আড়াই হাজার দিতেন, এবং কতিপয় দাতার প্রদত্ত টাকার সুদ ও ঔষধ বিক্রয় দ্বারা বাকী টাকা পাওয়া যাইত।

হাসপাতালটি হস্তান্তরিত হওয়ার সহিত ইহার আয়ও কমিয়া এক্ষণে মাত্র দুই হাজার টাকা হইয়াছে। তন্মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির বাৎসরিক দান দেড় হাজার টাকা ও দাতাদের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতে বৎসরে ১৫০০ ফ্রাঙ্ক পাওয়া যায়। কার্য্যের মধ্যে আয় অনুযায়ী স্থানীয় দুস্থদিগকে সাহায্য করা হয় মাত্র। বর্ত্তমানে মোট ৫।১৬ জন লোক মাসিক ১৩২৲ টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমানে যে সরকারি হাসপাতাল আছে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সেনাবাসের একটি কক্ষে একটি সামান্য হাসপাতাল ছিল। উহা কতকটা বাহিরের সমাগত রোগীদের চিকিৎসাগারের (Out-door dispensary) মত ছিল। ডাক্তার মারগ্যা দ্বারা কতিপয় মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে বর্ত্তমান হাসপাতালটির সৃষ্টি হয়। ইং ১৮৭১ সালে মরতিমের লেকোলিয়ের (Mortimer Lecoler) আলফ্রেড্ কুর্জন (Alfred Courjon) ও পরে লুই জোয়াকীম (Louis Joakim) যথাক্রমে ৮০০০৲, ৪০০০৲ ও

১১০০০৲ টাকা হাসপাতাল ও কমিটে দে বিয়ে ফেসাদের জন্য এবং লেকোলিয়ে সাহেব তাঁহার বড়বাজারের একটি বাড়ী হাসপাতালের জন্য দান করেন। সাধারণের নিকট হইতেও টাকা তোলা হয়। গোবরডাঙ্গা নিবাসী ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছয় শত টাকা দিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ ৩০০০০ ড্রাফ্ট দিয়াছিলেন।

ইংরাজি ১৮৭৮ সালে ভাড়াটে বাড়ীতে প্রথমে হাসপাতালের কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপরে উল্লিখিত দানের টাকা ও লেকোলিয়ে সাহেবের বাটী বিক্রীর টাকাতে বর্ত্তমান

অনেকে ইহাকে রাণী রাসমণির বাড়ী বলিয়া থাকেন। বাটীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ ও পূজার দালান প্রভৃতি দেখিয়া এ কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। বোধ হয় প্রথমে উহা উক্ত রাণীর সম্পত্তিই ছিল। বাটীর পরবর্ত্তী অধিকারী ঋণগ্রস্ত হইয়া উহা বন্ধক দেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হরলাল দত্ত ও চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম ১২১০০৲ টাকায় এই বন্ধকি কওলা খরিদ করেন। তৎপরে হাসপাতালের জন্য উক্ত কমিটির হইয়া হরলাল বাবু, মরগ্যা সাহেব ও মসিয়ে চিরোল (M. Chirol) নীলামে উহা খরিদ করেন।

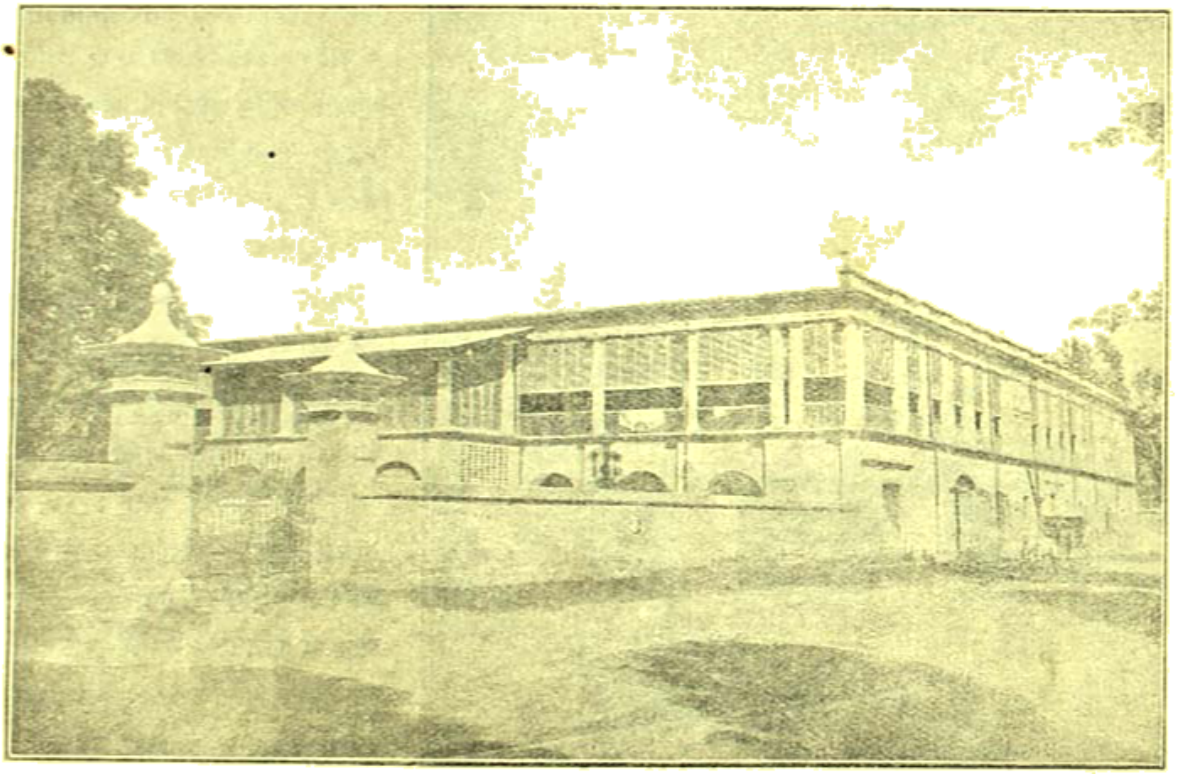

সরকারী হাসপাতাল

হাসপাতালের বাটীটি খরিদ করিয়া উহাকে হাসপাতালের আবশ্যকোপযোগী ভাবে সংস্কৃত করিয়া লওয়া হইলে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই নূতন বাটীতে হাসপাতাল উঠিয়া আইসে। (১১) সরকারি কাগজপত্রে জানা যায়, এই বাড়ীটি মাডাম্ সেনোর (Madame Chenaux) বাড়ী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু ইহাতে খরচা সমেত মোট ১৪৫০০৲ টাকা ব্যয় হয়। হরলাল বাবু সময় সময় এই হাসপাতালে অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া সহায়তা করিয়াছেন। স্থানীয় ডাক্তারদের মধ্যে ক্ষীরোদচন্দ্র পালিত মহাশয়ও কোন কোন সময় এখানে কার্য্য করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি উভয়ের প্রদত্ত মোট ৬০০০৲ টাকায় প্রধানতঃ এতাবৎ হাসপাতাল চলিতেছিল এবং গভর্ণমেণ্ট একজন ডাক্তার দিতেন। উহা ম্যায়রের সভাপতিত্বে পূর্ব্বোক্ত কমিটে দে বিয়ে ফেসাদ্ সভার

(১১) কাগজ পত্রে ১৮৮২ লেখা আছে, কিন্তু হাসপাতালের প্রবেশ দ্বারে প্রস্তর ফলকে "১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং চিতকাটি সমিতি দ্বারা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মেট্ কোম্পেরের কৃপাদিনে সমর্পিত"—লেখা আছে।

কর্তৃত্বাধীন ছিল এবং সাধারণতঃ উহাকে উহার প্রতিষ্ঠাতা মারগ্যা সাহেবের নামে মারগ্যা হাসপাতাল বলিত। ১৮২৫এর ১লা জানুয়ারি হইতে উহার ভার গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে লইয়াছেন এবং উহার নাম হইয়াছে হস্‌পিট্যাল্ কন্‌ভ্যেলিস্যাণ্ট্। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট এই হাসপাতালে বৎসরে চৌদ্দ হাজার টাকা ও দুইজন চিকিৎসকের বেতন দিবেন স্থির হইয়াছে। উপস্থিত এখানে মোট ৩৬টি রোগী থাকিবার স্থান আছে। সমাগত রোগীদের চিকিৎসায় যে ব্যয় হয়, তন্মধ্যে স্থানীয় লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা ও চন্দননগরে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দরিদ্রদের দান করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, ইহা তাহারই অংশ। এই টাকা কলিকাতার এড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেল অব্ বেঙ্গলের অফিসে জমা আছে। এখানকার গির্জ্জার যখন যিনি পাদ্রি থাকেন, তখন তিনি উল্লিখিত টাকার মধ্যে ৫০০০৲ টাকার সুদ উক্ত অফিস হইতে পাইয়া থাকেন এবং গির্জ্জার সম্মুখে প্রতি রবিবারে গরীব দুঃখীদের উহা দান করা হইয়া থাকে। কলিকাতার ও লক্ষ্ণৌএর

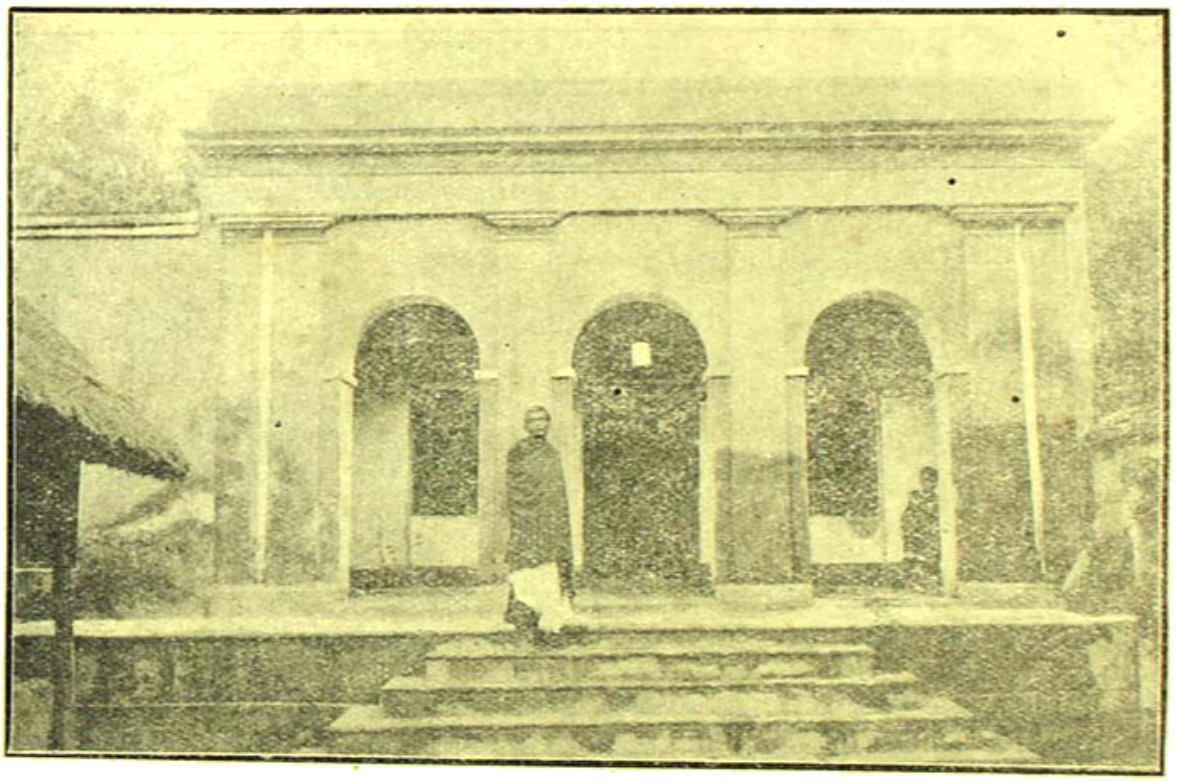

এই দেবী মন্দির হইতে কুকুর-দষ্ট ব্যক্তিদিগকে ঔষধ দেওয়া হয়। গোন্দলপাড়া

দুস্থদের চিকিৎসার ব্যয়ভার চন্দননগরের মিউনিসিপ্যালিটি বহন করিয়া থাকেন। (১২)

দীন দুঃখীদের সাহায্যের জন্য এখানে আর একটি স্থায়ী দাতব্য-ভাণ্ডার অনেক দিন হইতে আছে। ফ্রান্সের লিঁয় নিবাসী লক্ষ্ণৌয়ের মেজর জেনারেল্ ক্লড্ মার্টিনের (Major General Claud Martin) উইল্ অনুসারে তাঁহার প্রদত্ত ৪০ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মধ্যে যে দেড় লক্ষ টাকা, তা মার্টিনার কলেজ তাঁহারই অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিতেছে। মার্টিন একটি রেশমের কারখানায় একজন অতি সামান্য কর্ম্মচারী হইতে নিজ প্রতিভা বলে একজন প্রসিদ্ধ জেনারেল হইয়াছিলেন। (১৩) তিনি প্রথমে একজন সামান্য ফরাসী সৈনিক হইয়া ভারতে আগমন করেন এবং কাউণ্ট্ ল্যালির (Count Lally) দেহ-রক্ষক নিযুক্ত

(১২) হরধন শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দের নিকট হইতে সরকারি হাসপাতাল ও কমিটি সে বিষয় কাগজের বিষয় প্রধানতঃ অবগত হই।

(১৩) Major General Claud Martin নামক গ্রন্থের লেখকবর্গিয়া ছেন, তিনি রেশমের কারখানায় কাজ করেন নাই, পিপা তৈয়ারি। মিস্ত্রীর কাজ করিতেন।

হন। পরে তিনি, ফ্রান্সের সহিত কখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না এই সর্ত্তে, বৃটীশ সৈন্যের কাজ গ্রহণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। (১৪)

এই বৈদেশিক দাতার নাম অবলীয় রাখিবার উদ্দেশ্যে এখানে ক জেনারেল মার্টাঁ নামে একটি রাস্তা আছে এবং গির্জ্জার দেওয়ালে প্রস্তর-ফলকে এই দানের কথা লেখা আছে। কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধে তাঁহার একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

১৮২৬ হইতে এখানে একটি অনাথ আশ্রম হইতে প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। ইহাতে কিছু অকুলান হইলে গির্জ্জার তহবিল হইতে তাহা পূরণ করা হয়। গির্জ্জার যাজক ও কনভেণ্টের মাদার সুপিরিয়রের কর্তৃত্বাধীন দুইজন রোমান্ ক্যাথলিক্ ব্রহ্মচারিণীর (Nun) তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে।

বোথেরো সাহেব আর একটি আশ্রমের (hospice) প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইয়া উহার জন্য বাটী খরিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা ঠিক-মত কার্য্যে পরিণত হয়

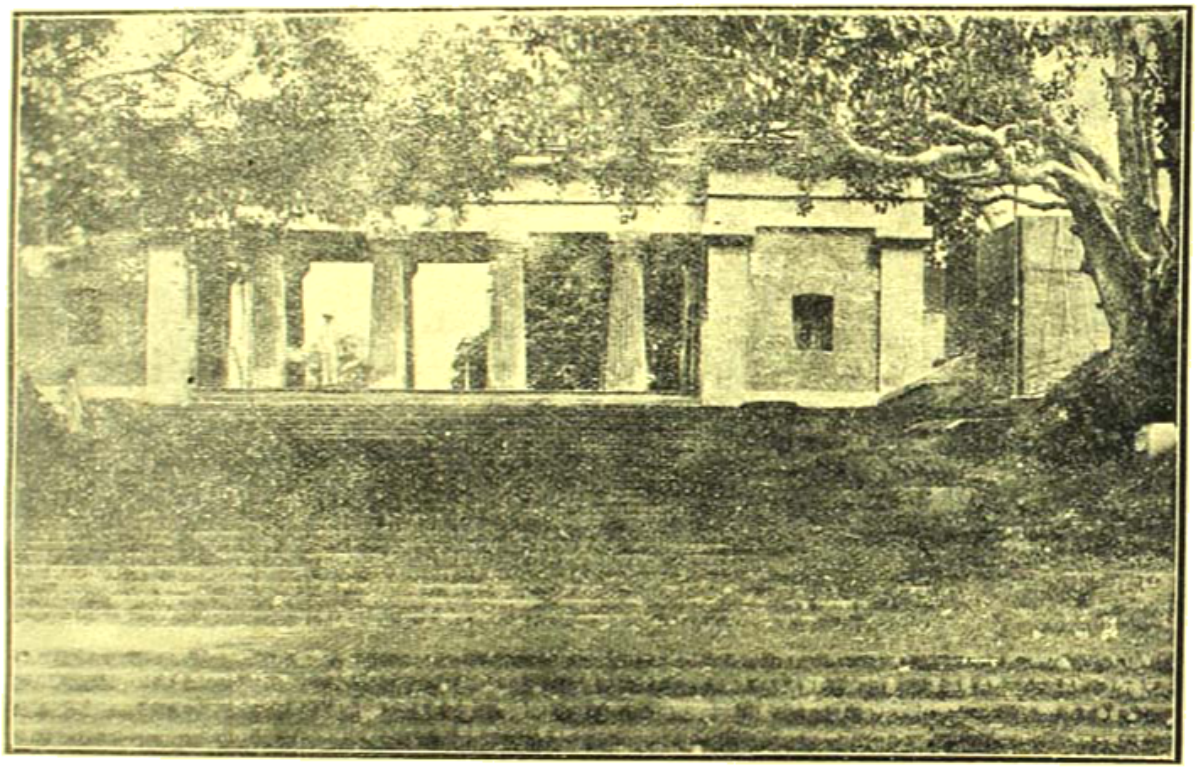

দত্তের ঘাট।—উপরে রাণী তারাসুন্দরীর প্রতিষ্ঠিত চাঁদনী

(orphanage) আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি কনভেণ্ট্ বাটীর পশ্চাতে অবস্থিত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ফাদার বার্থে (Rev. Father Berthet) দ্বারা একটি ও বোথেরো সাহেব (M. Bothero) দ্বারা অন্য একটি বাড়ী ও কিছু জমি উহার জন্য খরিদ করা হয়। কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কে এই আশ্রমের কিছু টাকা জমা আছে। উহার সুদ এবং প্যারিস্থ সেণ্ট্ আকান্ (Saint Enfance of Paris)

নাই। এই বাটী গভর্ণমেণ্ট ভবনের ঠিক পশ্চাতে অবস্থিত। এক্ষণে দেশীয় রোমান ক্যাথলিক্ খৃষ্টানগণ ঐ সকল বাটীতে নামে মাত্র মাসিক এক টাকা ভাড়া দিয়া বাস করিয়া থাকে। (১৫)।

খাঁটি সাহায্য ভাণ্ডার এখানে আর তিনটি আছে। "ভাকুণ্ডা সাহায্য ভাণ্ডার সমিতি" উহাদের মধ্যে অন্যতম। উহা ১৯১৬ সালে কতিপয় স্থানীয় যুবক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১৪) Some notices of General Claud Martin—Bengal Past and Present, Vol. II No. 3

(১৫) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দের মধ্যবর্ত্তিতায় ফাদার দুরিয়ের (Father Durie) নিকট হইতে আশ্রম দুইটির বিষয় অবগত হই।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার প্রথম সভাপতি। "গোন্দলপাড়া অনাথ ভাণ্ডার"ও প্রায় ঐ সময় ৺প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মণ্ডল মহাশয় উহার প্রথম সভাপতি ছিলেন। তৃতীয়টি "দুস্থ ব্রাহ্মণ সাহায্য ভাণ্ডার।" ১৩২৭ সালে কয়েকজন সহৃদয় ব্রাহ্মণের চেষ্টায় চন্দননগর ব্রাহ্মণ-সভার দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উহার সভাপতি। স্থানীয় দুস্থ লোকদের আর্থিক সাহায্য করাই উক্ত সমিতিগুলির উদ্দেশ্য। সাধারণের চাঁদার ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহায়তায় ১৩২৮ সালে "পালপাড়া সুহৃদ-সমিতি" নামে আর একটি সমিতি স্থাপিত হয়। ইহাও সাধারণের চাঁদার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়" ও "চিত্ত বিশ্রাম" নামক দুইটি সমিতি ছিল। উহার সভ্যগণ দ্বারা সংগৃহীত মুষ্টি-ভিক্ষা-লব্ধ চাউল ও মাসিক চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত অর্থে স্থানীয় দীনজনকে সাহায্য করা উহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমটি ১৩১১ সালের ৩রা পৌষ কতিপয় যুবকের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং দ্বিতীয়টি অল্প দিন পরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চন্দ্র ও অন্য

শিশুবাবুর ঘাটের ভগ্নাবশেষ

দ্বারা এইগুলি চলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-সভা তাঁহাদের নিজস্ব গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন কর্ম্মজীবনকে আদর্শ করিয়া দেশসেবার উদ্দেশ্য লইয়া ইং ১৯১৫ সালে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্তের দ্বারা "সন্তান সঙ্ঘ" নামক একটি সমিতি এবং পল্লীস্থ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দুস্থ জনকে সামর্থ্য মত সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বড়াল, কালীপ্রসন্ন বসু, প্রিয়নাথ দত্ত কয়েকজনের উদ্যোগে ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থাপিত হয়। এই সমিতিদ্বয়ের সহিত স্থানীয় অনেকগুলি সম্ভ্রান্তব্যক্তির নাম বিজড়িত থাকিলেও, ইহা স্বল্প কাল জীবিত ছিল, এবং সরিষাপাড়া ও বোড়াই-চণ্ডীতলা পল্লীস্থ যুবক ও বালকগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। শুনা যায় শেষোক্তটি প্রথমটির প্রতিপক্ষ রূপে সৃষ্ট হইয়াছিল।

সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ জাতিবিশেষের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নতি-

করে এবং তাহাদের দুস্থদিগের সাহায্য করিবার জন্য একণে চন্দননগরে চারিটি উল্লেখযোগ্য সভা আছে। "চন্দননগর সনাতনভুক্ত তিলি জাতি-হিতৈষী-সভা"—শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন শেঠ, ভুবনচন্দ্র পাল, রায় ভগবতীচরণ কুণ্ডু বাহাদুর, হরিহর শেঠ প্রভৃতির চেষ্টায় ১৩২৩ সালের ২২শে আশ্বিন বক্সিবেড় নিবাসী ৺নন্দলাল পাল মহাশয়ের বাটীতে আহূত এক সভায় উহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীযুত হরিহর শেঠ উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। চন্দননগর ইহার কেন্দ্রস্থান হইলেও ইহার কার্য্য প্রধানতঃ মুখচর হইতে বাগানের ৺নন্দলাল ভড় মহাশয়ের বাটীতে ১৩১৯ সালের ২৩শে পৌষের এক সভায় "তন্তুবায় সমিতি" নামে এক সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। পরে ১৪ই মাঘ উহার প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীযুক্ত হাবুলাল ভড় মহাশয় উহার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। "ফরাশডাঙ্গা তন্তুবায় সমিতি" নামে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে আর একটি সমিতি ছিল বলিয়া জানা যায়। (১৬)

"চন্দননগর কায়স্থ সভা" নামে কায়স্থ জাতির উন্নতি ও স্বজাতীয় দুস্থদিগের সাহায্যার্থে শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন ও

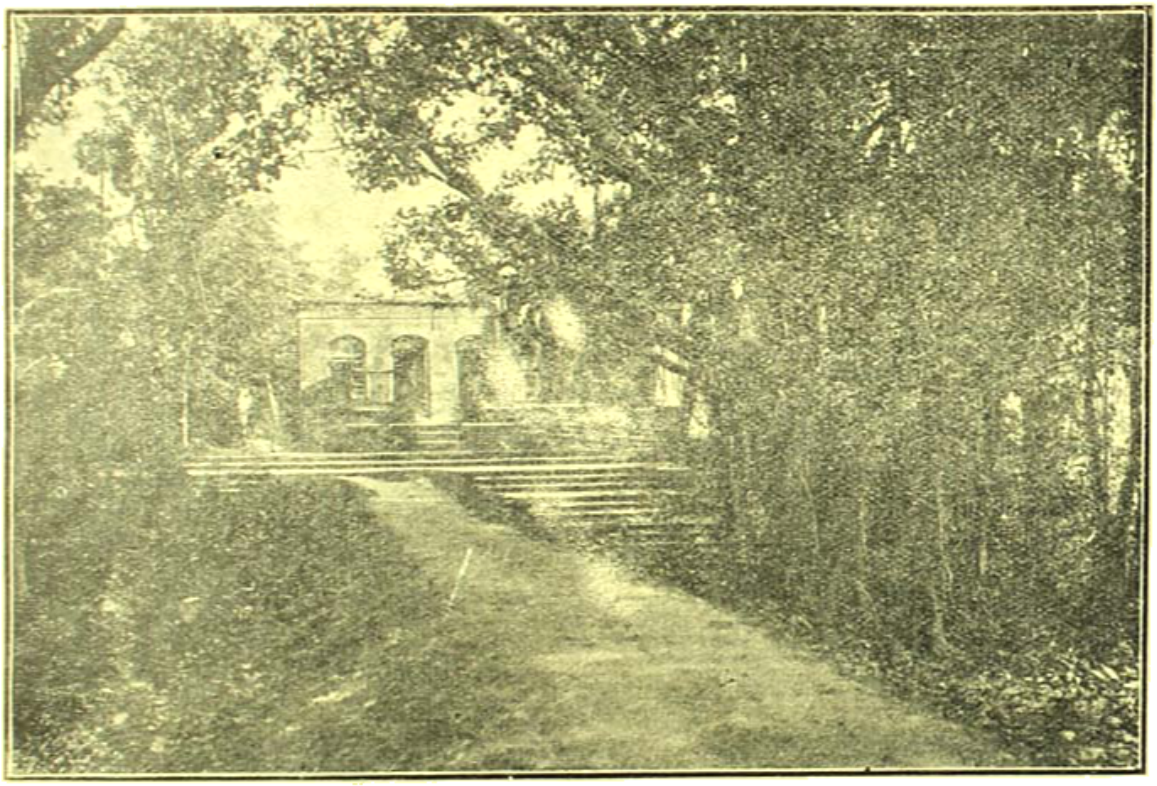

কানাই সরকারের ঘাট। উপরে দ্বারিকানাথ শীল প্রতিষ্ঠিত তীর্থস্থ করিবার ঘর।

বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হুগলী জেলার অন্যত্র এবং বর্দ্ধমান জেলার কোন কোন স্থানেও ইহার সভা আছেন।

ব্রাহ্মণ-সভার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদের জাতীয় স্বার্থ-রক্ষা ও উন্নতি ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। তন্তুবায়দিগের জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় ব্যবসার পুনরুন্নতি সাধন, নিঃসহায় এবং দরিদ্র পাঠার্থী ছাত্রগণের শিক্ষা ও দুস্থ স্বজাতীয়গণের সাহায্য-কল্পে শ্রীযুক্ত কালীচরণ ভড়, শশিভূষণ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির উদ্যোগে লাল-পঞ্চাননতলা-নিবাসী কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয়ের চেষ্টায় ১৩৩০ সালে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দে মহাশয় উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। উক্ত সকলগুলিই সভ্যদের প্রদত্ত চাঁদা ও এককালীন দানের উপর চলিয়া থাকে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "কায়স্থ হিতসাধনী-সভা" নামে এখানে একটি সভা ছিল।

এখানে আর একটি অভিনব প্রকারের সাহায্য-

(১৬) প্রত্নতত্ত্ব—২১শে বৈশাখ ১২৯৯ সাল।

প্রতিষ্ঠানটি আছে; তাহার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত। বিদেশে যাইয়া উচ্চশিক্ষার লাভে সহায়তার জন্য কিছু কম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। তিনি শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু মহাশয়কে এই সর্ত্তে বিলাতে ডাক্তারি-শিক্ষার্থ পাঠান, যে, তিনি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দুই জনকে এই সর্ত্তে বিলাতে শিক্ষার্থ পাঠাইবেন যে, তাঁহারাও দুই জন করিয়া পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন এবং পর পর এইরূপ চলিতে থাকিবে। এই কার্য্যে চৌধুরী মহাশয়ের অর্থ ব্যয় অধিক না হইলেও, ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় আছে এবং সুব্যবস্থা হইলে ইহার দ্বারা দেশের ও দশের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারিবে। ধর্ম্মদাস বাবু এই তহবিল হইতে ১৮০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। তিনি আই-এম্-এস্, হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর শিব প্রসাদ রায় ও এল্‌বিয়ন্ রাজকুমার ব্যানার্জ্জিকে ৭।৮ হাজার টাকা ব্যয়ে বিলাত পাঠান। প্রথমোক্ত ভদ্রলোক ডাক্তার এবং শেষোক্ত ব্যক্তি সিবিলিয়ন্ হইয়া আইসেন। রাজকুমার বাবু জানাকুর দে মহাশয়কে তিন সহস্র টাকা ব্যয়ে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও সিবিলিয়ন্ হইয়া আসিয়াছেন। (১৭) শুনা যায়, এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে ৺প্রসন্ননাথ মিত্র মহাশয়ের পরামর্শ ছিল।

সরকারি হাসপাতাল ভিন্ন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের বাস-ভবনের পার্শ্বে কয়েক বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। তথায় সমাগত রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হইত। এখানকার তৎকালীন মেডিক্যাল্ কলেজের নব-পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার রমণলাল সাধু তথায় রোগীদের চিকিৎসা করিতেন।

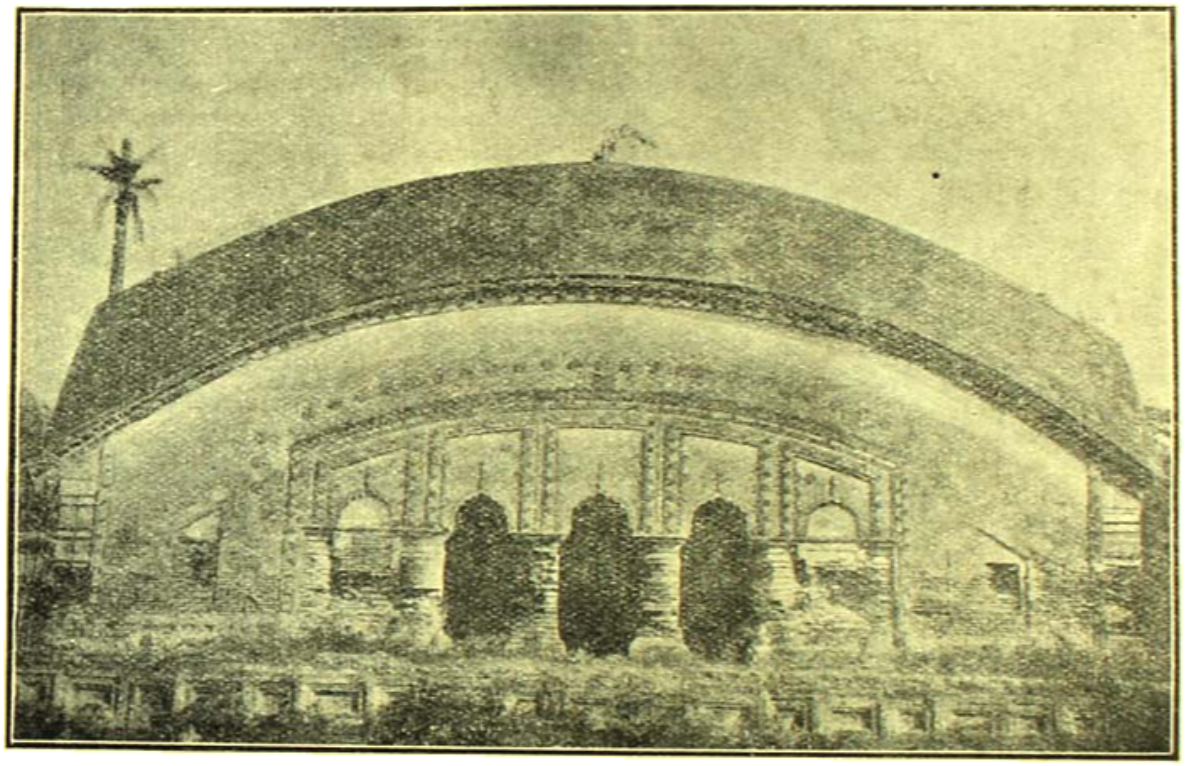

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী-প্রতিষ্ঠিত নন্দদুলাল-মন্দির। ইহার সংলগ্ন অতিথিশালা ছিল।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পাদুপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ হরিসভার অন্তর্ভুক্ত একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় ছিল। ডাক্তার গগনচাঁদ নন্দী তথায় রোগীদের ঔষধ দিতেন।

এক্ষণে বেসরকারি যে কয়টি দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে, তন্মধ্যে ৺দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় প্রতিষ্ঠিত একটি কবিরাজি দাতব্য-চিকিৎসালয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহাতে একজন উপাধিধারী সুযোগ্য কবিরাজ নিযুক্ত আছেন।

(১৭) লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু আই-এম্-এস্ মহাশয়ের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে অবগত হই।

প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাগবাজার নামক পল্লীতে উপযুক্ত চিকিৎসক না থাকায়, স্থানীয় লোকেদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য, বাগবাজারের সরকার বংশের পূর্ব্বপুরুষ নীলকণ্ঠ সরকার মহাশয় কাঁচড়াপাড়া হইতে একজন কবিরাজ আনাইয়া তাঁহাকে স্থান দিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম নামে সহরের দক্ষিণ উত্তর ও মধ্যাংশে তিনটি স্বতন্ত্র দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকগণ আবশ্যক মত রোগীর বাটীতে গিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইহাতে দুইজন মেডিক্যাল্ কলেজের ও দুইজন মেডিক্যাল্ স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার ও দুই তিনটি কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত আছেন। চিকিৎসকদের মধ্যে একজন নারী-চিকিৎসক। নারী-চিকিৎসা-বিভাগে তিনিই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইনিও আবশ্যক মত বাটীতে যাইয়া বিনামূল্যে চিকিৎসা ও প্রসবাদি করাইয়া থাকেন। সহরের মধ্যাংশের চিকিৎসালয়টির ইনিই তত্ত্বাবধারক। সমাগত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রাতে ও বৈকালে চিকিৎসকগণ উপস্থিত থাকেন। এখানে নারী-চিকিৎসকের অভাব থাকায়, যাঁহারা এই আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসা গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের আবশ্যক মত উক্ত নারী-চিকিৎসক এক টাকা মাত্র দর্শনী লইয়া তাঁহাদের বাটীতে যাইয়া চিকিৎসা করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি ১৩২৯ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শম্ভুচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের নামে, তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী-চিকিৎসা বিভাগের ও অন্যান্য বিভাগের উন্নতি এবং চিকিৎসা ভিন্ন আশ্রমের অন্য যে সকল কার্য্যের সদয় আছে,—গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতির

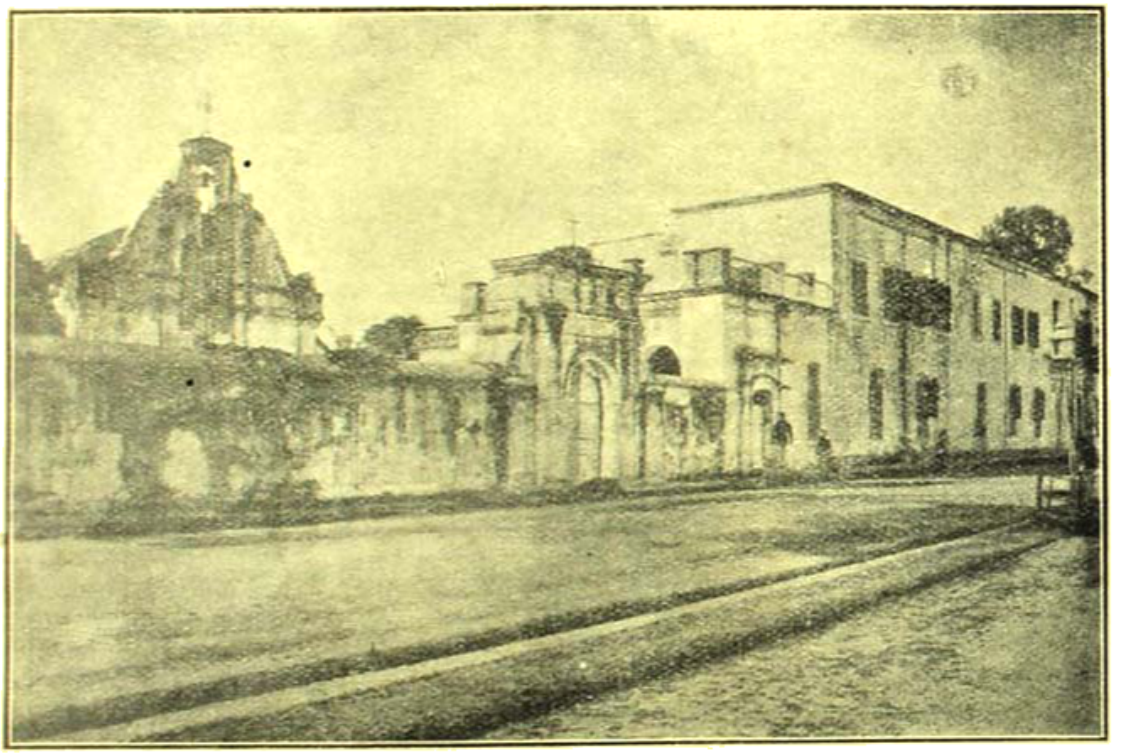

কনভেণ্ট বাটী। দুইশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই বাটীতে একটি আশ্রম ছিল।

অভাবে প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার পথে বাধা থাকায়, তাহা এখনও করা যাইতে পারিতেছে না। গভর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে এখনও চেষ্টা হইতেছে।

উক্ত সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠান ভিন্ন, নিজ বাটীতে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন, এরূপ কতিপয় ভদ্রলোক আছেন। বর্ত্তমান সরকারি হাসপাতাল স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে নন্দলাল বসু নামক একজন তৎকালীন খ্যাতনামা ভদ্রলোক নিজ বাটীতে বহু রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতেন। করালী

রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা

ফাদার বার্থে

গভর্ণমেণ্ট এক সময় তাহাকে প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। (১৮)

মারিভয়ের সময় আবশ্যক মত অস্থায়ীভাবে চিকিৎসার জন্য এখানে সময় সময় ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৩১১ সালে প্লেগের সময় প্লেগাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র অস্থায়ী সরকারি ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইং ১৯১৮ সালে যখন দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রবল আকার ধারণ করে, তখন মেডিক্যাল রিলিফ্ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তাহার দ্বারা নিযুক্ত একজন সুযোগ্য ডাক্তার দ্বারা রোগীদের বাটীতে পাঠাইয়া বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই কমিটিতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং এড্‌মিনিষ্ট্রেটর তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। পরে বসন্তের টিকা দিবার জন্যও এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যগুলি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের উদ্যোগে ও ব্যয়ে সম্পাদিত হইয়াছিল।

গোন্দলপাড়ার কুকুরের কামড়ানর ঔষধ ও এখানকার

(১৮) চন্দননগর সারস্বত উৎসবে পঠিত মুদ্রিত প্রবন্ধ।

সাফরিদ্ পীরের প্লীহা ও যকৃতের ঔষধ বহুদূর পর্য্যন্ত খ্যাত। গোকুলপাড়ার কুকুর শৃগাল দংশনের ঔষধ বহু-দিন হইতে চলিতেছে। হাজরারা ৩৫।১০ লইয়া এখন এই ঔষধ দিয়া দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ৩৫০।৪০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ শুকদেব হাজরা তাঁহার গৃহে প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীর প্রত্যাদেশে এই ঔষধ প্রাপ্ত হন।

বোড়াইচণ্ডীতলার সাফরিদ পীরের মাদুলী প্লীহা ও যকৃৎ সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়ার মহৌষধ বলিয়া বহুদিন হইতে খ্যাত। উহা ।/৫ মূল্য লইয়া প্রতি রবিবারে বিতরিত হয়। ইহা সেবনের আবশ্যক হয় না, এক প্রকার মালা গলায় পরিতে হয় মাত্র। কথিত আছে, পঞ্চাশিক বৎসর পূর্ব্বে কুল ক্ষেত্রী জাতীয় বদনচন্দ্র বাগ সর্দ্দার নামক এক ব্যক্তি সুপ্রসিদ্ধ মেবাঁচরণ সরকার মহাশয়ের নিকট চাকুরী করিত। পরে সরকার মহাশয়ের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সহিত তাহারও বিশেষ দুরবস্থা হয়। ক্রমে স্ত্রী-পুত্র লইয়া তাহার এমন কষ্ট হইল যে, অন্য উপায় না দেখিয়া শেষে সে সপরিবারে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া সকল ক্লেশের অবসান করিবে স্থির করিল। ঐ

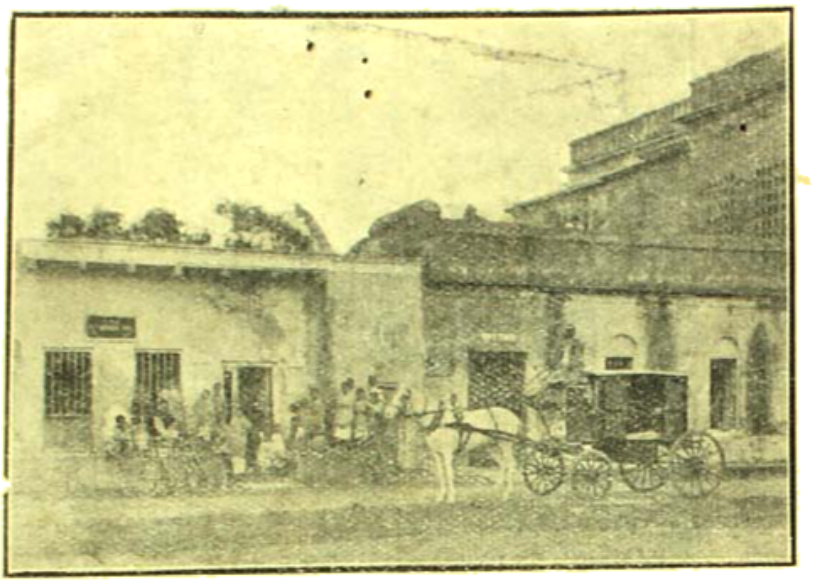

শম্ভুচন্দ্র-সেবাশ্রম। উত্তর বিভাগ

শম্ভুচন্দ্র-সেবাশ্রম। দক্ষিণ বিভাগ

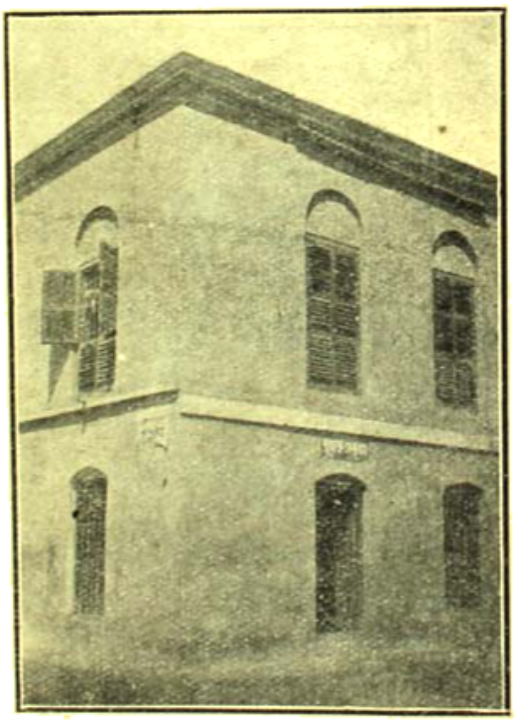

শম্ভু চন্দ্র-সেবাশ্রম। উত্তর বিভাগ

দিন রাত্রেই সাক্ষাৎ পীর ঠাকুরের স্বপ্নাদেশে সে উক্ত ঔষধ প্রাপ্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় পরদিন প্রত্যূষে অকস্মাৎ কোথা হইতে বিস্তর লোক ঔষধ লইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই পর্য্যন্ত এই মালা লোকে অশেষ শ্রদ্ধার সহিত লইয়া যাইতেছে। এখন বদনের উত্তরাধিকারী আশুতোষ বাগ দর্দ্দার এই ঔষধ দিয়া থাকে। (২০)

১৩২৬ সালে দেশে যখন চাউলের দর বৃদ্ধি হয় এবং চাউল ব্যবসায়ীরা তাহার সুযোগ লইয়া নিত্য দর বৃদ্ধি

দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অতিথিশালার ভগ্নাবশেষ—গোন্দলপাড়া

করিতে থাকে, তাহার উপশমার্থ শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলিত হইয়া "চন্দননগর চাউল সরবরাহ সমিতি" নামে অযথা চাউলের দর বৃদ্ধি প্রশমনার্থ একটি অস্থায়ী সমিতি গঠন করেন। ইহার দ্বারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূলে চাউল বিক্রীর ব্যবস্থা হয়। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন চন্দননগরের ম্যার এবং এড্-মিনিষ্ট্রেটর মহোদয় উহার প্রতিপোষক ছিলেন। সমিতির অন্যতম সভ্য গোন্দলপাড়া জুটমিলের অন্যতম মিঃ উইল্‌সন বহুসংখ্যক বোরা দিয়া এই সমিতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

নাগরিকদিগের নৈতিক, আর্থিক, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-বিষয়ক ইষ্ট এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষার্থ "চন্দননগর রেপুবলিকাঁ রাদিকাল" (Comite Republi-cain Radical de Chandernagore) ও নাগরিক-দিগের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া প্রজাপ্রতিনিধিদের পরামর্শদান, স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নূতন অধিকার লাভের চেষ্টা করার জন্য "প্রজাসমিতি" নামে দুইটি সভা আছে। প্রথমটি ইংরাজি ১৯০৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিটি স্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত ভূদেশ্বর শ্রীমানী মহাশয় উহার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই কমিটি ফ্রান্সের র‍্যাডিক্যাল্ ও র‍্যাডিক্যাল্ সোসিয়ালিষ্ট (Repuplican Radical and Radical Socialist) দের দলভুক্ত। (২১) দ্বিতীয়টি ১৯২২ সালে স্থাপিত হয়।

প্রজাসমিতি গঠিত হইবার পূর্ব্বে ১৯১৯ সালে নির্ব্বাচিত প্রজাপ্রতিনিধিগণকে পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের প্রস্তাবে উহাদের বড়বাজারের বাটীতে তাঁহার সভাপতিত্বে এক প্রকাশ্য সভায় প্রজাপ্রতিনিধি নির্ব্বাচন-বিষয়ক পরামর্শ সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে শ্রীযুক্ত বনমালী পালের সভাপতিত্বে পরে এক সভা কর্ত্তৃক উহাই সংস্কৃতাকারে প্রজাসমিতি নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে বোড় পোলেটিক্যাল্ ইউনিয়ন্ নামে বোড় নামক স্থানের অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার্থ আর একটি সভা ছিল। ১৩১৮ সালের ১২ই কার্ত্তিক উহা স্থাপিত হইয়াছিল। শেষোক্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা ঠিক এ প্রবন্ধের বিষয় না হইলেও, সাধারণের হিতকর বিষয় বলিয়া উহার কথা এই স্থানেই বলিলাম। *

(২০) স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেনের নিকট হইতে ইহার বিবরণ অবগত হই।

(২১) ১৩১৪ সালের ২৭শে মাঘের "মাতৃভূমি" হইতে এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাস মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত কমিটির কাগজ পত্র হইতে অবগত হই। *

* অজ্ঞতা বশতঃ যে সব কথা এই প্রবন্ধে বাদ পড়িয়াছে তাহা, বা প্রবন্ধে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকিলে তাহা, লেখককে চন্দননগরের ঠিকানায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে উপকৃত হইব। লেখক।

দেয়ালি

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্‌সি

—ওরে!—

—কি?—

—আলো দিবি নে ভাই? সাঁঝ উৎরে গেল, এখুনি ঝহুরা সব—

—থাক্ গে।—

—বলিস্ কি রা! আজ দেয়ালি, বছরের একটা দিন। কত ফুর্ত্তি, কত রোজগার।—

—ভাল লাগে না আজ।—

—ভালো লাগে না! এরি ভেতর! তরা বয়স, গাঙ্গে জোয়ার বইছে। কত পান্‌সী, কত ডিঙি এতে ঘুরপাক খাবে, তলিয়ে যাবে। আর তুই কি না এখুনি! নে, নে, রঙ্গ রাখ্।—

—সত্যি ভাই, ভালো লাগে না আজ।—

—কি হয়েছে তোর শুনি।—

—জানি নে, লাগে না ভালো।—

—কেন? আমাদের আবার লাগালাগি কিসের? আমরা হ'লেম কাচের গেলাসে গোলাপী মদ। টল্‌টল্ ছল্‌ছল্ করে সবাইকে টেনে আনব। যারা খাবে তারা মজবে, হাসবে, কাঁদবে, আর আমরা কেনিল ঢেউ তুলে তুলে তাদের অতলে তলিয়ে দোব।—

—কিন্তু, গেলাস যদি খালি হয়?—

—হ'বে কেন, হ'তে দোব কেন?—

—গেলাস যদি ভুটো হয়ে যায়?—

—তা ছুঁড়ে ফেলে নতুন গেলাস ভরে দোব।—

—কিন্তু এমন রাত কি আসে না, যখন তার দরকার মনে হয় না?—

—আমাদের তা হয় না, তাহ'লে ব্যবসা চলে না।—

—কিন্তু এমন রাত যদি আসে, যখন এ দুই ব্যবসায়, কাঁদগুলো ছিঁড়ে যায়।—

—বাস্‌রে! তুই যে তত্ত্ব শিখেছিস্! শুনি কোন বোষ্টমের পায়ের তলায় তোর দেহ যৌবন প্রাণমন—

—প্রথম দুটি দিয়েছি সবাইকে, শেষের দুটি কাউকে নয়। এপথে যে লেন-দেন নেই।—

—তবে?—

—বলেছি ত, আজ ভালো লাগে না। আচ্ছা ইচ্ছে হয় বাইরের সমস্ত আলো নিভিয়ে আঁধারে বুকের আলো জেলে দি।—

—অর্থাৎ?—

—আজ বুকের ইচ্ছাকে ঠেকাতে পাচ্ছি নে।—

—বাস্‌রে! তোর বুকে আবার কেমন ধারার মানুষ বাসা বাঁধল' রা? আমাদের বুকে বাসা বাঁধলেই ব্যবসা বন্ধ্‌করে।—

—নতুন কেউ সে নয়। চিরদিন, চিররাত সে যে সবার বুকে বাসা বেঁধেছিল, আজও আছে। আমরা খালি কড়ের দোলা দিয়ে তার বাসা ভাঙ্‌বার চেষ্টা করছি, তবু—

—হেঁয়ালি রেখে বল্‌না ভেঙ্গে ব্যাপারটা—।

—বুঝবি নে ভাই। মিছামিছি—

—বুঝবি নে তাই বল্। আচ্ছা তাই বুঝলেম।—

—ওকি রাগ করি! চাপা, কের্ বল্‌চি, আর—

—বল্ তা হ'লে।—

—নিতান্তই শুনবি। তা আমারি মুছে-যাওয়া দিন-গুলোর স্মৃতির আলো।—

—অর্থাৎ?—

—আজ সেই আলো হঠাৎ বুক রোশ্‌নাই করে তুলছে, প্রাণের তারে হারানো সুর জেগে উঠছে, আর বর্ত্তমানটা

বেশুরো হয়ে যাচ্ছে। আজকের এ দেয়ালি রাতে খালি মনে পড়ে পেছনের এম্নি রাতগুলো, আর—

—কি হয়েচে তাতে? তখন যেমন আলো দিয়েচিস্ আজ তার দশগুণ দে না।—

—কিন্তু কৈ সে আলো?—

—হাবা মেয়ে! বল্ না তোর বাবুদের—কি আলো চাই। মোমবাতি, অ্যাসিটিলিন্, গ্যাসলাইট্, বিজ্‌লী বাতি—ফর্‌মাস কর না। তোর একটা কথার জন্য ওরা সব হাঁ করে থাকে।—

—কিন্তু যে আলো ছাড়া সব অন্ধকার, সে আলো তারা কোথায় পাবে?—

—বাঃ রে! তুই বুঝি চাস্ আকাশের চাঁদ?—

—ধর্ তাই।—

—তুই ক্ষেপেচিস্! আকাশের চাঁদ কেউ কি এনে দিতে পারে?—

—কিন্তু এক দিন তা ত' আমার ছিল।—

—তবে আঁচলে বেঁধে রাখ্‌লিনি কেন?—

—তাই ত আজ ব্যথা।—উঃ আমার পেয়ে-হারানো চাঁদ!—

—নাঃ তোর মাথা খারাপ হয়েচে। কি খেয়েচিস্ বল্ ত?—

—স্মৃতির মদ।—

—ধেনো বোধ করি? কেন ওসব খাস্ বিলিতি কেলে? অত বড় বড় বাবু তোর—

—বাজে নয়, শুধু খাঁটি।—আর সব বাজে।—

—তুই মর্‌বি ও সব খেয়ে।—

—কিন্তু ওতে যে নেশা জমে, শরীর বিভল হয়, চোখ জড়িয়ে আসে, বুকে সমুদ্র উথ্‌লে ওঠে। উঃ সে নেশায় মরা কি সুখের!—

—নাঃ তুই বড্ড মাতাল হয়েচিস্ আজ।···কিন্তু কৈ গন্ধ নেই ত মুখে!—

—মুখে নেই, কিন্তু বুকে আছে।···পাচ্ছিস্?—

—কৈ না।···বোধ করি সারা সাঁঝ একলা বসে তুই হাঁফিয়ে উঠেছিস্, মাথা গরম হয়েচে। তা ছাড়া, এ সময়টা নেশার চটক ছাড়া এম্নি শরীর নেতিয়ে পড়ে। নে, একচুমুক খা।—

—না ভাই, অন্ততঃ আজকের রাতটা আমায় রাখ কর। আজ ও বিষ ছোব না।—

—কি খাবি তা হ'লে আজ?—

—বিষ খাব না,—আজ সুধা পানের রাত।—

—অবাক্ করি তুই! তোর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি নে।···ঐ শোন্ তোর কোন্ বাবু ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গলো।—

—ভাঙ্গুক। বলে দে, দেখা হ'বে না,—যেতে না চায় তাড়িয়ে দে।—

—ছি অমন ক'রে তাড়াস্ নি। বদনাম হবে, ব্যবসার ক্ষেতি হবে।—

—বলে দে, আজ শরীর ভালো নেই।.. বলেচিস্? আঃ বাঁচলুম। বোস্ এই জানালার ধারে। দেখ্‌চিস্ বাইরে কি সুন্দর—আহা!—

—দেখেচি; কিন্তু কি বা এমন। একটা ছোট্ট বাড়ী, ছাদে গুটীকত বাতি, আর নীলকাগজের কানুস।—

—কিন্তু চোখ জুড়িয়ে যায়,—নয়? আর আমাদের বাড়ীর বাতিগুলো চোখ পুড়িয়ে দেয়।···ও কি, অমন অবাক হয়ে আমায় দেখ্‌চিস্ যে! ভাব্‌চিস্ ঠাট্টা কচ্ছি? তা নয় লো, তা নয়। তুই জানিস নে, ঐ ছোট্ট বাড়ীর আলোর সাথে কি সেখান আছে। স্বামীর সীমাহারা প্রেম, স্ত্রীর অকুরান অনুরাগ, বাপমায়ের টলটল স্নেহ, শিশুর চঞ্চল বুকের উদ্দাম আনন্দ।···সমস্ত বাতির শিখা দিয়ে তা যেন ফুটে বেরুচ্ছে,—আর আমাদের আলোর শিখায় শিখায় বজ্রের আগুন।—প্রেম নেই, স্নেহ নেই, অনুরাগ নেই,—খালি অতৃপ্ত শোণিততৃষ্ণায় একটা ক্ষুধিত রাক্ষসের লেলিহান জিহ্বা লক্‌লক্ কচ্ছে।···চাপা, খানিক আগে যদি দেখ্‌তিস্—ঐ ছোট্ট ছাদে আলোর আয়োজন।—স্বামী-অনুরাগ-বিভল এক তরুণী তার মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ চিহ্ন ছেলেমেয়ে দুটিকে সাথে করে ঐ ছোট্ট ছাদে বাতি দিচ্ছিল। তার স্বামী একটা টিনের কানাস্তারা থেকে তাতে তেল ঢেলে দিচ্ছিল, আর তাদের ঘিরে ঢেউ-শিশুর মত তালে তালে নাচ্‌ছিল তাদের প্রণয়ের পুষ্পদল দুটি।...দীন আয়োজন,—কিন্তু তাতেই তাদের বুকের ধারাগুলো উপ্‌চে পড়ছিল। ক'বার তাদের কৃত্রিম অভিমান হ'ল,—তরুণী ঠোঁট ফুলিয়ে চলে যাবার উপক্রম কর্‌তেই তার স্বামী তার আঁচল চেপে, খোঁপা খুলে দিয়ে,

আলগোছে তাকে কাছে টান্‌তেই তার অভিমান উবে গেল! আবার স্বামী রাগ করুন, তরুণী মুচ্‌কি হেসে তার মুখের কাছে মুখ এগিয়ে দিতেই সন্ধি হয়ে গেল। তরুণী ফিক্ করে হেসে বল্লে, কি লোভী তুমি, দিনরাত খাই খাই লেগে না। তার স্বামী জবাব দিলে, বাঃ রে, লোভ দেখিয়ে উল্টো লোভী বলা!···তার পর শিশু দুটির যখন মাতামাতি সুরু হ'ল, তারা দুটিতে দুজন দুজনার কাঁধে ভর দিয়ে এমন ভঙ্গীমায় সে দৃশ্য দেখ্‌লে যে, প্রেম ও বাৎসল্যের অমন মিলিত ছবি কোনও চিত্রকর আঁক্‌তে পারে নি।—

—বুঝ্‌লেম। তিনি পরদায় বড়রকম একটা বাধ্‌সোপ দেখে ফেলেছিস্। কিন্তু তাতে তোর নিজের রোশ্‌নাই তুচ্ছ মনে হয় কেন?—

—কেন?···আমার চোখ দিয়ে যদি দেখ্‌তিস্ চাঁপা।··· যদি চকিতের জন্য দেখ্‌তিস্ আমার জীবনের এদ্দি হারানো ছবি।—

—কি করে দেখ্‌ব ভাই? আমি ত কোনও দিন তোর মত গেরস্ত ঘরে ছিলাম না। আমি ত এখানেই বড় হয়েছি।—

—তবু বুঝ্‌বি। শোন্ বল্‌ছি। আজ না করে বুক শান্ত হচ্ছে না।···যে হারানো জিনিস ফিরে পাবার উপায় নেই, তার জন্য অনুতাপ করেও একটা ব্যথাভরা সুখ আছে।···তোরা জানিস্ নে চাঁপা, এক দিন আমারও এদ্দি সুখের সংসার ছিল, এবং এদ্দি আলোময় দেয়ালি-রাতে আমার জীবনে যে অভিনয় হয়েছে, তা বোধ করি ঐ তরুণীর চেয়ে কম আবেগে আমি অনুভব করি নি।···আমার স্বামী ছিলেন এক ক্ষুদ্র জমিদারের ক্ষুদ্র তহশিলদার। তবু সুদূর পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট এক খাদালে চকাচকীর মত আমাদের বিবাহিত জীবনের কটি বছর মহাসুখেই আমরা কাটিয়েছিলেম। একটী খোকা স্বর্গের মত মিষ্টি হাসিতে আমাদের কুটীর ভরে দিয়েছিল। অল্প মাইনে হ'লেও আমার স্বামীর ব্যবহারে প্রজারা তুষ্ট ছিল, তাই আর্থিক অভাব আমাদের ঘেঁস্‌তে পারে নি। কাছারি ঘরের পেছনেই থাক্‌বার বাড়ী। পিপাসায় ছল করে ঘুরে ঘুরে তিনি বাড়ী আস্‌তেন। রান্নাঘরে এসে আমার ঘোম্‌টা ফেলে দিতেন, খোঁপা খুলে দিয়ে আগুনের তাতে আমার আরক্ত মুখ ধরে বল্‌তেন, পিপাসায় বারবার আস্‌তে হয়। স্নানের পর আমার শুক্নো কাপড় সুকিয়ে সুমধুর আলাতন দিতেন, দুপুরে আমার নিদ্রামগ্ন পেয়ে আমার ওষ্ঠাধরে মধু ঢেলে দিয়ে যেতেন, আমার বুকের মাঝখানে তাঁর নাম লিখে বল্‌তেন, অনুরাগ আমার বক্ষপঞ্জর ভেদ করে ফুটে বেরিয়েছে। খোকার কচি কচি কথা ফুটেছিল, তাকে দিয়ে আমায় প্রশ্ন করাতেন, তিনি আমার কে হন।···সন্ধ্যেবেলা যখন পেছনের খোলা বারান্দার চাঁদের তলায় খোকাকে মাঝখানে লয়ে আমরা বস্‌তেম, চাঁপার উগ্রগন্ধে-মাতাল বাতাস দু'জনার বুকের ভেতর কি সব মদির-স্বপ্ন জাগিয়ে তুল্‌ত! কি সে আকাঙ্ক্ষা, কি সে আবেগ, কি সে অনুভব,—কি মধুর, কি কোমল, কি শীতল! হয় ত আমরা আত্মহারা হয়ে দুজনে দুজনার বুকের স্পন্দন অনুভব কর্ত্তি, খোকা ঝাঁপিয়ে এসে আমাদের মাঝে ব্যবধান করে দিল। অম্নি দুজন দুজনার পানে চেয়ে, মুচ্‌কি হেসে, খোকার দুগালে অজস্র চুম্বনবৃষ্টি সুরু করে দিলাম,—দিতে দিতে খোকাকে লুকিয়ে ক'টি বা এ ওর গালে দিয়ে ফেল্লাম,—যেন কখন অনুরাগ-পুষ্পে বাৎসল্য-চন্দন-প্রলেপ, কখন বাৎসল্য-চন্দনে অনুরাগ-পুষ্প-সংযোগ!···পূজা-পার্ব্বণে আমাদের তিনটির আনন্দোৎসব, দোলে কুঙ্কুম-খেলা, দেয়ালিতে দীপসজ্জা,—অতুল, সব অতুল!···

—বাঃ এত সুখী ছিলি তোরা!···তার পর?—

—তার পর আরো শুন্‌বি?···কি বল্‌ব? আলোর অধ্যায় ত ঐখানেই শেষ। তার পর খালি অন্ধকার, গাঢ় নিকষ কালো অন্ধকার।···উঃ—শোন্! কি কুক্ষণে জানি না, বোধ করি আমারি কর্ম্মফলে আমাদের দেয়ালির অনুরাগ-পর্ব্ব শেষে জমিদারের ছেলে এল' মহাল দেখ্‌তে। সে ছিল লম্পট ও সুচতুর। তার মহালের বিজন কোণে কোথায় কোন্ বন-কুসুম অপরূপ মাধুর্য্যে ফুটে আছে, তার কাণে সে খবর বয়ে নেবার চরও ছিল অনেক। সে এসে আমার সরল স্বামীর সাথে প্রভু-ভৃত্য-সম্পর্ক ভুলে দিয়ে একেবারে দাদা সম্বোধন সুরু করে দিল, এবং বল্ল যে উড়ে বামুনের রান্না তার আর পরিপাক হচ্ছে না, তাই কদিন বৌদির পাকা হাতের রান্না খেয়ে প্রবাসের দুঃখটা ভুল্‌তে চায়। আমার স্বামী ছিলেন নিতান্ত ভালোমানুষ, তা ছাড়া আমার ওপর তাঁর বিশ্বাসও ছিল অগাধ, তাই আমার

পাকা হাতে তাহার আহারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তুলে দিতে তিনি এতটুকু ইতস্ততঃ করলেন না।···আমারি অদৃষ্ট! প্রথমটা আমি আপত্তি জানিয়েছিলেম। তিনি বল্লেন, ও তোমায় বৌদি ডেকেছে, লজ্জা কি? বড়মানুষের ছেলে, সত্যি খাবার দাবার ওর কষ্ট হচ্ছে। সুবু নিজের কাছে, কি হানি ওর কাছে বেরুতে?···হায়! যদি তিনি জান্‌তেন যে আমারি ভেতর এক বীভৎস রাক্ষসী লুকিয়ে বাস কচ্ছিল!···

প্রথম রাতে পরিবেষণ কর্ত্তে গিয়ে নারী-সুলভ কৌতূহলে ঘোমটার ফাঁকে তাকে একবার চেয়ে দেখ্‌লাম। এই কৌতূহল না কি অনেক সময় নারীর সর্ব্বনাশ করে,—আমার করল। জমিদার-পুত্রটি ছিল রূপের অগ্নিশিখা,—যে শিখার পতঙ্গ আপনার পরিণাম ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরুষের এমন ভুবন-ভুলান রূপ আর দেখিনি, তাতে নতুন যৌবনের ঢেউ লেগে তাকে মোহময়, স্বপ্নময় করে তুলেছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে ক'বার আমি তাকে দেখ্‌লেম; এবং ঐ অপরূপ সুন্দর বুঝাও আমায় আড়নয়নে দেখ্‌ছে—এই অনুভূতি কি জানি কেন আমায় লজ্জিত ও অপমানিত না করে, বরং একটু পুলকিত ও চঞ্চল করে তুল্‌ল। পরপুরুষের চোখের চাউনীকে মধুবর্ষণ বলে জীবনে ঐ প্রথম গ্রহণ কল্লেম।··· রাত্রিতে যখন স্বামীর শয্যায় শুলেম, তখন ধিক্কার এলো। সুমতি বল্লে, ছি, ছি, রূপে সে কন্দর্প হতে পারে, তবু ত পরপুরুষ। লজ্জিত হয়ে খোকাকে বুকে টেনে বুঘন্ত স্বামীর পায়ের তলায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়্‌লেম। সারাটা ভোর ভাবনা কল্লেম, স্বামীকে বল্‌ব—তার আহারের অন্য ব্যবস্থা কর্ত্তে, কিন্তু মুখ ফুটে বল্‌তেও কেমন লজ্জা হ'ল, বোধ করি নিজের মনে গলদ থাকায়। দুপুর বেলা আবার অবাধ্য চোখ-দুটা লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখ্‌ল, দৃষ্টি-বিনিময়ে বুক শিউরে উঠ্‌ল।···আবার সারা-রাত সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব—কুমতির পরাজয়।···কিন্তু লম্পট পুরুষদের ফাঁদ পাত্‌বার আশ্চর্য্য কৌশল আছে। তা থাক্—আমিও যে অন্তরে খাঁটি ছিলেম না। হয় ত এ পরীক্ষায় না পড়্‌লে ঢেউহীন নদীতে কাঁচা মাঝির মত নৌকাখানি আমি কোনও প্রকারে বেয়ে যেতে পার্ত্তেম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টে নদীতে ঢেউ উঠেছিল। ···আমার অন্তরের মাঝে যে কুৎসিত সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা গোপন অতৃপ্তি লয়ে লুকিয়ে ছিল, সে ক্রমে আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল,—ঐ মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গের সাথে আমার কুরূপ স্বামীর তুলনা চলে না। আমার ইন্দ্রাণীর মত রূপ,—এ কি এ ভাবে বিফল কর্ব্বার? কি আছে স্বামীর? রূপ, অর্থ, বিভব—বা লয়ে জীবনের উপভোগ—সে সব কিছুই নেই!··· অবশ্য এক দিনেই আমার এত অধঃপতন হয়নি,—আমার স্বামীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকায় ঐ জমিদার-পুত্র আমায় লুব্ধ কর্ব্বার অত সুযোগ পেয়েছিল, এবং আমিও ধাপে ধাপে নেবে যাচ্ছিলেম, কতকটা জেনে, কতকটা না জেনে।···

কিন্তু হায়! যদি তখন জান্‌তেম এ তৃষ্ণার পরিণাম! যদি জান্‌তেম দেহটাকে ঘিরে মানুষের ভোগের আয়োজন খালি আগুন জ্বালায়,—শান্তি, তৃপ্তি দিতে পারে না!··· উঃ সেদিন সবুজ অন্তরের স্নিগ্ধ আলোগুলি ভোগের দাবানল-শিখায় আড়াল হয়ে পড়েছিল। তাই ভেবে দেখিনি, স্বামীর আবার রূপ, স্বামীর আবার ঐশ্বর্য্য! সে যে অরূপ রতন, সে যে চিরঐশ্বর্য্যময়! নারীর স্বামী, সে যে সকলের বড়, বিশ্বের চেয়েও বড়!···স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ,—এ কি বাইরের কিছু? এ যে অন্তরের বাঁধন, জন্ম জন্ম যার শেষ নাই। এ সম্বন্ধে বাইরের বোধ-বিচার নেই বলেই ত যৌবনে ও যৌবনান্তেও এ সমান সুন্দর। তাই দুটি প্রাণী সকল সময়, সকল অবস্থায় খালি পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে সংসারের সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝাকে অগ্রাহ্য কর্ত্তে পারে।···

—তার পর?—

—তার পর আর কি? চারের লোভে মাছ যেমন বড়্‌শিতে ধরা দেয়, আমিও দিলেম, এবং ধরা পড়্‌বার পর মাছের যে অবস্থা হয়, আমারও তা হ'ল। উঃ কি সে তাপ, কি সে দাহ! কেন তার আগে মরণ হ'ল না!—

—এখানে এলি কেন? অত বড় জমিদারের ছেলে—

—সে কি স্বামী, যে, চিরদিন সমান আদরে বুকে করে রাখ্‌বে? এ সব লম্পট ভ্রমর ফুলি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়—চিরদিনের জন্য তাকে পূজার অযোগ্য করে দিয়ে উড়ে যায়।—

—তোর ছেলে?—

—আমার ছেলে! চাপা, ইচ্ছা করেই তার কথা চেপে গিয়েছিলেম।—আমার সেই নন্দনের পারিজাতকেও তার রাক্ষসী মা অনায়াসে ফেলে এসেছিল!···স্বামীর তবু সান্ত্বনা আছে, হয়ত তিনি দুঃস্বপ্নের মত আমার স্মৃতি মুছে ফেলে

আবার বিয়ে করে সুখী হয়েছেন ; কিন্তু আজ এই আলোর দিনে মৃদু বাতাসে দীপশিখাগুলো কেঁপে কেঁপে যেন আমার খোকার বাধাভরা ঠোঁটের মৃদুকম্পন জানিয়ে দিচ্ছে,—সারা নগরীর মহোল্লাস ভেদ করে একটা অস্ফুট ক্রন্দন-রোল শুনতে পাচ্ছি—মা, মা ! . উঃ—

—ও কি টগর ! অমন কচ্ছিস্ যে ? ও বাড়ীর ছাদে কি দেখ্‌ছিস্ ? অত ধারে যাস্‌নি, যাস্‌নি। ভাঙ্গা কার্ণিস, পড়ে যাবি।—

—দেখ ত, দেখ ত চাঁপা, ওদের ঐ ছেলেটি। ঐ যে বাড়ি নিয়ে খেল্‌চে। কে ও ? ঠিক যেন আমার খোকা, তেম্নি নাক, তেম্নি চোখ। দেখ্‌ ত, তার বাঁ গালে একটি কালো তিল ছিল। এই যে এই পাশটায় ছুটে আস্‌চে।—

—টগর, টগর !···অ মালতি, অ বকুল, শীগ্‌গী বাবুদের বল্। টগর কার্ণিস্ ভেঙ্গে ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেল। সর্ব্বনাশ হোল রে। ওলো তোরা সব বেরিয়ে আয়, গান থামা।—

•

—চাঁপা—!

—কি ভাই টগর ! একটু ভাল বোধ কচ্ছিস্ ?—

—ভাল ? আমার আবার ভাল মন্দ !···লোক ফিরেচে ?—

—না ফেরেনি এখনো।—

—দেখেচিস্ তুই ? ঠিক যেন আমার খোকা,—তেম্নি গড়ন, তেম্নি রং, তেম্নি মুখ, তেম্নি হাসি,—খালি মাথায় একটু বড়। সেও বোধ করি এমনটি হয়েচে।···ঠিক খোকার মতন নয় রে ?—

—কি করে বলি ভাই ? আমি ত দেখিনি তোর খোকাকে।—

—ওঃ ভুলে গেচি,—তুই ত দেখিস্‌নি। দেখ্ চাঁপা, ভারি সুন্দর হয়েছিল আমার খোকা। দুজনকার যা সুন্দর সব সে বেছে নিয়েছিল। আমার রং, ভ্রূ, চোখ, ঠোঁট, ওর বাপের নাক, অবয়ব, মধুরতা, সরল হাসি।···কে জানে কোথায় আছে ? একটিবার—একটিবার যদি দূর থেকেও চোখের দেখা দেখ্‌তে পেতাম।...শান্তি,—পাপের শাস্তি। ভগবান সব দেখে দেন কি না।···খোকন বোধ করি এখন ঠিক ঐ ছেলেটির মত ছুটতে শিখেচে। . আশ্চর্য্যি···কি চেহারার মিল !···দেখ্‌ত ভাই লোক ফির্‌ল কি না—

—এই যাই। তুই বেশী বকিস্‌নে, ডাক্তার বারণ করেচে।—

• • • • •

—চাঁপা এলি ? বাপ্‌রে তোর কি চলন। আমি একযুগ তোর পথের পানে চেয়ে আছি। লোক এসেচে ?—

—হাঁ।—

—দিলে না ?·····

—না, বল্লে, এ বাড়ী ছেলে তারা পাঠাবে না, এটা যে গেরস্ত-বাড়ী নয়।—

—নাই বা হ'ল। খোকার মত বলেই আমি দেখ্‌তে চাচ্ছি। খালি চোখের দেখা দেখ্‌ব, তাদের ছেলেকে ছোঁবও না, খালি দূর থেকে—

—দুবার লোক ফিরে এসেচে। শেষবারে খোকার বাপ রাগ করেছিল।—

—আচ্ছা চাঁপা, ওরা ত গরীব।—

—হাঁ, কেন ?—

—এক কাজ কর্ব্বি ভাই ? আমার চাবীটা নিয়ে বাক্স খুলে নেক্‌লেস্‌টা চুপি চুপি খোকার মাকে পাঠিয়ে দিবি ? ওর বাপ যখন বাইরে থাকে তখন খোকাকে যেন পাঠিয়ে দেয়।—

—কি যে তোর সাধ ! লাভ কি পরের ছেলে দেখে ?—

—চাঁপা, যদি হ'ত বুঝ্‌তিস্। এই নাড়ী-ছেঁড়া ধন, দশ মাস দশ দিন যাকে দেহে ধরে রাখা যায়, স্তনের সাথে প্রাণের সমস্ত সুধা নিংড়ে যাকে পান করান যায়—উঃ বুঝিনি চাঁপা, তার এ শাস্তি।···যা লক্ষ্মী বোন্ আমার।—

—যাই, অত উতলা হোস না। পরের ছেলে, কেঁড়ে ত আনা যায় না—

• • •

—এলি চাঁপা ?—খোকা এলো—

—না, ফিরিয়ে দিয়েচে—

—কেন ? ওর বাপ বাড়ী আছে ?—

—নেই ; কিন্তু ওর মা বল্লে, বাবুর অনুমতি ছাড়া—

—খুব পার্ব্বে। নে যা ত আমার সব গয়না। আর বল্‌গে, আমি যা হই, এক দিন আমিও মা ছিলেম, আমার সকল হীনতার আড়ালে সে মা আজও বেঁচে আছে। সেও ত মা। মায়ের শেষ সাধ না মেটালে ভগবানের কাছে

তাকে অপরাধী হ'তে হ'বে।···নিজে যাবি ভাই? তোর পায়ে পড়ি লক্ষ্মী বোন্‌টি।···

• • • •

—টগর, নিয়ে এসেচি খোকাকে।—

—খোকা! কৈ, কৈ খোকা?—

—এই যে, খোকার মা তোর গয়না ফিরিয়ে দিলে।—

—কেন,—আরো চায়? আর ত আমার নেই।—

—না, সে কিছু চায় না।—

—কিছু না,—এত ভালো!···ও বুঝেচি,—এ যে আমার গয়না। সে স্বামীর স্ত্রী, কেন নেবে? তার ললাটে সিঁদুর, হাতে শাঁখা,—কুবেরের ঐশ্বর্য্য!···না নিক্, এসব আমি খোকাকে দোবো,—পাপ-পুণ্যের সংস্কার ত ওতে প্রবেশ করে নি।···কৈ খোকাবাবু এসো, —আরো কাছে এসো। আমি উঠ্‌তে পারি না ত। কি হয়েচে জিজ্ঞেস্ কোচ্ছ? ব্যথা, ভয়ঙ্কর ব্যথা এইখানে,—বুকে। তোমার হাতখানা দাও ত। আঃ কি ঠাণ্ডা, কি মিষ্টি! বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠ্‌চে! অনেকক্ষণ পরে আমার খোকা মাই খাবার জন্য কোলে এসে মুখ দেবার আগেই এক এক দিন যেমন স্তন থেকে ধারা ছুট্‌ত, তেম্নি বুক থেকে যেন সুধা নিঃসৃত হচ্ছে।···খোকন,—শোন, আরো কাছে এসো। একবার আমায় মা বলে ডাক ত'। ডাক্‌বে না? লজ্জা করে? বোকা ছেলে, আমিও ত তোর মা হই।···চাঁপা, ভাই, তুই একটু সরে যাবি?···হাস্‌চিস? খুব হাস্। আজ আমার সকল সাধ মিটিয়ে নিতে হবে।···খোকাবাবু, এসো তোমায় গয়নায় সাজিয়ে দিচ্ছি। এ সব তোমার,—আর ঐ কাচের আলমারীতে যত পুতুল আছে। হাঁ, ঐ কলের জাহাজ, ঐ বাঁশী, ঐ যে হাঁসের পেট টিপ্‌লে প্যাক্ প্যাক্ করে—সব তোমার। একবার আমায় মা বলে ডাক ত'।··· মা, মা,—ওঃ কাণ জুড়িয়ে গেল, সমস্ত ইন্দ্রিয়ে, দেহের সমস্ত শিরা, উপশিরা, শোণিতবিন্দুতে বান্ ডেকে উঠ্‌ল',— আঃ কি তৃপ্তি! মনে হচ্ছে আমার হারানো খোকাই বুঝি কোলে এসে আবার মা বলে ডাক্‌চে।···

—এবার যেতে চাও খোকন? তোমার বাবার ফের্‌বার সময় হয়েচে? তোমার মা তাই বলে দিয়েছেন? বড় লক্ষ্মী মা তোমার,—যেম্নি সোণার খোকা তুমি, তেম্নি সোণার মা। ভগবান তাঁকে সুখী কর্বেন।···হাঁ, আমি ত উঠ্‌তে পারি না। তুমি আলমারি থেকে পুতুলগুলো নিয়ে যাও। সব তোমার! যা হাতে ধরে, তুলে নাও, বাকীগুলো আমি পাঠিয়ে দোব।···এইবার যেতে হবে? আচ্ছা কাছে এসো, আর একটু দেখি। আর একটু বুকে হাত দাও ত। আঃ!···কিছু খাবে খোকন? মা বারণ করেচেন? তা হ'লে থাক্। আবার এসো?···ওহো ভুলে গেছি। তোমার নাম কি খোকন?···রতন। আশ্চর্য্যি—এক নাম। ভারি আশ্চর্য্যি!···আমরা দুজনে মিলে খোকার নাম রেখেছিলেন রত্নাকর, মিষ্টি নামের ভেতর এইটিতে শুধু ওর বাপের নামের মিল্ পেয়েছিলেন। তা থেকে ডাক নাম হয়েছিল রতন।···তোমার বাপের নাম কি রতন? কি—কি বল্লে খোকা?—হরিহর! বাড়ী?—ঈশানপুর!··· উঃ কি তুফান উঠ্‌ল,—পৃথিবী টল্‌মল্ কচ্ছে,—বিশ্বসংসার ধ্বসে যাচ্ছে!···খোকন, আমার মাণিক, আমার যাদু, আঁচলের নিধি আমার, নাড়ীছেঁড়া ধন আমার, আমার হারানো র—ত—ন—

··· ···

—টগর, টগর! কি হয়েছে? ও কি এলিয়ে পড়লি যে! আঁ্যা চোখ উল্টে গেল!···অ বকুল, মালতি, শীঘ্রী কাকে পাঠিয়ে দে ডাক্তার ডাক্‌তে। ওলো তোরা বেরিয়ে আয়। মাধব, তুমি খোকাকে তাদের বাড়ী রেখে এস।—

—কি লা চাঁপা, বাড়ী যে মাথায় করে তুলেচিস্! কাল বছরের দিনটায় নিজেরা অন্ধকারে ডুবে রইলি, আমাদেরও ফূর্ত্তি কর্ত্তে দিলি নি, আজ আবার চেঁচামেচি!—

—আর ফূর্ত্তি! টগর মরে গেচে!—

—মরে গেচে!··· তিরমী ফিরেচে বোধ করি। অন্ধকারে পেঁচাপানা মুখ করে বসে থাক্‌লে এ রকম হবেই।···টগর, ওলো টগর! তাই ত, চোখের পাতা পড়ে না যে! সত্যি মরে গেল!···এই ছোঁড়াটার জন্য ছাদ থেকে পড়ে অমন হ'ল। ও যেন কাল হ'য়ে এসেছিল।···কেন ফের আন্‌লি এটাকে?—

—ওর নিজের ছেলে।—

—বলিস্ কি লা?—

—হ্যাঁ।—

—অত টাম যার সে ছেড়েছুড়ে এ পথে বেরয় কেন?—

—আগে ত বোঝে নি।—

—ম'লও তাই। আমরাও ত বাবু ছেড়েছুড়ে এসেচি। প্রথমটা মন একটু কেমন: করেচে, এক চুমুক খেয়েচি—ব্যস্। এসে পড়েচি যখন কেঁদে কি হবে?—

—কিছু নয়, ওর বরাত। বয়স, ছুরত ছিল, ছপয়সা রোজগার কর্ত্তে পাত্ত।—

—বরাতে নেই, কি কর্ব্বে বল?—

—নে, এসব বলে লাভ নেই। ওর বাবুদের খবর দে, নিমতলায় নেবার ব্যবস্থা করুক।—

—এ বেলা আর বাবুদের পেতে হয় না। নিতে হবে আমাদেরই।—

—কেন বেঁচে থাকতে কত সোহাগ ছিল।—

—আর ত বেঁচে নেই, সোহাগও তাই মরে গেছে।—

—বাক্সে কিছু আছে ত, না সব ঐ ছোঁড়াটাকে দাতব্য করেচ? চাপার মত আদিখ্যেতা;—খুঁজে এনেচে ঐ ছোঁড়াটাকে! এনেছিলি—তুলিয়ে সব রেখে দিলেই হত।··· আহা মরে যাই তোমার ধর্ম্মের বালাই নিয়ে! অত টন্‌টনে ধর্ম্মজ্ঞান যার তার উচিত এ পথ থেকে খসে পড়া।···তোর সরের সব ঐ ছোঁড়াটাকে দিবি? তবে তোর গাঁট থেকে বার কর,—বিলিতি না হ'লে এই রেতে আমরা মরা ছোঁব না, থাকবি একা মরা আগলে।···কত আন্‌লি দেখি? দে, আমার ঘরে দুবোতল আছে, দিচ্ছি।···টগরের বাবুরা কেউ এলো? এলো না! কাল এ বাড়ীতে এলে মুড়ো খ্যাংরা মার্ব্ব।···ভাড়াটে লোক এসেচে? কলসী টলসী সব?—এস গো লোকেরা,—কাঁধে কর। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে নেব। ···আঃ ছুঁড়িটা পরশু তোরে নিমতলার ঘাটে নাইতে গিয়েছিল, ওকে ঘিরে কত পুরুষের ভিড়! আজও সেই ঘাটে যাচ্ছে,—সবাই সরে যাবে!···ঈঃ রাস্তাটা এখনো নিরুম, আলোগুলি যেন চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছে, গা ছম্‌-ছম্ করে।·· বল হরি, হরিবোল্!···

ছাত্র-মণ্ডল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

বাঙলা দেশের ছাত্র ওরা, বাণীর স্নেহের পাত্র ভাই;
মিষ্টি ওদের দুষ্টামি যে, নষ্টামি তায় মাত্র নাই।
পান্না দিয়ে হাল্কা করে গুণ্ডামি হীন গণ্ডগোল;
বক্ষ-সাগর আন্দোলি বয় নিত্য হাসির অট্টরোল।
থাকুক তবু দুদ্দুকপ্রিয় সত্যে অভিষিক্ত মন,
অন্নাহারী, ব্রহ্মচারী—তপ যে ওদের অধ্যয়ন।

কার্য্য ওদের মজ্জাগত কেউ করি নয় কল্পনায়;
নিত্য সাজায় বাণীর বেদী অশ্রু আঁখীর আলপনায়।
মহত্ত্ব হায় মূর্ত্তি হেরে ওদের বুকের দর্পণে,
যুগের যুগের কাব্য কবি সঞ্জীব ওদের তর্পণে।
আনন্দের ওই করণাগুলির কলধ্বনির অন্ত নাই,
পাষাণ বুকের ভাসান আদর তাপিত বুকের সান্ত্বনা।

তিব্বত এবং সুদূর চীনের আনলে খপর ওরাই যে,
গোরার মত নবদ্বীপের ওরাই ছিল বড়াই যে।
নালন্দাকে গড়লে ওরা, তক্ষশীলা করলে জয়,
ওরাই সঞ্জীব বিদ্যাপীঠ, আর ওরাই বিশ্ব বিদ্যালয়।
ওরাই অতীত সেকেন্দারার মৃতকালয় জীবন্ত,
ওরাই রাখে উজল করে হোমের অনল নিভন্ত।

ভোগবতীকে টানতে পারে ওরাই মোদের ভাগীরথী,
সাগর বুকে বাঁধলে সেতু বীণার শরের জাল বুনি।
দেশ-বিদেশের রত্ন এসে দেশকে করে সমৃদ্ধ।
তুলছে কালির আখর থেকে কাল-সাগরের অমৃত।
বোধিদ্রুমের ওরাই চারা, সমাজ বটের নামান গো,
মানস-সরের মরাল-শিশু একটু বেশী দামাল গো।

ছুটছে ওরাই দেশ-বিদেশে সাগর-গিরি লঙ্ঘি যে,
স্বরগ-সুধার সন্ধানী সব গরুড় পাখীর সঙ্গী যে।
সেক্সপীয়রের বন্ধু এরা, কালিদাসের আত্মীয়,
হাফেজ-সাদীর পংক্তি-ভোজী, পংক্তি হতে বাদ দিয়ো।
ওরাই হেলায় জয় করেছে ভবের ভাব-রাজ্যকে,
বুকের জোরে-জোর মিলালে প্রতীচ্য আর প্রাচ্যকে।

বাঙলা দেশের নব-কুশেরা মায়ের ব্যথা বুঝবে রে
যজ্ঞ তুরগ আটকে দেবে, স্নায়ের লাগি যুঝবে যে।
ধ্রুবলোকের পাহুরে যে ভিত এ সব ধ্রুব-প্রজ্ঞাদে।
দেখলে পরে বুক যে ভরে অপূর্ব্ব এক আহ্লাদে।
ওরাই দেশে করবে আবার নূতন ভাবের উদ্বোধন,
ওদের মাঝেই মিলবে আশু-বিদ্যাসাগর-রামমোহন।

শিশু-মৃত্যু ও তাহার কারণ

ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার

শিশু ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন-বিকাশের বীজ। আমরা উদ্ভিদ-জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, প্রকৃতি কঠিন-আবরণ বীজকোষের সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতর বীজ রক্ষার বিধান করিয়াছেন। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও বীজ যাহাতে সহজে নষ্ট না হইয়া যায় ইহার জন্যই কঠিন আবরণের সৃষ্টি। প্রাণীজগতে দেখিতে পাই যে ইতর জীবজন্তুদিগের বুদ্ধিবৃত্তির অভাব থাকিলেও তাহাদের সন্তানসন্ততিদিগের লালন পালনের দিকে তাহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। প্রকৃতি দেবী তাহাদের হৃদয় সন্তান-বাৎসল্যের দ্বারা এরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের অন্য সব দিকে বুদ্ধির অভাব থাকিলেও, প্রকৃতি-দত্ত সহজাত সংস্কার দ্বারাই তাহারা সন্তান-পালন সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। মানবজাতিকে ভগবান বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া ঐ সকল দায়িত্ব তাহাদের নিজেদের উপরেই ফেলিয়াছেন। শিশু ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয় হিসাবেই সর্ব্ব প্রধান সম্পত্তি। তজ্জন্য শিশুরক্ষার উপায় আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয় ভাবেই বিশেষরূপে বিবেচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যবোধ প্রণোদিত হইয়াই আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি।

বিগত ১৯১৭ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডে সর্ব্ব প্রথম জাতীয় শিশু-সপ্তাহ গঠিত হয়। সন্তান-পালন-পালন বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে,—বিশেষতঃ মাতৃজাতির মধ্যে যাহাতে বিস্তৃতি লাভ করে এই উদ্দেশ্য লইয়া এই সমিতির সৃষ্টি হয়, এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রতি বৎসর এক সপ্তাহকালব্যাপী জাতীয় শিশু-সপ্তাহ, অর্থাৎ শিশুগণের যথাযথ তত্ত্বাবধারণের উপায় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ইহার সুফল ইতিমধ্যেই জনসাধারণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন।

শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনার ফল আমাদের দেশেও ভবিষ্যতে তদ্রূপ হইবে, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে আশা করিতে পারি।

আমাদের বিশ্বাস নিম্নলিখিত কারণগুলিই প্রধানতঃ শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী :—

১। বংশগত দুর্ব্বলতা।

২। দেহের সম্পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্ব্বে এবং সংসার-পালনোপযোগী ভাবে উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে বিবাহ।

৩। মাতাপিতার স্বাস্থ্যাভাব ও অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস, পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া ও উদরাময় রোগের আক্রমণ।

৬। সহরের জনতা ও দূষিত বায়ু এবং গ্রামে মহামারি প্রভৃতি কারণে সন্তানের স্বাস্থ্যহানি।

৫। বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব।

৬। গর্ভাবস্থায় জননীর অসতর্কতা ও ডাক্তারের সাহায্য লওয়ার অক্ষমতা।

৭। প্রসবকালীন উপযুক্ত যত্নের অভাব—অশিক্ষিতা দাইয়ের পরিচর্য্যা।

৮। মাতার অস্বাস্থ্যকর সূতিকাগারে বাস।

৯। মাতার মৃত্যুহেতু সন্তানের মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত হওয়া।

১০। প্রমেহ, উপদংশ প্রভৃতি রোগের বিস্তারহেতু গর্ভপাত অথবা অপূর্ণাবস্থায় দুর্ব্বল সন্তান প্রসব। উপরিউক্ত কারণগুলির বিস্তারিতভাবে, এমন কি, সংক্ষেপে আলোচনা করাও এই সভার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। তজ্জন্য উহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রধান কারণ সম্বন্ধে আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১। জীবিকা অর্জ্জনের বিভিন্ন প্রকার ভেদের সহিত বংশগত দুর্ব্বলতার একটি ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে। যেমন যে সব জাতি বংশানুক্রমে উন্মুক্ত বায়ুতে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে তাহারা সাধারণতঃ সবল ও সুস্থ হয়, যেমন চাষী গৃহস্থগণ। আবার যাহারা গৃহের বদ্ধ বায়ুতে বিশেষ শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাহার ক্রমশঃই দুর্ব্বল হয়। যেমন মালাকার ও মসীজীবী ইত্যাদি। মুসলমানের মধ্যে চাষীর সংখ্যাই অধিক; সম্ভবতঃ এই জন্যই আদম সুমারীতে (Census Report) দেখা যায়—মুসলমানের সংখ্যা এবং হিন্দুর মধ্যে চাষী শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

২। বাল্য বিবাহ :—বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে আজকাল অনেক মনীষি লেখক লেখিকা অনেক পত্রিকাদিতে অনুকূল ও প্রতিকূল অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদের স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনরূপ সংখ্যানির্দ্দেশক তালিকা দেন নাই। যত দিন ঠিক ঠিক সংখ্যা নির্দ্দেশক তালিকাদি দ্বারা তাঁহাদের যুক্তি সমর্থিত না হইবে, তত দিন এই বিষয়ে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না। দৈহিক হিসাবে (Physiologically) বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত না হইলেও আর্থিক হিসাবে যে বাল্য বিবাহ দ্বারা শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ইহা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

কারণ, উপার্জ্জনক্ষম হওয়ার পূর্ব্বেই বংশবৃদ্ধি হেতু দারিদ্র্য উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য উপযুক্ত আহারের অভাবে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৩। দরিদ্রতাই যে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ, এ কথা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। দরিদ্রতার সঙ্গে শিশু-মৃত্যু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এ কথা যদি আমরা জাতীয় ভাবে ধারণা করিতে পারি, তাহা হইলেও আশা করা যায়, শিশু-মৃত্যু নিবারণের একটী সমবেত চেষ্টা হইতে পারে। এই বিষয়টির ব্যাপকভাবে আলোচনা করা আমাদের প্রবন্ধের মূলীভূত বিষয় নহে। যাঁহারা ভগবৎ কৃপায় লক্ষ্মীর ও সরস্বতীর কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির প্রসার বৃদ্ধি করে সহায়তা করিয়া দেশের দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা করেন, তদ্দ্বারা অনেক অসহায় শিশুর প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করা হইবে।

৪। সহরের জনতা :—সাধারণ নিয়মে পল্লীগ্রামগুলি সহর হইতে স্বাস্থ্যকর হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, পূর্ব্বে ইতালী ও গ্রীস এবং ইদানীং আলজিরিয়া, পানামা ও ফরমোজা প্রভৃতি দেশ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল, কিন্তু দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায় ঐ সব দেশ হইতে ম্যালেরিয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছে। সেইরূপ ভাবে সমবেত চেষ্টা দ্বারা কি আমাদের বঙ্গদেশ হইতেও ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইতে পারে না?

৫। বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের অভাব :—গোদুগ্ধের সহিত শিশুমৃত্যুর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আমি যখন খুলনার সিভিলসার্জ্জন ছিলাম, তখন শিশুমৃত্যুর সম্বন্ধে কিছুদিন গবেষণা করিয়াছিলাম। তৎফলে ইহা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই অবগত হওয়া গিয়াছিল যে, যেসব জায়গায় গরুগুলি প্রধানতঃ দূর্ব্বাঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করে, সে সব স্থানে শিশুমৃত্যুর হার খুব কম; এবং যে সব স্থানে জলো-ঘাস গরুর প্রধান খাদ্য, সে সব স্থানে শিশুমৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। এই কারণেই দেখা গিয়াছে যে, বর্ষাকালে (যে সময় জলোঘাসই গরুর প্রধান খাদ্য) শিশুমৃত্যু অধিক

হয়। এই জলোত্থাসেরও আবার প্রকারভেদে শিশুমৃত্যুর হারের তারতম্য হয়। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারীমাসে আমার গবেষণার ফল "ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে" প্রকাশ করার পর ঘাসের প্রকার ভেদে গুণাগুণ নির্দ্দেশের জন্য খুলনা জেলায় বঙ্গদেশের কৃষিশিল্প বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের কৃষকগণ এসব বিষয়ে অনেক সন্ধান দিতে পারে। ১৯১৮ সালে বড়ে খুলনাতে অনেক গরু মারা গিয়াছিল, সেই বৎসর এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর শিশু-মৃত্যুও গো মৃত্যুর সহিত ঠিক সমানুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

৬। অশিক্ষিতা দাইয়ের পরিচর্য্যা অনেক সময় শিশু-মৃত্যুর কারণ হয়। মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে দেশীয় দাইগণের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে উপকার হইতে পারে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকগণ শিশু-পরিচর্য্যা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। এমন কি শিশুর রোগ বিশেষ সাংঘাতিক না হইলে তাঁহারা কদাচিৎ চিকিৎসকের সাহায্য লইতেন। কিন্তু ইদানীং সে সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখনও যদি নবীনারা শিশু-পরিচর্য্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ বর্ষিয়সী গৃহিণীদিগের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন, তবে সে শিক্ষা আমাদের সন্তান সন্ততিগণের পক্ষে অধিক উপযোগী ও সহজ-লভ্য হয়।

আমাদের জাতীয় সাহিত্যে শিশুপালন সম্বন্ধে আলোচনার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যে এবিষয়ে বিস্তারিত ও ধারাবাহিকরূপে আলোচনা হইলে দেশের ও সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে।

খোকা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

'ক'

ধুবড়ীর রাজপথ দিয়ে চলেছিলুম্। ব্রহ্মপুত্রের পাশ দিয়েই সে রাস্তাটা চলে গেছে। রক্তের মত রাঙা সুরকির ওপর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে মনে হচ্ছিল—এ যেন কার বুকের রক্ত-নদী বেয়ে চলেছি। যুঁইফুলের মত শুভ্র জ্যোৎস্না-ধারা অঝোরে ঝরে পড়্‌ছিল। সুমুখেই ভিক্টোরিয়া গার্ডেনের গোলাপ-গুলো লাল-মণির মত জ্বল্‌ছিল···ওপারের শাল-বনে মর্ম্মর-ধ্বনি বয়ে চলেছিল···আর চেয়ে দেখ্‌ছিলুম্ ওই সরু পাহাড়ী পথটা কেমন এঁকেবেঁকে নীল-মায়ার দিকে ছুটে চলেছে, আবার এই পৃথিবীর মাটির টানে নেমে পড়েছে। বাসায় একটু কাজের তাড়া থাকায় হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছি—হঠাৎ ডেপুটী কমিশনারের বাঙ্‌লোর সুমুখে একটা বেঞ্চের দিকে আমার চোখ পড়্‌ল। তাতে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক, আর তাঁরই পাশে সুন্দর ফুটফুটে একটী ছেলে। বয়স বোধ হয় ছেলেটীর বছর পাঁচেক্ হবে···কর্ণা দিয়ে গোলগাল গড়ন। দুটো জিনিসকে এ পর্য্যন্ত আমি সত্যি করে ভালোবেসিছি—বই আর শিশু। ওঃ! বাদ পড়ে গেছে একটা—কুল···ওটাকেও আমি খুব ভালোবাসি! তাই ছেলেটীকে দূর থেকে দেখেই আমার ইচ্ছে হল তাকে একটু আদর কর্‌তে···কেন জানিনে···শিশুরা আমায় চিরকালই অম্‌নি করে টেনে এসেছে। আমি তাড়াতাড়ি একটা কন্দী এঁটে ছেলেটীর বাঁ হাতটা একটু চাপা দিয়ে হঠাৎ গিয়ে বসে পড়্‌লুম্ সেই বেঞ্চটার ওপরে···মনে হল একরাশ শিউলির ওপর বসে পড়েছিলুম্। আমি তক্ষুণি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটীকে কোলে তুলে নিলুম্... তার সঙ্গের সেই ভদ্রলোকটী···বোধ হয় খোকার বাবাই হবেন···একটু চড়াগলায় বলে উঠ্‌লেন—কেমন লোক হে ছোক্‌রা তুমি! চোখের মাথা খেয়ে বসেছ?

আমি ততক্ষণ খোকাকে কাঁধে তুলে নাচিয়ে হাসিয়ে

অনেকটা শান্ত করে ফেলেছি। ভদ্রলোকটী বোধ হয় আমার ব্যবহারে আর অতবড় একটা ঝাঁঝাল কথার জবাব না পেয়ে একটু ভড়কে গিয়েছিলেন···আবার একটু বিদ্রূপ আর রাগের সুরেই বল্লেন—বলি ওহে ছোক্‌রা, শুন্‌ছ?

আমার তখন হুঁস্ হল যে কাজটা আদবেই ভালো হয় নি...খোকাকে কাঁধে তুলে রেখেই অনুনয় করে বল্‌লুম্—দেখুন, কিছু মনে করবেন না···হঠাৎ থুথু দিয়ে ফেলেছি—সেজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত!

ভদ্রলোক একটু নরম হলেন। খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জান্‌লুম্ যে, তিনি ওখানকারই তিরিশ টাকা মাইনের লোকেল বোর্ডের ক্লার্ক···নাম সুকুমার সেন; আর আমার ভুল হয়নি যে খোকাটী তাঁরই ছেলে। তখন বোধ হয় আট্‌টা বেজে গিয়েছিল; তাই দেরী না করে আরও দু'চারটে কথাবার্ত্তার পর তাঁকে বল্লুম্—কিছু যদি মনে না করেন তো অনুগ্রহ করে এক দিন আমাদের বাসায় গেলে সুখী হব। ভদ্রলোকটীও আমার পরিচয় জেনে নিয়েছিলেন ···তিনি রাজী হলেন।···ছেলেটীর কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে এলুম্···ওকে আমার কেন এত ভাল লেগে গেল! সেদিন রাতে যে কাজগুলো করব ভেবে রেখেছিলুম্ তা আর হল না।

'খ'

সেদিন বাইরের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে রুশীয় লেখক এণ্ড্রিয়েফের 'দি রেড্ লাফ্'—খানা পড়্‌ছিলুম। আগাগোড়া বইখানা শেষ করে আবার প্রথম পাতায় এসে যেই আরম্ভ করেছি···Horror and madness...অম্‌নি কে একজন যেন কড়ানাড়া দিয়ে ডাক্‌লেন—প্রেমল বাড়ী আছ?

আঁৎকে উঠ্‌লুম্···এ যে সেই খোকার বাবার ডাক! তাড়াতাড়ি উঠে দোরটা খুলে তাঁকে বসালুম্। খোকা এসেই আব্‌দার ধর্‌লে—প্রেমলদা, আমায় তোমার ওই বইগুলোর ওপর তুলে দাও না!

কত বারণ কর্‌লুম্—কিন্তু তাকে শেষকালটা বইয়ের র‍্যাকের ওপর বসিয়ে দিতে বাধ্য হলুম্···কে শোনে আমার মানা! র‍্যাকে উঠেই সে খিল্‌খিল্ করে হেসে দিলে!

সেই সেদিন সন্ধ্যের চেনার পর থেকে এর মধ্যে খোকা প্রায় রোজই আমার কাছে এসেচে। প্রথম প্রথম তার হাতে একটা বিস্কিট্ কি লজেন্স্ গুঁজে দিতে ঢের সাধ্যি-সাধনা কর্‌তে হয়েচে। তবে এখন বেশ ভাব হয়ে যাওয়াতে আর সে কোন আপত্তি বা সঙ্কোচ করে না···শুধু তাই নয়, আমি এরি মধ্যে তার প্রেমলদা হয়ে গেছি। সুকুমার বাবু বল্‌লেন—"ছাখো প্রেমল, চব্বিশটী ঘণ্টা ওর তোমায় চাইই চাই, কী করি বলতো? বড় জ্বালাতন হয়ে গেছে কিন্তু ও তোমার!"

আমি একটু হেসে র‍্যাঁম্বো আর টুর্গনিভের ছুটো বই সুকুমার বাবুর হাতে দিয়ে বল্‌লুম্—"আপ্‌নি দয়া করে একটু বসুন, আমি খোকাকে মার কাছে নিয়ে যাই।"

এই বলে আমি খোকাকে কোলে করে বাড়ীর ভেতর চলে এলুম্! ওর গায়ে ছিল একটা ছেঁড়া তালি দেওয়া সোয়েটার···কী করবে বেচারী তিরিশটী টাকা পুঁজি নিয়ে! পরশু দিন আমার ভাগ্‌নে সাদুর জন্যে একটা লালিম্‌লির সোয়েটার কিনে এনেছিলুম। খোকাকে ভুলিয়ে তার ছেঁড়া সোয়েটারটা খুলে সেই নতুনটা ওকে পরিয়ে দিলুম্। খোকার নাম বল্‌বার ধরণ দেখে আমি কোন দিনই হাসি চেপে রাখ্‌তে পারিনি···বল্লুম্—"খোকা, তোমার নামটী কী বল দিকিন্।"

খোকা গম্ভীর মুখে দিব্যি ভারিক্কি চালে জবাব দিলে—"শ্রীশিহরণ সেন।"

আমরা দু'জন এমি সব কথার ভেতর দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলুম্। ওঃ! হ্যাঁ, খোকার গায়ে সোয়েটারটা পরিয়ে দিয়ে আমার ভাবনা হল, সুকুমার বাবু এ দেখে কি বল্‌বেন। তাই একটা কাগজে লিখ্‌লুম্ "খোকার দাদা এটা তার ছোট ভাইটীকে দিচ্ছে, ফিরিয়ে দিলে সে কিন্তু ভয়ানক দুঃখিত হবে।" তার পর সেই কাগজ-টুকুন্ পিন্ দিয়ে এঁটে দিলুম্ খোকার পেছনে। সুকুমার বাবু যখন চা খেয়ে গেলেন, রাত্রির কৃষ্ণাঞ্চল তখন পৃথিবীর গায়ে এসে পৌঁছেচে। তাই তিনি নতুন সোয়েটারটা আর দেখ্‌তে পেলেন না। দেখ্‌লে এতবড় অপমানটা বোধ হয় তিনি সইতে পার্‌তেন না!

• • • •

মাস কয়েক বাঙ্‌লা দেশ ঘুরে ফিরে এসেচি।

খোকার দৌরাত্ম্যের অভাবটা কিন্তু বুকে বড় বেজেছে। কী চোখেই ওকে আমি প্রথম দেখেছিলুম্..জানিনে আর·

জন্মে ও আমার কে ছিল!……সেদিন সন্ধ্যের সময় গেলুম্ খোকাদের বাড়ী। দেখি বাড়ীর সুমুখে রকে বসে আছে বছর বারো তেরোর একটী ছেলে। খোকাদের বাড়ীতে আমি হামেশাই যেতুম্, কিন্তু সে ছেলেটীকে আর কোন দিন আমি এদের বাসায় দেখিনি। তাই চেনা করে নেবার জন্ত জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম্—"এইটে সুকুমার বাবুর বাড়ী, কেমন?"

ছেলেটী নেহাৎ নিরুৎসাহভরে উত্তর দিলে—"আজ্ঞে হাঁ, কাকে খুঁজ্‌চেন আপনি?"

বল্‌লুম্—"খোকাকে একটু ডেকে দিতে পার?"

ছেলেটী খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্‌লে—"খোকা তো দু'হপ্তা হ'ল নিউমোনিয়ায় মারা গেছে।"

মাথাটা আমার হঠাৎ গুলিয়ে গেল…চোখ দুটোর ওপর কে যেন সরু একটা কালো পর্দা টেনে দিলে। মনে হল, পায়ের নীচের পৃথিবীটা একটা তুমুল ভূমিকম্পের আবর্ত্তনে ঘুর-পাক্ খাচ্ছে। পড়ে গেছলুম্ আর কি…কোন রকমে উঁচু রক্‌টার একটা কোণ ধরে নিজেকে সাম্‌লে নিলুম্। ছেলেটী থতমত খেয়ে একটা মোড়া এনে আমায় বসিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ চুপ্ করে বসে রইলুম। ছেলেটী কেন জানিনে বল্‌লে—"মরবার সময় খোকা ওর প্রেমলদা না কি কার কথা বল্‌ছিল…আমি তাঁকে চিনিনে।" গলাটা শুকিয়ে গেছ্‌ল তবু কোন রকমে জিব্‌টাকে একটু ভিজিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম্—"আর কী কী বল্‌ছিল সে?"

ছেলেটী উত্তর দিলে—"আরও কত আবোল্-তাবোল্ বক্‌ছিল যে তার আর শুনি শুপ্‌তা নেই। ওর সেই প্রেমলদা না কি ওকে খুব ভালোবাস্‌তো…এম্‌নি কত সব।"

আর পার্‌লুম্ না। আমার ষোল বছরের জীবনের ভেতর অমন আঘাত আর পাইনি…চোখ দিয়ে আমার টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়্‌লুম। বাইরে তখন তুমুল ঝড়ের তাণ্ডব-নৃত্য বয়ে চলেছে…ওঃ! খোকারে আমার!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

চরক ও সুশ্রুত

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, ভিষগরত্ন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী,
এইচ-এম-বি, এল-এ-এম-এস

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে সকল প্রকার চিকিৎসার সার মূল, ইহা বড়-বড় সাহেব ডাক্তারেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে কথা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন নাই। সত্য ও ত্রেতার সন্ধিক্ষণে প্রাণী সকল যখন রোগে পীড়িত হইতে লাগিল, মহর্ষি ভরদ্বাজ সেই সময় অমরনাথ ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আনিলেন। ত্রিকালদর্শী অন্যান্য ঋষিগণও প্রকৃতি-পুঞ্জের স্বাস্থ্য কামনায় ভরদ্বাজের নিকট হইতে উহার শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। "চরক-সংহিতা" এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। এজন্ত "চরক" ঋষিমুনির আয়ুর্ব্বেদের আদি গ্রন্থ। আরবীয়েরা এই চরকের অনুবাদ করিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন—সরক।

সুশ্রুত-সংহিতা চরকের অনেক পরে বিরচিত। মহর্ষি ভরদ্বাজ যেমন ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, ধন্বন্তরিও সেইরূপ উপদেষ্টা বা গুরু—দেবরাজ ইন্দ্র। ধন্বন্তরিই এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেবগণের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং শল্যতন্ত্রাদি অষ্টাঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্ত পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়া মানবরূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত এবং অন্যান্য আর্য্য ঋষি এই বিদ্যা দিবোদাস বা ধন্বন্তরির নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মহর্ষি সুশ্রুত প্রণীত "সুশ্রুত-সংহিতা" তন্মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের শল্যবিদ্যা শিক্ষা করিবার ইহাই প্রধান গ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধুনা শল্যবিদ্যায়

চরমোন্নতি সাধন করিয়া চরকসংহিতাকে সংস্কৃত করিয়া তুলিয়াছে—তাহার মূল ভিত্তি হইল এই সুশ্রুত সংহিতা। কিন্তুদধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই মহান গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

চরক ও সুশ্রুত—দুইখানি মহামূল্য আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থরত্নের অনুসন্ধান রয়: যিনি এই দুইখানি গ্রন্থ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না। অধুনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ঐ দুইখানি মহাগ্রন্থের পঠনপাঠন করিয়া চিকিৎসা করা বেশ হইতে একরূপ লোপ পাইয়াছে, কিন্তু এমন এক দিন ছিল—যেদিন এই দুইখানি মহাগ্রন্থের অনুশীলন পাইবার জন্য সমগ্র বিশ্ব উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। আরব দেশের অধিবাসিবৃন্দ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

চরক ও সুশ্রুত উক্ত সংহিতা পাঠেই অবগত হওয়া যায়,—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরস্পর সংযোগকে আয়ু বলে। এই আয়ুর হিতাহিত, ব্যাধির নিদান ও প্রশমনের উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত, তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। এই আয়ুর হিতাহিত—কথাটীর বিশ্লেষণ করিবার জন্য চরক ও সুশ্রুত উভয় সংহিতাকারকেই আপ্তবাক্য, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং উপমানের বহু প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। উভয় সংহিতাকার স্ব স্ব সংহিতায় পুরুষ কি,—ব্যাধি কি,—স্বাস্থ্য কি,—রুগ্ন কি,—আয়ের দ্রব্যগুণ, সৌম্য পদার্থ, ওষধি বিবরণ, ব্যাধি সকলাদির হেতু প্রভৃতি অনেক কথারই বিশদ ভাবে মীমাংসা করিয়া দিয়া তাহার পর চিকিৎসার সূত্রের প্রকৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এক কথায় চরক ও সুশ্রুত কেবল চিকিৎসার গ্রন্থ নহে, বিশ্ববাসীর সার্ব্বজনীন বিদ্যা এই দুইখানি মহাগ্রন্থে নিহিত। আমাদের মনে হয়, কাহারও চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদের অমূল্য রত্ন এইখানি মহাগ্রন্থ ভাল করিয়া পড়িয়া রাখিলে তাঁহাকে আর সংসার-ধর্ম্ম পরিচালনায় কোনোরূপ কষ্ট পাইতে হয় না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ আয়ুর্ব্বেদের মূল ভিত্তি। দেহোৎপত্তির কারণও এই তিনটী। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

"বাত পিত্ত শ্লেষ্মাণি এব দেহে সমাস হেতবঃ। তৈরে ব্যাপন্নৈরো দোষ মধ্যোর্দ্ধ সঞ্চারিণৌঃ শরীরমিদং ধার্য্যতে নানাবিধ দুঃখাতিঘি শতিরক্ত মিত্যুনবাপ্নুবন্তে। ত এব সাম্যেনঃ প্রসন্নহেতুসমুদয়েজিতের শোণিত চতুর্থৈঃ সম্ভব স্থিতি লক্ষণেপা বিরহিতং শরীরং ভবতি। তস্মাৎ। নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তাত্ত চ মারুতাৎ। শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ ঐতেন ধার্য্যতে।"

(সুশ্রুত সূত্রস্থান একবিংশতিতমোঽধ্যায়)।

অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দেহোৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিবে। অব্যাপন্ন (অবিকৃত) বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটী দেহের অধঃ মধ্য ও ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত হইয়া তিনটী দৃঢ় অর্থাৎ শুষ্ক দ্বারা সংহিত গৃহের ন্যায় শরীরকে ধারণ করিয়া রাখে। এই নিমিত্ত কেহ কেহ এই দেহকে ত্রিদুঃখ আধার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বায়ু, পিত্ত, কফ ব্যাপন্ন অর্থাৎ বিকৃত হইলে দেহ ধ্বংসের অর্থাৎ বিনাশের হেতু হইয়া থাকে। পরন্তু, এই ত্রিদোষের অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফ এবং শোণিত এই চারিটী পদার্থ উৎপত্তি, স্থিতি প্রলয়-কালেও অবিরহিত ভাবে দেহ-মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে জানিবে। সুতরাং বাত, পিত্ত, কফ ও রক্ত—এই দ্রব্য চতুষ্টয় ব্যতীত কিছুতেই শরীর রক্ষিত হইতে পারে না বলিয়া উহারা নিয়ত এই দেহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এই বায়ু, পিত্ত ও কফ কিরূপে শরীরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য ঋষি বলিয়াছেন,—

"বিসর্গাদান বিক্ষেপৈ সোম সূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফ পিত্তানিলা স্তথা।"

অর্থাৎ যেমন চন্দ্র স্বীয় শীত কিরণ অর্থাৎ শীতলতা প্রদান করে ও সূর্য্য আপনার উষ্ণ রশ্মি দ্বারা চন্দ্রের শীতলতা আকর্ষণ (গ্রহণ) পূর্ব্বক উষ্ণতা প্রদান করে এবং বায়ু ঐ উভয়ের সঞ্চালন দ্বারা জগৎকে ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ কফ—সৌম্য দ্বারা শরীরকে আর্দ্র করে ও পিত্ত—উষ্ণতা দ্বারা শুষ্ক করে এবং বায়ু স্বীয় গতি প্রবাহ দ্বারা উক্ত শীতোষ্ণাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক দেহকে রক্ষা করিতেছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূল সূত্র এই বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রত্যেকটী আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। বায়ুর শ্রেণীবিভাগে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। পিত্তের নামকরণে উহাদের সংজ্ঞা হইয়াছে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এবং কফের সংজ্ঞা নির্দ্দেশে উহাদিগকে বলা হইয়াছে ক্লেদক, অবলম্বক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষক। বায়ুর এক কথায় পরিচয়—উহা গমনাদি শারীর-চেষ্টাসমূহের প্রবর্ত্তক। শরীরের উচ্চাবচ স্থানসমূহের নিয়ন্তা, মনের প্রেরক, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অভিবাহক, শরীরের সন্ধানকারক, বাক্যের প্রবর্ত্তক, কর্ণের শব্দবোধ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্পর্শবোধের মূল, হর্ষ ও উৎসাহের যোনি, অন্তরাগ্নির বোধনাশক, মলসমূহের নিষ্কাশক, মূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ ধাতুর ভেদকারী, গর্ভাকৃতির কর্ত্তা এবং আয়ুর আধারীভূত। বায়ু শরীরে কুপিত হইলে শরীরকে নানাবিধ রোগ দ্বারা ক্লেশিত করে। এই বায়ুই উৎপত্তির কারণ, আবার ক্ষুভনের সৃষ্টি-সংহারকারক।

পিত্তের পরিচয়ে আমরা জানিতে পারি, প্রাণীদিগের দেহমধ্যে যে অগ্নি বিদ্যমান, পিত্ত তাহারই নামান্তর। এই পিত্তই জীবদেহে দাহন ও পাচন প্রভৃতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। এই পিত্ত ক্ষীণ হইলে অগ্নি গুণবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ ও উষ্ণাদিগুণ পিত্তের সমান গুণান্বিত দ্রব দ্বারা উহা বর্দ্ধিত হয়। পিত্ত অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে শীতল ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হয়।

কফ—পিত্তের বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট। পিত্তের গতি জীবদেহে ঊর্দ্ধদিকে বর্ত্তমান হইয়া থাকে, এইজন্যই কফের আশ্রয়—আমাশয়—পিত্তাশয়ের উপরি সংস্থিত। যেরূপ দিক্ দর্শনে সূর্য্যের উপরি চন্দ্র অবস্থিত থাকায় সূর্য্যের উষ্ণ কিরণের আধার স্বরূপ, সেই প্রকার আমাশয় পিত্তের

তেজঃক্রিয়ার আধারস্বরূপ হেতু তোমা, ভক্ষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহারেরও আধার বলিয়া জানিবে। এই চতুর্ব্বিধ আহার দ্রব্য উদকগুণ অর্থাৎ দ্রব স্নেহাদি দ্রব গুণযুক্ত; আমাশয়িক রস দ্বারা স্নেহ ভাবাপন্ন ও শিথিল-সংযোগ হইয়া সুখে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে জানিবে।

উপরে অতি সংক্ষেপে বায়ু, পিত্ত ও কফের পরিচয় প্রদত্ত হইল মাত্র; বস্তুতঃ এই তিনটীর বিশদ পরিচয় দিতে হইলে প্রবন্ধ অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা এই বায়ু, পিত্ত ও কফের উপরই সংস্থিত। এই বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইলেই প্রাণীদিগকে রোগগ্রস্ত হইতে হইবে—ইহাই আর্য্যঋষির অমূল্য উপদেশ। মহর্ষি সুশ্রুত, এই বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশমনের বিষয় বুঝাইবার জন্য দোষ ও দূষ্যাদি ভেদে ঋতুবিভাগ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা কেবল চিকিৎসা ব্যবসায়ী কেন, সকল গৃহস্থেরই পাঠ করা উচিত। পৃথিবীর কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধি-সকল এরূপ ভাবে সুবিন্যস্ত আছে কি না জানি না। ঐ উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে পারিলেই স্বাস্থ্যরক্ষা করা হয়।

ঋষি উপদেশে কোন্ কথাটা স্বাস্থ্য রক্ষার বিহিত বলিব না? চরক ও সুশ্রুতের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক ছত্রই স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রদানের জন্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বায়ু প্রকোপের কারণে সুশ্রুত বলিয়াছেন,—বলবান্ ব্যক্তিদিগের সহিত অতিরিক্ত ভাবে যুদ্ধ করিলে, অত্যন্ত স্ত্রী সংসর্গ করিলে, অধিক অধ্যয়ন করিলে, উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে, অতি দ্রুত দৌড়াইলে, অতিশয় শরীর মর্দ্দন করিলে, লগুড়াদি আঘাতপ্রাপ্ত হইলে, বেগের সহিত গর্ত্তাদি অতিক্রম করিলে, লাফাইয়া লাফাইয়া চলিলে, অতিরিক্ত সন্তরণ প্রদান করিলে, রাত্রি জাগরণ করিলে, ভার বহন করিলে, হস্তী, অশ্ব, গাড়ী ও পদ দ্বারা অধিক গমন করিলে, কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, শীতল, শুষ্ক শাক, শুষ্ক মাংস, বন্য কোদোধান্য প্রভৃতি ভোজন করিলে, অল্প ভোজন বা উপবাস করিলে, বহু ভোজন বা অকালে ভোজন করিলে, অধোবায়ু, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, বমি, হাঁচি, উদ্গার ও ক্রন্দন এই সকলের বেগ ধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে।

পিত্ত প্রকোপের কারণে ঋষি বলিয়াছেন,—ক্রোধ, শোক, ভয়, পরিশ্রম, উপবাস, বিষম, (ভুক্তদ্রব্য অম্লপাকহেতু কষ্টে জীর্ণ হওয়া) মৈথুন, উপগমন, কটু, অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিল তৈল, তিল বাটা, ছাগমাংস, মেষমাংস, দধি, তক্র, সুরা সেবন ও আতপ সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হয়।

শ্লেষ্মা প্রকোপের কারণ নির্ণয়ে ঋষির মীমাংসা—দিবা নিদ্রা, আলস্য পরিশ্রম না করা, অলসতা, মধুর, অম্ল, লবণ, শীতল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, স্নেহজনক, গোদুগ্ধ, তিল, পিষ্টক-বিকৃতি (চাউলের পিঠা), দধি, গুড়, পায়স, ইক্ষু বিকার (গুড় প্রভৃতি), মহিষ বরাহাদি মাংস, কচ্ছপ মাংস, কেশুর, পানিফল, তাল, নারিকেলাদি, নাউ, কুমড়া, এই সকল দ্রব্য মিষ্টা সম্যক্‌রূপে ভোজন এবং অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজনে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহাতে আয়ুর কথা বর্ণিত থাকে তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। এই আয়ুঃ বিস্তারের বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি চরক ও সুশ্রুতের এত কথা বলিবার আবশ্যকতা হইয়াছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, চরক ও সুশ্রুত শুধু চিকিৎসা গ্রন্থ নহে, গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় সকল সংসারেই ইহা রক্ষিত হওয়া উচিত।

শরীরের মূল কি—ইহা বুঝাইবার জন্য সুশ্রুত বলিয়াছেন, যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের পক্ষে মূলই প্রধান, সেইরূপ প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের পক্ষে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ত্রিদোষ, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র এই সপ্তধাতু এবং পুরীষাদি মল—শরীরের মূল জানিবে। বায়ু, পিত্ত, কফের দ্বারা যেরীতিতে কি কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। রস ধাতুর দ্বারা শরীরের প্রীণন অর্থাৎ স্নিগ্ধতা প্রভৃতি কার্য্য ও রক্তের পোষণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। মাংসের দ্বারা শরীরের পোষণ ও মেদের পুষ্টি সাধিত হইতেছে। মেদের দ্বারা স্নেহ ও মেদের পোষণ ও অস্থির দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে। অস্থির দ্বারা মেদ ধারণ ও মজ্জার পোষণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। মজ্জার দ্বারা প্রীতি, স্নেহ, বল শুক্রের পোষণ এবং পূর্ণতা নিষ্পাদিত হইতেছে। শুক্রের দ্বারা ধৈর্য্য, হর্ষণ, প্রীতি, মেদের বৃদ্ধি, হর্ষ ও ঔদার্য্য অর্থাৎ গর্ভের প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইতেছে। পুরীষের দ্বারা—শরীর ধারণ এবং বায়ু ও অগ্নি ধারণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। মূত্রের দ্বারা বস্তির পূরণ ও আহারাদির ক্লেদ নিঃসরণ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। চরকের চিকিৎসা-স্থানের রসায়ন অধ্যায় ইহারই ভিত্তির উপর লিখিত। চরক বলিয়াছেন,—

"লাভো পায়োঽি-পুরুষং রসাদীনাং রসায়নম্।"

অর্থাৎ রসাদি ধাতুসমূহ লাভ করিবার উপায় স্বরূপ বলিয়াই ইহার নাম রসায়ন। রসায়ন উহা সেবন করিলে—

দীর্ঘায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
প্রভাবর্ণ স্বরৌদার্য্য দেহেন্দ্রিয় বলং পরম্॥"

অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তরুণতা, প্রভা, বর্ণ ও স্বরের পুষ্টি, স্নেহ ও ইন্দ্রিয়দিগের বল, বাকসিদ্ধি, প্রণতি ও কান্তি লাভ হইয়া থাকে। রোগবিশেষে আক্রান্ত হওয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও নানা কারণে মানবের বহুপ্রকার ক্ষয় সর্ব্বদাই হইতেছে, আর্য্য ঋষি তাহা চিন্তা করিয়াই চিকিৎসা স্থানের প্রথমেই রসায়ন চিকিৎসার কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই রসায়ন চিকিৎসা, আয়ুর্ব্বেদের মহান্ গৌরব। এরূপ চিকিৎসাও অন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র এখনও অধিগত করিতে সমর্থ হয় নাই।

অপত্যকামী পুরুষ ও স্ত্রীলোক মাত্রেরই শুক্র ও শোণিতের বিশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সুশ্রুতের অমূল্য উপদেশে এ সকল কথাও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঋতুমতী নারীর কর্ত্তব্য, ঐ সময়ে পুরুষের কর্ত্তব্য—কিরূপ নিয়মে থাকিলে সুসন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে—এ সব কথাও মহর্ষি সুশ্রুত অতি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। এ সব উপদেশ পালন করিয়া চলিলে পৃথিবী হইতে

যেমন রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেইরূপ অন্নায়ুর সংখ্যাও কমিয়া যায়। আমরা এই সকল উপদেশ পালন করিতে জানি না বলিয়াই তো এখন আমাদের এই দুর্গতির চরম অবস্থা। শুধু রোগ রোগ বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে কেন, রোগ না হইবার যে সকল বিধি ব্যবস্থা আর্য্য ঋষি দিয়া গিয়াছেন, তাহা অব্যাহত ভাবে পালন কর; দেখিবে, দেশের সংসারে রোগের প্রাদুর্ভাব সত্যসত্যই অনেক কম পড়িয়া গিয়াছে। ঋষির উপদেশ মানি না বলিয়াই আজ আমাদের এত দুঃখ। হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুর স্বাস্থ্যের সহিত জড়িত—এ কথাটি আমরা যতদিন না বুঝিতে পারিব, আর্য্য ঋষির অমূল্য উপদেশাবলী যতদিন না আমরা সর্ব্ব কর্ম্মে পালন করিতে শিখিব, সমস্ত চিকিৎসার মূলসূত্র চরক ও সুশ্রুতকে যে পর্য্যন্ত না আমরা সমাদর করিয়া সকলসময়ে বরণ করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত যে আমাদের কল্যাণ নাই এ কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

"দেহ দেশস্থ যো রক্ষু তজ্জং তস্যৌষধম্ হিতম্।"

এই প্রসঙ্গে এ কথাটিও আমাদের স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার অর্থ এই—যে দেশের প্রাণী, তাহার পক্ষে সেই দেশের ঔষধই হিতকর। আমরা যে কারণেই হউক—এ কথাটার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অদ্যও প্রস্তুত নহি। আমরা জানি, ম্যালেরিয়া জ্বরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইলে ইহা উপকার হইবে। কিন্তু সেই উপকারের পরিণতি যে কোথায়—তাহা তো আমরা ভাবিয়া দেখি না। ঋষি, বায়ু, পিত্ত, কফের উপর বিচার করিয়া তাবৎ রোগেরই চিকিৎসা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সেই সঙ্গে উহাদিগের ভোগ কালেরও যে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, প্রকৃত আরোগ্যকামী ব্যক্তির সেই ভোগকালের অপেক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা সে ভোগকালের যে অপেক্ষা করেন না, তাহার ফলে উহাদের চিকিৎসায় আশু রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেও উহার দ্বারা অন্য ব্যাধি কর্ত্তৃক যে আক্রান্ত হইতে হয়—একথা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যার আন্দোলন

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ বি-ই

আমাদের দেশের স্থপতি-বিদ্যার পুনরুদ্ধার হউক, ইহা সকলেই চান; এবং এই পুনরুদ্ধার কার্য্যে ব্রতী যাঁহারা, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তাহা বলিয়া হুজুগ জিনিসটা ভাল নহে এবং হুজুগে মাতিয়া যাঁহারা আসল জিনিস হইতে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কলা-বিদ্যার অবমাননা করেন। আর, যাঁহারা ঐ হুজুগের বাজীকর, তাঁহারা অতিরিক্ত কৃপার পাত্র। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যার নামে এইরূপ একটা হুজুগের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে এই "পুনরুদ্ধারের" নীতিগত এক বৈঠক বসিয়াছিল এবং শ্রীশবাবু সেখানে এক বৃহৎ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার পরেই কলিকাতা বিউনিসিপ্যাল গেজেটে তাঁহার ধারাবাহিক গুণগান বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আসল কথাটা এই যে, পাঠকপাঠিকাগণ যাঁহাকে যথার্থ শিল্পী বলিয়া জানেন, তাঁহাকে "খাড়া দিয়া ঘড় করিবার জন্য কখনও বল-বিন্যাসের আন্দোলনের অবিশ্যকতা হইয়াছে কি? নিম্নে শ্রীশবাবুর বক্তৃতার বা প্রবন্ধ পাঠের একটু সমালোচনার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আসল সমালোচনা পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেদের মনে করিয়া দেখিবেন।

একটা মজার জিনিষ ভাবিয়া দেখিবার আছে যে, ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদ কেহই ছিলেন না। চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানবিদ্ এবং সাধারণে এই বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীশবাবু ঐ বৈঠকে যে সব অবান্তর প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন, তাহার সমালোচনা করিবার মত কেহই উপস্থিত ছিলেন না, বা থাকিলেও ও-বিষয়ে তত মনোযোগ করেন নাই। কাজেই শ্রীশবাবুর প্রস্তাবনা যে একটা "পাকা" জিনিস হইয়াছিল, ইহা বলা যায় না।

ওই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে শ্রীশবাবুর যে বক্তৃতা বাহির হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিবেন যে, ঐ উদ্ভট কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে!

শ্রীশবাবুর প্রস্তাবের মধ্যে একটা এই যে, মিউনিসিপ্যালিটীতে একটা নূতন ভারতীয় স্থপতি বিভাগের সৃষ্টি করিতে হইবে। ঐ বিভাগে আদর্শ বস্তাবাসগৃহের বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিবে, পারিশ্রমিক লইয়া সাধারণের ইমারত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা হইবে, ভারতীয় স্থপতির আদর্শে যাঁহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য আইনের "ঘাড়-ভোড়ের" বিধান হইবে, যখনসময়ে গবর্ণমেণ্টের পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টটা হস্তান্তর করিয়া লওয়ার ক্ষমতা থাকিবে, ইমারতের মাল-মশলা প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা স্থাপিত করা হইবে এবং ঐ সব মালমশলা বিক্রয়ের জন্য দোকান খোলা হইবে, বিলাতীর বিলাতের-সমূহের সাহায্যে সাধারণকে ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হইবে, পুস্তকালয় থাকিবে এবং সহজ কথায়, ঐ বিভাগে থাকিবে না এমন কিছু নাই। এক কথায়, বিভাগটি একটী দ্বিতীয় কল্পতরু হইবে। এখন, এই প্রস্তাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উঠিতে পারে:—

(১) শ্রীযুক্তবাবুর প্রস্তাবের মোটামুটি কত খরচ?

(২) কোন্ আইনবলে ঐ নূতন স্থপতি-বিভাগকে তাহার নানাবিধ কার্য্যে ক্ষমতা দেওয়া হইবে এবং উহার ব্যয় বহন কে করিবে?

(৩) করদাতাগণের শ্রীযুক্তবাবুর স্থপতি-বিদ্যা বিষয়ে কি এতই আগ্রহ যে, তাঁহারা এখনই শ্রীযুক্তবাবুর উদ্ভট কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ছুটিবেন এবং তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা কি এতই সচ্ছল?

(৪) কলিকাতা কর্পোরেশনের স্থপতি-বিভাগের যিনি উপস্থিত

কর্ণধার তিনি Royal Institute of British Architectsএর একজন "ফেলো"। তিনি কি এতই অক্ষম যে, ভারতীয় স্থাপত্যের পুনরুদ্ধার করে কিছুই করেন না বা করিতে পারেন না? ইহার জন্যই শ্রীযুক্তবাবু কি তাঁহার নূতন বিভাগের এবং নূতন খরচের প্রস্তাব আনিয়াছেন?

(৪) করদাতৃগণ প্রস্তাবিত বিভাগটীকে একটী ব্যবসায়ের আড্ডা করিতে দিবেন কি এবং তাঁহারা উপস্থিত মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের অতিরিক্ত অর্থ ইমারত তত্ত্বাবধান ইত্যাদি বাবদে মিউনিসিপালিটীকে দিতে রাজী আছেন ত? এই ব্যবস্থায় মিউনিসিপ্যালিটীর বিল্ডিং ব্যবসায়ে একাধিপত্য জন্মিবে না কি এবং সাধারণ বিল্ডিং ব্যবসায়ী-দিগকে ইহার কলে গলা টিপিয়া মারা হইবে না কি?

(৫) কলিকাতা অথবা বাংলার যদি কোন আধুনিক স্থপতি-বিদ্যা থাকে, তবে তাহাকে দেশীয় বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে "খাপ" খাওয়াইয়া কিছু করা যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে কলিকাতায় ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের স্থপতি জোর করিয়া প্রবেশ করান সুবিধা হইবে কি, এবং, যদিই বা জোর করিয়া প্রবেশ করান যায়, তবে তাহা গ্রীক্, রোমান্ অথবা ইংরাজী ধরণের স্থপতি অপেক্ষা কোন অংশে কম "বিদেশী" হইবে কি? বিশেষতঃ আজ বাঙালী "Bihar for Beharis" ইত্যাদি চীৎকারে যেরূপ উত্যক্ত!

(৬) নির্ম্মাণের ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতীয় স্থপতির কতকগুলি অঙ্গ-বিশেষের আয়তন এরূপ যে, তাহা বসাইতে গেলে হয় রাজপথ হইতে অনেকখানি জমি ছাড়িতে হইবে, নতুবা মিউনিসি-প্যালিটীকে জমি দখলের বাবদে অনেক "কি" দিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ "Chuja"র নাম করা যাইতে পারে। সাধারণে ইহার জন্য প্রস্তুত আছেন ত?

(৭) ভারতীয় স্থপতির ছোট জানালা যা সহজে বর্ত্তমান হাওয়া খাওয়ার দিনে কলিকাতায় সুবিধা হইবে কি এবং বর্ত্তমান ইম্প্রুভমেণ্ট্ ট্রাষ্টের নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত রাজপথের পরিবর্ত্তে কেহ গৃহের সম্মুখে বারাণসী অথবা উজ্জয়িনীর গলি চাহিবেন কি? শ্রীযুক্তবাবু স্বাস্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত লক্ষ্য রাখার বিরুদ্ধে একটু কটাক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু এই লক্ষ্যটা কি যুক্তি-সঙ্গত নহে এবং কলিকাতার ন্যায় আবাস-বহুল স্থানে যদিই বা একটু উন্মুক্ত স্থান রাখার ব্যবস্থা আইনে থাকে, তবে তাহা কি বাঞ্ছনীয় নহে? আর, শ্রীযুক্তবাবুর গলিগুলি আধুনিক মোটর গাড়ীর দিনে বিপজ্জনক হইবে না কি?

(৯) শ্রীযুক্তবাবু মোটের উপরে হিন্দু স্থপতির সম্বন্ধেই কথা কহিয়া-ছেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসে যে দুইখানি চিত্র দিয়াছেন, তাহার একখানির নিম্নে স্বয়ং লিখিয়াছেন—"মহান্, কিন্তু কারুকার্য্য-বহুল নহে", এবং অপর খানির নিম্নে লিখিয়াছেন—"অতি মহান্ এবং অতি সাদাসিধা।" তাঁহার Saracenic অথবা অন্যান্য স্থপতির সম্বন্ধে কিছু বলিবার ছিল না কি? তাঁহার প্রস্তাবিত মিউনিসি-প্যালিটীর বিভাগটী হিন্দু ব্যতীত অপরাপর সমাজকে বাহিরে রাখিবে কি, অথবা কলিকাতার ইংরাজ City Architect ছাড়াও একজন হিন্দু স্থপতিবিদ্ এবং একজন মুসলমান স্থপতিবিদ্ রাখিবে?

(১০) শ্রীযুক্তবাবু বলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারীগণ আধুনিক বিদ্যা প্রথায় ইমারত নির্ম্মাণ শিখিয়াছেন এবং তাঁহার মত এই যে, মিউনিসিপ্যালিটীর স্থপতি-বিভাগে চাকুরী দেওয়া উচিত এমন সব ইঞ্জিনিয়ার এবং ওভারসিয়ারগণকে যাঁহারা ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যায় পারদর্শী। আবার তিনি ইহাও বলেন যে, জয়পুর চিত্র-বিদ্যালয় এবং বরোদা কলা-ভবনের পাস-করা ছাত্রদিগকেও এই বিভাগে স্থান পাইবে।

মিউনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জিনিয়ারদের সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একটু অতিমাত্রায় বড়াই করা হয় নাই কি? পরলোকগত স্থপতি-পণ্ডিত মনোমোহন গাঙ্গুলী যে মিউনিসিপ্যালিটীর একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, এবং এখনও অনেকে আছেন যাঁহারা যথার্থ দেশের স্থপতি-বিদ্যার পুনরুদ্ধারে উৎসাহী!

হাজো *

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শোণিতপুরে (বর্ত্তমান তেজপুর) থাকিতে, সেখানকার 'ভিক্টোরিয়া জুবিলী লাইব্রেরী'র পুস্তক ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে 'মণিকূট' নামক একখানা অসমীয়া কবিতার পুঁথি পাই। সেই পুঁথিখানা পড়িয়া জানিতে পারি যে, 'মণিকূট' পাহাড়ের উপরিস্থিত হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির কামরূপের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। তখন হইতেই হাজো যাইবার ইচ্ছাটা খুব প্রবল হইয়া উঠে।

হাজো, গৌহাটির উত্তর পশ্চিমদিকে, প্রায় পোনের মাইল দূরে অবস্থিত। গৌহাটি হইতে 'কেরি ইমারে' ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পোনের মাইল রাস্তা পাল্কে চড়িয়া হাজো যাইতে হয়।

---

* গোড়ায় দুইজনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। হাজোর ইতিহাস অবগত হইবার জন্য আমি কয়েকখানা 'অসম-বুরঞ্জী' পড়ি। কিন্তু সেই ইতিহাসগুলা পড়িয়া হাজোর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। তার পর, ১৮৪৪ শকের ফাল্গুন মাসের 'চেতনায়' (অসমীয়া পত্রিকা) আসামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সোণারাম চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত 'কামরূপত কোচরজার কীর্ত্তিচিন্' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া জানিতে পারি যে, অনেক দিন আগে, চৌধুরী মহাশয়ের হাজোর 'বিবরণ' নামক একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে দুই সংখ্যা চেতনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গৌহাটিতে আসিয়া সেই দুই সংখ্যা চেতনার খোঁজ করি। কিন্তু, তখন বিক্রীর জন্য এক সংখ্যাও অবশিষ্ট ছিল না। 'চেতনা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদের 'অফিস-কপি' ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। লেখক।

হাজো যাইবার রাস্তাঘাট আমার মোটেই পরিচিত নহে। তবে, লোকের মুখে শুনিলাম যে, গৌহাটী একটী রাস্তা ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর হইতে হাজো পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

পথে এক বুড়াকে সাথী পাইয়াছিলাম। গৌহাটিতে সে আসিয়াছিল এক মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে। এখন ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে। এই বুড়াকে পাইয়া আমার খুবই সুবিধা হইয়াছিল। হাজো পার হইলে তাহার বাড়ী যাইতে হয়।

যে দেশে ভ্রমণ করিতে যাওয়া যায়, সে দেশের ভাষা-শিক্ষার আবশ্যকতা, সেদিন আমি বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিলাম। 'অসমীয়া' ভাষাটী অল্প-স্বল্প শিখিয়াছিলাম বলিয়া, সেদিন এই অপরিচিত বৃদ্ধের সহিত এমন সহজভাবে আমি মিশিতে পারিয়াছিলাম।

পরে, সে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে আমাকে লইয়া গেল। সেখানে, আমাদের দুইজনকে দুইটী বাটীতে করিয়া প্রায় সেরখানেক চা এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটী পিঠা আনিয়া দেওয়া হইল।

হাজোর কাছে আসিয়া বুড়ার নিকট বিদায় লইলাম। বিদায় লইবার সময় সে আমার চাদরে কিছু ধান্য বাঁধিয়া দিল। সারাদিন অনাহারে আছি। পাণ্ডার বাড়ীতে গিয়াই তো আর খাবার তৈরী পাইব না। সুতরাং, ধান্য করিয়া, এই ধান্য দিয়া যেন জলযোগ করি, এই তাহার একান্ত অনুরোধ।

হাজোতে এক পাণ্ডার ঘরে আসিয়া অতিথি হইলাম। এই দুষ্ট পাণ্ডা মহাশয় বিপত্নীক। শুধু বিপত্নীক বলিলে ইঁহার সমস্তটা পরিচয় দেওয়া হয় না—ইনি বিপত্নীক। ইঁহার দ্বিতীয়পক্ষের না কি, স্বামীর ঘর করিতে আপত্তি একেবারে ঘোরতর। পাণ্ডা মহাশয়ের একটীমাত্র বিধবাকন্যা, দুইটী কন্যা আছেন। সম্প্রতি তিনি শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে আসিয়াছেন। যে-কয়দিন এখানে থাকিবেন, বাপের সংসার তিনিই চালাইবেন।

পথশ্রমে বড়ই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই সেদিন আর মন্দিরাদি দেখিতে যাওয়া না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া মন্দিরাদি দর্শন করিতে বাহির হইলাম। আমার সঙ্গে চলিলেন এক বাঙ্গালী পাণ্ডা। তিনি হাজো মাইনর স্কুলে পড়েন। অল্পস্বল্প ইংরাজীও জানেন। ইঁহাকে পাইয়া আমার সুবিধা হইয়াছিল। কেন না কদাপিকপালের সময় যেখানে অসমীয়া শব্দ খুঁজিয়া পাইতাম না, সেখানে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইতাম।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। কামাখ্যার পাণ্ডারা ছেলেবুড়া সকলেই প্রায় কলকাত্তাই ভাষায় চমৎকার কথা কহিতে পারেন। সুতরাং, সেখানে অসমীয়া ভাষা না জানিলেও কাজ চলিতে পারে। হাজোতে কিন্তু, অসমীয়া ভাষাটা মোটামুটি জানা না থাকিলে ভারি মুস্কিলে পড়িতে হয়।

মাধবের মন্দির ছাড়া হাজোতে কেশব, কমলেশ্বর ও কামেশ্বর এই তিনটি শিব এবং গণেশের একটি মন্দির আছে। প্রথমে আমরা গণেশের মন্দির দেখিতে গেলাম। মাধব-মন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে গণেশের মন্দির। গণেশের মূর্ত্তি প্রকাণ্ড একটি প্রস্তরে খোদিত। গণেশের মন্দির দেখিয়া আমরা সোণসর্ব্ব টিলার উপরিস্থিত কামেশ্বর শিবের মন্দির দেখিতে গেলাম। উহা গণেশের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহার পর প্রায় মাইল দেড়েক পথ চলিয়া আমরা শালবন-সুশোভিত মধুমাচল পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই পাহাড়টি কামেশ্বর মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহাতে কেশব এবং কমলেশ্বর শিবের মন্দির বিদ্যমান আছে। এখানে, 'অপুনর্ভব' নামে একটি কুণ্ড আছে।

এই সমস্ত তীর্থস্থান দেখিয়া আমরা সু-উচ্চ গরুড়াচল পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম। এই পাহাড়ের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এই পর্ব্বতে পোয়ামক্কা নামক মুসলমানদের একটি তীর্থস্থান আছে। পূর্ব্বে এখানে একটি মস্‌জিদ ছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে সেই মস্‌জিদটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সেই ভগ্নাবশেষের উপর একটি টিনের ঘর তৈরী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শুনিতে পাইলাম যে, পোয়ামক্কা দর্শন করিবার জন্য সময় সময় মুসলমান যাত্রিগণ এখানে আসিয়া থাকেন। এখানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিবার কালে, মক্কা হইতে একপোয়া মাটি আনিয়া নাকি এই মস্‌জিদের ভিটায় পোতা হইয়াছিল। মুসলমানদের বিশ্বাস, এই তীর্থদর্শন করিলে, মক্কা যাওয়ার দারিদ্রাদের একভাগ ফল পাওয়া যায়।

এ সকল তীর্থস্থান দর্শন করিয়া আমরা 'মণিকূট' পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ছোট পাহাড় বা টিলাটি তিনশো ফিট উঁচু। এই পাহাড়ের উপরেই মাধবের মন্দির অবস্থিত। কামাখ্যার অনুকরণে গর্ভ-গৃহমধ্যে মাধবের মূর্ত্তি স্থাপিত। মাধবের মূর্ত্তি ছাড়া এখানে হয়গ্রীব মাধব, লালকানাই এবং বাসুদেবের মূর্ত্তি আছে।

মাধবের মূর্ত্তিটি প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং প্রকাণ্ড। এত বড় প্রস্তর-মূর্ত্তি কামরূপের আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, উহা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। পরাণ গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর তাঁহার 'আসাম-বুরঞ্জী'(১)তে বলেন, "ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইল তখন সেই ধর্ম্মস্রোত এ দেশেও (আসামে) প্রবাহিত হইয়াছিল। এবং সেই সময়েই এ দেশ সম্পূর্ণরূপে ভগদত্তের বংশধরদের হস্তচ্যুত হয়। এদেশে তখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজারা রাজত্ব করিতেন। এই দেশে জায়গায় জায়গায় যে-সকল মন্দির, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, বা মূর্ত্তি আছে, সেগুলিতে বৌদ্ধ মূর্ত্তির গঠন অনেক

(১) "* * * Buranji is one of the very few Assamese word which are derived from the Ahom. The literal meaning is "a store that teaches the ignorant "(Bu.= ignorant persons, ran,="teach' and ji "store" or granary")

Gait,—A History of Assam P. IV.

দেখিতে পাই। হাজোর হয়গ্রীব মাধব নামক দেবতাকে দর্শন করিবার জন্য এখনো ভোটেরা আসিয়া থাকে। তাহারা বলে, এই দেবতা তাহাদের দেশ হইতে (ভোটে) আনীত হইয়াছে। (২)

শ্রীযুক্ত সোণারাম চৌধুরী মহাশয় বলেন—"এই হয়গ্রীব মাধবকে ভুটিয়ারা মহামুনি বলে এবং তাহাদের দেশ হইতে আনা মূর্ত্তি বলে। এই মহামুনি দর্শন করিবার জন্য ভোটান, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর বৌদ্ধযাত্রিগণ আসিয়া থাকেন।" (৩)

আমাদের অন্যতম প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারী ডালটন সাহেবও বলেন যে, এই প্রস্তরে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড মূর্ত্তিটি বুদ্ধদেবের। তিনি তাঁহার Notes on Assam Temple ruins এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক Asiatic Society's Journal এ (No, 1—1855) প্রকাশিত, তাঁহার সেই প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

এখন, কিন্তু মূর্ত্তিটীকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় নাই। মূর্ত্তিটীর প্রায় সর্ব্বাঙ্গই বস্ত্রখণ্ড এবং ফুলের মালা দ্বারা আবৃত। তার উপর আবার বিগ্রহকে দুইটি রূপার চক্ষু, দুইটি রূপার কর্ণভূষণ এবং একটি রূপার নাসিকা দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের সবগুলা প্রাচীন তীর্থস্থানের সহিতই কোনো-না-কোনো পৌরাণিক কাহিনী বিজড়িত আছে। মাধব-মূর্ত্তি স্থাপনা সম্বন্ধেও কালিকা পুরাণ এবং যোগিনীতন্ত্রে দুই প্রকার কাহিনী বর্ণিত আছে। আমরা দুইটি কাহিনী-ই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

কালিকা পুরাণে লিখিত আছে,—পূর্ব্বে ঊর্ব্ব নামে এক ঋষি ঘোরতর তপস্যায় রত হইলে শ্রীহরির দেখা পান। ভগবান তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে ঋষি, নরকাসুরের সেনাপতি মণিকূটবাসী হয়াসুরকে বধ করিতে প্রার্থনা করেন। হরি তথাস্তু বলিয়া হয়াসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুর যখন বুঝিতে পারিল যে, সেই যুদ্ধে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, তখন সে, বিষ্ণুকে মণিকূটে হয়াসুররূপে বাস করিবার জন্য তাহার অন্তিম প্রার্থনা জানাইল। তৎপর ভগবান বিষ্ণু তাহাকে নিহত করেন। বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অসুর বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। ভগবান তখন হইতে মণিকূটে বাস করিতে লাগিলেন (৪)। যাগযজ্ঞের শেষ এবং বলির ঠিক আগিতে ঊর্ব্ব ঋষি কর্ত্তৃক হয়গ্রীব মাধবের মূর্ত্তি মণিকূটে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত কাহিনীটি অন্য প্রকার :—

পুরাকালের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু কি রকম মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন তাবিয়া তাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বিকলচিত্তে ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন বিষ্ণু রাজার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হইবে, স্বপ্নে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রত্যূষে সাগরজলে বিধিবত স্নান করিয়া স্বপ্ন-নির্দ্দেশিত স্থানে গিয়া সেই বৃক্ষটিকে সাত খণ্ড করিয়া কাটিলেন। সেই সাত খণ্ডের এক খণ্ড দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক হয়াখ্য মাধবমূর্ত্তি স্থাপিত হইল। (৫)

কালিকা পুরাণে হয়গ্রীব এবং যোগিনীতন্ত্রে হয়াখ্য এই দুই মাধবের উল্লেখ দেখিতে পাই। মন্দিরের ভিতরেও মাধবের দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি যেমনি প্রকাণ্ড অপরটি তেমি ছোট। প্রকাণ্ড মূর্ত্তিটী প্রস্তরে নির্ম্মিত ; ইহাই হয়গ্রীব মাধবের মূর্ত্তি। পাণ্ডারা বলেন, ইনি 'বুড়া মাধব'। এই 'বুড়া মাধব'কেই ভোটেরা 'মাহমুনি' বা মহামুনি বলে। ডালটন সাহেবও ইহাকেই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন।

হয়াখ্য বা হয়কণ্ঠী মাধবের মূর্ত্তি বামনের। ইহার মুখ ঘোড়ার মুখের মত। ইহাকে পাণ্ডারা দ্বিতীয় মাধব বলিয়া থাকে। এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত সোণারাম চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন যে, হয়গ্রীব মাধব আগে এবং হয়াখ্য বা হয়কণ্ঠী মাধব পরে স্থাপিত। প্রথমটি ঊর্ব্ব ঋষি কর্ত্তৃক স্থাপিত এবং দ্বিতীয়টি যোগিনীতন্ত্রে উক্ত বরুণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। (৬)

মোট কথা, আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, হয়গ্রীব মাধব—পাণ্ডারা যাহাকে 'বুড়া মাধব' বলিয়া থাকে—আসলে তাহা বৌদ্ধ-মূর্ত্তি। আর হয়াখ্য বা হয়কণ্ঠী মাধবই প্রকৃত পক্ষে হিন্দু বিগ্রহ।

হাজোর হয়গ্রীব মাধবের বলির প্রথমে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহার প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, হয়গ্রীব মাধবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতা ঊর্ব্বঋষি কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম মন্দির নির্ম্মিত হয়। কালক্রমে উহা নিবিড় অরণ্যের ভিতর ঢাকা পড়িয়া যায়।

---

(১) বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ভারতবর্ষের চারিশতকালে হল দি সমস্ত সেই ধর্ম্মস্রোত ই দেশদেশেরো প্রবাহিত হৈছিল। আজ সেই সমস্তহে ভগবতর বংশর হাতর পরা ই দেশ একেবারে যায়। তেতিয়া ই দেশত বৌদ্ধবর্ম্মক রজাই রাজত্ব করিছিল। এই দেশত ঠাইয়ে ঠাইয়ে যি যি মন্দির বা মন্দিরর ভগ্নাবশেষ বা মূর্ত্তি আছে তাত বৌদ্ধবিলাকর মূর্ত্তির গঢ় গঠন অনেক দেখি। * * * হাজোতে মাধব নামে যি দেবতার আছে, সেই দেবতাক দর্শন করিবলে এতিয়াও ভোটবিলাক আছে। সিহঁতে কয় বোলে এই দেবতা সিহঁতর দেঁশর পরা আহিছে।

অসম-বুরঞ্জী—৺রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর কৃত।

(২) এই হয়গ্রীব মাধবকে ভুটিয়া বিলাকে মহামুনি বোলে আরু সিহঁতে দেশর পরা অনা মূর্ত্তি বোলে, এই মহামুনি দর্শন করিবলে ভোটান, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশর পরা বহুরি বৌদ্ধযাত্রী আহে।

শ্রীসোণারাম চৌধুরী—কামরূপ কোরেঞার কীর্ত্তিচিন,

(চেতনা, ফাল্গুন, ১৮৪৫ শক)

(৪) "মণিকূটাচলে বিষ্ণুর্হয়গ্রীব স্বরূপধৃক্।" যোগিনীতন্ত্র। দ্বিতীয় ভাগ। অষ্টম পটল।

(৫) যোগিনীতন্ত্র। দ্বিতীয় ভাগ। অষ্টম পটল।

(৬) কাজেই দেখা যায়, হয়গ্রীব মাধব আমর আরু হয়াখ্য বা হয়কণ্ঠী মাধব পাছর স্থাপিত। প্রথমখানি কালিকা পুরাণত উল্লেখ করা ঊর্ব্ব ঋষির স্থাপিত আরু দ্বিতীয়খানি যোগিনী তন্ত্রত উক্ত বরুণর দ্বারা স্থাপিত।

হাজোর বিবরণ—শ্রীসোণারাম চৌধুরী (চেতনা, মাঘ, ১৮৪১ শক)

কোচরাজ নরনারায়ণ শুনে ও জীর্ণাবস্থায় এই মন্দিরটি দেখিতে পান। তিনি ইহার চারিদিক পরিষ্কার করাইয়া মন্দির সংস্কার করেন। এই মন্দিরের সম্মুখের ঘরটি তিনি ১৪৫০ খ্রীঃ শকে নির্মাণ করাইয়া দেন। (৭)

তৎপরে কোনো বেকবেরী মুসলমান কর্তৃক ১৫৫৩ খ্রীঃ এই মন্দির ভগ্ন হয়। শেষে কোচরাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব, শকে (১৫৮৩ ইং) শ্রীধর নায়ক একজন গুণী কারিকর দ্বারা এই ভগ্নমন্দির পুনর্নির্মাণ করাইয়া দেন। (৮) (৯)

মাধব মন্দিরের সম্মুখে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটি ছোট মন্দির আছে। ইহাকে রাস লীলার মন্দির বলে। দোলযাত্রার সময় মাধবের চলন্ত বিগ্রহ এই মন্দিরে আনা হয়। এই মন্দির ১৬৭২ শকে (ইং ১৭৫০) আহোম রাজা প্রমত্ত সিংহ স্বর্গদেবের আদেশানুসারে শ্রীতরণ দুলা বরফুকন কর্তৃক নির্মিত হয়। (১০)

কেশব মন্দির, আহোমরাজা শ্রীরাজেশ্বর সিংহ স্বর্গদেবের আদেশানুসারে দুবরা বরফুকন কর্তৃক ১৩৮০ শকে (১৭৫৮ ইং) নির্মিত হয়। (১১)

পোয়ানবার একখানা কাশীতে লেখা শিলালেখ আছে। তাহাতে লেখা আছে, মোগল সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে ১০৩৭ হিজরি শকে অর্থাৎ ১৬৫৭ ইংরাজীতে কালরূপ এবং হাজোর ফৌজদার সূত্রকুমার দ্বারা এই মন্দির নির্মিত হয়। সূত্রকুমার পারস্যের সিরাজ নগরের লোক ছিলেন। (১২)

বেলা প্রায় এগারোটার মধ্যে দর্শনাদি শেষ হইল। সেদিন-ই সৌহাটিতে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম; কিন্তু ভাবিলাম, মন্দিরের গঠন-প্রণালী ভালো করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং মন্দির সম্বন্ধে সকল কথা জানিয়া যাইব।

মাধবের মন্দির সমস্তটাই প্রস্তরে নির্মিত, নির্মাণ-কৌশলে উহা কামাখ্যার পাণ্ডু-মন্দির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নিম্ন হইতে প্রায় দুই ফিট উচ্চে অনেকগুলা পাঁথরে তৈরী হাতীর মাথা একসারিতে সংস্থাপিত। হাতীর মাথা প্রত্যেকটি বোলো ইঞ্চি উঁচু। ইহার মাত আট হাত উপরে যে অংশ, তাহা দেখিতে খুব সুন্দর। এই অংশে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেকগুলা দেব-দেবীর মূর্তি পাথর খুদিয়া আঁকা হইয়াছে। মন্দিরের উপরিভাগে ছোট ও বড় কয়েকটি পদ্ম পাথরে খোদিত আছে। সেগুলা দেখিতে ভারি সুন্দর।

'মণিকূট' পুঁথিখানা পড়িয়া জানিতে পারি যে, পূর্বে মাধব মন্দিরের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল। পর্বতের উপর অসংখ্য নারিকেল, বেল, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল এবং এক সুবৃহৎ পুষ্প-বাটিকা নির্মাণ করাইয়া সেটিকে বকুল, করঞ্জ, কাঞ্চন, অশোক প্রভৃতি ফুলের গাছ দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল।

কোচরাজা নরনারায়ণ মাধব মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করাইয়া মন্দিরের নামে অনেক জমিজমা, বামুন, গায়ক, বাদক, নর্তকী ইত্যাদিও বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মন্দিরের নিকটে এখনো নাচুনীপাড়া বলিয়া একটি পল্লী আছে। পূর্বে নর্তকীরা প্রত্যহ মাধবের মূর্তির সম্মুখে নৃত্যগীত করিত (১৩)। আজ কয়েক বৎসর হইল উহারা নাচগান বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

নরনারায়ণ কর্তৃক নির্মিত নাটমন্দিরটি ভূমিকম্পে ভাঙিয়া যায়। সেই ভগ্নমন্দিরের প্রস্তরখণ্ডসমূহ মন্দিরপ্রাঙ্গণে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

ছোট কথা, এখন মন্দিরের পূর্ব গৌরবের সামান্যমাত্রই অবশিষ্ট আছে। আমি যে তিন দিন হাজোতে ছিলাম, সেই তিন দিনের মধ্যে আর একজন যাত্রীও দেখিতে পাই নাই। শুনিলাম, [পৌষ-মাঘ মাসে এখানে যাত্রীর খুব ভিড় হয়। এই সময়েই ভোটেরা মাধবকে দর্শন করিবার জন্য আসে। ভোটদের নাকি স্বর্গপুরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। আজ প্রায় চার বছর হইল তিব্বতের বিখ্যাত দলে লামাও অনেক লোক জন লইয়া এই মন্দির দর্শন করিয়া গিয়াছেন (১৪)

এই মাধব মন্দিরের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের এবং আসামে বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সর্বপ্রধান শিষ্য মাধবদেবের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত আছে।

---

(৭) ৺ ৺ তেওঁ ইহার মন্দির জীর্ণ অবস্থাতে দেখা পাইছিল। তেওঁ ইহার চারিও কাষ পরিষ্কার করোবাই মন্দির সংস্কার করাত লাগে। তেওঁ এই মন্দিরর সন্মুখর ঘরটোও ১৪৫০ খ্রীঃ শকত সাজি দিছিল।

কামরূপরকোচ রজার কীর্ত্তিচিন্—সোণারাম চৌধুরী (চেতনা ফাল্গুন ১৮৪৫ শক)

(৮) মাধব মন্দিরে একটি শিলালিপিতে কোচরাজ প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুদেব পর্যন্ত সমস্ত কোচরাজগণের নাম খোদিত আছে। সেইটে সাহেবের আসামের ইতিহাসের ৬২ পৃষ্ঠায় সেই শিলালেখটি ইংরাজী অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে।

(৯) ৺ ৺ ৺ The King (Raghudeb) coming of age had a Temple built on the hillock called Mani hillock in 1505 Sak (1583 A. D.) The most skilled and efficient artisan Sridhar himself built it.

E. A. Gait—A History of Assam Page 62.

(১০) হাঃ বিঃ—শ্রীসোণারাম চৌধুরী (চেতনা চৈত্র ১৮৮৪ শক)

(১১) হাঃ বিঃ—শ্রীসোণারাম চৌধুরী (চেতনা, চৈত্র ১৮৪৪ শক)

(১২) হাঃ বিঃ—শ্রীসোণারাম চৌধুরী (চেতনা, চৈত্র ১৮৪৪ শক)

(১৩) "নর্তকী সকলে নৃত্য করে
ভাব দিয়া নানা তন্ত্রী করে।"
—মণিকূট পৃঃ ৪০।

(১৪) আজি প্রায় চারিবছর হল, তিব্বতের বিখ্যাত দলে লামাই ও অনেক লোকজন সৈ এই মন্দির দর্শন করি গৈছেহি। হাঃ বি—সোমনাথ চৌধুরী (চেতনা, ফাল্গুন, ১৮৪৪ শক)

শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণপ্রদেশে ধর্মপ্রচার করিয়া, মণিপুরে আসিয়া, সেখানেও ধর্মপ্রচার করেন। সেখান হইতে সন্ন্যাসীবেশে আসামে আসিয়া, তিনি হাজোতেও কিছুদিন ছিলেন। (১৪)

মণিকূট পাহাড়ে আরোহণ করিবার সময় প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান পথে একটি নাম, একটি লাঠি এবং একটি আসনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, কোচরাজ রঘুদেবের আদেশে মাধবদেব হাজোতে গিয়া একদিন সেবকদের সহিত মাধব-মন্দিরে যান। সেখানেরে লাট-মন্দির হইতেই তিনি মাধব-মূর্ত্তিকে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসেন, লাট-মন্দিরের দুয়ারে মাধবদেব হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর হাতের আঙুলের চিহ্ন রহিয়া গেল। শ্রীরাম আতা (মাধবদেবের একজন শিষ্য) তাঁর লাঠি এবং কাঁথা বাহিরে রাখিয়া বসিয়াছিলেন; মাধবদেবকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁর লাঠি এবং কাঁথা লইয়া উঠিলেন। আজও পর্য্যন্ত শ্রীরাম আতার সেই লাঠি এবং কাঁথা প্রভৃতির চিহ্ন পাথরে খোদা হইয়া রহিয়াছে। (১৫)

শঙ্কর-দেব কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে আসাম দেশটি ছিল তান্ত্রিকতার লীলাভূমি। নরবলি-প্রথা তখন আসামে পূরা-মাত্রায়-ই প্রচলিত ছিল। নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব মণিকূট বা হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিবার সময় অনেক নরবলি দিয়াছিলেন। (১৭) মন্দিরস্থ শিলালেখে, কিন্তু, রঘুদেব রাজাকে "শ্রীকৃষ্ণ-পাদার্চ্চকো" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পুরাকালে হাজো মণিকূট নামে পরিচিত ছিল। তার পর ইহার নাম হয় হরপেশ্বর বা হয়গ্রীবেশ্বর। সর্ব্বশেষে ইহা হাজো নামে পরিচিত হইয়াছে। (১৮)

পাঠকদের নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে দুইটি ঘটনার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঘটনা দুইটি নিতান্তই সামান্য। কিন্তু এই সামান্য ঘটনা দুইটি আমার মনের উপর যে-রকম দাগ রাখিয়া গিয়াছে, দুনিয়ার অনেক বড় বড় ঘটনা-ও তেমনটি পারে নাই।

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে, মন্দির-প্রাঙ্গণে একলা বসিয়া আকাশ-পাতাল নানা কথা ভাবিতেছি। মন্দিরে একটি সেবাইত ভৃত্য আছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মুহূর্ত্তেকের জন্যও তার মন্দির ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার অধিকার নাই। শুনিতে পাইলাম, মাধব-মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইয়া, ভক্তিগদ্গদ্ স্বরে সে বলিতেছে—"মাধব! মাধব! দয়াময় প্রভু, জন্মে জন্মে, আমি যেন তোমার ভৃত্য হইবার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।" প্রার্থনা আন্তরিক হইলে, সত্যসত্যই যে তাহা অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত গিয়া স্পর্শ করে, এ কথা সেদিন আমি যেমন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তেমন জীবনে আর কখনো করি নাই।

সেদিন রাত্রে খাইতে বসিয়াছি। পাণ্ডা মহাশয় তখনো মন্দির হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁর সেই যুবতী কন্যাই আমাকে অন্নাদি পরিবেষণ করিতেছেন। বড় স্নেহমাখা চক্ষে আমার পানে একবার চাহিয়া তিনি বলিলেন—"বাবা, এখানে লজ্জা করিয়ো না। যা লাগে, তোমার মায়ের নিকট থেকে যেমন চাহিয়া খাও, তেমি আমার নিকট থেকেও চাহিয়া লইয়া খাইও।" কথা তো মাত্র এই কয়টি। কিন্তু, কি আদর-ভরা স্বরে সেই কথা কয়টি বাহির হইয়া আসিল! আহা! ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি, পরের মুখে এমন স্নেহের কথা তো আর কোথাও শুনি নাই। আমার আর্ত্ত, পীড়িত, ব্যথিত চিত্তের সকল কথা যেন ঐ মাতৃ-স্নেহের স্নিগ্ধ স্পর্শে জুড়াইয়া গেল।

ফিরিবার দিনে সকালবেলা সকলের নিকট বিদায় লইয়া মোটরে রওনা হইলাম—বুকের মাঝে কোথায় যেন ব্যথা বাজিতে লাগিল।

---

(১৪) শ্রীচৈতন্যই দক্ষিণ প্রদেশে ধর্মপ্রচার করি তার পরে এবার মণিপুরেতে আসি তাহো ধর্মপ্রচার করি সন্ন্যাসীবেশেরে আসমেতে আসি হাজোতে কিছুদিন আছিল।

শ্রীশঙ্করদেব আর শ্রীমাধবদেব—শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। পৃঃ ১২৩

(১৫) শ্রীশঙ্করদেব আর শ্রীমাধবদেব—শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। পৃঃ ১৮৮

(১৭) Raghudeb rebuilt the Manikut or Hoygrib temple at Hajo, which had been destroyed by Kala Pahar, and endowed it with grants of land. When it was completed, it was consecrated by the sacrifice of numerous human victims.

E. A. Gait—A History of Assam. Page 61-62.

(১৮) হাঃ বিঃ—শ্রীসোণারাম চৌধুরী। (ভেরেণ্ডা, চ'ত্ত, ১৮৪৪ শক।)

সার্জেন্ট শ্রীমাখনলাল সমাদ্দার

প্রত্যেক বারের মত এবারও পূজোর বাইরে ছিলাম। বুদ্ধগয়ার দিন কতক কাটিয়ে যখন রোটাসগড়ের দরজায় এলাম, তখন এক দিন বড়দার চিঠি পেলাম বাড়ী থেকে, যে আমার পরওয়ানা এসেছে। অর্থাৎ ক্যাম্প শুরু হবে, আর আমাদের যেতে হবে। কের সেই দানাপুরে! আগের বছর আমরা যখন মুঙ্গেরীতে পনের দিন কাটিয়ে এলাম, তখন ঠিক হয়েছিল যে, এবার আমরা হাজারিবাগে যাব। তাই দানাপুরের কথা শুনে মনটা বিগড়ে গেল। ধুলাভরা শহর, লোকজন নেই, তার উপরে সেই জলের কষ্ট। সেবার যখন প্রথম দানাপুরে ক্যাম্প হয়, তখন আমাদের কষ্টের শেষ ছিল না। খাবার কষ্ট, জলের কষ্ট, আর সব চেয়ে কণ্ট্রাকটারদের বজ্জাতেরি আমাদের ঘরিয়া করে তুলেছিল। কিন্তু যেতে ত হবেই!

নূতন 'রিক্রুট' নেওয়া সুরু হয়েছে। মেম্বরদের সংখ্যা হুহু করে বেড়ে চলেছিল! অনেকে কলেজ ছাড়ায় আর অনেকে পাটনা ছাড়ায়, কোরের সংখ্যা বেশ কমে এসেছিল; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আবার তা ভরে এল। আমাদের কোর একটা Company অর্থাৎ প্রায় ১৬০ জনের জন্তে হলেও, এ পর্য্যন্ত ছুটো প্লাটুন অর্থাৎ জন ৮৪র বেশী ছিল না। সুখের বিষয়, এবার আমাদের বহু দিনের আশা পূর্ণ হতে চল্‌ল। কোর এখন একটা full company হয়ে তার মর্য্যাদা রক্ষা করছে।

আমাদের বহু দিনের আর একটী আশাও এবার পূর্ণ হয়েছে। সার্জেন্ট চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় এবার কমিশন পেয়ে আমাদের কোরের সেকেণ্ড লেফ্‌টেনাণ্টের পদ পেয়েছেন। টেরিটোরিয়াল কোর্সের ইনি জমাদারও নিযুক্ত হয়েছেন। এখন ইনি বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। বছর ছুই পরে ফিরে আসবেন।

এই আনন্দের মধ্যেও আমাদের মনে একটা গভীর ক্ষত করে দিয়ে গিয়েছে অনকতক মেম্বর। সকলের চেয়ে দাগা দিয়েছে আমার রাজুদা (প্রাইভেট রাজেন্দ্রলাল মিত্র)। রাজুদার কথা আগের বছর আমি বলেছিলাম। পূজোর আগে রাজুদা বসন্তরোগে আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে অমরধামে চলে গিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষা করবার জন্ত বিহার হাসপাতাল কলেজ (যে কলেজে তিনি পড়তেন) যথাসাধ্য করেছে। আমাদের কোর রাজুদার কথা চিরদিন মনে রাখবে। এই অবকাশে আমরা ভগবানের নিকট তাঁর পারলৌকিক তৃপ্তির কামনা করছি।

সুখ ছুঃখ চিরদিন পাশাপাশি চলছে। তাই এত আনন্দের মধ্যে ছুঃখের কথা চলে এসেছে। পাঠক-পাঠিকারা ক্ষমা করবেন।

এবার পয়লা নবেম্বর বাত্রারম্ভ। সেবারও পয়লা নবেম্বর থেকে ক্যাম্প সুরু হয়। সেদিন রবিবার। আরমারীতে আমাদের হাজির হবার সময় ছিল বেলা ছুটোয়। আন্দাজ মেড়টার সময় শ'খানেক উপস্থিত হ'ল। তার পর আরম্ভ হ'ল আনকোরা নূতন রিক্রুটদের পোষাক বিতরণ। পোষাক মানে ছুটি করে ফ্লানেল সার্ট, ছুটী খাকী হাফ্‌প্যাণ্ট, একটী টুপী (হেলমেট), একটী কোরেজ ক্যাপ, একজোড়া হুপশেরি বুট, ছুজোড়া পশমের মোজা, হোস্ আর পট্টি। এছাড়া একটী করে টিউনিক বা কোট সবাইকে দেওয়া হ'ল। যারা পুরান লোক

তারাও full uniform অর্থাৎ বুট, পট্টি, মোজা, শার্ট, প্যাণ্ট, ও হেলমেট পরে। তারা এখন লেগে গেল Web equipment পরতে। এটা একটা বিষম জ্বালা! সর্ব্বাঙ্গে এঁটুলির মত এঁটে থাকে, আর ফিট করতে সকলকেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হয়! এতে কতকগুলো পকেট আছে ছোট, ছোট, যার মধ্যে গুলি রাখতে হয়। লড়াই নেই বলে আমরা আসল গুলির বদলে নকল গুলি যাকে ইংরাজীতে Dummy বলে তাই দশটা করে পেলাম। এই গুলি পেয়ে অনেকের দুধের সাধ ঘোলেই মেটাতে হ'ল।

কখনও তাড়াহুড়া করে, কখনও ঢিমে তেতালা হয়ে যখন সবাই ready হয়ে দাঁড়াল, তখন বেলা প্রায় ৪টে। সবশুদ্ধ ১১০ জন! সাড়ে চারটে আন্দাজ ২খানি লরী এসে গর্জ্জন আরম্ভ করলেন। এবার আর সাড়ে আট মাইলের ধাক্কা থাকলেও পদব্রজে চরণ-মাঝির নৌকায় যেতে হবে না। এর জন্য আমাদের কাপ্তেন সাহেব খুব ভাল ব্যবস্থাই করেছেন। কষ্ট পেতে হবে না জেনে সবাই কাপ্তেনের স্তুতিবাদ আরম্ভ করে দিলাম। কেউ কেউ বলছিলেন, "না কালীই রক্ষা করেছেন। বাপরে! এই ভারী বুট নিয়ে মার্চ্চ করা……।" বেচারীরা সবাই নূতন ভর্ত্তি—তার ওপর প্রথম দিন বুটের মধ্যে নূতন পা দিয়েছেন!

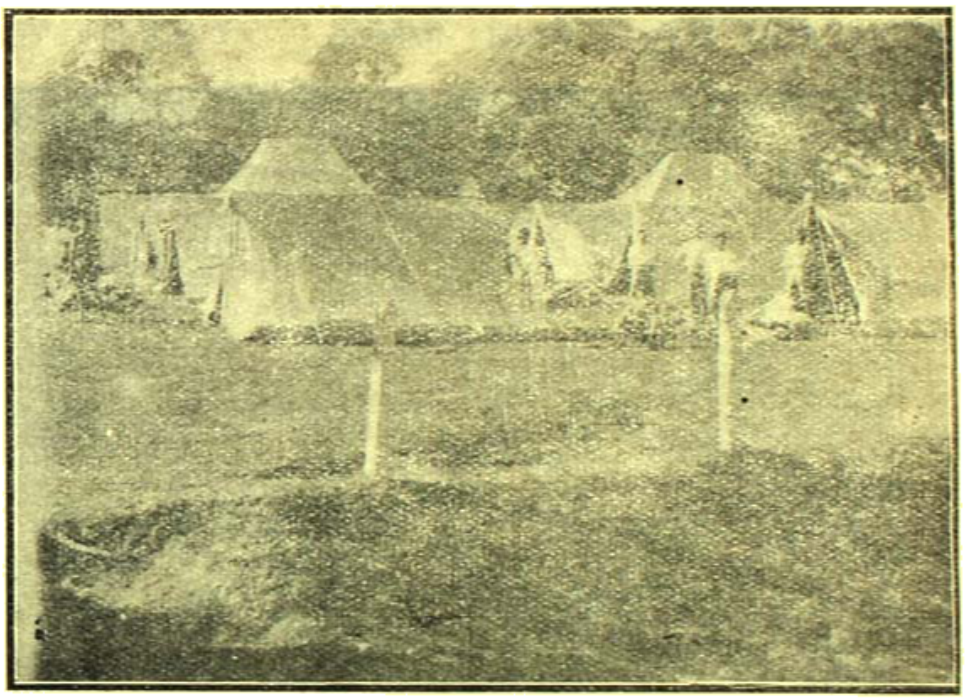

শিবির-দৃশ্য—ভোরবেলায়

অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ একটুখানি হাসলেন। ভবিষ্যৎ যা ঠিক করে দিলেন, তাতে সুখের ভাগ কমে গেল। ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হলে যে কি হয়, তা একটু পরেই টের পাওয়া গেল। জল্পনা কল্পনার স্রোত উদ্দাম গতিতে ছুটছিল। হঠাৎ বজ্রধ্বনি উঠল—"Sergeant Roy! Fall in with your men."—অর্থাৎ গরুর গাড়ীর সঙ্গে যারা পাহারায় যাবে তারা হাজির হও। কুড়িজন তার সঙ্গে মার্চ্চ করে চলে গেল। এর মধ্যে জনকতক জল্পনাকারীও ছিলেন। সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছিল রতনীদার (এখন ল্যান্স কর্পোরাল) দশা দেখে। বেচারী বড় আশা করেছিল যে Sergeant Roy তাকে বাছবেন না; কিন্তু বিধি ঠিক উল্টো বুঝেছিলেন। যাঁরা থেকে গেলেন তাঁদের স্ফূর্ত্তি তখন তালগাছের আড়াই হাতের কিনারায়! সকলের মতে লরীতে খুব আরাম হবে এই যখন সাব্যস্ত হ'ল, তখন দেখা গেল যে চারখানা লরীর বদলে মোটে যে দুখানাই এসেছে তারাই সব; আর লোকজন সব-সমেত ৯০ জন। তার উপর রাইফেল, ওভারকোট, আরও খুঁটীনাটী কত কি!

সার্জ্জেণ্ট এলিস প্রথম সার থেকে জন ত্রিশকে দুখানা লরীতে চাপিয়ে দিয়ে ড্রাইভারদের যেতে বললেন। আর সবাই হাঁকরে তাকিয়ে মনে মনে লরীর টায়ার-টিউব কুটো করছিল। শাপ ফলতে বেশী দেরী হ'ল না। শাপের ভয়ে এঞ্জিন একেবারে চুপচাপ মেরে গেল। বেচারী শঙ্কার সড়াসড় সড়াঘড় হাঁটার ঘুরিয়েও তাকে বাগাতে পারল না। আর তাই শনির কোপে পাটনাতেই আমাদের পাঁচটা বেজে গেল। কোথায় দানাপুরে পৌঁছে দিবি

হকি খেলা, না, পাটনাতেই ধুলো খাওয়া! যাহ'ক অনেক করে যখন হাওয়াগাড়ী ছুটলেন হাওয়ার বেগে, তখন সবাই নিশ্বাস ফেলে বলেন, "আর ফিরতে দেরী কি? বড় জোর ৪৫ মিনিট!"

কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট ত পঁয়তাল্লিশ মিনিট! নব্বই মিনিটও যখন কেটে গেল, তখন আমরা আকাশের তারা গোণা আরম্ভ করে দিলাম। কেউ কেউ তারা গোণা অসম্ভব মনে করে বাড়ীর কথা ভেবে ভেবে গাছতলাতেই শুয়ে নিলেন। সবুর আর কাটে না; এমন সময়,—প্রায় আটটা আন্দাজ—পঁচিশ নম্বরের একজন হাজির হলেন। আমরা তখন ফিরের আশায়। একজনের হিন্দীজ্ঞান

২০জন লোক বাকী—আর তাদের মধ্যে, আমিও একজন!

"হেঁটে যেতে পারে বেশ হ'ত হে!"—একজন বল্লেন।

আর একজন, আগের বছরের শাস্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দিয়ে বল্লেন, "না হে না। বেশ আছি। আগে যারা গেছে, তাদের গার্ড ডিউটী দেবে। সেটা ত বেঁচে যাব।" আমিও ভাবলুম তাই। তবুও মুখে-চোখে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য এনে "অদৃষ্টটা নেহাৎ মন্দ", বলে আমার সদানন্দী নন্দর পিঠ ঠেসে বসে পড়লাম। জনকতক যারা ভূমিশয্যা পেতে-ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন তখন ঘুমিয়ে! আহা বেচারী!

লরী ফিরে আসতে কেন এত দেরী হয় তা নিজেরাই

অফিসারগণ।—চেয়ারে—কাপ্টেন ব্রাউন মধ্যে, বামদিকে—সার্জ্জেণ্ট ক্রনিস, ডানদিকে—সার্জ্জেণ্ট মর্গান

"করতা চড়তার" মধ্যে। তিনি, "তুমতো বুঝতে পারতা নেহি, আমাদের বিষম অবস্থা," বলে জনকতকের সঙ্গে তাড়াতাড়ি গাড়ী চেপে বল্লেন, "চলো।" সার্জ্জেণ্ট মর্গান হেসে বল্লেন, "Wait; not now! let the other lorry come." যে আজ্ঞা! দ্বিতীয় নম্বর হাজির হলেন প্রায় মিনিট দশেক পরে। আবার সেই টানা হ্যাঁচড়া কাণ্ড করে যখন এরা উধাও হয়ে গেলেন তখনও বুঝতে পারলুম অর্দ্ধেক রাস্তায় যখন লরী থেমে পড়ল ভীষণ শব্দ করে। চার পাঁচ জায়গায় থেমে থেমে (আমরা অনেক সময় নেমে ঠেলে হাঁটে দিচ্ছিলাম) আমরা যখন দানাপুরে কেণ্টনমেণ্টের কাছে, তখন সবারই নাক দিয়ে আরামের নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

নিজের নিজের ক্যাম্পে ঢোকবার আগে আমাদের এক এক খানা করে water proof sheet মাটীতে পাতবার

অন্ত, আর দুখানি করে কম্বল দেওয়া হ'ল। খড় আর নেই। জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে-গাছিয়ে একটুখানি বুটের স্থিতে আলগা করেছি, এমন সময় ডাকদূত রূপে কে একজন এসে বল্লেন, "তাড়াতাড়ি আসুন। সার্জেণ্ট এলিস ডাকছেন।" পিলে চম্‌কে উঠ্‌ল। ম্যালেরিয়া রোগী হলে বোধ হয় কেটেই যেত। বাপরে—রাত্তির প্রায় বারটা! খাওয়া দাওয়া হয়নি এখনও—হঠাৎ কেন ডাক পড়ল? বোধ হয় ডিউটী আছে। বুকের নিশ্বাস বুকে রেখেই বেরিয়ে এলাম। পিঠে আস্তে একটু চাপড় মেরে সার্জেণ্ট বল্লেন, "তুমি আজকে রাত্রের গার্ড কমাণ্ডার। তোমার গার্ডদের খাইয়ে দাইয়ে তুমি ১২টার সময় guard mount করাবে।" গার্ডরুমের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আর মাত্র ২০ মিনিট আছে। খাওয়া দাওয়া চুলোর দোরে—ডিউটী শুনে অবধি। কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে গার্ড মাউণ্ট করিয়ে কম্বল বিছিয়ে নিলাম।

এবারকার গার্ডদের কাজটা একটুখানি সহজ। অন্য বারের মতন আর ২৪ ঘণ্টা ডিউটী দেবার বন্দোবস্ত ছিল না। সন্ধ্যা ৭॥ টায় guard mount করিয়ে সকাল ৬টায় dismount করান হ'ত। গার্ডদের সকালবেলায় ব্যায়াম ছাড়া আর সব কাজই করতে হত—যা কোন বারে হয়নি। মাত্র তিনজন করে গার্ড নেওয়া হ'ত। তারাই সারারাত্রি ২য় ঘণ্টা করে পালা দিয়ে পাহারা দিত।

বেজেলী ভোর ৪টায়। নবেম্বর মাস। শীত পাটনায় সামান্য। কিন্তু এখানে চারিদিকে মাঠ আর তাঁবুর তলায় ঠাণ্ডা—আমাদের বেশী শীত বোধ হচ্ছিল। কম্বল ছেড়ে উঠতে তখন কি কারুর ইচ্ছে হয়? কিন্তু সামরিক বিধান—টুঁ শব্দ করবার উপায় নেই—বিশেষতঃ শিক্ষার সময়। তাই সবারই উঠ্‌তে হ'ল তাড়াতাড়ি।

এত সকালেই কিন্তু Orderly Sergeant detail অর্থাৎ কার কি কাজ, কি করে পরে ড্রিল হবে তা পড়ে

কোর টিম—খেলার পরে

শোনালেন। Routineও সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন—তা ছাড়া Notice Boardএ আসল Routineখানি টাঙ্গান ছিল। Detail Routine দেখে রিক্রুটদের মুখের অবস্থা প্রায় মাওরি-শিশুর মত দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে যারা পুরান চোর বা ক্যাম্প-খাটা করেদী তারাও ভুরুটা একটুখানি কুঁচকে দিলেন; কারণ ৬-১৫ মিনিটেই আবার Physical Training বা ব্যায়াম। এর আগের বছর আমাদের physical drill আরম্ভ হ'ত সাড়ে সাতটায়। Physical drill হত সাদা সেজি, সাদা হ্যাফপ্যাণ্ট আর সাদা রঙের running shoe পায়ে। এগুলি অবশ্য আমাদের

নিজস্ব। কাপ্তেন সাহেব সব এক রকম দেখতে চাইতেন তাই এই ব্যবস্থা। ব্যায়াম আরম্ভ করবার আগেই প্রাতরাহ্নিকের ব্যবস্থা ছিল। তবে আমাদের মত জনকতক মুখোপাধ্যায়ের আর সকালবেলায় স্নান হত না। আমরা জনকতক স্নান করতুম সন্ধ্যেবেলায় সমস্ত কাজকর্ম্মের পরে।

প্রথমেই আমাদের Fall in করিয়ে চারটে প্লাটুনে ভাগ করে দেওয়া হ'ল। রিক্রুটরা ২, ৩, আর ৪ নং প্লাটুন, আর যারা পুরান তারা ১ নং প্লাটুন হল। প্রথম নং প্লাটুন নিলেন Sergeant মর্গান (এখন ইনি আমাদের Staff Sergeant)। সার্জ্জেণ্ট এলিস বদলি হয়ে এখন কলকাতায়। Sergeant Morgan এসেছেন South Wales Borderers থেকে। আর ২, ৩, ও ৪নং নিলেন কর্পোরাল হপকিনস্, জোন্স, ও ডেভিস। এদের তিনজনকে Cheshire Regiment থেকে অস্থায়ী ভাবে আনা হয়েছিল। এদের মধ্যে ডেভিস্ ছিলেন একটু গম্ভীর মেজাজের। কিন্তু জোন্স্ ও হপকিন্স্ ছিলেন একেবারে দিলদরিয়া টাইপের। আর সার্জ্জেণ্ট মর্গান যদিও খুব গম্ভীর তবুও বেশ ভাল লোক। লোক চেনার আর কাজ বুঝে নেবার ক্ষমতা এঁর অসাধারণ। সার্জ্জেণ্ট হয়েও এমন সব Politics আর Economicsএর কথা তুলতেন, যা সমাধা করতে আমাদের এম-এর ছাত্ররাও থ খেয়ে যেতেন। এঁরা ছাড়া সার্জ্জেণ্ট এলিসের সঙ্গে আমাদের বেশী কাজ করতে হ'ত না। কাপ্তেন ব্রাউন এখন আমাদের কোরের adjutant, আর কাপ্তেন কওওয়েল বরাবরকার Commanding Officer। এঁরা দুজনেই আমাদের সাক্ষাৎ ভগবান। দুজনেই আমাদের স্নেহ ও যত্ন করেন; আর ক্যাম্পে খালি এঁদের দুজনের জন্যেই আমরা হাজার দুঃখের মধ্যেও সুখে ছিলাম।

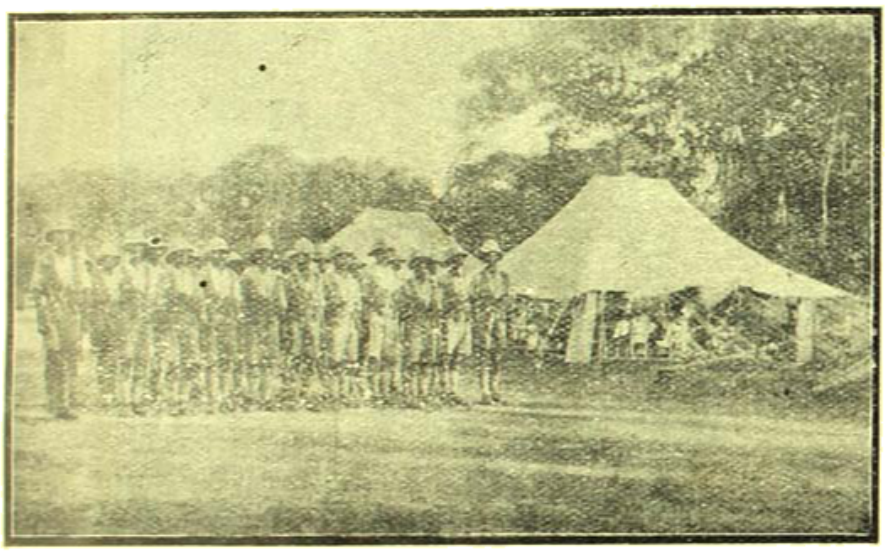

দুই নম্বর প্লাটুন—প্যারেড শেষে

Physical Drill শেষ করে সাড়ে সাতটায় আমরা জলখাবার পেলুম। জলখাবার মানে ছোট এক টুক্‌রো পাঁউরুটী যাতে চিনি কিংবা মাখনের সম্পর্ক কোন দিনই থাকত না, আর এক কাপ করে পাতা-সেদ্ধ গরম জল। কিসের পাতা তা আমাদের কেমিষ্ট্রী-পড়া সৈন্যদেরও জানা ছিল না। যারা গোড়া হিন্দু তারা পেত হালুয়া কচুরি। কিংবা জিলিপি কচুরি। আমরা জনকতক প্রথম ক'দিন চা-রুটি নিতাম, কিন্তু পরে Orthodox menuটাই চালাতুম। বিকেলবেলায়ও এই বরাদ্দ ছিল। এবারকার খাবারের ভার ছিল বেহারী Contractorএর ওপর; আর তাই খাওয়াও আমাদের হত বেহারীদের মত। অর্থাৎ ডেলী রহরকী ডাল। প্রথম প্রথম ত আমরা মাছ কিংবা মাংস পেতাম না। চাইলে বলত, জাত যায়গা। কিন্তু শেষে আমাদের জুলুমে বাধ্য হয়ে তাকে এই সব দিতে হ'ত। যদিও মাংস পেতাম, দু' টুকরো কিংবা বড়-জোর তিন টুকরোর বেশী কোন দিনই না। নেহাৎ বারবার চাইলে আর টেবেলের কাছে মাংস নিয়ে আসতই না। হিন্দু মুসলমানদের পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত। মুসলমান Contractorটী বেশ ভদ্রলোক; সে বেশ ভাল খাবারই দিত। দুবেলা মাংস, রাত্রে রুটী তরকারি, আর দিনে ভাত কিংবা রুটী, এই ছিল তাদের menu।

তার পরে ৮—৪৫ মিনিটে full dress পরে' প্যারেড করা গেল। এটা চল্‌ল ১১॥ পর্য্যন্ত,—মধ্যে ১৫ মিনিটের

বিশ্রাম পেতুম। এর পরে এই সময়ে আমরা Rifle drillই বেশী করতুম। এ ছাড়া Squad drill, Platoon drill আর Company drillও সময় সময় হ'ত। খাওয়া দাওয়ার পর বিকেল বেলায় যে প্যারেড হত, তাতেও full dress। এই সময় অর্থাৎ বিকেল বেলায় আমরা শিখতুম Musketry অর্থাৎ কি করে বন্দুক চালাতে হয় ইত্যাদি। এ ছাড়া Bayonet training বা সঙ্গীন দিয়ে কি করে আক্রমণ করতে হয় বা কি করে নিজেকে বাঁচাতে হয় ইত্যাদি শেখান হ'ত।

প্রথম দিন মাধ্যাহ্নিক ভোজনটী হ'ল প্রায় সাড়ে বারটার সময়। এ সময়টা আমাদের বড় সুবিধের ছিল না। এর পরেই ১—১৫ মিনিটে আমাদের জন্য Sanitation lectureএর বন্দোবস্ত ছিল। এই সময় আমাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনেক উপদেশাদি, ফার্ষ্ট এড শিক্ষা ইত্যাদি দেওয়া হ'ত। বক্তৃতা দিতেন আমাদের কাপ্তেন ব্রাউন সাহেব আর Cheshire Regimentএর একজন বড় ডাক্তার। ক্যাম্প সকাল বেলায়ই মেথরে ঝাড়ু দিয়ে যেত। একটুও ময়লা থাকত না। আমাদের জিনিষপত্তর সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফাট করে বাইরে সারবন্দী করে রোদ্দুরে রেখে দেওয়া হ'ত। এটা রোজই করা হ'ত, আর তাতে আমাদের সর্দ্দি খুব কমই হ'ত।

বিকেলের প্যারেড শেষ যখন হ'ল, তখন বেলা সাড়ে তিনটা। সাড়ে চারটের খেলা। খেলাটা আমাদের বাধ্যতামূলক অর্থাৎ Compulsory করা হ'ল। এবারকার খাবার বন্দোবস্তটী তত সুন্দর না হলেও খেলার বন্দোবস্তটী অন্য বছরকার চাইতে খুবই ভাল। এর জন্য আমরা আমাদের কাপ্তেনের নিকট খুব কৃতজ্ঞ। খেলা হ'ত প্রায়ই প্লাটুন; ডারসাস প্লাটুনে আর সকল খেলার

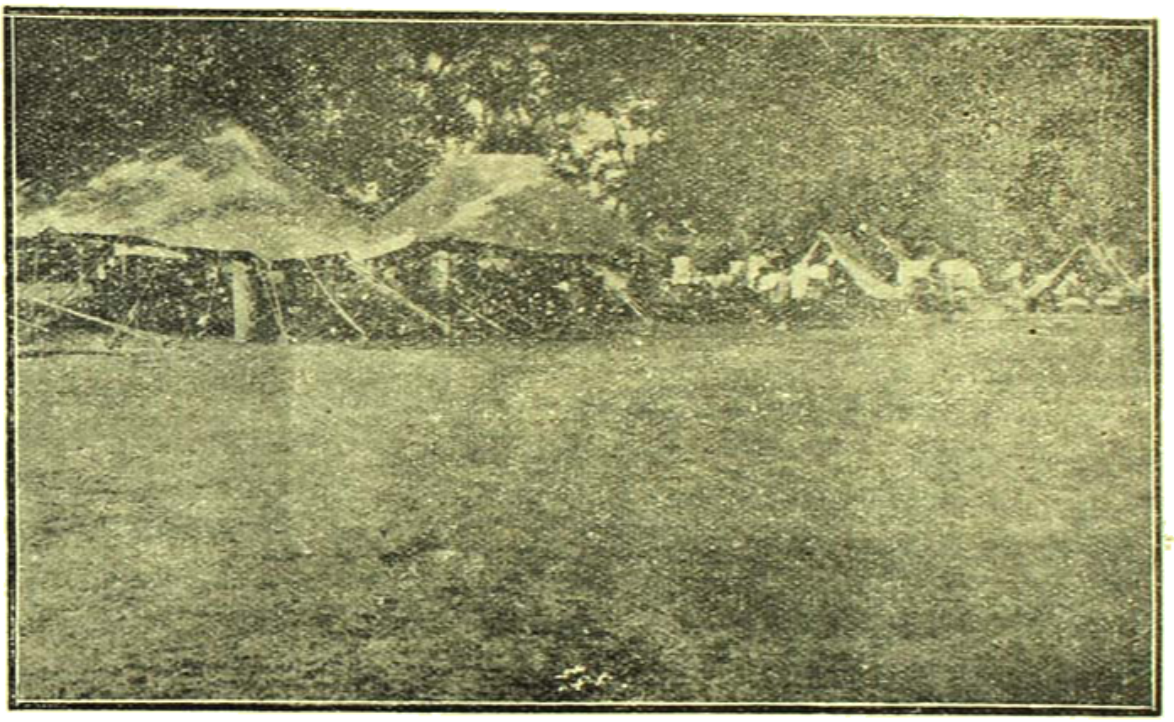

শিবির দৃশ্য—ছুটির সময়

যোগ দিতে হত পারাপারি করে। হকি, ফুটবল আর বাস্কেট বল, এই তিন রকমের খেলা হ'ত। ফুটবল খেলাটাই বেশীর ভাগ লোকে পছন্দ করত। হকিটা তত আদর পায় নাই যদিও এটা মিলিটারী খেলা। আর সবচেয়ে মজা হ'ত বাস্কেট বল খেলায়। ক্রিকেটের বন্দোবস্ত ছিল না। কিন্তু তা হ'লেও আমরা Cheshire Regimentএর সঙ্গে একদিন ম্যাচ খেলি। বল্‌তে বোধ হয় হবে না যে আমরা রীতিমত হেরে গিয়েছিলাম। খেলার শেষে আমাদের পাটনা কলেজের

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের একখানা ছবি তোলেন। ইনি কিছুদিন আগে আমাদের কোরের মেম্বর ছিলেন; এখন ছেড়ে দিয়েছেন। Cheshireদের সঙ্গে আমরা এক আধদিন ফুটবল কিংবা হকি খেলতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তারা নাকি তখন ভারি ব্যস্ত ছিল অন্য সব খেলার জন্য; তাই আমাদের আর কোন ম্যাচ হয়নি তাদের সঙ্গে।

প্রথম প্রথম নূতন রিক্রুটদের দু'একদিন বেশ একটু কষ্ট বোধ হয়েছিল; কিন্তু শীঘ্র তা সয়ে এল। আর প্যারেডে তত কষ্ট ছিল না। প্যারেডের কষ্ট ছাড়া N. C. O.দের ঠেলা বড় কিছু কম ছিল না। পরেশ বেচারা (প্রাইভেট পরেশ-চন্দ্র ব্যানার্জ্জি) একদিন বড় দুঃখ করে বলে ফেলল, "দেখ্, এই যে কোর মেম্বারশিপ্, এর অস্তিত্ব এই ক্যাম্প পর্য্যন্ত। এই ফিরে ক্যাম্পে দেখবি খালি একটা প্লাটুন—তাতে থাকবে খালি N. C. O.s—কোন প্রাইভেট ব্যানার্জ্জি, মুখার্জ্জি, দাশ, দত্ত নেই। N. C. O.রাই form fours, left right করে বেড়াচ্ছে।"

সারাদিন প্যারেডের পর সন্ধ্যার সময় যখন কাপড়-চোপড় ছেড়ে আমরা Refreshment tentএ জমা হতাম, তখন সেখানে আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। জনকতক হতভাগা অর্থাৎ যাদের গার্ড ডিউটী বা অন্য কিছু থাকত, তারাই কেবল আসত না—এমন কি পিকেট ডিউটীরও কেউ আসতে পারত না। এই পিকেট ডিউটীর কথা আগে বলতে ভুলে গিয়েছি। এদের কাজ ছিল চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা দেখা, আর মেথর ও চাকর-গুলোকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া। যাহ'ক এরা ছাড়া

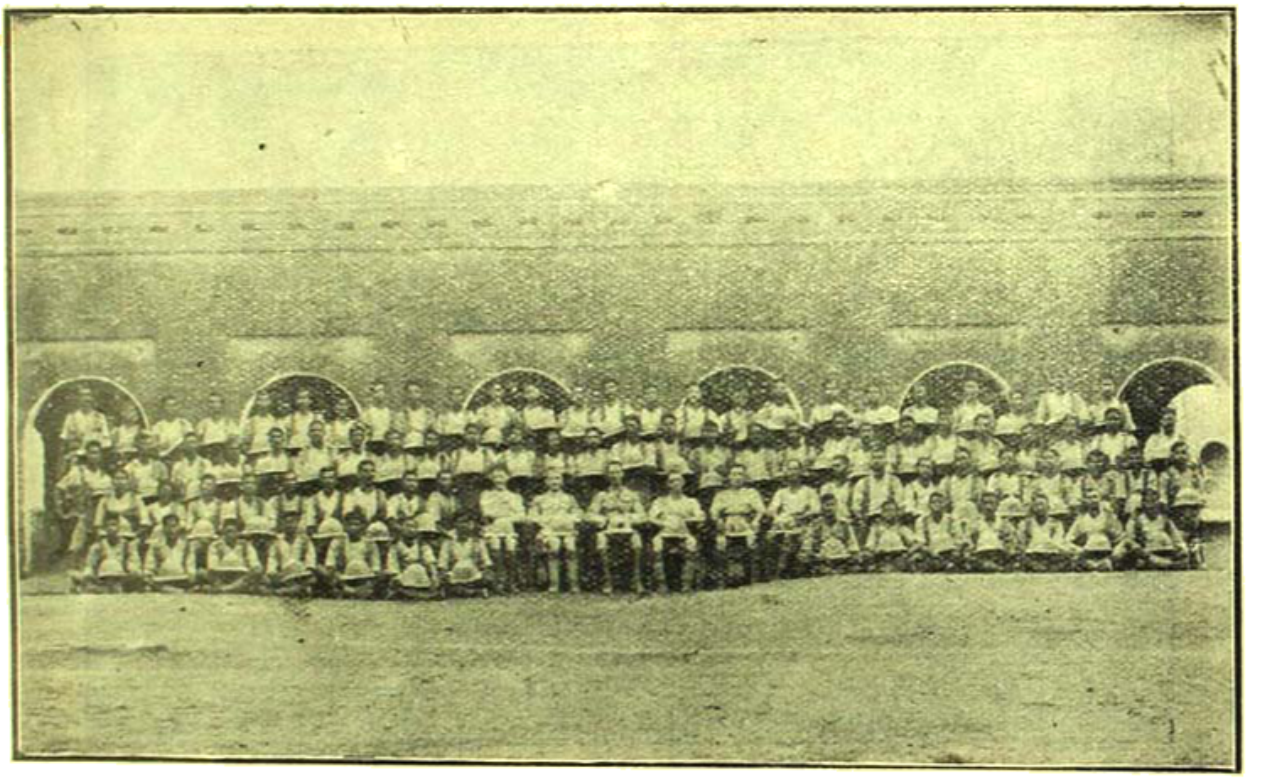

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সৈন্যদল

সবাই Refreshment tentএ জড়ো হতাম। এটা একটা মস্ত বড় তাঁবু অর্থাৎ office tent—আমাদের আমোদ প্রমো-দের জন্য আমাদের adjutant সাহেব ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখানে হাসি-গল্প ছাড়া গান-বাজনা ও farce পর্য্যন্ত হয়ে হ'ত। ল্যান্স কর্পোরাল কিরণ বাবু (ইনি ট্রেণিং কলেজের) ছিলেন এ বিষয়ে একটী ওস্তাদ। তিনি যে কোত্থেকে তাঁর হাসির ভাণ্ডার নিয়ে আসেন, তা আমরা ভেবেই পাই না। গানেও ইনি বড় কম ন'ন। কিরণ বাবুর পরেই থাকতেন

Company Sergeant Major শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি। এই tentএই camp ভাঙ্গবার আগের দিন আমরা একটা Social gathering গোছের করেছিলাম। তাতে আমরা সবাই যোগ দিয়েছিলাম। আর আমাদের সদাশয় কাপ্তেন সাহেব ও সার্জ্জেণ্টরা উপস্থিত ছিলেন। সে সময় গান, বক্তৃতা, আরও অনেক কিছু হয়। সে কথা পরে বলব। Cheshire Regiment—আমরা ক্যাম্পে থাকাকালীন এক দিন আমাদের ব্যাণ্ড শুনবার জন্য নেমন্তন্ন করেছিল। আমরা প্রায় জন ৮০ লোক গিয়েছিলাম। প্রায় ৭।৮ রকমের গৎ বাজান হ'ল। সবচেয়ে ভাল লাগলো আমাদের Napoleonএর Moscow থেকে ফেরবার বাজনা। এটা বাজান হ'ল গুলিগোলা, হাউই ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে; আর অনেক রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে। এটা প্রায় আধ ঘণ্টা চলেছিল—আর আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখছিলাম। সেটা সত্যি সত্যি একটা দেখবার জিনিষ। সত্যিকার যুদ্ধের বৎসামান্য—বোধ হয় কণামাত্রও না—আমরা দেখতে পেলাম; আর তাও কি চমৎকার। যারা যায় নি তারা এর পরে আমাদের কাছে বর্ণনা শুনে যেজায় আফশোষ করেছিল।

আমাদের কাজকর্ম্ম বেশ ভাল ভাবেই চল্‌ছিল, এত কঠিন কাজগুলোও যতই বেশ সহজ মনে হচ্ছিল, ততই দিন ফুরিয়ে আসছিল। কেউ কেউ অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর দল তাড়াতাড়ি করছিলেন; কিন্তু আমাদের মত গোঁয়ার-গোবিন্দদের কতকগুলির শীঘ্র বাড়ী ফিরতে হবে বলে দুঃখ হচ্ছিল। সুখে দুঃখে তখন প্রায় তেরদিন কেটে গেছে, এর মধ্যে Cheshire Regimentএর কর্ণেল আমাদের inspect করে গেছেন। এখন খবর এল যে General Barell আসছেন দানাপুরে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। বুঝতে বাকী রইল না যে আবার inspection হবে; তাই equipment বা পোষাক ইত্যাদি সাফ করার ধুম পড়ে গেল।

শুক্রবারে জেনারেল সাহেব এলেন; আমরা Present at Arms করলাম; আর কিছু ড্রিলও দেখালাম। জেনারেল সাহেব ঘুরে ফিরে অনেকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্লেন। জন কতককে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা University career-এর পর কি করব? কেউ বল্‌লেন, executive service, কেউ বা বিলেত যেয়ে barristery পড়া, আর কেউ কেউ নিজের মন-মতন কথা বল্‌লেন। দেখে শুনে কথাবার্ত্তা বলে জেনারেল সাহেব খুব খুসীই হলেন; আর বল্‌লেন যে, পরের বারে এসে তিনি আমাদের আরও ভাল দেখতে চান। ইনি চলে যাবার খানিক বাদেই এলেন—শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী সার মহম্মদ ফকরুদ্দীন, আমাদের ভাইস চেন্সলার মিঃ সুলতান আহম্মদ, আরও জনকয়েক বড় অফিসার। ফকরুদ্দিন সাহেব আমাদের স্পোর্টসের জন্য ১৫০৲ টাকার গ্রাণ্ট দিলেন। ছোটখাট বক্তৃতাও হল আমাদের সাফল্যের প্রশংসা করে।

এবার বেশীর ভাগ লোক রিক্রুট থাকায় আমরা বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারি নাই। তবে যারা advanced platoon বা কাজ-চালা প্লাটুন, তারা আগের চাইতে ঢের বেশী জিনিষ শিখতে পেরেছে। এবারকার উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আমাদের বাৎসরিক স্পোর্টস্ সবচেয়ে সুন্দর হয়েছিল। এটা হ'ল শনি ও রবিবারে, অর্থাৎ আমরা পাটনায় ফিরবার দুদিন আগে। এবার ল্যান্স কর্পোরাল রমণীদা সবচেয়ে বাহাদুরি দেখালেন। তিনি পাঁচটা জিনিষে ফাষ্ট হলেন; আর কর্পোরাল দীনেশ সেন তিনটা জিনিষে। মতিন বলে একটী মুসলমান ছেলে ১ মাইলে ½ মাইলে ফার্ষ্ট, আর দুটো জিনিষে সেকেণ্ড হল। আমি নিজে ১ মাইলে ও আধ মাইলে সেকেণ্ড হলাম; আর ২২০গজে হলাম থার্ড। স্পোর্টস্ যেদিন সেদিন সকালে দুই, তিন আর চার নম্বর প্লাটুন short rangeএ গুলি ছুঁড়তে যায়। এক নম্বর প্লাটুন short rangeএ দুইদিন যায়। তার একদিনে ছোট গুলি ছোঁড়া হয়, আর একদিনে বড় গুলি থাকে। Live rounds বলে তা ছোঁড়া হয়। এই গুলি গুলি ·৩০৩ নম্বরের। এবারও কর্পোরাল দীনেশ সেন সব চেয়ে ভাল করেছে অন্য সবার চেয়ে।

রবিবারে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আরম্ভ হ'ল আনন্দ সম্মিলন। প্রথমে কোরাসে opening song "আমার দেশ" গাওয়া হ'ল। তার পর কিরণবাবু তাঁর speech in 27 languages আরম্ভ করলেন। একে কিরণবাবু Atkinson's criticism on Johnson বলেন; আর তাঁর মতে এটা একটী nocternal perambulation। ভূমিকার

সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা হাসির ঢেউ উঠ্‌ল, যা সামলাতে সবাই কাস্‌তে আরম্ভ করলেন,—

"Gentlemen and Non-Gentlemen (I mean the ladies) ! বলে, তার পর চল্‌ল, "I have arrived at a point which is in my mind a very fachulating, endomating and latapetic subject. This subject, however, involves the most catheting, captulating, thoughtifying and moraletive rambling.....The sweet voice, sweet I say, very sweet indeed ! Coming from her dilapitating, fren—chusing and trembulative lips, and entering into these versemilating ears of mine made me at once rotatic, romantic, disinterrogative, and on the whole, tetract and infatuous I was hethicasingly tansponed. Gentle and batharassetic men.....! Stood a stock—still with no articulation from these infinitesimal and hanivolasive lips. .....O calcarian brethivocative sentilation of the horumanced envigorate the most tersecorean sycophantic aliquendo in that static virago, who.....hampers on the voilubility of vocabulary and vocumerates the viluperation of the focumeration..... ইত্যাদি ইত্যাদি।

বক্তৃতার সমস্তটা দিতে হলে অনেকখানি যায়গা লাগে, তাই খানিকটা মাত্র দেওয়া গেল। পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে যদি কেউ পুরোটা চান তবে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর পরে ল্যান্স কর্পোরাল ভুবন লাহিড়ী অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে ছুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে নিলেন। এর পর বাঙ্গালা, হিন্দী ও উর্দ্দু গান, ফার্স আরও কত কি হবার পর কর্পোরাল শ্রীযুক্ত পরমচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি এম-এ (এখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) এক বক্তৃতা দিলেন। আমাদের পালা শেষ হলে সার্জ্জেণ্ট ইলিস ও কাপ্তেন ব্রাউন উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। সর্ব্বশেষে "আমার কুটীর রাণী" গানখানি গেয়ে আমরা বিদায় নিলুম।

পরদিন—পাটনায় ফেরবার দিন। সকাল বেলায় উঠে সবাই লেগে গেল জিনিষপত্তর প্যাক্ করতে, টেণ্ট গোটাতে আর লটবহর গোছাতে। প্রথমে কম্বলগুলি গুণে গেঁথে ফেরৎ দেওয়া হল। দুপুরবেলায় গরুরগাড়ী বোঝাই করে দেওয়া হ'ল সমস্ত জিনিষপত্রে। সমস্ত দুপুরটা তার পর কেটে গেল তাঁবুগুলো প্যাক করতে। বিকেল নাগাত সব ঠিক হয়ে গেল। আগেকার মত ২০ জন জিনিষপত্র নিয়ে চলে গেল—আর আমরা ফের পড়ে রইলাম গরীর আশায় আশায়।

তাঁবুগুলো সরিয়ে ফেলাতে যায়গাটা বড় খালি খালি দেখাতে লাগল। জটলা পাকিয়ে সবাই খালি পাটনার কথা বলাবলি করতে লাগ্‌ল। ফের সেই আগেকার কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি করে গরীগুলো যখন আমাদের পাটনায় পৌঁছে দিল, তখন রাত আটটা। নেমে বন্দুক, ওভারকোট আর অন্যান্য সরকারী জিনিষপত্তর ফিরিয়ে দিয়ে বাড়ী যাবার জন্যে যখন সবাই ব্যস্ত, তখন খবর পাওয়া গেল, একজন বন্দুকের ম্যাগাজিন আর বেল্ট হারিয়ে ফেলেছে। হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গেল। বেচারীর মুখ তখন চুণ হয়ে গিয়েছে। আমরাও জবুথবু হয়ে গেলাম। খোঁজ খোঁজ কর্ত্তে সেগুলোকে একটা গরীর তলায় খুঁজে পাওয়া গেল। তারপর Fall in করিয়ে প্রায় নটার সময় আমাদের Dismissএর হুকুম দেওয়া হল—আর সঙ্গে সঙ্গে বানের জলের মত হু হু করে বেরিয়ে এসে সকলে চারিদিকে ছুটকে পড়ল। আমিও।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ

(২)

পরলোকে বিশ্বাসের ন্যায়, পরলোকের অবস্থা সম্বন্ধে, অর্থাৎ স্বর্গ-নরক প্রভৃতি সম্বন্ধেও, প্রত্যেক জাতিরই কোন-না কোনও ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে, অথবা মানবের জ্ঞানোন্মেষের মুহূর্ত হইতেই পরকালের চিন্তা মানুষের মনে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম যে সকল প্রমাণ এখন পর্যন্ত আমরা পাইয়াছি, তাহাতেও পরকালের স্থান আছে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণা ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল; এবং এই সকল ধারণার সহিত সেই জাতির ধর্মবিশ্বাস ও দার্শনিক জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এমন কি পরলোকের ধারণার সহিত ইহলোকের জীবন-যাত্রা নির্বাহের প্রণালী ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল (বা এখনও আছে) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ধারণা ও বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ ছিল না। সুতরাং অপ্রত্যক্ষের সম্বন্ধে মানুষ যেমন আপনার প্রবৃত্তি, শিক্ষা, ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে, প্রাচীন যুগের মানুষও কতকটা তেমন ভাবেই নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেন। যাঁহারা অপ্রত্যক্ষের উপর বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা পরলোকের ধারণাকে মানব-মনের কল্পনার বিজৃম্ভন বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। পৃথিবীর সর্বত্র কোন ধারণা প্রচলিত আছে বলিয়াই তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না,—তাহার সত্যতার অস্তিত্বের উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া চাই। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতা জনসাধারণের নিকট পরলোকের অস্তিত্বের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারে নাই। তাহেই পরলোকে বিশ্বাস করিলেও, চিন্তাশীল মানবের মনে একটা 'কিন্তু' থাকিয়া গিয়াছিল।

প্রত্যক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ-তুল্য উপায়ে পরলোকের অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রমাণিত করিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছে—নব-অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের উপর। এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান কিরূপে তাহার এই

কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

প্রথমেই এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন উঠে। প্রথম প্রশ্ন—পরলোক আছে কি না; দ্বিতীয় প্রশ্ন—যদি পরলোক থাকে, তাহা হইলে ইহলোকের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ; তৃতীয় প্রশ্ন—পরলোকের স্বরূপ কি? পূর্ব্বের প্রবন্ধগুলিতে আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি; এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারিক ভাবে তাহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত করিব। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিয়াছি—পরলোক আছে। এখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এ সম্বন্ধে মোটামুটীভাবে এই বলিতে পারা যায় যে, ইহলোক ও পরলোক একই অবস্থার দুই দিক মাত্র। উভয়ের মধ্যে অজ্ঞানতার একটা কাল-যবনিকা রহিয়াছে, তাই আমরা এপার হইতে ওপারের দৃশ্য দেখিতে পাই না। যখন সেই যবনিকা সরিয়া যায়, তখন, অর্থাৎ সাধন বলে মানবের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইলে, ইহলোক ও পরলোকের ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। এই অবস্থা যে কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর যোগীদেরই হয়, তাহা নয়,—সাধারণ মানুষও শিক্ষা ও সাধনা বলে এই শক্তি লাভ করিতে পারেন। যাহা হউক, অতি-মানুষের (Superman) অথবা (Clairvoyant) অতীন্দ্রিয়দর্শীদের কথা এখানে আলোচ্য নয়—বর্ত্তমান প্রবন্ধে পরলোক সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইবে।

মৃত্যু জীবনের নামান্তর মাত্র, জীবন ও মৃত্যু একই অবস্থার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র—এই সত্য পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই পরিজ্ঞাত ছিল। মানুষ অমর,—সান্ত মানুষের মধ্যে অনন্তত্বের বীজ রহিয়াছে। কিন্তু আমরা তো মানুষকে ফলবুদ্বুদের মতই কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইতে দেখি! তবে সে অমর হইল কিরূপে? সত্তার অথবা অস্তিত্বের (Existence) একটা দিকমাত্র আমরা দেখিতে পাই; আর তাহাও পূর্ণ সত্যের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। মৃত্যুর —এই আপাত-প্রতীয়মান ধ্বংসের পরেও মানুষের সত্তা বর্ত্তমান থাকে, আর তাহার সেই অবস্থাই 'পরলোক।' সুতরাং মানুষের পক্ষে ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন অলঙ্ঘ্য সমুদ্র নাই—ইহলোক ও পরলোক এক সূত্রে গ্রথিত। মৃত্যুর প্রতি, পরলোকের প্রতি, মানুষের যে ভয়, তাহা অজ্ঞানতা-জনিত অপরিচিত অজ্ঞাতের প্রতি কাল্পনিক ধারণার ফল মাত্র। যাঁহারা সেই অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা অপসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা, তাঁহারাই মৃত্যুঞ্জয়ী,—অর্থাৎ মৃত্যুজনিত ভয় তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে পারে না। আজ সেই অজ্ঞাত দেশের বার্ত্তা আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাই তাহার প্রতি ভয়ও কমিয়া যাইতেছে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কল্যাণে মৃত্যুর প্রতি মানুষের ভয় যত কমিয়া যাইবে, ততই জগতের মঙ্গল।

এখানে আমরা অতি সাধারণ ভাবে পরলোক সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের ধারণার একটু আভাষ দিতে চেষ্টা করিব। আমি হিন্দু বলিয়াই যে হিন্দুশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি তাহা নয়। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যজাতির মধ্যেই প্রায় একরূপ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই ধারণার পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বক্তব্যও বিবৃত করা হইবে।

ঋগ্বেদে পরলোক সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, তখন আমাদের দেশে পৌরাণিক পরলোকের ধারণা জাগে নাই। ঋগ্বেদে পরলোক পরম সুখের স্থান বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। * পরবর্ত্তীযুগে পরলোক সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনা প্রকাশ পাইতে লাগিল। পরলোকের রাজা হইলেন—যম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শাস্ত্রেও এই পৌরাণিক পরলোকের বর্ণনাই আছে। মানুষ ইহজীবনের পাপপুণ্যের শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে পরলোকে—ইহাই সকল পৌরাণিক ধারণার সারমর্ম্ম।

পরলোক সম্বন্ধে দার্শনিক মতও এই যে,—আত্মিকগণ মৃত্যুর পর (অথবা ইহজীবনেই) আপন আপন সংস্কার বা কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করেন। অবশ্য পাপ-পুণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে পৌরাণিক ও দার্শনিক মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব, এবং ইহলোক ও পরলোকের সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই এই মত। অবশ্য বিভিন্ন দেশে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মতেরই প্রকারভেদ পাওয়া যায়। হিন্দুগণ জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন। মুসলমান বা খ্রীষ্টানগণ তাহা স্বীকার

* এ সম্বন্ধে মূল বা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়োজন নাই! এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ঋগ্বেদ ১০২—১১ ও ৫৮ সূক্ত দ্রষ্টব্য।—লেখক।

করেন না। গ্রীকদিগের মধ্যে পিথাগোরাস-প্রমুখ যাঁহারা এই মতবাদ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার শিষ্য। আবার পরলোকভোগের—ধর্মভেদে প্রকারভেদ আছে। কাহারও মতে, যেমন খৃষ্টীয় শাস্ত্রে, পাপ করিলে আর রক্ষা নাই, অনন্তকাল ধরিয়া নরক ভোগ করিতে হইবে! আবার হিন্দুমতে পাপ করিলেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। পাপী আবার উন্নত পবিত্র হইতে পারে, তবে তার নিজের পাপের ফলভোগ করা চাই। দর্শন ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা আমাদের শক্তিমত ইহার সত্যতা-অসত্যতা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। এবং এ সম্বন্ধে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের প্রমাণ ভবিষ্যতে উপস্থিত করিব।

গতবারে (ভারতবর্ষ, চৈত্র) শ্রাদ্ধতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা সংস্কারের প্রভাব এবং মনের শক্তি লক্ষ্য করিয়াছি। পাপ-পুণ্য এবং স্বর্গ-নরক প্রভৃতি এই সংস্কার ও মানসিক ধারণার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। গতবারে আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, মানুষ ইহজীবনের বাসনা কামনা ও সংস্কারের পুঁজি লইয়া পরলোকের পথে যাত্রা করে, এবং অনেক স্থলে এই কামনা ও সংস্কারই তাহাকে স্বর্গ-নরক ভোগ করায়। বস্তুতঃ মানুষের মনই স্বর্গ-নরকের সৃষ্টিকর্ত্তা।

মানুষ ইহজীবনে সহজাত সংস্কার বশে ও শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লয়। সুতরাং কোন কাজ করিলে তাহা পাপকার্য্য না পুণ্যকার্য্য সে সম্বন্ধেও তাহার একটা ধারণা জন্মে; এবং পাপের ফলে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, ইহাও তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায়। পুণ্য সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। সুতরাং সে যখন ইহলোকের হিসাব নিকাশ করিয়া (অথবা হিসাব নিকাশ করিবার জন্য ?) পরলোকে যাত্রা করে, তখন তাহার সম্বল থাকে—পাপ-পুণ্যের পুটুলী, অর্থাৎ পাপ-পুণ্য সম্বন্ধীয় ধারণা। সুতরাং যে পাপ করিয়া গেল, সে পরলোকে (অধিকাংশ স্থলে ইহলোকে) তাহার পাপ সম্বন্ধীয় ধারণাগত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। এবং যাঁহার পুণ্য সঞ্চিত আছে, তিনি এই মানসিক অশান্তি হইতে নিস্তার লাভ করিলেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। ক ও খ এই দুই জনেরই যথেষ্ট সম্পত্তি আছে এবং উভয়ই অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। 'ক' নির্লিপ্ত ভাবে ধন ভোগ করিলেন এবং 'খ' যক্ষের মত ধন আগলাইয়া মৃত্যু সময়ে সম্পত্তির নিকট মন রাখিয়া পরলোকে চলিলেন। তাহার ফল হইল এই যে, 'খ' তাঁহার সম্পত্তি আগলাইবার জন্য 'যক্ষ' হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন, আর 'ক' নিশ্চিন্ত ভাবে মানসিক শান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। এক মানসিক অবস্থা ব্যতীত 'ক' ও 'খ' উভয়েই সমানই ছিলেন; কিন্তু মানসিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য পরলোকে দুইজনের স্বর্গ-নরক ভোগের ধারা বদলাইয়া গেল। পরলোকে গিয়াও পার্থিব বিষয়ের জন্য অশান্তি ভোগ করে, এরূপ আত্মিকের বিবরণ পরে প্রদান করিবার ইচ্ছা আছে। উপরিউক্ত উদাহরণে সম্পত্তির বন্ধন সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কার সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—পাপ-পুণ্য কি তবে মানুষের মানসিক ধারণা বা সংস্কার মাত্র? ঠিক তাই। পাপ-পুণ্য মানুষের নিজের তৈরী জিনিস। যাহার পাপ-পুণ্য-জ্ঞান নাই, অথবা যিনি পাপ-পুণ্যের অতীত, তাঁহার পাপ-পুণ্য ভোগও নাই, তাঁহার পক্ষে স্বর্গ-নরকও নাই। আপাত-দৃষ্টিতে কথাটা খুব শক্ত এবং ভীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। পাপ-পুণ্য-জ্ঞানহীন হওয়া অথবা পাপ-পুণ্যের অতীত হওয়া, এই দুয়ের কোনটাই সাধারণ-মানবের পক্ষে সম্ভবপর নয়। * সুতরাং সমাজ-কর্ত্তাগণের আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

প্রথমে পাপ-পুণ্য-জ্ঞানহীনদিগের কথাই ধরা যাউক। আমরা এখানে সসীম জ্ঞান লইয়া আমাদিগের ধারণার অনুযায়ী আলোচনা করিতেছি। সুতরাং এই আলোচনায় উপনীত সিদ্ধান্তকে ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি

* মানুষের পাপ-পুণ্য-জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখানে সমাজ-বিজ্ঞান এবং আইন-ঘটিত সমাজ-বিজ্ঞানের (sociologico-legal) অনেক সমস্যা আসিয়া পড়ে। আমরা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না, তাহা এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিকও হইবে। তবে মোটামুটী ভাবে এই বলিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান সামাজিক ও পারিবারিক ইত্যাদি আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া মানুষের মনে পাপ-পুণ্যের ধারণা জন্মিবেই এবং পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে অধিকাংশ ধারণার মূলে আছে—সমাজ-মঙ্গল। সুতরাং অন্ততঃ এই দিক দিয়া পাপ-পুণ্যের ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।— লেখক।

না। ভগবানের নিয়ম মানবের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত কি না জানি না, তবে তিনি মানুষকে যতটুকু দিয়াছেন, ততটুকুর সাহায্যেই এ বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

যাহার পাপ-পুণ্যের জ্ঞান নাই, যাহার মনে পাপ-পুণ্য সম্বন্ধীয় কোন ধারণা ছায়াপাত করিতে পারে নাই, সে কিরূপে পাপ-পুণ্যের ফলাফল ভোগ করিবে? ফল ভোগ করিতে তো মন। কিন্তু মন তো এ বিষয়ে নির্জ্জিয়—তবে ফল ভোগ করিবে কে? তার পর, যে পাপ-পুণ্য কিছুই জানে না, যেমন শিশু, অথবা পাগল, তাহার কাঁধে তৎকৃত কর্ম্মের জন্য পাপ-পুণ্যের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া যায় কি? উত্তর হইতে পারে—শিশু আগুনে হাত দিলে তাহার হাত পুড়িবেই; সুতরাং বিশ্বমঙ্গল নীতি লঙ্ঘন করিলে শাস্তি পাইতেই হইবে। কিন্তু সেই নীতির নিয়ন্তা কে? অন্ধ প্রকৃতি, না, মঙ্গলময় ভগবান? যদি প্রকৃতি হয়, তবে হাত পুড়িবেই। কিন্তু তাহা তো সত্য নয়! যদি তাহা সত্য হয়, তবে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনার কোন প্রয়োজনই থাকিত না। কিন্তু এ শুধু মতবাদের কথা নয়। ভবিষ্যতে আমরা তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব।

যাহাদের মানসিক শক্তির বিকাশ হয় নাই, তাহারা ব্যতীত বর্ত্তমান সমাজে এমন কেহ থাকিতে পারে না, যাহার মনে পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। বাহিরে জ্ঞান করিলেও অথবা আত্মবঞ্চনায় বিভোর থাকিলেও, অনেকের অন্তরেই অন্ততঃ সুপ্তভাবে পাপ-পুণ্যের ধারণা বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বজন্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহজন্মেরই পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধারণা ও সংস্কার প্রত্যেকের মনে ক্রিয়া করিতে থাকে। নানা কারণে এই ধারণা সুপ্ত অথবা মৃতপ্রায় থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহারা মরে না—হীনপ্রভ ভাবে মানুষের সুপ্তচৈতন্যে অবস্থিতি করে। (যাঁহারা পাপ-পুণ্যের অতীত তাঁহাদের কথা পরে বলা যাইবে)। সুতরাং কোন-না-কোন সময়ে সংস্কার জাগরিত হইয়া উঠে; আর সংস্কারের মালিক অথবা দাস, এই সংস্কারের বোঝা ও তদনুযায়িক পাপ-পুণ্যের বোঝা কাঁধে করিয়া ইহলোক ও পরলোকে বিচরণ করেন। চিরজীবন অসৎকার্য্য করিয়া, শেষজীবনে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইয়াছেন,—ইহজীবনেই নরকভোগ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াছেন,—এমন লোকের উদাহরণ বিরল নয়। সুতরাং আপাত-দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য না মানাটা যত সহজ বলিয়া মনে হয়, কার্য্যতঃ তাহা তাহার ঠিক বিপরীত। সুতরাং সাধারণ মানবের পক্ষে পাপ-পুণ্য মানিয়া চলাই শান্তির উপায়—যদিও তাহা মুক্তিদায়ক নয়।

যাঁহারা সাধনাবলে পাপ-পুণ্যের অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগকে সাধারণ ভাবে ত্রিগুণাতীত বলা যায়। কামনা, বাসনা, সংস্কার প্রভৃতির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। গীতাতে এইরূপ মহাপুরুষের লক্ষণই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের কর্ম্মও নাই কর্ম্মফলও নাই; পাপ-পুণ্য নাই, পাপ-পুণ্যের ফলভোগও নাই।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। সুতরাং তাঁহার পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি থাকিতে পারে না, এবং নাইও। বেদান্ত-দর্শন মতে এই সকল পরিদৃশ্যমান জগৎ সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি মায়ার বিজৃম্ভন—অজ্ঞানতার ফলমাত্র। মায়ামোহ দূর হইলে, জীবই শিব হইবেন,—তিনি স্বরূপস্থ হইবেন। সুতরাং দর্শনের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সুখ-দুঃখের ন্যায় পাপ পুণ্যেরও বাস্তব সত্তা নাই। যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভোগ করে, পাপ-পুণ্যও সেই সৃষ্টি করে এবং ভোগও করে সেই। এই সকলের প্রহীতা মন। সুতরাং মানুষ স্বীয় মানসিক ধারণা অনুযায়ী পাপ-পুণ্য ভোগ করে। এই দিক দিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের পৌরাণিক স্বর্গ-নরক বর্ণনাও সত্য। এই হিসাবে সত্য যে, এই সকল বর্ণনার অনুযায়ী মানুষের সংস্কার গঠিত হইয়াছে; সুতরাং সংস্কার অনুযায়ী পৌরাণিক স্বর্গ-নরক ভোগ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই ভাবে আইনানুযায়ী, পাপ-পুণ্যেরও সত্তা আছে।

সংস্কার মানুষকে ঘুরায় সত্য, কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে এই সংস্কারের শক্তি প্রতিহত হয়। ইহলোকের স্থূল-দৈহিক বন্ধন-মুক্ত হইলে, মানুষ ইহলোকের অপরিজ্ঞাত অনেক সত্যের সাক্ষাৎ পায়। তাহাতেও আত্মিকের সংস্কার ও ধারণা পরিবর্ত্তিত হয়।

পাপ-পুণ্যের এই মতবাদের বিরুদ্ধে, অথবা, ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আর একটী প্রচলিত মতবাদ (Theory) দেওয়া যাইতে পারে যে, পাপ-পুণ্য ভগবানের অলঙ্ঘনীয়

অপরিবর্ত্তনীয় বিধান। জ্ঞানবলে অথবা ভগবানের কৃপায় সেই পাপের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা হইতেই ইহা পরিস্ফুট হইবে যে, এই মতবাদ যুক্তিসিদ্ধ নয়, অথবা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় না।

মানুষের কামনা-বাসনাই তাহার সুখ-দুঃখের মূল কারণ। মানুষ যখন কামনার প্রভু না হইয়া কামনার দাস হয়, তখনই আপনার পায়ে আপনি শিকল পরাইয়া দেয়,—নিজের দুঃখের সৃষ্টি করে। যে কামনা-বাসনা ইহজীবনে মানুষকে পরিচালিত করে, সেই কামনা পরলোকেও তাহাকে স্বর্গ-নরকের স্বপ্ন দেখায়। এই স্বর্গ ও নরক ভোগ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—কামনার ধ্বংস নয়—কামনার উপর প্রভুত্ব লাভ।

হিন্দু চিন্তা-ধারায় স্বর্গের স্থান খুব উচ্চে নয়। বহু স্থলে স্বর্গের কামনাকে মুক্তির অন্তরায় বলা হইয়াছে। কথাটা খুব সত্য। এ কেবল পৌরাণিক ধারণা নয়, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দিক দিয়াও স্বর্গ-ভোগ চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়। সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি খুব ভাল; কিন্তু তাহা যদি মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তাহা হইলে তাহাই মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। মৃত্যুর পরপারে গিয়াও সেই প্রবৃত্তি মানুষকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আত্মীয়-স্বজনের ও মানবজাতির প্রতি ভালবাসা খুব ভাল জিনিস, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাই আবার আত্মিকের বন্ধনের কারণ হইতে পারে। এরূপ অনেক ঘটনার কথা জানা যায়, যাহা দ্বারা ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মিক পার্থিব আকর্ষণের জন্য ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। সেই জন্যই হিন্দু-সভ্যতার উপদেশ —'সু' এবং 'কু' এই উভয়ের উপরে যাও—শৃঙ্খল স্বর্ণেরই হউক আর লৌহেরই হউক, উভয়েরই বাঁধিবার শক্তি সমান।

এখানে একটী সমস্যা উপস্থিত হইতেছে। মানুষ কি তবে পাপ-পুণ্য-জ্ঞান-বর্জ্জিত হইবে,—তাহার কি সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি থাকিবে না? তাহা হইলে পৃথিবীটাই যে একটা প্রকাণ্ড নরকে পরিণত হইবে! হিন্দু চিন্তা-ধারার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠিয়াছে এবং অভিযোক্তাগণ প্রায়ই পাশ্চাত্য দেশীয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার স্থান এখানে নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, অভিযোক্তাগণ এই চিন্তা-ধারার মূলে পৌঁছিতে পারেন নাই। এই মতবাদ কাহাকেও সুৎ-প্রবৃত্তিহীন অথবা অলস নিষ্কর্ম্মা হইতে বলে না। কেবল মাত্র বলে—নিজের প্রভু হও, 'সু' বা 'কু' প্রবৃত্তির দাসত্ব করিও না; নিষ্কর্ম্মা হইও না, অধিকন্তু—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখিলাম যে, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি মানুষের সংস্কার ও ধারণার ফল। স্বর্গ-নরক-ভোগের পশ্চাতে থাকে—প্রচণ্ড কামনা। স্বর্গ ও নরক উভয়ই মুক্তি-পথের অন্তরায়। তবে কুপ্রবৃত্তির বশে মানুষ অধঃপতিত হয়, কষ্ট ভোগ করে। আর সুপ্রবৃত্তির দাসত্বে মুক্তিলাভ না হইলেও আত্মিক অধিকাংশ স্থলেই দুঃখ ভোগ করেন না বা তাঁহার অধঃপতন হয় না। বিশ্বমঙ্গল-নীতির অনুসরণে ক্রমশঃ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। এই দিক দিয়া সৎকর্ম্মের বা পুণ্যকার্য্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবারণ মনে করিয়াছিলো মলয়ের পত্র পাইয়াই তাহার স্ত্রী প্রেয়সী মলয়কে পত্র লিখিবে। এই আশায় সে খুব ঘন ঘন মলয়ের কাছে আসিতে লাগিলো। নিবারণের সহিত মলয়ের এই ঘনিষ্ঠতা ও তাহাদের আলাপ গোপন করিবার চেষ্টা মৃদুলার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্রমশঃ তাহার স্বামীর দৃশ্য অভি-সন্ধির আকার ধরিয়া উঠিতে লাগিলো।

চার দিন অপেক্ষার পর চিন্তান্বিত হইয়া মলয় অনন্তকে জিজ্ঞাসা করিলো—মিষ্টার বসু, প্রেয়সী তো আমার চিঠির জবাব দিলে না। এখন কী করি বলুন তো? নিবারণ বেচারা আমার উপরই শেষ নির্ভর করে' আছে।

অনন্ত এবার একটা সত্যাভাসের কথা বলিলো—সে চিঠি হয় তো প্রেয়সী দেবী পান নি। আপনি আর-একখানা চিঠি লিখুন না।

মলয় অন্যমনস্ক ভাবে বলিলো—তাই লিখবো।

অনন্ত তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলো—আমি ডালো ভালো ল-ইয়ারদের সঙ্গে কন্‌সাল্‌ট্ করেছি··· হিন্দু-ম্যারেজ ইজ্ ইন্‌ডিসোলিউব্‌ল্—হিন্দুর বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য, স্ত্রী যদি মার-পিট কি নিতান্ত অপর প্রমাণ কর্‌তে না পারে তবে সে কিছুতেই স্বামীকে ত্যাগ কর্‌তে পারে না। নিবারণ-বাবু যখন স্ত্রীকে ঘর করে' পুনর্গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত আছেন, তখন তাঁর স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে ফিরে আস্‌তে হবে। আপনি আর-একবার চিঠি লিখে দেখুন। না জবাব পান, আপনাতে আমাতে একদিন গিয়ে বুঝিয়ে বল্‌লেই হবে।

মলয় অনন্তের কথায় ভুলিয়া আবার প্রেয়সীকে পত্র লিখিলো—

প্রেয়সী,

তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় চার দিন কাটলো, আজও তোমার চিঠি পেলাম না। তুমি যে এতো-বড়ো হৃদয়হীনা হয়েছো এ ধারণা আমি কর্‌তে পার্‌ছি না। হয় তো তুমি আমার পত্র পাওনি। তাই তোমাকে আবার জানাচ্ছি যে লোক তোমাকে ভালবেসে পত্নীর মর্য্যাদা দিতে উৎসুক হয়ে আছে, তার প্রেমের অমর্য্যাদা তুমি কোরো না।

এই পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় দুদিন থাক্‌বো। উত্তর না পেলে আমি নিজেই তোমার কাছে যাবো জান্‌বে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমলয় চট্টোপাধ্যায়

পত্রখানি পূর্ব্ববৎ অনন্ত হস্তগত করিলো, পত্রের সম্বোধন প্রেয়সীকে অনায়াসেই প্রেয়সীতে পরিণত করিলো এবং পত্রনিম্নের শুভাকাঙ্ক্ষী শব্দটাকেও প্রেমাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিতে অনন্তকে অধিক বেগ পাইতে হইলো না। এবং অবশেষে এই পত্রখানিও মৃদুলার হস্তে সমর্পণ করিয়া অনন্ত হাসিমুখে বলিলো—এই নিন বৌদিদি, আপনার হৃদয়েশ্বরের হৃদয়ের আর একটু পরিচয়।

মৃদুলা কম্পিত হস্তে পত্র লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলো; তাহার বিশ্বাস ও প্রেমের নিষ্ঠুর হত্যা অপরের সমক্ষে সে সহ্য করিতে পারিলো না। এই চিঠি পড়িয়া মৃদুলার সন্দেহ দৃঢ় বদ্ধমূল হইলো। স্বামীসঙ্গ তাহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইতে লাগিলো। কিন্তু সে শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য এই মর্ম্মান্তিক যাতনা সহ্য করিয়া রহিলো।

প্রেয়সীকে মলয় যে চিঠি লিখিয়াছিলো তাহা মৃদুলার বাক্সে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিলো, কাজেই মলয় তাহার উত্তর পাইলো না। নিবারণ প্রত্যহ সন্ধান করিতে আসে পত্রের উত্তর আসিয়াছে কি না। নিবারণের ব্যাকুলতা দেখিয়া মলয়ও উতলা হইয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় দিন গণে। মৃদুলা নীরবে প্রত্যহ নিবারণের আগমন ও মলয়ের উন্মনস্কতা লক্ষ্য করে। এবং মৃদুলা ক্রমশঃই ম্লান গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে।

মলয় নিজের অন্যমনস্কতার মধ্যেও মৃদুলার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলো—মৃদুল, তোমার শরীর কি ভালো নেই?

মৃদুলা দ্রুতপদে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেলো—না, আমি বেশ আছি।

মলয় পত্নীর ঐ কথাতেই আশ্বস্ত হইয়া অপর কোনো প্রশ্ন করা হইতে নিরস্ত হইলো।

প্রেয়সীর উত্তর আনার সময় যখন অতিক্রান্ত হইয়া গেলো, তখন একদিন অনন্তই মলয়কে জিজ্ঞাসা করিলো—মলয়-বাবু, প্রেয়সীর কোনো উত্তর পেলেন?

মলয় উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলো—না, কোনো সাড়া শব্দই তো নেই।

অনন্ত গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলো—তা হলে একদিন আপনাকে যেতে হয়।

মলয় বলিলো—আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম। কিন্তু ও-সব জায়গায় যেতেও ইচ্ছা করে না।

—তা কি কর্‌বেন বলুন, আপনি পত্রের উপকারের জন্যে যাবেন; আর যার বাড়ীতে যাবেন তিনি তো আপনার নিকট আত্মীয়, সেখানে গিয়ে আপনি কিছু অন্যায় করেছেন এমন দোষারোপ তো আপনার শত্রুতেও কর্‌তে পার্‌বে না।

মলয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলো—তাই যাবো। আমি নিবারণকে বিকাল-বেলা আস্‌তে ফোন্ করে' দি।

অনন্ত মৃদুলার কাছে গিয়া সংবাদ দিবার জন্য ছটফট করিতে লাগিলো। প্রথম অবকাশ পাইয়াই সে গিয়া মৃদুলাকে চুপিচুপি বলিলো—বৌদিদি, আজ সন্ধ্যাবেলা আপনার কর্ত্তা যে তাঁর প্রেয়সীর বাড়ী যাচ্ছেন তার খোঁজ রাখেন!

মৃদুলা অবাক্ হইয়া অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া

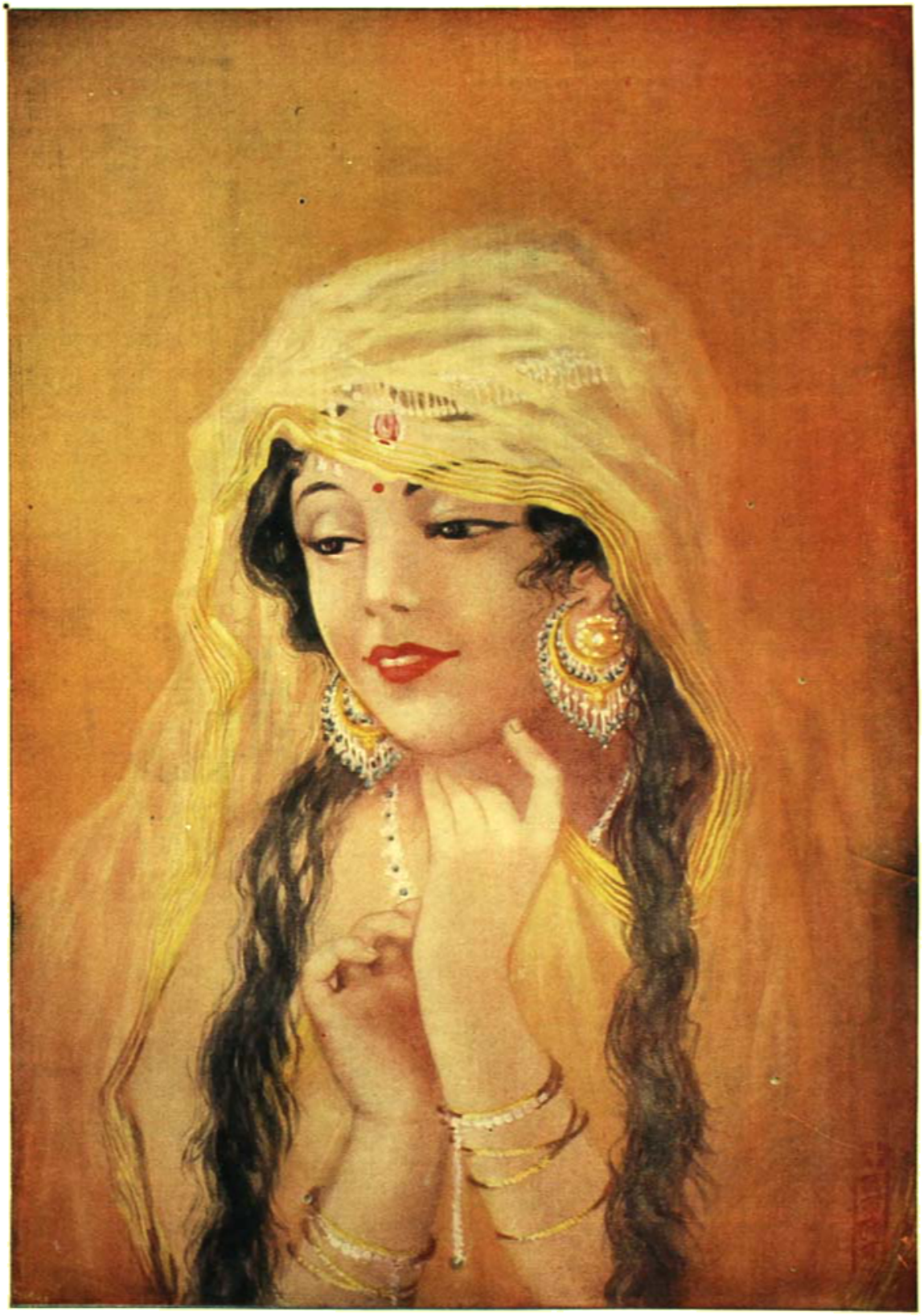

"তৃপ্তি"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

নিজের বেদনা লুকাইবার জন্ত সেখান হইতে পলায়নের উপক্রম করিলো।

অনন্ত নাছোড়বান্দা। সে মৃদুলার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিলো—মলয়-বাবু নিবারণকে বিকাল-বেলা আন্‌বার জন্তে এখনি ফোন্ করবেন, আপনি একটু সতর্ক থাক্‌লে নিজকর্ণেই শুনতে পাবেন।.....

মৃদুলা এই কথাতেও কোনো কিছু না বলিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলো। কিন্তু সে অদৃশ্য হইয়া যাইবার আগেই অনন্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া লইলো—টেলিফোন হয়ে যাওয়ার পর কিম্বা বিকালের দিক বেঁসে আপনি ওঁকে বায়োস্কোপে যাবার জন্তে অনুরোধ কর্‌বেন, তা হলে হয় তো ওঁকে ঐ অসৎ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত কর্‌তে পার্‌বেন.....

মৃদুলার মন প্রথমে অনন্তের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলো এই ভাবিয়া যে কেনো সে বারম্বার তাহার বিশ্বাস ও প্রণয়কে এমন নির্দয় ভাবে আঘাত করিতেছে; সে তো না জানিয়া পরম সুখে ছিলো। কিন্তু অনন্তের শেষ কথায় মৃদুলার মন তাহার উপর একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিলো, সে ভাবিলো যে অনন্ত বন্ধুভাবে হিতৈষণা হইতেই তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে, এবং বন্ধুকে অসৎ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত উৎসুক হইয়াই তাহার সহকারিতা প্রার্থনা করিতেছে।

কিন্তু মৃদুলা অনন্তের উদ্দেশ্ত উদ্ভেদ করিতে পারে নাই। অনন্ত মৃদুলাকে তাহার স্বামীকে বায়োস্কোপে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিতে বলিয়া গেলো এই উদ্দেশ্তে যে মলয় নিবারণের সঙ্গে প্রেয়সীর গৃহে যাওয়া স্থির করিয়া ফেলিলে আজ আর বায়োস্কোপে যাইতে স্বীকৃত হইবে না, এবং মৃদুলার অনুরোধ উপেক্ষিত হইলে মৃদুলার মন স্বামীর প্রতি অধিক বিরূপ হইয়া উঠিবে।

মৃদুলা যেনো গৃহকর্মে ব্যাপৃত হইয়া আছে এমনি ভাবে যে ঘরে টেলিফোন আছে তাহার আশে পাশে ঘুরঘুর করিতে লাগিলো এবং সজাগ হইয়া কান খাড়া করিয়া রহিলো। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিলো মলয় আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলো এবং টেলিফোন্ করিতে প্রবৃত্ত হইলো। মৃদুলার বুক দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলো, সে কাতর হইয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলো—হে ঠাকুর, উনি যেনো অন্ত কাউকে টেলিফোন্ করেন! অনন্তের কথা ও আমার আশঙ্কা মিথ্যা হোক ঠাকুর!

কিন্তু মৃদুলা মর্মাহত হইয়া শুনিলো যে ভগবান্ তাহার প্রার্থনা শুনিলেন না, মলয়ের প্রশ্ন সে শুনিলো—কে? নিবারণ?

তাহার পর মৃদুলা টেলিফোনের একতরফা কথোপকথন এইরূপ শুনিলো—চিঠির জবাব তো এলো না আজও ...আমি মনে করছি আজ বিকালে গিয়ে উপস্থিত হবো... না...তুমিও এসো...একসঙ্গেই যাওয়া যাবে...আপিস থেকে এসে...পাঁচটার সময়...তার চেয়ে দেরী করা চল্‌বে না।... তা হলে কথা রইলো...এসো তুমি...আচ্ছা...হাঁ...আচ্ছা ...মলয় টেলিফোনের মুখনল বৈঠকের উপর রেখে দিলো।

মৃদুলার চোখের জল বন্যার বেগে তাহার মুখ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলো; সে তাড়াতাড়ি এক ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইলো। যাহা শুনিবার নয় সেই অবিশ্বাস্ত কথা সে স্বকর্ণে শুনিয়াছে, তাহার বিশ্বস্ত প্রণয়ের মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে।

মলয়ের আপিস যাইবার সময় পর্যন্ত মৃদুলা তাহার নিকট হইতে দূরে দূরে রহিলো। মলয়ের আহারের সময় মৃদুলা মলয়কে ভাত দিয়া আর নিকটে রহিলো না, নিজের দাসীকে বলিয়া গেলো—আমি খোলায় মাছ দিয়ে এসেছি, পুড়ে যাবে। তুমি এখানে থেকো, বাবুর কিছু দরকার হলে আমাকে গিয়ে বোলো...

মলয় আহার করিয়া আপিসের পোশাক পরিলো। সে যখন আপিসে যাইবার জন্ত সিঁড়িতে নামিবার উপক্রম করিতেছে তখন মৃদুলা আসিয়া বলিলো—তুমি আজ একটু সকাল সকাল এসো, বায়োস্কোপে যাওয়া যাবে...অনেক দিন যাওয়া হয় নি...

মলয় পত্নীর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলিলো—আজ তো আমি যেতে পারবো না, নিবারণের সঙ্গে একটা কাজে যাবো আগে থাক্‌তেই ঠিক করে' রেখেছি...

মৃদুলার বিষণ্ণ মুখ আরও মলিন গম্ভীর হইয়া উঠিলো।

পত্নীর মুখ দেখিয়া ব্যথিত হইয়া মলয় বলিলো—তোমার শরীর মন কদিন থেকে ভালো নেই দেখছি। তোমাকে নিয়ে আমার কোথাও বেড়াতে যাওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু আজ একটা বিশেষ দরকারী কাজে যেতে হচ্ছে। তুমি রাগ

কোরো না লক্ষ্মীটি! আমি কাল তোমাকে নিয়ে যাবো-স্বোপে যাবো···

মৃদুলার অবরুদ্ধ অশ্রুসাগর স্বামীর মিষ্টবাক্যের আকর্ষণে একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিতে চাহিলো, কিন্তু সে প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা নিরস্ত করিয়া রাখিলো এবং মৃদুস্বরে বলিলো—আচ্ছা তাই হবে।

সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলো।

মলয় মনে করিলো মৃদুলা অভিমান করিয়া গেলো; সে প্রেয়সীর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে গল্প করিয়া পত্নীর মন প্রফুল্ল করিয়া তুলিবে।

মলয় চলিয়া গেলে মৃদুলা খুব খানিক কাঁদিলো। তার পর একটু সম্বৃত হইয়া সে ভাবিলো যেমন করিয়া হোক এই পাপ সংসর্গ ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী কলিকাতায় নাই, তাহার শ্বশুর এক মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে ঢাকায় গিয়াছেন; তাহার শাশুড়ীও সেই সঙ্গে গিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের মেয়ের শ্বশুরবাড়ী, মেয়ে পীড়িত, মেয়েকে একবার দেখিয়া আসিবেন। এখন তাঁহারা এখানে থাকিলে সে তাঁহাদের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইতে পারিতো। তাহার সখী সাগর-জল কলিকাতায় আছে, তাহার বাড়ীতে গিয়া দু-একদিন থাকা চলে, কিন্তু তার পর? তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী কবে ফিরিবেন তাহার তো কোনো স্থিরতা নাই। অতএব তাহার জুড়াইবার একমাত্র স্থান তাহার পিতার স্নেহাশ্রয়। কিন্তু সেই পুরীতে সে কাহার সহিত যাইবে? তাহার মনে পড়িলো বিলোপকে। সে তখনই তাহাকে চিঠি লিখিলো—

শ্রদ্ধাপ্রীতিভাজনেষু—

আমার একমাত্র বন্ধু, বিপদের কাণ্ডারী আপনি। আমি বিপন্ন হয়ে শরণাপন্ন হচ্ছি, অনুগ্রহ করে উদ্ধার করুন। পত্রপাঠ এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

আপনার বান্ধবী শ্রীমৃদুলা দেবী।

চিঠি লিখিয়া মৃদুলা চাকরকে ডাকিয়া বলিলো—এই চিঠিখানা এখনই বিলোপ বাবুকে দিয়ে এসো। তিনি যদি বাড়ীতে না থাকেন কারো কাছে রেখে দিয়ে এসো আর বলে দিয়ো যে খুব জরুরী চিঠি বিলোপ বাবু বাসায় এলেই যেনো তাঁকে দেয়।

মৃদুলা যাহাই আশঙ্কা করিয়াছিলো তাহাই ঘটিলো; চাকর যখন চিঠি লইয়া গেলো তখন বিলোপ বাসায় ছিলো না; সে খাইয়া বাহির হইয়া কোথায় গিয়াছে। চাকর বাসার অন্য একজনের কাছে চিঠি দিয়া আসিলো।

বিলোপ যখন বাসায় ফিরিলো তখন বেলা প্রায় তিনটা। তাহার সহবাসী বন্ধু তাহাকে রসিকতা করিয়া বলিলো—কী বিলোপ! আজ-কাল যে মেয়েলি হাতের চিঠি আনা-গোনা করতে আরম্ভ করেছে! অবর জরুরি খবর! জোর তলব! এলেই যেতে বলবার হুকুম আমার উপর জারি হয়েছে!

বিলোপ কৌতূহলী হইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলো—হেঁয়ালি ছেড়ে ব্যাপার কি বলো তো। কার চিঠি? কৈ?

বন্ধু মুচকি হাসিয়া বিলোপের হাতে মৃদুলার চিঠি দিলো।

খামের উপরের শিরোনামার লেখা দেখিবামাত্রই বিলোপ চিনিলো তাহা মৃদুলার হাতের লেখা। সে আত্মপ্রাধিত ও কৃতার্থ হইয়া চিঠির খাম খুলিতে খুলিতে প্রফুল্ল মুখে বলিলো—এ আমার বন্ধু মলয়ের স্ত্রীর চিঠি। তুমি যা রোমান্স আস্বাদ করেছিলে তা মোটেই নয়।

বন্ধুটি কৌতুকের হতাশা প্রকাশ করিয়া হাসিয়া বলিলো—আ আমার কপাল! আমি ভেবেছিলাম ফুলশরের একটা বা ছিটকে এলো বুঝি।

বন্ধুর কৌতুকে বিলোপের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিলো না, চিঠি পড়িতে পড়িতে তাহার প্রসন্ন মুখ বিষন্ন চিন্তাকুল হইয়া উঠিলো।

বন্ধু শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলো—কি খবর?

বিলোপ বাসায় ফিরিয়া চাদর রাখিয়া জামার বোতাম খুলিতেছিলো; সে জামার বোতাম লাগাইয়া চাদর গায়ে দিয়া পুনরায় বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতে বলিলো—মলয়ের বাড়ীতে কিছু বিপদ হয়েছে, তাই মলয়ের স্ত্রী আমাকে যেতে লিখেছেন। চিঠি কখন এসেছিলো?

বন্ধু বলিলো—সাড়ে এগারোটা বারোটা হবে।

"উঃ! তা হলে তো অনেক দেরী হয়ে গেছে!" বলিতে বলিতে বিলোপ বাহির হইয়া গেলো এবং রাস্তায় পৌঁছিয়াই চলন্ত এক ট্যাক্সি মোটর-গাড়ী থামাইয়া তাহাতে লাফাইয়া উঠিয়া মলয়ের বাড়ীর উদ্দেশে ছুটিয়া চলিলো।

(ক্রমশঃ)

আশুতোষ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

শারীরিক দুর্ব্বলতা, মানসিক অশান্তি ও শোকের সুতীব্রতায় আশুতোষকে বড় নিরানন্দ করিয়াছিল। কার্য্য ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না। সাধ্যমত চেষ্টায় কতক কাজ করিতেন, এবং মোকর্দ্দমার মত কখন কখন গৃহে বসিয়াও দিতেন। আগষ্ট মাসে শিবকুমার বাড়ী ফিরিয়া আইসে ও তাহাকে দেখিয়া আশু অনেকটা সান্ত্বনা পান। ৭ই আগষ্ট রাত্রে হঠাৎ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। রজনী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাচার ভ্রাতা ভগিনীর নিকট যায় ও সকলে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়েন। মহানগরীর সুদক্ষ চিকিৎসকগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে চিকিৎসা করেন। প্রকাশ্যে আশা-ভরসা খুবই দেন; তবে ভিতরে ভিতরে বুঝিয়াছিলেন যে, এ কঠিন রোগের হস্ত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই। সেই সব মহোদয়ের কাছে আমরা চির-কৃতজ্ঞ। সে উপকারের প্রতিদান সাধ্যাতীত।

অত অসুস্থতার মধ্যেও জাপানের ভূমিকম্পের সাহায্যার্থ নিজ গৃহে একটী সভা আহ্বান করিয়া আশু কতক অর্থ দান করিতে চেষ্টা করেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আশুকে চৌকী করিয়া সভাস্থানে লইয়া যাইতে চিকিৎসকগণ মত দেন নাই। তিনি শয্যাগত থাকিয়াও জাপানের দুর্ঘটনার কথা বিস্মৃত হন নাই। তখনকার অবস্থায় যাহা সাধ্য তাহা করিয়াছেন। স্বাস্থ্যলাভের জন্য আশু শারদীয়া পূজাতে ডিব্রুগড়ে বেড়াইতে যান। সঙ্গে পাচক ইত্যাদি সবই ছিল; তথাপি জাহাজ-কোম্পানীর বড় সাহেব তাঁহার নিমিত্ত দৈনিক ব্যবস্থা সুচারুরূপে করিয়া দেন। এ জাহাজ-কোম্পানীর মোকদ্দমায় আশুতোষ Barrister থাকিয়া কোম্পানীকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। তাহারই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, তাঁহারা সতত সর্ব্বপ্রকার সুবিধার জন্য যত্নবান ছিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিবার জন্য জাহাজে উপস্থিত ছিলেন। এ জলবায়ু পরিবর্ত্তনে কোনই উপকার না হওয়াতে, আশু রেল-পথে গৃহে ফিরিয়া আইসেন। এই পরিবর্ত্তনে প্রত্যক্ষ কোন উপকার বুঝিতে না পারিয়া সকলেই নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়েন। অমন অসুস্থ অবস্থার ভিতর আশুতোষ কত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতি সভা-সমিতির নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতে প্রয়াস পাইতেন; কিন্তু পরিবারবর্গ প্রতিবন্ধক হইয়া কোন খানে যাইতে দিতেন না। তাহাতে তিনি বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন।

অতি দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি বোধ করিতেন বলিয়া চিকিৎসকগণ বাহিরের বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কহিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু তাহা মানিতেন না। তাঁহার গৃহ সকলের পক্ষেই সর্ব্ব সময়েই অবারিত-দ্বার। যখন যিনি আসিতেন, তখনি তাঁহাকে সাদরে শয়ন-কক্ষে আহ্বান করিয়া আশু কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন। কত গরিব দুঃখী, অনুগত লোক-জন সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে আসিত; তিনি কখনও কাহাকেও বাধা দিতেন না।

তাঁহার জার্ম্মানী-প্রবাসকালে তাঁহারই একজন মোটর-চালক ভদ্র-সন্তান অনেক মূল্যবান কার্পেট ও অন্যান্য মৌখীন দ্রব্য অপহরণ করিয়া রাজসাহীতে পলায়ন করে। কতকদিন পরে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হইলে, সে করযোড়ে প্রার্থনা ও রোদন করিতে থাকে; এবং তাহার মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, আসিয়া পা ধরিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করে। তিনি তাহাতে বাধিত হইয়া ক্ষমা করিতে চাহেন; কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছিল।

ভ্রাতা মন্মথনাথ স্বয়ং আসিয়া দাদাকে সমুদ্র-তীরে ওয়াল্টেয়ারে লইয়া যান ও নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহার উপর দুইজন ভগিনী এবং একজন সেবক অনবরত

তাঁহার নিকট থাকিয়া দেখা-শুনা করিতেন। সিন্ধু-সৈকতে বাস ও ভ্রাতার যত্নে আশু শরীর অনেক সুস্থ বোধও করেন। ভগিনীগণ অতি সুনিপুণ সেবিকা। তাঁহাদের সেবায় মনও প্রফুল্ল থাকিত। বিলাত যাইয়া চিকিৎসা করাইবার কল্পনা ছিল ও তাহাদের কথায় টিকিট যাহাতে শীঘ্র পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা হয়। পরে গৃহে ফিরিলে, এখানকার প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ তাহা অনুমোদন করেন নাই। সেই সময় হঠাৎ মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের 'তার' পাইয়া আশু একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। ১৫ই মার্চ্চ শনিবার প্রভাতে কোনরূপ রোগ ভোগ না করিয়া ৮২ বৎসর বয়সে সকলকে রাখিয়া পুণ্যময়ী জননী মনুময়ী দেবী পুণ্যলোকে চলিয়া যান। নবমবর্ষীয়া বালিকা বিবাহিতা হইয়া স্বামী-গৃহে আসিয়াছিলেন; আর ৮২ বৎসর বয়সে বিনা রোগ শোকে চাঁদের হাট বসায় রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি নারী-জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ সাত পুত্র ও দুই কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী এবং স্বজনগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দেহরক্ষা করেন। তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা যেমন অপূর্ব্ব, এ লোকান্তরও তেমনি অলৌকিক। যদিও মাতৃ-বিয়োগের গভীর শোকে তাঁহার পুত্র কন্যা স্বজনবর্গের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে; তথাপি তিনি যে কোন শোক পান নাই ও পূর্ণ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছেন—ইহাই সর্ব্বজনের অন্তরের সান্ত্বনা। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বড় শ্রীমানের অনুমতি লইয়া শ্রীমান যোগেশ ও অন্য ভ্রাতাগণ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। মাতৃ-শোকে আশুর মন বড় উদাস হইয়া যায় এবং ওয়ালটেয়ার হইতে পুরীর বাড়ীতে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার পুরীর গৃহ অতিশয় সুবিধাজনক ও মনোহর স্থানে অবস্থিত। তাহার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া মহাসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিতে দেখিতে জীবন পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। সন্ধ্যায় শয়ন করিয়া নির্জ্জনে আধ-নিদ্রায় তাহার গর্জ্জন শুনিতে পাইয়া সবই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয় ও সাগর-বায়ু সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া দেয়। সেখান হইতে শ্রীমন্দির অনতিদূরে। পাণ্ডাগণ যখন-তখন আশীর্ব্বাদী ফুল-চরণামৃত ও বলরামের উপাধের প্রসাদ দিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিয়া থাকে। জগবন্ধুর রাজ্যে জাতিভেদ নাই। প্রত্যহ বৈকালে অন্নক্ষেত্র দর্শনীয় বস্তু। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল একত্র বসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সে এক আনন্দধাম। গৃহহীনের গৃহ, নিরন্নের অন্ন-পান মহাপ্রভুর নিত্য দান। তাঁহার মন্দির-দ্বার অবারিত।

পুরী যাইয়াই কয়েক দিনের মধ্যে আশুর শরীর আরো অসুস্থ বোধ হওয়াতে, আশু সুহৃদের সহিত কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তখন সুহৃদ এবং জ্যেষ্ঠপুত্র আর্য্যকুমার সেখানেই ছিলেন। গৃহে ফিরিয়াই সামান্য জ্বরে শয্যাগত হইয়া আশু দিন দিন অতিশয় দুর্ব্বল হন। নানারূপ চিকিৎসা ও সেবায় শরীর আর সুস্থ হইল না; সেই দারুণ জ্বরের হস্ত হইতে কোন ক্রমেই রক্ষা পাইবার উপায় হইল না। সব ব্যর্থ হইয়া গেল; জ্বর অল্প, দুর্ব্বলতা অসীম। তবুও সকলের মনে কত আশা,—পুনর্ব্বার অনেকটা আরোগ্য লাভ করিবেন, কতক সুস্থ হইয়া চিকিৎসার্থে ইয়োরোপ যাইবেন এবং সেখান হইতে সারিয়া আসিবেন। আশা ইচ্ছা আমরা করি, ভগবান তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দেন। যাহা কল্পনাতীত তাহাই ঘটিয়া থাকে। সাধ্বী পত্নী প্রতিভার বিয়োগ-শোক তাঁহার জীবনকে একেবারে অভিভূত করিয়াছিল; তাহার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। সেই প্রথম ও সেই শেষ শোক। পত্নী-স্মৃতি এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়কে আর কিছুতেই সুখ শান্তি দেয় নাই।

প্রতিভা তাঁহার গৃহিণী, সখীবিধ, প্রিয়শিষ্যা, ললিত-কলাবিধৌ ছিলেন। নারীর বৈধব্য সামাজিক নিয়মে অনেক কঠোর, কিন্তু এমন পত্নী-প্রেম এবং অপরিসীম একাগ্রতা সচরাচর সংসারে দুর্লভ।

আশুতোষের জীবনী নূতন করিয়া আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তিনি সর্ব্বজন-পরিচিত। কি ছিলেন আর কি ছিলেন না তাহা পুনর্ব্বার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ছয় ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী, চারি পুত্র ও একমাত্র কন্যা, দুই দৌহিত্র ও এক পৌত্র অদিতানন্দ এবং পৌত্রী শুভাবরী (নামটি বেদ হইতে রাখিয়াছিলেন)। পরিবারের অনেকেরই নাম তাঁহার দত্ত।

শুভাবরী তাঁহার অত্যন্ত স্নেহপাত্রী ও আদরণীয়া থাকায় আদালতের কাজের মধ্যেও তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া "রায়" লিখিতেন। নিরুপমা সুন্দরী বালিকা "সুগোল নিটোল" ছিল; তাই আদর করিয়া ডাক নাম "টুবলী" রাখিয়া সেই

নামেই তাহাকে ডাকিতেন। "টুবলী" পিতামহকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহার অকাল-মৃত্যু-জনিত শোক তাঁহাকে একেবারে কাতর করে; রোগ-শয্যায় তাহার কথা বলিতে বলিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। টুবলীকে শেষ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হন নাই।

পারিবারিক জীবনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে তিনি প্রধান ও অগ্রগণ্য ছিলেন। কোন কোন ভ্রাতুষ্পুত্রকে উপনয়নে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়া উপবীত দেন। কোন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আদি সমাজের মতে বিবাহে সম্প্রদান করেন।

ইদানিং অনেক ব্রাহ্ম-পরিবার কন্যার বিবাহ কালীন তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া বেদীতে বসাইয়া পৌরোহিত্য করাইতেন। তিনি অতি গৌরবের সহিত তাহা সুসম্পন্ন করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। আশুতোষের দৈনিক জীবনের কার্য্যাবলী সম্যকরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে প্রকার নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক জীবন অতুলনীয়। যে বংশে এমন কৃতী সুসন্তানের জন্ম হয়, তাহার কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা।

সার আশুতোষের দানের কথা অনেক কাগজপত্রে তৎকালে বাহির হইয়াছে, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল তাঁহার অতি-যত্ন-রক্ষিত অমূল্য "লাইব্রেরী" কাশীর "হিন্দু ইউনিভারসিটিতে" পিতৃদেবের নামে দান সর্ব্বপ্রধান। যখন সেই সব গ্রন্থাবলী লরী করিয়া কাশী কলেজের জন্য রওনা হইয়া যায়, তখন তাহা দেখিবার নিমিত্ত বালিগঞ্জের রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল; এবং দর্শকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অভাব স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার নাকি বলিয়াছেন যে "এবার কাশী যাইলে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া পরে চৌধুরী মহাশয়ের কীর্ত্তি এই দানের গ্রন্থাবলী দেখিয়া আসিব।"

বিশ্বজয়ী প্রেমে তুমি আশুতোষ শিব,
"তোমার তুলনা তুমি" কি আর বলিব?
মুক্ত-হস্ত মুমহান্
পরহিতে আত্মদান
আশৈশব, ভেদাভেদ নাহি ছিল মনে;
সমভাবে পালিয়াছ দীন দুঃখী জনে।
তোমার প্রাসাদ-দ্বার
মুক্ত ছিল অনিবার,
আত্মদানে তুষিয়াছ অনাথ আতুরে;
কত আয়োজন নিত্য ছিল তব পুরে,
শোকে শান্তি, রোগে সেবা
তোমার মতন কেবা
করিয়াছে,—পতি-পত্নী একত্র মিলিয়া
সাধিয়াছ সঙ্গোপনে কিছু না বলিয়া;
ফিরায়ে দেওনি কারে,
সদাব্রত তব দ্বারে,
অকাতরে অনাথের প্রার্থনা পূরণ
করিয়াছে,—তোমা সম নাহি কোনজন।
অগাধ পাণ্ডিত্য খনি, বুদ্ধি ক্ষুরধার,
কর্ম্মক্ষেত্রে অদ্বিতীয় সর্ব্বসাধার,
অকৃত্রিম দেশ-প্রীতি
চালিয়া দিয়াছ নিতি
সমভাবে, শ্রম অর্থ অসাধ্য সাধনে
দেশের কল্যাণ লাগি, চেষ্টা কার মনে।
সদালাপী মিষ্টভাষী
তাপিতের তাপ নাশি
সান্ত্বনায় ব্যথিতের ব্যথা দূর করি,
ভাই ভগিনীকে স্নেহ আপনা পাসরি,
ভালবাসা পরিজনে,
স্বজন বান্ধবগণে,
পিতৃমাতৃ-পদে ভক্তি অসীম অপার,
সন্তান-বৎসল পিতা, পত্নী-প্রেম সার।
আদর্শ চরিত্র তব
একে একে কত কব?
এত গুণ একাধারে দেখিতে না পাই,
সার্থক জনম মর্ত্ত্যে তুলনা ত নাই।
চিরদিন তব নাম
ঘোষিবে এ ধরাধাম,
অনন্ত যশের কীর্ত্তি, অমর অক্ষয়,
নিষ্কলঙ্ক জীবনের সব দীপ্তিময়,
এই পরিচিত ধরা
তোমার স্মৃতিতে ভরা,
প্রাণের অধিক ভাই, আজন্মের সাথী,
সহসা একেলা কোথা গেলে রাতারাতি।
পথ ঘাট সব তবে
দেখিতে পাই না বলে,
আমিও রয়েছি বসে বৈতরণী-তীরে,
ডাকিয়া পাই না দেখা খেয়া-পাটনীরে।

যশোহর

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

(আলোক-চিত্র—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের সৌজন্যে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যশোহরেশ্বরীর মন্দির-পশ্চিম কোণার দিকে কিঞ্চিৎ দূরে "চন্দ্রতাল" নামক একটি পুষ্করিণীর ভগ্ন ঘাট আছে। এই পুষ্করিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে একটি ক্ষুদ্র খাল বা নালা পশ্চিম দিকে "হামামখানায়" গিয়া পড়িয়াছে। খালটি প্রায় ১০ হাত প্রশস্ত। উক্ত পুষ্করিণী হইতে স্নানের জল এই খাল দিয়া হামামখানায় যাইত।

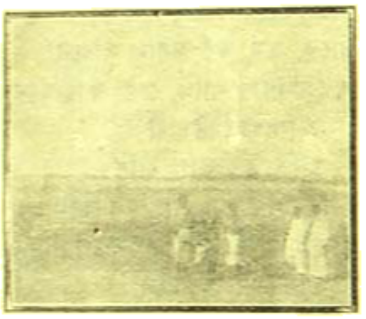

চন্দ্রতাল—ভগ্নঘাটের দৃশ্য

উক্ত পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ের মধ্যস্থলে "হামামখানা" আছে। ইহা হামামখানা, কিন্তু স্থানীয় লোকে ইহাকে "বারিজখানা" বা কারাগার কহে। Major Ralph Smythe's Statistical and Geographical Report of the Pergunahs District, 1857"

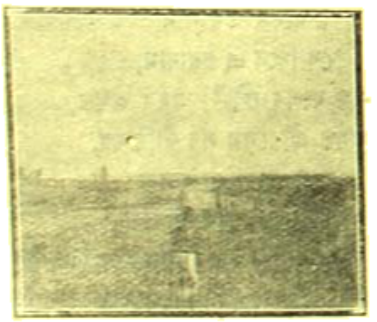

হরিপুর—হামামখানার দৃশ্য

নামক গ্রন্থে ইহাকে "Black hole" বা কৃষ্ণকূপ কারাগার বলা হইয়াছে। ইহা মুসলমানী ধরণের বাড়ী, পশ্চিম দিকে ইহার দরজা। কয়েকটি গুম্বজের দ্বারা ইহার ছাদ গঠিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখদেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কারাকক্ষ গুম্বজের শেষ বিলানটী কয়েকখণ্ড প্রস্তরের উপর বর্ত্তমান আছে। হামামের ভগ্ন সম্মুখ দেশে দাঁড়াইলে দেখা যায় যে ইহার একটি দক্ষিণ ও একটি উত্তর অংশ আছে। উত্তরের যে পূর্ব্ব দিকের অংশ অক্ষত অবস্থায় আছে। দক্ষিণ অংশের দিকে দাঁড়াইলে দেখা যায় যে উহার মধ্যস্থলে একটি দ্বার আছে ও ইহার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ঐরূপ দীর্ঘ কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম উন্নত একটি করিয়া প্রকোষ্ঠের ন্যায় আছে। মধ্যস্থলের দ্বারটির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি করিয়া চতুষ্কোণ থাম দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাকে উক্ত প্রকোষ্ঠদ্বয় হইতে পৃথক করিয়াছে। উক্ত মধ্যস্থলের দ্বারের ছাদে একটি বড় গোল গুম্বজ আছে, কিন্তু উহার

ঈশ্বরীপুর—বৃহদ্গোটা বা প্রধান বুরুজ

শিখর-দেশ উন্মুক্ত। শুনা যায়, পূর্ব্বকালে আলোক প্রবেশের জন্য ঐ উন্মুক্ত স্থানে আতশী কাচ দেওয়া ছিল। এই বড় গুম্বজটির চারি কোণায় চারিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গুম্বজ ছিল, উহাদেরও শিখরদেশে আতশী কাচ দেওয়া ছিল, কিন্তু এক্ষণে এই গুম্বজগুলির অধিকাংশে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

হামামের ভিতরের অংশে যাইবার জন্য উক্ত মধ্যস্থলের ভগ্ন দ্বারটির পূর্ব্ব প্রান্তে যে দ্বার আছে, উহার দুই পার্শ্বের দেয়ালের মধ্যে প্রায় ৩০ ইঞ্চ স্থান বিশিষ্ট পোড়াবার মাটীর নল আছে। ঐ নল ছাদ হইতে মেঝের নীচে পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে ছাদের জল এই নল দিয়া মেঝের নীচে যাইত। শুনা যায় যে ঘরের মেঝের নীচে স্নানের ব্যবস্থা ছিল। উক্ত পূর্ব্ব দিকের দ্বার দিয়া অন্দরের অংশে প্রবেশ

করিলে দেখা যায় ... হয়। পূর্বোক্ত মন্দিরের অংশের ন্যায়। অন্দরের অংশে মন্দিরের অন্য হইতে অনেকটা বিষয়ে পার্থক্য আছে—অন্দরের অংশে প্রবেশ করিয়া বাম দিকে দেখা। উপরে এক স্থানে নীচের তলায় যাইবার সিঁড়ি ছিল বলিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হইল। শুনিলাম যে এ সিঁড়ি দিয়া মন্দিরের যে অংশ মাটীর নীচে আছে তথায় যাওয়া যাইত; কিন্তু অধুনা গ্রামবাসিগণ ইষ্টকাদি

কালীঘাট অভিমুখে গরুর গাড়ীতে যাত্রা

ফেলিয়া সিঁড়িটি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অন্দরের অংশের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার পূর্ব দিকের দেওয়ালের পার্শ্বদেশে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট ও মধ্যস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত বড় চৌবাচ্চা আছে। শুনিলাম যে বড় চৌবাচ্চাটি ইশ্বারা ছিল, কিন্তু ঐগুলিকে গ্রামবাসিগণ ইষ্টকাদি ফেলিয়া বুজাইয়া দিয়াছে। চৌবাচ্চা তিনটীর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে দেওয়ালের মধ্যে একটি করিয়া সরু মাটীর নল ঘরের ভিতর হইতে বাহির দিক পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই নল তিনটির প্রয়োজনের ন্যায় ... ঠিক। অন্দরের অংশের ছাদের মধ্য ভাগে একটী বড় গম্বুজ ও ইহার চারি কোণে চারিটী অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ আছে, সকল গুলির শিখর-দেশ খোলা। এক কথায় মন্দিরের হামাম পুরের ছাদ কেবল গম্বুজের দ্বারা আবৃত; ইহাদের মধ্যে দুইটি বড় ও ইহাদিগের কোণের ৮টী অপেক্ষাকৃত ছোট। হামামের সমস্ত অন্দর অংশের ভিতরের মাপ প্রত্যেক দিকে প্রায় ... হাত। ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে ইহা প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন। "খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে" একটি প্রবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই হামাম পূর্বে ত্রিতল ছিল, কিন্তু কালক্রমে ইহার দক্ষিণ দিকের দুইটি তলা বৃষ্টিকা গর্ভে বসিয়া গিয়াছে। হামামের ছাদের উপরিভাগ এক প্রকার লতা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আছে। ইহার পূর্ব দিকে একটি ভগ্ন দেওয়ালের দৃশ্য পড়িয়া আছে, ইহার মধ্যে একটি ... ঠিক যার নির্দিষ্ট মাটীর নল আছে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৪ নবেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে এই হামামখানাকে Ancient monument—preservation Act অর্থাৎ প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণী আইনের গণ্ডীর

ঈশ্বরীপুর—রায়বাড়ীর ভগ্নাবশেষ প্রাচীর

মধ্যে আনিয়াছে। শুনিলাম যে ইহা একণে ... বাবু হরিপ্রসাদ মুন্সী ও চৌধুরী বিপ্রের সম্পত্তি। নিম্ন শ্রেণীর গ্রামবাসিগণের এক পান গরু এই হামামখানার মধ্যে বাস করিয়া ইহাকে গোয়াল ঘরে পরিণত করিয়াছে ও ক্রমে ... করিতেছে। হামামের সম্মুখ দিকে কিছুদূর স্থান লইয়া ইষ্টকের বেদি ও ঘরের মেঝে প্রস্তুত আছে। এক্ষণে তথায় নিম্ন শ্রেণীর ... পর্যটনের স্থান

দ্বারের নিকটে উত্তর দিকে একটি কোঠা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে।

দ্বারের পশ্চিমে অল্পে "টেরা" মসজিদ্ আছে। ইহা অতি বৃহৎ মসজিদ। পূর্ব্বদিকে ইহার সম্মুখ। ইহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে পর পর ৫টি অতি বৃহৎ ঘর বা প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রকোষ্ঠগুলির পূর্ব্ব দিকে এক একটি খিলান-করা দ্বার আছে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের উপরে একটি করিয়া অতি বৃহৎ গুম্বজ আছে, কিন্তু সর্ব্ব পশ্চিম দিকের গুম্বজটি পূর্ব্ব বর্ণনাকালে বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মসজিদটির বহির্দ্দেশের মাপ প্রায় ৯০ হাত দীর্ঘ (ব্লাখ্‌ম্যান সাহেব তাঁহার রিপোর্টে ইহাকে ১৫০ ফুট = ১০০ হাত দীর্ঘ লিখিয়াছেন) ও ৫১ হাত প্রস্থ। নিখিল বাবুর "প্রতাপাদিত্যে" মধ্যস্থলের এই বড় ঘরটির ভিতরের মেঝের মাপ প্রত্যেক দিকে প্রায় ১০ হাত। দেওয়ালের এবং দ্বারের খিলান প্রায় ৩।০ হাত স্থূল, ঘরের মেঝে হইতে দেওয়ালের উচ্চতা প্রায় ১৩।০ হাত। এই ঘরের গুম্বজটির অভ্যন্তর ও যে স্থান হইতে গুম্বজ আরম্ভ হইয়াছে উহার ঠিক নীচে দেওয়ালের উপরিভাগে চারিটি কোণায় অতি ক্ষুদ্র চারিটি খিলান আছে। এই খিলান চারিটি দেখিতে ছোট গুম্বজের অর্দ্ধাংশের ভিতর দিকের ন্যায়, কিন্তু উহার মধ্যভাগ ফিরা, উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত একটি করিয়া খাঁজ কাটা আছে। মসজিদের অভ্যন্তরে উদ্ধৃতাংশের গুম্বজ ও খিলানগুলি দেখিতে ডায়মণ্ডহারবারের ও গোপালপুরের মন্দিরাভ্যন্তরের ন্যায়। মধ্যস্থলের বড় ঘরটির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সম্মুখ প্রকারে এই ঘরটির ন্যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট চারিটি ঘর

ঈশ্বরীপুর—বঙ্গের প্রথম খৃষ্টান মিশনারী বনাকীর্ণ স্তূপ

ইহার উচ্চতা এক স্থলে ১০০ হাত লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সতীশ বাবুর "যশোহর-খুলনার ইতিহাসে" মেঝে হইতে ইহার গুম্বজের উচ্চতা ৭৫ ফুট লিখিত হইয়াছে; ইহাই ঠিক। P. Leo Faulkner সাহেব ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের "Calcutta Review"তে "Where Pratapaditya reigned" নামক প্রবন্ধে এই মসজিদের মাপ ৬০ গজ দীর্ঘ ও ৩১ ফুট উচ্চ লিখিয়াছেন। মসজিদের পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলের খিলান-করা দ্বার দিয়া মধ্যস্থলের ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপরে একটি গুম্বজ ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে নমাজ পড়িবার কুলঙ্গী বা "মেহর" আছে। "মেহরের" ঊর্দ্ধে দেওয়ালে একটি খিলান-করা খোলা জানালার ন্যায় আছে, উহা দিয়া খুব মধ্যে আলোক প্রবেশ করে। মসজিদের আছে, তন্মধ্যে উত্তর দিকে দুইটি ও দক্ষিণ দিকে দুইটি আছে। উহাদের ভিতরের মেঝের মাপ প্রায় ১২।০ × ১২।০ হাত, দেওয়াল ও দ্বারের খিলান প্রায় ৩।০ হাত স্থূল। এই ঘরের ভিতর দিয়া যাতায়াতের জন্য চারিটি বৃহৎ খিলান-করা দ্বার আছে। এই মসজিদটি প্রতাপাদিত্য তাঁহার মুসলমান সৈন্যদিগের জন্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এক্ষণে মসজিদের দেওয়ালে ও উপরে বৃক্ষাদি হইয়াছে। মসজিদটি টাকীর বাবু ষষ্ঠীপ্রসাদ মুন্সী রায় চৌধুরীদিগের জমিদারী মধ্যে অবস্থিত। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৭০শে নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে এই মসজিদটিকে "প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষিণী আইনের" মধ্যে আনিয়া ইহাকে "সংরক্ষিত কীর্ত্তি" (Protected monument) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দের Archæological Survey

of India; Eastern circleএর বার্ষিক বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে যদি পূর্ব্বোক্ত হামাম এবং এই টেঙ্গা মসজিদের মালিকগণ গবর্ণমেণ্টের সহিত চিরস্থন প্রথানুযায়ী এগ্রিমেণ্ট লেখা পড়া করেন তাঁহা হইলে গবর্ণমেণ্ট উহাদিগের সংস্কার করিবেন। কিন্তু বেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ মালিকদিগের সেরূপ কোন উৎসাহ এখনও দেখা যাইতেছে না। ফলে, অদূর-ভবিষ্যতে প্রতাপাদিত্যের অন্যান্য কীর্ত্তি-গুলির ন্যায় এই কীর্ত্তি দুইটিও ধ্বংস হইয়া যাইবে।

এই মসজিদের মধ্যস্থলের দ্বারের সম্মুখে ৫৬।৫৮ হাত দূরে পূর্ব্ব দিকে সিংহদ্বার ছিল; উহার দৃষ্টগুলির ধ্বংসাবশেষ বেওয়াল ও ভিতরে কিয়দংশ এবং ইষ্টকাদির স্তূপ বর্ত্তমান আছে। সিংহদ্বারের স্থানের পার্শ্বে একটি বৃহৎ চালা ঘর আছে। মসজিদের চতুর্দ্দিকে

জাহাজ বাটা—তরঘর বা হামাম

যে জমি আছে, উহার বহির্দ্দেশ দিয়া পূর্ব্বে প্রাচীরের বেষ্টনী ছিল, এখন তাহা নাই। মসজিদ-সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ দিকের জমিতে কয়েকটি কবরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মেজর রামৃক সাইখের রিপোর্টে এবং ওয়ালি কৃত "খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে" উল্লেখ আছে যে, এগুলি প্রতাপাদিত্য কৃত "বার ওমরাহের গোর"। উক্ত কবরগুলির স্থানে স্থানে এখনও ইষ্টকের গাঁথনি আছে। 'ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে' আরও প্রকাশ আছে যে, এ গুলিকে কেহ কেহ বারুদের আধার (magazines) বলিয়া থাকেন। বাবু শশিভূষণ দত্ত কৃত "কায়স্থ-কারিকা" গ্রন্থের চন্দ্রদ্বীপের "ঘটক-কারিকা" হইতে জানা যায় যে, কচুরায় মানসিংহকে যশোহরের দ্বারে আনিয়া যখন নিধন করিলেন। "কিতীশ বংশাবলী চরিতম্" নামক কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, দিল্লীশ্বর যাদিপতি সেনাপতি সহ মানসিংহকে প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গলে" লিখিয়াছেন যে, 'বাইশী নগর সঙ্গে, কচুরায় লয়ে রঙ্গে, মানসিংহ বাঙ্গালা আইল'। রেইনি সাহেব তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "সুন্দরবন" প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্য আক্রাম খাঁ এবং আরও ২০ জন মোগল সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যে কেহ নিহত হইয়াছিলেন এরূপ কথা রেনি লিখেন নাই। "Ancient Monuments in Bengal"এ লিখিত আছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রথমে ক্রমে ক্রমে বার জন ওমরাহকে

প্রতাপাদিত্য সমরের চতুর্থ প্রহরে মরেন; কিন্তু তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিগণ পরাজিত ও নিহত হন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে প্রতাপকে পরাজিত করিয়া যেই বার ভূঁইয়ার মৃত্যু ঘটিয়াছিল, সেই বারই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহা হইতে আমরা এই ফল লাভ করি যে, প্রতাপের রাজ্য (প্রতাপাদিত্য) বিনষ্ট-মূলক হইলে, তাঁহার ছিন্ন ২৪ জন ওমরাহ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। রাজা তাঁহাদের মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া সমাধিস্থ করেন এবং ইহা তাঁর ওমরাহের গোর বলিয়া বিদিত। সতীশ বাবু ইহার এই মত বিশিষ্টরূপে করিয়াছেন যে, ঈশ্বরীপুরের ২৪টি ওমরাহের গোর এবং তার ওমরাহের গোর নামক এই দুইটি সমাধি স্থানে সম্ভবতঃ যাহাদের ঠিক ২৪ ওমরাহ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে মৃত না হইলেও, তাঁহারা নিহত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে এই দুই স্থানে গোর দেওয়া হইয়াছিল সতীশ বাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কোন সময় প্রতাপের বিরুদ্ধে ২৪ জন ওমরাহ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিহত হইয়া এই স্থানে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, টেঙ্গা মসজিদের সংলগ্ন উত্তর দিকের জমিতে যে ২টি গোর আছে, উহা 'বার ওমরাহের গোর' বলিয়া বিদিত, এবং জনশ্রুতি এই যে, প্রতাপাদিত্য মৃত মোগল সেনানীদিগের জন্য ঐ ভূমি নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এখনে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে সকল নূতন কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, মানসিংহ প্রতাপকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রতাপের সহিত সন্ধি করার পূর্ব্বে বা পরে মোগল-সেনানীদিগের মৃতদেহের উপরে মানসিংহ কর্ত্তৃক এই সমাধি নির্ম্মাণ অসম্ভব নহে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনিলাম যে, পূর্ব্বে মসজিদের পশ্চিম দিকেও সমাধি ছিল; কিন্তু আমরা মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি করিয়া মাত্র চারিটি সমাধি দেখিতে পাইলাম। টেঙ্গা মসজিদের সান্নিকটে দুর্ত্তকাহারের হইতে অল্পকাল পূর্ব্বে সহস্র সহস্র পদ্ম ও বিনুক বাহির হইয়াছিল। সে গুলি বোধ হয় পুরাকালে চূণ প্রস্তুত হইবার জন্য আনিয়াছিল। তাহার কয়েকটি পদ্ম যশোরেশ্বরীর বাটীতে প্রবেশ-দ্বারে রক্ষিত আছে।

টেঙ্গা মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণা হইতে প্রায় ৬০ হাত দূরে একটি ভগ্নাবশিষ্ট কোঠার ভগ্নাবশেষ আছে। এই ভগ্ন কোঠার বহির্ভাগ চতুষ্কোণ কিন্তু ইহার অভ্যন্তর অষ্ট-কোণ। এই ভগ্ন কোঠার চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে। লোকে ইহাকে "বিবির আস্তানা"

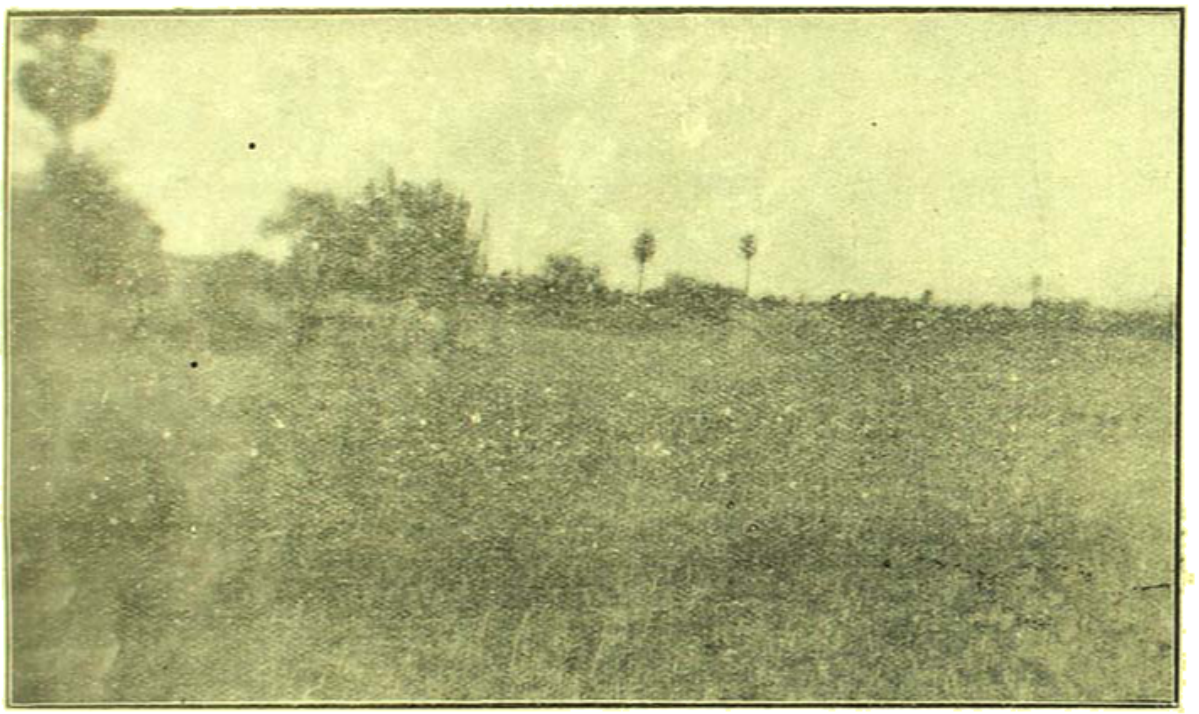

কুমারীর মাঠ

বলে। সতীশ বাবুর গ্রন্থে ইহাকে অধিকন্তু "লক্ষ্মীদেবীর মন্দির" বলা হইয়াছে। কেহ কেহ কহিলেন যে, টেঙ্গা মসজিদের মাতওয়ালী ঐ গৃহে থাকিতেন। কিন্তু "খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে" উল্লেখ আছে যে টেঙ্গা মসজিদের নিকটে একটি পোড়ো মনাকীর্ণ গৃহ আছে,—উহা চতুষ্কোণ ও উহা প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পরে মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি শিবমন্দির মাত্র। মানসিংহের শিবমন্দির ও বিবির আস্তানা একই ছিলনা কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই; কিন্তু ইহা মানসিংহের শিবমন্দির হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে ইহার গুম্বজ ছিল, এক্ষণে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ভগ্ন গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণায় কতকটা বজ্রদুয়রের গাছের ন্যায় দেখিতে একটি অতি বৃহৎ ও স্থূল গাছ আছে. উহার নাম জানা

নাই বলিয়া লোকে উহাকে "কাটীন খাল" কহে। ইহা খাল খাল নহে।

টেঙ্গা মসজিদের পশ্চিম দিকে প্রায় ২০০ হাত দূরে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি পরিখার খাত আছে। উহার স্থানে স্থানে সামান্য জল আছে। উক্ত পরিখা ছাড়াইয়া কাঁচা রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইলে টেঙ্গা মসজিদ হইতে ৫০০ হাত দূরে পশ্চিম দিকে ও রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি দীঘি আছে। ইহা ঘাস ও শৈবালে পরিপূর্ণ। ইহাতে প্রায় ১০।১৫ হাত গভীর জল আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যের অক্লান্ত সহযোগকারী অক্ষয় শত্রু বিদ্যারত্ন ও রাজা বসন্তরায়ের ভ্রাতৃ-জামাতা রূপরাম বসুর নামানুসারে স্বর্গীয় বাবু ইহার 'রূপরামের দীঘি' নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু স্থানীয় লোক ইহার নাম "রূপ হাজের দীঘি" কহিলেন।

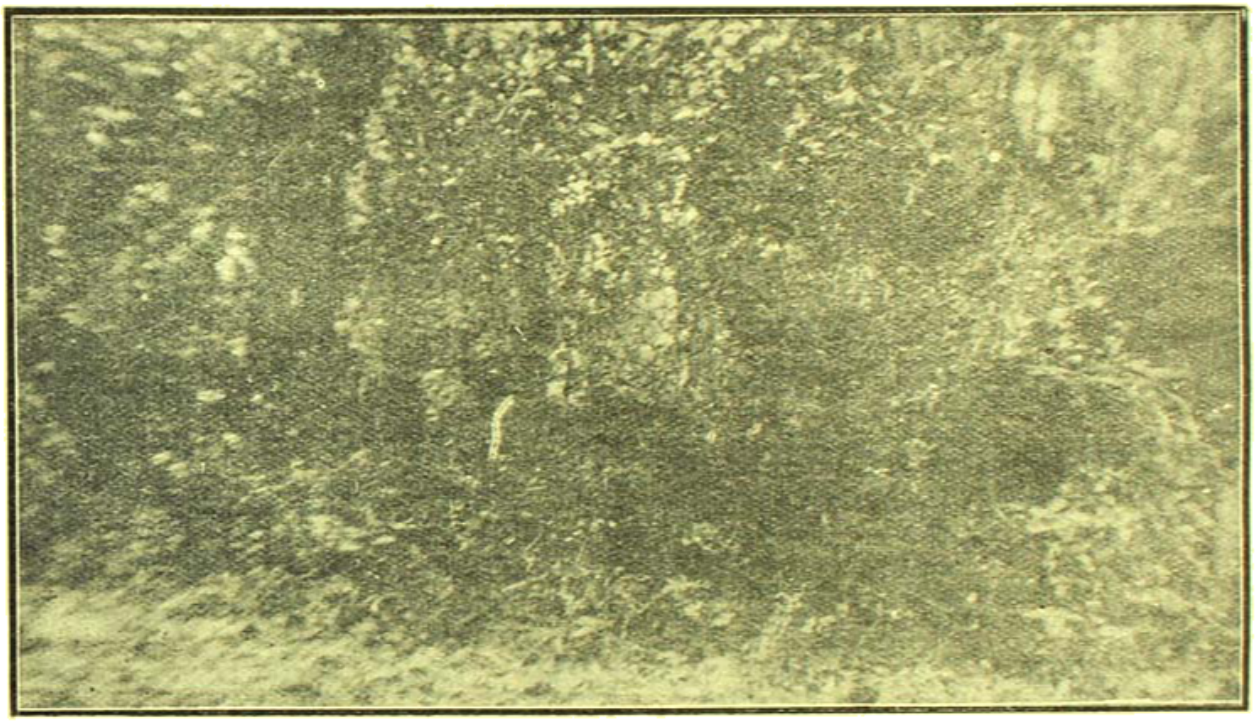

পরমানন্দ কাটী—গোবিন্দকাটীর দ্বিতীয় প্রাচীন মন্দিরের বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষ

রাজা বসন্তরায়ের পঞ্চম পুত্র রূপরাম বা রূপরামরায়ের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছিল কি না তাহা বলা কঠিন। "খটক কারিকায়" উল্লেখ আছে যে, মানসিংহ যশোহর আক্রমণ কালে সর্ব্ব প্রথমে যশোহর দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন।

রূপরামের দীঘির উত্তর দিক দিয়া যে লোহার রোডের রাস্তা গিয়াছে, উহা এই দীঘির পশ্চিম দিকে দিয়া লোহার রোডের যে রাস্তাটি পশ্চিম দিকে যাইয়া বসুনার তীর স্পর্শ করিয়াছে ঐ রাস্তার আসিয়া শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রাস্তা দিয়া উত্তরে দুর্গ দিকে যাইতে হইলে দুর্গের দক্ষিণ দিকের প্রায় ১০০ হাত প্রশস্ত পরিখার শুষ্ক খাতের উপর দিয়া যাইতে হয়। দুর্গের মধ্যদেশের ভূমি সমতল। উহা দেখিতে দীর্ঘিকার শুষ্ক খাতের ন্যায়। এই খাতে এখন ধানের চাষ হয়, ইহার জমির পরিমাণ অনুমান ১২০ বিঘা। এই খাতে পূর্ব্বে পুষ্করিণী ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। বসন্ত রায়ের চতুর্থ পুত্র চাঁদরায় কর্তৃক রূপরামের পরে কিছুদিন যশোহর শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে লোকে এই দুর্গকে চাঁদরায়ের দীঘি কহে। এই দুর্গের মধ্যস্থ নিম্নভূমির উত্তর-পশ্চিম কোণায় কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিক দিয়া প্রায় ৬০ হাত প্রশস্ত একটি খাল বাহির হইয়া পশ্চিম দিকের কামরবালির পরিখায় যে স্থান হইতে 'শরৎখানার বহ' নামক খাল বাহির হইয়াছে তথায় গিয়া মিশিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ৬০ হাত প্রশস্ত খাল যেখানে দুর্গাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে একটি লকগেট ও দুর্গের গুপ্ত দ্বার ছিল। তাহার ইষ্টকের গাঁথনি এখনও মজবুত আছে। দুর্গ মধ্যস্থ পূর্ব্বোক্ত নিম্নভূমির চতুর্দ্দিকে উচ্চ বৃহৎ প্রাকার আছে। ইহা প্রায় ১২০ হাত প্রশস্ত ও নিম্নের সমতল ভূমি হইতে ৩০ হাত উচ্চ। দুর্গের পশ্চিম দিকের প্রাকারের প্রায় মধ্যস্থলে টাকীর জমিদারের যে কাছারির ঘর আছে, ইহার নিকটে প্রাকারের উপরে দুর্গাভ্যন্তর হইতে এক নালিতে কয়েকটি শান-বাঁধান চৌবাচ্চা বাহির হইয়াছে। এ গুলি দুর্গ-প্রাকারের উপরে উহার বহির্দ্দিকের ধারে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই শান-বাঁধান স্থান-গুলির পরস্পরের দূরত্ব অনুমান ৪০।৫০ হাত এবং উহাদিগের প্রায় মধ্যস্থলে একটি করিয়া দুর্গের গুপ্ত দ্বার আছে। স্থানীয় লোকে অনুমান করেন যে, এই শান-বাঁধান স্থানগুলিতে কামান থাকিত। দুর্গের দক্ষিণ দিকের প্রাকারের উপরে দুর্গাভ্যন্তরে কামানের গোলা ও স্থানে স্থানে লৌহের গুঁড়া পাওয়া যায়। এই লৌহ-গুঁড়া সমস্ত

বাহির দিতের ন্যায় হইয়াছে। উহাকে "মছুয়া" কহে, উহা কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয়। দুর্গের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের প্রাকারের উপরে মৃত্তিকাস্তরে নানাপ্রকারের ইষ্টক, লৌহসোলক ও লৌহ-আস্ত্রাদির প্রস্তর গোলক এবং শুধু প্রস্তরের গোলক পাওয়া যায়। কয়েকটি গোলক বশোহরেশ্বরীর বাটীতে প্রদর্শনী-স্বরূপ আছে। উহাদের মধ্যে লৌহের গোলক, চূণ ও বালি দিয়া জমাট করা গোলক, লৌহাস্ত্রাদির প্রস্তর-গোলক এবং শুধু প্রস্তর-গোলক আছে। উহাদের কোনটার বেড় ৩´´ ইঞ্চ, কোন কোনটির ১৪´´ ইঞ্চ ও ১৫´´ ইঞ্চ পর্য্যন্ত আছে। "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" ১৩ ভাগ ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগ্‌চী গুপ্ত "যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোলক" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত গোলকগুলি রাজমহল হইতে

মহৎপুরের ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাকার

আনীত প্রস্তর দিয়া প্রস্তুত। দুর্গের পশ্চিম দিকের প্রাকারে নানা প্রকারের বন্দুকের গোলাই-করা ইট পাওয়া যায়। পূর্ব্বদিকের প্রাকারে ইট পাওয়া যায় কিন্তু তাহা বন্দুকের নহে। উত্তর দিকের প্রাকারে অতি সামান্য ইট পাওয়া যায়। এখনে এই দুর্গের চতুর্দ্দিকের প্রাকারের উপরে লোকের বাস হইয়াছে এবং বড় বড় বৃক্ষ আছে। দুর্গের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নিম্ন ভূমি যা খাত প্রায় সমচতুষ্কোণ, উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। প্রাকার সহ এই দুর্গ প্রায় ২১০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। প্রাকারের বহির্দ্দেশ দিয়া দুর্গের প্রত্যেক দিকের বাপ প্রায় ১২০০ হাত হইবে। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে প্রতাপের "ধূমঘাটের দুর্গ" বলেন।

দুর্গের পশ্চিম প্রাকারের উপরে যেখানে টাকীর বাবুদিগের কাছারীর

বর্ত্তমান আছে, উহার পশ্চিম দিকে দুর্গের বহির্দ্দিকে প্রাকারের পাদদেশে সরকারি রাস্তার পাশে একটি পুষ্কর আছে। উহা খননকালে একটি পাষাণ-বাঁধান ঘাট পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে ঐ স্থানে পুষ্কর ছিল। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে পূর্ব্বোক্ত ছোট খালটি দুর্গের ভিতর হইতে বাহির হইয়া দুর্গের পশ্চিম দিকস্থ কাছারিবাটী বা পরগণাবাড়ীর খালে যে স্থানে মিশিয়াছে, ঐ মিলন স্থান হইতে "পরগণাবাড়ীর বহর" নামক একটি খাল কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে হেলিয়া উত্তর দিকে গিয়া যমুনায় মিশিয়াছে। এই "পরগণাবাড়ীর বহরে" ২।৩ হাত গভীর জল আছে। এই "পরগণাবাড়ীর বহর" সহিত একটি হৃদয়-বিদারক দুঃখের কাহিনী জড়িত আছে। কথিত আছে যে, পরাজয়ের পর প্রতাপাদিত্য যশোর সেনাপতি ইসাখাঁ খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত

যশোরের ঈশা খাঁর প্রাকার

বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী ঢাকায় পঁহুছিলে, বঙ্গের সুবাদার নবাব ইসলাম খাঁ তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে যুবরাজ উদয়াদিত্য যশোহরে থাকিয়া মোগলদিগের যাবতীয় গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর অমানুষীক অত্যাচার দেখিতে না পারিয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক "কুখণ্ডীর ক্ষেত্রে" যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। এই দুইটি নিদারুণ সংবাদ যখন রাজ-অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল, তখন উদয়াদিত্যের মাতা রাজমহিষী পরমসুন্দরী (কাঁটুনিয়ার রাজবাটীতে শুনিয়াছি যে ইঁহার নাম "পরমসুন্দরী," "পরমসুধাময়ী" নহে,) প্রতাপাদিত্যের অপর মহিষী (যিনি গোপাল ঘোষের কন্যা), রাজীব ও অনন্তমল্ল নামক তাঁহার দুইটি পুত্র এবং অন্যান্য স্ত্রীলোক ও তাহাদের শিশু সন্তান সহ দুর্গাভ্যন্তরে নৌকায়

আয়োজন করিয়া পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত দ্বার দিয়া এই শরৎপানার ঘরে আসিয়া সৌকার তলদেশ বিদীর্ণ করিলেন এবং সকলে এক সঙ্গে সলিলরাশি মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। সেই হইতে রাজমহিষী শরৎসুন্দরীর নামানুসারে ইহাকে সাধারণে "শরৎপানার ঘর" কহিয়া থাকে। এই পবিত্র স্থানে হতভাগ্য বঙ্গসন্তানগণ আজ পর্য্যন্ত কোন স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করে নাই। এই পবিত্র ঘরের উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া আমরা উত্তর দিকে চলিলাম।

যেখানে শরৎপানার ঘর যমুনার সহিত মিশিয়াছে ঐ স্থান হইতে একটি বৃহৎ প্রাকার পূর্ব্ব দিকে কিয়দ্দূর গিয়া পুনরায় দুইবার বাঁকিয়া ইছামতীর দক্ষিণ তীরে যাইয়া শেষ হইয়াছে। উহাকে লোকে "উত্তরের গড়" কহে। এই প্রাকার ইছামতীর দক্ষিণ তীরের অদূরে যেখানে কাহিনী আগাইয়া দিতেছে। এই স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিমে যেখান হইতে যমুনা ও ইছামতী পৃথক হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানের দক্ষিণ দিকে "চৌকি ঘাটা" ছিল।

হামামখানা, টেঁয়াবন্দির, খিরির আস্তানা, ভূপরাজের দীঘি, কাঁসারখালি দুর্গ, শরৎপানার ঘর, চৌকি ঘাটা, বুরুজ পোতা ও দুর্গের পূর্ব্ব দিকের পরিখা হাবেরের খাল প্রভৃতি পূর্ব্বে ধূমঘাট পরগণার অন্তর্গত ছিল বলিয়া শুনা যায়। সনতার বংশীবদন শুক্ল চৌধুরী যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঈশ্বরীপুরের পশ্চিম দিকের জমিগুলি বন্দোবস্ত করিয়া লন, তখন তাঁহার নাম অনুসারে এই পরগণার নাম বংশীপুর হইয়াছিল। বংশীপুর খুলনার ৮৭৪ নং চৌহি ও খুলনার ১৩৪ নং লাট। বংশীপুরের চক খুলনা বেড়িয়া যাহা সাধারণতঃ বংশীপুর

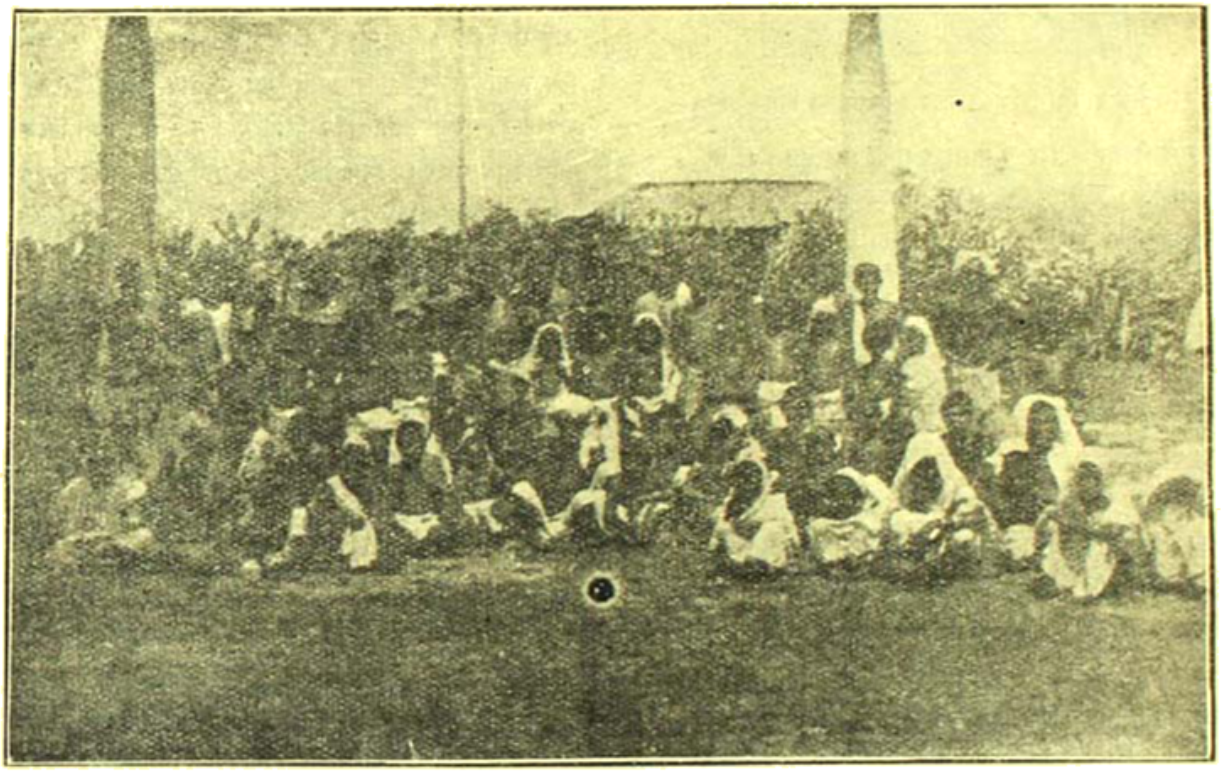

কালীগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়ে কালাজ্বরের রোগীগণ ইনজেকসান লইতে সমাগত

দ্বিতীয় বার বাঁকিয়া পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে, ঐ বাঁকের স্থানটি অতি উচ্চ ও উহা "প্রধান বুরুজ পোতা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ৩ স্থানে বুরুজটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৫০ হাত দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৮০ হাত প্রশস্ত। এই উচ্চ বুরুজের পৃষ্ঠের উপরে দাঁড়াইলে বহু দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বুরুজের মৃত্তিকাস্তরে ইষ্টক ও কামানের গোলা পাওয়া যায়। পুরাকালে উক্ত বৃহৎ প্রাকারের উপরে নদীর দিকে সারি দিয়া বুরুজ ছিল। তাহার উপরে বৃহৎ কামান সকল সজ্জিত থাকিত। পূর্ব্বোক্ত বুরুজ পোতার উপরে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পথিকের মনে অতীতের

বলিয়া বিদিত, উহার উত্তর সীমা যমুনা ও ইছামতী কদমতলা নদী, পূর্ব্ব সীমা ঈশ্বরীপুর, দক্ষিণ সীমা আইমুড়ী ঘোরানিয়া খাল ও পশ্চিম সীমা যমুনা নদী। এক্ষণে এই পরগণাটি টাকীর জমিদার ৺ঈশ্বরচন্দ্র বসুমল্লিকের সম্পত্তি।

উক্ত বুরুজ হইতে বাহির ঘাটের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে কিয়ৎ দূর যাইলে হাবেরের খাল নামক শুষ্ক পরিখা আছে। উহার পূর্ব্ব দিকে একটি ঘাটের পূর্ব্ব প্রান্তে প্রতাপাদিত্যের "রাজবাটীর ভিটা" আছে। তথায় মজিলাল সাহা নামক একঘর চাষী বাস করিতেছে। সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর শুষ্ক খাত আছে, উহাকে "চাউল ধোয়া" পুষ্কর কহে। উহা প্রতাপাদিত্যের সময়ের। উহার নিকটে এক

খণ্ড জমির উপরে প্রতাপের রাজবাটীর শেষ চিহ্ন একটি কুদ্র ইষ্টকের স্তূপ মাত্র আছে। তাহাতে কারুকার্য্যযুক্ত ইষ্টক আছে। খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার ধারে প্রাচীর ছিল বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

এই রাজবাটীর ভিটার পূর্ব্ব দিকে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা আছে। উহার পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রতাপাদিত্যের "বার দুয়ারী" বা "বেত্রবতী আসের"

কালীগঞ্জ রায়ল চিকিৎসালয়ে তাপমানের ইনস্ট্রুকশান

শেষ চিহ্ন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। ভগ্ন প্রাচীরের গাত্রে পদ্ম পুষ্পাকৃতি ও নানারূপ কারুকার্য্যে বিমণ্ডিত ইষ্টক আছে। এই প্রাচীর চূণ ও বালি নির্ম্মিত মসলা দ্বারা গাঁথা হইয়াছে। এই বারদ্বারীটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ছিল ও দক্ষিণ দিকে উহার সদর দ্বার ছিল। বারদ্বারীর পূর্ব্বে বসিয়া প্রতাপ যশোরেশ্বরীর মন্দির দেখিতে পাইতেন। পূর্ব্বে যেখানে প্রতাপের বারদ্বারী দরবার-গৃহের বৃহৎ দৌধ ছিল, আর যেখানে নিম্ন শ্রেণীর চাষী বাস করিতেছে—স্থানটিতে খোয়ার ও আবর্জ্জনা ফেলিয়া অপরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। বারদ্বারীর দক্ষিণ দিকে ঘন ও সৈবাল পরিপূর্ণ উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি অপরিষ্কার পুষ্করিণী আছে। ইহাকে লম্ব পুষ্করিণী বা বারদ্বারীর পুষ্করিণী কহে। ইহা প্রতাপাদিত্যের সময়ের পুষ্করিণী। পূর্ব্বোক্ত রাজবাটী ও এই বারদ্বারী একটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। বারদ্বারী ও রাজবাটীর ভিটার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বাটীর নীচে পাকা ভিত্তি ও ইষ্ট আছে। এক্ষণে এই ভূমিখণ্ডের মধ্য দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা হওয়ায় বারদ্বারী ও রাজবাটীর ভিটা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। প্রতাপের বারদ্বারী ও রাজবাটীর ভিটায় আজি পর্য্যন্ত কেহ প্রতাপাদিত্যের কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার চেষ্টা করেন নাই। এখনও যে সামান্য ইষ্টক-স্তূপ ও ভগ্ন প্রাচীর বর্ত্তমান আছে বনজঙ্গলের কঠিন দন্ত ক্ষুদ্র আঘাতের সঙ্গে তাহাও ক্রমে পথে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এগুলি লোপ পাইলে প্রতাপের কীর্ত্তিগুলি কোথায় ছিল, তাহা জানিবার উপায় থাকিবে না।

বারদ্বারীর পশ্চিমের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া দক্ষিণ দিকে কিয়ৎ দূর যাইলে সম্মুখে যশোরেশ্বরীর মন্দির ও তাহার দিকে বেতপুকুর নামক একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও ঈশ্বরীপুরের ক্ষুদ্র ডাক্তারখানা আছে। ইহা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য-প্রাপ্ত ডাক্তারখানা। ইহা ঈশ্বরীপুরের বাবু জীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে ও চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি ডাক্তারখানার জন্য একটি পৃথক পাকা বাটী নির্ম্মাণ করাইবার চেষ্টায় আছেন। প্রায় ৩ বৎসর অতীত হইল এই ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একজন সব্ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার আছেন। এখানে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর ও কলেরা ইত্যাদি রোগের বাৎসরিক প্রায় তিন হাজার রোগী চিকিৎসিত হয়। শুনিলাম যে মুখঘাটের ভূম্যধিকারী বাবু যোগেন্দ্রনাথ সরকার নিজ ব্যয়ে ডাক্তারখানার একটি বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়াছেন।

ডাক্তারখানার বিপরীত দিকে রাস্তার অপর পার্শ্বে "মাকের পুকুর" নামক একটি পুষ্করিণী আছে। যশোরেশ্বরীর বাটীর উত্তর দিকে আসিয়া উক্ত রাস্তা বাঁকিয়া পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে। এই স্থানে রাস্তার বাঁকের নিকটে যশোরেশ্বরীর বাটীর সম্মুখে ঈশ্বরীপুরের বাজার আছে। বাজারে মুদীর ও মনোহারীর সামান্য কয়েকখানি দোকান আছে। উক্ত রাস্তা দিয়া পূর্ব্ব দিকে যাইতে রাস্তার উত্তর দিকে ৺ওলাইচণ্ডীর মহাদেবের পূর্ব্বোক্ত পরিত্যক্ত ত্রিকোণ মন্দির ও দক্ষিণ দিকে ত্রিকোণ খর্পর পুষ্করিণী আছে। আর কিয়ৎ দূর পূর্ব্ব দিকে যাইলে রাস্তার দক্ষিণ দিকে কচুরি পানা ও সৈবাল পূর্ণ "মিহরী পুষ্করিণী" নামক একটি পুষ্করিণী আছে ও রাস্তার উত্তর দিকে "নূতন পুষ্করিণী" নামক সাধারণের স্নানের জন্য আর একটি বড় পুষ্করিণী আছে। ইহার দক্ষিণ দিকে একটি পাকা বাধান ঘাট আছে। শুনিলাম যে কিছু দিন আগে এই পুষ্করিণী খনন কালে কতকগুলি অতি বৃহৎ আকারের মনুষ্যের মুণ্ড ও অস্থি বাহির হইয়াছিল। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে ঐগুলি হাবসীদিগের মুণ্ড ও অস্থি। ইহা কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। 'ঘটক কারিকায়' মানসিংহের সহিত

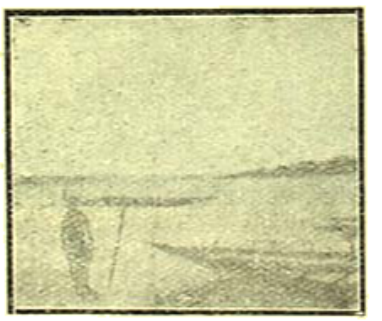

কালীগঞ্জের কিঞ্চিৎ দূরে সংযুক্ত ইচ্ছামতী যমুনা

প্রতাপের যুদ্ধের বর্ণনা স্থলে উল্লেখ আছে যে, প্রতাপের সেনাপতিগণ যথা ভড়া, মদন, সুখা, রঘু ও সূর্য্যকান্ত মানসিংহের দশ সহস্র হাবসি সৈন্যকে যুদ্ধে হনন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সহিত উক্ত অস্থিগুলির কোন সম্পর্ক আছে কি না তাহা বলা কঠিন। এই নূতন পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে যশোরেশ্বরীর অধিকারী-দিগের কোঠা বাড়ী আছে। এই বাটীর দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বোক্ত

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার একটি শাখা বাঁকিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। এই রাস্তার ধারে সিমেন্ট ফুল ফুটিয়া গাছগুলি আলো করিয়া আছে।

উক্ত রাস্তা দিয়া দক্ষিণ দিকে সামান্য দূর যাইলে প্রাচীন খৃষ্টান পল্লীর ভিটায় উপস্থিত হওয়া যায়। খৃষ্টান পল্লীর ভিটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত রাস্তা গিয়াছে। ঐ রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে খৃষ্টানদিগের ৩০।৪০টী সমাধি ছিল, কিন্তু এক্ষণে তথায় চাষ আবাদ আরম্ভ হওয়ায় সেগুলি লোপ পাইয়াছে। প্রায় ৫০।৬০টী ইষ্টক-নির্ম্মিত কবর পাওয়া গিয়াছে। মুসলমানদিগের কবর যেরূপ উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ হয়, এই কবরগুলি সেই নিয়মে প্রস্তুত হয় নাই। ১৯২০—২১ খৃষ্টাব্দের "Annual Report of the Archæological Survey of India, Eastern Circle" নামক গ্রন্থে এই স্থানে সর্ব্বপ্রথম গির্জ্জা প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ আছে। "ষটকরাইকোয়ে" যে স্থানে মানসিংহের নিকট হয়ের পক্ষ কচুরায় যশোহরের বর্ণনা করিয়াছেন, তথায় এই গির্জ্জার কথা কিছুই নাই; কিন্তু যশোহর পুরীর পূর্ব্ব দিকে ফিরিঙ্গী সৈন্য

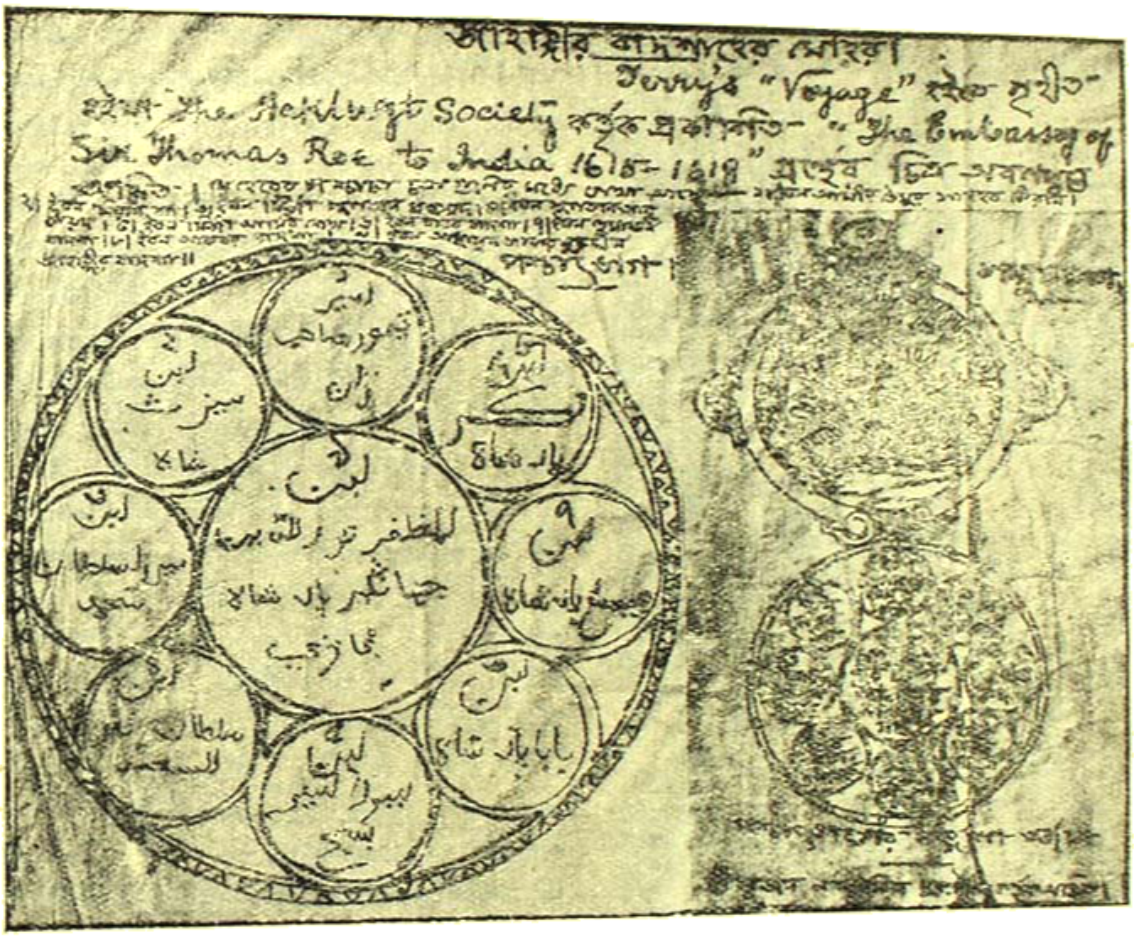

জাহাঙ্গীর বাদশাহের মোহর

রাস্তার বিপরীত বা পূর্ব্ব দিকে এক্ষণে চাষীদিগের বসতি হইয়াছে। এই স্থানে একটি ছোট পুষ্করের শুষ্ক খাত আছে, উহাকে "ছোট পুষ্কর" কহে। এই পুষ্করের পূর্ব্ব দিকে কতকটা স্থান বনাকীর্ণ হইয়া আছে, তথায় খৃষ্টানদিগের গির্জ্জার ভগ্নাবশেষ আছে। স্থানীয় লোকে এবং বাবু সতীশ চন্দ্র মিত্র ইহাকেই ডুল্লারিক-বর্ণিত "চ্যাণ্ডিকানের" গির্জ্জা বলিয়া থাকেন। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, এই স্থানে খৃষ্টান পল্লী থাকার একটি অতি প্রাচীন জনশ্রুতি আছে। তাহা ছাড়া এখানে ধ্বংস-স্তূপ দ্বারা রক্ষিত একটি কেল্লার ইতিহাস আছে। এই গির্জ্জার ও খৃষ্টান পল্লীর ভিটা যশোহর পুরীর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত দেখা যাইতেছে। যেখানে খৃষ্টান ফিরিঙ্গীদিগের কেল্লা ও বাসস্থান ছিল, তাহার সন্নিকটে গির্জ্জা থাকা অসম্ভব নহে। যশোহরের রাজধানীতে যখন মুসলমান সৈন্যদিগের জন্য সুবৃহৎ তেরামসজিদ নির্ম্মাণ হইতে পারিয়াছে, তখন অদূরবর্ত্তী জাহাজঘাটায় ও দুর্গে তুর্কের এবং রাজধানীর ফিরিঙ্গী সৈন্য, নাবিক ও কর্ম্মচারীদিগের জন্য রাজধানীর খৃষ্টানদিগের দ্বারা রক্ষিত দুর্গের খৃষ্টান পল্লীতে গির্জ্জা থাকা স্বাভাবিক।

"রামরাম ও হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার-প্রণীত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিতে" উল্লেখ আছে যে, এই যশোহর অঞ্চলে পূর্ব্বকালে চাঁদ খাঁ বহুকরীর অধিকারী ছিল। চাঁদ খাঁর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইলে প্রতাপের পিতৃ মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী এই সকল জঙ্গলভূমি বঙ্গের নাবুবের নিকট হইতে চাহিয়া লন। H. Beveridge সাহেব এই ঘটনা অবলম্বনে তাঁহার History of Bakerganj" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, Pietre Die Jarric তাঁহার Histoire des Indes Orientales নামক

জাহাঙ্গীর বাদশাহের পতাকা

গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—জেসুইট পাদ্রীগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম গির্জ্জার স্থান "চ্যাণ্ডিকান" পূর্ব্বোক্ত "চাঁদ খাঁর" অন্যতম নাম। বিদ্যাধিরের মতে চ্যাণ্ডিকান ও ধুমঘাট একই স্থান এবং প্রতাপাদিত্য ও ভুলারিক বর্ণিত 'চ্যাণ্ডিকান—' রাজা একই ব্যক্তি। "যশোহর—খুলনার ইতিহাসে" ঈশ্বরীপুরের এই গির্জ্জার স্থানকে ভুলারিক-বর্ণিত চ্যাণ্ডিকান গির্জ্জার স্থান বলা হইয়াছে কিন্তু নিখিল বাবুর "প্রতাপাদিত্যে" গঙ্গার মোহানার নিকটস্থ সাগর-দ্বীপকে চ্যাণ্ডিকান বলা হইয়াছে,—ঐ স্থানে প্রতাপের জলতরী-বহরের একটি বৃহৎ গোলাঘর ও দুর্গ ছিল। Sir Thomas Roe র "A description of East India Conteyninge th' Empire of the Great Mogoll" গ্রন্থে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যের মানচিত্রে গঙ্গার মোহানার নিকটে "The de chandaca" লিখিত আছে। উহাই চ্যাণ্ডিকান এবং ঐ স্থানে গির্জ্জা ছিল ইহাই নিখিল বাবুর মত।

বহুলোকে ঈশ্বরীপুরের যে স্থানকে চ্যাণ্ডিকান গির্জ্জার স্থান বলিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন, উহা ভুলারিক-বর্ণিত গির্জ্জার স্থান হইলে, ঐ স্থানে বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম খৃষ্টান গির্জ্জা ছিল। হুগলী ব্যাণ্ডেলের প্রাচীন পরিত্যক্ত গির্জ্জা ও চ্যাণ্ডিকান গির্জ্জা। সমসাময়িক হইলেও চ্যাণ্ডিকান গির্জ্জার নির্ম্মাণ কার্য্য অগ্রে শেষ হয়। ভুলারিক বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম গির্জ্জার সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

বঙ্গের বারজন ভূঞার মধ্যে ৯জন মুসলমান ও ৩জন হিন্দু ছিলেন। হিন্দু ভূঞাদিগের নাম, যথা চ্যাণ্ডিকান রাজ (বা যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্য,) শ্রীপুর-রাজ (বা বিক্রমপুর-রাজ কেদার রায়) ও বাকলা-রাজ (বাকলা চন্দ্রদ্বীপ বায়ার রাজধানী মাধব পাশা ও যাহার রাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্র রায়)। ব্যবসায় ও চাকুরীর জন্য পর্টুগীজ ফিরিঙ্গী ও খৃষ্টান আসিয়া এই তিন রাজ্যে বাস করিত। ইহাদিগের কোনও ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না। এই নরপশুদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ভারতবর্ষের জেসুইট সম্প্রদায়ের নেতা নিকলাস পাইমেন্টা ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস ফার্ণান্ডেজ ও ডমিনিক লোপ্স নামক পাদ্রীদ্বয়কে বঙ্গদেশে পাঠান। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে মেলচিওর ফনসেকা এবং এণ্ড্রু বাউয়েস্ নামক আর দুইজন পাদ্রী বঙ্গে প্রেরিত হন। ফনসেকা চাটগাঁ হইতে বাকলা হইয়া পরে নদী-মেখলিত বনজঙ্গলাকীর্ণ গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য-জন্তু-পরিপূর্ণ সুন্দরবন অতিক্রম করিয়া ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর চ্যাণ্ডিকানে পঁহুছেন। তথায় লোপ্স পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। ফনসেকা রাজার সহিত দেখা করিয়া খৃষ্টানদিগের বাসস্থানের জন্য স্থান প্রার্থনা করায় রাজা তাঁহাকে ভূমি দান করিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যে গির্জ্জা নির্ম্মাণ শেষ হয়। রাজা স্বয়ং অন্যান্যবর্গ সহ গির্জ্জা দেখিতে গমন করিয়া সুন্দ পদে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এবং চেয়ারে উপবেশন না করিয়া তিনি সিঁড়ির উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। তৎপরে যুবরাজ (উদয়াদিত্য) গির্জ্জা দেখিতে গিয়াছিলেন।

এই সময় সুন্দরবনে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হইত, এবং ইহা লবণের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। উহা শ্রীপুরের ভূঞা কেদার রায়ের রাজ্যভুক্ত ছিল। (পর্টুগীজ বদমায়েসদিগের অত্যাচারের ফলে) সেই সময় বঙ্গে খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইলে তাহাদিগকে

পর্টুগীজগণ এইস্থানে আশ্রয় নিবার ব্যবস্থা করিল। সবদ্বীপের প্রতি আরাকান রাজ্যের ও মোগলদিগের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। কেবল রাজ সকল দিক ভাবিয়া সবদ্বীপের স্থল পর্টুগীজদিগকে দিলে তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি কার্ভালো ১৬০২ খৃষ্টাব্দে উহা পর্টুগীজদের হইয়া দখল করেন ও পরে চাটগাঁর পর্টুগীজ সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুসের সাহায্যের প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহার সহিত ইহা ভাগাভাগি করিয়া লন। এই দ্বীপ লইয়া আরাকান-রাজের সহিত পর্টুগীজ-সেনাপতি কার্ভালোর বহুবার যৌ-যুদ্ধ হওয়ার পরে পর্টুগীজগণ ইহা ত্যাগ করিল। এদিকে আরাকান-রাজ সবদ্বীপ দখল করিয়া বাকলা রাজ্যের বালক রাজার অনুপস্থিতি কালে ঐ রাজ্য দখল করিলেন এবং তৎপরে প্রতাপাদিত্যের যশোহর রাজ্য গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। (প্রতাপের তখন মোগলদিগের সহিত শত্রুতা বাধিয়া উঠিয়াছে।) প্রতাপ আরাকান-রাজের মিত্রতা লাভের জন্য তাঁহার পরম শত্রু কার্ভালোকে মৃত করিবার জন্য উপায় স্থির করিলেন। তিনি কার্ভালোকে প্রলোভন দেখাইয়া আপন রাজধানীতে আনাইয়া অনুচরসহ তাঁহাকে বন্দী করেন, তাঁহার যুদ্ধজাহাজগুলি দখল করিয়া লন; ইহার পরে সংবাদ রটিল যে কার্ভালোকে চাটিকান্ রাজ হত্যা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া পর্টুগীজ ও খৃষ্টানদিগের কতকগুলি লোক কার্ভালোর হত্যার প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলে তিনি পর্টুগীজদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইয়া প্রথমে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করেন ও পরে অর্থ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন এবং পাদ্রীদিগকে চাটিকান রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করেন। ইহার পর বঙ্গে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ হইল। Nicalao Pimenta কৃত "Relatio Historica de Releus in India Orientali" হইতে জানা যায় যে সোনা খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সুন্দররূপে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং পাইমেন্টা ও সোনা চাটিকানের বহু ছুই লোক ও বেত্রাকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগের বিবাহ দিয়াছিলেন।

ঈশ্বরীপুরের এই সিমার্ত্ত ভিটা ছাড়াইয়া দক্ষিণ দিকে কিয়ৎ দূর যাইলে যে স্থানে ইছামতী কমলতলীর সহিত হাসরের খাল মিশিয়াছে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে একটি যুদ্ধস্থ ও লক্ষগেট ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ঐ স্থান হইতে হাসরের খালের উত্তর পাড় দিয়া পশ্চিম দিকে যাইতে থাকিলে উক্ত খালের ধারে মাঠের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে এক সারিতে কয়েকটি অল্পোচ্চ মৃত্তিকার পাটাতন বা ঢিপি আছে। এইগুলি পূর্ব্বে যুদ্ধস্থ বা gun-stand ছিল। ঐগুলির ভিতরে ইঁট পাওয়া যায়। এই খালের নিকটে একটি পাকা ক্ষুদ্র ঘরের ভগ্ন ও ভগ্নাবশেষ কিয়দংশ আছে। লোকে বলিয়া থাকে যে প্রতাপ এইস্থানে বসিয়া সম্মুখের মাঠে সৈন্যদের রণকৌশল শিক্ষা দেখিতেন। এক্ষণে এই মাঠে ৬।৭ ঘর চাষীর বাস আছে।

এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে প্রায় ১৮০ রোপ দূরে আইনুদ্দী ঘোরানিয়া নামক খালের দক্ষিণ পারে "ঘুঘুঘাট" নামক স্থান আছে। তথায় শম্বু ঘাদের মাঠ, বিল ও চাষীদের বাস আছে; কোন প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নাই।

ঈশ্বরীপুর হইতে ৬।৭ রোপ দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ইছামতীর অপর পারে সুন্দরবনের ১৩৯নং লাট জনসাধারণ কর্ত্তৃক "হেজ কাটির জঙ্গল" বলিয়া অভিহিত হয়। এই স্থানে হিংস্র জন্তু-পূর্ণ দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে ইষ্টকালয়ের প্রাচীর, একটি মন্দির বা মঠের ধ্বংসাবশেষ, একটি পুষ্করিণী, একটি পাকা রাস্তার ধ্বংসাবশেষ এবং বকুল ও গাব প্রভৃতির কয়েকটি গাছ আছে, যাহা লোকালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি বনাকীর্ণ বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত। ঈশ্বরীপুরের পূর্ব্ব দিকে ঘুরে "বীর কাটি" নামক আর একটি স্থানে জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আছে।

ঈশ্বরীপুরের পূর্ব্ব দিকে বহু দূরে কপোতাক্ষ নদীর পূর্ব্ব পারে "বেদকাশী" নামক স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। মুসলমান বলভদ্রায়ের আদেশমত প্রতাপ উড়িষ্যা হইতে উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ আনিয়া এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে মন্দিরের এখন চিহ্নমাত্র নাই। অনেক দিন পূর্ব্বে এই স্থানের ভূগর্ভ হইতে প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বারের চৌকাঠ পাওয়া গিয়াছিল এবং উৎকলেশ্বরের মন্দিরের একটি প্রস্তরের স্মৃতি-ফলক পাওয়া গিয়াছিল, উহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। ঐ স্মৃতিফলকে লেখা ছিল :—

নির্ম্মমে বিবকর্ম্মা যং সম্বৎসরে প্রতিষ্ঠিতম্।
উৎকলেশ্বর সংজ্ঞক শিবলিঙ্গ নমস্তমম্।
প্রতাপাদিত্য ভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ।
যতো বলভদ্রায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চতৎ।

ঈশ্বরীপুর ও উহার পার্শ্বস্থ গ্রামে স্থিত আধুনিক ঘণ্টেশ্বর নামক শিবকে এক্ষণে সাধারণ লোকে ঘণ্টেশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

গোবরডাঙ্গার নিকটস্থ টেঁরি হইতে যমুনা ও ইছামতী একত্র এক খাতে প্রবাহিত হইয়া এই ঘণ্টেশ্বর উত্তর-পশ্চিম কোণায় আসিয়া পরস্পর হইতে পৃথক হইয়াছে। তৎপরে ইছামতী এই গ্রামের উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া ত্রিভাকৃতি হইয়া বাঁকিয়া ইহার পূর্ব্ব দিক বেষ্টন করিয়া গিয়াছে। গ্রামের পূর্ব্ব দিকে যেখানে ইছামতী-কমলতলী ত্রিভাকৃতি ত্যাগ করিয়া বাঁকিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, ঐ কোণায় ঘোরানিয়া খাল নামক উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি ক্ষুদ্র খালের দক্ষিণ প্রান্ত মিশিয়াছে। ঐ খালের উত্তর প্রান্ত গ্রামের উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত ইছামতী কমলতলীর অপর বাহুতে মিশিয়াছে। যাহার দুই দিক দিয়া জোয়ার-ভাঁটা খেলে এ অঞ্চলের লোকে তাহাকে "ঘোরানিয়া" কহে। যমুনা নদী গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়া কিঞ্চিৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। যে স্থানে ইছামতী ও যমুনা পৃথক হইয়াছে, উহাকে "চৌকি-ঘাট" কহে। এই চৌকি-ঘাটের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ইছামতীর একটি প্রাচীন পরিত্যক্ত শুষ্ক খাত আছে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে "হাসরপালি" বা "হাসরের খাল" নামক একটি

খাল আছে। ইহার পূর্বপ্রান্ত যেখানে ইছামতীতে মিশিয়াছে, তথায় পূর্বে একটি লকগেট ছিল। খালের খাদে আজিও জল আছে। গ্রামের পশ্চিম দিকে "শরৎখানার পরিখা" বা "কামারখালি" নামক একটি খাল আছে। ইহার তীরে কামারদিগের বাস ছিল এবং তথায় লৌহের গোলা পাওয়া যায়। ইহার দক্ষিণ প্রান্ত খালের পশ্চিম প্রান্তে মিশিয়াছে, এবং ইহার উত্তর প্রান্ত হইতে

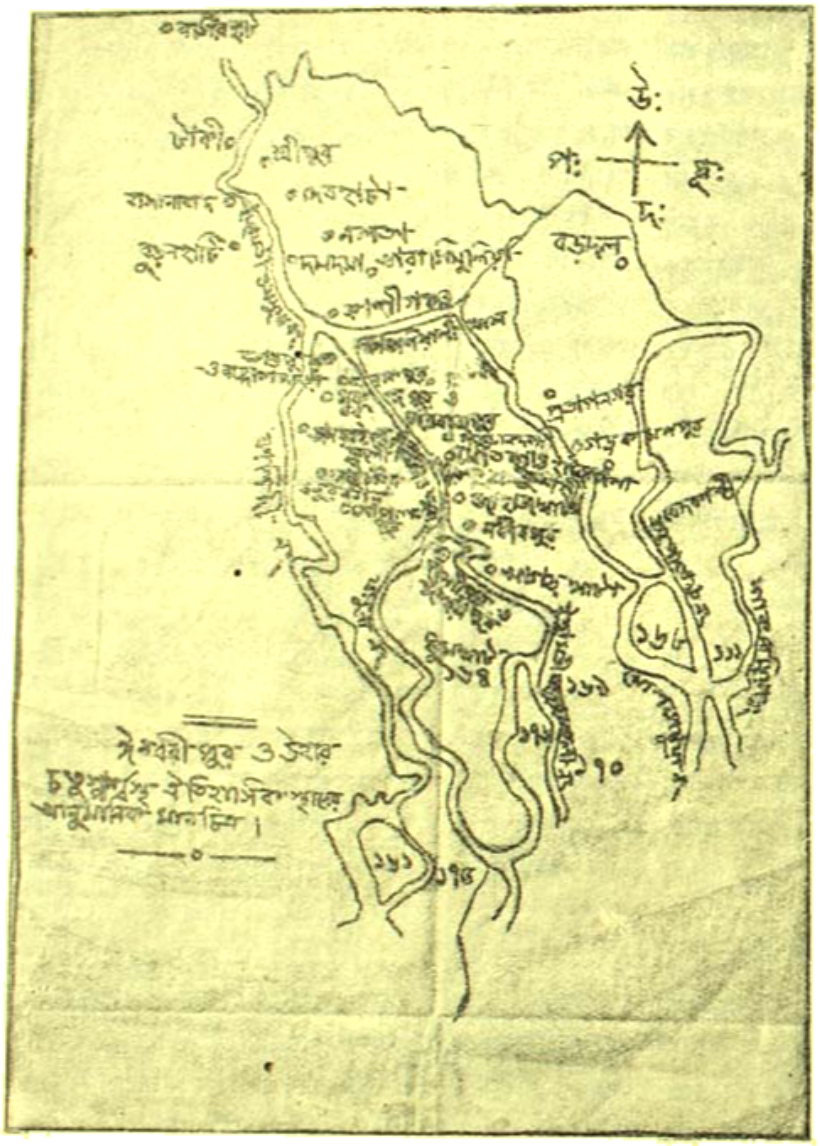

মানচিত্র

"শরৎখানার বহ" নামক ছোট খাল বাহির হইয়া উত্তর পশ্চিম দিকে কিয়দ্দূর যাইয়া যমুনায় মিশিয়াছে; সেখানে উহা যমুনায় মিশিয়াছে সেখানে পূর্বে লকগেট ছিল। পূর্বোক্ত কামারখালির উত্তর প্রান্তের যে স্থান হইতে শরৎখানার বহ বাহির হইয়াছে ঐ সঙ্গম-স্থান হইতে আর একটি ক্ষুদ্র খাল পূর্ব দিকে যাইয়া সন্নিকটবর্তী দুর্গঘাট দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যেখানে ইহা দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তথায় পূর্বে লকগেট ও গুপ্ত-দ্বার ছিল।

যেখানে শরৎখানার বহ যমুনায় মিশিয়াছে উহার পূর্ব দিকে ও যে স্থান হইতে ইছামতী ও যমুনা পৃথক হইয়াছে উহার দক্ষিণ দিকে সামান্য দূরে প্রত্নতাত্ত্বিকের নয়নবিমোহিত রায়বাঁশী দুর্গঘাটের বৃহৎ দুর্গ আছে। দুর্গের নীচে উহার বহির্দেশে চতুর্দিকে কিয়দ্দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি আছে। এই সমতল ভূমির বহির্দেশে দুর্গের পূর্ব দিকে হাবরের খাল, দক্ষিণ দিকে লোকালবোর্ডের রাস্তা ও তাহার দক্ষিণে একটি পরিখা, পশ্চিম দিকে লোকালবোর্ডের রাস্তা, তাহার পশ্চিমে কামার-খালি ও তাহার পশ্চিমে যমুনা নদী, এবং উত্তর দিকে বৃক্ষশোভিত উচ্চ বৃহৎ বাঁধ বা প্রাকার ও তাহার উত্তরে ইছামতী কদম-তলী নদী আছে।

দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে পূর্বোক্ত প্রাচীন বৃক্ষশোভিত যে প্রাকার আছে, উহা যমুনার সহিত শরৎখানার বহের সঙ্গম-স্থানের পূর্ব উত্তর কোণা হইতে আরম্ভ হইয়া বাঁকিয়া পূর্বদিকে গিয়াছে এবং গ্রামের উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত ইছামতী কদমতলীর দক্ষিণ তীরে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানে যে বৃক্ষ আছে উহার পাদদেশে ইছামতী হইতে হাবরের খাল বাহির হইয়াছে। এই স্থানে একটি লকগেট ছিল। হাবরের খাল দুর্গের পূর্ব দিক দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া হামাখখানার গুপ্ত গৃহের পশ্চিম দিক দিয়া উহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় কিঞ্চিৎ ঘুরে যাইয়া পূর্ব দিকে বাঁকিয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকে স্থিত হাবরের খালে মিশিয়াছে; এই সঙ্গম স্থলে পূর্বে লকগেট ছিল, এবং উহার উত্তর-পূর্ব কোণায় একটি ছোট বুরুজের চিহ্ন আছে। দুর্গের দক্ষিণ দিকে পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ একটি ছোট পরিখা আছে, উহাকে কেহ কেহ "চুলিখালি" বলেন। উহার পূর্ব প্রান্ত হাবরের খালে ও পশ্চিম প্রান্ত কামারখালিতে মিশিয়াছে। চুলিখালি হইতে আর একটি পরিখা বাহির হইয়া টেঁয়া মসজিদের পশ্চিম দিক দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া হাবরের খালের উত্তর প্রান্তে মিশিয়াছে। এই সঙ্গম স্থানের উত্তর পূর্ব কোণায় একটি ক্ষুদ্র বুরুজের চিহ্ন আছে। শেষোক্ত পরিখার অধিকাংশ স্থল এক্ষণে শুষ্ক, স্থানে স্থানে সামান্য জল আছে।

মহারাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যশোহর রাজ্য বিভাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের ।৵০ অংশ প্রতাপকে ও পশ্চিম দিকের ।৵০ আনা বসন্ত রায়কে দিয়া যান। রাজ্য-বিভাগের পরে বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকিতে প্রতাপ যশোহরের প্রাচীন রাজধানীর (বুহুলপুরের) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধুমঘাটে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। যশোহর ও ধুমঘাট পরস্পর নিকটবর্ত্তী থাকায় এই উভয় নগর একত্রীভূত হইয়া যে বৃহৎ নগর সৃষ্ট হইল, উহার বিস্তৃতি পঞ্চক্রোশ ছিল। রাল্‌ফ ফিচ্ যশোহর পুরীর যে বর্ণনা করিয়াছেন উহা ধুমঘাট ও যশোহরকে একত্রে একটি বৃহৎ নগর ধরিয়া লইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যশোহর পুরীর 'চারিদিকে গড় আছে ও তাহার দীর্ঘ প্রস্থ এক-এক দিকে পাঁচ পাঁচ ক্রোশ'। লোকের বিশ্বাস যে পূর্ব্বের বর্ণিত ধুমঘাট, তিয়কাটি, তেরকাটি, ঈশ্বরীপুর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী আধুনিক বংশীপুর ছুড়িয়া প্রতাপের নূতন রাজধানী ধুমঘাট অবস্থিত ছিল। আধুনিক বংশীপুরের অন্তর্গত ধুমঘাটের প্রাচীন দুর্গ যমুনা ও ইছামতীর বিচ্ছেদের মোহানার নিকটে অবস্থিত আছে। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে:—"যদুনেচ্ছা প্রসঙ্গেন ধুমঘট্ট পত্তনে চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।" এখানে 'যদুনেচ্ছা প্রসঙ্গেন' দ্বারা যমুনা ও ইছামতীর বিচ্ছেদ-স্থান বুঝাইতেছে। যশোরেশ্বরীর আবাসস্থল "যশোরেশ্বরী পুর" এক্ষণে শুধু "ঈশ্বরীপুর" নামে অভিহিত হইতেছে এবং ইহাকেই এক্ষণে সাধারণতঃ "যশোর" বলা হয়। ঈশ্বরীপুরের উত্তরে ঈশ্বরীপুর ও নবীবপুরের মধ্যে "যশোর" নামক একটি গ্রামের নাম পূর্ব্বের জেলা ২৪ পরগণার মানচিত্রে দেখা যায়। সম্ভবতঃ ঈশ্বরীপুর, যশোহর ও ধুমঘাট লইয়া একটি অতি বিস্তৃত নগর গঠিত হইয়াছিল। হাইখ সাহেব তাঁহার রিপোর্টে ঈশ্বরীপুরকে "যশোর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জেনারেল রেনেলের ১৭৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে এই সকল স্থান কৃষ্ণনগর জেলাভুক্ত সুন্দরবনের অন্তর্গত করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে। হাইখ সাহেবের ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে বর্ণনা করা হইয়াছে যে ধুমঘাটে ব্যাঘ্রের আবাসস্থল হইয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরীপুরে তখন গ্রাম ছিল ও সুন্দরবনবাসী নৌকার মাঝিরা ইহাকে যশোর বলিত ও এই স্থান হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লইত। ইতিপূর্ব্বে এই সকল স্থান জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে খুলনা জেলাভুক্ত হইয়াছে।

ঈশ্বরীপুর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ; পূর্ব্ব-পশ্চিমে ঐরূপ হইবে। ঈশ্বরীপুরের প্রায় ৪ ক্রোশ দক্ষিণে নিবিড় সুন্দরবন আছে। খাল ও নদীগুলি বহিয়া যাওয়ায় গ্রামের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল নহে; কালাজ্বর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ লাগিয়া আছে। এতদঞ্চলে পাকা রাস্তা না থাকায় চলাচলের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। গ্রামে পানীয় সস্তা, কিন্তু ক্রমে দুর্ম্মূল্য হইতেছে। বৎসরাধিক কাল হইল এই গ্রামে একটী বোর্ডের লোয়ার প্রাইমারি বালক বিদ্যালয় এবং অল্প দিন হইল একটী বালিকা বিদ্যালয় হইয়াছে। তথায় পাঠ্য পুস্তক পড়ান হয় ও চরকায় সূতা কাটা শিখান হয়। বালক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫১ জন শিক্ষার্থী আছে। অদূরবর্ত্তী নবীবপুরে একটি মাইনর স্কুল আছে। ইহাই এতদঞ্চলের প্রধান শিক্ষার কেন্দ্র। এতদঞ্চলে ডাক্তারের অত্যন্ত অভাব। পূর্ব্বে গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাক প্রভৃতি জাতির ও ঘর মুসলমানের বাস ছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ৬ ঘর, কায়স্থ ১২ ঘর, নাপিত ১ ঘর, কর্ম্মকার ৭ ঘর, কৈবর্ত্ত ২ ঘর, গোপ ২ ঘর, কাওরা ৪ ঘর, বাগ্দী ৩ ঘর মুচী ৭ ঘর এবং কয়েক ঘর মুসলমানের বাস আছে। গ্রামে কয়েকটি মিঠা জলের পুষ্করিণী আছে, কিন্তু ঘাট ও সৈবাল হওয়ায় সেগুলি খারাপ হইয়া রহিয়াছে। প্রায় ১৩ বৎসর হইল ১৮ খানি গ্রাম লইয়া একটি চৌকিদারী ইউনিয়ন হইয়াছে। ১৮ জন চৌকিদার ও ২ জন দফাদার আছে। ১৯২৫৲ টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় হয়। গ্রামটি বারকৌয়া সবডিভিসনের জানপদ থানার অধীন। বাবু শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এই ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, তিনি আবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরীপুরের প্রাণ। তিনি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কালিকানন্দ গ্রামের ইষ্টানিষ্টে ও অতিথি অভ্যাগতদিগের তত্ত্বাবধানে সর্ব্বদা তৎপর। ইঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত আমাদিগের পর্য্যটন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইত।

মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

৬

অমৃতসর বেশ সমৃদ্ধ সহর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। চতুর্থ শিখ-গুরু রামদাস এ সহর স্থাপন করেন, ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে। বছর নিয়ে একটু মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে নয়, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে এ নগরের প্রথম পত্তন হয়। বাদ্‌শাহ আকবর এ জায়গাটুকু তাঁকে জায়গীর দেন—স্বর্ণমন্দির-সংলগ্ন ভূমিতে সহরের প্রথম পত্তন হয়। এখানে গুরু রামদাস এক দীঘী তৈরী করান; সে দীঘীর নাম দেন অমৃতসর—তাই থেকেই সহরের নাম হয়েছে অমৃতসর। এই দীঘীর বুকের উপর মস্ত প্রাসাদ। দীঘীটি অমৃতসর সিটির মধ্যে; ক্যান্টনমেণ্ট থেকে দূরে। এই দীঘীর বুকে এই প্রাসাদের নাম হরমন্দির বা গুরু-দরবার বা দরবার-সাহেব বা স্বর্ণমন্দির। কারো মতে স্বর্ণমন্দির তৈরী করান পঞ্জাব-কেশরী রণজিত সিং। এ কথা ঠিক নয়। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণমন্দির প্রথম তৈরী হয়। পরে আহমদ শাহ দুর্‌রানি পুরানো মন্দিরটি ধ্বংস করেন; ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রণজিত সিং মন্দিরের সংস্কার করে তাকে বর্ত্তমান শোভা-শ্রীসৌষ্ঠবে মণ্ডিত করেন। স্বর্ণমন্দির বহুকালের প্রাচীন মন্দির।

তীর-পথ থেকে মন্দিরে যাবার জন্য শ্বেত পাথরের একটি পুল-পথ আছে। এই পথই মন্দিরের প্রবেশ-পথ। স্বর্ণমন্দিরের গড়ন মন্দিরের মত নয়—rectangular, চতুষ্কোণ প্রাসাদের মত; নীচের অংশ পাথরের তৈরী, মাথার চারদিকে চারটি রূপার চূড়া। এ চূড়াগুলির ভিতর দিয়ে পথ আছে; সেই পথে মাঝখানকার উচ্চ চূড়ায় পৌঁছানো যায়। মাঝখানকার এই সর্ব্বোচ্চ চূড়াটি তামার সোনালি পাতে মোড়া।

এই মন্দিরের চারিধারে বহু গৃহ—গৃহগুলিকে বুঙ্গা বলে। বুঙ্গাগুলিতে গণ্যমান্য শিখ সর্দ্দাররা পূজা দিতে এসে বাস করেন। উত্তর-পশ্চিম কোণে তৎকালীন আকাল বুঙ্গা—এটি পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন তৈরী করান্। এই বুঙ্গায় গুরু গোবিন্দ সিংএর তরবারি সংরক্ষিত আছে।

মন্দিরের মধ্যে বিচিত্র সোনালি কাজ-করা হল-ঘরে 'গ্রন্থসাহেব' সংরক্ষিত। নিত্য মৃদঙ্গ-বীণা ও বিবিধ বাদ্য-সংযোগে ধ্রুপদ ও ভজন-গানের ব্যবস্থা আছে। প্রহরে-প্রহরে শঙ্খবাদ্য হয়। মন্দিরে ঢুকতে হলে জুতা খুলে যেতে হয়। সর্ব্ব জাতির পক্ষেই এই ব্যবস্থা। শুনলুম, য়ুরোপীয়েরাও এ নিয়মের বহির্ভূত নন্। মন্দিরের ছাদে শীষমহল গুরুর বাস-গৃহ। ময়ূরপুচ্ছের ঝাঁটায় এই মন্দির নিত্য ঝাঁট দেওয়া হয়।

মন্দির-সংলগ্ন ভূ-খণ্ডের দক্ষিণে দরবার-উদ্যান। উদ্যানে নানা ফলের গাছ। তাছাড়া একটি দীঘী আছে। দক্ষিণে অটল টাওয়ার—সাধু হরগোবিন্দর পুত্র অটল রায়ের নামে এটি উৎসর্গীকৃত।

অমৃতসর সিটির উত্তর-পশ্চিমে রণজিত সিংএর তৈরী দুর্গ, গোবিন্দগড়; চৌদ্দ মাইল দূরে তরণ-তারণ। তরণ-তারণ একটি দীঘী—গুরু অর্জ্জুন এ-দীঘী তৈরী করান্। এ দীঘীর জল তীর্থ-বারির মত পবিত্র। শিখেরা বলেন, এ দীঘীর জলে স্নান করলে ও সাঁতার কাটলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। গুরু অর্জ্জুনের না কি কুষ্ঠরোগ ছিল, তাই তিনি তরণ-তারণের তীরেই বাস করতেন।

অমৃতসর সহরটি বলেছি, বেশ পরিচ্ছন্ন। পথ ঘাট তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। এখানে বহু ধনীর বাস। তাছাড়া কাশ্মীরী, আফগান, নেপালী, বোখারাই, তিব্বতী, বেলুচি, ইয়ারখণ্ডী বহু ব্যবসায়ী ব্যবসা সূত্রে এখানে এসে বাস করছেন। জরি-চুমকি, শাল, আলোয়ান, পশ্‌মিনা, হাতীর দাঁতের কাজ অমৃতসরের নামকে সারা বিশ্বে খুবই প্রসিদ্ধ

করে তুলে [illegible] এখানে বেশ গরম —রাত্রে ছাদে [illegible] বার দার বহু দামী নেয়ারের খাট পেতে তাতে শুয়ে বিছিয়ে নিদ্রা যান্। এখানকার মুসলমান মেয়েরা পায়জামা পরেন—সে পায়জামার নাম সুথুন। সুথুনের কোমরের কাছটা যেমন চওড়া, পায়ের দিকটা তেমনি সরু। হিন্দু মেয়েরা পরেন ঘাগরা। সাধারণ ভাষায় এই ঘাগরার নাম, লাঙ্গা। মেয়েরা মাথায় ছোট ছোট বেণী রচনা করে চুল পাতিয়ে রাখেন। মেয়েদের

হয়ে গেল সে দিন! জালিয়ানওয়ালা [illegible] এক বড় পার্ক—আগাগোড়া পাচিল-ঘেরা। [illegible] দীর্ঘনিশ্বাসে তার বাতাস আজো ভারাক্রান্ত হয়েছে!

১২ সেপ্টেম্বর উষার আলো ধরণী স্পর্শ করা মাত্র আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লুম। অত ভোরে ফটো নেওয়া সম্ভব হলো না। কাজেই কতক নিরাশ চিত্তে ফিরে আমরা রামবাগে এলুম। রামবাগ এখন ক্যান্টনমেণ্টের মধ্যে। এই রামবাগ ছিল রণজিৎ সিংহের খাস-বাগান।

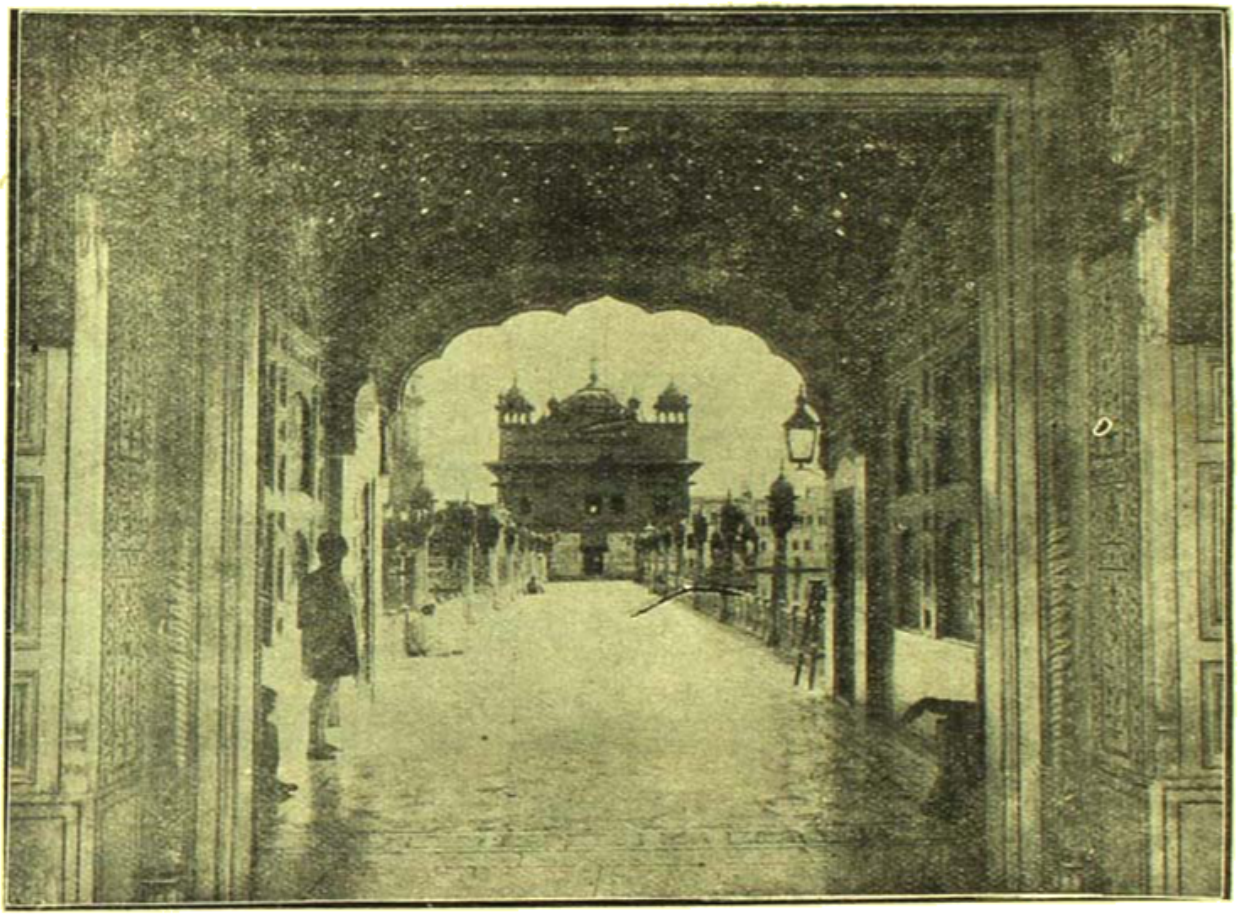

স্বর্ণমন্দিরের প্রবেশপথ—অমৃতসর

পায়ে ছুতা পরার রেওয়াজ আছে। সুশ্রী বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ, শক্তির সঙ্গে শ্রীর অপূর্ব্ব সমন্বয় এই শিখ রমণীর দেহে।

এখানকার হল্-বাজার খুব বড় বাজার। হল্-বাজারের কাছেই হল্ গেট্। ক্যান্টনমেণ্ট ছেড়ে বেলের পুল পেরিয়ে এই হল্ গেট্ দিয়ে সিটিতে প্রবেশ করতে হয়। হল্ গেট্ দিয়ে ঢুকে সিটির দিকে খানিকটা এলেই [illegible] বাগ যেখানে মানব-জাতির অতি নিষ্ঠুর এক ট্রাজেডির অভিনয়

এর মধ্যেই গ্রীষ্ম-যাপনের জন্য তাঁর সৌধ ছিল। সে সৌধ এখনো বর্ত্তমান আছে।

রামবাগ ঘুরে আমরা গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে এলুম। আশে-পাশে কখানা দোকান। এখানে দোকানে ভাত, রুটী, মাংস বিক্রী হয়—শিখেরাই খায়। মুসলমানী হোটেলে শিখেরা প্রবেশ করে না। শিখের জাতাভিমান খুব। অমৃতসরে সরাই আর ধর্ম্মশালা আছে অনেকগুলি। স্নান-বাজনার রেওয়াজও এখানে বেশী-রকমের।

একটু আগেই এসে দেখি, পথের দুধারে ধু-ধু মাঠ। বাঁয়ে দূরে রেল-লাইন। ডাহিনে কোথাও দুঃখী-গরীবের জীর্ণ গৃহ, কোথাও শুষ্ক মাঠ, কোথাও বা ঘেঁষাঘেঁষি কয়েকটা গাছপালা। একটু আগে খালসা কলেজের প্রকাণ্ড বাড়ী নজরে পড়লো।

অমৃতসর ছেড়ে ঠিক ৫২ মিনিট পরে লাহোরে প্রবেশ করলুম। লাহোরে ঢুকে প্রথমেই ডান দিকে দেখলুম, সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শালিমার-বাগ। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ শাহজাহান কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ বাগেবাগের আদর্শে শালিমার বাগ তৈরী করান্। বাগানটি তেতলা। ফটক দিয়ে ঢুকেই রাস্তার সঙ্গে এক level-এ—প্রথমেই যে তলা, সেই তলাটি সব-চেয়ে উঁচু। এই তলা থেকে সিঁড়ি বয়ে নেমে মাঝের তলা, আবার মাঝের তলা থেকে সিঁড়ি বয়ে শেষের তলায় যেতে হয়। প্রথম সর্ব্বোচ্চ তলাটির নাম ফরহ বখ্স্—আর শেষের সব-নীচু তলার নাম ফৈজ বখ্স্। প্রথম সর্ব্বোচ্চ তলায় দুধারে ফল-ফুলের বিচিত্র গাছপালা, নানা রঙের ফল-ফুলে অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে; মাঝখানে জলের লহর, দীর্ঘ—তাতে ১০০টি ফোয়ারা। দোতলায় চারিধারে ফুলগাছের মধ্যে শ্বেতপাথরে তৈরী জলটুঙ্গি। জলাধারের মাঝে মর্ম্মর-রচিত গৃহ—গৃহটির চারিধার খোলা। জলাধারে পদ্মের রাশ ফুটে রয়েছে। শেষের সব-নীচু তলায় বিস্তর আম গাছ। এ বাগান শাহ জাহানের হুকুমে তাঁর স্থপতি আলিমর্দন খাঁ তৈরী করেন।

শালিমার-বাগের সামনেই আর একটি বাগান। এর নাম গুলাবী বাগ। শাহ জাহানের একজন প্রধান সৌখিদার ছিলেন, সুলতান বেগ—তিনি এই গুলাবী বাগ তৈরী করান। এ বাগানের হরেক রকমের নকাশী কাজ ভারী চমৎকার। এই বাগানের সামনে যা লেখা আছে, তার অর্থ,—

"চমৎকার এই বাগান। এ বাগানের ফুলের রূপ দেখে চন্দ্র-সূর্য্য হিংসায় খুন হয়েছিল,—তারা এখন এ বাগানে রোশনি দিচ্ছে!"

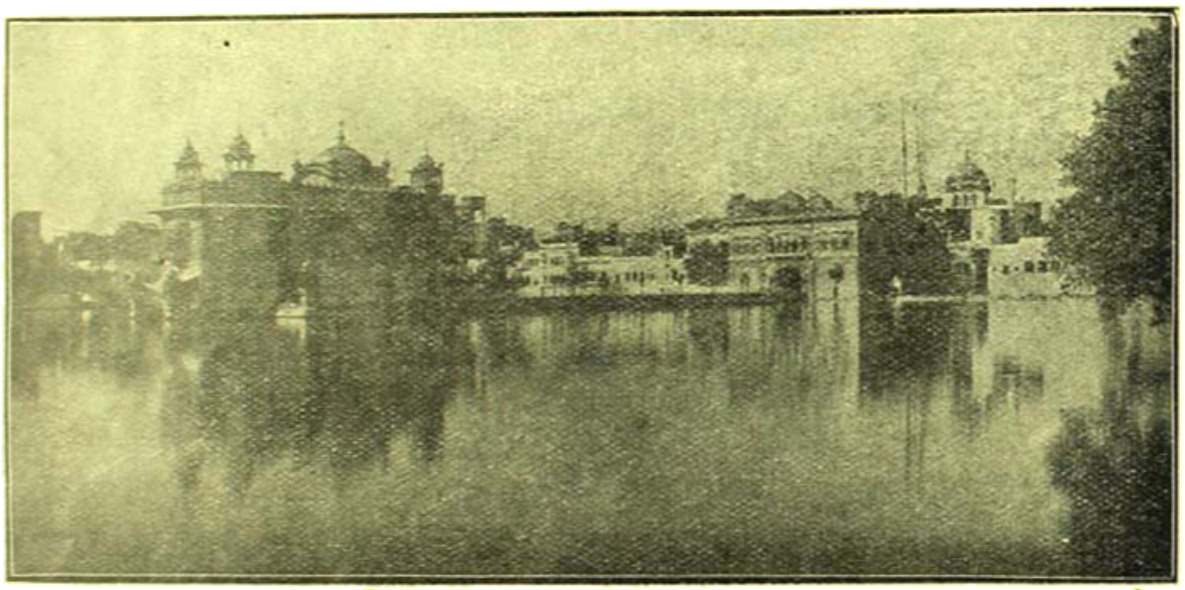

স্বর্ণমন্দির—অমৃতসর

কিম্বদন্তী, লাহোরের প্রতিষ্ঠা করেন সূর্য্যবংশীয় রাজা লব। সে-সম্বন্ধে অবশ্য কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ইতিহাসের যুগে দেখি, দশম শতাব্দীতে লাহোর কাবুলের ব্রাহ্মণ-রাজাদের অধিকার-ভুক্ত ছিল! মামুদ গজনীর অভিযানের পর তাঁর অধীনস্থ দাস মালিক আয়াজ লাহোরের শাসন-কর্ত্তা হন্। লাহোরের সমৃদ্ধি হয় মোগল বাদশাহ আকবরের আমলে। এখানে তিনি রীতিমত দরবার করেন ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে এসে। জাহাঙ্গীর লাহোরে ভালোভাবেই বাদশাহী আস্তানা পাতেন। তাঁর আমলে আদি-গ্রন্থের সংগ্রহ-কার শিখ-গুরু অর্জ্জুন লাহোরের দুর্গমধ্যে বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। জাহাঙ্গীরের পর শাহ

জাহান লাহোরের সমৃদ্ধি-শ্রী আরো বাড়িয়ে তোলেন; ঔরংজীবের আমলেও লাহোর বেশ সমৃদ্ধ ছিল। ঔরংজীবের কন্যা জেব-উন্নিসা এখানে এক বাগান তৈরী করান, তার ফটক চৌ-বুরুজী; সে বাগান নেই, তার ফটক আছে। তবে চৌবুরুজের একটি বুরুজ ধ্বংস হয়েছে। এ বাগানটি তিনি ফকিরকে দান করেন; পরে লাহোরের নওয়াব কোটে আর-একটি বাগান তৈরী করান। নওয়াব কোটের এই বাগানে দেহান্তে তাঁকে কবরিত করা হয়। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লাহোর শিখের অধিকারে আসে; পরে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত হয়।

ঘটা। নর্ত্তকী বাইজীর বাড়ীর দোরে অবধি সাইনবোর্ড আঁটা। তাতে যে-সব কথা লেখা আছে, তাতে বৈচিত্র্যও মন্দ নয়। "নাচ দেখতে চান তো আসুন—পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, খুব ভালো বন্দোবস্ত" ইত্যাদি ধরণের বিজ্ঞাপন অপ্রতুল নয়।

লাহোরে বাগান অসংখ্য—যুগে যুগে যে সব রাজা-বাদশা লাহোরে প্রভুত্ব করে গেছেন, এই সব বাগান তাঁদের সৌখীনতার চিহ্ন-স্বরূপ আজো পড়ে আছে। এগুলির মধ্যে হুজুরী-বাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রণজিৎ সিংহের বাগান ছিল এই হুজুরী বাগ। বিশুদ্ধ মোগল

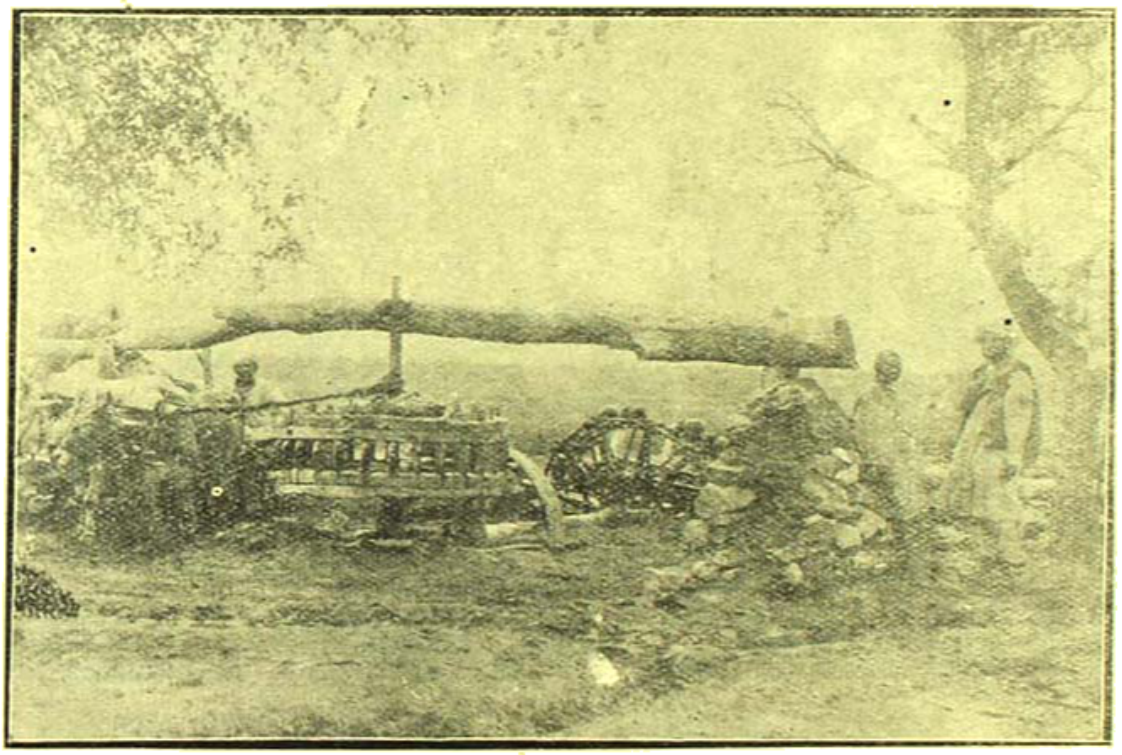

কূপ

আমরা শালিমার বাগ প্রভৃতি দেখে সহরের মধ্য দিয়ে ক্যান্টনমেন্টে চল্‌লুম। এই ক্যান্টনমেন্টের পুরানো নাম, মীয়ান্ মির। মীয়ান্ মির ছিলেন এক ফকির; জাহাঙ্গীর ও শাহ্ জাহান তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সমাধিও এখানে আছে। লাহোর ক্যান্টনমেন্ট প্রকাণ্ড সমাধি-ক্ষেত্রের উপর তৈরী হয়ে উঠেছে।

লাহোরে বহু লোকের বাস। সহর বেশ সমৃদ্ধ; কিন্তু মেথী-পল্লী অত্যন্ত নোংরা। সাইন-বোর্ডের এখানে ভারী

ভেঙ্গে তারি উপাদানে হুজুরী বাগের মাঝখানে শ্বেতপাথরের বারদ্বারী তৈরী হয়েছে। হুজুরী বাগের মধ্যে শ্বেত সমাধি-ভবন। এই ভবনে রণজিৎ সিং, খড়্গ সিং ও নেহাল সিংয়ের ভস্ম সমাহিত আছে। লাহোর দুর্গের ঠিক পশ্চিমে এই হুজুরী বাগ। সমাধি-ভবনের মাঝখানে এক প্রস্তর-বেদী। বেদীর মাঝখানে পাথরে খোদা মস্ত একটি পদ্ম,—এই পদ্মটির ঠিক নীচে মহারাজ রণজিৎ সিংয়ের ভস্মরাশি আছে; আর এই বড় পদ্মটির চারি ধারে

ছোট ছোট এগারোটি পাথরে-খোদা পদ্ম। চারটিতে রণজিতের চার মহারাণীর ভস্ম; বাকী সাতটী তাঁর সাত পরিচারিকার ভস্মাধার। এঁরা এগারো জনেই মহারাজের চিতায় দেহ বিসর্জ্জন দিয়ে সতী হয়েছিলেন।

লাহোর দুর্গের কারিগরিতে তিন রকম প্যাটার্ণ দেখা যায়। প্রথমে এ দুর্গ তৈরী হয় জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে; পরে শাহ জাহান এর নতুন ভাবে সংস্কার করেন, ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে। তার পর শিখের আমলে আর একবার এ দুর্গের সংস্কার হয়। শিখের হাতে শোভা শ্রী কিছুই ফোটেনি।

পাথর যেত। [illegible] এদিকে দৃষ্টি না পড়তো, তাহলে ভারতের এই সব ঐতিহাসিক মহাতীর্থ আজ কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হতো—তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও এত খোঁচা বিঁধতো যে সেগুলিকে চিনে নেবারও উপায় থাকতো না! এই লাহোর দুর্গের মধ্যে একটি প্রশস্ত হল্ আছে, তার নাম খিলাৎখানা; রণজিৎ সিংহের আমলে এখানে কাচারি বসতো। শীষমহলের যথেষ্ট দুর্দ্দশা হয়েছে শিখের হাতে।

মোনেরা মসজিদ এটি তৈরী করান ভিখারী খাঁ, ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে। লাহোরের শাসন-কর্ত্তা মীর মন্নুর বিধবা

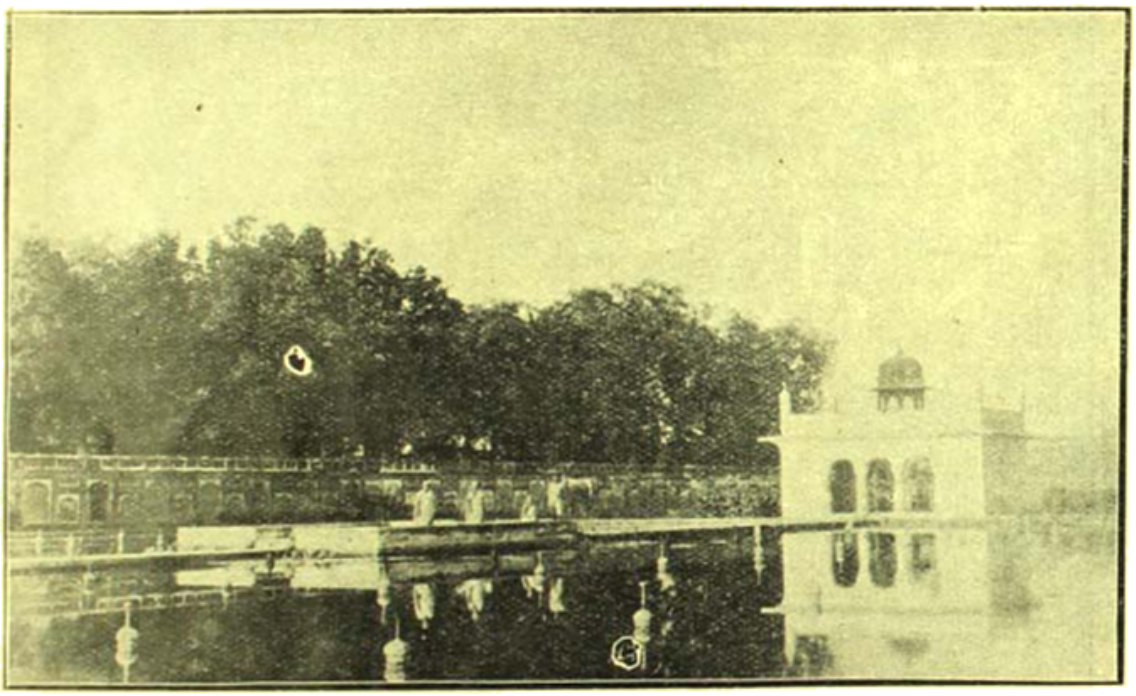

লাহোর—শালিমার বাগ (মাঝের তলা)

এই দুর্গের মধ্যে বাদশাহী কেতায় দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস মসজিদ প্রভৃতি সবই মজুত আছে। দেওয়ান-ই-আমের থামগুলির ভারী বাহার। রণজিৎ সিংহের রাজত্বের সময় এই দেওয়ান-ই-আমের নতুন নামকরণ হয়, তখ্ত্। দুর্গমধ্যে যে মোতি মসজিদ আছে, শিখেদের আমলে সেটি তোষাখানায় রূপান্তরিত হয়। তার পর লর্ড কার্জ্জন তাকে এই আধুনিক বর্ব্বর পাশ থেকে মুক্ত করেন। ঐতিহাসিক সৌধমালার সংস্কার ও সেগুলির গৌরব-সৌষ্ঠব-সংরক্ষণে লর্ড কার্জ্জনের দরদ আর সহানুভূতি বিশ্বের দরবারে শ্রদ্ধা

পত্নীর প্রিয়-পাত্র ছিলেন এই ভিখারী খাঁ। মীর মন্নুর মেজাজ ছিল ভারী উগ্র। প্রভুত্বের গর্ব্বে তিনি সর্ব্বদা মশগুল থাকতেন। মীর মন্নু একবার পত্নীর কাছে কি অপরাধ করেন—পত্নীর তা অসহ্য বোধ হওয়ায় তাঁর হুকুমে বাঁদীরা মীর মন্নুকে প্রহার করে মেরে ফেলে। মীর মন্নুর মৃত্যুর পর তাঁর এই বিধবা পত্নীই লাহোর শাসন করেন।

লাহোর দুর্গ আর হুজুরী বাগের কাছেই লাহোরের প্রসিদ্ধ বাদশাহী মসজিদ; লাল বেলে পাথরে তৈরী, মাথায় প্রকাণ্ড গম্বুজ। এ মসজিদ বাদশাহ ঔরংজীব

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তৈরী করান। মহারাজ রণজিৎ সিং এ মসজিদটিকে বারুদখানা-রূপে ব্যবহার করতেন।

এ-সব দেখে আমরা আনারকলিতে এলুম। আনারকলি প্রকাণ্ড মহল্লা।—এক তরুণী বাঁদী আকবরের মহালে ছিলেন; তাঁর রূপের জ্যোৎস্নায় শাহজাদা সেলিম অভিভূত হন। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে আকবরও স্নেহ-ভরে তাঁর নাম দেন আনারকলি! এই আনারকলি আর সেলিম, দুজনের মধ্যে গভীর প্রণয়-সঞ্চার হয়। সে প্রণয় কাহিনী যেমন মধুর, তেমনি করুণ! আনারকলির অপর নাম নাদিরা বেগম বা সরিফ-উন্নিসা। দিল্লীর ভবিষ্যৎ সম্রাট এক বাঁদীর পাণিগ্রহণ করবেন, বাদশা আকবরের তা সহ্য হলো না। বাদশার হুকুমে শাহজাদাকে ভালোবাসার স্পর্দ্ধা-হেতু বেচারী আনারকলিকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। আনারকলির উদ্যানে আনারকলির সমাধি আছে। সমাধির গায়ে ছোট্ট একটি ছত্র খোদা আছে—'মজনুন্ সেলিম্-ই-অকবর' অর্থাৎ আকবরের পুত্র প্রণয়-মুগ্ধ সেলিম। তাছাড়া দুটি কবিতার ছত্রও পার্শ্বে ছত্রকে লেখা আছে; তার অর্থ, প্রিয়ার ঐ মুখখানি যদি একবার দেখতে পেতুম, তাহলে জীবনের শেষক্ষণটুকু অবধি খোদার পায়ে প্রাণের ধন্যবাদ জানাতুম!

এই আনারকলির বাগানের কাছে আনারকলি মিউজিয়ম। ভারতে এত বড় মিউজিয়ম আর নেই। এখানে সেকালের বহু অমূল্য মণিমাণিক্য অলঙ্কার সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের পিতলের কামান এবং

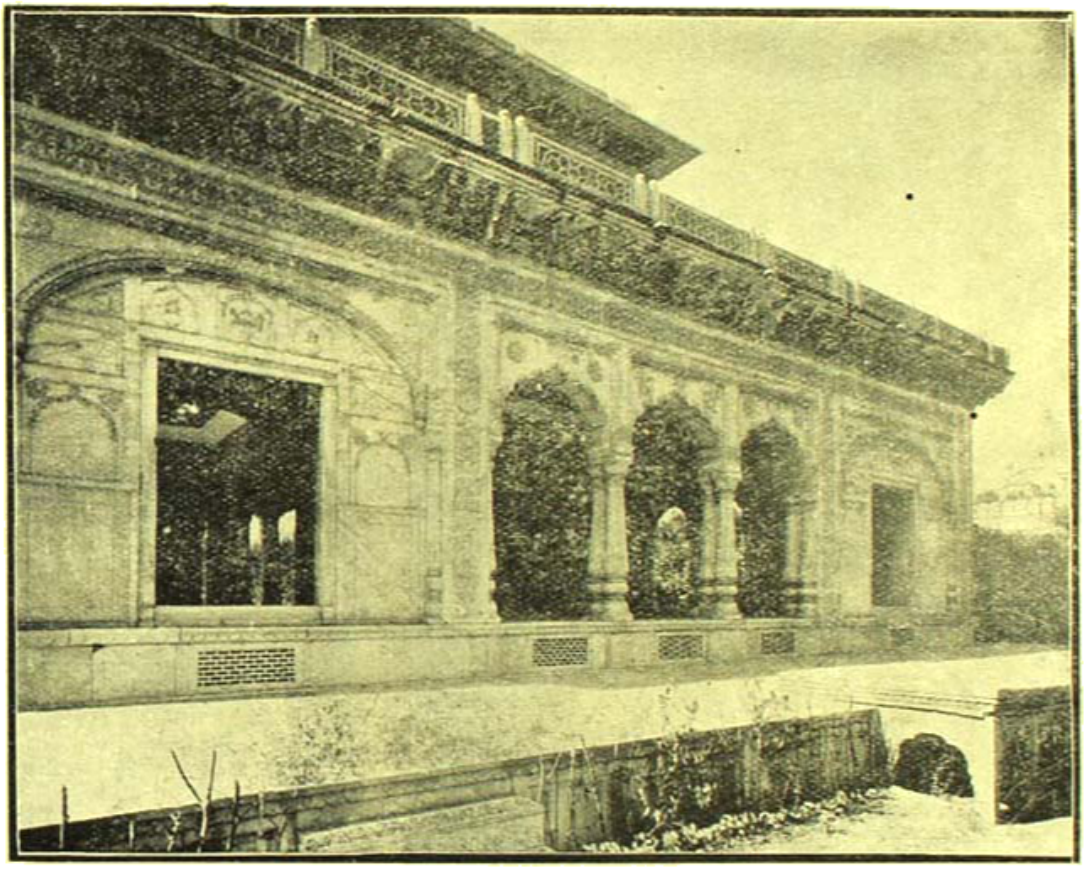

হজুরবাগ মর্ম্মর বারদোয়ারী

আরো বহু প্রাচীন বসন-ভূষণ, অস্ত্রশস্ত্রও এখানে সংরক্ষিত আছে। মিউজিয়মের সামনে পঞ্জাব য়ুনিভার্সিটি-গৃহ ও লাইব্রেরী। লাইব্রেরীর সামনে বিখ্যাত "জম্‌জমা গান্" (gun) বা 'বুঙ্গীওয়ালী তোপ্'। এই কামানের একটু ইতিহাস আছে। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আহমদ শাহ দুরানি এই কামান নিয়ে ভারত-আক্রমণে আসেন। পাণিপথ যুদ্ধে তিনি এই কামান ব্যবহার করেছিলেন। তার পর লাহোরেই এ কামান তিনি পরিত্যাগ করে যান। ১৮০২

খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং এ কামান দখল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই কামান অমৃতসরের ডুগীদের হাতে যায়। তা থেকেই এর নাম হয় ডুগীওয়ালা-তোপ। এ তোপের সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে, যে জাতি এই কামানের অধিকারী হবে, সেই জাতিই এই কামান-অধিকৃত ভূখণ্ডের মালিক হবে।

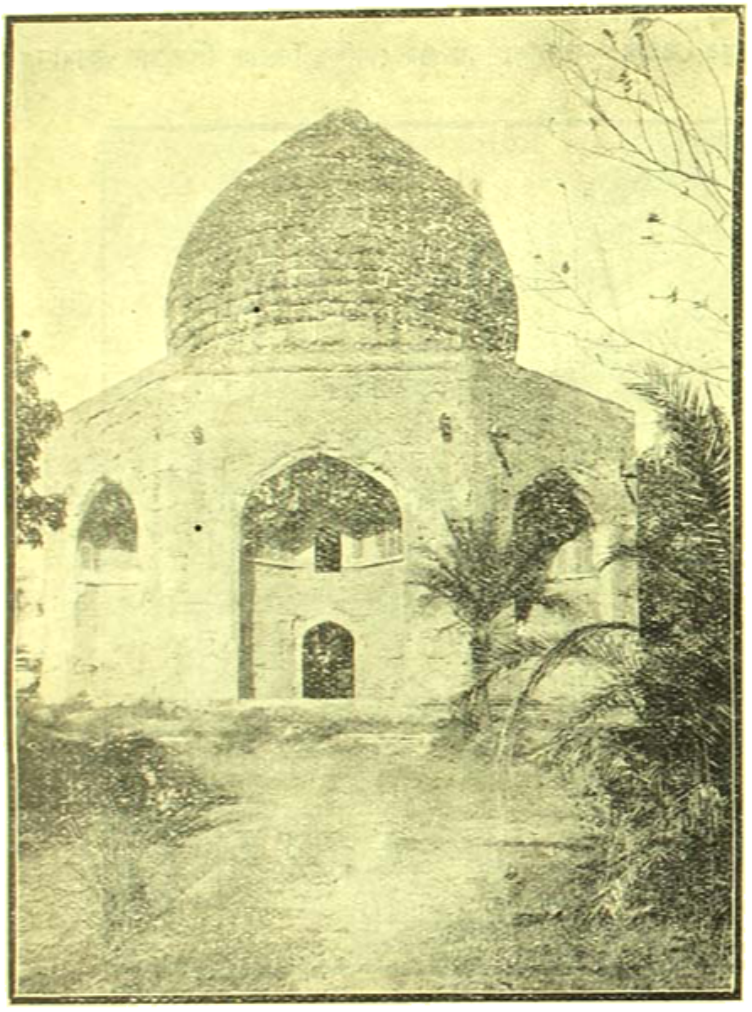

সমাধি—মিয়ানমীরের পথে

এই মহালে আনারকলির বন্ত বাজার। বাজারের পূর্বদিকে নীল-গম্বুজ,—হুমায়ুনের আমলের সাধু ফকির আবদুল রাজাকের সমাধি-মন্দির। বাজারে ঢুকে আমরা তরী-তরকারী কিনলুম—আঙুর, কমলা-লেবু, আপেল এ-সবও সংগ্রহ করা হলো—দাম খুব সস্তা। আনারকলি ঘুরে আমরা পেট্রোল সংগ্রহ করলুম,—১৩ টীন পেট্রোল আর ছ'টীন মোবিল অয়েল নেওয়া হলো। তারপর লাহোরের মাল্ ধরে একচক্র ঘোরা হলো। এখানকার লরেন্স গার্ডন্স্ দেখবার মত। এর উত্তরে গবর্ণমেণ্ট হাউস। গবর্ণমেণ্ট হাউসটি সমাধি-ক্ষেত্রের উপর নির্ম্মিত। সামনে মহম্মদ কাশেম খাঁর সমাধি-মন্দির—নাম কুস্তিওয়ালা গম্বুজ। কাশেম খাঁ ছিলেন বাদশাহ আকবরের এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা। ইনি সে-আমলের প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর পালোয়ান ছিলেন। লাহোরের এচিসনস্ চীফ কলেজও এই মালের ধারে। মাল্ ঘুরে অচিরে রাবী নদীর পুল পার হলুম। রাবীর পৌরাণিক নাম ইরাবতী। রাবীর তীব্র স্রোতের বেগে লাহোর একবার বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছলো—তাই ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বাঁধ বেঁধে দেওয়া হয়। সেই বাঁধ ছুঁয়ে রাবী এখন লাহোরের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে।

অচিরে চোখের সামনে ফুটে উঠলো বড় বড় গম্বুজ! বুঝলুম, ঐ শাহ-দারা,—বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও বিশ্ব-রূপসী নূরজাহানের সমাধি-মন্দির। রোদ্র তখন বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে! পঞ্জাবী রৌদ্র! তার উপর পথে কি ধূলা! ক্রমে সমাধি-ভবনের সামনে এসে পৌঁছলুম। পথের ডাহিনে বন্ত তোরণ—এ সমাধি-মন্দির আগ্রার ইৎমদ উদ্দৌলার ছাঁচে গড়া।

গ্রামের নামও হয়েছে শাহ-দারা। শাহ-দারার অর্থ আনন্দ-উদ্যান। রাবীর ওপারে লাহোর, আর এ-পারে লাহোর থেকে পাঁচ মাইল মাত্র দূরে শাহ-দারা। বন্ত বাগান—নানা ফল-ফুলের গাছ, ফুলের গাছে নানা রঙের ফুল ফুটে যেন রামধনুর বিচিত্র বাহার খুলে গেছে। বাগানটি তৈরী করান নূরজাহান বেগম; তৈরী করিয়ে প্রিয়তম স্বামী বাদশাহকে সেটি উপহার দেন। বাগানের অপর নাম দিলখুশা বাগ। এই দিলখুশা বাগেই জাহাঙ্গীর বাদশার সমাধি। তাঁর সাধ ছিল, দেহান্তে তাঁকে যেন কাশ্মীরের ভেরী-নাগে সমাহিত করা হয়। কিন্তু এ তো গরীব গৃহস্থের অন্তিম ইচ্ছা বা অনুরোধ নয় যে, পুত্র-পরিজন তা সর্ব্বাগ্রে পালন করবে! এ যে

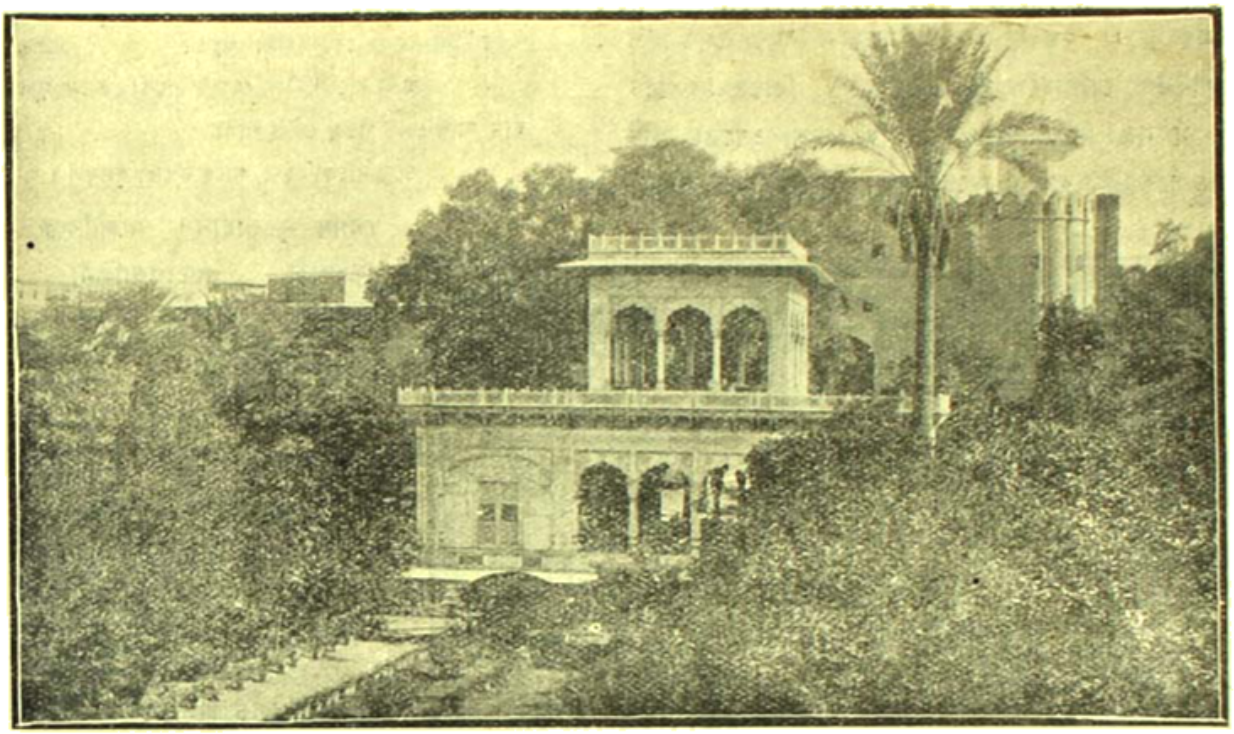

শাহ জাহান উদ্যান

জাহাঙ্গীরের সমাধি—শাহ-দারা

বাদশার ইচ্ছা, বাদশার সাধ—এ মেটানোর আগে কাম্বদা-কানুন, ইজ্জৎ-মান এ-সব আগে দেখা চাই! এই রঙীন ফুলের রাশ, লতরের রাশ, ফোয়ারার রাশ—এ সবের মাঝে মন কেমন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠ্‌লো। দিলখুশা বাগ এইখানেই

জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের প্রণয়ের শত লীলা উৎসারিত হয়েছিল একদিন! কত মান, কত অভিমান, অনুরাগের কত কাকলী এর চারিদিকে পুঞ্জিত রয়েছে! প্রিয়তমার ছোট একটু মানের কিঞ্চিৎ রাখতে গিয়ে বাদশা হয়তো কত বড় বড় যুদ্ধের আয়োজন করেছেন,—যে-যুদ্ধে কত রাজা,

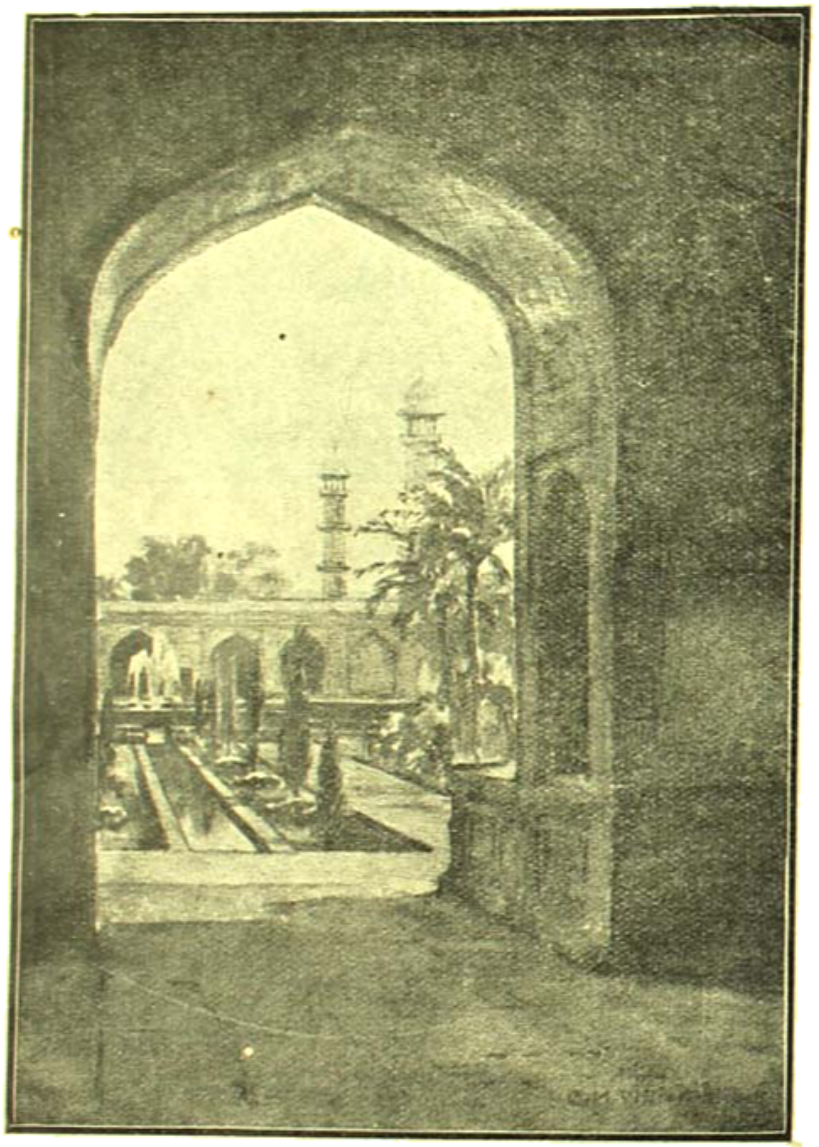

শাহ-বারা

কত গৃহ, কত বুক হয়তো শ্মশান হয়ে গেছে! এরি কাছাকাছি নূরজাহানের সমাধি। এ সমাধি-স্তূপের অবস্থা জীর্ণ। সমাধি-বক্ষে পারশ্য ভাষায় লেখা আছে—

বর মজারে মা গরিবা নেই চেরাগরে নেই গুলেস্ত।
নেই পরে পরওয়ানা সাজদ নেই সদাএ বুলবুলেস্ত॥

এর অর্থ—

অতি-দীন এই মোদের সমাধি' পরে
জ্বালে নাকো দীপ, ফোটে নাকো কোনো ফুল।
হায়, অতি-ছোট পতঙ্গ মেলি পাখা
ওড়ে নাকো হেথা, গাহে নাকো বুলবুল॥

বেগম নূরজাহান! অলৌকিক রূপের অধীশ্বরী, প্রতাপশালিনী, সমগ্র ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রী নূরজাহান···এই তাঁর শেষ শয্যা! একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ যাঁর অঙ্গুলির ইঙ্গিতের পানে কম্পিত বুকে চেয়ে থাকতো!···সেই চির-পুরাতন কথা মনে পড়লো,—

যা কুন্দ যেহনময়ৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং!

নূরজাহানের ফুলের সখ, বাগানের সখ ছিল, শুনেছি। তাছাড়া তাঁর একটা নূতন পরিচয়ও পেলুম, যা ছেলেবেলায় ইতিহাস পড়ে পাইনি, কলিকাতায় ষ্টেজে বাংলা নাটক দেখে পাইনি! সে পরিচয়—তিনি একজন অশ্বারোহী যোড়-সওয়ার ছিলেন।

কাবোরে ওয়াচোর খাঁর এক মসজিদ আছে—এর নক্সা-কাজের সঙ্গে তুলনা নেই। তাছাড়া শাহ আলমের উদ্যান —সবুজ বর্ণে গন্ধে-সুষমায় অনুপম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শাহ-দারা ছেড়ে আমরা রেলওয়ে-লাইন পার হয়ে সেই রৌদ্র-তপ্ত আকাশের তলে ধূলি-গর্জ্জর পথে সবেগে গাড়ী চালিয়ে দিলুম। খানিকটা পথ কোনো বৈচিত্র্যই পেলুম না। দুধারে প্রশস্ত মস্ত প্রান্তর, রৌদ্রের তেজে তার মাটী ফেটে চৌচির হয়ে রয়েছে! তারি মাঝে মাঝে দু'চারটে গাছের আড়ালে persian wheel ঘুরা, আর পথে এমন ধূলা উড়চে যে সামনে কিছুই দেখা যায় না! রৌদ্রের তেজ ক্রমে বাড়তে লাগলো! গাড়ীর হুড, সাইড স্ক্রীন্ দস্তরমত আঁটা থাকলেও রৌদ্রের

সে ভেজে বলসে ওঠবার জো! অলস গন্‌গনে আগুন থেকে যেমন হল্কা ওঠে, চুল্লীর প্রান্তরের গা বয়ে তেমনি যেন একটা গন্‌গনে হল্কা উঠছে! লাহোর থেকে ২৪ মাইল পরে শাধোকি, ৩০ মাইলে দীলানওয়ালা পার হলুম; ৪২ মাইলে পেলুম গুজরানওয়ালা। এই গুজরানওয়ালা হলো মহারাজা রণজিৎ সিংহের জন্মভূমি। তাঁর পিতা মোহন সিংহের সমাধি এখানে আছে। বাবা নানকের শৈশবের বাল-ভূমি নানকানা-সাহেবও এই গুজরানওয়ালার অতি সন্নিকটে। মোহন-সিংহের সমাধি-মন্দির খুব উঁচু, মাথায় বাদশা শাহ্ জাহানের রাজত্বের সময় ওয়াজির খাঁ এই নগরের পত্তন করেন। এখানে দুটী পুল পার হলুম—দুটীই চেনাবের পুল। চেনাবের পৌরাণিক নাম চন্দ্রভাগা। একটি পুলের নাম বল্‌কার ব্রিজ, অপরটির নাম চেনাব ব্রিজ। এ পুল দুটী হালে তৈরী হয়েছে। আগে ফেরির সাহায্যে এ নদী পার হতে হতো—নয় ট্রাকের বন্দোবস্ত করতে হতো। পুল হবার পর থেকে পথ খুব সুগম হয়েছে। এই ওয়াজিরাবাদ হলো জংসন-ষ্টেশন। এখান থেকে এক স্বতন্ত্র রেলোয়ে-লাইন শিয়ালকোট হয়ে কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী জম্মুতে

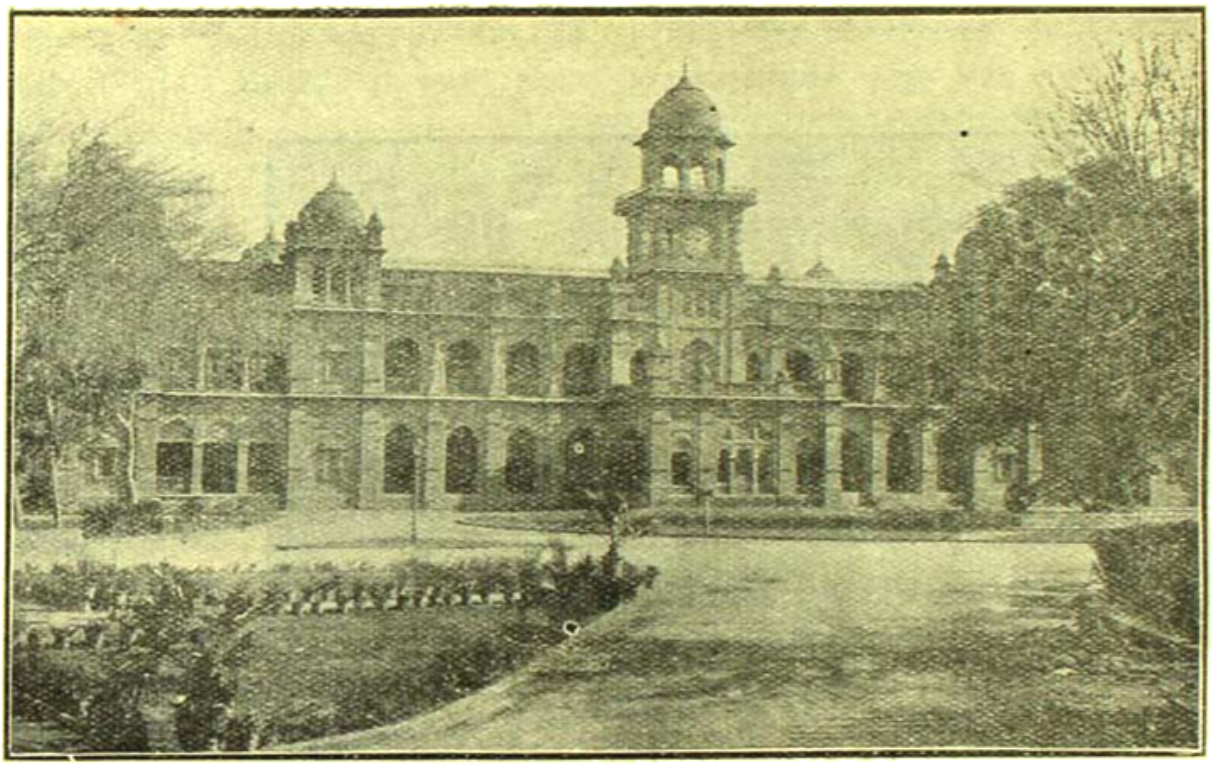

পঞ্জাব ইউনিভারসিটি

সোনালি কাজ-করা গম্বুজ। বাজারের কাছে সেই গৃহ, যে-গৃহে রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়—এখনও আছে। গুজরানওয়ালায় কমলা লেবুর বাগান অসংখ্য—এখানকার লেবু যেমন মিষ্ট, দরও তেমনি শস্তা। গুজরানওয়ালায় এখন লোহার সিন্দুকের বিস্তর কারখানা আছে—সে সব সিন্দুকের বেশ খ্যাতি আছে। দেশ-বিদেশে এই সব সিন্দুক প্রচুর পরিমাণে চালান হয়। তাছাড়া ক'বছর পূর্ব্বে এই গুজরান-ওয়ালায় যে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠে জালিয়ানওয়ালা-বাগের মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডিতে পরিণত হয়। তার ফলে পুরানো রেলওয়ে ষ্টেশনটি ধ্বংস পায়; এখন নতুন রেলওয়ে ষ্টেশন তৈরী হয়েছে। গুজরানওয়ালার ডাকবাংলো বেশ প্রশস্ত। আমরা ভেবেছিলুম, এখানে রান্নাবান্না স্নানাহার সেরে নেবো—কিন্তু ডাকবাংলো ভর্ত্তি রয়েছে। কাজেই সেই ধূ-ধূ রৌদ্রে প্রচণ্ড ধূলা খেতে খেতে এগিয়েই যেতে হলো। ৫৩ মাইলে পেলুম খরর—এখানকার ডাকবাংলাটি ছোট,—তাতেও লোক রয়েছে। থামা হলো না। আরো এগিয়ে এসে লাহোর থেকে ৬২ মাইল দূরে পেলুম ওয়াজিরাবাদ। এখানেও দেখি, ডাকবাংলো ভর্ত্তি।

গেছে। ওয়াজিরাবাদ থেকে মোটরে চড়েও অমৃৎ যাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত হদিশ পাইনি, তাছাড়া আমাদের ইচ্ছা ছিল, শ্রীনগর—কাজেই এ-পথে কাশ্মীর-প্রবেশের অভিপ্রায়ও আমাদের ছিল না। শিয়ালকোট ছিল শুধু রাজার রাজধানী। শিয়ালকোটের ক্রিকেট বাট, বল প্রভৃতি বিখ্যাত। ওয়াজিরাবাদের ডাকবাংলোয় আমাদের স্নান হলো না! এখানে পথে এক জায়গায় একটু ছায়া পেতে গাড়ী থামালুম। সেই সুযোগে এঞ্জিনে জল নেওয়া হলো। নিকটেই একটি persian wheel কূয়া; গৃহস্থেরা জল তুলছিল। তাদের অনুমতি নিয়ে জল আনানো হলো। তৃষ্ণায় সব ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। জল পান করে আবার রওনা হলুম। ওয়াজিরাবাদে এখন

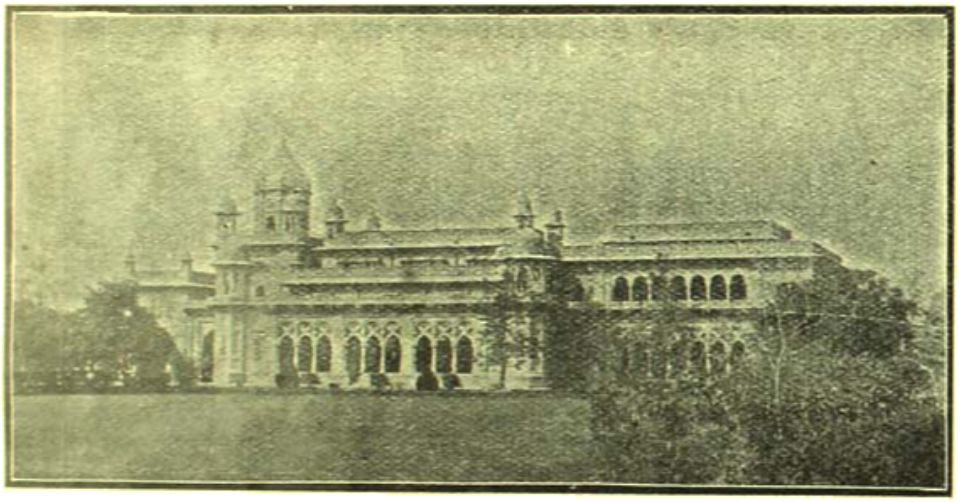

এঞ্জিন কলেজ

অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী হয়। পথের যেন আর শেষ নাই! এখন একটু বিশ্রাম পেলে বর্তে যাই, এমন অবস্থা! অন্তর্যামিনী ভাগ্যদেবীর উদ্দেশে প্রাণের মধ্য থেকে আকুল নিবেদন ফুটে উঠছিল—রবীন্দ্রনাথের সেই অমর ছত্রে—আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরি! সুন্দরীর মৌনতা ভাঙলো না! কাজেই আমরা নিরুদ্দেশ যাত্রায় আরো অগ্রসর হয়ে চললুম।

ওয়াজিরাবাদ থেকে আরো ৩৮ মাইল এসে পেলুম গুজরাট। দূর থেকে পথের ডানদিকে প্রকাণ্ড দুর্গের মত এক সৌধ দেখা যাচ্ছিল—তার আশে-পাশে বসতির চিহ্ন··· পাকা ঘর-বাড়ী। গুজরাটের সমৃদ্ধির পরিচয় সে ঘর-বাড়ীর আষ্টে পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে। এই গুজরাট ছিল পুরুরাজার রাজধানী। সেকন্দর শাহ পুরুরাজকে হারিয়েছিলেন; পরে চন্দ্রগুপ্ত গুর্জ্জর অধিকার করেন। বর্ত্তমান গুজরাট সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংস-স্তূপের উপর তৈরী হয়েছে। বর্ত্তমান গুজরাট গড়ে তোলেন শের শাহ ও বাদশাহ আকবর। যে দুর্গটি এখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি আকবরের তৈরী: এই গুজরাটের তিনি নাম দিয়েছিলেন, আকবরাবাদ। কিন্তু সে নাম টেঁকলো না—গুজরাট নামই বাহাল রয়ে গেছে। পরে শাহ জাহানের আমলে পীর শাহ দৌলা নামে এক মুসলমান ফকির গুজরাটে বেশ খাতির জমিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে গুজরাট সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই গুজরাটের কাছে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ হয়—সেই যুদ্ধে পঞ্জাবের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়! পীর শাহ দৌলার আমলের এক প্রকাণ্ড গভীর কূয়া, আর বাদশাহী হামাম এখানে দেখবার জিনিষ। এখানকার ডাক-বাংলোতেও ভিড় দেখে আমাদের নামা হলো না। আরো ক মাইল এগিয়ে মস্ত এক সহর পেলুম, সহরের নাম শুনলুম, লালা মুশা। পথের ধারে খোয়ান্ পাঠানের দল। ষ্টেশনের কাছে মস্ত বাজার—সেখানে খুব বেচাকেনা চলেছে—বিক্রেতা-ক্রেতা দু'দলই পাঠান। তাদের কাছে ডাকবাংলোর পাত্তা চাইতে তারা যে-ভাষায় জবাব দিলে তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝলুম না। তবে কোনো রকমে ইঙ্গিত বুঝে পথের ডান দিকে এক মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ী চালিয়ে গিয়ে ডাকবাংলোয় উঠলুম। লালা মুশা মস্ত জংসন। এখান থেকে রেলোয়ে-লাইন সোজা গেছে রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে পেশোয়ার। তাছাড়া বাঁয়ে আর একটা দীর্ঘ লাইন গেছে, চিলিয়ানওয়ালা হয়ে ডেরা ইসমাইল খাঁ, ডেরা গাজি খাঁ! আশে-পাশে প্রাচীন কালের বিস্তর ধ্বংস-স্তূপ দেখলুম। হিন্দু রাজা ছিলেন তেল ও বিল, এগুলি তাঁদের আমলের। এ রাজাদের নাম শুনিনি কখনো—তবে হিন্দু রাজা শুনে প্রাণটা আনন্দে ভরে

উঠলো। বাংলার ঐতিহাসিক মশায়রা এঁদের একটু পরিচয় সংগ্রহ করে দিন্ না! সে পরিচয় আর কোনো কাজে না লাগুক, আমাদের বাংলা নাট্যকারের দল বাংলার রঙ্গালয়ে তাঁদের খাড়া করে দিতে পারবেন তো!—ডলিম সিং আর বিক্রম সিং দেখে দেখে চোখ আর মন যে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে!

লালা মুশার ডাকবাংলোয় বন্দোবস্ত ভালো—টানাপাখা, চেয়ার, টেবিল, খাট, বাথরুম—সব আছে। তবে ভালো জলের অভাব! য-ভায়া মোটর নিয়ে রেলোয়ে-ষ্টেশনে গেলেন জলের জন্ত। আমরা কাছের Persian wheel থেকে জল আনিয়ে স্নান সেরে নিলুম। লাহোরের বাজার থেকে যে তরী-তরকারী সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা নিয়ে মহিলারা ষ্টোভ জেলে রান্না চড়িয়ে দিলেন। আহারাদি শেষ হতে বেলা পৌনে চারটে বাজলো। বাসন-কোসন বাজানো হলে আবার জিনিষ-পত্র গাড়ীতে তুলে রওনা হলুম। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঝিলাম ষ্টেশনে এসে পৌঁছলুম। ঝিলাম নদীর পুল পার হয়েই রেলোয়ে ষ্টেশন। ঝিলামের পৌরাণিক নাম বিতস্তা। প্রকাণ্ড নদী। নদীর বুকে বিস্তর মোটামোটা গাছের গুঁড়ি ভাসছে। ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে বড় বড় কাঠের গোলা। শুনলুম, এই সব কাঠ কাশ্মীর থেকে এই নদীর স্রোতে ভেসে আসছে। কাঠের ব্যবসায়ীরা ঐ সব কাঠ সেখানে কাটিয়ে নম্বর মেরে চিহ্নিত করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়, আর এখানে তাদের লোকজন কাঠের নম্বর দেখে গোলায় তোলে। রেলোয়ে ষ্টেশনে ঢুকে বরফ আর কলের জল পেলুম—পান করে আরাম হলো। রেলোয়ে-ষ্টেশনের কাছে বহু-প্রাচীন স্তম্ভের ধ্বংস-স্তূপ পড়ে আছে। এগুলি বৌদ্ধ যুগের। এখান থেকে বহু শিলা-স্তূপ তুলে লাহোর মিউজিয়মে রাখা হয়েছে। রেলোয়ে-এঞ্জিনিয়ারের কম্পাউণ্ডে এখনো একটি শিলাস্তম্ভ পড়ে আছে; সেটি শুনলুম, গ্রীক সম্রাট সেকন্দর শার আমলের। ঝিলাম ষ্টেশনের কাছেই একটি ছোট ঝরণা আছে—ঝরণাটির নাম কতস্। সতী-হারা শিবের শোকাশ্রু থেকে না কি কতসের উৎপত্তি! কতস্ আর পুষ্কর,—দুটিরই সৃষ্টি সতী-হারা শিবের চোখের জলে। কতস্ হিন্দুদের তীর্থ।

ঝিলাম ছাড়িয়ে পাঁচ ছ' মাইল এগুতেই পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করলুম। দুধারে উঁচু পাহাড়, মাঝে পথ। পাহাড়ের গা কি রুক্ষ—তৃণগুল্মের চিহ্নমাত্র নেই! পথও আঁকা-বাঁকা। কোথাও পথের ধারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রকাণ্ড গহ্বর—যেন গুনিয়াটাকেই গিলে খেতে পারে! ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! বিজন পথে পেশোয়ারী পথিকের দল কেউ পায় হেঁটে চলেছে—কেউ-বা ঘোড়ার পিঠে। সকলেই সশস্ত্র। পাঁচ-ছ'হাত লম্বা মোটা লাঠি আর টাঙ্গি-গোছ অস্ত্র! কি হিংস্র দৃষ্টি তাদের চোখে! গা ছম্‌ছম্ করতে লাগলো। পাহাড়ের বাঁকে কোথাও বা পেশোয়ারীরা দল বেঁধে আড্ডা জমিয়েছে। দু'পাশে পাহাড়ের মাঝে যে পথ, সেই পথের বহু উর্দ্ধে

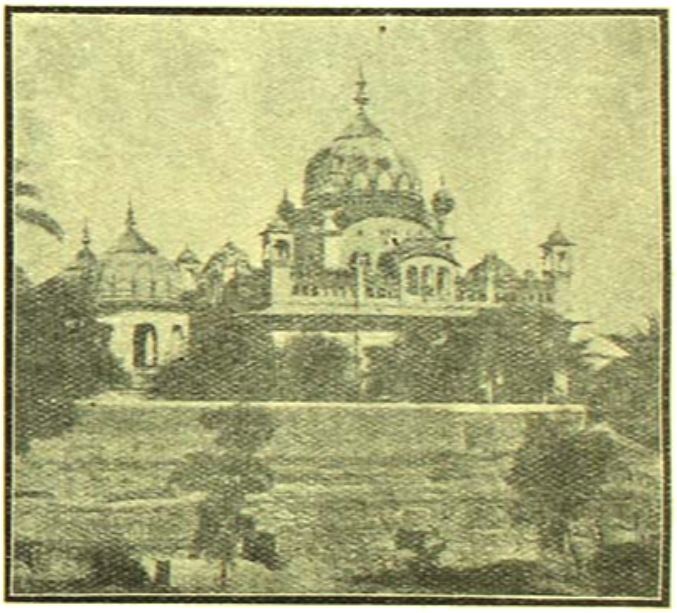

রণজিৎসিংহের সমাধি

পাহাড়ের বুকে পেশোয়ারী ছেলেমেয়েরা খেলা করছে—তাদের সামনে পাথরের রাশ! দুদিকের পাহাড় এমনভাবে পথের দু'পাশে খাড়া উঠেছে যে দেখলে হঠাৎ মনে হয়, যেন কে ফটক তৈরী করে রেখেছে! ঐ পেশোয়ারী ছেলেমেয়েরা যদি খেলাচ্ছলে খেয়াল-ভরে ক'খানা পাথর আমাদের গাড়ী লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে, কি পাহাড়ের খানিকটা ধ্বসে নীচে গড়িয়ে পড়ে তাহলেই গেছি! ভাগ্যে, তাদের এ খেয়াল হয়নি—তাই এ যাত্রা খুব রক্ষা পেয়ে গেছি!

পাহাড়ের এই ভীম-রুদ্র মূর্ত্তি দেখে গা যে ছম্‌ছম্ করেনি, এমন নয়। কে জানে, কোথায় কোন্ দুর্গম গিরিশৃঙ্গে

হয়তো বাধা পাবো! দু'একজন পথিককে প্রশ্ন করলুম, রাওয়ালপিণ্ডির পথ ভালো তো? তারা সে কথার জবাব না দিয়ে বললে,—দিথী সড়কী...ন ইধির, ন উধির! যাকে পথের সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, সে-ই ঐ এক জবাব দেয়, দিথী সড়কী! অগত্যা এই দিথী সড়কী ধরেই এগিয়ে চললুম। প্রায় বারো মাইল এসে পাহাড়ের গা ভেদ করে একটা দুর্গের মত কি বস্তু নজরে পড়লো। দুর্গ ই এটি।

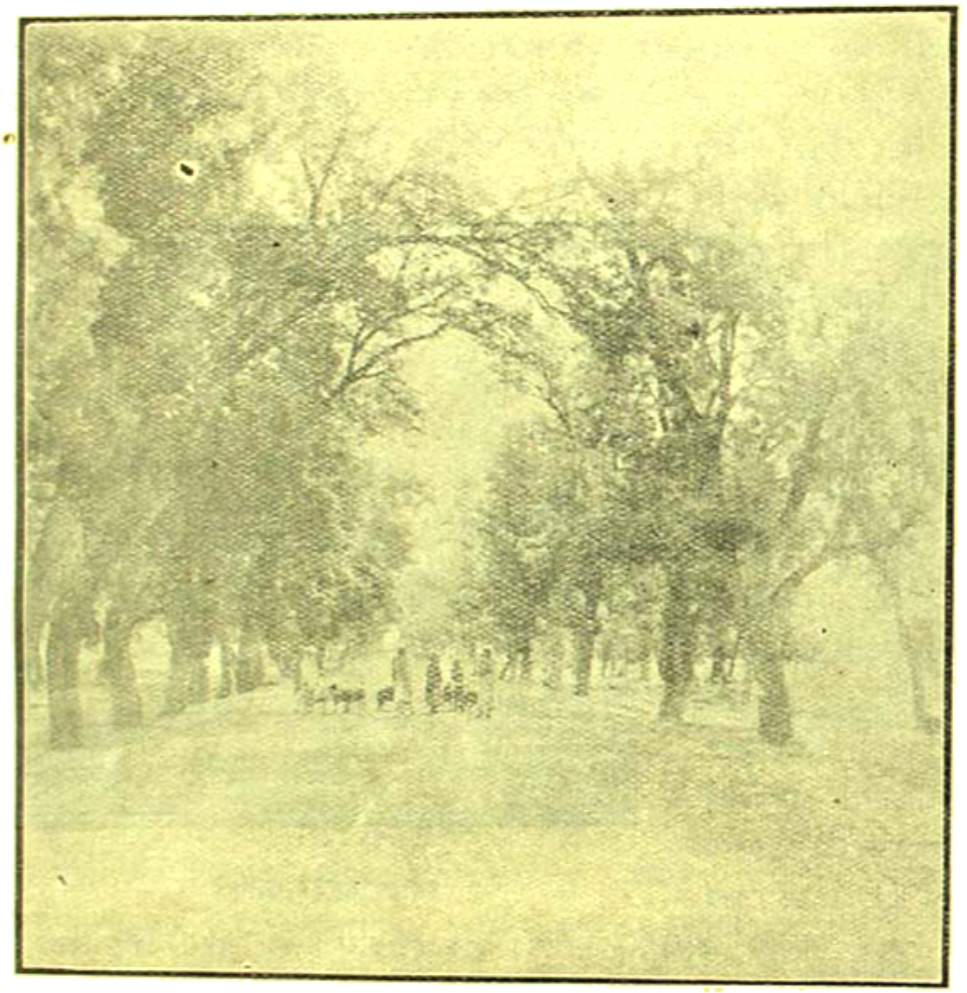

লালা মুশা ও রিলায় ষ্টেশনের মধ্যে—পথ

১৬৫২ খৃষ্টাব্দে শের-শাহ তৈরী করেন—এর নাম আটঘটা খাম্বা। দুর্গে আটষট্টি টাওয়ার আর বারোটি ফটক আছে। সীমান্ত-প্রদেশের দস্যুর অত্যাচার থেকে রাজ্য-রক্ষার জন্য এ দুর্গ তৈরী হয়। দুর্গটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল; পরে রাজা মানসিংহ একে আবার দুর্জ্জয় শক্তিতে গড়ে সুসংস্কৃত করে তোলেন।

ক্রমে বেলা পড়ে আসতে লাগলো। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ের পথে কখনো উঠতে উঠি, আবার কখনো ঐ পথ বয়েই নেমে পড়ি। থাকে-থাকে পাহাড় কত দূর জায়গা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে দৃশ্যে চমৎকারিত্ব যেমন, ভয়ের ছম্‌ছমানিও তেমনি। এই পাহাড়ের গায়ে একতলার পথে আমরা চলেছি, দোতলায় রেলোয়ে-লাইন—আবার একটু পরেই রেলোয়ে-লাইন এক-তলায়, আমরা দোতলায়! বিস্তর টনেলের মাথা বয়ে টনেল পার হলুম।—ছোট ব্র্যাকেটের মত পাহাড়ের গা বয়ে রেল-লাইন—খেলার ঘরের গাড়ীর মতই ট্রেণ চলেছে! উঁচু পাহাড়ের বুকে নির্জ্জনতার মাঝে দু-একখানি বাংলা ছবির মত। রিলায় থেকে ৩১ মাইল পরে সোহাওয়া, এখান থেকে উত্তর-সীমান্তের বিখ্যাত পল্ট সেক্স দেখা যায়। ভয়ঙ্কর রুদ্র সে দৃশ্য! এখানে এক কাণ্ড ঘটলো।

পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য তখন সরে পড়ার আগে লুকোচুরি সুরু করেছে। ড্রাইভারকে সরিয়ে ভায়া এ পথে মোটর চালিয়ে আসছিলেন। ডিহিরি থেকে তিনিই মোটর চালিয়েছেন; দু-চার বার মাত্র চুপচাপ বসেছিলেন। লালা মুশা থেকে তিনিই এ পথে চালক। খুব জোরে যাওয়া হচ্ছিল, কারণ, রাত্রি আটটা ন'টা নাগাদ রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছুনো চাই। হঠাৎ এই পার্ব্বত্য পথে আমাদের গতি অবরোধ করে দাঁড়ালো দুই ভীম-দর্শন পেশোয়ারী। আকারেই তারা শুধু ভীম-দর্শন ছিল না, তাদের দুজনের হাতের লাঠি লম্বে প্রায় সাত-আট হাত। ব্যাপার দেখে

আমরা একটু সন্ত্রস্ত হলুম। ড—গাড়ী থামিয়ে ফেললেন। প্রশ্ন করলুম—কেয়া মাংতা? বিশুদ্ধ পেশোয়ারীতে তারা উত্তর যা জানিয়ে দিলে, তার অর্থ—তারা দু'জনে বিশ মাইল দূরে যেতে চায়,—আমাদের গাড়িতে তাদের আমরা উঠিয়ে নেবো, এই তারা চায়। গাড়ী তখন প্রায় থামো-থামো দেখে তারা পথ থেকে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। ড—অমনি তাদের পাশ কাটিয়ে চকিতে গাড়ী ছুটিয়ে দিলে। খানিক গিয়ে ভয় হলো, যদি পিছনের গাড়ীতে লাঠি চালায়। পিছন-পানে তাকিয়ে দেখি, ২৩৩৭ নম্বর গাড়ীর ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করে তারা সে গাড়ী থামিয়েছে। আমরা হর্ণ দিয়ে তখনি সঙ্কেত করলুম, চালাও! ড্রাইভার সে গাড়ী সজোরে চালিয়ে দিতে পেশোয়ারী দুজন গাড়ীর পিছনে লাঠি তুলে একটু আক্রমণোদ্যত ভাবেই তাড়া করলে; কিন্তু মোটরের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন! দুখানি গাড়ী তখন তীর বেগে ছুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহুদূর এসে গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলুম—ওরা কি বলছিল? সে জবাব দিলে,—ওরা বলছিল, দশটো রূপেয়া দেও, সাব্ লোক বোলা হ্যায়। সর্ব্বনাশ! রূপেয়া! পেশোয়ারী দুটো ভারী ওস্তাদ তো!

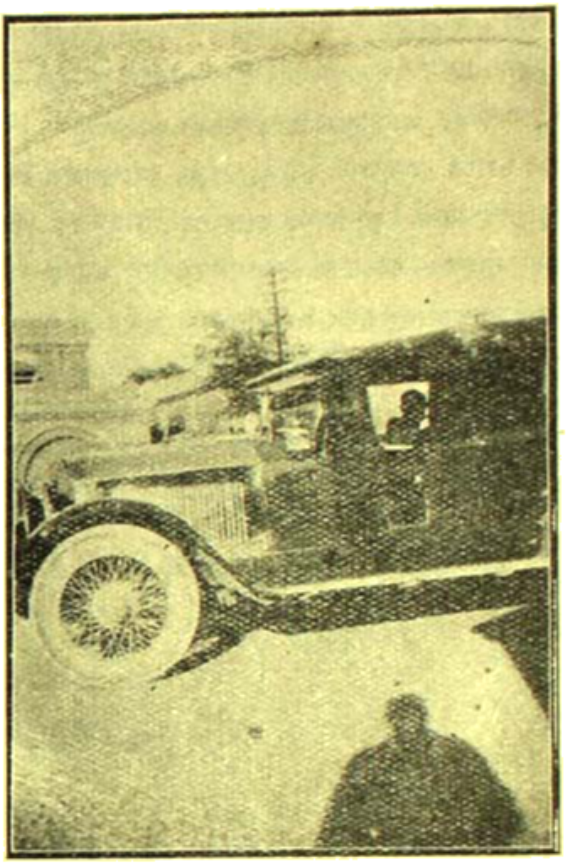

কিলাম—বেল ওয়ে ষ্টেশনে

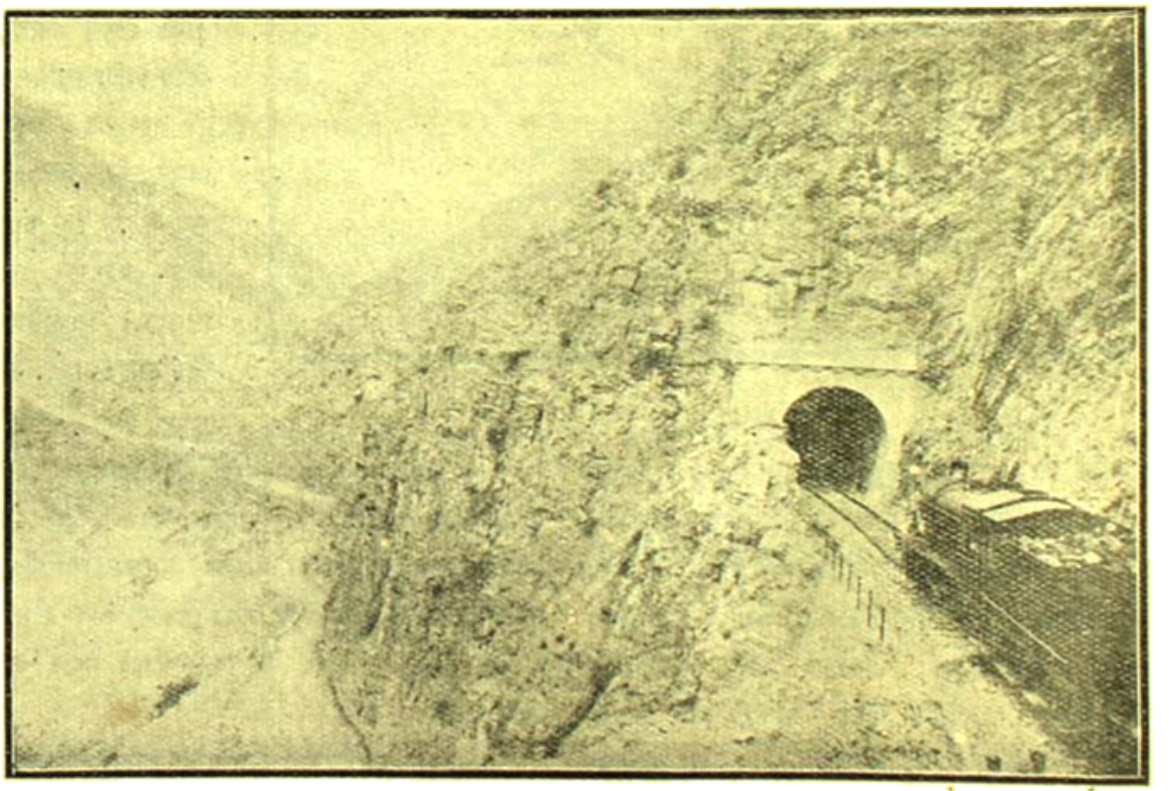

দোহাওয়ার পর ওজর খাঁর আগে পার্ব্বত্য-পথ—দোতলায় রেল-লাইন, এক তালায় পথ

সৌম্র ক্রমে চট্ করে মিলিয়ে গেল এবং সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া সেই দুর্গম পথকে আরো ভীষণ-মূর্ত্তিতে ভরিয়ে তুললে! লাইট জ্বালিয়ে এসে পাহাড় ছাড়িয়ে সমতল-ভূমি পেলুম। পথের দুধারে লোকের বসতি, পথে লোকজনও অনেক; কিন্তু পেশোয়ারী মুসলমানই প্রায় সব; তা'দিকে বেলোচে লাইন দেখলুম—এবং ক্রমে রেলোয়ে ষ্টেশনও নজরে পড়লো।

প্রশ্ন করে জানলুম, এ জায়গার নাম গুজর খাঁ। এখানে ডাকবাংলো আছে, খাবার-দাবার ভালো না মিললেও

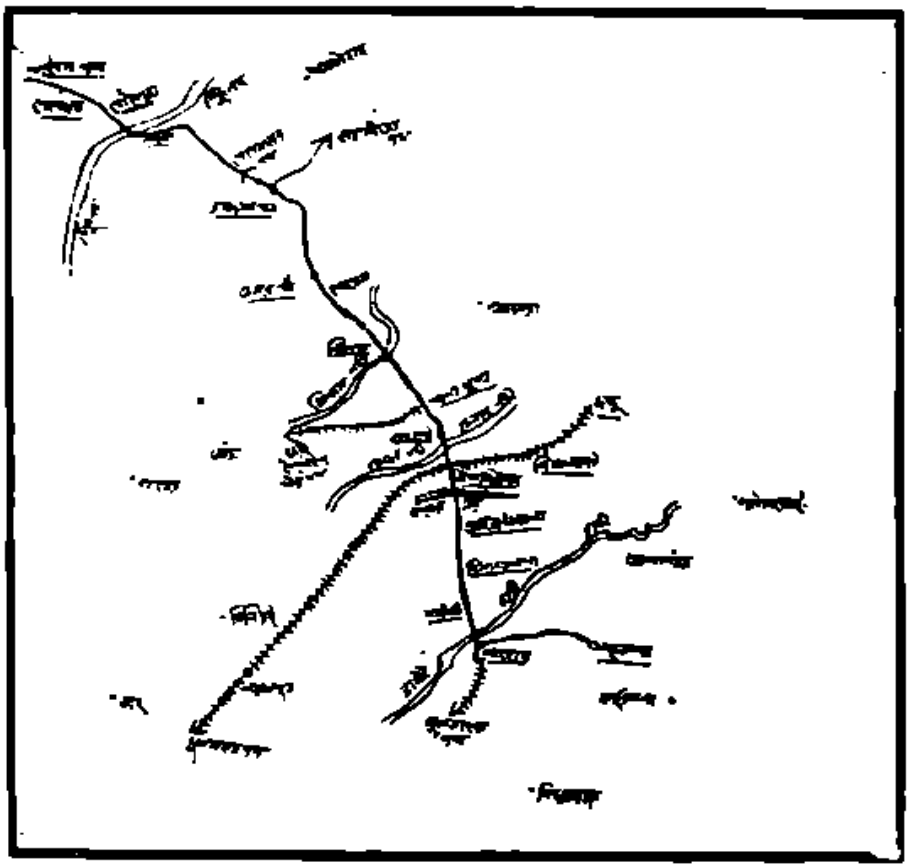

ম্যাপ

থাক!—এগুলুম। প্রায় চার-পাঁচ মাইল এসে পিছনে চেয়ে দেখি, ৯৩৩৭ নং গাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই! পথের দু'ধারে ধূ-ধূ মাঠ! বন্দুক-রিভলভার সঙ্গে ছিল; সেগুলো উদ্যত রেখে পিছনের গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট কেটে গেল—তবু সে-গাড়ীর দেখা নেই! ভাবনা হলো। অগত্যা ফিরে গুজর খাঁ রেলষ্টেশনের কাছাকাছি এসে দেখি, ৯৩৩৭ নং গাড়ীর টায়ার ফেটেছে! অন্য টায়ার পরানো হলে, সকলে স্থির করলুম, রাত্রে নির্জ্জন পথে যদি আবার এমনি দুর্যোগ ঘটে! অজানা ভুঁই! এগিয়ে কাজ নেই! তার চেয়ে গুজর খাঁর ডাক-বাংলাতেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্! তাই হলো। ডাকবাংলোয় এলুম। রাত তখন আটটা। লোকজন স্নানের জল তুলে দিলে। স্নান সেরে আমরা কিছু আহার না করেই বন্দুক ঘাড়া রেখে একটু সজাগ হয়ে রাত্রি কাটালুম।

পরদিন ভোর হতে গুজর খাঁ ত্যাগ করলুম। পথ ভালো; তবে খানিক এসে বন্দুকের মত ঘুরে পড়েচে। একদিককার উঁচু সীমানার গাড়ী এলে দেখি, দূরে এক নগরের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—পেট্রোলের ট্যাঙ্ক, জলের প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক, অসংখ্য চিমনী, বাড়ী, ঘর—ছবির মত যেন আকাশের গায়ে আঁকা। বুঝলুম, ঐ রাওয়ালপিণ্ডি! পথের মাইল-ষ্টোন্ থেকে বুঝলুম, সহর এখনো ২০।২৫ মাইল দূরে! আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলুম—পথের প্রায় প্রান্ত-সীমায় এসে পৌঁছে গেছি!···

১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা ঠিক ৭টায় রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রবেশ করলুম। রাওয়ালপিণ্ডি মস্ত ক্যান্টনমেণ্ট। পথ-ঘাট

রুক, ছাগ-মাংস আর দুধ মেলে প্রচুর। এখান থেকে রাওয়াল-পিণ্ডি, শুনলুম, প্রায় ৩০ মাইল। এখন সমস্যা হলো—কি করা যায়? সামনে অন্ধকার রাত্রি, কে জানে, আবার অমনি দুর্গম পার্ব্বত্য পথ যদি মেলে! এধারে ডাকাতির ভয়ও আছে, শুনেছিলুম। এগুবো, না, এইখানেই আস্তানা পাতবো! গুজর খাঁর দু'চার জন লোক বললে, পথ খুব ভালো। তখন স্থির হলো, এই নির্জ্জন স্থানে ডাকবাংলোয় না থেকে রাওয়ালপিণ্ডিতেই যাওয়া

দিব্যি ঝকঝক্ ঝক্‌ঝক্ করছে—পথের দুধারে কেয়ারি-করা ফুলের গাছ, নানা রঙের সীজন্ ফ্লাওয়ারে গাছগুলি আলো হয়ে রয়েছে! বড় বড় দোকান—এক ধারে মাঠে কিং কার্নিভালের মত তাঁবু পড়েছে। নানা রঙের নিশান টাঙানো! আমরা সোজা এলুম একেবারে রেলোয়ে-ষ্টেশনে। আগে থেকেই এখানকার এন্ ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির কাছে পরিচয়-পত্র পাঠানো হয়েছিল। এঁরা হলেন নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলোয়ের outer agents—কাশ্মীরের মাল-পত্র এঁরাই বহন করার অধিকারী। পোষ্টাল পার্শেল ছাড়া যত কিছু রেলোয়ে-পার্শেল এঁরাই বহন করেন! রেলোয়ে-ষ্টেশনে এসে এঁদের অফিসে গিয়ে পরিচয় দেবামাত্র হেড্ অফিস থেকে এক কর্ম্মচারী এলেন। তিনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ছেলেরা পূর্ব্বদিন এসে পৌঁচেছে, শুনলুম।

অচিরে তাঁদের guest-houseএ গিয়ে উঠলুম। পোষ্ট অফিসের কাছে বড় রাস্তার উপর মস্ত দোতলা বাড়ী, চমৎকার সজ্জিত। আমাদের যে তাঁরা গোটা বাড়ীটাই ছেড়ে দিলেন, তা নয়, ভৃত্য-পরিজন দিলেন, আর খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত যা করে দিলেন, একেবারে চূড়ান্ত!

(ক্রমশঃ)

নিদাঘ

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

(ঋতুসংহার অবলম্বনে)

দিনকর-কর উষ্ণ প্রখর রত চরাচর দাহনে
তড়াগ বাপীর ক্ষীয়মান নীর ঘনঘন অবগাহনে।
গত তাপ খেদ চারু দিনান্ত,
মন্মথ বেগ আজি প্রশান্ত,
সুন্দর শুচি চন্দ্র-মরীচি স্পৃহনীয় রুচি নয়নে,
এসেছে নিদাঘ ভূধর গগনে গহনে।

এবে ঈপ্সিত পুষ্পামোদিত বিধুমণ্ডিত যামিনী,
ভাজি পালঙ্ক শিলাকুট্টিমে তন্দ্রিতা যত কামিনী।
আজি পরিহৃত ভূষাকাঞ্চন,
বাঞ্ছিত শীত মণি চন্দন,
ঘনঘন ধারাযন্ত্র ধারায় স্নান করে পুরভামিনী,
বৃষ্টি ধারায় যেন বা চকিত দামিনী।

নাগরনিকর আজি ঘর্ম্মর-ঘর্ম্মান্তর ভবনে,
উশীর অগুরু ধূপ গুগ্‌গুলু গন্ধমোদিত পবনে,
পান করে সুখে সুন্দরী বধূ-
বদনোচ্ছ্বাসে বিগলিত মধু,
তানলয়যুত তন্ত্রীসনাথ প্রেম-সঙ্গীত শ্রবণে
করে সার্থক নিশীথে মধুর স্বপনে।

শিথিলমেখলা নিতম্বিনীরা, স্বচ্ছ পেশল দুকূলে,
মলয়জ পরিমল বলিত ভুজবল্লরী দুকূলে,
হারমণ্ডিত পীবর উরসে,
মান-সুশীতল অঙ্গপরশে,
কেশ-কলাপের সুরভি বীজনে, চম্পা শিরীষ বকুলে,
করে নন্দিত ক্লান্ত নিদাঘ চটুলে।

তুলি মঞ্জীর হংসকাকলী লাক্ষা-রাতুল চরণে,
কোকনদময় সরোবর-স্মৃতি জাগায় শবদে বরণে,
স্বেদ-নিষিক্ত দুকূলে প্রকটে,
স্নাত লাবণ্য নারী-তনুতটে,
দুলে পাণিপুটে চন্দন শীত ব্যজনী ঘর্ম্ম-হরণে,
সুপ্ত কামনা-বহ্নি জাগায় স্মরণে।

সৌধের কূটে চন্দ্রশালায় নাগরীরা যাপে এ রাতি
নেহারি' তাদের নগ্নসুষমা, নেহারি মুখের শ্রীজাতি,
গণি' আপন চন্দ্রিকারাজি,
লজ্জাপাণ্ডু চন্দ্রমা আজি।
সৌধের শশী সুধাময় শশী দুই-ই যাহার অরাতি
সে প্রবাসী হায় জাগে বিনিদ্র এ রাতি।

সাগর-স্বপ্ন

শ্রীরাধারাণী দত্ত

এক

স্বর্গদ্বারের শেষ সীমানায় যেখানে শুধু কাঁটাবন আর জঙ্গল ভিন্ন লোকালয় দেখা যায় না, সমুদ্রতীরের উঁচু পাড়ে মস্ত বড় একটা বালির ঢিবির উপরে পা ঝুলিয়ে বসে নিবিষ্টচিত্তে নীলরংয়ের তুলিটা কাগজের উপর বুলিয়ে বুলিয়ে ছবি আঁকছিল মুকুর। অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করে তুলি টানবার পর মাঝে মাঝে এক একবার বিভল স্বপ্ন-উদাস দৃষ্টি মেলে সমুখের অন্তহীন সুনীল জলরাশির উপরে মৃদু-ঘনায়মান সাগর-সন্ধ্যার গভীর শান্ত-স্নিগ্ধ শ্রীর দিকে চেয়ে দেখছিল।

স্বচ্ছ ঘন-নীল আকাশ ও সান্ধ্য সমুদ্র মুকুরের সাগরেরই মতো অতল-গভীর কালো আঁখিতারা দুটির উপর নীলের নানান বুলিয়ে সাগরতলের অজানা কোন্ নীল পুরীর সুনীল-স্বপ্ন বুটিয়ে তুলছিল!

দক্ষিণ হাতখানি তার ঢেউয়েরই মতো তালে তালে বিসর্পিত গতিতে দুলছিল এবং আপনা আপনি তুলি টেনে যাচ্ছিল ক্রমাগত, নীলের পরে নীলেরই বৈচিত্র্য ফুটিয়ে,—অনন্ত সাগরের সাথে উদার-বোধের ঘন আলিঙ্গনের অসীম প্রতিধ্বনি সীমার মাঝে ছোট্ট করে সুপরিস্ফুট ক'রবার প্রয়াসে। চিত্রখানির বিষয় হ'চ্ছে "সাগরের বুকে সন্ধ্যা।"

গম্ভীর কল্লোল-ধ্বনি-পূর্ণ নির্জন সাগর-তটের স্তব্ধতা হঠাৎ ভঙ্গ হয়ে উঠল—কতকগুলি তরুণী-কণ্ঠের কলহাস্য-চীৎকারে। চকিত মুকুর তুলি টানা বন্ধ করে মুখ তুলে চাইলে। নীচে সমুদ্র-বেলায় সিক্ত বালুর উপর দিয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণ-বেশে সুসজ্জিতা কতকগুলি নারী দলবদ্ধা হয়ে এগিয়ে আসছেন! সমুদ্রের চপল ঢেউগুলি বারে বারে তাঁদের পদ-চুম্বন করেই ক্ষান্ত হয়নি, যথেষ্ট সাবধানতা ও দ্রুতপদে পলায়ন সত্ত্বেও তারা দুরন্ত শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে ছুটে এসে খলখলহাস্যে তাঁদের পেটিকোটের লেস্ ও সাড়ীর প্রান্ত ভিজিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে! সমবেত যুবতী ও তরুণী-কণ্ঠের কলহাস্য-চীৎকারে জনহীন সাগরতট তাই হঠাৎ মুখরিত হয়ে উঠেছে।

মুকুর চেয়ে দেখল, তাদের দলের মধ্যে একটি কিশোর বালক ও একটি ফ্রক-পরা দশ-এগার বৎসর বয়সের বালিকা ছাড়া বাকী কয়জনই যুবতী এবং বিবাহিতা। কেবল দু'টিমাত্র তরুণী সেই দলে আছেন, উভয়েই অনবগুণ্ঠনা কুমারী-বেশধারিণী।

ঊর্দ্ধে দৃষ্টি না পড়ায় উঁচুপাড়ে ঢিবির উপর চিত্রাঙ্কনরত মুকুরকে এতক্ষণ তাঁরা দেখতে পাননি। এবার তার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় সকলেই একটু সন্ত্রস্তা হয়ে কোমল কণ্ঠের উচ্চ হাস্য-পরিহাস সহসা সংযত করে মৃদুগুঞ্জনে গল্প ক'রতে ক'রতে এবং কেউ কেউ বা অঞ্চল-রত মুকুরের প্রতি কৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে-করতে বেলিক দিয়ে আসছিলেন আবার সেই মুখেই ফিরে চলে গেলেন।

মুকুর এতক্ষণ নতমুখে নিজের কাজ করে যাচ্ছিল। একবার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় এবার তুলির টানে সুনীল জলের উপর সান্ধ্যাকাশ ও গোধূলির রাঙা আলো-ছায়ার রঙ ঠিক যেন মনের মত হয়ে ফুটছিল না! বিরক্ত মুকুর ভ্রূকুঞ্চিত করে তুলিকা নামিয়ে রাখল। সামনের দিকে চেয়ে দেখল যুবতী ও তরুণীর দল অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন, তবে তাঁদের গতিভঙ্গী ও পরিচ্ছদ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এতগুলি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ের গতিভঙ্গী মুকুরের আর্টিষ্ট-দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রল। সকলের চেয়ে তার বেশভূষা ও চলন-ভঙ্গিমার যেন বেশ একটু স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল।

সবারই পরিধানে মূল্যবান রঙিন চাকাই কিম্বা টাঙ্গাইল সাড়ী। চাকাই সাড়ীর ঝিল্‌মিলে বুটী ও টাঙ্গাইল সাড়ীর চওড়া জরীপাড়ের ঝক্‌ঝকে বাহারে জুহুরতীর আলো করে চলেছেন তাঁরা। শুধু সবার শেষে হাঁটছে যে মেয়েটি, তার

পরিধানে ফিকে চাঁপাফুল রংয়ের খদ্দর শাড়ী। লাল ও গোলাপী ফুল এবং সবুজ-লতাপাতা-আঁকা বিচিত্র সুন্দর পাড়ের আঁচলখানি ঘুরিয়ে পিঠের উপর সুবিন্যস্ত ভাবে ফেলে কাঁধের উপরের অঙ্গলাংশ কুঞ্চিত করে ব্লাউজের সঙ্গে একটা দেশী আইভরী ব্রোচ্ দিয়ে 'পিন্' করা। সেই রকমেরই চাঁপারংখদ্দরের লতা-পুষ্প খচিত পাড়, ঢিলা হাফ-হাতা ব্লাউজটি কনুইয়ের উপর পর্য্যন্ত ঢেকে রয়েছে। সন্ধ্যার ম্লান আলোতেও দেখা যাচ্ছিল তার ছোট্ট পা দুখানির তলা আল্‌তা দিয়ে লাল টুক্‌টুকে রঙানো।

কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা অন্ধকার সাগর-বক্ষে কোন্ এক অজানা ভীতিময় কালো পর্দ্দা টেনে আনছিল ধীরে ধীরে, আর আকাশে তারাফুলগুলি বড় বড় হীরার মত ঝক্ ঝক্ করে একটির পর একটি জ্বলে উঠ্‌ছিল। দূর চক্রবাল-সীমায় যেখানে সাগর ও গগন গভীর আলিঙ্গনে মিলিত হয়েছে, সেই দিককার তারাগুলিকে মনে হচ্ছিল তা'রা যেন সমুদ্রের জলের ভিতর থেকে কটি একটি করে ফুটে উঠ্‌চে!—যেন সাগরবক্ষে দিগ্‌বধূরা অসংখ্য প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকার সাগর-বুকে উঁচু উঁচু ঢেউগুলি ঘূর্ণায়মান হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময়ে তাদের সাদা ফেণাগুলি ফস্‌ফরাস মেখে দীপ্ত হ'য়ে এগিয়ে আস্‌তে লাগল।

মুকুর তার 'পাতৃতাড়ি' গুটিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে তট-ভূমিতে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে চল্‌ল বাড়ীর উদ্দেশে। অন্ধকারে ঢেউগুলি মাঝে মাঝে তার নগ্ন পা' দুখানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে যেতে লাগল, আর তার পাদস্পর্শে সিক্ত বালি-গুলি অন্ধকারে জোনাকীর মত ঝিক্‌মিক্ করে আলোকিত হয়ে ফুলঝুরির মত হেসে উঠ্‌তে লাগল।

দুই

"হুরো—সমুদ্র, হু—রো—সমুদ্র, বেরে গেলে—ছি—ছি—"

"রীতি, তুই ভারী বীর হয়েছিস্ না? সরে আয় বল্‌চি শীগ্‌গির—"

"ইঃ, ভয় কিসের? এই দেখ না, ঐ যে বড় ঢেউটা আস্‌চে, ওর উপরে আমি লাফিয়ে উঠ্‌বো।"

"রীতি, অত এগিয়ে যাস্‌নে বল্‌চি! সরে আয় শীগ্‌গির, —আর তোকে কোনও দিন সমুদ্রে নাইতে—" কথা সমাপ্ত হ'তে না হ'তেই ভীষণ গর্জ্জনে প্রকাণ্ড ঢেউ এসে সবাইকে বিপর্য্যস্ত ও ওলোট পালট করে বালিতে ফেলে দিয়ে, এবং বিশেষ ভাবে রীতিকেই একটু বেশী জব্দ করে দিয়ে চলে গেল। তখন কাছা খোটাখোটা প্রৌঢ়া একটি নারী হাঁকাতে হাঁফাতে উঠে কাপড় চোপড় ঠিক করতে করতে বকতে সুরু ক'রলেন,—"একরত্তি মেয়ের ভারী মর্দ্দানি!! সমুদ্রকে 'হুরো' বল্লে ত' সমুদ্র রেগে যাবেই,—এ' একেবারে ধরা কথা! রীতি বেজায় বাড়াবাড়ি সুরু করেছে, কাল থেকে ওর সমুদ্রে চান্ করা বন্ধ কোরবো। ওকে বাড়ীতে রেখে আসবো—" একাদশবর্ষীয়া রীতি তখন 'নেকার-বেকারে'র উপর রঙীন পেয়ারী ডুরে শাড়ীখানি মালকোছা মারতে মারতে ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য আবার তাল ঠুকে প্রস্তুত হ'চ্ছিল। বহুক্ষণ ঢেউয়ের সাথে লড়াইয়ের পর রীতি একটা বড় ঢেউয়ের অতর্কিত ধাক্কা সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেল। একটি সুগৌরবর্ণা সুন্দর-মুখশ্রী তরুণী রীতির কাছে দাঁড়িয়েই স্নান করছিল, সে রীতির বিপদ দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে রীতিকে অট্টহাস্যপরায়ণ তরঙ্গ-ঘন্যার কবল থেকে উদ্ধার করে, ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে টলে টলে সামনের দিকে এগিয়ে তীরে উঠে এল। রীতি ও তরুণী উভয়েরই মুখে তখন খুব হাসির ঘটা।

সেই শুভ্রবর্ণা বিপুলদেহা প্রৌঢ়াটি তখন জল থেকে বালুসৈকতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তীব্রস্বরে ভর্ৎসনা করতে করতে তিনি বারম্বার জানাচ্ছেলাগলেন, রীতির মতো 'দস্যি মেয়ে' ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই এবং তা' জেনেও ঐ 'অবাধ্য দস্যি মেয়ে'কে সমুদ্র-স্নানে নিয়ে আসাই তাঁর প্রধান ভুল হয়েছে।

স্তরকে স্তরকে ঘন-কুঞ্চিত রেশমের মতো চুল ডান পাশে সিঁথা কাটা, সুগঠিত-নাসা, টানা-চোখ পাতলা-ওষ্ঠাধর সুচিত্রিত-ভ্রূ, অতিসুন্দর-মুখশ্রী ২৪।২৫ বৎসর বয়সের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি যুবক মালকোছা ধুতির উপর কোমরে চামড়ার 'বেল্ট' আঁটতে আঁটতে জলে নেমে আস্‌ছিল। রীতি বলে উঠ্‌ল—"দিদি, ঐ লোকটিকে কাল সন্ধ্যাবেলা সেই স্বর্ণদ্বারের ওদিকে বালির ঢিবির উপর দেখেছিলাম।" তরুণী রীতির কথায় মুখ ফিরিয়ে একবার সেই দিকে দৃষ্টি-পাত করে তার পর আবার অন্যদিকে ফিরে রীতির সিক্ত চুলগুলি শুষ্ক গামছা দিয়ে মুছে, ঝেড়ে, সোজা করে দিতে মন দিল। রীতিদের স্নান সমাপ্ত হয়েছিল। অদূরে বালুর উপর দিয়ে আর একদল সাগর-স্নানার্থিনী নেমে আসছিলেন। তার

মধ্য থেকে কর্সা রং, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ একটি সুন্দরী তরুণী রৌদ্র-রক্তিম মুক্তোদ্ভাসিত মুখে দ্রুতপদে এগিয়ে এসে বল্‌ল—"এই যে নীলিকা, তোরা আজ যে আমাদের আগেই এসে পড়েছিস্! আমাদের আজ একটু লেট্ হয়ে গেছে ভাই! তোদের স্নান হয়ে গেছে যে দেখ্‌চি। না—ভাই, তা' হবে না, আমি একলা নাইবো না, তুমি আর একবার আমার সঙ্গে নাইবে চলো।" বলতে বলতে নীলিকার সুগোল নরম মণিবন্ধটিতে একটু জোরে চাপ দিয়ে টান্‌ল। সিক্ত-বসনা নীলিকা সখীর মুঠোমুঠি থেকে হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে ভিজা চুলের রাশি বাঁ হাতে জড়িয়ে কবরী বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে ব'ল্‌লে,—"না ভাই, আজ আর যাবো না। বেশী বেলা হলে বালি তেতে ওঠে, হাঁটতে কষ্ট হয়। আর, আমি আবার জলে নাম্‌লে রীতিও আবার নাইতে চাইবে; কত বকাবকি করে জ্যাঠাইমা ওকে জল থেকে তুলেছেন। তা'ছাড়া তুহিণের টন্‌সিল ফুলে জ্বর হয়েছে, সে একা আছে, আমাদের শীগ্‌গির ফিরতে বলে দিয়েছে।" "আচ্ছা, আমি তোমায় বেশী দেরী করাব না—ঠিক পনেরো মিনিট মাত্র। আর, রীতিকে আমি বল্লেই জলে নামবে না। রীতু, লক্ষ্মী ভাই, তোমার কাপড় ছাড়া মাথা মোছা হয়ে গেছে, আর জলে নেমো না—কেমন? রীতু ভা—রী বাধ্য মেয়ে, ও একবার স্নান করেছে, আর জলে নামবে না। নীলাকে নিয়ে আমি একটু নেয়ে আসি ভাই, কেমন? নীলা তো এখনও ভিজে কাপড়েই আছে!"

খোসামোদের বিনয়পূর্ণ সুমিষ্ট সুরে কথাগুলি উচ্চারিত হওয়ায়, রীতি লুব্ধ দৃষ্টিতে ঢেউগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মাথা হেলিয়ে সম্মতি প্রকাশ ক'র্‌ল—যদিও তার মন তখন ঐ সম্মুখের স্নানরত বালক বালিকা ও পুরুষ নারীর দলে ভিড়ে আর একবার দুরন্ত তরঙ্গগুলির সহিত ঝাঁপাঝাঁপি করে আসবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল!

নীলিকা আবার বল্‌ল—"সীতা, কাজ নেই ভাই, আজ তুই তোর বৌদিদের সঙ্গেই নেয়ে আয়। আবার জলে নাবলে জ্যাঠাইমা কি ভাববেন?"

"রোস্ না আমি জ্যাঠাইমারও 'পারমিশান্' নিচ্চি" বলে অসিতা দ্রুতপদে এগিয়ে আর একটু উঁচুতে উঠে, জ্যাঠাইমা যেখানে তাঁর কোনও পরিচিতা সখবা আত্মীয়া নারীর সহিত তদ্‌গতচিত্তে আলাপে মগ্ন ছিলেন সেখানে এগিয়ে এসে ডাক্‌ল—"জ্যাঠাইমা—" মোটা মোটা সোণার তাগা পরা স্থূল শুভ্র বাহুদ্বয় আন্দোলিত করে জ্যাঠাইমা তখন বহুদিন অদর্শনের পর আত্মীয়া সখীটির অতর্কিত সাক্ষাৎ পেয়ে অত্যন্ত খুসী মনে সাংসারিক আলাপে নিবিষ্টা ছিলেন। ডাক শুনে পিছন ফিরে চেয়ে বললেন—"কে রে? অসিতা? তোদের যে আজ এত দেরী হোল আস্‌তে?"

অসিতা বল্‌ল "আজ সকালে আমরা চক্রতীর্থে গেছ্‌লুম, বৌদির মামার বাড়ী বেড়াতে গেছ্‌লুম, স্নান আসতে বেলা হয়ে গেল।" তার পর গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে মিনতির সুরে বল্‌ল—"জ্যাঠাইমা! নীলিকা এখনও গা' মোছেনি, ভিজে-কাপড়েই আছে, সে আর-একটু আমার সঙ্গে নাইবে কি?"

জ্যাঠাইমা নীচে সিক্ত বালুবেলায় নীলিকা ও রীতি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্‌লে—"তা' যাক্ না! রীতু গা' মুছেচে, ও যেন আবার জলে না নামে।" তার পর বাম হস্তস্থিত সিক্ত গামছাখানি, রৌদ্র তাপ নিবারণের জন্য মাথার উপর তুলে দিয়ে আবার সেই আত্মীয়াটির সহিত আলাপে নিমগ্না হ'লেন।

অসিতা বালিকা-সুলভ চঞ্চল-পদে হরিণীর মত লঘু লম্ফে উঁচু বালির পাড় হতে সাগর-সৈকতে নেমে এসে নীলিকার পিঠে এক ধাক্কা দিল। "চল চল্ শীগ্‌গির, একেবারে 'হাইয়েষ্ট অথরিটি'র 'পারমিশান্' নিয়ে এসেচি।"

নীলিকা মৃদু হেসে তার সঙ্গে এগিয়ে চল্‌ল। রীতি এতক্ষণ চুপ করে ছিল; কিন্তু আর থাকতে না পেরে অনুনয়ের স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—"দিদি ভাই! আমি একটুখানি জলে নামবো কি? শুধু একটিবার মাত্র পা' দু'টি ভিজিয়ে আস্‌ব।"

নীলিকা জলের ভিতর হতে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—"না ভাই, তোমার ফ্রক্ ভিজে যাবে, তুমি নেমো না।"

রীতি উদ্দাম ইচ্ছায় বাধা পেয়ে নিরাশা, ক্রোধ, ক্ষোভ ও অভিমানে মুখখানা অত্যন্ত ভারী ও অন্ধকার করে বালুর উপর ধপ্ করে বসে পড়্‌ল।

অসিতা ও নীলিকা হাত ধরাধরি করে ঢেউয়ের বেগ ঠেলতে ঠেলতে প্রথম 'ব্রেকার্'টা পার হয়ে দ্বিতীয়টার

কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। অসিতা আরও অগ্রসর হবার ইচ্ছা করায় নীলিকা বল্‌ল—"না ভাই, আজ আর আমি খুব বেশী এগোব না—কারণ, আজ আমার 'আন্‌ডার-অর্ম্‌স্' নেই, শুধু সেমিজ পরে এসেচি। তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গেছে।"

অসিতা বল্‌ল "আমি দাদার হাফ্‌-প্যাণ্টে কাজ চালিয়ে নিই। নিজের 'ইজের-বডি' বা 'পা-জামা' গুলো পরে সমুদ্রে এখন আর নাইতে আসিনে—কারণ, সেগুলো টুইলের লংক্লথের কিম্বা খদ্দরের তৈরি, কাজেই বড্ড শীগ্‌গির ছিঁড়ে যায়। ছিনের হাফ্‌-প্যাণ্টগুলো ছেঁড়ে না।"

নীলিকা হেসে বল্‌ল "সাদা কাপড়ের কিম্বা পাতলা কাপড়ের 'আনডার-ক্লথে' সমুদ্র-স্নান পোষায় না; বিশেষতঃ মেয়ে মানুষের। শীঘ্র ছিঁড়ে যায়, আর ভিজে গেলে পরা-না-পরা সমান হয়ে দাঁড়ায়। আমি কাকাবাবুর পুরানো মোটা খাকি 'ইউনিফর্ম্' কেটে নিজের গায়ের মাপে একটা নিজের মনের মত 'সুইমিং-কষ্টিউম্' তৈরী করে নিয়েচি।"

অসিতা সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড ঢেউ পিঠ নীচু করে মাথার উপর চলে যেতে দিয়ে, তার টাল্ সামলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল—"কি রকম কাটের করেছিস্? সাঁতার কাটবার 'অর্ডিনারী' যে কালো 'সুইমিং কষ্টিউম্' গুলো দেখা যায়, ঐ রকমই তো?"

নীলিকা ঢেউয়ের সঙ্গে উঠা-নামা করতে করতে মাঝে মাঝে থেমে থেমে বল্‌ল,—"না, ও'রকম ঢিলে করিনি, বেজায় বালি ঢোকে। অনেকটা 'ইজের বডি'র ধরণের কাট্ হয়েছে—অথচ খুব টাইট্ করে করেচি। খাকির একটি মাত্র দোষ—ভিজলে একটু ভারী হয়। তা টাইট্ করে ফিট্ কর্‌লে তা' টেরই পাওয়া যায় না, অথচ অনেক সুবিধা। হাজার ঝতা-ঝন্তিতে ছেঁড়ে না, ভিজ্‌লেও কিছু ক্ষতি হয় না।"

অসিতা মুচকে হেসে একটু ঠাট্টার সুরে বল্‌ল,—"খাকি কিন্তু খাঁটী খদ্দর নয়, খাঁটী বিলিতী।"

নীলিকা হেসে উত্তর দিল,—"সাধ করে নতুন খাকি কিনে যদি "সুইমিং কষ্টিউম্" করতুম, তা'হলে নিশ্চয়ই অন্যায় হোত বৈকি।"

গল্প করতে করতে অদাবধানে একটা বড় ঢেউয়ে খানিকটা লবণাক্ত জল দু'জনের নাকে মুখে প্রবেশ করায়, হাঁকাতে হাঁকাতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে সঙ্গীরা তীরের দিকে সরে এল। অসিতার বৌদিদিরা সেখানে হাঁটুজোর জলে সবাই মিলে জড়াজড়ি করে সর্ব্বাঙ্গে বালি মেখে কলরব করে স্নান করছিলেন, বেশী এগোবার সাহস তাঁদের নেই। সেখানকার আছড়ে-পড়া ঢেউগুলির বালু-আলোড়নের মধ্যে স্নান অসিতাদের মনঃপূত হ'ল না, আবার এগিয়ে দু'টো 'ব্রেকার্' পার হয়ে বড় ঢেউয়ের মাঝে বুক-পর্য্যন্ত জলে গিয়ে দাঁড়াল তারা। কিন্তু বাতাস জোর হওয়ায় ও জোয়ারের মুখ বলে ঢেউয়ের বেগ ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল, এবং তারা অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল। নীলিকা বেশীক্ষণ সেই তরঙ্গযুদ্ধে দাঁড়াতে না পেরে 'রণে ভঙ্গ' দিয়ে পিছিয়ে এল। অসিতা হাসতে হাসতে বল্‌ল—"নীলা, তোর প্রাণের ভয় বড় বেশী।"

নীলিকা তার প্রতিবাদ করে স্নান-পরিচ্ছদের অভাবের উল্লেখ করায় অসিতা বল্‌ল—"ওটা তোমার একটা বাজে 'প্রিটেক্‌ষ্ট্'।

নীলিকা ও অসিতা যেখানে স্নান ক'রছিল, তার বাম-পাশে হাত-বারো-তেরো দূরে মুকুর আরও একটা বড় ব্রেকারের ওপারে স্নান ক'রছিল। তার সঙ্গে একজন তেলেগু-মুলিয়া যুবক একখণ্ড লম্বা 'পাল-তুলা' কাঠ নিয়ে, তার সাহায্যে মুকুরকে ঢেউয়ের ওপরে গা ভাসান্ বা সমুদ্র-তরঙ্গে সাঁতার শেখাচ্ছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ-গুলির শীর্ষে মুকুরের কুঞ্চিত-কেশ কালো মাথাটি ও মুলিয়ার তালপাতার চোঙা-টুপী-পরা মাথাটি ছাড়া আর কোনও অবয়বই দেখা যাচ্ছিল না।

অসিতারা সকলে সমুদ্র থেকে উঠে সিক্ত মসৃণ বালুবেলার উপরে দাঁড়িয়ে গায়ের জল-সিক্ত সাড়ী সেমিজ-গুলি সুবিন্যস্ত করে নিতে নিতে বাড়ী ফিরবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল।

এমন সময়ে তারা শুনল, মুকুর সিক্তবস্ত্রে ব্যস্ত ভাবে সমস্ত মুলিয়াদের ডেকে বল্‌ছে, তার হাত থেকে একটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী সমুদ্রে পড়ে গেছে, উদ্ধার করে দিতে পারলে তাদের পুরস্কৃত ক'রবে। অসিতা তার ভিজা চুলের রাশি রাঙা গামছাখানায় বেশ করে জড়িয়ে, দু'হাত দিয়ে চাপ দিয়ে নিঙড়াতে নিঙড়াতে নীলিকার সামনে

এগিয়ে এসে কৌতুক পূর্ণ মুখে মিষ্টস্বরে বলল,—"নীলা, ঐ ছেলেটি ভাই, নিশ্চয়ই একজন কবি। আমি ওকে না চিনে এবং ওর পরিচয় না জেনেও, কেবলমাত্র চোখে দেখে বলে দিচ্ছি।" নীলিকা অঙ্গুরী-অন্বেষণ-তৎপর চিন্তিত-মুখ মুকুরের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উত্তর দিল,—"কি রকম? আজকাল জ্যোতিষ-শাস্ত্রটাও তোমার করতলগত হয়েছে নাকি?"

অসিতা হাসতে হাসতে উত্তর দিল,—"আরে, কাল ওকে সেই স্বর্ণদ্বারের শেষ সীমানার কাউগাছ আর কাঁটা-বনগুলোর ওপাশে উঁচু বালির ঢিবিটার উপর বসে থাকতে দেখেছিলি মনে নেই? আমি তখনই ওকে 'মার্ক' করে-ছিলাম। ও' তখন কিছু-যেন লিখছিল বলে মনে হ'ল। অতো নির্জ্জনে সমুদ্রতীরে বসে কেউ চাল ডাল নুন-তেলের জন্য খরচ বা আফিসের হিসাবপত্র লেখে না, কবিতা লেখাই সম্ভব। আর চেহারা, চুল, বেশ-ভূষা সবই কাবি-কেতা'র লেখতে পাস্‌নি? জনহীন সাগর-তীরে সন্ধ্যা আঁধারে উদাসনেত্রে পেন্সিল হাতে বসে-থাকা থেকে, সমুদ্রে এই আংটী হারানোটি পর্য্যন্ত যেটুকু ওর পরিচয় পেলুম—ও' কবি না হয়ে যায় না।"

নীলিকা হেসে বলল, "আমি কিন্তু বলতে পারি, ও 'পেন্টার'। অবশ্য কবিও হ'তে পারে, কারণ 'পেন্টার্' হ'লে সে যে পোয়েট্রী লিখতে পারে না তা'তো নয়! তবে ও যে একজন চিত্রকর, তাতে কোনও সন্দেহ নেই—কারণ, কাল আমি স্পষ্টই দেখেছি, ও'র হাতে নীল রঙের তুলি ছিল। তুমি কাল যেটাকে 'লিখ্‌ছিল' বলে সন্দেহ করেছো, সেটা ও' লিখছিল না, আঁকছিল।"

অসিতা পরাজিতা হয়ে একটু ছটাদীর হাসি হেসে বলল,—"এক্স্‌কিউজ্‌ মি, আমি ভুলে গেছ্‌লুম যে তুমি একটি 'সেন্টিমেন্টাল্‌-গার্ল্‌'—বঙ্গ-সাহিত্যের একজন 'ব্রাইথিং-পোয়েটেস্‌'; সুতরাং আমার চেয়ে ও' সব খবর তোমারই বেশী জানা স্বাভাবিক।"

নীলিকার গণ্ড হতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। সে অসিতার কথার প্রতিবাদ করে কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঈষৎ চমকিত ভাবে তার হাতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠল—"সীতা! আমার একগাছি চুড়ি কি হ'ল ভাই?" শুভ্র নিটোল প্রকোষ্ঠ বেষ্টন করে কাঁচের লাল টুকটুকে ভালিমদানা চুড়ির কোলে তিনগাছি করে ছ'গাছি ফ্যান্সী 'মিক্স্‌-প্যাটার্ণে'র সোণার চুড়ি ঝক্‌মক্‌ ক'রছিল, বামহাতের একগাছি সোণার চুড়ি অন্তর্হিত হয়েছে। অসিতার মুখ হতে কৌতুক-রেখা নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল। বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে উদ্বেগ-পূর্ণ সে স্বরে বলে উঠল—"সে কিরে?"

তার পর সকলে মিলে 'খোঁজ খোঁজ' রব পড়ে গেল! কিন্তু সকলেই বুঝিলেন, অন্বেষণ বৃথা! উন্মত্ত তরঙ্গের অশ্রান্ত আনাগোনার আলোড়নে কোথায় বালির তলে তার সমাধি হয়ে গেছে এতক্ষণে, তার পুনরুদ্ধারের আশা সুদূর-পরাহত।

অদূরে মুকুর অসিতাদের সকলের উদ্বিগ্ন-মুখে অন্বেষণ করা দেখে বুঝতে পেরেছিল, তুরন্ত সিন্ধু এদেরও কোনও দ্রব্য অপহরণ করেছে। কিন্তু সেটা কি, এবং কার, তা বুঝতে পারলে না। কিছুক্ষণ লুলিয়াদের নিয়ে অঙ্গুরীয়কের ব্যর্থ-অন্বেষণের পর সে উঠে চলে গেল। উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে যেতে যেতে চেয়ে দেখল, স্থূলকায়া জ্যাঠাইমা ও অসিতাদের বাড়ীর সকলে দলবদ্ধা হয়ে তখনও সমুদ্রতীরে অন্বেষণ বা জটলা ক'রছেন। নীলিকার সুন্দর মুখখানি ঈষৎ ম্লান ও দুঃখিত।

তিন

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে 'ফ্ল্যাগ্‌-ষ্টাফে'র কাছ-বরাবর নীলিকাদের সঙ্গে আজও মুকুরের দেখা হ'ল। মুকুর আজও লক্ষ্য ক'র্‌ল, তাদের দলে বিপুলকায়া হাস্যপ্রসন্নাধরা জ্যাঠাইমা হ'তে তরুণী যুবতী বালিকা সকলকারই পরিধানে বিলাতী-সূতার মূল্যবান রেশম কিম্বা জরীর বিচিত্র পাড়যুক্ত শাড়ী, শুধু নীলিকার পরিধানে ঘন চকোলেট্‌ রঙের পাড় সাদা ধব্‌ধবে খদ্দরশাড়ী ও নীল্‌চে-রংয়ের মোটা খদ্দরের একটি প্রেন্‌ জ্যাকেট। হাতে তার, ক্রুশে-জালতি-বোনা কালো রেশমের একটি লম্বা থলি। থলিটির গায়ে গোলাপী রেশম দিয়ে ইংরাজীতে বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা "কুমারী নীলিকা রায়।" তারা সমুদ্রতীরে হাঁটতে হাঁটতে সুন্দর সুচিত্রিত রঙীন ঝিনুক, জমাট্‌-বাঁধা সমুদ্র-ফেণা, বিচিত্র শামুক শঙ্খ—যা' কিছু সংগ্রহ ক'রছিল, সেই থলিটির মধ্যে পূর্ণ করছিল।

নীলিকারা মুকুরের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে

অগ্রসর হয়ে স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে 'বালুখণ্ডের' দিকে বেড়াতে চলে গেল। মুকুর কিছুক্ষণ ক্ল্যাপ্‌ষ্টাকের সামনে বেঞ্চের উপর বসে ঘন-নীল সমুদ্র-বক্ষে গোধূলির রক্তিমাভায়-মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দু'জন ভ্রমণ-ক্লান্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে সেই বেঞ্চে মুকুরের পার্শ্বে উপবিষ্ট হওয়ায়, মুকুর আস্তে আস্তে উঠে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হল। সাগরবক্ষোদ্ভে ঘূর্ণ-দিক্-চক্রবালগামী সিন্ধু কপোতগুলির পানে অলস দৃষ্টি মেলে অন্যমনস্ক মনে কি-জানি-কি ভাবিতে ভাবিতে সিক্ত বালুবেলার উপর নগ্ন পায়ে অলস-মন্থর গতিতে চলেছিল সে। ঢেউগুলি মাঝে মাঝে তার পা দু'খানি চুম্বন করে ফিরে ফিরে যাচ্ছিল।

স্বর্গদ্বারের শ্মশান-ঘাটের কাছাকাছি এসে পিছনে পরিচিত কণ্ঠের গল্প ও হাস্য-গুঞ্জন-ধ্বনিতে মুকুর সচকিতে ফিরে চেয়ে দেখল, নীলিকারা প্রায় হাত-চার-পাঁচ তফাতে আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্র নীলিকার বড় বড় সুন্দর কালো চোখ দু'টির শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টির সহিত তার দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য সম্মিলিত হ'ল। অপ্রতিভ মুকুর তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সমুদ্রের দিকে একটু বেশী সরে গিয়ে দ্রুতপদে হাঁটতে আরম্ভ ক'রল। অন্যমনস্কতায় সমুদ্রের দিকে একটু সরে আসায়, একটি বড় ঢেউ মুকুরের কাপড় ভিজিয়ে হাঁটুর উপর দিয়ে চলে গেল। অসিতারা কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে একবার নেত্রপাত করে সহাস্যমুখে পরস্পরে বোধ হয় তার বুদ্ধিরই তারিফ্ কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেল। বিপন্ন মুকুর সিক্ত বসন-প্রান্ত হতে বালি ও জল ঝাড়তে ঝাড়তে একবার মুখ তুলে সামনের দিকে চেয়ে দেখল, নীলিকা সবার পিছনে ছোট ভাইটির হাত ধরে চলতে-চলতে তারই দিকে চেয়ে আছে। তারও মুখে যেন ঈষৎ কৌতুকের ক্ষীণ-আভাস রয়েছে, কিন্তু দৃষ্টিতে যেন সহানুভূতির করুণ ছায়াও ফুটে উঠেছে বলে মনে হ'ল। মুকুরের সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হ'বা মাত্র সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আর একটু দ্রুতপদে এগিয়ে সঙ্গিনীদের অতিক্রম করে তাদের অগ্রবর্ত্তিনী হ'ল। মুকুর তার অলক্তক-রঞ্জিত ছোট ছোট পা' দু'খানি বিপ্রতালে ফেলার সুন্দর ভঙ্গীটির দিকে অল্পক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকবার পর আবার ধীরপদে অগ্রসর হ'ল।

স্বর্গদ্বারের শেষের দিকে মুকুর তার এক বন্ধুর বাড়ীতে অতিথি হয়ে উঠেছিল। তাদের বাড়ী হতে আরও অনেকটা দূরে একখানি সাদা ধবধবে বাড়ী খালি পড়ে ছিল। বাড়ী-খানির সামনে ট্যাবলেটে সোণালী অক্ষরে "প্রবাল-পুরী" নাম লেখা। একেবারে নির্জ্জন দিকটায় সমুদ্রতটের উপরেই আগাগোড়া মার্ব্বেল পাথরে গড়া এই সুন্দর বাড়ীখানি মুকুরের শিল্পী-প্রাণকে বড় বিমুগ্ধ করে তুলত। সে প্রায়ই এই নব-নির্ম্মিত চারিবন্ধ বাড়ীখানির সামনের দিকের ছোট মার্ব্বেল দালান কিম্বা সিঁড়ির উপরে বসে বসে বহুরূপী সিন্ধুর রূপ-বৈচিত্র্য উপভোগ ক'রত।

কিন্তু ছাদের উপরে পায়চারী ক'রতে ক'রতে মুকুর যেদিন দেখল 'প্রবাল-পুরী'র বাতায়নগুলি আলোকোদ্ভাসিত, একটুখানি বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থেকে বুঝল, বাড়ীর অধিকারী কিম্বা ভাড়াটে এসে থাকবে। সেদিন থেকে সে আর সে-বাড়ীর দালান মাড়াতো না।

এক দিন ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে মুকুর দেখল, 'প্রবাল-পুরী'র সামনে সমুদ্র-তটে রীতি ও তার কিশোর ভাইটি বিমুক কুড়াচ্ছে; এবং নীলিকা সবুজরংয়ের ঘাসের চট পায়ে 'প্রবালপুরীর' সামনের সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপের উপর দাঁড়িয়ে একখানা রাঙা মোটা চিরুণী দিয়ে ঘন কেশরাশির বিশৃঙ্খলা মোচন ক'রছে। উদাম সমুদ্র-হাওয়া তার হাতের বেষ্টন হ'তে চুলগুলিকে এলোমেলো ভাবে উড়িয়ে দিয়ে তাকে বিপন্না করে তুলছে। নবনীত-শুভ্র সুগঠিত বাহুখানির উত্থান-পতন ও নিবিড় মেঘের মতো ঘন-কুন্তল-রাশির মধ্যে লাল টুকটুকে চিরুণীখানির ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাব ও অন্তর্ধান-লীলায়, ভোরের অরুণালোকে প্রবাল-পুরীর মর্ম্মর-সোপানে দণ্ডায়মানা তরুণী নীলিকাকে মুকুরের চোখে মূর্ত্তিমতী ঊষবীরই মতো ঠেকল।

নীলিকা সমস্ত চুলগুলি আঁচড়ে সুসংবত করে ডান হাতে কেশ-গুচ্ছ ধরে, বাম হাত দিয়ে মাথার মাঝখানটায় ঈষৎ চাপ দিয়ে একটু কাঁপিয়ে ধরতেই, বাম-পাশ-ঘেঁসা অল্প-বাঁকা সিঁথা আপনিই সোজা দু'ভাগ হয়ে পড়ে গেল। তার পর চুলের রাশি দু'হাত দিয়ে ধরে হাত জড়িয়ে একটি এলোচুলের কবরী বেঁধে নীলিকা ভাই-বোন দু'টিকে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল—"তুহিণ—তুহিণ—রীতি—" নীলিকার বারম্বার উচ্চ-আহ্বান সমুদ্রের গর্জ্জন ও হাওয়ার হুহু-রবে কারুরই কাণে পৌঁছাচ্ছিল না। নীলিকা এবার

সিঁড়ির উপর চটী জোড়া খুলে রেখে চিরুণীখানি হাতে দোলাতে দোলাতে শুভ্র বালির ভিতরে পা-টেনে-টেনে এগিয়ে চল্‌ল—ভাইবোন দু'টির কাছে।

'চা ও খাবার খেয়ে বেড়াতে যেতে হবে, আর বিমুক কুড়াবার সময় নেই' জানিয়ে ভাই-বোন দু'টির পিঠে চিরুণীর দ্বারা আদর-সূচক মৃদু আঘাত করতে করতে নীলিকা বাড়ীর দিকে ফিরে দাঁড়াতেই মুকুরের দিকে দৃষ্টি পড়ল।

ফিকে গেরুয়া রংয়ের সিল্কের লম্বা এক্সিংগাউন্ ও সেই রংয়ের রেশমী-পাগড়ী পরে জরীর পম্পিস্ জুতো পায়ে দিয়ে মুকুর প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিল। হাতে সুদৃশ্য একখানি ডায়েরী ও নোটবুক-পেন্সিল।

নীলিকা প্রথম-দৃষ্টিপাতে গেরুয়া পাগড়ী ও গাউন-পরিহিত মুকুরকে চিনতে পারেনি; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তার ক্ষোদিত-প্রস্তর-পুত্তলির ন্যায় নিখুঁত-সুন্দর মুখশ্রী, স্বপ্ন-ময় চাহনি ও অলস-মন্থর গমন-ভঙ্গীতে চিনতে পারল। একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল সেই দিকে চেয়ে থেকে, তার পর খুব কিরিয়ে ভাই-বোন দু'টিকে নিয়ে বাড়ীর সিঁড়িতে গিয়ে উঠল। জ্যাঠাইমার লম্বা ধব্‌ধবে পিঠখানি তখন দ্বিতলের বাতায়ন-পথে দেখা যাচ্ছিল, তিনি ডাকছিলেন—"ও নীলা, রীতি,—খোকা—তোদের চা যে জুড়িয়ে গেল—"

মুকুর দ্রুতপদে সমুদ্রতীরে নেমে পড়ল। পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ হয়ে সূর্য্যোদয়ের আভাস সূচনা করছিল। মুকুর স্বর্গদ্বারের পশ্চিমদিকে ধীরে আপন মনে ঘাড় হেঁট করে পেন্সিলটা ঠোঁটে চেপে ধরে অত্যন্ত অন্যমনস্ক মনে কত কি ভাবতে ভাবতে হেঁটে চলল। সমুদ্রের শুভ্র ফেনপুঞ্জ আনমনা মুকুরের জরীর জুতা চুম্বন করে পালিয়ে গেল। চিন্তাধ্যানমগ্ন মুকুর সচেতন হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। তার মনে পড়ে গেল সে আজ ভোরে 'স্বর্গদ্বাররোড্' দিয়ে শ্রীমন্দিরে যাবে ভেবেছিল। তাই পাকা রাস্তায় হাঁটতে হবে বলে জুতা পরেছিল ও শ্রীমন্দিরে যাবে বলে রেশম-আলখাল্লা পাগড়ী পরেছিল। সমুদ্রতীরে ঝিনুকবালির উপরে সে কেন যে নেমে এল, কিছুই ঠিক কর্ত্তে পারল না। তার পর জুতা জোড়াটি খুলে হাতে নিয়ে পাড়ের উপর উঠে, একখানি রঙ্‌চঙে জেলেডিঙ্গি নৌকার পাশে ছায়ায় গিয়ে বসে পড়ল। আজ আর তার মন্দিরে যাওয়া হ'ল না। সে নিজেই নিজের এই অদ্ভুত অন্যমনস্কতায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়েছিল; অনেক চিন্তা করেও সে ঐ ভুলের কারণ নির্ণয় কর্ত্তে সমর্থ হ'ল না।

সূর্য্য তখন ঊর্দ্ধে উঠে পড়েছেন, চারিদিক সোণালী রৌদ্রে ভরে গেছে। মুকুর নোটবুক ও ডায়েরীখানি সঙ্গে নিয়েছিল, শ্রীমন্দিরে গিয়ে দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি নোটবুকে এবং ডায়েরীতে যথাযথ ভাবে লিখে নেবে বলে। অনেকক্ষণ নৌকার পাশে বসে থাকবার পর সে আস্তে আস্তে ডায়েরী-খানির পাতা উল্টে পড়তে লাগল—

৯ই জানুয়ন—আজ পাঁচদিন হ'ল 'সু'—র সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ এড়াতে না পেরে ও চিত্রাঙ্কনের কিছু খোরাক সংগ্রহের জন্য সাগর-তীরে এসেছি। পুরীধামে এসে শ্রীমন্দিরটি এবং সবচেয়ে সমুদ্রটিই একমাত্র দেখবার জিনিস বলে আমার মনে হচ্ছে। 'সু'—যে বাড়ীখানি ভাড়া নিয়েছে তার নাম "রত্নাকর"। স্বর্গদ্বারের শ্মশান ছাড়িয়ে মাইল খানেক পশ্চিমে এই বাড়ী—সমুদ্র হতে প্রায় একশো গজ তফাতে। সমুদ্রের উন্মত্ত গর্জ্জন-ধ্বনি ও দুরন্ত হাওয়ার হুহু শব্দ সব সময়েই কাণে লেগে আছে; আর সাগরের নব-ঘন নীলরূপ সর্ব্বদাই চোখের উপরে ভাস্‌ছে। আমাদের বাড়ী লোকালয় হ'তে তফাতে; আবার আমাদেরও বাড়ীর সিকি-মাইল তফাতে আর একখানি বাড়ী আছে। সে বাড়ীখানি অনেক দূরে হলেও এখান থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। সমুদ্র হ'তে প্রায় বিশ গজ তফাতে, বালির উপরে দুধ-ধব্‌ধবে শ্বেত-মার্ব্বেলের ছোট্ট দোতালা বাড়ীখানি। অ—নে—ক দূর থেকে দেখলে মনে হয়, সমুদ্রতটে ধূ ধূ বাদামী বালুরাশির উপর পড়ে আছে যেন একখানি সাদা বড় ঝিনুক বা শঙ্খ! বাড়ীর দ্বীপের সামনে-দিকটা মুসলমানী মিনারের গড়নের। অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে সাজানো এগারটি শুভ্র স্তম্ভের উপর গম্বুজাকার সোণালী-কলস উপুড় করে বসানো।

দিবসান্তে অস্তাচলগামী রক্তিম-রবির সোণালী-আলোর ধারা যখন তার সোণার আঁচলখানি মেলে দেয় সুনীল জলরাশির বুকের উপর, সাগরের পশ্চিম দিকটা নীল বেণারসী শাড়ীর ঢালা-জরীর সাঁচ্চা-আঁচলার মতো ঝক্‌মকিয়ে ওঠে, আর সমস্ত বুকখানির উপর তার চিক্‌মিক করে খেলে ওঠে সেই আঁচলার রঙের আভাস—'প্রবাল-পুরী' নামটি তখন সত্যিই সার্থক হয়ে ওঠে।

এগারোটি স্বর্ণাভ কলস সহ কারুকার্য্যময় দুগ্ধধবল সৌধ-শীর্ষ, অস্তাকাশের সেই সোণালী আলোর ধারায় স্নাত হয়ে সাগর-আয়নার নীল বুকে নিজের প্রতিচ্ছবিখানি দেখতে থাকে যখন, আর তার প্রতি কক্ষ ও দালানের মর্ম্মর-মেঝের উপরে যখন দু'বেলা উদয় ও অস্তের আলোক-আবীর খেলা হতে থাকে, তখন মনে হয় এই বাড়ীখানি রচনা ও এর নামকরণ করেছেন যিনি, তাঁকে দেখতে পেলে জিজ্ঞাসা করি একবার, কোন্ সে বরণীয় শিল্পীর কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন তিনি? কিসের আদর্শে গড়েছিলেন তাঁর এই স্বপ্ন-প্রাসাদ? —অনাদি অনন্ত সুরে কল্লোল-গীতি-পরায়ণ নৃত্যচঞ্চল, ফেণ-মুকুট তরলহার-সজ্জিত ঐ উন্মাদ সিন্ধুর সহিত পরামর্শ করে,—না, সাগর-কল্লোলের সাথে সমান তালে হাততালি দিয়ে অহর্নিশি হোহো হাস্তে দিগন্ত মুখরিত করে সারাদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, ঐ চির-অশান্ত সমুদ্র-বাতাসের সহিত পরামর্শ করে, না,—ঐ ধূ-ধূ, ধূ ধূ—অনন্ত বৈরিক-বসনা উদাসিনী বালুবেলার সহিত পরামর্শ করে?.....কে এই সামঞ্জস্যকর সুন্দর নামটি বলে দিয়েছিল তাঁকে?...ঐ সাগর-বক্ষোর্দ্ধে দূরদিগন্তাভিমুখী সিন্ধু-পারাবতেরা, না—অতল সমুদ্রের তলদেশে সাগর-রাজের সত্যকারের প্রবালপুরীর অধিবাসী ঐ নানাবর্ণ-রঞ্জিত সুচিত্রিত-দেহ সিন্ধু-সৈকতশায়ী অগণ্য বিচিত্র ঝিনুক-শিশুরা?...কারা?"

—হঠাৎ একটা করুণ আর্ত্ত-চীৎকার-শব্দে মুকুরের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। খাতা থেকে মুখ তুলে সামনের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল, একটি শুভ্র নধর ছাগ-শিশুকে একটা পাটকিলে রংয়ের কুকুর সবেগে তাড়া করেছে। অসহায় ছাগ-শিশু—বালুকার উপর দিয়ে ভাল দৌড়াতে পারছে না, কুকুরটা বেগে ছুটে আসছে। মুকুর তাড়াতাড়ি উঠে কুকুরটাকে ভয় দেখিয়ে জোরে তাড়া ক'রল, সে লেজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে ও বারে বারে পিছন ফিরে চাইতে চাইতে পলায়ন ক'রল। আর ছাগ-শিশুটি সেইখানেই দাঁড়িয়ে ভীত-দৃষ্টিতে কম্পিত-কণ্ঠে কাতর ভাবে ডাকতে লাগল। মুকুর ছাগ-শিশুটিকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে রাস্তার উপরে তুলে দিতে গেল।

ছয়

সমুদ্রতীরে নীলিকার সঙ্গে মুকুরের প্রায় প্রত্যহই দু'বেলা বেড়াবার সময়ে এবং এক এক দিন স্নানের সময়েও দেখা হয়। নীলিকার সঙ্গে তার সখী অসিতা ও অসিতার বৌদিদিরা প্রায় বেড়ান এবং স্নান করেন। আবার কোনও কোনও দিন 'জাঠাইমা' কিম্বা কেবলমাত্র রীতি ও ভূষিণ নীলিকার সঙ্গে থাকে। সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়ে প্রতিদিন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত তারা একসঙ্গেই দেখে। কত শত বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দলবদ্ধ হয়ে কিম্বা একাকী, অথবা যুগল-দম্পতীতে সমুদ্র-তটে পায়-চারণা করে, এই সুন্দর মনোরম দৃশ্য উপভোগ করেন। তাদের মধ্যে মুকুর ও নীলিকারাও বহু লোকের মাঝে পরস্পরে অনেকখানি ব্যবধানে দাঁড়িয়ে এই সুমধুর দৃশ্য উপভোগ করে' বাড়ী ফিরত। প্রত্যহ দেখা হওয়ায় তারা পরস্পরকে খুবই চিনে নিয়েছিল, যদিও সুদূর ব্যবধানেই উভয়ে সমুদ্র-তীরে ভ্রমণ করে বাড়ী ফিরত। বহু দূর থেকেও কেবল মাত্র চলনভঙ্গী বা অবয়ব মাত্র দেখেই খুব সহজে এবং শীঘ্রই তারা পরস্পরে পরস্পরকে চিনে নিতে পারতো।

নীলিকার খদ্দরের রঙীণ-শালখানি তিন কোণা করে গায়ে জড়াবার ভঙ্গী ও বাম-প্রকোষ্ঠে রেশমী-দড়িতে দোদুল্যমান ঝিনুক কুড়াবার কালো-রেশমী থলিটি হাজার লোকের মাঝখানে ও বহু দূর-ব্যবধানেও মুকুরের দৃষ্টিকে অতিক্রম করতে পারতো না। আর, মুকুরের কুঞ্চিত-কেশ মস্তক, সুদীর্ঘ সুঠাম চেহারা, নিখুঁত মুখখানি ও শিথিল-মন্থর গমন-ভঙ্গী নীলিকা সুদূর হতেও এক মুহূর্ত্তে চিনে ফেলতে পারতো।

শেষে এমনই অভ্যাস হয়ে গেল—যেদিন কোনও কারণে সহরের ভিতরে বা অন্য কোনও দিকে যদি তারা একজন বেড়াতে যেত, কিম্বা একবেলা বেড়াতে না বেরুত, তা'হলে সে বেলা অপরজনের সমুদ্রতীরে ভ্রমণটাই কেমন যেন অসম্পূর্ণ রয়ে যেত। অজানা কি জানি কি কারণে মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে যেত, কিছু ভাল লাগত না সেদিন। অথচ দূর থেকে তারা পরস্পরকে দেখে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় গম্ভীর মুখে দু'জনে দু'দিকে চলে যায়।

প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল। মাঝে মাঝে নীলিকার মনে হ'ত, অপরিচিত যুবককে প্রত্যহ দেখার নেশা এবং কোনও এক দিন দেখা না হ'লে তার জন্য অহেতুকী উদ্বিগ্নতা ও মনের ভাবনা, এটা একান্ত অনুচিত হচ্ছে।

তাই সে মাঝে দিন-কতক সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ ক'রল। অফিস্-কোয়ার্টার, ষ্টেশনের দিকে বেড়াতে যেত। সম্পূর্ণ দু'দিন অদর্শনের পর তৃতীয় দিনে স্নানের সময়ে অদূরে স্নানরত মুকুরের সহিত নীলিকার দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। তখন, মুকুরের আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি ও প্রসন্ন-স্মিত মুখ নীলিকার বুকের মধ্যে অনেকখানি তোলপাড় করে আর দু'টি রাঙা করে তুলল।

কিছুদিন পরে মুকুরও ঠিক নীলিকারই মত মনে মনে বিবেকের কঠোর তাড়নে, মনের মধ্যে এই দর্শন-স্পৃহাটা নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ ও অকর্ত্তব্য ব'লে বহু চিন্তা করে' সমুদ্র-স্নান ও ভ্রমণ বন্ধ করে বাড়ীর মধ্যে অত্যন্ত মনোযোগে দিনকতক ছবি আঁকতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল।

কয়েক দিন পরে ভোরের বেলা সাগরের সুমিষ্ট গম্ভীর আহ্বান-ধ্বনিতে সদ্যো-জাগরিত মুকুর বাইরে এসে দাঁড়াতেই কোটী তরঙ্গ-বাহু উত্তোলন করে সাগরের উন্মত্ত বাধ্র-আহ্বান, তার প্রাণের সদ্য-রুদ্ধ ভ্রমণ-বাসনাকে বিদ্রোহী করে তুলল। নগ্নপদে গেঞ্জি গায়ে নিদ্রা-স্ফীত-আঁখি, বিস্রস্ত-কেশভার মুকুর, ছড়িগাছটা টেনে নিয়ে, সাগরতীরে বেরিয়ে পড়ল। শুভ্র ফেনপুঞ্জে পা দু'খানি সিক্ত করে করে চলতে চলতে মুকুর দেখল, নীলিকা কমলা-রংয়ের খদ্দর শাড়ী ও জাম্বা পরে ভাই বোন দুটির সঙ্গে নেমে আসছে। তার অচপল শান্ত নেত্রদুটি আজ একটু চঞ্চল ভাবে চারিদিকে উৎসুক দৃষ্টিপাত করে ফিরছিল। মুকুর দূর হতে মুহূর্ত্তেই যেন বুঝতে পারল, কিসের এই অন্বেষণ! মুকুরের প্রতি দৃষ্টি পড়ামাত্র কিন্তু নীলিকা, বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে হাঁটতে সুরু করল। এমনি করে আরও কয়েক দিন কেটে গেল।

মুকুর মাঝে মাঝে সমুদ্রতীরে বসে তালপাতার সুচালো টুপী ও কৌপীন-পরিহিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ 'মুদিয়া' অথবা সদ্যো-মৃত প্রকাণ্ড অদ্ভুত সামুদ্রিক মৎস্য বা জন্তুর 'পোর্ট্রেট্' এঁকে নিত। নাসিকায় প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার ও সর্ব্বাঙ্গে দরিদ্রলিপ্ত উৎকল-বালিকা কিম্বা পায়ে প্রকাণ্ড গোদযুক্ত উৎকলীয়ের ছবিও সখ করে আঁকত।

রীতি ও তুহিণ নিজেদের ছবি আঁকিয়ে নেবার লোভে মুকুরের সঙ্গে আলাপ ক'রবার জন্য বেজায় লোলুপ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নীলিকার কঠোর নিষেধে তা' এ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি। নীলিকা রীতি বা তুহিণের 'গায়ে-পড়ে আলাপ'টা পাছে মুকুর, নীলিকার তার সহিত আলাপের ইচ্ছা বা এমনি একটা কিছু ভেবে নেয়—এই ভয়ে প্রাণান্তে তুহিণ ও রীতিকে সেদিকে ঘেঁষতে দিত না। আবার মুকুরও ঐ প্রিয়দর্শন কিশোর বালকটি এবং প্রফুল্লতার জীবন্ত-উৎস হাস্যচঞ্চলা বালিকাটির সহিত 'ভাব' ক'রতে একান্ত উৎসুক হওয়া সত্ত্বেও, পাছে নীলিকা মনে করে তারই সহিত পরিচিত হ'বার বা ঘনিষ্ঠতার অভিপ্রায়ে এই অসমবয়স্ক বালক-বালিকা দু'টির সহিত মুকুরের এই অযাচিত বন্ধুত্ব-চেষ্টা, তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও, সঙ্কোচে ও আশঙ্কায় তুহিণ কিম্বা রীতিকে ডাকতে পারত না।

কিছু দিন পরে প্রায় তিন-চার দিন মুকুর আর নীলিকাকে দেখতে পায় না। 'প্রবালপুরী'র খোলা বাত-বাতায়ন ও সমুদ্র-তীরে ক্রীড়ামত্ত রীতি-তুহিণকে দেখে, তারা যে এখানেই আছে, বুঝতে পারা যেত, কিন্তু তিন-চার দিন নীলিকাকে বাড়ীর বাইরে বা'র হতে না দেখে তার শারীরিক অসুস্থতা অনুমান করে মুকুর মনে মনে বড় উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছিল। দু'বেলা প্রবালপুরীর সম্মুখ দিয়ে বেড়াতে গিয়ে এবং স্নানের সময় সমুদ্রতীরে খুঁজেও কেবলমাত্র রীতি, তুহিণ ও মাঝে মাঝে জ্যাঠাইমা ছাড়া নীলিকার চিহ্ন মাত্র সে দেখতে পেত'না। মুকুর মনে মনে অস্থিহীন হয়ে উঠল।

তার পর এক দিন তিন-চারখানি সারিবন্দী সাদা-যানের মধ্যে অসিতাদের সকলকে ও তার সহিত নীলিকাকেও দেখা গেল। তাদের সঙ্গে জিনিষপত্র ও বিছানা প্রভৃতি দেখে মুকুল অনুমান ক'রল, তারা 'কোণারক' দেখতে গিয়েছিল। নীলিকার সহিত একটি যুবকও গাড়ী হতে নামল ও নীলিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রবালপুরীর দিকে অগ্রসর হ'ল। অসিতাদের গাড়ীগুলি তাদের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

মুকুর হঠাৎ নিজের প্রতি নিজে খুব কড়া হয়ে উঠল। মনে মনে আপনাকে বহু ভৎর্সনা করে' বয়স্থা ভদ্র-কুমারীর প্রতি ঐরূপ মানসিক আকর্ষণ নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা করে' আজ আর সমুদ্রে বেড়াতে যাবে না স্থির করে ফেলল।

বিকেলে যত রৌদ্র পড়ে আসতে লাগল, সমুদ্রতীরে

দলে দলে বালক-বালিকা পুরুষ-নারীদের যতই ভ্রমণ উপবেশন ও খেলাধূলার মেলা বসে গেল, মুকুরের মন ততই ঐ'দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল ; এবং সে মনে মনে নিজেকে নিজে কৈফিয়ৎ দিতে লাগল—"কেন ? আমি বেড়াতে যাব না কিসের জন্য ? আমি অন্যায়ই বা কি করছি ? সমুদ্রতীরে কত শত অপরিচিতা নারী বেড়িয়ে থাকেন—অনেকের সাথেই তো মুখ-চেনা' হ'য়ে যায় ! তার জন্য নিজের স্বাস্থ্যোন্নতি ছেড়ে বেড়ানো বন্ধ ক'রবার তো কোনও কারণ নেই। আমি তো কোনও দিন তাঁর সাথে আলাপের এমন কি তাঁর পরিচয়-গ্রহণেরও চেষ্টা করিনি, তবে কিসের ভয়ে বেড়ানো বন্ধ কর্ব্ব ?"

মুকুর মনে মনে নিজেকে ভীরু ও দুর্ব্বল বলে তিরস্কার করে এবং নিজের অহৈতুকী দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বেশভূষা সমাপন করে বেরিয়ে পড়ল।

সমুদ্রতীরে গিয়ে কিন্তু সে সমস্ত কথাই একেবারে ভুলে গেল,—অবাধ্য আঁখি দু'টি চঞ্চল ভাবে খুঁজে ফিরতে লাগল তার দৃষ্টির স্বতঃ-প্রার্থিতকে !

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'বার অনেকক্ষণ পরে শুক্লপক্ষের চন্দ্রালোকে বাড়ীর দিকে ফিরল যখন সে, তখন সমুদ্রতীর জন-বিরল ! জ্যোৎস্না নিশীথে ক্বচিৎ দু' একজন সাগর-সৌন্দর্য্য-পিপাসু বালুর উপর বসে আছে বা গান গাইছে।

মুকুর বাড়ী ফিরে চায়ের পেয়ালা এবং ডায়েরী ও ষ্টাইলো পেন্‌টি নিয়ে সমুদ্রের দিকে সামনের গোল-বারান্দাটিতে ইজি-চেয়ারখানির উপর এসে ব'সল। সুদূর হতে ক্ল্যারিওনেট্ বাঁশীতে "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে" অতি সুন্দর সুরে বাজছিল। মুকুর বাঁশীর সুর লক্ষ্য করে চেয়ে অনুমানে বুঝল, প্রবালপুরীতেই বাঁশী বাজছে। কিন্তু সেখানে বংশীবাদক তো কই এত দিন দেখা যায় নি, বা বাঁশীও শোনা যায় নি ! হঠাৎ মনে পড়ল—আজ যে একটি যুবককে নীলিকার সাথে গো-যান হতে নামতে দেখেছিল, সম্ভবতঃ সেই বংশীবাদক।

মুকুর আনমনে স্থিরভাবে বসে রইল। তখন বাঁশী সে গান শেষ করে আবার নতুন তান ধরেছে—"নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে দেছে চাঁদের আলো—" বাঁশী বেজে বেজে ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে চুপ করে গেল। চায়ের পেয়ালা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—মুকুর ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত হ'য়ে মুদিত নেত্রে নিশ্চল ভাবে শুয়ে। তা'র কাণে তখনও বাঁশীর মিষ্টি সুর বাজছে—"এখন যদি মরতে না পাই তবে আমার মরণ ভালো।"

মুকুরের বন্ধু এসে আহারের জন্য তাকে ডাকল। নিজের বিধুরতায় লজ্জিত মুকুর তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। আহার-শেষে রাত্রে আবার এসে বারান্দাটিতে বসল। চিঠি ও ডায়েরী প্রভৃতি লেখার ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক-আলোকটির বোতাম টিপে ধরে চেয়ারের হাতার উপর ডায়েরী খাতাখানি রেখে, লিখে যেতে লাগল—

"সম্মুখে অনন্ত অসীম জ্যোৎস্না-পুলকিত নীলাম্বুরাশি। কোন্ সে অনাদি কাল হতে সদ্যোজাতা পৃথিবীর প্রথম জাগরণ-দিন থেকে এমনি উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে দুলতে দুলতে উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে আর্ত্ত-চীৎকারে আছড়ে পড়তে পড়তে রাশি রাশি ফেণপুঞ্জ উদ্গার করে ছুটে এগিয়ে আসছে বালুতটের বুকের উপর, আবার কোন্ অনতিক্রমনীয় আকর্ষণের নিষ্ফল কান্নার হা হা শব্দে পিছিয়ে সরে যাচ্ছে নিজস্থানে !..... এই ছুটে আসা আর ফিরে যাওয়ার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, শ্রান্তি নেই।.....

মানবের অবোধ্য ভাষার হা হা রবে দিগন্ত মুখরিত করে কী জানাতে চায় সিন্ধু ? কার তরে তার এই আকুল উন্মত্ততা, তা' কে বলতে পারে ?.....

গগন আর সাগর যেন এক মায়ের পেটের দু'টি ভাই-বোন। এদের রূপ-বৈচিত্র্যের সীমা নেই, অন্ত নেই।

সন্ধ্যার সময় এবং জ্যোৎস্না-রাত্রে প্রায়ই স্বর্গদ্বারের পশ্চিমে মানব-বসতিহীন নির্জ্জন দিক্‌টায় গিয়ে একা বসে থাকি। উর্দ্ধে আকাশ, সম্মুখে সাগর, মুক্ত সিন্ধু-শীকর-স্নিগ্ধ হাওয়া, আর পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে ধূ ধূ বালুকারাশি আমার দৃষ্টি ও মনকে ঘিরে কি যেন এক নতুন স্বপ্ন-জাল রচনা ক'রে আমায় যেন বিধুর-বিকল করে তোলে।

মাঝে মাঝে মনসা-কাঁটার ঝোপ, মুলিয়াদের মাছ-ধরা জাল রাখবার ধানের মরাইয়ের গড়নের গোল গোল সুপারী পাতার 'পলাং', আর বালুকারই ক্ষুদ্র সংস্করণের ছোট ছোট পাহাড়। আর দেখা যায় রঙিণ-চিত্র-বিচিত্র-করা মাছ-ধরা নৌকা বালির উপর সারি সারি নোঙর-বাঁধা।

প্রকৃতি-মায়ের এই নিরাভরণ বালুকা-গৈরিক-পরিহিত উদাসিনী বিধবা-বেশ প্রাণের মাঝে সব সময়েই একটা গম্ভীর

উদাস-বৈরাগ্যের ভাব এবং অসীমের আভাস এনে দেয়। জ্যোৎস্না-রাতে তাই সাগর-কূলে গিয়ে বসি, কিন্তু প্রাণের খোরাক সংগ্রহের জন্য।

সহরে যন্ত্রবাদের প্রভুত্ব শক্তি এত বিস্তৃত হয়েছে যে, সেখানকার মানুষগুলি দেখলেও যেন এক-একটি চলৎশীল যন্ত্র মাত্র বলেই মনে হয়। প্রাণের সাড়া, প্রাণের আভাস, সহরের কর্ম্মকোলাহলময় রাজপথে খুঁজে পাওয়া নিতান্ত দায়। সকলেই চলেছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে—আপনার চেষ্টায়, আপনার কাজে। এই সব তরুণ কিশোর, তরুণী কিশোরী, যাদের সমুদ্র-তীরে ঢেউয়ের সাথে ছুটাছুটি আর বালুর মাঝে কিশুক কুড়ানো দেখলে মনে হয়—সরলতা, সরসতা, প্রফুল্লতা ও আনন্দের মূর্ত্তিমন্ত কল্পনা, জীবন্ত (Life) প্রাণী !! এদেরই আবার যখন সহরের পথে পুস্তক-হাতে চলতে বা বালিকা-বিদ্যালয়ের খাঁচা-গাড়ীর মধ্যে সারিবন্দী হয়ে সুসজ্জিত মূর্ত্তিতে বসে থাকতে দেখি, তখন মনে হয়, এরা নিয়ন-চালিত স্কুল-কলেজের ডিগ্রী-অর্জ্জনের এক-একটি সচল-যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাণের সজীবতার সন্ধান আভাস কোথাও খুঁজে পাইনে।

জল-হাওয়া-মাটীর সঙ্গে এমন কাছাকাছি নৈকট্য সম্বন্ধ, প্রকাণ্ড ধরিত্রী আবার যেন আদিম যুগের সেই বন্ধনমুক্ত উদার, অবাধ, স্বাধীন প্রাণকে তার গভীর সুপ্তি থেকে জাগিয়ে সভ্যতার কঠিন অঙ্গাবরণ, কৃত্রিমতার নিগড় ও সংস্কারের অচ্ছেদ্য জাল থেকে একটু একটু করে মুক্ত করে' সেই চির-পুরাতন হারানো জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়।

এই সমুদ্র-বেলায় যত নর-নারীকে দেখতে পাই, কেমন যেন আপনা-আপনিই মনে হয়, এরা প্রত্যেকেই এক একটি মানুষ। এদের মধ্যে আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার স্বপ্ন-জড়ানো এক-একটি 'প্রাণ' আছে। এরা কাউকে ভালবাসে ও ভালবাসা পেতে চায় অথবা পেয়েছে! সকলকারই চোখে দেখি সাগরের রূপের মুগ্ধতা-অঞ্জন আঁকা। নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক ব্যক্তিও যদি এই চাঁদনী-রাতে, একা সাগর-তীরে বালুশয্যার উপর এসে বসে, সিন্ধু তারও চোখে নিজের মায়ার কাজল না এঁকে দিয়ে ছাড়ে না।

প্রবালপুরীর অধিবাসিনী তরুণীটিকে আমার সৌন্দর্য্যের জীবন্ত দেবী বলে মনে হয়। আমার কল্পনা-কেন্দ্রের শিল্পাধিষ্ঠাত্রী মানসী যেন রূপ পরিগ্রহ করে আজ এই জনহীন সাগর-তটে আমায় দেখা দিয়েছেন।.....

নীলিকাকে আমার মূর্ত্তিমতী উষালক্ষ্মী বলে বোধ হয়, যখন তাকে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে ফেণশিরু-চরণে সাগর-তটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আর কবরীচ্যুত কেশগুচ্ছ চঞ্চল ভোরের বাতাসে তার স্বল্প মাখা মুখের উপর এসে পড়ে! আবার সূর্য্যকিরণে ঢেউয়ের শিরে দোদুল্যমানা সাগর-স্নান-রতা মূর্ত্তিতে যখন দেখি, তখন মনে হয়, সাগরের অতল তল হ'তে ঢেউয়েরই মাঝে আলোর জগতে উঠে এসেছেন জলদেবী। আবার জ্যোৎস্না-রাতে রজত-ঝিকিমিকি বালুচরে শীতপবারণা বা রত্নাকরের রত্ন-চয়নিকার মূর্ত্তিতে যখন দেখি তাকে, মনে হয় তখন 'স্বপ্নদেবী' কল্পলোক ছেড়ে ঐ জ্যোৎস্নাধারা বেয়ে নেমে এসেছেন এই সাগরের উপকূলে।

নামটিও তার ঠিক তারই রূপের উপযুক্ত! সত্যই শিউলী ফুলেরই মতো স্নিগ্ধ, সুন্দর, সুরভিময় সে। স্পর্শ করলে যেন ঝরে যাবে বলে মনে হয়।"

পাঁচ

মুকুরের বন্ধুটির ছুটি শেষ হওয়ায় ভাড়া-বাটী ত্যাগ করে কলিকাতায় চলে গেলেন। মুকুর কোণারক খণ্ডগিরি উদয়গিরি ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থগুলি দেখে আসবার ইচ্ছা থাকায় আরও দিনকতক পুরী থাকবে বলে মনস্থ করে 'প্যারাডাইস্ লজ্' হোটেলে গিয়ে উঠ্‌ল।

সেদিন সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়ে মুকুর স্বর্গদ্বারে তাদের পুরানো বাড়ী "রত্নাকরে"র ওদিকে গিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে তার সাঁতার-শিক্ষক সেই নুলিয়া যুবকটিকে দেখতে পেল। সে তখন ২।৩টি ১০।১২ বৎসর বয়স্ক কৃষ্ণবর্ণ নুলিয়া-বালককে সমুদ্রে সাঁতার শেখাচ্ছিল। মুকুর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের ডুব-জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউয়ের উপর ভেসে ওঠা ও ধাক্কা সামলানোর কায়দা দেখতে দেখতে তারও ঐ ঢেউয়ের মাথায় চড়ে অমনি করে সাঁতার শেখবার ইচ্ছা দুর্দ্দম হয়ে উঠলো। ধুতি পাঞ্জাবী সেজি খুলে একটি ধীবর বালকের কাছে গচ্ছিত রেখে টুইলের 'ড্রয়ার্স' প'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে।

নূলিয়া-যুবকটি তার পুরাতন প্রভু এবং সহচরগণ-ছাত্রকে দেখে খুশী-মনে এগিয়ে এসে তাকে সাঁতার শেখাতে লাগল। সাঁতার শেখবার হাল্কা কাঠ ও নূলিয়ার বাহু অবলম্বনে মুকুর অনেক দূরে এগিয়ে গিয়ে বড় বড় ঢেউয়ের উপরে মহানন্দে সাঁতার বা ভেসে ওঠা শিখতে লাগল। প্রায় আধঘণ্টা পরে নূলিয়া-যুবকটি মৎস্য-শিকার-যাত্রী ধীবরগণের সন্ধানে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

মুকুর পিছিয়ে এসে ঢেউগুলির সঙ্গে সাঁতারের কায়দায় গা-ভাসান্ দিয়ে উঠা-নামা করতে লাগল।

একটু পরে চেয়ে দেখ্‌ল—নীলিকা, প্রীতি, তুহিন, ম্যাঠাইমা, দাদুঠাকুর ও নীলিকার সাথে গো-যান হতে যাকে নাম্‌তে দেখেছিল সেই যুবকটি, কেউ কোমরে গামছা বেঁধে, কেউ ইজের পরে, কেউ মালকোছা মেরে সমুদ্রে অবতরণ ক'রছেন। নীলিকার মোটা সাড়ীখানির আঁচল কোমরে শক্ত করে জড়ানো, গায়ে হাল্‌কাভাবে খদ্দর সেমিজ।

আশেপাশে আরও পাঁচ-সাতজন হিন্দুস্থানী ও বাঙালী পুরুষ-নারী স্নান করছিল। নীলিকা মুকুরের প্রতি একটু কৌতূহল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তার দক্ষিণ হাত পাশ থেকে, সেই যুবকটির হাত ধরে ছুটো 'ব্রেকার্' পার হয়ে এল। মুকুর চেয়ে দেখ্‌ল—যুবকটির বর্ণ ও মুখশ্রী অবিকল নীলিকারই অনুরূপ। হাসিটি পর্য্যন্ত ঠিক নীলিকার ছন্দের। তুহিন ও প্রীতির 'দাদা' 'দাদা' চীৎকারে মুকুর বুঝতে পারল, যুবকটি নীলিকার অগ্রজ হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যে অসিতারাও সদলে এসে তাদের সঙ্গে স্নানে যোগ দিলে। ম্যাঠাইমা বালুর উপর আসনপীঁড়ি হয়ে থপ্ করে বসে পড়লেন। ঢেউগুলি এসে তাঁর গা ভিজিয়ে কোমর ডুবিয়ে দিয়ে দিয়ে চলে যেতে লাগল। ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করবার শক্তি ও সাহস তাঁর ছিল না। অসিতা নীলিকার পাশে এসে দাঁড়াতেই, নীলিকার দাদা বোনের হাত ছেড়ে দিয়ে একটু তফাতে সরে গেলেন। সকলেই নিজে নিজে স্নান করছিলেন, কারুরই সাথে 'নূলিয়া' ছিল না। অসিতা ও নীলিকা খুব উৎফুল্লতার সহিত ঢেউয়ের সহিত যুদ্ধ ক'রছিল।

অসিতা সেই জলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে অনর্গল বক্তৃতা করছিল। "দেখ্ নীলা, ঢেউগুলি যেখানে 'ব্রোল' করে সেখানে ধাক্কা বেশী, তাই উল্টে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অল্প-জলেই বেশী। কিন্তু ঢেউগুলি একটু বেশী-জলে যেখানে 'ওয়াস্' হচ্চে, সেখানে ধাক্কা মোটেই নেই, জলও বেশ পরিষ্কার, আর স্নান করেও তাই আরাম ওখানে বেশী। অবিশ্যি সমুদ্র 'রাফ্' থাকলে বেশী জলে যাওয়া ঠিক নয়। সাধারণতঃ ঢেউগুলো বেশ 'রেগুলার'ই আসে; কিন্তু যখন জোয়ার আসে, সমুদ্র বেশী 'রাফ্' হয়ে ওঠে, তখন ঢেউগুলোও বেজায় এলোমেলো ভাবে আস্‌তে থাকে, তখন অবিশ্যি 'ডেনজার্' থাকে।" অসিতা বকতে বকতে মাঝে মাঝে নীলিকাকে তীক্ষ্ণ অপবাদ দিয়ে ঠাট্টা করছিল। নিজের অপবাদ খণ্ডন করতে করতে অসিতার সঙ্গে নীলিকা অনেকখানিই এগিয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে বাতাস জোর হয়ে জোয়ার আসায় জলের টান্ ও ঘূর্ণী খুব বেড়ে উঠছিল। মুকুর মনে মনে এই বিবেচনা-শূন্যা অসাবধানী তরুণীদ্বয়ের জন্য মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছিল। কারণ, সেদিন চতুর্দ্দশী তিথি, সমুদ্রের টান ও বেগ বড় বেশী। জলও খুব শীঘ্র বেড়ে উঠ্‌চে এবং ঢেউগুলি উন্মত্তভাবে ছুটে আসচে। আজ সমুদ্রে স্নান বিশেষ নিরাপদ নয়। তা'ছাড়া আশেপাশে নূলিয়ারা কেউ একজনও নেই। তরঙ্গ দ্বারা আকান্ত হয়ে মজ্জমান হলে, যে সকল বাঙালী, উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী স্নান করছে, তাদের দ্বারা কোনও সাহায্যের আশা নেই। মুকুর ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করতে করতে নীলিকা ও অসিতাদের প্রতি উদ্বিগ্ন-চিন্তিত মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল। নীলিকার দাদা তাঁর এক হিন্দুস্থানী বন্ধুর সহিত উচ্চ-হাস্য চীৎকার সহকারে স্নান-মত্ত। তাঁরা অবশ্য সকলেই কাছাকাছি আছেন।

মুকুর দেখ্‌ল—হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বড় ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কা নীলিকা সামলাতে না পেরে পড়ে গেল এবং তার উপর দিয়ে আরও ঢেউ চলে গেল। নিমেষ মধ্যে মুকুর বুঝে নিল—ঐ উন্মত্ত বেগে যে প্রকাণ্ড ঢেউটা এগিয়ে আসছে, ওটা কূলে প্রতিহত হয়ে ফিরবার সময়েও ভীষণ জোর-টানে ফিরে যাবে। নীলিকা পতন-বেগ সামলে জলের তলা হতে বড় বড় তরঙ্গগুলির চাপ ঠেলে উঠতে না উঠতে ঐ প্রত্যাবর্ত্তনমুখী ঢেউয়ের টানে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আরও তলিয়ে যেতে পারে; এবং আরও বেশী দূরে গিয়ে পড়লে, বড় বড় ঢেউয়ের উঁচু প্রাচীরগুলি ডিঙিয়ে সেখান হতে

নিজের শক্তিতে ফিরে আসা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

অসিতারা তৎক্ষণে সেই বড় ঢেউটার ধাক্কায় ওলোট-পালোট খেয়ে, নাকে-মুখে জল চুকে সকলেই নিজের নিজের টাল্ সামলাতে সামলাতে প্রবল টানের বিপরীত দিকে সরে আসতে ব্যস্ত। নীলিকার মুহূর্ত্ত-অদর্শন তারা টের পায়নি।

এদিকে নিশ্বাসের জন্য প্রাণ ব্যাকুল, নাক ও মুখ দিয়ে প্রচুর লবণাক্ত জল পেটে প্রবেশ করছে, কাণে জলেরই বুম্‌ঝম্ গুম্‌গুম্ শব্দ, বাতাসের জন্য ব্যাকুলা নীলিকা মাথার উপর বড় বড় ঢেউয়ের প্রবল চাপ ঠেলে কোনও মতেই জলের তলে উঠে দাঁড়াতে পারছিল না! দুই নিশ্বাসে অর্দ্ধ চেতনাবস্থায় জলের তলে লুটাপুটি খেতে খেতে সেই সময়ে সে যেন কার স্পর্শ পেল। অর্দ্ধ-সংজ্ঞাহীনা নীলিকা অসহায় ব্যাকুলভাবে প্রাণপণ বলে তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।

নীলিকার বিপদ্‌টিক সেই মুহূর্ত্তেই অসিতারা বুঝতে না পারলেও, মুকুর খুব নিকটে স্নান করছিল এবং বিপদাশঙ্কায় তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল বলে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বে তার প্রাণনাশের সম্ভাবনা বুঝে সত্বর রক্ষা কর্ত্তে বা সাহায্য কর্ত্তে অগ্রসর হয়েছিল। ঢেউয়ের ধাক্কা ঠেলে নীলিকার দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে মুকুরের "ডুবল—ডুবল—" চীৎকারে অসিতারা বিস্মিত ভীত নেত্রে সেইদিকে চেয়ে মুহূর্ত্তমধ্যেই বুঝতে পারল—নীলিকা ডুবে গিয়েছে। স্নানরত সমস্ত পুরুষ ও নারীর ভীত ব্যাকুল কণ্ঠের যুগপৎ 'হায় হায়' 'কী সর্ব্বনাশ' 'গেল গেল' ইত্যাদি শব্দে সমুদ্রতট মুখরিত হয়ে উঠল এবং অনেকেই উচ্চ চীৎকারে "পুলিয়া—পুলিয়া—" বলে চেঁচামেচি সুরু ক'রলেন—যদিও সেখানে পুলিয়ারা কেউ ছিল না।

তার পরে একবার মাত্র একটা বড় ঢেউয়ের শিরে নীলিকার দীর্ঘ কেশরাশিগুলি ছড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণবর্ণ মাথার ঊর্দ্ধভাগটি চকিতে দেখা দিয়ে পরমুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল! মুকুর তখন তাকে ধরতে পেরেছে, কিন্তু চতুর্দ্দশীর জোয়ারে সেই উন্মত্ত ঢেউয়ের আক্রমণ-বেগ অতিক্রম করে কিছুতেই তাকে নিয়ে তীরের দিকে অগ্রসর হ'তে পারছিল না। আরও, নীলিকা তাকে প্রাণপণ বলে জড়িয়ে ধরছিল বলে, নীলিকার সাথে সে নিজেও প্রায় নিমজ্জিত হয়ে আসছিল। সেই মৃত্যু-ভীত বাহুবেষ্টনীর কঠিন বন্ধনপাশ কোনও মতে ছিন্ন করতে না পেরে তরঙ্গ-যুদ্ধে শ্রান্ত-ক্লান্ত মুকুর যখন ক্রমশঃ অবসন্নপ্রায় ও হতাশ হয়ে' ভগবানের উপর নির্ভর করে মৃত্যুরই জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন নীলিকার বাহুপাশ ক্রমে শিথিল হয়ে আপনিই খুলে পড়ে গেল। এই সময়ে একটা বড় ঢেউ তাদের ধাক্কা দিয়ে খানিকটা তীরের দিকে এগিয়েও দিয়ে গেল। মুকুর শেষবার ঈশ্বরকে স্মরণ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণপণ বলে শেষ শক্তি সংগ্রহ করে, নীলিকার একখানি শিথিল বাহু নিজের ডান হাতে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে তীরের দিকে হাঁপিয়ে এগিয়ে এল। ততক্ষণে কেউ কেউ তাদের সাহায্যার্থ এগিয়ে এসেছে। নীলিকার দাদা ও আরও জন দুই যুবক তাদের ধরে বালুতটের উপর এনে ফেল্‌ল। নীলিকা তখন সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনা; আর মুকুর আসন্ন নিঃশ্বাসের জন্য বার বার মুখ-ব্যাদান ক'রছে। নীলিকার ডান হাতখানি কিন্তু তখনও তার ডান হাতের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ। তার পর একটু সুস্থ হ'লে তাড়াতাড়ি মুকুর নীলিকার হাত ছেড়ে দিয়ে, বাহুতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বস্‌ল। নীলিকা তখনও অজ্ঞানাবস্থায় পড়ে আছে। যজ্ঞের শাড়ীখানি সমুদ্র ফিরিয়ে দেয়নি, খাকির 'ইজের-বডি'র উপর হাফ্ হাতা শাদা সেমিজ-পরা ক্ষীণ তনুলতা সিক্ত বালুর উপর শোয়ানো রয়েছে। চারিদিকে স্নানার্থীদের জনতা।—কখন সঙ্গোপনে মুকুর উঠে অনেক দূরে সরে গিয়ে উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে ছিল। লোকের ভীড়ে নীলিকাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ক্রন্দনাকুলা ঝাঠাই-মা ও শঙ্কাকাতরা উদ্বেগাকুলা অসিতা প্রভৃতি সকলে একসঙ্গে "চোখ মেলেছে, চোখ মেলেছে" "জ্ঞান হ'য়েছে এবার" "হাঁ করেছে" ইত্যাদি শব্দে হর্ষ প্রকাশ করে উঠায়, মুকুর বুঝ্‌ল এইবার নীলিকার সংজ্ঞা ফিরেছে।

মুকুর তখন আস্তে আস্তে শুষ্ক ধুতি ও পাঞ্জাবী কোনও রকমে গায়ে জড়িয়ে একজন উড়িয়াকে ডেকে পয়সা দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়ে তার স্কন্ধে ভর দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। এদিকে যখন নীলিকা সুস্থ হ'ল, তখন তাকে নিয়ে বাড়ী যাবার সময়ে মুকুরের কথা সকলের মনে পড়ল। কোথায় গেলেন তিনি? কিন্তু তখন মুকুরের কোনও চিহ্নই দেখা গেল না।

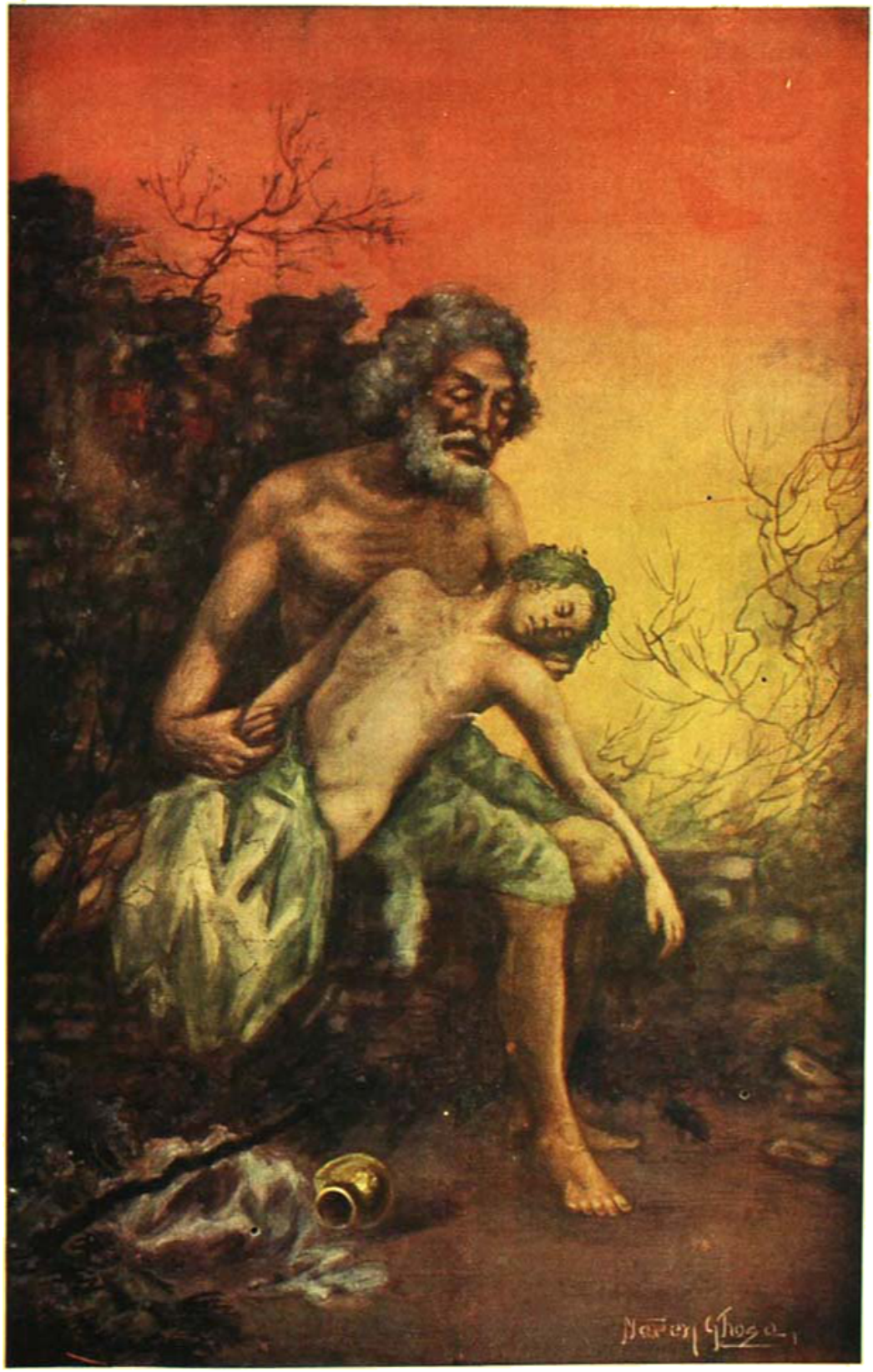

যজ্ঞের বহ্নি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

নীলিকার দাদা সুপ্রভাত নিতান্ত অপতিভ, দুঃখিত এবং লজ্জিত হয়ে বার বার বলতে লাগলেন—"আমাদের নিতান্ত অন্যায় এবং অকৃতজ্ঞতা হ'ল কিন্তু তাঁর খবর না নিয়ে কেবলমাত্র নীলিকেই নিয়ে ব্যস্ত থাকা। ছি ছি ছি! নিতান্ত স্বার্থপর ও অভদ্রের মতো আমাদের ব্যবহারটা হয়েচে আজ। ভদ্রলোক নিজের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে না গেলে আজ যে আমাদের কি হয়ে যেত, তা' ভগবানই জানেন" ইত্যাদি।

অসিতার বৌদিদিরা এবং অসিতা বল্‌ল, "আপনি অত ভাবছেন কেন? তিনি দু'বেলা এই সমুদ্রতীরে বেড়ান। আজ বিকেলেই হয় তো তাঁর দেখা পাবেন।"

ছয়

সেদিন বিকেলে শরীর ভাল না থাকায়—অল্প জ্বর-জ্বর-ভাব হওয়ায়, মুকুর বেড়াতে বেরুল না। মনটা যদিও নীলিকার সুস্থ-সংবাদ জানবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু তবুও সে চুপ করে রইল।

নীলিকার দাদা সুপ্রভাত সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর পর্য্যন্ত খুঁজে ব্যর্থকাম হয়ে বাড়ী ফিরে এসে বললেন —"কৈরে নীলি, আজ তো সমুদ্রতীরে সে ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেল না। তাঁর বাড়ী কোথায় বলতে পারিস্?"

রীতি অঙ্ক কষছিল—শ্লেটখানা নামিয়ে রেখে সোৎসাহে বলে উঠ্‌ল, "হ্যাঁ দাদা, পারি। তিনি খুব চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন। আমাদের বাড়ী থেকে দেখা যায় দূরে ঐ—যে একখানা হল্‌দে রংয়ের একতালা বাড়ী দেখা যায় না—"রত্নাকর" যার নাম,—ঐ বাড়ীটায় উনি থাকেন দেখেচি।"

সুপ্রভাত ব'ল্‌ল—"কৈ? আজ দু'তিন দিন দেখ্‌চি তো "রত্নাকর" নাম-লেখা বাড়ীখানা চাবিবন্ধ,—ভাড়া দেবে লিখে দিয়েচে।"

নীলিকা এবার আস্তে আস্তে ব'লল,—"তাঁকে দিন দুই আগে 'প্যারাডাইস্ লজ্' হোটেলের দোতালার বারান্দায় পায়চারী করতে দেখেছিলুম। বোধ হয় 'প্যারাডাইস্ লজে' আছেন।"

পরদিন সকালে সুপ্রভাত 'প্যারাডাইস্ লজে' মুকুরের খোঁজ করতে গিয়ে দেখল মুকুর নেমে আসছে সমুদ্র-তীরে। চাঁপা-রং পরদের পাঞ্জাবী, বেগুণে রেশমী পাড়ে ছোট ছোট জরির ফুল তোলা মাদ্রাজী জরী-পাড় ধুতি ও ঝকঝকে বাদামী রংএর সেন্দিল-সু'তে তাকে চমৎকার মানাচ্ছিল। সুপ্রভাত এগিয়ে এসে মুকুরকে অভিবাদন ক'রল। তার পর শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করে, গত দিনের সেই বিপদের পর মুকুরের উপযুক্ত সম্মান সম্বর্দ্ধনা ও যত্ন না করে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ স্বার্থপরের ন্যায় নীলিকাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার অমার্জ্জনীয় ত্রুটীর বারম্বার উল্লেখ করে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রতে লাগল।

মুকুর লজ্জারুণ মুখে নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে হাত কচলিয়ে ও মাথা চুল্‌কে, কি করে যে সুপ্রভাতের সেই বিনয়পূর্ণ দীর্ঘ-বক্তৃতা বন্ধ করবে ঠিক করতে না পেরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

নিতান্ত বিপন্নভাবে, "না—না, ও'কথা কেন বলছেন? ও'সব কথা বলে মিছামিছি আমায় অপরাধী করবেন না। আপনারা কোনও ত্রুটী করেন নি আমার কাছে। আমি আর কি করেছি, শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।" ইত্যাদি নিতান্ত অসংলগ্ন ভাবে কথা বলে আরও লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতে লাগল। আর বেশী কিছু কথা তার মুখ দিয়ে বের হ'ল না।

তার পর সমুদ্রতীরে পাদচারণা করতে করতে সুপ্রভাত মুকুরের পরিচয় নিয়ে এবং নিজের পরিচয় দিয়ে বলল,—নীলি আমার ছোট বোন। আমার আপন সহোদরা বোন ঐ একটিমাত্র, আর ভাই বোন নেই। বাপ মা দু'জনেই মারা গেছেন। নীলি ভবানীপুরে আমার জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমার কাছে থাকে। গোখ্‌লে মেমোরিয়াল স্কুলে পড়ে, 'নেক্‌স্ট ইয়ারে' ম্যাট্রিক্ দেবে। আমি কলকাতায় হোষ্টেলে থাকি 'এম এস্‌সি', প' পড়ি।

মুকুর খুব সামান্যই কথা বল্‌ছিল। সুপ্রভাতের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর মাত্র। সুপ্রভাত একাই ক্রমাগত হাত পা নেড়ে অনর্গল বকে যাচ্ছিল।

শেষে বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হ'লে সুপ্রভাত ব'লল,—"যাই হোক্, আপনার সঙ্গে আলাপে খুব খুসী হলেম। আপনিই যে নতুন আর্টিষ্ট্ মুকুর সেন তা' জানতেম না। "বঙ্গ ভারতী" পত্রিকায় আপনার অনেকগুলি খুব 'নাইস্ সিনারি' দেখেচি। আপনার 'সিনারি'গুলি আমি বড্ড 'লাইক্' করি।

"আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাবার আমার বড়

ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু এখানে তা'আর ঘটে উঠ্‌ল না। আজই সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার এক্সপ্রেসে আমি কলকাতা ফিরবো—কাল কলেজ অ্যাটেণ্ড্ কর্ত্তে হবে। আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করার সুবিধা এখানে হ'ল না, কিন্তু ক'লকাতায় গেলে আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে হবে কিন্তু ; সে আমি সহজে ছাড়ছিনে—নিতে এসে ধরে নিয়ে যাব।···এখানে আমার জ্যাঠতুতো ছোট ভাই বোন দু'টি আর নীলিকে নিয়ে জ্যাঠাইমা এসেছেন, তাঁর পুরানো চাকর ও লোকজন নিয়ে। পুরুষ মানুষ এমন কেউই নেই যে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে যাই !··· তা' চলুন না, জ্যাঠাইমা আর নীলির সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিয়ে যাব।" মুকুর নিতান্ত লজ্জায় রঞ্জিত হয়ে ঘোর আপত্তিতে অসম্মতি জানিয়ে বল্‌ল, না—সে কলকাতায় গিয়ে যা হয় হ'বে। সেখানে গিয়ে সে সুপ্রভাতের সঙ্গে দেখা করবে এবং তাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ গ্রহণও ক'রতে পারে ; কিন্তু এখানে পারবে না। মুকুরের মনে হ'ল, নীলিকা নিশ্চয়ই ভাববে—তার সঙ্গে আলাপ করবার একটু সুযোগ পাবা মাত্রই ছুটে এসেছে ধনিকতা করতে ! ছি ছি ছি—সে মরে গেলেও নীলিকার সম্মুখে গিয়ে অযাচিত আলাপ করবার জন্য দাঁড়াতে পারবে না ! ছিঃ, নীলিকা কতই হীন ভাববে তা'হলে তাকে।

সুপ্রভাত পকেট থেকে নোটবুক পেন্সিল বা'র করে বল্‌ল, "আপনার কলকাতার ঠিকানাটা বলুন তা' হলে, লিখে নিই। এখানে চিঠিও লিখতে পারি আপনাকে। কলকাতায় গেলে কিন্তু নিশ্চয়ই দেখা কর্ব্বেন এবং আমাদের বাড়ী যেতে হবে। এখন থেকে নিমন্ত্রণ রইল, তখন কোনও রকম ওজর-আপত্তি শুনব না।"

ঠিকানা লিখে নিয়ে প্রগাঢ় ভদ্রতার সঙ্গে মুকুরের করমর্দ্দন করে বারম্বার কলকাতায় গিয়ে দেখা কর্ব্বার অনুরোধ করে সুপ্রভাত বিদায় গ্রহণ ক'রল।

যার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি সমুদ্র-তটে ক্ষণেকা তার দৃষ্টিকে ধন্যিনী করে রেখেছে, যার কৃপায় এ যাত্রায় সমুদ্র-সমাধি হতে সে রক্ষা পেয়েছে—নীলিকা তার দাদার মুখে শুন্‌ল, সে "ঝঞ্ঝাবতী"র প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী মুকুর সেন।

সুপ্রভাত বল্‌ল,—"লোকটিকে বেশ ভাল বলেই মনে হ'ল, তবে বেজায় লাজুক ও একেবারেই মুগচোরা। একটা কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না—খালি মুচ্‌কে মুচ্‌কে মিষ্টি মিষ্টি হাস্‌ছিল। তোদের 'কাবি-তাবা'র থাকে 'মুগ্ধবল্ধ সলাজ হাস্ত' বলে আর কি !" ব'লে সুপ্রভাত আপনার মনে খুব উচ্চৈস্বরে হাসতে লাগল। তার পর বল্‌ল—"যাই বোলো, চেহারাটা কিন্তু ঠিক আর্টিষ্টের মতো বলা যেতে পারে। 'গ্রীক্ ট্র্যাজু'র মত অমন সুগঠিত বলিষ্ঠ পেশী-সংযুক্ত সুদীর্ঘ অবয়ব, অমন পরিষ্কার মুখের শ্রী, নাক চোখ ও তুলি-আঁকা ভ্রূ আমি তো বাঙালীর মধ্যে খুব কমই দেখেছি। চুলগুলি শুদ্ধ চমৎকার ! রেশমের মত নরম চিকণ আর কোঁচকা-কোঁচকা। মোটের উপর মুকুর সেনের রং খুব ফরসা না হলেও তাকে সুপুরুষ বলা চলে। কি বলিস্ ?"

নীলিকা অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ারের উপর বসে ছিল, সুপ্রভাতের প্রশ্নে নিতান্ত উদাসীন ভাবে উত্তর ক'রল,—"তা' হবে।"

সেদিনকার ঘটনার পর নীলিকারা আর ক'দিন সমুদ্র-স্নানে যায়নি। তার পরে তারা শীঘ্র কলিকাতায় চলে যাবে বলে সমুদ্রের মায়া কাটিয়ে উঠতে না পেরে আবার একদিন স্নান ক'রতে গেল। জ্যাঠাইমা এবার ওদের তুলিয়া সঙ্গে নিয়ে তবে সমুদ্রে নামলেন ও বার বার নীলিকাকে সাবধান করে বলতে লাগলেন "বেশী দূরে এগিও না মা, অল্প জলেই স্নান করে উঠে এসো।"

অদূরে দু'খানা মাছ-ধরা নৌকা জলে ভাসানো হ'চ্ছিল, —তীরের উপর অনেক লোক দাঁড়িয়ে সেই নৌকা ভাসানো দেখছিল। তরঙ্গের প্রতিঘাতে নৌকা দু'খানি দু'হাত এগিয়ে পাঁচহাত পেছিয়ে আসছিল। আবার ঢেউ ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমনি করে একখানি তরঙ্গ-যুদ্ধে জয়লাভ করে এগিয়ে চলে গেল ; আর একখানি তখনও ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝে অগ্রসর হচ্ছে। মুকুর সেই দর্শক দলের একপাশে দাঁড়িয়ে নৌকা ভাসানো দেখছিল। তুলিয়ার হাত ধরে সমুদ্রের মধ্যে নীলিকাকে দেখে মুকুরের মুখে ঈষৎ কৌতুক স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। তাতে অবজ্ঞা বিদ্রূপের চিহ্ন ছিল না। নীলিকার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তে সে হাসিটা আর একটু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু মুকুর তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাসমান নৌকা দু'খানির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রল।

নীলিকা লজ্জায় অপমানে যেন অর্দ্ধমৃতা হয়ে গেল। লজ্জার চেয়ে অপমান এবং রাগই তার বেশী বোধ হচ্ছিল।

সে লুলিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে, তাকে ভাঠাইমাকে স্নান করাতে আদেশ দিয়ে, নিজেই স্নান করতে ঢেউয়ের মধ্যে এগিয়ে চল্‌ল।

লুলিয়া নীলিকার আদেশমত ভাঠাইমার কাছে এসে ওঁর স্থূল বাহুখানি ধরে তেলেগু ভাষায় 'ভয় নেই মা' 'ভয় নেই মা' বলে অভয় দিতে দিতে এগিয়ে নিয়ে চল্‌ল। নীলিকা তখন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে আরও অগ্রসর হয়ে চলেছে। সে তাচ্ছিল্য-ভঙ্গীটুকু কিন্তু স্পষ্টই মুকুরকে লক্ষ্য করে। ভাঠাইমা শঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"ও নীলা, আর যাস্‌নে, একা অতদূরে যাস্‌নে, লুলিয়ার হাত ধর—" তিনি লুলিয়াকে সত্বর তার রক্ষণাবেক্ষণে পাঠিয়ে দিলেন।

নীলিকা লুলিয়াকে হাত ধরতে নিষেধ করে গোটাতিনেক মাঝারি-ঢেউয়ে ডুব দিয়ে, প্রতিকূল টান্ ঠেলে উপরে উঠে আসতে লাগল। মুখ তুলে সামনে চেয়ে দেখল—মুকুর অদূরে উপরে দাঁড়িয়ে তারই দিকে চেয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে যুগপৎ উৎসুক্য ও ব্যথার আভাস ফুটে উঠেছে! নীলিকা তাড়াতাড়ি নিতান্ত লজ্জিত এবং অপরাধী ভাবে মাথা নীচু করে ঘুরে চলে গেল।

সেই দিনই বিকেল বেলা স্বর্গদ্বারের সেই নির্জ্জন দিকটায়, কাঁটাবনগুলির ওধারে উঁচু বালির ঢিবিটার পাশে মুকুর বেলাবেলি রং তুলি প্যালেট্ নিয়ে ছবি আঁকবার জন্য গিয়ে বস্‌ল।

আজ দু'মাস ধরে "বঙ্গভারতী" সম্পাদকের চিঠিতে চিঠিতে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সমুদ্রতীরে উদার-সৌন্দর্য্যের মাঝখানে থেকে ছবি আঁকবার এত খোরাক পাওয়া সত্বেও মুকুর কেন যে "বঙ্গভারতী"কে তার চিত্র-সম্পদ্ থেকে বঞ্চিত রেখেছে, বিনীতভাবে তার কৈফিয়ৎ প্রার্থনা করে করে মুকুরকে উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছেন তিনি। তাই মুকুর আজ বাড়ী থেকে দৃঢ়সঙ্কল্প করে বেরিয়েছে, আজই একখানি ছবি আরম্ভ করে দু'তিন দিনের মধ্যে সেখানি শেষ করে' এই সপ্তাহেই "বঙ্গভারতীতে"তে "পাঠিয়ে দেবে।

বালির ঢিবির পাশে বসে মুকুল নিবিষ্ট চিত্তে আরব্ধ চিত্রখানির উপর ক্ষিপ্র হাতে তুলি টেনে যাচ্ছিল। শান্ত নীল সিন্ধুর বুকে গোধূলির স্বর্ণাভ আলোকধারা নেমে এসে, মধুরকান্তি বেণারসী শাড়ীর মত ঝল্‌মল্ করছিল।

মুকুর এক-একবার মাথা তুলে সামনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রছিল। এবার মাথা তুলে চাইতেই দেখ্‌লে,—নীলিকা তার সখী অসিতার সঙ্গে পাশাপাশি আসচে, সঙ্গে ছোট ভাই বোন দু'টি।

ঢেউগুলি বিস্তীর্ণভাবে বেলাভূমির উপর আছড়ে আছড়ে ছুটে এগিয়ে এসে আবার ফিরে ফিরে চলে যাচ্ছিল, সেই ঝক্‌ঝকে সিমেণ্টের মত মসৃণ সিক্ত-বালুকাতটের উপর গোধূলির রাঙা আলো পড়ে আয়নার মতো ঝিক্‌মিক্ ক'রছিল। সেই চক্‌চকে বালু-বেলায় শুভ্র পা' দু'খানি ধীরে ধীরে মৃদুতালে ফেলে নীলিকা এগিয়ে আসচে।

পরিধানে আজ তার সাগর-রংয়ের সরু নীল প্লেন্-খোল বেণারসী শাড়ী। তার তিন আঙুল চওড়া ঢালা জরীর পেটা পাড়টি পিঠের উপর দিয়ে লম্বা ভাবে এসে, সামনে বুকের উপর চওড়া ঢালা-জরীর আঁচলটা পড়েছে। হিন্দুস্থানী ধরণে শাড়ীখানি সামনে কোঁচাকরা ও ডান কাঁধে আঁচলখানি সোণার ব্রোচ দিয়ে আটকান। সেই রংয়েরই একটি ছোট্ট হাতা জরির পেটা-পাড়-বসানো টাইট্ জামা গায়ের সঙ্গে সমান হয়ে বসে গেছে। শুভ্র ললাটের মাঝখানে রক্তবিন্দুর মতো সিন্দুর-টিপ্‌টি অস্তগামী সূর্য্যেরই তুল্য মনোমুগ্ধকর।

মুকুর নীলিকাকে খদ্দর ব্যতীত অন্য কোনও বেশে আজ পর্য্যন্ত দেখেনি; সুতরাং তার এই সুসজ্জিত বেশ মুকুরের চক্ষে নিতান্ত শোভাময় ঠেকল।

অসিতাও একখানি [illegible] রংয়ের খোলে রূপালী জরীর বড় বড় পুষ্প-গুচ্ছ-অঙ্কিত বহুমূল্য বেণারসী-সুটে সজ্জিতা। তার পায়ে জরীর কারুকার্য্যময় ভেল্‌ভেট্ নাগরা, মুখে ও চুলে পাউডার। রীতি এবং তুহিনের পরিচ্ছদও যথেষ্ট মূল্যবান্।

মুকুরের দৃষ্টি কিন্তু [illegible]হিন বা অসিতার প্রতি একবারও আকৃষ্ট হল না, সে নীল [illegible]র প্রতি বিস্মিত আত্ম-বিস্মৃত ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে নীল সাগর-সৈকতে রঙিন-সন্ধ্যা আলোক-রেখাগুলির মাঝখানে, অকস্মাৎ তার শিল্প-মানসীর প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়ে, যেন প্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল।

অসিতারা এসে মুকুর যে উঁচু পাড়ের উপর বালির ঢিবির আড়ালে বসে ছিল, তারই নিম্নভাগে দু'খানি সিল্কের রুমাল বিছিয়ে বসে পড়্‌ল। সেখান থেকে মুকুরের অস্তিত্ব জানা যায় না, কারণ পাড় অনেক উঁচু।

তুহিন ও রীতি ছুটাছুটি করে ঝিনুক ও 'মেলিনিশে'র

হাড় সংগ্রহ কর্ত্তে ব্যস্ত হল। 'জেলিফিশে'র হাড়গুলি অন্ধকার রাত্রে ঘরের মধ্যে আলোক বিকীর্ণ করে। অসিতা ও নীলিকা দু'জনে নিভৃত আলাপে নিমগ্না হয়ে পড়ল।

মুকুর তরুণীদের নিভৃত আলাপ তাদের অগোচরে শ্রবণ করা নীতি-বিরুদ্ধ বিবেচনা করে, সেখান থেকে উঠে যাবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে তাদের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে কৌতূহলাক্রান্ত ভাবে আবার বসে পড়ল।

অসিতা প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসে পাউডার-চর্চ্চিত এলোচুলের মেম-স্যাপানে-বাঁধা লম্বাও কবরী শুদ্ধ ক্ষুদ্র মাথাটি দুলিয়ে বল্‌ছে,—"বিখ্যাত আর্টিষ্ট মুকুর সেন পুরীতে এসেছে—তা কে জান্‌তো?—যাই-ই বলো না তুমি, ব্যাপারটা কিন্তু আগা-গোড়াই কি একটা মস্ত বড় রোম্যান্স হয়ে আসচে না? এর চেয়ে বড় রোমান্টিক্ ব্যাপার-তোমার 'লাইফ্'এ আর কিই বা তুমি আশা কর্ত্তে পার; এখন "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হ'লেই ভাল। 'ট্র্যাজেডি'টা আমার মোটেই ভাল লাগে না, আমি মিলনান্তের একান্ত ভক্ত।"

সজোরে অসিতাকে ধাক্কা দিয়ে কৃত্রিম ক্রোধের সুরে নীলিকা ব'ল্‌ল—"অতো যদি মিলনান্তের ভক্ত তুই, যা' না নিজেই কেন মিলিত হ' না গিয়ে! এর মধ্যে আবার রোম্যান্স্ যে কি খুঁজে পেলি তা একা তুই-ই জানিস্।"

কপট-বিস্ময়ে চোখ-মুখ কপালে তুলে অসিতা বলে উঠ্‌ল—"হোয়াই মিস্ নীলা!! ইট্ ইজ্ রাইট্ লাইক্ এ নভেল। বাঙ্গালী মেয়ের জীবনে এর চেয়েও আর বেশী 'রোম্যান্স্' কি হতে পারে বলো? সমুদ্রতীরে প্রত্যহ সাক্ষাৎ, দৃষ্টি-বিনিময় হ'তে আরম্ভ করে, সমুদ্রে ডোবা এবং নিজের প্রাণ বিপন্ন করে উদ্ধার পর্য্যন্ত হয়ে গেল, এখনও বলিস্ কি না রোম্যান্স্ কোথায়? কাব্যে, উপন্যাসে যা লেখে সবই তো 'ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড' মিলে যাচ্ছে। মিল্‌ছে না শুধু নায়ক এখনও কেন নায়িকার সহিত আলাপ কর্ত্তে এলেন না? বিশেষতঃ জলে ডোবা'র পর অমন সুন্দর সুলভ সুযোগ পেয়েও। এইখানটায়ই যা' একটু গরমিল ঠেক্‌ছে।

"ত' হলেও আমার খুব ভরসা আছে শেষটা কখনই কাঁচবে না। সুপ্রভাতদা'র সঙ্গে আলাপটা তো করা রইলো!"

নীলিকা এবার সত্য সত্য রাগ করে উঠে দাঁড়াল—"আমি চলে যাচ্ছি সীতা! তুই যদি ক্রমাগত আমার সম্বন্ধে ঐ রকম ভাবে যা' তা' বলিস্, আর কোনও দিন তোর সঙ্গে বেড়াতে বেরুব না। তোর ঐ অতিরিক্ত ফাজ্‌লামীর জ্বালাতেই আজকাল আর তোর সঙ্গে একত্রে বেড়াতে যাই না। আজ নেহাৎ নিমন্ত্রণ-বাড়ী গেলুম বলে তোকে ডেকে সঙ্গে নিয়েছিলুম।"

অসিতা উচ্ছ্বসিত-হাস্যে বল্‌ল—"তা এখন আর আমাকে সঙ্গে নেবে কেন বল? এখন তোমার বেড়াবার সঙ্গীর তো অভাব নেই; সুতরাং সঙ্গিনী না থাকলেও ক্ষতি নেই। যাই হোক্, মুকুর সেন আর্টিষ্ট লোক,—তোমার 'কবিত্ব' নেহাৎ মাঠে মারা যাবে না,—মূল্য বুঝবে সে।" তার পর হাত সম্বরণ করে ব্যস্তভাবে ব'ল্‌ল—"আচ্ছা ভাই নীলা! যেদিন সমুদ্রস্নানে তোর সোণার চুড়ী হারালো, সেইদিন মুকুর সেনেরও আংটী হারিয়েছিল—মনে আছে তোর? সেদিন আমারও ভাই একটি মূল্যবান প্রিয় জিনিস সেই সমুদ্রস্নানের সময় খোয়া গেছে! তোমাদের অবশ্য এতদিন বলিনি।"

বিস্মিতকণ্ঠে নীলিকা ব'ল্‌ল—"তোর আবার কি হারিয়েছিল সে দিন?" কণ্ঠে গাম্ভীর্য্যে অসিতা দীর্ঘশ্বাস টেনে বল্‌ল—"আমার একটি বড় প্রিয় ছেলেবেলাকার নীলার লকেট সেদিন সমুদ্র-জলে হারিয়ে গেছে। সোণার 'বডিটা' আছে, কিন্তু তার আসল চিহ্ন নীলাখানি খোওয়া গেছে।" বলতে বলতে তার কৃত্রিম-গম্ভীর মুখখানি কৌতুক-হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

নীলিকা আরক্তিম মুখে উঠে দাঁড়িয়ে ভৎর্সনার সুরে বল্‌ল—"সীতা! তুই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে দেখ্‌ছি একেবারেই উৎসন্ন গেছিস্। তোদের 'লোরেটো'য় কি শুধু বাংলা-কথার মধ্যে হাজারটা ইংরাজী বুক্‌নি আর ফাজ্‌লামী-ইয়ার্কীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছাড়া আর কিছুই শেখায় না? ছিঃ!"

মুকুর এই অনূঢ়া তরুণীদ্বয়ের গোপন-আলাপ শুনতে আর একটুও ইচ্ছুক ছিল না। প্রথমে তার নিজের নাম শুনে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে শুনতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের আলাপের কিয়দংশ শুনেই সে সেখান থেকে অন্যত্র উঠে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু উঠে দাঁড়ালেই রীতি ও তুহিন তাকে দেখতে পাবে এবং নীলিকারা তার অবস্থিতি জানতে পারলে অত্যন্ত অপ্রতিভ হবে ভেবে উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ার মাঝেও মুকুরের সমস্ত কাণ মুখে ঝাঁ ঝাঁ করে যেন আগুন ছুটছিল।

অসিতা নীলিকার ক্রোধ শান্ত করে তাকে বসিয়ে তখন অন্য আলোচনা সুরু করেছিল। তারা এইমাত্র কোনও বন্ধুর বাটীতে উৎসবোপলক্ষে নিমন্ত্রিতা হয়ে গিয়েছিল, সেই উৎসব-সভারই আলোচনা ক'রছিল তখন।

অল্পক্ষণ পরে তারা উঠে চলে গেল। রীতি ও তুহিন হাত ধরাধরি করে ছড়ার মত সুর করে গাইতে গাইতে চলেছিল "—দি সী, দি সী, দি ওপন্ সী, দি ব্লু, দী ফ্রেশ্, অ্যান্ড্ এভার্ গ্রী—"

তারা দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেলে মুকুর পাড়ের উপর থেকে নেমে এসে, নীচে যেখানটায় তারা রুমাল পেতে বসে ছিল, তারই অনতিদূরে বালির পাড়ে হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসে পড়ল। সেখানটা তখন এসেন্সের সুমিষ্ট সৌরভে আমোদিত। মুকুরের অন্তরের মাঝে তখন ঐ সমুদ্রেরই ঢেউগুলি যেন অশরীরি ভাবে প্রবেশ করে তাদের উত্তাল নর্ত্তন-আন্দোলন সুরু করে দিয়েচে। সে তার ছবি রং তুলি প্যালেটের কথা বিস্মৃত হয়ে, মুদিত-নেত্রে শ্রান্ত অবসন্ন ভাবে বসে রইল। গভীর মন্দ্রে সাগর-গর্জ্জন আর তার সঙ্গে উদ্দাম সমুদ্র-হাওয়ার ঢেউয়ের সাথে মাতামাতির বিচিত্রধ্বনি, গোঁ গোঁ সোঁ সোঁ হু হু নানা সুরে নানা শব্দে, কখনও উন্মাদের অর্থহীন হাসির মতো, কখনও শত্রু-কারারুদ্ধ বীরের নিষ্ফল রুদ্র গর্জ্জনের মতো, কখনও সদ্যঃ পুত্রহারা জননীর বুক-ফাটা আর্ত্ত-কান্নার মতো শ্রবণ-পথে এসে ঠেকতে লাগল তার।

স্নাত

নীলিকারা ক'লকাতায় ফিরে গেছে। মুকুর ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও কোণারকের সূর্য্যমন্দির দেখে দাক্ষিণাত্যে সীমাচলের দিকে যাত্রা ক'রল। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ও তীর্থগুলি পর্য্যটন করে ক'লকাতায় ফিরল যখন, তখন বন্ধুবান্ধব ও সচিত্র মাসিকের সম্পাদকবর্গ তার ভ্রমণকাহিনী ও কতগুলি ছবি এঁকে এনেছে শুনবার উদ্গ্রীবতায় তাকে অতিষ্ঠ করে তুলবার জোগাড় ক'রলেন এবং সকলেই, বৈশাখের "বঙ্গভারতী"তে তার যে "সাগরলক্ষ্মী" চিত্রখানি প্রকাশিত হয়েছে, তার উচ্চ প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠ্লেন। মুকুর শুন্ল "সাগরলক্ষ্মী" ছোটবড় সমস্ত বাংলা সাপ্তাহিক ও মাসিকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে।

বৈঠকখানায় টেব্লের উপর মুকুর দেখ্ল—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের "বঙ্গভারতী" মোড়ক শুদ্ধ পড়ে রয়েছে। বই দু'খানার মোড়ক ছিঁড়ে, বৈশাখের সংখ্যা খুলে দেখ্ল—প্রথমেই তার অঙ্কিত "সাগরলক্ষ্মী" ছবিখানি প্রকাশিত হয়েছে।

তন্বী তরুণী মূর্ত্তি। সিন্ধু-বারি-সিক্ত তনুলতা ও আলুলায়িত ঘন-নিবিড় আর্দ্র কুন্তলজাল হতে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় বারিকণা ঝরে ঝরে পড়্ছে। প্রবাল-নির্ম্মিত বিচিত্র মুকুট শিরে গলদেশে থরে থরে সজ্জিত মুক্তাহার, পায়েমণিময় নূপুর, প্রকোষ্ঠে বৈদূর্য্য-বলয় প্রভৃতি মরকত-অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ শোভা-দীপ্ত। শুক্তি-খচিত অরুণ-কোণ, সবুজ-শৈবাল-বসনা "সাগরলক্ষ্মী" এক হাতে শুভ্র শঙ্খ অপর হাতে সুধাপাত্র নিয়ে অরুণোদয়-মুহূর্ত্তে সুনীল সিন্ধু-বক্ষ হতে উঠে আস্ছেন তাঁর স্নিগ্ধ রূপপ্রভায় সাগর কূল আলোকিত করে।

আকুল সিন্ধু লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ-বাহু বাড়িয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্য উন্মত্তবেগে অলক্তক-রঞ্জিত পায়ের উপর তাঁর আছড়ে পড়ে বেদনায় শুভ্র ফেনপুঞ্জ উদ্গার করছে। অদূরে সুনীল জলরাশি ভেদ করে কনককান্তি বালারুণ জ্যোতির্ম্ময় সপ্তাশ্ব-রথে গগন-পথে উঠে আস্ছেন।

চিত্রখানি সত্যই চমৎকার হয়েছে। মুকুর চেয়ারে বসে অপলক নেত্রে টেবিলের উপর খোলা "বঙ্গভারতী"র বক্ষোনিবদ্ধ ছবিখানির দিকে চেয়ে ছিল। ছবিটির মুখখানি সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হলেও, অঙ্গগঠন, হস্তপদ, কেশরাশি অবিকল কার মত হয়েচে? মুখখানি মুকুর চেষ্টা করেই অন্তরকম ছাঁচে আঁকতে চেয়েছিল; কিন্তু তবুও নাসিকাটি, দাড়ির কাছে ছোট্ট টোল্টি; নিটোল গণ্ড'র কাছটি অবিকল সেই নীলিকার মতোই হয়নি কি?

মুকুর যখন ছবিখানি পুরী হতে এঁকে "বঙ্গভারতী"তে পাঠায়, তখন সত্যই বুঝতে পারে নি "সাগরলক্ষ্মী"তে নীলিকার এতখানি সাদৃশ্য এসে গেছে। তা'হলে হয়তো সে ছাপতে পাঠাতই না; কিন্তু তখন বুঝতে না পারলেও এখন বেশ বুঝতে পারল, চিত্রপটে অহরহঃ ঐ মূর্ত্তি ফুটে ওঠায় চিত্রকরের অজ্ঞাতেই চিত্রে এই সাদৃশ্য এসে গেছে। মুকুর শূন্য গৃহে আপনা আপনি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্ছিল, ছবি-খানিকে আর যেন নির্নিমেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে পারছিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বইখানির মলাট বন্ধ করে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যাখানি টেনে নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে চোখ বুলিয়ে চল্ল। একটি কবিতার উর্দ্ধে রচয়িত্রীর নাম চোখে পড়তে

চমকিত ভাবে খেমে গিয়ে আগ্রহের সহিত চেয়ে দেখলে। কবিতাটির নাম 'সাগর-স্বপ্ন'। রচয়িত্রী কুমারী নীলিকা রায়। মুকুর কণ্ঠ-নিশ্বাসে কবিতাটি সমস্তটা পড়ে ফেলল। খুব বড় কবিতা নয়—মাঝারি। ছন্দটি অতি সুন্দর, যেন সমুদ্র-তরঙ্গেরই মতো চপল-নৃত্য-তালে বেয়ে চলেছে। প্রথমটা উদাস-উচ্ছ্বাস স্বপ্নময় ভাবের হ'য়ে শেষের দিকটা বড় করুণ আর্ত ও বেদনা-কাতর।

ঘরকার বাইরে হতে ডাক এল "মিষ্টার সেন আছেন?" মুকুর উঠে গিয়ে দেখল—বাইরে সুপ্রভাত দাঁড়িয়ে আছে। মুকুরকে দেখে সে সস্নেহে তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—"এই যে এসেছেন আপনি? আমাদের জানাতে হয়! চিঠি লিখলে তো আপনার জবাবই পাওয়া যায় না। আইছি, মানুষ, আপনার শিল্প-বস্তুই বিভোর।"

মুকুর অপ্রতিভ ভাবে সলজ্জ হাস্যে মৃদু প্রতিবাদ করে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করায় সুপ্রভাত বাধা দিয়ে বলল—"আমি এসেছি আপনার কাছে একটা দরকারে। আমি মাঝে মাঝে প্রত্যহ এসে আপনি এসেছেন কিনা খবর নিয়ে যাই। আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ। আপনাকে নিয়ে আমাদের একটা তর্ক বেধেছে, আপনি নিজে গিয়ে সেই তর্কের মীমাংসা করে দেবেন। আচ্ছা—আপনার "সাগর-স্বপ্ন" ছবিখানা আপনি নীলিকে মডেল্ করে আঁকেন নি কি? আর পুরীতেই তো ওটা এঁকেছিলেন? যদিও মুখখানা নীলির মতো অবিকল ঠিক হয়নি, তবুও আমাদের তর্ক বেধেছে ওটা নীলিকেই মডেল্ করে আঁকা। ঠিক কি না বলুন তো?".....সুপ্রভাত তার বড় বড় সরল আঁখি দুটির চকিত দৃষ্টি সোৎসুক ভাবে মুকুরের মুখের প্রতি মেলে সপ্রশ্ন আগ্রহে চেয়ে রইল।

লজ্জাকুণ্ঠ মুকুর রঙিণ রুমাল দিয়ে বার বার মুখের ঘাম মুছতে মুছতে নিতান্ত বিপন্ন অপ্রতিভ ও অপরাধী ভাবে নতমস্তকে মৃদুস্বরে আমতা আমতা করে বলল—"হাঁ—না—তা' ঠিক নয়। তবে কি জানেন—অনেক সময়ে অনেক জিনিষ দেখে সেটা 'রেখে' এমন 'ডীপ্-লি' 'ইম্প্রেষ্ট' হ'য়ে যায় যে, নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোন সময়ে সেটা 'নিজস্ব' বলে প্রকাশ হয়ে যায়, তা' টেরই পাওয়া যায় না। আমি ঠিক ওঁকে মডেল্ করে আঁকিনি, তবে সমুদ্রতীরে হয়তো, অনেক বার ওঁকে বেড়াতে দেখে, ছবিখানা আঁকবার সময়, নিজের অজ্ঞাতেই ওঁর মত তন্বী বা সাদৃশ্য এসে গিয়েছে।" মুকুর নিজের কৈফিয়তে নিজেই আরও আরক্ত হয়ে উঠছিল।

প্রসন্ন-হাস্য-স্মিত-বদন সুপ্রভাত, টেবিলের উপর সজোরে চাপড় মেরে বিস্মিত উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল,—"তন্বী কি মুকুর বাবু? একেবারে জবহু! আশ্চর্য্য কিন্তু আপনার ক্ষমতা! সামনে দাঁড় করিয়ে পোর্ট্রেটই কত সময়ে ঠিক হয় না, আর আপনি নীলিকে 'মডেল্' না করেও, চমৎকার এঁকেছেন কিন্তু। যাই হোক্, তর্কে যেহেতু জিতটাই হবে ঠিক। আপনাকে কিন্তু আজ সন্ধ্যায় ভবানীপুরে আমাদের বাড়ী যেতে হবে। ঠিকানা জানেন তো?—নং রসারোড্। এই কার্ডখানা রেখে গেলুম—নিশ্চয় যাবেন। যাই, 'অনুরূপ'কে তার বাড়ীতে খবরটা দিয়ে আসি। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার তারই আগ্রহ বেশী। নাম শুনেছেন বোধ হয়? ডাক্তার অনুরূপ মল্লিক, আমার খুব 'ফ্রেন্ড্'। নীলির সঙ্গে তার বিয়ের 'এন্গেজ্মেণ্ট্' হয়ে গেছে। আমিই অবিশ্যি সব ঠিকঠাক করলুম। আসছে জুলাই-এ বিয়ে... আপনি যাবেন কিন্তু নিশ্চয়। অনুরূপ আপনার সঙ্গে আলাপের জন্য ভারী উৎসুক। যাবেন—ঠিক—নিশ্চয়ই—" সুপ্রভাত বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। "চল্লুম তা'হলে,—মনে রাখবেন—" সুপ্রভাত আরও কত কি অনর্গল বকে গেল, মুকুরের কাণে শব্দগুলি প্রবেশ করলেও তার কিছু অর্থ বোধ হচ্ছিল না। শুধু শেষকালে—পুনঃ পুনঃ 'নিশ্চয় যাবেন' 'যাবেন তো?' শব্দে অর্থহীন বিমূঢ় দৃষ্টিতে যন্ত্র-চালিতবৎ সম্মতিসূচক একটু ঘাড় হেলা'ল।

প্রভাত একবার বিস্মিত নয়নে তার বিবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মুকুর রক্ত-লেশহীন বিবর্ণ মুখে নিশ্চল ভাবে চেয়ারে বসে রইল। সামনে টেবিলের উপর জ্যৈষ্ঠের খোলা "বঙ্গ-ভারতী"র পাতাগুলি বাতাসে ফর্ ফর্ করে উল্টে যাচ্ছিল। মুকুরের নিষ্পলক দৃষ্টির উপরে বড় বড় হরফে ছেপে লেখা 'সাগর-স্বপ্ন'টি একবার জেগে উঠ্‌তেই, মুহূর্ত মধ্যে আরও অনেকগুলি পাতা ফর্ফর্ করে তার উপর উল্টে পড়ে কোথায় তাকে মিলিয়ে দিল।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুর—(মিশ্র তিলককামোদ—বেহাগ কাঁপতাল)—শ্রীদিলীপকুমার রায় *

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি,
কখনো শুনিনা যে ॥ ধ্রু ॥
আকাশে যবে নিঃঝুম উঠে গানে
গোপন কথা কহিতে থাকে
ধরার কানে কানে,
তাহার মাঝে সহসা মাতে
বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা
স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপাণি, তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে,
তোমার বাঁশি কখনো শুনি কখনো শুনিনা যে ॥
চলিতেছিনু তব কমলবনে,
পথের মাঝে ভুলালো পথ উষা সমীরণে।
তোমার সুর কানন মাঝে জাগে,
সে সুর আমি শ্যামলে নীলে অরুণ রেণু রাগে।
যে সুর বাঁশি চকিতে চাহি আপন ভোলা মনে
শুনিতে পাই তাহার মধুকরের সনে,—
কুহেলি কেন জড়ায় আবরণে,
আঁধারে আলো আবিল করে, আঁখি যে ঘুমে ভাসে।
তোমার বাঁশী কখনো শুনি কখনো শুনিনা যে ॥

---

* গত বই ৪ প্রসঙ্গ প্রসঙ্গে এ বছর শান্তিনিকেতনে থাকতে তাঁর এই গানটির সুর দিতে বলেন। তার পর ৪ খানেকে এর সুরটি সংযোজন করে তাঁকে শোনাই। রাত্রিবেলায় নির্জনতায় গানটিতে যে সব ভাবালোপের অবতারণা করেছি কেবল এই কথা বলে রাখা দরকার মনে করছি যে সকল ভাবালোপে কবিগুরুর সুর সংযোজন করতে তাঁর সুর খুঁজে পেতে হলেও এ সংযোজনের যে গান যে কোনও গানে কখনো এর সংযোজন করে থাকতে সম্পর্কে তাঁর মুখ হতেই পরিচয় পেয়েছি। অর্থাৎ কখনো তাঁর মনে হত যে তাঁর গানে কেউ সম্পূর্ণ নূতন সুর দিয়ে গাইলে সেটা অনুচিত হয় না। এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা তত্ত্বকথায় প্রকাশিত হবে।

\+ ৩ ০ ১

II { না পা -। ন্‌ সা | রগা রগা রা সন্‌ সা | ন্‌সা রগা মপা ধপা মগা | সরা গমা গরা গরা সন্‌ । } II
তো মা র বী ণা আ মা র ম নো মা বে

মা রা মা না মা পা ধা ধপা মা গমা | রগা রা পা মা গা | সরা গমা গরা সন্‌ ধ্‌ন্‌া | II II
ক থ নো ও নি ক থ নো ভু লি ক থ নো ও নি না - বে -

মা পা পা না না না র্সা পা না র্সা | র্রা না র্সা -। -। |
আ কা শ ব বে শি হ রি উ ঠে গা - নে - -

র্রগা র্রা র্মা গা গা | র্সা র্রা গর্রা র্সনা সা | পা না -। র্সা র্রা মরা র্সার্সা ণা ধা পা |
গো প ন ক থা ক হি তে থা কে ব রা র কা নে কা - নে -

মা রা -। মা মা পা পা ধা পমা পা ধা র্সা র্সা ণা পা | ম পধা মপা মগা মরা -। |
তা হা র মা ঝে স হ সা মা তে বি ষ মো হা ঞ্জ নে - -

গা রগা -। মা ধপা | না গা মা রা সা | সা গা গমা গরা গা | মা পক্ষা পা -। । |
আ মা র ম নে বী ধ ন হা রা স্ব প ন ঘ লে হ - লে - -

গা মা পা না না | না না -। না র্সা | ধনা র্রর্সা র্সা -। -। |
হে বী ণা পা নি তো মা র স ভা ত - লে - -

র্সা র্সা র্রর্সর্সা পা পা | পা ধা ধপা মা গা | সা রা গা মগা রগা | ন্‌া ন্‌সা ন্‌া -। -। |
আ কু ল হি য়া উ ন্‌ মা দি য়া বে ন্ধু র হ' রে বা - জে - -

মা মা রা না মা | পা পধা ধপা মা গমা | রগা রা পা মা গা | সরা গমা গরা সন্‌া ধ্‌ন্‌া | II II
তো মা র বা ণী ক থ নো ও নি ক থ নো ও নি না - বে -

সা সা সা গা গমা | পা পা পা পা পগা | মা -। গা -। । |
চি নি তে ছি হু ত ব ক ম ল ব - নে - -

পা পা -। ক্ষা পা | না না না ক্ষধা পপা | মা গা রগা মা পধা | পমগা পমা গা । । |
প থে র মা ঝে ভু লা লো প থ উ ত লা স মী র লে

গা মা পধা নর্সা না | না না না না র্সা | র্সা -। র্সা -। -। |
তো মা র ভ্র কা ও ন রা তে মা - লে - -

সা সা -া না পা | পা না ধা সা না | পা পা ণপা গা পা | গা -া রগা -া ।
তো মা র সু র অ শো ক শা খে অ রু ণ রে ণু মা - খে - -

সা সা গা গা মা | পা না না না সা | সা সা সা সা ধা | ধনা সনা ধা পা ক্ষপা |
যে সু র বা হি চ লি তে চা হি আ প ন ভো লা ম - নে

সা -া সা ণা গধপা | পা ধা পগপা মা গমা | রগা গা মা ধপা মা | গা -া রসা -া -া |
ও - ঞ্জ রি ত ঝ রি ত পা খা ম ধু ক রে র ম - নে - -

সা সা গা গা মা | পা না না সা র্রা | সা ।- নর্সা র্রর্সা নধা | নর্রা সনা ধপা মগা রসা |
কু হে লি কে ন অ ভা ন্ত আ ব র - ণে

সা সা গা গা মা | পা না না সা র্রা | সা না র্রর্সা নর্সা না | ধনা সর্রা নর্সা -া -া |
কু হে লি কে ন অ ভা ন্ত আ ব র ণে - - - -

সা গা গা গা র্রগর্মা | রগা রগা রগা র্রর্সনা সা | পা না না না সা | ধনা রসা না -া -া |
আঁ ধা রে আ লো আ বি ল ক রে আঁ খি বে য রে লা গে - -

সা নর্রা সর্সা পা পা | পা পধা পগপা মা গমা | রগা রা পা মা গা |
তো মা র বা ণী ক নো শু নি ক খ নো শু নি

সরা গমা গা সন্া ধ্না | II II
না যে -

খৃষ্টিয়ান তীর্থরাজ পাদোহ্বা

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

(শেষাংশ)

(১৮)

শুনিলাম, "সেইণ্ট আন্তোনিয়ো যখন পূজায় বসিতেন, তখন তাঁহার ঘরের দুয়ার খিল দিয়া বন্ধ করা থাকিত। কিন্তু তাঁহার সহবাসী সাধু-সন্তরা ঘরের ভিতর এক অপূর্ব্ব আলোকরশ্মি দেখিতে পাইত। অথচ অন্ধকার ঘরে প্রার্থনা করিতে বসাই ছিল আন্তোনিয়োর দস্তুর।

"সহবাসীরা ভিতরকার খবরটা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল বলাই বাহুল্য। দুয়ারে এক ফুটার ভিতর দিয়া তাহারা আন্তোনিয়োর কোলে যাশুর শিশু-রূপ দেখিতে পাইয়াছিল। ভগবানের আবির্ভাবেই ঘর আলোকে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আন্তোনিয়ো স্বয়ং অবশ্য তন্ময় অর্থাৎ ভূমানন্দে ভরপুর।"

আন্তোনিয়োর আর এক বিশেষত্ব এই যে,—তাঁহার এই ভগবৎ প্রাপ্তির কথা ঘুণাক্ষরেও তিনি কোনো বন্ধুকে বলিতেন না। একে সাধনায় সিদ্ধিলাভ তাহার উপর কীর্ত্তি-

লোক সম্বন্ধে চরম সংবাদ। আন্তোনিয়ো সাধু মহলে "মহাত্মা" এবং ভক্ত সমাজে দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ যখন "মানসী" গাহিতে গাহিতে ঘরের বাড়া বাঁধিতেন তখন স্বয়ং মা কালীই না অপর দিকে দাঁড়াইয়া ভক্তের কাজে সাহায্য করিতেন? সাধনা, ভাবোচ্ছ্বাস, "এক্‌স্‌টাসি" ভাবোন্মাদ ইত্যাদির বিকাশ মানব-চিত্তে এক পথেই চলে। কি খৃষ্টান, কি হিন্দু উভয় চিত্তের ভাবধারার একই "সংস্কার," একই বিশ্বাস, একই ধর্ম্মরূপ দেখিতেছি।

(১৯)

মন্দিরের ভিতর দেখিলাম অনেক কানা খোঁড়া বোবা পুরুষ নারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া "রসনা" দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে আন্তোনিয়োর মানত করিয়া অথবা আন্তোনিয়ো তাহাদের আসিবার পর দৃষ্টিশক্তি, বাক্‌শক্তি অথবা চলৎশক্তি লাভ করিয়াছে, তাহারা যথোচিত উপায়ে নিজ নিজ ভক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতে ভুলে নাই।

আন্তোনিয়োর নিকট মানত করিবার ফলে অনেক জননী নিজ নিজ পুত্র-কন্যার চোখ ফুটাইতে পারিয়াছেন। যে সকল শিশু অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছিল, তাহাদের অনেকে আজকাল অন্যান্য লোকের মতই চোখ ব্যবহার করিতে সমর্থ। এই ধরণের মন্দিরে ভিতর খুঁটা নাকি বেশী নাই।

এক কৃষ্ণ শিশুকে পুরোহিত বেদীর উপর শোয়াইয়া তাহার স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। জনক জননী কোন কথা না বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মন্দিরের এক ধারে কতকগুলা লাঠি দেখিলাম। বাতব্যাধিতে ভুগিয়া অথবা অন্য কোনো রোগের যন্ত্রণা যে সব পরলোকগামী লাঠির আশ্রয়ে চলিতে বাধ্য হইত, তাহারা সারিয়া উঠিবার পর লাঠিগুলা আন্তোনিয়োর চরণতলে রাখিয়া গিয়াছে।

(২০)

বাস্তবিক পক্ষে, ধর্ম্ম প্রকারান্তরে "অন্ধের যষ্টি"। দেবদেবীর পূজা, সাধু-সন্তের আরাধনা, পরকাল-চেষ্টা, ধর্ম্মকর্ম্ম,—এক কথায় যতকিছু আধ্যাত্মিক আয়োজন, তপোযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ সবই প্রধানতঃ দুঃখনিবৃত্তির জন্য। মানুষকে সংসার-যাত্রায় সক্ষম করিয়া তুলিবার জন্যই এই সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কারণ হইয়াছে। মানুষ যদি দুর্ব্বল না হইত তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতা এই সব সুপরিচিত রূপে দেখা দিত কি না সন্দেহ।

মানুষ মরে,—ইহা দুনিয়ার নরনারীর এক মহা দুঃখ। এই দুঃখের শান্তি চাই। সেই শান্তি ছড়াইবার জন্যই ধর্ম্ম-জীবনের ঘোড়শোপচার।

মানুষের অন্নবস্ত্রের অভাব হয়। জগতে পয়সাওয়ালা লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম। অধিকাংশ নরনারীই অন্ন-কাপড়ের তাড়নায় জর্জ্জরিত। এই "অন্নচিন্তা চমৎকারা" বা দারিদ্র্য দুনিয়ার আর এক মহা দুঃখ। এই দুঃখকে কাবু করা চাই। কি উপায়ে সম্ভব? লাগাও পরকালের চর্চ্চা। অর্থাৎ তথাকথিত আধ্যাত্মিক সাধনের হরকমারি তুকতাক।

মানুষের অসুখ হয়। পয়সাওয়ালা জমিদার, নবাব, বাদশা, ক্রোরপতি, কাউরিপতি, পুঁজিপতি ইত্যাদি কেহই ব্যাধির হাত এড়াইতে পারে না। এই ব্যাধি দুনিয়ার এক চরম সত্য আর এই সত্যটা মহাদুঃখও বটে। কবিরাজ, ডাক্তার, এালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ—ইত্যাদির সাহায্যেও এই সনাতন দুঃখ কাটাইয়া উঠা অনেক সময়েই ঘটিয়া উঠে না। কাজেই মানব-চিত্ত আশ্রয় লয় দেবদেবীর। সাধু-সন্তকে প্রার্থনা করা হয় তাঁহারা যেন দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট রোগীর মঙ্গলের জন্য আর্জ্জিটা সুপারিশ করিয়া পাঠাইয়া দেন।

মানুষ চায় বাঁচিতে, অমর হইতে। মানুষ চায় ধন-যৌবনে সুখী হইতে, সংসারী সুখে স্বচ্ছন্দে চালাইতে। মানুষ চায় সুস্থ সবল শক্তিমান রূপ চিরযৌবনের আনন্দ উপভোগ করিতে। কিন্তু মানুষের রক্ত মাংসের "বাঁধ" ভাঙ্গে। সেই অমরতা, পার্থিব সুখভোগ এবং যৌবন-শক্তি তাহার কপালে লেখা নাই।

জগতের সনাতন দুঃখগুলার কথা বুদ্ধদেবের আবিষ্কার নয়। এই সব মানব রক্তের অতি আদিম কথা। সেই আদিম তত্ত্ব হইতেই আন্তোনিয়ো, ভিচো আর অন্যান্য তীর্থস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। আর সেই তত্ত্বটাকেই চলিত ভাষায় "কুসংস্কার" বলিতে, জানে, সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। কুসংস্কারের ভিতর দেখিতে পাই,—সেই এক কথা। দুঃখ নামক দুর্ব্বলতা আর দুর্ব্বলের বল তথাকথিত ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিকতা। এইখানে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, খৃষ্টান, হিন্দু

ইত্যাদি প্রভেদ করিতে বসিলে মানবের রক্তমাংস সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে মাত্র।

(২১)

মানুষের রক্তমাংস যদি অন্য কোনো গুণের অধিকারী হইত,—যদি মানুষ অমর হইয়া জন্মিত, যদি পৃথিবীতে ধনদৌলতের অভাবে কোনো নরনারীকে ভুগিতে না হইত, যদি অসুখ-বিসুখ নামক অভিজ্ঞতা মানব-জীবনে অজানা থাকিত, তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতা দেখা দিত কোন্ রূপে? এই প্রশ্নটা বেশ চিত্তাকর্ষক বটে। কিন্তু জবাব দেওয়া সোজা নয়।

এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে তাহা হইলে দেবদেবীর আবির্ভাব হইত না। মানুষ পরকাল-চর্চ্চা নাই বলিয়া একটা কিছু আবিষ্কার করিত না। গির্জ্জা, মন্দির, মঠ, সাধু, মোহন্ত, স্বারাজ্য সিদ্ধি, ভগবৎপ্রাপ্তি, যোগসাধন,—ইত্যাদি বস্তু আবিষ্কৃত হইত না। এক কথায় তথাকথিত ধর্ম্ম জগতে দেখা দিত না।

অনন্তের কথা, অসীমের কথা, ভূমার কথা তখন নরনারী অন্য কোনো উপায়ে চিন্তা করিত। তাহা হইলে দার্শনিকদের মাথায় গজিত অন্য কোনো সাহিত্য। শিল্পীরা গড়িত অন্য কোনো মূর্ত্তি। কবিরা গাহিত তখন অন্য কোনো গান। অর্থাৎ মানবজাতি এ যাবৎ আধ্যাত্মিকতাকে যে মূর্ত্তিতে চিনিতে শিখিয়াছে সে মূর্ত্তি না থাকা সত্ত্বেও জগতে আধ্যাত্মিক জীবন দেখা দিত।

(২২)

ডাক্তারবাবুর বা দুইটি দুই বোন। ইহারা ভাইয়ে-বোনে এক ডজন। ইতালিয়ানে নারী সম্বন্ধে এই কারণে আজ-কালকার "নব্য" নারীরা বলিয়া থাকেন :—"ইহারা বিদ্ঘুটে জাতীয় লোক। বৎসর বৎসর ছেলে বিয়ানো ইহাদের পেশা।"

জমিদারী হইতে বাবু বৎসরে পান ঘাটটী মুর্গী। সারা বৎসর আটা, মাংস, দুধ, তরীতরকারী ইত্যাদি যত দরকার হয় সবই "প্রজারা" দিতে বাধ্য। তাহার উপর ঋতু অনুসারে ফল মূলও আসে। মাত্র সাতঘর রাইয়তের ইনি মালিক। নগদ আয় বার্ষিক প্রায় চার হাজার টাকা।

বীদের সঙ্গে "কুলের কথা" আলোচনা করা গেল। ইহারা লিখিতে পড়িতে জানে না। যে পল্লীতে ইহাদের বাস্তু ভিটা সেখানকার সকলেই নিরক্ষর। বাবু বলিতেছেন—"ইতালিতে এখনো বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনিক শিক্ষার বিধান সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই।"

জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে "বাবোণ" এবং "বারোণার" নিকট নানা কথা শুনিলাম। বাবুর পিতা রাইয়তদিগকে চাবুক মারিয়া পাঁচাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। "প্রজারা" টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করিতে অধিকারী ছিল না, করিতও না। এই কয়দিনের অভিজ্ঞতায়ও দেখিতেছি,—ডাক্তারবাবু কথায় কথায় দাসীদিগকে "জানোয়ার" বলিয়া গালাগালি করিয়া থাকেন। "শূয়ার," "চামারকাদা," "শূয়ারকা বাচ্চা" ইত্যাদি বোলের যে ভাবার্থ, ইতালিয়ান জমিদারের মুখ-নিঃসৃত "জানোয়ার" সম্ভাষণের কিয়ৎও তাই।

একবার জিজ্ঞাসা করিলাম :—"আচ্ছা, এত গালাগালি সহ্য করিয়াও ইহারা আপনাদের জন্য গতর খাটাইতেছে কেন? ইচ্ছা করিলেই ত কাজে জবাব দিয়া চলিয়া যাইতে পারে।" স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বলিলেন :—"সেটি হবার জো নাই। যাবে কোথায়? তাহা হইলে ইহাদিগকে বাপ মা পরিবার শুদ্ধ জমিদারী হইতে খেদাইয়া দিব। অপর দিকে অন্য কোনো জমিদারের অধীনে ভিটামাটি পাওয়া ইহাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। কাজেই ইহারা সবই নীরবে সহিতে বাধ্য।"

(২৩)

এক যুবার সঙ্গে সহরের এটা ওটা দেখিয়া আসা গেল। কবিবর দান্তে এক গলিতে কিছুদিন কাটাইয়াছিলেন। বাড়ীটার দেওয়ালে তখাটা খোদা রহিয়াছে। পথিক রীতির গুহার ও জানালা দেখিতেছি।

ইহারই অল্প দূরে বিশ্ববিদ্যালয়। পুরান ইমারতের ভিতর ভারত-প্রসিদ্ধ চকমিলানো বাড়ী দেখিলাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রতিষ্ঠান। ইয়োরোপের সর্ব্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ইতালির বোলোঞা শহরে স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর কথা।

যুবা বলিতেছেন :—"বোলোঞা আজও চিকিৎসাবিদ্যায় ইতালিতে শ্রেষ্ঠ। তাহার পরই পাদোছবার ঠাঁই।"

খোলা উঠানে বাজার বসিয়াছে। কমলা লেবু ও অন্যান্য ফলমূল বিক্রী হইতেছে। সম্মুখেই এক বিপুল "পালাৎসো" বা প্রাসাদ। তাহার নীচের তলায় মাছমাংসের হাট। বাড়ীটা ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। রেণেসাঁসের গড়ন দেখা যাইতেছে। সে কালের নবাবেরা এই ভবনে রাজ-কার্য্য চালাইতেন।

এখানে ওখানে খাল পার হইতে হইল। ভেনিসের খালের সঙ্গে পাদোহ্বার খালের যোগাযোগ আছে। এখান হইতে বেলে দেড় ঘণ্টায় ভেনিস পৌঁছানো যায়। খালের জল অপরিষ্কার। দেখিলেই মনে হয় ম্যালেরিয়ার বাথান।

শিক্ষার সংখ্যা অনেক। চিত্তরে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইতেছি কম নয়। অধিকাংশ ঘর-বাড়ীই মেরামতের অভাবে জরাজীর্ণ দেখাইতেছে। বারান্দাওয়ালা ঘরগুলা ইতালির বিশেষত্ব। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই ধরণের বারান্দা দেখা যায় না। ভারতের কথা মনে পড়িবে।

ইটগুলা মধ্যযুগের ভারতীয় (বঙ্গীয়) ইটেরই অনুরূপ। যে সকল ছোট খাটো চৌকা ইটকে আমরা "গৌড়ের ইট" বলিতে অভ্যস্ত সেই সকল বস্তু এখানে "রোমাণ ইট" নামে পরিচিত।

ইয়োরোপের অন্যত্র দেখিয়াছি ঘরের মেঝেগুলা কাঠের তৈয়ারি। ইতালিতে ঘরের মেঝে পানে বাঁধানো,—সিমেণ্ট-করা। এইখানেও আবার ভারত।

কন্ধ্যাটারের মতন উলে তৈয়ারি আলোয়ান জড়াইয়া মেয়েরা চলা ফেরা করিতেছে। "কেপ্"-জাতীয় ওভার কোটেও দুচার জন পুরুষকে দেখিতেছি। বাজারের মেয়ে দোকানদারেরা সকলেই আলোয়ান গায়ে সওদা বেচিতেছে।

(২৪)

ইতালিতে "রেনেসাঁস" বলিলে প্রধানতঃ তিনটা যুগ বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ,—ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী। সেটা রেনেসাঁসের আমল। দ্বিতীয়তঃ ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দী। এই সময়ে মধ্যযুগের ভরা জোয়ার চলিতেছে। তৃতীয়তঃ, রোমাণ সাম্রাজ্যের যুগ বা রোমাণ আমল। সে খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কথা।

পাদোহ্বায় সেই "রোমাণ আমলে"র ঘরবাড়ীও দুইচার-খানা দেখা যায়। অন্ততঃ তাহাদের ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু লক্ষ্য করিতে পারি। "রোমাণ আমল" বলিলে "ক্লাসিক" যুগ বুঝিতে হইবে। সেই ক্লাসিক রীতিই নবরূপে দেখা দিয়াছিল "রেনেসাঁসের" আমলে। অর্থাৎ যেখানে "রেনেসাঁস" সেখানেই "ক্লাসিক"ও কিছু কিছু আত্মপ্রকাশ করিতেছে এইরূপ মনে রাখা দরকার। কম সে কম বাস্তুরীতির ক্ষেত্রে এই কথা বিশেষরূপেই খাটে।

(২৫)

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-ভবন সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। সেকালে শবচ্ছেদ করা খৃষ্টানদিগের সমাজে প্রচলিত ছিল না। পুরোহিতদের চিন্তায় এই কাজ মহাপাতক বিবেচিত হইত। কোনো চিকিৎসক বা বিজ্ঞানসেবী মরা শবীর লইয়া কাটা ছিঁড়া করিতে সাহসী হইত না।

এক ব্যক্তি এই দিকে পথ-প্রবর্ত্তক হন। নাম তাঁহার মর্গাঞি। ইনি রাত্রিকালে চুরি করিয়া একটা ঘরে আনিয়া শবচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা এক অসম-সাহসিকতার পরিচয়। কেননা পুরোহিত এবং সমাজের হাতে নির্য্যাতনের ভয় কম ছিল না।

যে টেবিলের উপর মর্গাঞি শবচ্ছেদ করিতেন সেই টেবিলটা দর্শক মাত্রকে দেখানো হয়। গত বৎসর পাদোহ্বার জীবনে অষ্টম শতাব্দীর সুরু উপলক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জ্জাতিক পণ্ডিত সম্মেলন ডাকা হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন কলিকাতার তিন প্রতিনিধি। দুনিয়ার অন্যান্য লোকের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সন্তানেরাও মর্গাঞির টেবিলটা দেখিয়া গিয়াছেন।

(২৬)

ভারতের পণ্ডিতমহলে একটা ব্যাধি আছে। ইঁহারা কথায় কথায় হিন্দুজাতিকে কুসংস্কারপূর্ণ রূপে গালাগালি করিয়া থাকেন। হিন্দু ধর্ম্ম এবং হিন্দু সমাজের "জাতিভেদ"-টাই নাকি ভারতে বিজ্ঞান-সেবার দুশমন। এই সূত্রে পূর্ব্বে পশ্চিমে তফাৎ দেখানোও তাহাদের এক বাতিক।

এই ধরণের মত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" গ্রন্থে অতি বিকট রূপে প্রচারিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক মহাশয় বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া বীর বৈজ্ঞানিকতার মাত্রা ছড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার মত বোধ হয় কোনো দিন বদলাইতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু মুখরু ভারতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা আজকাল কোনো একমাত্র বীরবরের একচেটিয়া প্রভাবে পথভ্রষ্ট হইবে না। ভারতসন্তান চোখ খুলিয়া দুনিয়ায় বেড়াইতে শিখিয়াছে। মানব জাতির অতীত কথা, মধ্যযুগের অবস্থা এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যের গতি—সবই নিরপেক্ষভাবে পরখ করিয়া দেখিবার ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে ভারতে দেখা দিতেছে।

বিজ্ঞানের দুশমন ইয়োরোপে বড় কম ছিল না। কুসংস্কার, ধর্ম্মের গোঁড়ামি, চিত্তের অন্ধতা, ও সঙ্কীর্ণতা খৃষ্টান সমাজে বেশী ছিল কি হিন্দু সমাজে বেশী ছিল তাহার আলোচনায় বসিলে নিক্তির ওজনে উনিশ বিশ করা সহজ নয়। মর্গাঞ্জির টেবিলটা অতীত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনাকারীদের ভুল দেখাইয়া দিয়া যুবক ভারতকে কুসংস্কার হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি দিবে সন্দেহ নাই! প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে কোনো দিনই প্রভেদ ছিল না। খাঁটি তুলনা-মূলক সমাজ-বিজ্ঞান এই কথাই বলিবে।

ইয়োরোপের মুক্তি গভীরভাবে তলাইয়া বুঝিবার ক্ষমতা ভারতসন্তানের যতই বাড়িতে থাকিবে ততই পূর্ব্বে-পশ্চিমে প্রভেদের কাহিনী অলীক ও মিথ্যারূপে স্পষ্ট হইতে থাকিবে। ভারতকে বুঝিবার ক্ষমতাও ততই বাড়িতে থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে যুবক ভারতে "বিদেশী আন্দোলন" থাকিয়া উঠুক।

(২৭)

ইতালিয়ান ভাষায় এখনো হাতে খড়ি সুরু করি নাই। করিব কি না এখনো বলিতে পারি না। কিন্তু মাঝে মাঝে দুএকটা খবরের কাগজ এবং মাসিক পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছি। দুই চার দশ বিশটা শব্দের চেহারা দেখিয়া রাখিতেছি মাত্র।

ডাক্তার বাবুকে একদিন ইতালিয়ান সাহিত্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম। দান্তের "দিভিনা কোমেদিয়া" (ভগবদ্-গাথা) হইতে কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ শুনা গেল। "ইন্‌ফার্ণো" বা নরক অধ্যায় ইহার বিশেষ পছন্দসই। পড়িতে পড়িতে বলিলেন :—"আওয়াজ হইতেই মালুম হয় ঠিক যেন নরককুণ্ড—নয় কি?"

বাজারে পথেঘাটে এবং পরিবারের ভিতর সাধারণতঃ যে সব ইতালিয়ান আওয়াজ শুনিতেছি তাহাতে মধুরতার অভাব লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু ইতালিয়ান গানের আওয়াজ বড়ই হৃদয়গ্রাহী।

ছবি আঁকায় ডাক্তারবাবুর সখ আছে। নিজের আঁকা কয়েকটা চিত্র দেওয়ালে ঝুলানোও দেখিতেছি। ইহার পিতাও ছবি আঁকিতে ভালবাসিতেন। তিনি অবশ্য ছিলেন সামরিক নৌ-বিভাগের কাপ্তেন। তখনকার দিনে পালের জাহাজ চলিত। সেই সূত্রে চীন জাপান পর্য্যন্ত ঘুরাফিরা ঘটিয়াছিল। কিছু কিছু প্রাচ্য সওদা ঘরের আসবাবপত্রে মজুত দেখা যাইতেছে।

বাইসাইকেলে চড়িয়া ডাক্তারবাবু আল্পস পাহাড়ের শত শত মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। ইহাই দেখিতেছি যুবা জমিদার মহাশয়ের একমাত্র নেশা। মদ বা সিগারেট ইত্যাদির দিকে ঝোঁক নাই। কাফেতে বসিয়া ইয়ারদের দলে আড্ডা মারাও ইহার দস্তুর নয়।

ইহার আর এক নেশা টাকা জমানো। একমাত্র শিশু —তাহার জন্য টাকা পুঁজি করা ইহার জীবনের একমাত্র সাধ। শিশুটি দেখিতে রোগা,—আর্য্যাণ শিশুদের তুলনায় কিন্তু সুস্থ ও সুন্দর বটে।

ইনি অস্ত্র-চিকিৎসক। এ জন্য যা কিছু যন্ত্রপাতি দরকার সবই ভিয়েনা, প্যারিস এবং বার্লিন হইতে আমদানি করিয়াছেন। গ্রন্থশালায় যে সকল চিকিৎসা-বিষয়ক কেতাব দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশই হয় জার্ম্মাণ না হয় ফরাসী। ইহার মতে উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসার জন্য জার্ম্মাণী অথবা ফ্রান্সের শরণাপন্ন না হইলে ইতালির উদ্ধার নাই। শুনিলাম,—ইতালির হাসপাতাল সন্তোষজনক নয়। ব্যবসা হইতে কুরসৎ পাইলেই ইনি কেতাব ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ডুবিয়া থাকেন।

(২৮)

একটা পুরানা গির্জ্জার ভিতর "ফ্রেস্কো"-চিত্রগুলা দেখিতে দেখিতে কিছু এদিক ওদিক চিন্তা করিবার সুযোগ জুটিল। মন্দিরটা পুরানা অবস্থায় নাই। তবে সাবেক বাস্তুরীতি রক্ষা করিয়া ইহার বাহিরটা পুনরায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ভিতরটা সেকালের অবস্থায়ই রহিয়াছে। ঘড়ীর গড়নকে "গথিক" জাতীয় বলা চলে।

"ফ্রেস্কো" বলিলে দেওয়ালে লেপা চিত্রাবলী বুঝিতে হইবে। ভারতের অজন্তা চিত্রগুলা ফ্রেস্কো-শিল্পের অন্তর্গত। ইয়োরোপের যেখানে যেখানে মন্দির দেখিয়াছি, সেখানেই খৃষ্টান "রূপদক্ষ"দের হাতের ফ্রেস্কো নজরে আসিয়াছে। তাহা ছাড়া গির্জ্জার খাম্বায়, দেওয়ালে, বেদিতে কাচের ফ্রেমে বাঁধানো আল্‌পা তৈলচিত্রও সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ফলে গোলা রঙের ব্যবহার ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্পে,—বিশেষতঃ গির্জ্জাশিল্পে কোথায়ও দেখি নাই।

পাদোহ্বার এই গির্জ্জায় যে ওস্তাদ দেওয়াল লেপিয়াছেন তাঁহার নাম জোত্তো। ছবিগুলায় বাইবেলের গল্প চিত্রিত

হইয়াছে বলাই বাহুল্য। মূর্তিসমূহের ভিতর জীবনবত্তা লক্ষ্য করা অতি সহজেই সম্ভব। অথচ কোনো প্রকার রঙের সাহায্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলা অতিমাত্রায় ফুলাইয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। বর্ণসমাবেশে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে,—কিন্তু মনে হইবে যেন কতকগুলা সরল রেখার গতিভঙ্গীই দেওয়ালের উপরকার রঙীন গঠন গুলার প্রাণ।

অঙ্কিবিদ্যায় পাণ্ডিত্য দেখানো জোত্তোর মতলব ছিল না বিনা কষ্টেই বুঝিতে পারি। অধিকন্তু পারিপ্রেক্ষিকের কৌশল এই রূপদক্ষের মূর্তিগঠনে যোগ দেয় নাই। প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পে,—বিশেষতঃ মধ্যযুগের "রাজপুত"-"পাহাড়ী" অঙ্কনগুলায় জোত্তো-সুলভ কায়দাই দেখিতে পাওয়া যায়।

(২৯)

দান্তের মতন জোত্তোও ফ্লোরেন্সের লোক। ইহারা দুই জনে সমসাময়িকও বটে। জোত্তোর আঁকা দান্তেমূর্তি ফ্লোরেন্সের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

জোত্তো পুরোহিত, সন্ন্যাসী বা মঠবাসী ছিলেন না। শিল্পসেবাই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্যবসা। একজন ইতালিয়ান ইতিহাসকার বলিতেছেন:—"জোত্তোর জন্ম হয় এক গোয়ালা-বিবাহের ঘরে। তখনকার দিনে ভোস্কানা প্রদেশে শিল্পী চিমাবুয়ে (১২৪০–১৩০২) ছিলেন গুরুস্থানীয়। ইনি জোত্তোকে পাথরঘষা এবং অন্যান্য মামুলি কাজে দুএকবার লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন,—ছোকরাটার হাতে রূপ গড়িবার দক্ষতা খেলিতেছে। জোত্তো চিমাবুয়ের শাগ্‌রেদি করিতে থাকে।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালিতে আসিসি পল্লীর সেইণ্ট বা সাধু ফ্রান্সিস ধর্মজীবনে এক যুগান্তর সৃষ্টি করিতেছিলেন। দেশশুদ্ধ লোক তাঁহাকে একদম যীশুখৃষ্টের অবতার রূপে পূজা করিতে সুরু করিয়া দেয়। ফ্রান্সিস-"কথাবলী" খৃষ্টবচনকেও ছাড়াইয়া উঠিবার উপক্রম করে।

কাজেই, জোত্তো (১২৭৩—১৩৩৭) মহাত্মা ফ্রান্সিসের জীবন-কথা চিত্রশিল্পে স্থায়ী করিবার দিকে নজর দেন। ফ্রান্সিসের ভক্তিযোগ, ফ্রান্সিস-কথিত "উপদেশামৃত" আসিসির গির্জ্জা-প্রাচীরে জোত্তোর হাতে অঙ্কিত রহিয়াছে। জোত্তোর আঁকা ফ্রেস্কো ফ্লোরেন্সের মন্দিরে মন্দিরেও দেখিতে পাওয়া যায়। রোমের কোন কোন গির্জ্জায়ও জোত্তোর ডাক পড়িয়াছিল।

চিত্রশিল্পের ইতিহাস-বিষয়ক জার্ম্মাণ কেতাবে জোত্তোর কাজের যে সব ফটো দেখিয়াছি সে সবকে পাদোয়ার এই গির্জ্জার কাজের সহোদর রূপে চিনিয়া লওয়া কঠিন নয়। প্যারিসের সুন্দর সংগ্রহালয়ে বোধ হয় যেন এই শিল্পীর ফ্রান্সিস বিষয়ক একটা চিত্র অথবা চিত্রের নকল দেখিয়াছি।

(৩০)

জোত্তোর নাম ভারতে প্রচারিত আছে কি না বলিতে পারি না। ভারতবর্ষে যাঁহারা ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্পের খবর রাখেন, তাঁহারা ইতালির নাম করিবামাত্র রাফায়েল, মিকেলাঞ্জেলো, দাভিঞ্চি এবং টিসিয়ানের কথা তুলিতে অভ্যস্ত। এই সব রূপদক্ষ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। চিত্রকলায় "রেণেসাঁস" বলিলে এই সকল ওস্তাদের নামই মনে আসা স্বাভাবিক।

রেণেসাঁস যুগের চিত্রশিল্পীদের গড়নগুলায় রঙের বাহার, পারিপ্রেক্ষিকের মাপজোক এবং স্বাভাবিক অনুপাতের প্রভাব দেখিয়া দর্শকমাত্রই মুগ্ধ হইয়া থাকে। ইহারা "আধুনিক"—বর্ত্তমান জগতের লোক। এই সকল ওস্তাদদের তুলনায় জোত্তো "প্রিমিটিভ্" বা আদিম কারিগর। কেবল মাত্র কাল হিসাবে কথাটা বুঝিতে হইবে না,—শিল্পরচনার কায়দার তরফ হইতেই জোত্তো-ফ্লেস্কোর আদিমত্ব স্পষ্ট বুঝা যায়।

পুরান ভারতের শিল্পকলায় এই ধরণের প্রকৃত বিপ্লবসূচক কোনো "রেণেসাঁস" যুগের অস্তিত্ব দেখা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় রূপদক্ষেরা জোত্তোর সীমানা ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু জোত্তোর আমল পর্য্যন্ত খৃষ্টান চিত্রকলা যে রসের, যে রূপের এবং যে আদর্শের "লক্ষণ"গুলা প্রকটিত করিয়াছে, সেই সবই ভারতীয় শিল্পসংসারে মজুত দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পের লক্ষ্যে এবং শিল্পের কায়দায় খৃষ্টানে-হিন্দুতে কোনো প্রভেদ লক্ষ্য করা সম্ভব নয়।

(৩১)

ভারতীয় রূপদক্ষেরা পরবর্ত্তী কালে যুগে যুগে অতিমাত্রায় নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এই সৃষ্টি-শক্তির অভাব ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্পে দেখা যায় না। জোত্তোর আমল হইতে আজকালকার কিউবিজ্‌ম, ফিউচারিজ্‌ম, ইম্প্রেশনিজ্‌ম এক্‌সপ্রেশনিজ্‌ম্ ইত্যাদির আমল পর্য্যন্ত

পাশ্চাত্য আত্মা পুরুষানুক্রমে নয়া নয়া রূপ গড়িয়া চলিয়াছে।

এই সকল রকমারী রূপ গড়িবার দক্ষতা এবং বিচিত্র উপায়ে রসসৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ভারত হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। ভারতের এই দুর্ব্বলতার কথা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে অথবা দুর্ব্বলতাটাকে অস্বীকার করিলে জগতের লোক হাসিবে মাত্র।

বিজ্ঞানের মুলুকে ভারতমাতা চরক-সুশ্রুত ইত্যাদির জন্ম দিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরা চরক-সুশ্রুতের মতন লোক ত জন্ম দিয়াছিলই। পাঁচনের মাহাত্ম্য যখন যুগের খৃষ্টান সংসারে বেশ সুবিদিতই ছিল। তাহার উপর যুগে যুগে আজ পর্য্যন্ত নয়া নয়া চরক-সুশ্রুত পাশ্চাত্য সংসারে জন্মিয়াছে। এই কথা ভারতসন্তান আর বোধ হয় অস্বীকার করেন না।

ভারতমাতা আর্য্যভট্ট ভাস্করাচার্য্য ইত্যাদির জননী। ভাল কথা। কিন্তু খৃষ্টান জগতের সেকেলে ভাস্করাচার্য্যগুলা আজকাল প্রায় বাতিল হইয়া গিয়াছে। আইনষ্টাইন মাদাম কুরী ইত্যাদির যুগে গালিলেও ইত্যাদি বিজ্ঞানবীরের যুগ অতি নিশ্চয় এইরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পাশ্চাত্য নরনারীর সৃষ্টি-শক্তি অফুরন্ত ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভারতের কোনো লোক এ কথা অস্বীকার করিবে কি?

ইয়োরোপে আগে গরুর গাড়ী চলিত। আজ চলে সেই জায়গায় মোটর লরি, উড়ো জাহাজ। পুরুষানুক্রমে ইয়োরোপীয়ানদের আর্থিক কর্ম্ম প্রচেষ্টার নব নব রূপ দেখা যাইতেছে। ইহাও অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্বাধীন বিশ্বকোষে গরুর গাড়ীই অবশ্য চরম আবিষ্কার।

(৩২)

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা,—সুকুমার শিল্প সম্বন্ধে গতিবিধির জরীপ লইয়া ভারতীয় পণ্ডিত মহলে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সঙ্গীতের মুলুকে আমাদের ভরত এবং তানসেন জোড়া মাত্র, আর ইয়োরামেরিকার সেকেলে ভরত-তানসেনের ঠাঁইয়ে নয়া নয়া ভরত-তানসেনের আবির্ভাব হইয়াছে;—এ কথা বিশ্বাস করিবার মতন লোক ভারতে আজকাল কয়জন আছেন?

সেইরূপ চিত্রকলার তরফ হইতেও প্রশ্ন চলে। ভারতীয় জোতোর খুড়িদারগণ যাহা কিছু করিয়াছেন প্রায় তাহাই ভারতের রূপদক্ষ মহলে শিল্পের একপ্রকার শেষ কথা ছিল। ভারতমাতা যেরূপ নয়া নয়া চিকিৎসা-বীর, নয়া নয়া জ্যোতির্ব্বিদ, নয়া নয়া রাসায়নিক, নয়া নয়া জীবতত্ত্ববিৎ, নয়া নয়া এঞ্জিনিয়ারের জন্ম দিতে পারেন নাই, ঠিক সেইরূপই নবীন ইয়োরামেরিকার শিল্পবীর শ্রেণীর কোনো ওস্তাদের জন্ম দেওয়া তাঁহার ক্ষমতায় কুলায় নাই।

ভারতবর্ষের অক্ষমতা একসঙ্গে হাজার পথে প্রায় সমান-ভাবে দেখা দিয়াছিল। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুরক ভারতে যে "রেণেসাঁস" সুরু হইয়াছে [illegible] সম্প্রতি করা হইতেছে না।

ভারতীয় ওস্তাদগণের দৌড় একটা সীমানা আঁকিয়া ঠেকিয়াছিল। সেই সীমানা হইতে আগাইয়া যাওয়া ভারত শিল্পের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। যতটুকু গিয়াছিল তাহা পাশ্চাত্যের তুলনায় ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। যুরক ভারতের যে গণ্ডা দেড়েক শিল্প সমালোচক বা ঐতিহাসিক মান্ধাতার আমলের ভারতখানা লইয়া নাড়াচাড়া করেন তাঁহাদের মগজে এই সোজা কথাটি প্রবেশ করিতেছে না কেন?

(৩৩)

বরং তাঁহাদের আখড়ায় একটা উল্টা বাতিকই মাথা খাড়া করিয়া আছে। নতুন নতুন সৃষ্টি সাধন করিয়া ইয়োরামেরিকান শিল্পশক্তি যেখানে যেখানে দুনিয়ার চৌহদ্দিটা বাড়াইয়া দিয়াছে ও দিতেছে, সেখানে আমাদের ভারতীয় ঋষিত্ব ও আধ্যাত্মিকতার পাঁড় ধুরন্ধরেরা কোনো রূপ-দক্ষতাই দেখিতে পান না। তাঁহাদের চিন্তায় অথবা খেয়ালে ভারতীয় এবং প্রাচ্য "আদর্শ" পশ্চিম আদর্শ হইতে উন্নততর। ইহার নাম "ছোট মুখে বড় কথা" অথবা গাজুরি কিম্বা "অতি পাণ্ডিত্য" অথবা ইহাকেই বলে "আঙুর ফল খাট্টা!" ভারতে যেখানে যেখানে সৃষ্টিশক্তির অভাব সেখানেও উন্নত আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মপ্রাণতা উচ্চতর শিল্পকলা ইত্যাদি আবিষ্কার করিতে থাকা চিত্তের চরম দৈন্যই প্রকাশিত করে।

আঙুর ফল খাট্টা নয়। পাশ্চাত্য মুলুকের সর্ব্বত্রই নব নব সৃষ্টিগুলাও উন্নতিহীনতা, আধ্যাত্মিকতাহীনতা, পাশবিকতা এবং বর্ব্বরতার পরিচয় নয়। যতদিন এশিয়ার হৃদয় ও মাথা স্বাধীনভাবে নয়া নয়া জগৎ গড়িতেছিল

এতদিন প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে জীবনের কোনো স্তরে কোনো প্রকার ফারাক ছিল না। তাহার পর ইয়োরামেরিকা বাড়িয়া চলিয়াছে। এশিয়া বেচারা বাড়িতে পারেন নাই। এই জন্যই কি এশিয়া বলিতে অধিকারী যে পাশ্চাত্য দুনিয়া বর্ব্বর, খৃষ্টান সভ্যতা পাশবিক, ইয়োরামেরিকার প্রাণে অধ্যাত্মের পিয়াসা জাগে না?

(৩৪)

জোত্তোর প্রভাবমণ্ডলে থাকিতে থাকিতে আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোসেটি, বার্ণ্ জোন্স্, মিলেস ইত্যাদি ইংরেজ চিত্রশিল্পীরা একটা অতীত মুখো আন্দোলন রুজু করেন। তাহার নাম "প্রি-রাফায়েলিটিজ্‌ম্" বা প্রাগ্-রাফায়েল শিল্পশাস্ত্রের আন্দোলন।

তাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে রাফায়েলের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে সকল ইয়োরোপীয় (ইতালিয়ান) ওস্তাদেরা আঁকিয়াছেন তাঁহাদের কায়দা পুনরায় ফিরাইয়া আনা উচিত। তাহা হইলে বর্ত্তমান জগতের শিল্প-সংসারে একটা স্বাভাবিকতা ও সরলতা হাজির হইতে পারিবে।

"প্রাগ্-রাফায়েল" যুগ বলিলে যে সকল শিল্পবীরের নাম মনে উঠে তাঁহাদের ভিতর জোত্তোকে বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান বলিতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে সেই "প্রিমিটিভ" বা আদিম শিল্পরীতির নিদর্শন ইয়োরোপে বড় বেশী নাই। ষোলশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কাল চিত্রশিল্পে সেই আদিম কাল। জোত্তোকে পুরান ও নয়ার সন্ধিকালে ফেলা যাইতে পারে।

জোত্তোর আমল, "গথিক" আমল ইত্যাদি সময়কার শিল্প ও সাহিত্যের দিকে "প্রাগ্-রাফায়েল আন্দোলন" শিল্পী, কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমালোচক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর মাথাওয়ালা লোকের দৃষ্টি টানিয়া লইয়া যায়। পাশ্চাত্য জ্ঞানমণ্ডলে "মধ্যযুগের পুনরাবিষ্কার" সাধিত হয়।

ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের গৌরব প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জগতে সকল দেশের "প্রিমিটিভ্"গুলা পণ্ডিত ও শ্রদ্ধা-মহলে আদর পাইতে থাকে। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে চীনা জাপানী, মিশরীয়, ভারতীয় সকল আবিষ্কারই বর্ত্তমান জগতের রসরস জোগাইতে সুরু করে। অধিকন্তু, আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান, কঙ্গো-আফ্রিকান অর্থাৎ নিগ্রো, আজটেক-মেক্সিকান ইত্যাদি শিল্পরীতিও নবীন রূপ-দক্ষদের খোরাক জোগাইয়াছে। এক কথায়,—"মান্ধাতার আমল"টা নবীনতম যুগের "ভবিষ্যবাদ" গড়িয়া তুলিতেছে। এ এক বিপুল আধ্যাত্মিক বিপ্লব।

ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা অজন্তা-রাজপুত ইত্যাদির প্রেমিক হইয়া সেই "প্রাগ-রাফায়েল" আন্দোলনেরই জের চালাইতেছেন। মধ্যযুগ বা মান্ধাতার আমল যুবক ভারতের "ভবিষ্যবাদে" অনেক কথাই বলিতেছে।

পুরানা কোনো চিজ একদম বাতিল হইয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগের চরম বিপ্লবেও অনেক সময় মান্ধাতার আমলের ধরণ ধারণ খুব কাজে লাগিয়াছে। বোল্‌শেভিকরা আমদানি করিয়াছে কোন্ "আদর্শ"? বিলকুল আদিম কমুনিজ্‌ম বা ধন-সাম্য। আজ-কালকার লড়াইয়ে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে গোলাগুলি বর্ষণ করাই দস্তুর। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে দুর্গ দখল করিবার সময় অথবা তড়িতের ব্যাড়া (ট্রেঞ্চ) তাঁবে আনিবার জন্য তলোয়ার কিরীচ সঙ্গীন লইয়া লড়িতেও হয়। অথচ এই ধরণের হাতাহাতি বা মল্লযুদ্ধ মধ্যযুগের বা নেহাৎ "রাফায়েল" আমলেরই সেকেলে রীতি মাত্র। "লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষার" কিম্বৎ আজও ঢের।

সেইরূপ রেল এরোপ্লেন অটোমোবিলের যুগেও গরুর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী পুরাপুরি উঠিয়া যায় নাই। নবীনতম "কার্শালি"-কারখানার তৈয়ারি "ট্যাবলেট্" বড়ী ও অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার করাই আজকালকার রেওয়াজ। কিন্তু কি ইয়োরোপে কি এশিয়ায় হকমারি পাঁচন এবং "নেচার কিউর" বা প্রাকৃতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এখনো অনেক কাজে লাগে। গণিতের চরমতম আবিষ্কারের যুগেও এক দুই হইতে দশ গণনা রূপ ভারতমাতার বড় আবিষ্কারটা ইয়োরামেরিকার কেহই ফেলিয়া দিতে রাজি নয়।

এই জন্যই আনাটোল ফ্রাঁস, দস্তয়েবস্কি, হামসুন, ইত্যাদির যুগেও হোমার বাল্মীকি, কালিদাস, দান্তে, গ্যেটে ইত্যাদি সাহিত্যসেবিগণ মানবজীবনকে সরস করিয়া তুলিতে সমর্থ। এই কারণেই "জোত্তো," "সেজা," "হ্বাঙ্-হ্বে," "রাজপুত" ইত্যাদি নামের শিল্পরীতি যুগে যুগে নয়া নয়া "রেণেসাঁস," নয়া নয়া "রোমান্টিকতা" নয়া নয়া জীবনবত্তার বিপ্লব আমদানি করিতেছে। পুরানাগুলা মরিয়াও মরে না। অন্তত জীবনের সৃষ্টিকলার ইহাই স্বধর্ম্ম।

বন্দী-ডাঙ্গা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

যে কালে রাজারা মৃগয়া উপলক্ষে গভীর বনে পথ হারিয়ে এক পরমাসুন্দরী কন্যা বা দারুণ অভিশাপ কুড়িয়ে রাজ্যে ফিরতেন, তা হাজার বছর পারে চলে গেছে। একালেও সেই পুরাতন বন, গিরি, পর্ব্বত তেমনি বিরাজ কোরছে; তাতে মৃগযূথেরও অভাব নেই, উত্তরে হাওয়ায় আজও মৃগাম্বেষীর ভেরী তেমনি বেজে ওঠে; কিন্তু আর কারো পথের ভুল ঘটে না। মৃগয়া-যাত্রার মন-ভোলানো গল্পগুলিও তাই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবে আমার পূজ্যপাদ পিতামহের মুখে তাঁর কালের এক রাজপুত্রের গল্প অতি শৈশবে আমি বহুবার শুনেছি। যে স্থানে এখন আমরা বসবাস করছি, সেটা তারই একটী ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত। গল্পটা মোটামুটি এই :—

দীপতারার ভূস্বামী বিজয়কেশরীর নবাবী খেতাব ছিল রাজা। তিনি পাইক বরকন্দাজ ও পাত্র-মিত্র নিয়ে প্রবল প্রতাপে আপন ক্ষুদ্র রাজ্যটি শাসন করতেন। তার এতটুকু বিশৃঙ্খলা কোথাও ঘটতে দিতেন না। উদ্যত রাজদণ্ড প্রচণ্ড তেজে আপনার যা কিছু প্রাপ্য, প্রজাবৃন্দের কাছ হতে কড়ায়-ক্রান্তিতে আদায় করে নিত। তাঁর রাজকোষে ধনের অভাব ছিল না, অশ্ব ও হস্তীর বৃংহণ-হেষায় রাজপুরীর নিকটবর্ত্তী স্থান সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকৃত; এ ছাড়া পেয়াদা-পাইকের সদর্প চলা-ফেরা ত সারা দিন-রাত্রি ছিলই।

অজয়কুমার ছিলেন বিজয়কেশরীর একমাত্র পুত্র। তাঁর অভাবে রাজ্যপাট এবং চতুর্দ্দশ পুরুষকে স্বর্গের বিপুল অন্ধকার পথে আলো দেখিয়ে উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধতম প্রদেশে প্রেরণ করবার দুর্ব্বহ ভার তারই হাতে। এ কারণে পুত্রের প্রতি বিজয়কেশরীর স্নেহের মাত্রা অন্যান্য পরিমাণে অধিক ছিল। ফলে নদীর সুপ্রাচীন পিতামহের কালেও এ বালকটীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। রাজ-পরিজন ও প্রজা-বৃন্দ তার উচ্ছৃঙ্খলতা ও খেয়ালের ভয়ে সর্ব্বদা সচকিত থাকৃত। এবং এমন একটী মানুষও ছিল না, যাকে তার অত্যাচার নীরবে সহ্য কোরতে হয় নি। এমন কি, পরিশেষে স্বয়ং বিজয়কেশরীকেও দারুণ মনঃপীড়া সহ্য করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তাঁর অন্তর-ব্যথা বোঝবার মত মানুষ অতীব বিরল। বরং সেটা সকলের একটা সান্ত্বনা ও খুসীর কারণ হয়ে ওঠে। যাই হোক, একমাত্র পুত্রকে সর্ব্বগুণান্বিত করবার আশায় রাজা বিজয়কেশরী দেশ-দেশান্তর হতে কয়েক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে স্বরাজ্যে আনয়ন করে' তাঁদের হাতে অজয়কুমারের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। কিন্তু এই পণ্ডিতগণের অপেক্ষা রাজকুমারের সম্প্রীতি ছিল বহুদূর-দেশাগত জনৈক অস্ত্রশাস্ত্রবিৎ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গেই অধিক। অধ্যয়নাপেক্ষা অস্ত্রবিদ্যায় তাঁর পটুতা ও মনোযোগ ছিল যথেষ্ট। এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই, কৈশোরে তিনি একজন সুযোদ্ধা হয়ে ওঠেন। কালে সে রাজ্যের দূরে বা কাছে অশ্বচালনা ও অশ্বারোহণাদি নানান্ ব্যায়াম ক্রিয়ায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল বলে শোনা যায় নি। দীপ্ত-দীপশিখা-সদৃশ বর্ণ ও দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারায় এই যুবকটী যখন তাঁর দুরন্ত অশ্বচালনা করে রাজপথ দিয়ে সদর্পে চলে যেতেন, তখন মনে হত, এ বুঝি মহাভারতের কোন বীরকেশরীর দিগ্বিজয়-যাত্রা, যার মাত্র কামনাই শত্রুগণকে পরাস্ত ও অবনমিত করেছে। এ যাত্রা কেবল জয়লক্ষ্মীকে দূরদেশান্তর হতে বরণ করে রাজ্যে আনবার আয়োজন।

আমাদের আদি বাসভূমি ছিল দীপতারা থেকে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে চিত্রাগ্রামের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে। মাঝে সুদূর-প্রসারী একটী সুগভীর বন। তারি কোলে কোলে বৃক্ষলতা সরস সজীব এবং অরণ্যচারীগণের জীবন-ধারণ সহজ ও সুবিধার করে' আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে তীরে রেখে, চিত্রাগ্রামের ধারে ধারে একটী খরস্রোতা নদী বয়ে যেত। এই নদীটির একটি বহু পুরাতন খেলা ছিল, চিত্রাগ্রামের ক্রোশ দুই পশ্চিমে প্রতি বর্ষের বর্ষা অন্তে একখানি উর্ব্বর বিশাল চর ফেলে নববর্ষার তরঙ্গলীলায় সেখানিকে আবার

নিঃশেষে ধৌত করে ফেলা। আর এই চরখানি ছিল নানান্ বিপত্তির মূল।

অজয়কুমার যখন যুবক, একদা এই বনে অশ্বপৃষ্ঠে একাকী মৃগয়ায় যাত্রা করলেন। তখন শীতকাল। উত্তরে হাওয়ার সঙ্গে সুদূর হিমগিরি-পারের হংস-সারি বনের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। তাদের পক্ষধ্বনিতে সারা বনভূমি মুখর। বিজন, দীর্ঘ, শীতের বনের বিজনতা তাতে যেন আরও বেড়ে উঠছে। বোধ করি তাদেরই পিছু পিছু কিম্বা বনের নিরাভরণ বেশে আকৃষ্টহয়ে তিনি ক্রমে তার পঞ্চাশত্তম প্রবেশে উপস্থিত হ'ন। কেন না সেদিন কোন নিহত প্রাণীই তাঁর সঙ্গে দেখা যায় নি। এবং এম্‌নি ধরণের একটা কারণও পরে শোনা গিয়েছিল। ঘুরে ঘুরে অবশেষে বনের পারে বেলা ডুবে এল। সম্মুখে আসন্ন তিমির রাত্রি, দূর আকাশতট ছুঁয়ে বনরাজি, তার মাঝে গৃহে ফেরবার পথ-খানিও হারিয়ে গেছে। অগত্যা লক্ষ্যহীন ভাবে চল্‌তে চল্‌তে তিনি নদীর কূলে এসে পৌঁছলেন; তার পর সেখান থেকে আমাদের গ্রামের সন্ধান পেয়ে রাত্রির আশ্রয় খুঁজতে সেইদিকেই আসেন। মানুষের মতন গৃহেরও নিজস্ব একটা শ্রী আছে, যাতে মন আপনা হতেই আকৃষ্ট হয় ও খুসীতে ভরে ওঠে। আমাদের গ্রামের রামকমল গোঁসাইয়ের গৃহ-খানা ক্ষুদ্র হলেও শ্রীনাথা ছিল। সেই কারণে, কিম্বা হয় ত দৈব-দুর্বিপাকেই, অজয়কুমার সে রাত্রে আত্মপরিচয় গোপন কোরে তাঁদের গৃহে অতিথি হন। গোঁসাইজীর আন্তরিক আদর-আপ্যায়ন, তদপেক্ষা মধুর তাঁর কিশোরী কন্যা রমার যত্ন, অজয়কুমারের সব শ্রান্তি-ভার দূর করলে। তাঁর মুখশ্রী ও স্বাস্থ্য যেন রাজকুমারকে মুগ্ধ করে ফেল্‌লে। অবশ্য পরদিন প্রত্যূষে কিছু ভারাক্রান্ত চিত্তেই তিনি স্বস্থানে ফিরে যান। কিন্তু এর পর থেকেই দেখা গেল, তাঁর বার-বার পথের ভুল ঘট্‌ছে; প্রতি সন্ধ্যায়ই রাজকুমার নিরাশ্রয় ও গৃহহীন। রমাও যেন প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ হাতে করে প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকে, যেন কোন্ গৃহহীন মন্দভাগ্য ঐ বনে পথ হারিয়ে একলাটি অন্ধকারে ঘুরে মরছে, যার জন্যে তার চিত্তটি বেদনাতুর। এম্‌নি কোরে অনেক-গুলি সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটে গেল। ক্রমে এ খবরটি নানান্ রূপে কর্ণ হতে কর্ণান্তর হয়ে অবশেষে হঠাৎ একদিন দীপ-তারার সিংহাসন অবধি পৌঁছল। রাজা চিন্তিত হয়ে পড়্‌লেন। কিন্তু যে পুত্র শাসনের অতীত, তাঁকে শাসন কর্‌তে যাওয়া বুদ্ধিমানের কায নয়। বিজয়কেশরী পুত্রকে নিভৃতে ডেকে যতদূর সম্ভব তাঁকে সম্যক্ অবস্থাটা বুঝিয়ে দেবেন মনস্থ করলেন। কিন্তু এক প্রভাতে রাজ-প্রাসাদের পাষাণ-সোপান-শ্রেণী অতিক্রম কালে সহসা পদস্খলনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ফলে রাজকুমার অবিলম্বে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় তাঁর চিত্তেরও অনেক কিছু যেন পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল।

রাজপুত্রকে যা সাজে, রাজার পক্ষে তা সকল ক্ষেত্রে না হলেও অনেক স্থলে অবশ্য পরিত্যাজ্য। আর সিংহাসনে বসে হৃদয় জিনিসটাকে ত ঐ সঙ্গে মানা চলে না। ও হয় ত পৃথিবীর বিপুল সাম্রাজ্যকেই এক নিমেষে ত্যাগ কোরে বসবে, তার জন্যে ছোট একটী নিঃশ্বাসও ফেল্‌বে না। এই কারণে হয় ত রমার কথা আর রাজা অজয়কুমারের মনে পড়ে না। তিনি রাজকার্য্য নিয়েই থাকেন। রমার প্রতীক্ষার প্রদীপখানি রাত্রির অন্ধকারে বৃথাই জ্বলে জ্বলে নিবে যায়। অবশেষে উত্তরের দেশ থেকে এক রাজকন্যাকে নিয়ে অজয়কুমার যেদিন রাজ সমারোহে রাজ্যে ফিরলেন, সেদিন সেটুকুও তার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভরে' চিরদিনের মত নিবে গেল। এর কিছুকাল বাদে চিত্রাগ্রামের নিঃসন্তান ও বৃদ্ধ ভূস্বামীর সহিত রমার বিবাহ হয়। মদীয় পিতামহ এই বর্দ্ধিষ্ণু জমীদারেরই দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বৎসর খানেকের মধ্যেই রমার বৈধব্য ঘটে।

তারও পর ছটি বৎসর কেটে গেল। নামহীন ঐ চরখানির মালিকান্ স্বত্ব নিয়ে চিত্রাগ্রাম ও দীপতারার মধ্যে সেই পূর্ব্ব গোলযোগ আবার নূতন কোরে দেখা দিয়েছে। বিজয়কেশরী কিছুকাল জীবিত থাকলে চাল দিয়ে হয় ত চরখানিকে অবশেষে নিজের দখলে আন্‌তে সমর্থ হতেন। কিন্তু তাঁর মত ধৈর্য্য ও বুদ্ধি অজয়কুমারের চরিত্রে না থাকার দরুণ তিনি বাহুবলে তার দখল নিতে উৎসুক হলেন। বস্তুতঃ ঐ চরখানির মালিক চিত্রাগ্রাম ছাড়া স্থায়তঃ আর কেহই নয়। চিত্রাবাসীর যত্নে ও পরিশ্রমে তাতে প্রতি বৎসর ফসল ফলে ওঠে এবং বহুকাল যাবৎ তারাই এখানিকে ভোগ দখল করে আস্‌ছিল। তবে যাকে কি কারণে যেন জমীখানি পতিত থাকে। কেবল-মাত্র স্ব-রাজ্য সীমান্তবর্ত্তী জমীর অজুহাতেই দীপতারা

রাজ তার মতন চান। যাই হোক, অজয়কুমারের কর্ম্মচারী-বৃন্দও তাঁর মত সমর্থন করে বুঝিয়ে দিলে যে, এই সুবর্ণ সুযোগ। কেন না, সে বিচক্ষণ বৃদ্ধ জমীদার আর নেই। তার স্থলে যিনি আছেন, তাঁর ভয়ে অগ্রসর না হওয়া পুরুষ জাতির পক্ষে অতীব অপমানকর। উপরন্তু, এ সময়ে আর একটী সুবিধা ও লাভ এই দেখা যাচ্ছে যে, চিত্রাবাসীদের রোপিত ধানগুলিকেও তারা কেবলমাত্র কেটে আনবার ক্লেশ স্বীকার করলেই ঘরে আন্‌তে পার্‌বে। আর যদি এতে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তা দীপতারার অস্ত্রমুখে টিক্‌বে না; বরং সেটা তাদের শক্তির জয়-ঘোষণা করে নিজেকে পররাজ্যেও প্রতিষ্ঠিত করবে। এক্ষেত্রে কাল-ক্ষেপ আলস্যেরই পরিচায়ক এবং তাতে সুফলেরও সম্ভাবনা নেই। এই পরামর্শের ফলে দীপতারার নবীন রাজা সকলকে প্রস্তুত হবার আদেশ দিলেন। পরদিন প্রত্যূষেই স্বয়ং তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাত্রা করবেন। কথাটা সেই-দিনেই বন পেরিয়ে চরমুখে চিত্রাগ্রামে পৌঁছে গেল। মদীয় পিতামহ দেব অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রমার কাছে এ অশুভ সংবাদ জ্ঞাপন করতেই, তার মুখ-চোখ সহসা অতি কঠিন হয়ে উঠল। ক্ষণিক নীরব থেকে সে বল্লে—"আচ্ছা।"

মদীয় পিতামহ জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

"সকলকে প্রস্তুত হবার আদেশ দিন। আর এই রাত্রেই যাতে, যারা আছে, তারা ছাড়া আরও ভাল ভাল সর্দ্দার যোগাড় হয়, তার ব্যবস্থা করুন।" রমার মুখ-চোখের চেহারা ও কথাবার্ত্তার রকম দেখে তাঁর আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহস হল না। তিনি লোক সংগ্রহের জন্য চলে গেলেন।

সংসারে আসল বস্তুটির পাশে-পাশে তার নকলটিও আবহমান কাল ধরে চলে আস্‌ছে। আর অনভ্যস্ত চক্ষুকে ফাঁকি দিতে হলে তার আবশ্যকও একান্ত। আসল বস্তুটি যেখানে নেই অথচ তাকে না হলে চলা দায়, সেখানে আপনা হতে যেন নকলটি দেখা দিয়ে মান বাঁচায়। দীপ-তারার সৈন্য সামন্ত বল্‌তে কোন কালেই কিছু ছিল না; এবং যেদিন তার আবশ্যক হ'ল, সেদিন সে নকল দিয়ে কাজ চালাতে সুরু করলে। তার এই সব সৈন্য-সামন্তের পোষাক পরিচ্ছদ ও আস্ফালনে চট্ কোরে মনে হ'ত এরা জাত সৈন্য—এক নিমেষে সসিন্ধু ধরিত্রীকে জয় কোরে ফেল্‌তে পারে। এ কারণে তাদের রণ-সজ্জার সংবাদে চিত্রাবাসীর মনে ভয়েরই সঞ্চার হয়। তবে সৌভাগ্যবশতঃ এ দেশের প্রথামত রণের পূর্ব্বেই তারা কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নি।

পরদিন আকাশের কোলে তখনও একটু অন্ধকার ও দুএকটী তারা লেগে আছে, পথঘেরাগুলিও অস্পষ্ট,—পাঁচশো সুসজ্জিত যোদ্ধা দীপতারা থেকে ছায়া-সারির মত বেরিয়ে পড়ল। তার সব শেষে অশ্বপৃষ্ঠে অজয়কুমার। দ্রুত চলে তারা যখন সেই ক্ষেতখানির ধারে এসে উপস্থিত হল, চারিদিক তখন রৌদ্রে ভরে উঠেছে। ভরা ক্ষেতের সুপুষ্ট ধানমঞ্জরীগুলি ফলভারে মাটির বুক পানে টলে-টলে পড়্‌ছে; আর সেই সঙ্গে তা থেকে উঠ্‌ছে খুসীর একটা অস্ফুট গুঞ্জরণ! অজয়কুমার চারিধারে তাকিয়ে দেখ্‌লেন—অলস নদী-ধারা ও তরুশ্রেণী, তার মাঝে তাঁকে বাধা দেবার মতন কাউকে চোখে পড়্‌ল না। এই উপযুক্ত অবসরে তিনি সকলকে আদেশ করলেন—"ধানগুলি সব কেটে নাও—"

আদেশ মাত্র পাঁচশো লোক হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলে কাস্তে নিয়ে ধান কাটা সুরু করলে। তাদের নির্ম্মম আঘাতে ক্ষেতখানির অন্তর-বেদনা যেন উপ্‌চে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। নির্ব্বিঘ্নে প্রায় সিকি অংশ কাটা শেষ হয়েছে—তরুপুঞ্জের ফাঁক হতে সহসা তিনশো লোক মদীয় পিতামহের নেতৃত্বে অস্ত্র-হাতে তাদের বাধা দিতে ছুটে এসে একটা তুমুল সংঘর্ষ বাধিয়ে তুল্‌লে। কিন্তু দীপতারার পক্ষে লোকবল ও অস্ত্রবল অধিক থাকায়, অল্প ক্ষণের মধ্যেই চিত্রাবাসীদের পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগ্‌ল। তথাপি মদীয় পিতামহ সকলকে উৎসাহিত কোরে পৌরুষ বজায় রাখবার প্রাণপণ প্রয়াস পেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ হাতখানি শত্রুপক্ষের অস্ত্রাঘাতে চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে। শুনেছি এবং আমরাও এ কথায় গর্ব্ব অনুভব করি যে, তিনি এ ক্ষতির বেদনা তুচ্ছ করে সকলকে উৎসাহিত করেছিলেন। যাই হোক, তাঁর পক্ষে যখন জয়ের আশা আর রইল না, দু একটা করে তাঁদের পক্ষের লোক পৃষ্ঠ প্রদর্শন কোরতে সুরু কোরেছে, হঠাৎ বহুকণ্ঠের একটা জয়োল্লাস তাঁরা শুন্‌তে পেলেন। ফিরে দেখলেন,

একখানি শিবিকার পিছনে বহু লোক নানান্ অস্ত্র নিয়ে তাঁদের দিকে ছুটে আস্‌ছে।

রণক্ষেত্রের কাছে এসে বাহকেরা শিবিকাখানিকে নামাবামাত্র তার অভ্যন্তর হতে একটী নারী বার হয়ে পিছনে ফিরে বল্‌লে—"তোদের ধর্ম্ম ও শস্ত্র অপরে লুটে নিতে চায়—এ অত্যাচার, অপমান পুরুষ হয়ে সইবি?" কথাটায় যেন আগুন ছিল। বল্‌বামাত্রই সকলে অমিত তেজে দীপতারার বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'ল। ঠিক সেই সময়ে অজয়কুমার পরুষ কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন—"চিত্রা গ্রামের ঠাকরুণকে যে বন্দী কর্‌বে আমার এই উষ্ণীষ তার।" কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তার উষ্ণীষের বহুমণিটী প্রভাত-সূর্য্যে সহসা যেন জ্বলে উঠ্‌ল।

রমাও যেন প্রত্যুত্তরে বলে উঠ্‌ল—"তোদের প্রতি অন্যায়কারীকেও তোরা যেন ভুলিস্ নি।"

ফলে উভয় পক্ষ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়্‌ল। পরস্পরকে হত্যা করাটাই যেন তখন তাদের চরম লক্ষ্য। ফসল-ভরা ক্ষেতখানির কথা আর তাদের মনেই রইল না। সেখানিকে পদদলিত কলুষিত ও রক্ত-রঞ্জিত করে তারা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, দীপতারার পক্ষে যেন শৈথিল্য ঘট্‌ছে; তাদের অস্ত্রের আর সে তেজ নেই। ক্রমে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং স্বয়ং দীপতারা-রাজ চিত্রাবাসীর হাতে বন্দী হয়ে রমার সম্মুখে নীত হলেন। তাঁর উষ্ণীষের মণিটি যেন এই তরুণী বিধবাটির শান্ত মুখশ্রীর কাছে ম্লান হয়ে গেছে। তিনি অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হ'ল যেন কতকালের একটা রুদ্ধ অশ্রুর উৎস-ধারা সহসা রমার চোখের পাতায় দেখা দিলে। কিন্তু সে চকিতে আত্ম-গোপন কোরে বন্দীর পিতামহকে বল্লে—"চিত্রাবাসী ত ক্ষমা করতেও জানে।" তার পর তিলার্দ্ধ সেখানে অপেক্ষা না কোরে শিবিকায় আরোহণ করে চিত্রা-গ্রামের পথে অগ্রসর হ'ল। অল্প দূর মাত্র গিয়েই সে শিবিকা হতে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, অজয়কুমার তখনও সেখানে চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে,—যেন কত দিনের কত কথা তাঁরও মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। রমা বোধ হয় যেন বাহকদের শিবিকাখানি থামাবার আদেশ করলে। কিন্তু শিবিকাখানি থামবার পূর্ব্বেই অজয়কুমার সেখান হতে ধীরে প্রস্থান কর্‌লেন। রমা আবার ফিরে চল্‌ল। শুনেছি বন্দীর পিতামহ তখন তাঁর উদ্গত অশ্রু রোধ কর্‌তে পারেন নি—হায় নিয়তি! এর পরে তাদের উভয়ের আর কোন দিনও দেখা হয়নি।

সেই বৎসর হতে নদীটি এই চরখানিকে ফেলে রেখে ওই দূরে সরে গেল। ক্রমে এখানে ছায়া-সুশীতল এই ছোট গ্রামখানি গড়ে উঠেছে; চারিধারে বিশাল সবুজ শস্য ক্ষেত, তার ওধারে দূর গ্রামের ধোঁয়ার সীমানা। এখানিকে নিয়ে চিত্রা ও দীপ-তারায় আর সে কলহ বাধে না। সে চিত্রার চিহ্ন অবধি কোন দিন মুছে গেছে। আর দীপ-তারার প্রাসাদপুরীর ভগ্ন-স্তূপ আজ বিল্লী-মুখর ও অরণ্যচারীর আবাসভূমি।

কিন্তু লোকে সেই থেকে এই যায়গাটির নাম দিয়েছে বন্দী-ডাঙ্গা এবং ভাগ্যচক্রে আমরাই তার বর্ত্তমান ভূস্বামী।

বাঙ্গলার কৃষির উন্নতি

শ্রীনির্ম্মল দেব

যে দেশের ২৫ কোটি নরনারীর প্রতি দিনের অন্ন প্রত্যক্ষভাবে কৃষি হ'তে উদ্ভূত হয়, সে দেশে কৃষির গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনো তর্কই উঠতে পারে না। কিন্তু কৃষির উন্নতি ব'ললেই অনেক প্রাচীন পন্থীর মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়—যে পদ্ধতিতে চাষ-বাস ক'রে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা ভাল খেয়ে, ভাল প'রে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে গেছেন, আজ এতদিন পরে সে কৃষির উন্নতির কী প্রয়োজন! কিন্তু একটু তলিয়ে ভাব্‌লেই বেশ বোঝা যায় যে তাঁদের এ সন্দেহ সম্পূর্ণ অর্থহীন। পুরোনো কালে এই ভারতবর্ষের এমন একটা দিন ছিল যখন এত অসংখ্য পথ ছিল না, ঘাট ছিল না, রেল্ ছিল না, ষ্টীমার ছিল না—এত আনাগোনার ভিড়ে যখন মানুষ এমন ক'রে হারিয়ে যায় নি। তখন মানুষের সংখ্যাও এখনকার চেয়ে কম ছিল এবং এক দেশের অন্ন এত সহজে ও এত অল্প সময়ে অন্য দেশে চ'লে যেতো না। তখন গ্রামের অন্ন প্রায় গ্রামেই থাক্‌তো এবং মানুষের প্রয়োজনও ছিল অল্প; সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে মানুষ তখন

জীবন কাটাতো। কিন্তু এখন সে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘ'টেছে। এখন মানুষ সংখ্যায় বেড়েছে, তা'র বাস্তব প্রয়োজন বেড়েছে, এবং ছ'মাসের পথ মানুষ ছ'দিনে, ছ'ঘণ্টায় অবাধে চ'লে যাচ্ছে। এখন ভারতবর্ষের সঙ্গে সারা পৃথিবীর একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, তা'র অন্ন কত দূর দেশ-দেশান্তরে চ'লে যাচ্ছে। তাই এখনকার দিনে ভারতবর্ষের অভাব ও প্রয়োজন মিটছে না। সুতরাং জমীর ফসল বাড়ানো একান্ত দরকার হ'য়ে প'ড়েছে।

তাই এখন সারা পৃথিবীতে প্রত্যেক সভ্য গভর্ণমেণ্টের শাসন-যন্ত্রের মধ্যে কৃষি-বিভাগও একটা প্রধান অঙ্গ এবং প্রত্যেকেরই শেষ লক্ষ্য—কি ক'রে অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প ব্যয়ে জমীর আয় বাড়ানো যায়। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগেরও এই মুখ্য উদ্দেশ্য। আজ প্রায় ২৫ বছর এই বিভাগের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে, এবং এই সুদীর্ঘ ২৫টি বছর ধ'রে অক্লান্ত চেষ্টা চ'লছে বাঙ্‌লা দেশের কৃষির উন্নতির পথ খুঁজে বের করার। এ চেষ্টা যে নিষ্ফল হয়নি, আজ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ধান, পাট, আক, আলু—এই বাঙ্‌লার প্রধান শস্য। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ বহু দিন ধ'রে সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে নানা জাতের নানা প্রকারের শস্য পাশাপাশি পরীক্ষা ক'রে এই সকল ফসলের এমন জাত আবিষ্কার ক'রেছেন—যা'দের ফসল স্থানীয় জাতের চেয়ে অনেক বেশী এবং বাঙলার কৃষকরা ইচ্ছা ক'রলেই সেই সকল উন্নত বীজের চাষ ক'রে জমীর আয় বাড়িয়ে যথেষ্ট লাভবান্ হ'তে পারে; অথচ এর জন্যে তা'দের কোনো বেশী ব্যয় ক'রতে হবে না, ক'রতে হবে কেবলমাত্র বীজ পরিবর্ত্তন—স্থানীয় বীজের স্থানে এই বীজ বপন।

এই সকল বীজের মধ্যে প্রধান ও প্রথম উল্লেখ-যোগ্য চিন্‌সুরা গ্রীণ পাট। এটি দেশী-মুঁটি-জাতীয় পাট (olitorius) এবং বাঙ্‌লা দেশের যেখানেই উঁচু জমীতে পাটের চাষ হয়, সেখানেই এর চাষ হ'তে পারে। গত কয় বৎসর ধ'রে যেখানেই এই পাটের চাষ হ'য়েছে, সেখানেই বিনা-ব্যতিক্রমে এই পাটের ফলন স্থানীয় পাটের চেয়ে বিঘা প্রতি ১মণ পর্য্যন্ত বেশী হ'য়েছে। এর এই ফলনের গূঢ় কারণ এই যে, দেশী পাট বোন্‌বার ২৷৷০ মাস থেকে ৩ মাসের মধ্যে ফুল ধরে, কিন্তু এই উন্নত পাটের ফুল ধ'রতে আরও ১মাস ১৷৷০ মাস লাগে। সকলেই জানেন যে, ফুল ধ'রলেই গাছের বাড়্ বন্ধ হ'য়ে যায়, সুতরাং দেশী গাছের বাড়্ যখন থেমে যায়, চিন্‌সুরা গ্রীণ্ পাট তখনও পর্য্যন্ত বাড়্‌তে থাকে এবং এই কারণেই এ পাটের ফলন দেশী পাটের চেয়ে বেশী হয়। এ পাটের আঁশও খুব মোলায়েম ও চক্‌চকে, এবং সেই কারণে দেশী পাটের চেয়ে বেশী দামে বিকোয়। কাকেরা বোম্বাই ও চাকা ১৫৪ নং নামে কৃষি বিভাগের আরও দু'টো উন্নত জাতের পাট আছে। এগুলি গোল-মুঁটি-জাতীয় পাট (capsularis) এবং নীচু জমীর উপযোগী। এদের ফলনও দেশী নীচু জমীর পাটের চেয়ে বিঘা প্রতি ১মণ থেকে ২মণ পর্য্যন্ত বেশী হয়, অথচ এই দুই পাট চাষের প্রণালীর কোনো পার্থক্য নেই। সারা বাঙ্‌লা দেশে প্রতি বৎসর গড়ে ৭১৭০০০ বিঘা পরিমাণ জমীতে পাটের চাষ হয়। এই সকল জমীতে স্থানীয় পাটের পরিবর্ত্তে যদি কৃষি বিভাগের উন্নত বীজের পাটের চাষ হয়, তা' হ'লে জমীর আয় কত অনায়াসে কত অজস্র পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে, এ থেকে তা' সহজেই অনুমান করা যায়।

ধানের মধ্যে কৃষি-বিভাগের কটকতারা, ইন্দ্রশাল ও দুধসর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কটকতারা আউশ জাতীয় ধান, আশ্বিনের মধ্যেই এ ধান কাটা হ'য়ে যায়। সুতরাং এই ধান কেটে যে-কোনো রবিশস্য বোনা যেতে পারে। এর চাল মিহি, শাদা এবং অন্ন সুগন্ধযুক্ত। এর ফলনও খুব ভাল। যে সকল উঁচু ধান-জমীতে আশ্বিন মাসে জল স'রে যাওয়ার দরুণ আমন ধান ভাল জন্মায় না, সেই সকল জমীই এই ধানের উপযোগী এবং সেই প্রকার জমীতে এই ধান চাষ ক'রে পরে একটা রবিশস্য লাগালে একই জমী থেকে বেশ একটা ভাল ধান এবং রবিশস্য—দু'টো ফসলই পাওয়া যেতে পারে। যে সকল নীচু ধান-জমীতে কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই সকল জমীই ইন্দ্রশাল ধানের উপযোগী এবং সেই প্রকার জমীতে ইন্দ্রশাল স্থানীয় আমন ধানের চেয়ে বিঘাপ্রতি গড়ে ১মণ থেকে ২মণ পর্য্যন্ত বেশী ফলে। এর দানা মাঝারি, চাল শাদা এবং এর ভাতও সুস্বাদু। এই ধানে ভাল খই-মুড়িও হয়। সাধারণ আমন জমীর জন্যে দুধসর ধান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এটিও মাঝারি ধানার ধান এবং এর ফলনও খুব ভাল।

আকের মধ্যে কৃষিবিভাগ এখন ট্যানা আকই অনুমোদন করেন। এই আক খুব মোটা ও লম্বা হয় এবং এর গুড়ের ফলনও দেশী আকের চেয়ে অনেক বেশী। এর ছাল খুব শক্ত, সেইজন্য দেশী আকের মতন এ আকের ওপর শেয়াল-শুওরের উপদ্রব হয় না। কড়া ধাতের আক ব'লে এ আক শুখো-হাজা দুইই সহ্য ক'রতে পারে। ভাল ক'রে চাষ ক'রে চুঁচুড়া-কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ট্যানা আক থেকে বিঘেয় ৫৫ মণ পর্য্যন্ত গুড় পাওয়া গেছে। গভর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্রগুলিতে মাদ্রাজ থেকে আনা অপর একটা জাতের আকের পরীক্ষা চ'লছে, এবং এ পর্য্যন্ত যা' ফল পাওয়া গেছে, তা'তে আশা হয় যে, অদূর-ভবিষ্যতে এই আকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে পরিগণিত হবে। আরও কিছু দিন পরীক্ষা না ক'রলে স্থির-নিশ্চয় হওয়া যায় না, সেইজন্য এই আক এখনও চাষীদের মধ্যে প্রচলিত করবার কোনো চেষ্টা করা হয়নি।

উপরিউক্ত শস্যাদি ছাড়া ঢাকা ও চুঁচুড়া কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে নানা জাতীয় তুলো, পাট ও গবাদির সজ্জী-ঘাসের পরীক্ষা চ'লছে, এবং এই সকল পরীক্ষার ফলে যখন কোনো বিশেষ জাত শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রমাণিত হবে, তখন সেই সব জাত সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করা হবে।

শস্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গোজাতির উন্নতির জন্য বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ রংপুরে সরকারী গোপালন-ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। সেখানে যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব থেকে ভাল ভাল জাতের ষাঁড় এনে দেশী গরুর সঙ্গে জোড় দিয়ে বাছুর উৎপাদন করা হচ্ছে, যাতে উত্তর প্রদেশের বেশী দুধ দেওয়ার শক্তি এবং বাঙ্‌লা দেশের জলবায়ু-সহিষ্ণুতা—এই দুটো গুণই একই গরুর মধ্যে থাকতে পারে।

গত ১৫।১৬ বছর ধ'রে এই চেষ্টার ফলে রংপুর গোপালন-ক্ষেত্রে এই দুই গুণ-সমন্বিত এমন ষাঁড় উৎপন্ন হ'য়েছে, যেগুলির দ্বারা বাঙলার দুগ্ধহীন শক্তিহীন গোজাতির যথেষ্ট উন্নতি হ'তে পারে।

কৃষির এই সকল উন্নতি কৃষকদের দৃষ্টিগোচর করবার জন্যে প্রত্যেক জেলায় একজন ক'রে সুশিক্ষিত সরকারী কৃষি অফিসার্ (District Agricultural Officer) এবং তাঁ'দের অধীনে একাধিক কৃষি-প্রদর্শক (Agricultural Demonstrator) নিযুক্ত আছেন। কৃষকরা ইচ্ছা ক'রলেই উন্নত কৃষি বিষয়ে সব রকম পরামর্শ ও উপদেশ এঁদের কাছ থেকে পেতে পারেন।

কৃষির উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট্ যথাসম্ভব ক'রেছেন ও ক'রছেন। কিন্তু দেশের কোনো স্থায়ী উন্নতি কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কোনো দিন হয় না—যদি দেশের লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি তা'র সঙ্গে একান্ত ভাবে জড়িয়ে না থাকে। তাই এখন প্রত্যেক শিক্ষিত স্বদেশ-হিতৈষী বাঙালীর কর্ত্তব্য—গ্রামে গ্রামে কৃষি-সমিতি গঠিত ক'রে, সরকারী কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষিত এই সকল উন্নতির দিকে অজ্ঞ অশিক্ষিত কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সেই সকল উন্নত উপায় অবলম্বন ক'রে কৃষির উৎকর্ষ সাধন ক'রতে তাদের প্রণোদিত করা। এ কথা তাঁ'রা যেন কোনো দিন না ভোলেন যে, মানুষের জ্ঞান কোনো দিন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেনি, সে চির-গতিশীল—চিরদিন ধ'রে সামনের দিকে এগিয়ে চ'লেছে। তাই অন্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বিজ্ঞানেও প্রতি দিন কত নূতন জ্ঞান মানুষ লাভ ক'রছে, কত নূতন তথ্য সে আবিষ্কার ক'রছে। এ কথা কখনও যেন আমরা মনে না করি যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের জ্ঞানই চরম ও পরম ছিল—তা'র পর আর জানবার বা বোঝবার কিছুই নেই! প্রাচীনত্বের মজ্জাগত মোহ ত্যাগ ক'রে, অন্তরের জীর্ণ অসাড়তাকে নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে, মানুষের অবিশ্রান্ত-চেষ্টালব্ধ নূতন নূতন জ্ঞান-গুলোকে, আবিষ্কারগুলোকে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ ক'রে, যদি আমরা সকলেই আন্তরিকভাবে সব দিক থেকে দেশের উন্নতি ক'রতে বদ্ধপরিকর হই, তা'হ'লে এই পশু-দলিত, নির্জ্জীব, দরিদ্র, অনাহারী দেশ নিশ্চয়ই আবার এক দিন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহসে-শক্তিতে, ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে! বিশ্ব-নিয়ন্তার চরণে প্রার্থনা করি, ভারতবর্ষের সে দিন আসুক!

বীর-তর্পণ

বীরের মৃত্যুতে শোক করিতে নাই ; শান্ত-গম্ভীরচিত্তে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে হয়। বীরের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়।

হইয়াছিল, তখন ৪।৫ শত হিন্দু যুবক কেবল লাঠি লইয়া অকুতোভয়ে তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পুলিশ আসিয়া পড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যদি ইঁহারা দুর্ব্বৃত্তদিগকে

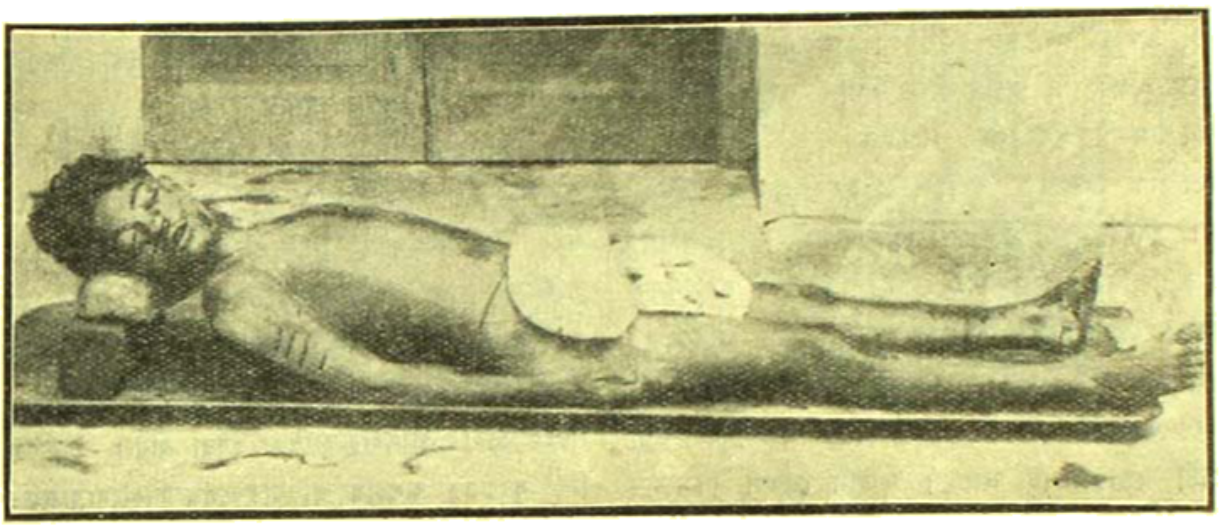

চন্দ্রকান্ত দেব

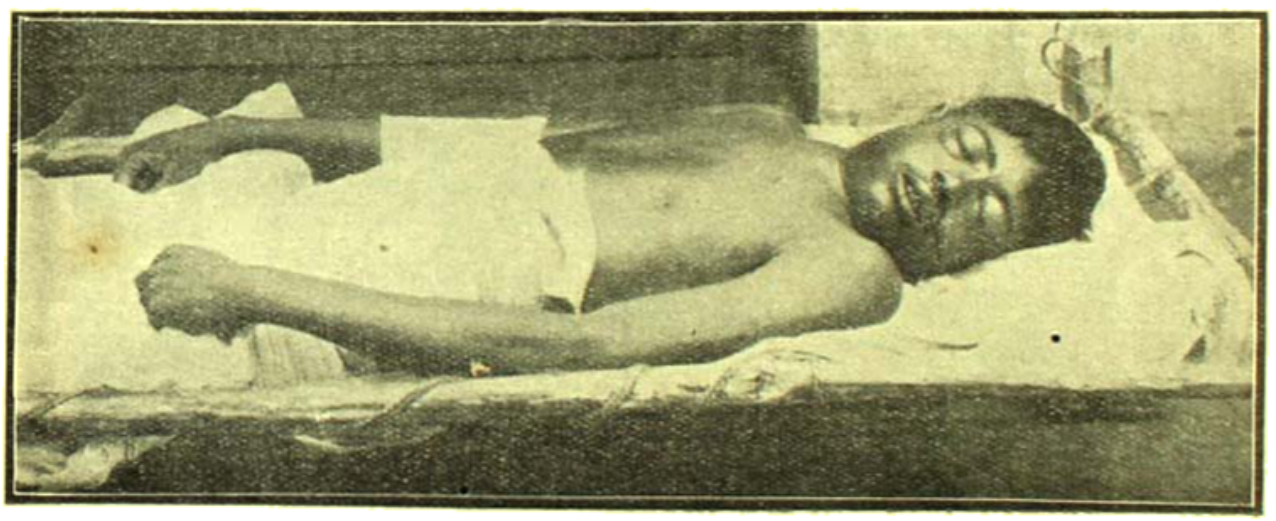

যতীন্দ্রনাথ সুর

১৪ই বৈশাখ মঙ্গলবার প্রভাতে ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বি-সহস্র গুণ্ডা যখন রাজাবাজার হইতে অগ্রসর হইয়া মেছুয়াবাজারের হিন্দু পল্লী আক্রমণ করিতে উদ্যত ঠেকাইয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে নৃশংস গুণ্ডারা হত্যা ও লুণ্ঠনের কি তাণ্ডবলীলা করিতে পারিত তাহা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ধন্য তাঁহারা—যাঁহারা গুণ্ডাদের কলুষিত লাঞ্ছনা হইতে পল্লীর সম্মান রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা অমিত পরাক্রমে চতুর্গুণ অধিক আততায়ীকে তাড়িত করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

এই রক্ষীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীমান চন্দ্রকান্ত সেব ও যতীন্দ্রনাথ সুর পুরোভাগে থাকিয়া যখন দুর্বৃত্তদিগকে বাধা দিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহারা গুলির আঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হন এবং অল্পকালের মধ্যেই অক্ষয় স্বর্গলাভ করেন। আত্মোৎসর্গের পূর্ণ অবদানে জননী ও জন্মভূমিকে কৃতার্থ করিয়া এই বীর যুবকদ্বয় বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন।

চন্দ্রকান্ত সেবের বাড়ী ত্রিপুরাজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামে। বিধবা মাতা ও দশবর্ষ বয়স্ক ভ্রাতার ভরণপোষণের একমাত্র তিনিই অবলম্বন ছিলেন। ২৪ নং রামপুকুর লেনের মেসে থাকিয়া চন্দ্রকান্ত কার্য্য করিতেন। যতীন্দ্রনাথ সুরের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার কুলসী গ্রামে (বেণ্টেশ্বর বাগিলা)। ইঁহার বাড়ীতে এক বিধবা ভগ্নী ও দুইটী ছোট ভাই আছে। ইনি কেমস্ ফিনলের অফিসে কার্য্য করিতেন এবং ১৯নং রাজাবেনে থাকিতেন।

তাঁহাদের পরলোক-গমনের তৃতীয় দিনে বিপুল শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাদের শব নিমতলার শ্মশানে নীত হয় এবং সমাগত অসংখ্য নর-নারীর জয়ধ্বনির মধ্যে ভাগীরথী-তীরে দাহকার্য্য শেষ হয়।

এই দুইটী যুবকের নিঃস্ব পরিবারের সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

এই স্মরণীয় ১৪ই বৈশাখ শুক্রবারে আরও একটী বাঙ্গালী যুবক স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে অবহিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ভরতচন্দ্র রায়। ইনি কলিকাতা পুলিসের হেড কনেষ্টবল ছিলেন। উক্ত ঘটনার দিন প্রাতঃকালে যখন উন্মত্ত গুণ্ডার দল রাজাবাজারের মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইনি তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন। তাহারা তাঁহার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া যখন অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে, তখন মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও এই বীর যুবক তাহাদের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হন। অকস্মাৎ গুণ্ডাপক্ষ হইতে একটী গুলি তাহার বক্ষে আসিয়া পড়ে, কর্ত্তব্য-পরায়ণ যুবক তখন ধরাশায়ী হন এবং একটু পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। এই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ যুবকের অসহায় পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্যও চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

আমরা এই সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রকান্তের মৃতদেহের ছবি প্রকাশ করিলাম; অনেক চেষ্টা করিয়াও ভরত রায়ের ছবি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

শোক-সংবাদ

৺রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর

বিগত ৪ঠা চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর ৪৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। মাত্র পাঁচদিন জ্বর ভোগ করিয়া তিনি লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। রাজা সতীপ্রসাদের পরলোকগমনের সংবাদ যে আমাকে বহন করিতে হইবে, ইহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। তিনি আমার ছাত্র ছিলেন, আমার পুত্রতুল্য ছিলেন। তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য, জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত করিবার জন্য আমার চেষ্টা যত্ন বিফল হয় নাই, রাজা সতীপ্রসাদ সত্যসত্যই দেবোপম সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন; এমন দয়াশীল, এমন বিনয়ী, এমন চরিত্রবান, এমন পরদুঃখকাতর, এমন অমায়িক, এমন স্বধর্ম্মপরায়ণ যুবক ধনাঢ্য বংশে অতি কমই দেখিতে পাওয়া

৺রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ রায়চৌধুরী

৺জ্যোতিরিন্দ্র মিত্র

যায়। কি বলিয়া তাঁহার শোক-কাতর আত্মীয় স্বজনকে প্রবোধ দিব, আমার নিজের হৃদয়ই যে প্রবোধ মানিতেছে না। সতীপ্রসাদ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন; আমরা তাঁহার অতুল গুণরাশি স্মরণ করিয়া হাহাকার করিতেছি।

৺জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র

জ্যোতিষচন্দ্র পরলোকগত প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি যে এত অল্প অকালে পরলোকগত হইবেন, এ কথা তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহই মনে করেন নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বেই তাঁহার অগ্রজ রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের শোচনীয় অপমৃত্যু হইয়াছিল; এই নিদারুণ আঘাতেই জ্যোতিষের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং কয়েকদিন রোগ ভোগ করিয়াই তিনি পরলোকগতহইলেন। দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ডেপুটী রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের গভীর বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

বিগত সংখ্যা ভারতবর্ষ ছাপা শেষ হইবার সময় শ্রদ্ধাভাজন যতীন্দ্রবাবুর অকস্মাৎ পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া আমরা শোক প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাড়াতাড়িতে তখন তাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশ করিতে পারি নাই। এইবার তাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়া সেই বরেণ্য বন্ধুর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম। বিগত ২৪এ বৈশাখ বরাহনগরের বাটীতে তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের মত সকলই দেখিতে পাইলাম, শুধু

৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

দেখিতে পাইলাম না সেই সহাস্য বদন, শুধু শুনিতে পাইলাম না যতীন্দ্র বাবুর মধুর প্রাণ-ঢালা সাদর সম্ভাষণ।

সাময়িকী

এবারের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে সাধক-প্রবর প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ নদীয়া শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আনন্দকৃষ্ণ গোস্বামী। ইনি প্রথমে গ্রামের চতুষ্পাঠীতে, পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। কলিকাতায় অধ্যয়ন সময়ে ইনি উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং কেশবচন্দ্র সেন-প্রমুখ ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। কুচবিহারের মহারাজার সহিত কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে মতভেদ হওয়ায় ইনি ও অপর কয়েকজন ব্রাহ্ম কেশব বাবুর দল ত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু, তিনি অধিক

দিন ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্কে থাকিতে পারেন নাই ; পরিণত বয়সে ইনি ব্যাকুল হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই সময় গয়াধামে এক যোগীর সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার নিকট ইনি মন্ত্র গ্রহণ করেন। এবং তাহার পর হইতেই গোস্বামী মহাশয় দিবানিশি হরিনাম ও ভগবৎ প্রসঙ্গে বিভোর থাকিতেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি পুরীতে অবস্থান করেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন। ইহাঁর ভগবৎপ্রেমের আকর্ষণে অনেকে ইহাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আমরা এই ভগবৎ-প্রেমিক সিদ্ধ-সাধকের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিলাম।

বৈশাখের 'ভারতবর্ষ' যখন প্রকাশিত হয়, তখন কলিকাতার দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমরা তখন মনে করিয়াছিলাম, সেইখানেই এই শোচনীয় অভিনয়ের যবনিকাপতন হইল। কিন্তু আমাদের সে ধারণা অচিরেই ভ্রমমূলক প্রতিপন্ন হইল ; দুই সপ্তাহ যাইতে-না-যাইতেই আবার হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকট হইল। তাহার পর কয়েকদিন যে তাণ্ডব-লীলা চলিল, যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল ; আহতের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে কলিকাতার গগন-পবন যে ভাবে মুখর হইয়া উঠিল, নিরপরাধ নাগরিকগণ যে ভাবে প্রকাশ্যে ও গুপ্তভাবে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে বিগত-প্রাণ হইল, সে সকল কথা বর্ণনা করা দূরে থাকুক, স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে, লজ্জায় ক্ষোভে অধোবদন হইতে হয়। আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি, এ ঘৃণিত ব্যাপারের সহিত কাহারও ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই ; ইহার অন্তরালে অপ্রীতিকর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রহিয়াছে ; এই তাণ্ডব-লীলার পশ্চাতে গভীর রাষ্ট্রনৈতিক চালবাজী কাজ করিতেছে। তাহারই প্রেরণায় অশিক্ষিত জনমণ্ডলী ক্ষুব্ধ হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে আত্মহারা হইয়া এই আত্মঘাতী তাণ্ডবে লিপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা এই দাবানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন, তাঁহারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান কাহারও কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, এই দেশব্যাপী বহ্নিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকেই সমভাবে পুড়িয়া মরিতে হয়।

এখন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই নিদারুণ দাঙ্গা হাঙ্গামার কি নিবৃত্তি হইবে না? এই হিন্দু মুসলমানের বিরোধ কি এই ভাবেই চলিতে থাকিবে? এতদিন হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য যে চেষ্টা হইতেছিল, তাহা এমন ভাবে ব্যর্থ হইল কেন? আমরা যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে এই বিরোধ এখনই নিবৃত্তি হইবে না, আরও কিছুদিন চলিবে ; নেতৃগণের কথাবার্ত্তা এবং আচরণে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু, আমাদের বিশ্বাস এতকাল উভয় জাতির মিলনের যে চেষ্টা হইয়াছিল, উভয় জাতিকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার গোড়ায় প্রকাণ্ড একটা গলদ্ ছিল। সবলে এবং দুর্ব্বলে কখন মিলন সাধিত হইতে পারে না ; কোন সাময়িক স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সবল ও দুর্ব্বল দুই দিনের জন্য কর-মর্দ্দন করিতে পারে, কিন্তু তাহা কখনও স্থায়ী হয় না ; সামান্য কারণেই সে মিলন-সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা সফল হয় নাই ; সামান্য একটা ঢাকের বাজনা উপলক্ষ করিয়া সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। তবে কি এই দুই জাতির মিলন একেবারেই অসম্ভব? আমরা তাহা মনে করি না ; বর্ত্তমান বিরোধ ও দাঙ্গা হাঙ্গামার অদূর-ভবিষ্যতে মিলনের সূচনা হইয়াছে। বর্ত্তমান হাঙ্গামায় উভয় জাতির বল ও সংহতি-শক্তির একটা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ; এখন এতদিনের সবল পক্ষ বুঝিতে পারিয়াছেন যে প্রতিপক্ষ আর দুর্ব্বল নহে ; এখন দুই পক্ষই সদর্পে বলিতেছেন 'তুম্ ভি মিলিটারী' 'হাম ভি মিলিটারী'। এইবার মিলনের সূত্রপাত হইল ; এখন কেহ কাহাকেও ভীরু বা দুর্ব্বল মনে করিয়া কৃপা চক্ষে দেখিবে না।

এইখানে বড় রকমের একটা 'কিন্তু' আছে। হিন্দু-মুসলমানের শক্তি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, ইহার মধ্যে একটা তৃতীয় পক্ষ আছেন। তাঁহারা আমাদের শাসক-সম্প্রদায়। তাঁহারা যদি এ সময় নিরপেক্ষ ভাবে শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন, কোন রাষ্ট্রনৈতিক চালবাজীর মধ্যে না যান, যাহা ন্যায়সঙ্গত, যাহা ব্যবস্থা-সঙ্গত সেই ভাবে কার্য্য করেন, সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থকে প্রশ্রয় প্রদান করিয়া তাহাদের অধিকতর সবল না করেন, তাহা হইলে হিন্দু-

মুসলমানের মিলন সুদূর-পরাহত নহে ; তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান আবার নিরুপদ্রবে প্রতিবেশীভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা-দেশের, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গভীর তমসাচ্ছন্ন।

দেশের কথা ত বলিলাম, এখন একটু বিদেশের কথা বলি। বিদেশ হইলেও তাহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিলাতে এক বিষম বিভ্রাট বাধিয়াছে ; বলিতে গেলে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এমন ব্যাপারের কথা ইতঃপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইংলণ্ডের পঁচিশ লক্ষ শ্রমজীবী ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য ত্যাগ করিয়াছে, ইংলণ্ডের কারখানা একেবারে অচল হইবার যো হইয়াছে। অধিকাংশ বিভাগের শ্রমিকেরাই এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। কিছুদিন হইতেই ইংলণ্ডে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে মন-কষাকষি চলিতেছিল। যাঁহারা ধনাধিকারী, যাঁহাদের মূলধনে বিপুল ব্যবসায়-বাণিজ্য, অসংখ্য কল-কারখানা, অগণিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, তাঁহারা লভ্যাংশ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেছেন ; আর যাঁহারা শ্রমিক, যাঁহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমে এই সকল প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহাদের দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, তাঁহারা অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই অসাম্যজন্তের জন্য শ্রমিকদলের মধ্যে অনেক দিন হইতেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদিন পরে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহারা ন্যায্য প্রাপ্যের দাবী করিতেছেন। তাঁহারা বলেন মূলধন এবং শ্রম (Capital and labour) উভয়েরই সমান দাবী। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এ দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন, মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রমিক-সঙ্ঘ তাই ধর্ম্মঘট করিয়াছেন ; ইংলণ্ডে হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে ; সুতরাং এই বিপ্লবের ফল ভারতবাসীকেও ভোগ করিতে হইবে। তবে, যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে অতি শীঘ্রই একটা মিটমাট না হইয়াই পারে না ; ইহাই আশার কথা।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বিহকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নাটক "চিত্রকুমার সভা" মূল্য—১৷৹
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব প্রণীত কবিতা "ওমর খৈয়াম" মূল্য—৷৵
শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত নাটক "কবিতা সভ্যতায়" মূল্য—১৲
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "খেলাঘর" মূল্য—১৷৹
ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" মূল্য—২৲
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত "মানুষ গড়া" মূল্য—১৷৹
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "রূপসী" মূল্য—২৲

নিবেদন

'ভারতবর্ষ' আগামী আষাঢ় মাসে চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিবে

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৩৵৹, ভিপিতে ৩৷৹ ষাণ্মাসিক ১৷৵৹ আনা, ভিপিতে ১৷৶৹। এই জন্য ভিপিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা অগ্রিমমূল্যে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক। ভিপির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়, সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। ২৫শে চৈত্রের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভিপি করা হইবে। পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নং দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ নূতন বলিয়া উল্লেখ করিবেন ; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

দ্রষ্টব্য—ত্রয়োদশ বর্ষের 'ভারতবর্ষে'র একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকপাঠিকাগণের গোচর করিতেছি। এই বৎসর ২০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী পঠিতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে ; এতদ্ভিন্ন বহু আলোচিত্র, একাধিক বর্ণ চিত্র ৩০ খানি ও একবর্ণ চিত্র নানাধিক ১৪০০ প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এই ত্রয়োদশ বর্ষে কি প্রবন্ধবৈচিত্র্য, কি ত্রিবর্ণ চিত্র, কি একবর্ণ চিত্র—সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিভিন্ন বিভাগের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকগণ 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিয়াছেন ;—বাঙ্গালাদেশে কেন, ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেরই কোন মাসিকপত্রই এত আয়োজন করিতে পারিয়াছে কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA

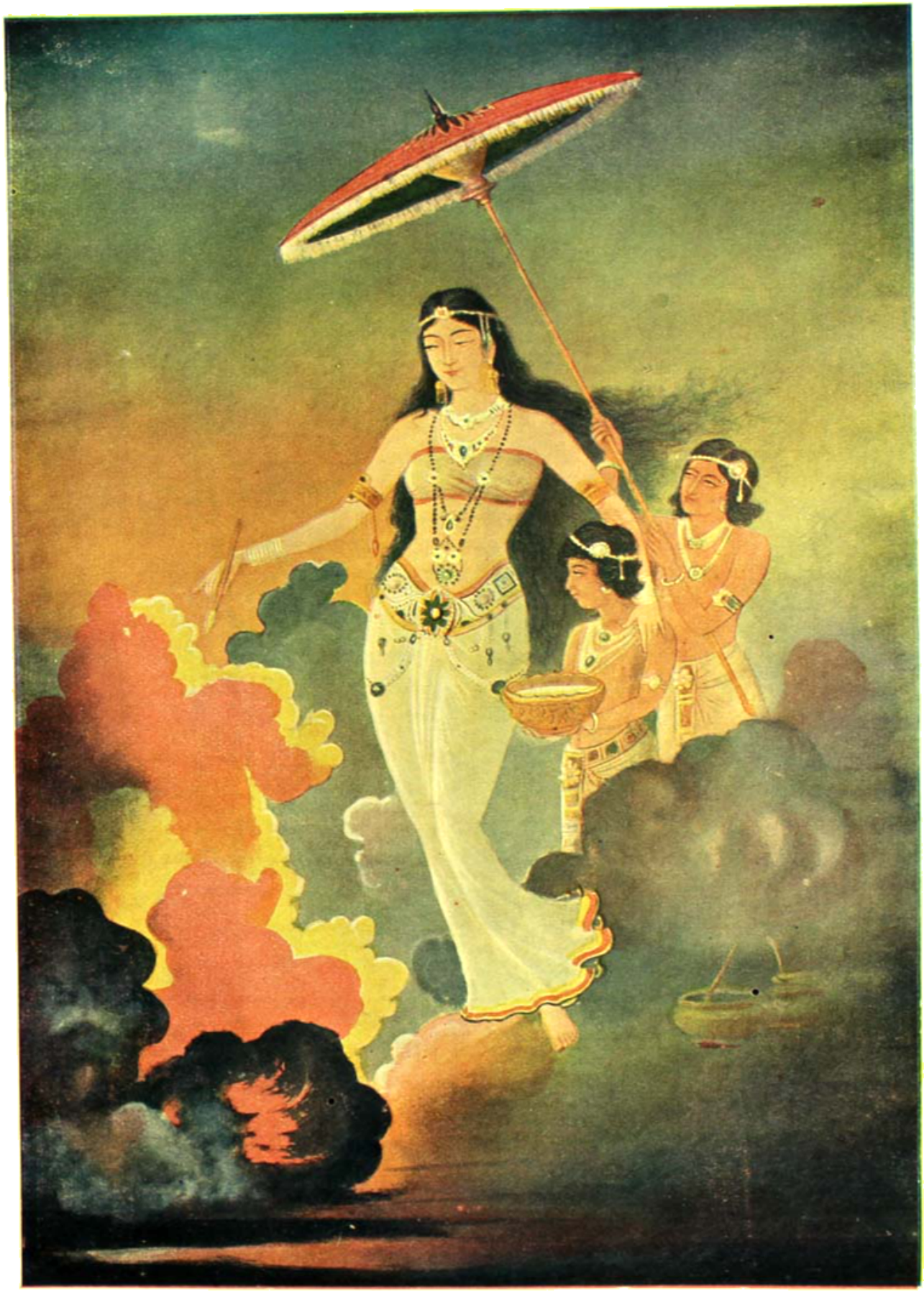

কংসের রাণী